











# ধন্যতত্ত্ব

স্বকিঞ্চনমিবং বিধং পরিভ্রং প্রদর্শনম্ ।  
চেতঃস্থমিচ্ছলভীৰ্বং সূত্রাং পাত্ৰম্ভনম্ ।  
বিদ্যাবো.ধর্মহলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।  
সার্বভৌমত্বং বৈরাগ্যং ব্রাহ্মচর্যং প্রকীৰ্ত্ততে ।

১ম ভাগ ।  
১ম সংখ্যা ।

১লা মাঘ, শনিবার, ১৩৩১ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ ।

14th January, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩-

## প্রার্থনা :

মা নববিধান-বিধায়িনী, নিত্য নব নব উৎসবসম্মিলিত  
মি । যত্নের পর যত্নের উৎসব সাধন করাইয়া, তুমি  
আমাদিগের পুরাতন জীবনের আমিত্ব হরণ করিলে ।  
আবার ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মনন্দন ও ব্রহ্মমন্দিরী প্রমোৎসবের  
সন্তোগদানে, নববিধানের নবজন্মলাভের আকাজক্ষা  
উদ্দীপন করিলে । খস্তু তুমি, কেননা পুরাতন জীবন না  
গেলে, আমরা ত নবজন্ম লাভ করিতে পারি না ; আরার  
তাহা লাভ না করিলে আমরা কেমন করিয়া, নববর্ধাগমে  
নববিধানের মহামহোৎসবের দ্বারে প্রবেশের অধিকার  
পাইব ? নববিধান নবজীবনের বিধান, নবজীবন বিনা  
প্রকৃত নববিধানের নব মহোৎসব সন্তোগ হয় না । এই  
নববর্ধাগমে প্রতিদিন এক এক নুতন উৎসব, নুতন সাধনা  
দিয়া, নব মহামহোৎসবের জন্ত প্রস্তুতির ব্যবস্থা করিয়াছ ।  
নববর্ধ দিনে নবদেবালয়ে প্রবেশের উৎসব, রাজর্ষি ও  
মহর্ষির স্মরণে, নববিধানাচার্য ও প্রেরিতগণ সঙ্গে, নব-  
বিধানের প্রতি, সাত্ত্বিকের প্রতি, গৃহের প্রতি, শিশুগণের  
প্রতি, দাসকর্মীর প্রতি, দীনজনের প্রতি প্রজ্ঞাদানান্তে,  
আচার্যদেবের তিরোধান দিনে তীর্থসমাগম সাধন করাইয়া  
ধন্য করিলে । তাহার পর মহাজনসমাগম, জনহিতৈষিসমাগম,

মিত্রসমাগম, বিরোধিসমাগম, আত্মানুগমন এবং চিন্তাশক্তি-  
সাধন এক একটি বিশেষ উৎসবরূপে সাধন করাইয়া,  
আমাদিগকে যেন হাতে ধরিয়া সাধনমার্গে উত্তোলন  
করিতে করিতে মহামহোৎসবের মহাবক্ষে লইয়া  
আসিলে । আমরা নিতান্ত দীনহীন কৃপাপাত্র বলিয়াই,  
তুমি এবার আমাদের জীবনের ভার যেমন লইয়াছ,  
তেমনি আমাদের ধর্মসাধন, উৎসবসাধনের ভারও স্বয়ং  
লইয়াছ । আশীর্বাদ কর, যেন আমরা তোমার এই  
অলৌকিক বিধানের অলৌকিক কৃপার উপযুক্ত হইতে  
পারি । তোমার বিশ্বমানব নবভক্ত সঙ্গে এবং সমগ্র  
মণ্ডলী, দেশ, জাতি ও জগজ্জন সঙ্গে, প্রকৃতি যোগে  
তোমার উজ্জল প্রেমমুখ দেখিতে দেখিতে, মহামহোৎসব-  
সন্তোগে কৃতার্থ হই । তব ভক্তবৃন্দ সঙ্গে তুমি  
আমাদিগকে আশীর্বাদ কর ।

শান্তিঃ । শান্তিঃ । শান্তিঃ ।

## মহামহোৎসবের মহা আহ্বানধ্বনি ।

"ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে, ডাকিতে  
এসেছি তাই চল ঘরা করে ।" সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বর  
বিনি, তিনি নিত্যই আমাদিগকে তাঁর স্বর্গের আনন্দোৎস-

সব দিবার জন্ম বারবার ডাকিতেছেন। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সেই ডাক শুনিয়া, তাঁহারা ই আকর্ষণে সংসারের অসার কাজকর্ম কেলিয়া, ব্যাকুল অন্তরে তাঁহার সমীপে আগমন করেন ও তাঁহার আশীর্বাদপ্রসাদরূপ উৎসবানন্দ-লাভে কৃতার্থ হন।

অমরলোকবাসী অমরাআগণ তাঁহারা ই ডাক শুনিয়া বিহ্বল হইয়া, এই পার্থিব দেহত্যাগ করিয়া, দৈহিক জীবনের যাবতীয় মোহমায়ার বন্ধন ইহতে বিমুক্ত হইয়া, সেই পরম প্রিয়তম পিতামাতার নিত্য সঙ্গসহবাসরূপ মহামহোৎসবসন্তোকে চিরমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহারা আর ইহলোকের দুঃখ যন্ত্রণা, রোগ শোক ভোগ করিতে ফিরিয়া আসিবেন না। কিন্তু দেহপূরবাসী আমরা, আমাদের ভাগ্যে সে নিত্য উৎসবসন্তোগের সৌভাগ্য ত হয় না। তাই, আমরা বাহাতে সশরীরে থাকিয়া, সেই স্বর্গবাসী অমরাআগের সন্তোধ্য উৎসব ত্র্যমুকুণায় সময়ে সময়ে সন্তোগ করিতে পারি, তাহারা ই জন্ম আমাদের সন্তানবৎসলা মা আমাদের ডাকিয়া আনিয়া, তাঁহার স্বর্গস্থ ভক্তবৃন্দ ও অদেহী সন্তান সমুত্তি-দিগের সঙ্গে মিলাইয়া, উৎসবানন্দদানে যথ্য করেন।

নববর্ধাগমে আবার আমাদের মা মহামহোৎসবে ডাকিতেছেন। এস, আমরাও তাঁহারা ই সুরে সুর মিলাইয়া, তাঁহার ভক্ত সঙ্গে এক হইয়া সকলকে ডাকিয়া বলি, এস তাই ভগ্নী, এস দেশবাসী জগদ্বাসী, এস রাজা প্রজা, দুঃখী ধনী, জ্ঞানী মুখ, রোগী ভোগী, শোকে তাপে তাপিত, পাপভারে ভারাক্রান্ত যে যেখানে আছ, এস। এস হিন্দু, এস মুসলমান, এস বৌদ্ধ, এস খ্রীষ্টান, এস শিখ, এস ইহুদী, এস শাক্ত, এস বৈষ্ণব, এস পার্সী, এস জৈন, এস শৈব, এস যে যে সাম্প্রদায়িক ইষ্টমত আছ, সকলে এই সার্বজনীন সর্বধর্ম-সমন্বয় নববিধানের মহাগহোৎসবে আগমন কর। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকাবাসী সকলে এস, সকল প্রকার আপন আপন বৈশিষ্ট্য লইয়া আমাদের আনন্দ ময়ী মার আনন্দোৎসবে শুভাগমন কর। সকলকার লিখিত সমতানে গাই, “গাড়া পেয়ে ছুটে আসিলাম নিকটে, তেমনি করে একবার দাঁড়াও না।” তিনি নিশ্চয়ই সকলকে তাঁহার জীবন্ত দর্শনদানে এবং মহামহোৎসবের মহা আনন্দদানে কৃতার্থ করিবেন।

## সার্বজনীন নববিধান।

নববিধান নবযুগধর্ম-বিধান, সর্বধর্ম-সমন্বয়বিধান। নববিধান সার্বজনীন বিধান, ইহা অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-বিধান। সকল ধর্ম, সকল শাস্ত্র, সকল সাধুতত্ত্ব, সকল সাধনপ্রণালী, সকল যোগ তত্ত্ব কর্তৃক জ্ঞান রূপ তপ এবং সকল সম্প্রদায়, সকল জাতি, সকল দেশবাসী নরনারীকে এক করিবার জন্ম, স্বয়ং বিশ্ববিধাতা কর্তৃক প্রেরিত। ইহা কোন মানুষের বুদ্ধি-নিষ্পন্ন ধর্ম নয়, কিম্বা মানুষের মধ্যবর্তিতা ইহাতে নাই।

এই বিধানের উপাস্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, যিনি সভ্যরূপে সর্বত্র এবং সর্বক্ষেত্র সবার অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষভাবে সর্বজনকে দর্শন দিবার জন্ম কাছে কাছেই আছেন; সকলকে জ্ঞান চৈতন্য দিবার জন্ম গুরু হইয়া বিবেকবাণী শুনাই-তেছেন এবং প্রত্যেক শুভকার্যের পরিচালক হইয়া প্রত্যাশে দিতেছেন। তিনি মানবকে চির উন্নতির পথে সমুন্নত করিবার জন্ম অনন্ত শক্তি ধারণ করিয়া রহিয়া-ছেন এবং প্রতিনিয়ত আমাদের ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, জড়তা ভাঙ্গিয়া ও আমিশূচক অহং নির্বাক করিয়া, তাঁহারা ই মহিমা দেখাইয়া, আমাদের অনন্তের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি নিত্য ত্রিগুণাশীল এবং স্বীয় প্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া, অনন্ত পিতৃমাতৃস্নেহে আমাদের লালন পালন, রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন ও আমাদের সর্বদেহ হইয়া আছেন। মা যেমন রুগ্ন শিশুর সকল দোষ ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া, কেবলই তাহার সেবা শুশ্রূষা করেন, তেমনি আমাদের সহস্র পাপ অপরাধ, আমাদের অপূর্ণতা ও পাপ-প্রবণতা রূপ রোগের ফল জানিয়া, তিনি আমাদের জীবনকে সকল ভার লইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিজ পুণ্যবলে আমাদের ইচ্ছাকৃত পাপের ছায়াদণ্ড বিধান করিয়া, শুদ্ধ ও সংশোধিত করিবার জন্ম ব্যস্ত এবং সকল পাপ ইহতে মুক্ত করিয়া আমাদের নিত্য আনন্দ, নিত্য শান্তি দিবার জন্মই জীবন্ত ব্যক্তিরূপে আনন্দময়ী মা হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন।

নববিধানের এই উপাস্য যিনি, তাঁহাকে যে যে নামে, যে যে ভাবে ডাকি না কেন, তিনি সকল নামেই অভিহিত হন। তাই নববিধানে ব্রহ্ম, গুরু, খোদা, আল্লা, জিহোভা, পুরুষোত্তম, হরি, মা সকলই সেই একই

পদ্ম দেবতা। তিনি নিরাকার, তাঁহার কোন বাহ্য আকার নাই, তিনি কোন একরূপ জড়মূর্তিও ধারণ করেন না। তিনি কোন প্রকার জ্যোতিঃ বা বিভূতিতেও দেখা দেন না। তাঁহার দর্শন শ্রবণ আধ্যাত্মিক; তবে বাহ্য নিদর্শনে তিনি তাঁহার প্রেমের ও কৃপার পরিচয় আমাদের কাছে দেন।

এই জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনাই নববিধান-সাধনের সর্বোচ্চ উপায়; কিন্তু এ উপাসনা প্রার্থনা কেবল মুখের কথা বা ভাবের উচ্চাস নয়, ইহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের প্রেরণায় করিতে হয়।

নববিধান সকল ধর্মের সকল সাধনের সম্মান করেন। যোগ, ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান, তপ, তপ, বৈরাগ্য, আত্মনিগ্রহ, ধ্যান, চিন্তা, পাঠ, শ্রমজ্ঞ, প্রচার, সেবা, শিক্ষা, সকলই ইহার আনয়নীয়; তবে কোন প্রকার অস্বাভাবিক কষ্টসাধ্য সাধনাকে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন না। ঈশ্বরের নীতি, বিধি, নিয়মাদি অমুসরণে সংবাদি সাধন ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য অবলম্বন করা যাইতে পারে; কিন্তু সকল সাধনই প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-নির্দেশেই অবলম্বনীয়।

নববিধান ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে এক করিতে অবতীর্ণ; সুতরাং বিজ্ঞানের বিধি অতিক্রম করা নববিধানের অমুমোদিত নয়। ধর্মবিজ্ঞান যেমন, মনোবিজ্ঞান, বস্তু-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, সকলই নববিধানের অন্তর্ভুক্ত; সকল বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও একত্ব সম্পাদনের জন্য নববিধানবিজ্ঞান রচিত।

বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, ললিতবিস্তর, গ্রন্থ, আবেস্তা প্রভৃতি সর্বধর্মশাস্ত্রই নববিধানে আদৃত ও অমু-সৃত; ইহার ভিতর যাহা সত্য, যাহা ঈশ্বরোক্ত, তাহার সমন্বয়সাধনে নববিধান মৌমাংসাশাস্ত্ররূপে বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত। বেদ বেদান্তে ঈশ্বরের জ্ঞান ও যোগ, আবেস্তা ও পুরাণে তাঁর প্রেমলীলা ও মহিমা, কোরাণে ও বাই-বেলে তাঁহার নীতি ও বিধি, ললিতবিস্তরে প্রজ্ঞানীতি বিশেষভাবে শিক্ষণীয়। সকল শাস্ত্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কাহাকেও উপেক্ষা করিলে চলিবে না, ইহাই নব-বিধানের শিক্ষা।

নববিধান সাধু ভক্তগণকে অজ্ঞানন্দন, ব্রহ্ম প্রেরিত, মানবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে গ্রহণ ও সম্মান দান করেন। তাঁহার অঙ্গচরিত্রের এক এক ভাব ও আদর্শ প্রদর্শনের

জগৎ প্রেরিত। মুখা বিশ্বাস ও বিবেকের, ঋষিগণ ও সঙ্কেটিস আত্মজ্ঞানের, বুদ্ধ বাসনা-নির্ব্বাণ ও বৈরাগ্যের, গৌরাজ প্রেমোন্মত্ততার, মহোন্মদ একেশ্বর-বিশ্বাসের, ঈশা আত্মইচ্ছাশক্তি-বিশ্বাসের ও শুদ্ধতার শিক্ষাদাতা। ইহাদের সকলকার মিলনে নববিধানের মূর্তিমান অজ্ঞানন্দ। সর্বভক্তগণের সহিত বোণ, সমাগম ও তীর্থসাধন নববিধানের বিশেষ সাধন।

নববিধান রাজা শ্রমজ্ঞ, দুঃখী ধনী, জ্ঞানী মুখ, ধার্মিক অধার্মিক, নর নারী সকল মানবকে এক অখণ্ড মানব-দেহের অঙ্গরূপে সম্মান করেন এবং পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ মহাপাপ মনে করেন।

নববিধান হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, আর্ধ্য, ব্রাহ্ম, ইহুদী, পার্শী, শাক্ত, বৈষ্ণব সকলকেই একই মার সম্মান, অতএব পরস্পর ডাই ডাই বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, সকলকেই সমাদর করেন এবং সকলকে নববিধানের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করেন।

নববিধান-মতে আসিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমে-রিকা একই ভূখণ্ডে যেমন গ্রথিত, তেমনি এই সকল দেশবাসী নরনারীও এক অখণ্ড পরিবারভুক্ত। সুতরাং সমগ্র জগতে এক প্রেমপরিবার, এক অখণ্ড ধর্মমণ্ডলী, এক স্বর্গরাজ্য বা স্বরাজ্য স্থাপনের জগৎই নববিধান অবতীর্ণ। মানবে মানবে, ধর্মে ধর্মে, সম্প্রদায়ে সম্প্র-দায়ে, বেণে দেশে, জাতিতে জাতিতে যে অসন্তাব, অশ্রীতি ও অশান্তি রহিয়াছে, তাহা উচ্ছেদ করিয়া, শ্রীতি, সন্তাব ও শান্তি সংস্থাপন করাই নববিধানের উদ্দেশ্য।

আর্ধ্য হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রীষ্টীয়, বৈষ্ণব, শিখ-বিধান, যুগে যুগে মানবের পাপ হইতে পরিত্রাণ, শান্তি ও স্বর্গলাভের জন্য যিনি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই মানব যুগে সর্বধর্মবিধান মিলাইয়া, এই নববিধান সমগ্র মানবজাতির পরিচরণ ও শান্তিলাভের জগৎ লইয়া, তিনিই স্বয়ং অব-তীর্ণ হইয়াছেন। নববর্ষে যেমন নব পঞ্জিকা, নবযুগেও তেমনি নববিধান।

যিনি ধর্মপিভামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়ের প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্চার করিয়া, এই নববিধানেরই বীজ বপন করেন, তিনিই ধর্মপিভা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়া এই নবযুগধর্মকে ব্রহ্মধর্ম নামে অভিহিত করিয়া, ইহার সাধনপ্রণালী নির্দ্ধারণ ও মণ্ডলী গঠন করেন এবং তিনিই মাতৃরূপে প্রকট হইয়া নববিধানাচার্য্য অজ্ঞানন্দ

বেশকল্পে লেনকে দিয়া জীবনে তাহা সাধন করাইয়া,  
 তাঁহাকে সববিধানমূর্তিমান সবশিশু করিয়াছেন । আমরাও  
 যেন সেই অক্ষরপাণ্ডে অক্ষানন্দে সহিত একাত্ম হইয়া,  
 পরম্পরকে ভাই ভাই, ভগ্নী ভগ্নীরূপে গ্রহণ করিয়া,  
 সববিধানমূর্তিমান সবশিশুদল হইয়া, সব জীবন প্রাপ্ত হই।  
 সববিধান-বিধায়িনী জননী আমাদিগকে ইহাই আশীর্বাদ  
 করুন ।

## ধর্মতত্ত্ব ।

### মানুষকে ভালবাসা ।

ঈশ্বরকে ভালবাসা সহজ, মানুষকে ভালবাসা কঠিন ।  
 প্রাচীন বিধানে কেহ কেহ ঈশ্বরকে অধিকতর ভালবাসিতে গিয়া  
 লংসারকে ত্যাগ করিলেন ; কিন্তু বর্তমান যুগধর্মবিধানে ঈশ্বরকে  
 ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকেও ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া ভাল-  
 বাসিতে হইবে । নদীর জল বধন কম থাকে, তখন তাহা কেবল  
 সাগরের দিকে ধায়; কিন্তু বান ডাকিলে নদীর জল উচ্ছ্বসিত হইয়া  
 পার্শ্বস্থ ভূমিকেও সিক্ত করে । তেমনি কেবল ঈশ্বরকে ভালবাসা  
 সকলেই দিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের উচ্ছ্বসিত প্রেম ছয়রে  
 মা আসিলে মানুষকে ভালবাসা বেওয়া যায় না ।

### ভক্তের রক্তে মানুষের পরিজ্ঞাপ ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, কেহ যদি রক্ত-  
 হীনতা বশতঃ জীবনীশক্তিহীন হয়, অপরের রক্ত সকালন  
 করিলে তাহার জীবনীশক্তি লাভ হইয়া থাকে । তেমনি যে  
 ব্যক্তি পাপব্যাবিধিতে দুর্বল, বিভ্রান্ত ভক্তের তেজোবর রক্ত  
 তাহার অন্তরে সঞ্চার করিয়া দিলে, তাহার পাপ দুর্বলতা  
 দূর হইয়া জীবন সঞ্চার হইবে । এই জন্যই ঈশ্বর-বলিলেন,  
 “আমার রক্ত লহিত আমার রক্ত মাংস আমার পান কর,  
 তাহা হইলে আপাঙ্গিক গিয়া পুণ্যশক্তি লাভ হইবে ।” অর্থাৎ  
 ঈশ্বর বিভ্রান্ত ভাগবতী তবু আমাদেরও হইবে এবং তদ্বারা  
 তাহার নিষ্পাপ আত্মা ও মন আমাদের হইবে । ইহাই ত  
 পরিজ্ঞাপ । অর্থাৎ নিষ্পাপাত্মার আত্মার আত্মহ হওয়াই পরিজ্ঞাপ ।

## সুনীতি-স্মরণে ।

( পত ১৭ই ডিসেম্বর, শনিবার, কমলকুটীরে, মহারাণী  
 সুনীতি দেবীর স্মৃতি-তর্পণ সত্কার প্রতি )

ভূমি ছিল মহারাণী, তবু ছিলে একান্ত আত্মীয়,  
 আপনীর জন বলি’ কেনেছি তোমার ;

কত না সুখের স্বপ্ন, স্বপ্নের অস্তিত্ব গিয়া,  
 তোমার অতাবে প্রাণ তরে’ বেদনার ।

অকালমৃত্যুরূপে তোমার প্রথম পরিচয়,

বীরপী রানী বলে’ জানি তার পরে ;

ভক্তি-প্রীতি উচ্ছ্বসিত মুক্তধারা প্রাণনা-নিচর,

স্বপ্নে আগিয়া র’বে চিরদিন তরে ।

বহু শোক পেরেছিলে, তীক্ষ্ণ হৃদয়ে বিদ্র-বদিকানি—

নিবেদিতা বাসি সুখে বহিরাহ বাখা ;

যে জনমেছে কাছে হ’তে, সেই জানে স্বপ্ন-স্বপ্নবানী,

সেই জানে মোক-স্বপ্ন অক্ষর-সাক্ষী ।

গেছ যোগা পূণ্য লোকে, বেড়াইলে ঘেহে সমাদরে

পূজমান রাখা যায়, কি সহজে, সবারেই আপনায় করে’ ।

প্রিয়তমা দেবী ।

## মহারাণী সুনীতি দেবীর

## স্মৃতি-তর্পণ ।

( ১৮ই ডিসেম্বরের, ‘বঙ্গবানী’ হইতে গৃহীত )

পতকন্য ১৭ই ডিসেম্বর, শনিবার, অপরাহ্ন ৪।০ ঘটিকার  
 সময়, অপর সাকুণার রোডে কমলকুটীরে, ভিক্টোরিয়া ইন্সটি-  
 টিউশনের প্রাঙ্গণে, কুচবিহারের স্বর্ণগতা মাননীয়া মহারাণী  
 সুনীতি দেবীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রকৃত-তর্পণ করার মন্তব্য  
 জনসত্কার অনুষ্ঠান হয় । সত্কার বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল ।  
 বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সত্কার যোগদান করিয়া-  
 ছিলেন । তন্মধ্যে কুচবিহারের মহারাজকুমারী ইলা, আয়েবা ও  
 মেনকা, মহারাজকুমার যৌতমনারায়ণ, কুচবিহারের রিজেন্সী  
 কাউন্সিলের ভাইস প্রেসিডেন্ট লেঃ কর্ণেল ইভান্স গভর্ন,  
 ময়ূরভঞ্জের মাননীয় মহারাজা, নন্দগাঁওয়ের রাজাপাহেব,  
 নাটোরের মহারাজা বোগীজনাথ, কনসাল জেনারেল-ইটালী,  
 কনসাল জেনারেল নেদারল্যান্ডস, কনিকাভার সেরর ডাঃ  
 বিমানচন্দ্র রায়, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সার হেবলসান  
 সর্বাধিকারী, অধ্যুক্ত বতীজনাথ বসু, নাটোরের হুতপূর্বসরস্বতী,  
 লেডী কবলা বসু, লেডী সরকার, অধ্যুক্তা প্রসন্নমণী দেবী,  
 সরলা দেবী, হেবলজা দেবী, মিঃ ও মিসেস পি. কে. সেন, মিঃ  
 ও মিসেস এস. সি. মহলানবিশ, মিঃ ও মিসেস এন. সি. সেন,  
 মিসেস এস. এন. সেন, মিসেস এ. এন. চৌধুরী, মিস  
 ম্যাকলিউড, মিঃ এন. এন. মুখোপাধ্যায়, সার বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ  
 মিত্র, মিঃ জানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ ডি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়,  
 মিঃ ও মিসেস এস. সি. মুখোপাধ্যায়, মিঃ ও মিসেস এস. সি.  
 রায়, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির দ্বারা উদ্বোধনযোগ্য । এতদ্বিধ  
 বহু-বহিলা ও ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের ছাত্রীসকল সত্কার উপস্থিত

হিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সত্যপতির আসন গ্রহণ করেন।

ঈশুকা ইন্দ্রিমা দেবী ও সুসমা যেন একটি সমরোচ্চিভ সজীত দ্বারা সজ্জিত উদ্বেগন করেন। অতঃপর ঈশুকা প্রিয়বদা দেবী শর্গীরা মহারাণীর উদ্দেশ্যে একটি কবিতা পাঠ করিলে, পূজনীয় সত্যপতির প্রাঙ্গণে ঈশুকা বতীজনাথ বহু নিরুনিধিত প্রত্যাব আনয়ন করেন :—

“কলিকাতা নগরীর গৌরজন ও তারকজর্জর বিস্তার হানের প্রতিনিধির এই সভা মাননীয়া, জনহিতকর কার্যে, আশ-সমর্পিত। কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবীর পরলোক-গমনে সত্যের খোক প্রকাশ করিতেছে। এই সভা পরলোক-গতা মহারাণীর রাজপরিবারকে তাঁহাদের অপূরণীয় ক্ষতিতে আন্তরিক সহায়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।” ঈশুকা হেমলতা দেবী একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উক্ত প্রত্যাব সমর্থন করেন।

ইহার পর লেডী অংলা বহু স্বর্গগতা মহারাণীর স্মৃতিরক্ষা-কল্পে মহারাণীর জনহিতকর শেখ কার্য। ডিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশনের উন্নতি সম্পর্কে এক প্রত্যাব উপস্থিত করেন। উক্ত প্রত্যাব সিং পি, কে, সেন সমর্থন করেন।

অতঃপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সত্যপতির আসন গ্রহণ করিয়া মহারাণীর পুত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে জন্মের প্রজ্ঞা তর্পণ করেন।

### রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা-তর্পণ।

“ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে জন্মের দোষ অবরুদ্ধ হয় না, এই আশা মনে রেখে আজ এসেছি স্বর্গগতা সুনীতি মহারাণীর উদ্দেশ্যে এই কথা জানাতে যে, আমাদের সবকু ঐহিক গীরা অভিক্রম করে অক্লুর আছে।

“মহারাণীর সঙ্গে আমার সবকু এক অংশ পৈতৃক, এক অংশ ব্যক্তিগত। কেশবচন্দ্র বখন একদিন কোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিরেছিলেন, তার অনতিকাল পূর্বেই আমার জন্ম। সেই সময়ে মহারাণীর মাতৃদেবী আমাকে তাঁর যে ক্রোড়ে লালন করেছিলেন, সেই ক্রোড়েই তার অনেক বৎসর পরে সুনীতি দেবী মাতৃদেহে সন্তোষ করেচেন।

“অবশ্যে তিনি বখন শ্রামিগৃহের অধিবাসী হলেন, তারপরে কতবার কতদিন তাঁদের আলিঙ্গনের বাড়ীতে, কমলকুটীরে, দাখিলিঙে তাঁর আতিথ্য লাভ করেছি। সেই সকল আনন্দ-হিল্লোলিত কলহালাসুপক দিনগুলি তাঁর প্রথম যুগের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। হৃৎকণ্ঠ দিয়েও শান্তির জন্তে, সাধনার জন্তে তিনি আমাকে স্মরণ করিতে কুণ্ঠিত হননি। আমাদের পরস্পর দেখা হবার অবকাশ নির্বাক বড়ই নাই; কিন্তু আত্মীয়তার বোগমুক্ত আমার আত্মীয় নিরবস্থির ছিল।

“তারপরে অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছিল। আমার যে বয়স, তাকে মৃত্যুকে আমার তুল বোঝবার আশঙ্কা নেই। মৃত্যু-লোকের নিকটে এসেছি। আমার জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর বাধ্যমান সঙ্কল্প হয়ে এসেছে। আমি উদয়গিগন্ত ও অস্ত-দিগন্তের মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। আমি, “বঙ্গা ছারামুতং বঙ্গা মৃত্যুঃ”—অমৃত বীর ছারা, মৃত্যুও বীর ছারা, সেই এক পরম সত্যের মধ্যে আমাদের চিরস্থিতি। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে শোক করবার দিন আমার নয়।

“দিনের বেলায় আলোতে নিকট সংসারের সীমার মধ্যেই নিজেই আমি। সে আলো বখন নিভে যায়, তখন নিজেই উপলব্ধি করি সসীম নক্ষত্রপরিবেষ্টিত জগতের মধ্যে। সীমার মধ্যে যে ক্ষতি, অসীমের মধ্যে তার পূরণ। আমাদের এই সীমার সংসার থেকে যিনি গেছেন, তিনি আজ প্রকাশ থাকেন অসীমের অন্তরীণ আলোকে। বা কিছু কৃত্রিম, বা কিছু কল্পনীয়, ধূনির পৃথিবী থেকে তা অন্তর্হিত, বা চিরন্তন জ্বার মধ্যে, তাই নিত্য হয়ে রইল, এই কথা মনে করে তাঁকে জানব যে, তিনি মর্ত্য স্থব্রহ্মণ্ডের অতীত। ‘তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা যা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।’ সে বেদনীর পুরুষকে জানো, মৃত্যু তোমাদের বাখা না দিক। জীবন ও মৃত্যু সেই পরম পুরুষের মধ্যে অখণ্ড সম্মিলিত। ‘আনন্দাচ্ছ্যেব খণ্ডিয়ানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দঃ প্রেরজ্যাত্তিগংবিশতি।’ আনন্দ হতেই সকল জীব জগৎ গ্রহণ করে, আনন্দের অতিমুখে প্রয়াগ করে, আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে।”

তারপর সত্যের সর্বসম্মতিক্রমে উপবোধ প্রত্যাব দুইটি গৃহীত হয়। সত্যপতি রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে দ্বিতীয় প্রত্যাব অল্পমাত্রী শর্গীরা মহারাণীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে সভার একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। অতঃপর ডাঃ বিমলচন্দ্র খোব সত্যপতিকে বক্তব্য প্রদান করিলে সভাভঙ্গ হয়।

### মহারাণী সুনীতি দেবীর মহাশয়গণ।

গত ১০ই নবেম্বর, এই রাত্রে সন্ধ্যায়, কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী সুনীতি দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন, এই সংবাদ সকলেই প্রবণ করিয়াছেন। অনেকে তাঁহার শেষ ক’দিনের বিষয় একটু বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন; সেজন্য এই প্রবন্ধে তাঁহার জীবনের শেষ দিন কয়টির বিষয় একটু লিখিব।

গত ২০শে অক্টোবর, তিনি স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য রাখিতে আগমন করেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ থাকতে, তিনি বি.এন. আর, হোটেল উঠিয়াছিলেন। একটু সুস্থ হইলে, বাড়ীত্যাগ করিয়া কিছু দিন এখানে থাকিবেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে বেরিবারি রোগে আক্রান্ত হওয়াতে, তাঁহার জন্মের বড়ই দুর্কল হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রে



আসিয়া প্রথম দিন করেক একপ্রকার কাটিল, কিন্তু গত ২৬শে অক্টোবর, তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। সে যাত্রা তিনি কোনও প্রকারে সামলাইয়া উঠেন। তারপর গত ৮ই নবেম্বর হইতে তাঁহার পীড়ার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। ৯ই নবেম্বর সারাদিন নিখাসের অত্যন্ত কষ্ট হয়, তিনি সমস্ত-কণ মুখ দিয়া নিখাস গ্রহণ করেন ও বারবার বলিতে থাকেন, “আমাকে খুম পাড়িয়ে দাও, আমাকে খুম পাড়িয়ে দাও।”

সন্ধ্যার পর হইতে তাঁহার কষ্টের একটু উপশম হয়, ও কিংবদন্তি পরে তিনি বলেন, “অজানা রাজ্যের ডাক এসেছে।” হাররে, আখীর বহন বাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তখনও বুঝিতে পারেন নাই, যে সভ্যই অজানা রাজ্যের ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চিকিৎসকগণ অবশ্য সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে, এ যাত্রার তাঁহাকে রক্ষা করা যাইবে না। তাঁহার নাড়ীর অবস্থা ও হৃৎকেন্দ্রের ক্রিয়া ক্রমশই খারাপ হইয়া আসিতেছিল। এই প্রকারে ধীরে ধীরে তাঁহার জীবন-প্রদীপ তোর পট্টার সময় চিরকালের মত নির্বাপিত হইল।

মৃত্যুর সময় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সপরিবারে ও তাঁহার বোনকে স্মৃতি দেবী ও তাঁহার স্বামী, তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১০ই নবেম্বর, রাঁচির ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। এই প্রকার অভাবনীয় দৃশ্য রাঁচিতে কখনও ঘটে হয় নাই— ভবিষ্যতেও হইবে কি না, সন্দেহ। একান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পরলোকগমনসংবাদ সমস্ত নগরে ছড়াইয়া পড়ে ও বহু ভক্তলোক ও মহিলা আসিয়া হোটেলে সমবেত হন। তখন গৌরীপ্রসাদ মজুমদার মহাশয় প্রার্থনা করেন। ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিদ্যালয়ে এই সংবাদ প্রচারিত হয়। তাঁহার মহাপ্রস্থান-সংবাদ পাইবামাত্র সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া যায়।

বেলা ১০টা হইতে হোটেলে জনসমাগম আরম্ভ হয়। দলে দলে আসিয়া ভক্তগণ ও শত শত অজ্ঞাত লোক সমবেত হইতে থাকে। ১১-প্রবাসী অধিকাংশ বাঙ্গালী সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনেক ইংরাজ নরনারীও উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১১টার সময় হাজারীবাগ হইতে ব্রজকুমার নিয়োগী মহাশয় আসিয়া, রাঁচি ব্রাহ্মসমাজের সহিত একত্র হইয়া ব্রাহ্মো-পাসনা করেন।

বেলা ৩টার সময় মহারাজীকে হোটেলে হইতে ডুয়েন্টা স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানীয় এ.জি. আফিসের বাবুসাই বহন করিবার সমস্ত কাণ্ড করেন। হোটেলে স্থিত সেই বিপুল জনবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। “জয় জয় সত্যদানন্দ হরে” এই সংকীর্ণটী গাহিতে গাহিতে ও পরমা বিতরণ করিতে করিতে জনতা অগ্রসর হইতে থাকেন। স্থানের নিকটে বহু মহিলা এই ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতী দেবীকে শেখ দেখা দেখিবার জন্য আগ্রহ হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন ও সকলেই স্থান অনুসি-

তাহার অনুগমন করেন। এই স্থানে বালিকাবিদ্যালয়ের বালিকাগণ তাঁহাকে পুষ্পাৰ্চা প্রদান করিয়া প্রণাম করে।

সেদিন স্থানের সেই দৃশ্য বর্ণনা করিতে পারি, এমন শক্তি আমার নাই। আবার বুদ্ধবিনীতা যে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াছে, সেই ছুটিরা আসিয়াছে। ছোট সুবর্ণবেশা নদীটির দুই তীর মহিলা ব্যাধী পূর্ণ। জননীরা সব শিশু সন্তান বন্ধে করিয়া ছুটিরা আসিয়াছেন; নব পরিণীতা যুগু, বাঁহাকে কখনও বাহিরে দেখি নাই, তাঁহাকেও সেদিন স্থানে দেখিয়াছি। স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহের ছোট বড় সমস্ত বালকবালিকা স্থানে। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান, বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী, শিখ, বৃক, বুদ্ধ, নরনারী সকলেই স্থানে ছুটিরা আসিয়াছেন। সে স্বর্গীয় দৃশ্য কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? বাঁহারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানটিকে ‘মহাবিলম্বকেন্দ্র’ বলিয়া নিশ্চয়ই মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। মৃত্যুর দ্বার সেদিন অমৃতরই সোপান বলিয়া অনুভব করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সেদিন এ পারে যেমন আমরা সকলে মিলিত হইয়াছিলাম—ওপারেও তাঁহাকে লইয়া বাঁহা বহু আত্ম সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

তত পিতার ভক্তিমতী কস্তা মহারাজী হইয়াও অন্তরে অন্তরে সভ্যই ভগবিনী ছিলেন। মৃত্যুর সময় কোথায় তাঁহার রাজ্য পড়িয়া রহিল, কোথায় তাঁহার রাজপ্রাসাদ রহিল, বিবর্ত সে সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাঁহার শাস্তিমতী প্রভাভর মধ্য হইতে তাঁহাকে আপন কোলে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সেই পবিত্র আশ্রয় অনন্ত কল্যাণ বিধান করুন ও শোক-মত্ত প্রিয়জন-দিগকে সাহসনা দান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

রাচি,

সুচরিতা দেবী

## মহারাজী স্মৃতি দেবী।

(রাঁচিতে স্মৃতিসভা)

গত ১০ই নবেম্বর, এই রাঁচিতে যে পুণ্যস্থান ইহখান হইতে সেই অমরধামে তিরোহিত হইলেন, সহস্রাধিক নরনারী পরিবেষ্টিত হইয়া সম্মোচিত গাভীরা সহ সুবর্ণবেশার আকর্ষিতকার বাঁহা নব্বয়দেহ দেখিতে দেখিতে পঞ্চভূতে মিলাইয়া গেল, আজ (২৭শে নবেম্বর) সেই মহারাজী স্মৃতি দেবীর তসম্বাপন উপলক্ষ্যে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণস্থানে সম্পন্ন হইতেছে। তাহারই সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, ৮দেবীর বোনের কস্তা স্মৃতি দেবী প্রাতঃকালে এখানে স্থানভূমিতে বিশেষ প্রার্থনা করিলেন।

বৈকাল :ষট্টিকার স্থানীয় নারীসমিতির উদ্যোগে বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটা বিশেষ স্মৃতিসভার আয়োজন হয়।

হানীর হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ভ্রাতৃ-মহিলাগণ যোগ দেন। প্রজ্জেরা মিসেস্ পি. এন. বোস একটা ব্রহ্মসংগীতের পর উপস্থিত সকলকে সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া, মহারানী প্রথমে তাঁহার খাল্যসহপাঠিনী ছিলেন, তৎকালীন তাঁহার সকলের সহিত কি মধুর ব্যবহার, এবং পরবর্তী জীবনে উপাসনাকালে ও কথকতা করিবার কালে তাঁহার যে ভক্তিবিশ্বগুণচ্ছবি ফুটিয়া উঠিত, এই সকল স্মরণ করিয়া গুণমুগ্ধ-হৃদয়ে স্বর্গগত আত্মার প্রতি প্রজ্ঞা নিবেদন করেন।

তৎপর মাননীয়া সুখা দেবী শোককাতরকণ্ঠে তাঁহার অগীরা জ্যেষ্ঠ মামীমাতার পারিবারিক জীবনের কয়েকটি সাধারণ ঘটনা উল্লেখ করেন। রাজরানী হইয়াও তাঁহার কিরূপ সরল খাতাবিক প্রকৃতি ছিল ও স্বামীর প্রতি তাঁহার কিরূপ জী-হুলভ সেবাপরায়ণতা ছিল, তাহা বর্ণন করিয়া, প্রোত্বৃক্ষের মনে চমৎকার কয়েকটি চিত্র ফুটাইয়া তোলেন। বিবাহিত জীবনে কিরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির আখ্যান কি সুল্লর ইংরাজি ভাষায় রচনা করেন, তাহাও বর্ণন করেন। তাঁহার দানশীলতা, দাসদাসীর প্রতিও সুমিষ্ট ব্যবহার, তাঁহার দৈনিক পূজা পদ্ধতি ও ভগবত্তত্ত্বের কথা সুল্লরভাবে বর্ণনা করেন। একদিকে রাষ্ট্রোৎসর্গ, অর্থসম্পদ, মান সম্মান, আর একদিকে শোকতাপ মনঃপীড়ার কথা দিয়া, তাঁহার এই সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়াছে; আজ তিনি এ জগতের অতীত হইয়াছেন। প্রতিদিন উন্নততর লোকে তাঁহার অমর আত্মার গতি হউক, তাঁহার পুণ্য আদর্শগুলি আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হউক, লীলাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক—এই রূপ প্রার্থনা করেন। তৎপর প্রজ্জেরা মিসেস্ জে. কে. দত্ত নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন :—

আপনারা সকলেই জানেন যে, গত ১০ই নবেম্বর, কুচবিহারের মাননীয়া মহারানী সুনীতি দেবী অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন; আজ আমরা তাঁহার তিরোথানে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। তাঁহার জীবনী লব্ধে আমি অল্পই জানি; বতটুকু তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাহাতে অনুভব করিয়াছি, তিনি একজন পবিত্রচেতা নিষ্ঠাবতী এবং ভক্তিমতী নারী ছিলেন। ধর্মে নিষ্ঠা এবং ভগবানে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল, তজ্জ পিতার উপযুক্ত কন্যা তিনি ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনে কত দুঃখ শোক এবং দুর্দিনের ঝড় বহিরা গিয়াছে, কিন্তু তিনি দরাময়ের দ্বারা প্রতি কখন সন্নিগ্ধ হন নাই এবং তাঁহার চরণে আস্থা ও বিশ্বাস হারাণ নাই; নিষ্ঠার সহিত প্রাতঃ সন্ধ্যার তাঁহার পূজা অর্চনা না করিয়া জল গ্রহণ করেন নাই। কত সময় তিনি মহিলাদের মধ্যে উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশ ও আরাধনা কেমন সরল ও ভক্তিপূর্ণ ছিল, তাহা এখনও স্মরণ হইতেছে।

মহারানী অতিশয় দরাসুন্দর এবং দানশীলা রমণী ছিলেন, কত দরিদ্র অনাথকে তিনি গোপনে অর্থসাহায্য করিতেন, তাঁহার পরিবারকেই কেহ তাহা জানিতে পারিতেন না; তাঁহার অভাবে আজ তাঁহার মাতৃহীন হইলেন। কেহ তাঁহার নিকট অভাব জানাইলে, তিনি তাঁহার অভাব বোচেন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। বিবাহিত জীবনে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিনী করিয়াছিলেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবনে তিনি ধনের লব্ধব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

সুনীতি দেবী জীশিকার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহারই অদম্য চেষ্টায়, উৎসাহে এবং অর্থসাহায্যে কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চিরদিন ইহাকে সাহায্য করিয়াছেন; ঐ বিদ্যালয়ের গৃহ না থাকিতে অসুবিধা হইত, সেজন্য তিনি কয়েক বৎসর হইল, বর্তমান গৃহ ও তৎসংলগ্ন জমি দান করিয়াছেন। দাক্ষি-নিং এর মহারানী স্কুল তাঁহার নিকট সাহায্য লাভ করিয়াছে এবং এইজন্য বিদ্যালয়টি তাঁহার নামে অতিহিত হইয়াছে। সকলেই জানেন, দাক্ষিণিং এর মত স্বাভাবিক স্থানে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে কত সুবিধা হইয়াছে। তিনি আরও কত সাহায্য করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ রূপ না জানার জন্য আমি উল্লেখ করিতে অসমর্থ। আপনাদের ক্ষমা করিবেন।

সরলময়ের চরণে আমরা আজ এই সর্বজনসম্পন্ন প্রজ্জেরা ভদ্রীর আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি; ( জীবনে তাঁহাকে অনেক শোক দুঃখ সহ্য করিতে হইয়াছে, আজ তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে। ) তিনি তাঁহার অমর আত্মাকে অনন্ত শান্তি এবং আনন্দ বিধান করুন, ইহাই আমাদের মিলিত প্রার্থনা।

## নববিধান-সঙ্গীত

( ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসন্ধির সামাজিক উপাধি বিবৃত )

নববিধান উদার ধর্ম, কেহ ইহাকে সঙ্গীত করিতে চেষ্টা করিলেও, ইহা নিজে সঙ্গীত হানে থাকিতে পারে না। নব-বিধান সাধনের ধর্ম, মতের ধর্ম নহে। ইহাকে বুঝিতে হইলে, উপরের দিকে দৃষ্টি ও অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়।

নববিধানতত্ত্ব ও নববিধান-সাধন-প্রণালী নববিধানের এক একটা সঙ্গীতে বিশেষভাবে পরিষ্কৃত দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটা সঙ্গীত যে কি অমূল্য ধন, তাহা কথার প্রকাশ করা যায় না। সাধন-পথে সাধক ভক্তগণ যেমন অগ্রসর হইতে থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়া এক অপূর্ণ রাসো তাঁহার উপনীত হন। তখন যে সকল তত্ত্ব ও নীতি তাঁহাদের অন্তরের দৃষ্টিতে পড়ে, তাহার সঙ্গীতাত্মকতা, তাঁহাদের মনে তাহা সঙ্গীতরূপে



প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গীত-রচনার তীহারের কবিত্বের, কিংবা মনুষ্যবুদ্ধি দ্বারা ওজন করিয়া যাঁকা ও শব্দ নির্দোষনক, কিংবা লোকের মনোরঞ্জনের দিকে দৃষ্টি থাকে না। তীহারী নিজে বাহ্য তীহারের অন্তর মধ্যে দেখেন এবং সেই সময় বর্ণন হইতে যে আলোক ও দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তাহাই স্বভাবতঃ সঙ্গীতরূপে প্রসূত হয়। সেই সঙ্গীতের মর্ম বুঝিবার জন্য সাধকের সেইখানে উপস্থিত হইতে হয়, যে স্থানে দাঁড়াইয়া ভক্তের প্রাণ হইতে সঙ্গীত উৎপন্ন হয়। অপরদিকে আমাদের মত হৃদয়লব্ধ প্রকৃতির এবং ক্ষীণ সাধনের লোকেরও, সাধন-পথে অগ্রসর হইবার জন্য, নিষ্ঠার সহিত ঐ সকল সঙ্গীত পাঠ, গান ও শ্রবণ বিশেষ সাহায্য করে।

সজন ও নির্জন উপাসনার, আরাধনার, যোগ ও তক্তির সাধনে, মনন সময়ে ও নিতৃত চিন্তার সময়ে, বুদ্ধব্রহ্মে, হৃদে কষ্ট ও শোকের সময়ে, ভগবৎসঙ্গীতত্বা বহু আর কেহই নহে। বিশেষ ভক্তের সাধন-প্রসূত হৃদয়স্পর্কারী সংগীতগুলি। এই প্রকার সংগীতের আদর বিশেষ প্রয়োজন। এখন দৃষ্টান্তরূপে একটি সংগীত লইয়া অর্থাৎ কিকিং আন্দোচনা করা যাউক।

ভক্তের সংগীত আরম্ভ হইল :-

“অন্ধকার চিনাকালে কে বেন একজন,

আপনার ভাবে আপনি করে সঙ্গ বিচরণ।”

সাধক বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিলেন, সবস্ত অন্ধকার প্রাণে পাইলেন। সাধক নিরাশ না হইয়া অপেক্ষা করিলেন। তখন কে বেন একজন আপনার ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দেবতারূপে—অন্তর ইচ্ছা করা চামিত না হইয়া—চলারূপে কচেন, আবছারা আবছারা সাধকের এই অসুস্থতি হইল। এখানে বলা আবশ্যক যে, সাধক সফল-স্বরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া সাধন-পথে বহির্গত হইয়াছেন। যে বিশ্বাস প্রাপ্তান্তেও কম-প্রাপ্ত হয় না—ইহাই সাধনের মূলধন। সাধকের তীহার দেবতার নিত্যতার ও সঙ্গীত হিতের আভাস এখানে লাভ হইল। ইহাই পরে পূর্ণ হইবে।

এই অন্ধকারে গাইলেন :-

“কাণে কাণে কথা বলে, হেসে হেসে যায় চলে,

নিজাবেশে দেখি বেন কত সুখের স্বপন”।

সাধনের প্রথম অবস্থার সাধকের যে অবস্থা হয়, তক্ত সাধক তাই বলিতেছেন। এখনও ভগবানের সঙ্গে সাধকের গাঢ় সম্বন্ধ হয় নাই। বাণী সাধকের বিবেক-কর্ণে অল্প অল্প দিয়া, হেসে-হেসে মরে’ স্নিগ্ধ ভগবান্ দেখছেন, সাধনপথের নূতন পথিক কি করেন। বাণী আসছে—সাধকের মনে তাহা তখন হৃদয়ের স্বপ্নমত বোধ হইতেছে আর।

সঙ্গে বাহ্য নূতন (Novice) সাধক দেখিলেন এবং তিনি ঐ বাণী শ্রবণে কচেন, তাকে ধরিতে সাধক ইচ্ছুক হইলেন। সেই অরম্ভটি সংগীতে এইরূপ আছে :-

“ধরিতারে যদি বাই, খুঁজে বেলা রাহি পাই,

কিছু নিজে কাছে এসে ধের দরশন;

হরারে ঠেলিয়া কত করে পরানন;

লুকোচুরী খেলে বেন শিশু ছেলের মতন।”

সাধক তো ধরিতার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে অল্প বেলায় আবশ্যক। তখন পর্যন্ত তাহার জন্য যথেষ্ট যত্ন হয় নাই। ধরিতার জন্য খোঁজা খুঁজি আরম্ভ হ’ল, কিন্তু সে পথের সব রাস্তা ঘাট তখনও সাধকের জানা নাই। সাধক পথ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রান্তে রাস্তা। সাধনের দেহতা সব দেখছেন। ঠিক পথে যে এলে তীহার দর্শন পাওয়া যায়, সাধক তাহা ঠিক করে তখনও খুঁজিতে পারেন না—মনে নিরাশা আসছে, মন হোহলায়ান। ভগবান্ দেখলেন, আর ঘেরী করলে চলে না—নবাগত সাধক বাহাতে মনঃসুখ হইতে পারে না, সেজন্য নিজে কাছে এসে একবার দেখা দিলেন, কখন বা হরার ঠেলিয়া সাফা দিয়েই, সাধকের তৃপ্তি আরও বাড়িবার জন্য, তীহ করবার জন্য লুকিয়ে পড়লেন, আবার আর এক সময়ে দেখা দিলেন, আবার লুকোলেন—ঠিক যেমন শিশুছেলেদের লুকোচুরী খেলার মতন।

এই রকম অবস্থার ভিতর দিবে সাধক আর এক অবস্থার এসে পড়লেন—অনন্তস্বরূপের আর এক স্বরূপ তাঁর দৃষ্টিতে পড়িল।—শিশুছেলের মত তিনি কেবলই ক্রীড়া করেন না—কিন্তু তাঁর স্বস্তি অল্প সুস্থিও আছে। পাপ তাঁর সহ হয়। তাই ক্রমশঃ দেখিয়ে পাপীর প্রাণে ভক্ত আনয়ন করেন। তাঁর সম্মান হ’য়ে পাপ করছে দেখে, পাপস্বস্তির উপায়স্বরূপ, ঠিক বেন অভিমান হয়েছে দেখাবার জন্য, তাঁর প্রসন্ন মুখ ঢেকে রাখেন, বাতে পাপীর প্রাণে অশ্রোচনা (Repentance) অজ্ঞাপন আইসে। অজ্ঞাপনালে বখন পাপীর প্রাণ একটু স্রবীভূত হইল, তখন আবার নূতন বেশে এসে ভগবান্ প্রাণের ভিতরে দেখা দিলেন। ঠিক যেমন কাল মেঘের মধ্যে সূর্য্য চপলা বিছাৎ দেখা দিল। চপলার মত দেখা দিয়েই আবার কোথার মিলাইয়া গেলেন। একবার দেখা দিবে আবার লুকান, এইরূপ বারবার চলতে লাগিল সাধকের সঙ্গে। সাধক উত্তং ক্রম হইতে উঠল। তাবল, এ কি আবার ভগবানের কাণ্ড, ঠিক বেন খাপানী। সাধক তখনও বুঝেন নাই যে, তাঁকে গড়বার জন্য—লৌহকে যেমন কর্মকার কোন অস্ত্রে পরিণত করবার সময়, কখন অজিতে উত্তপ্ত করে, আবার পঞ্চমুখে জ্বলন্ত ভিতর ডুবাইয়া লয়, আবার উত্তপ্ত করে ও আবার জলে ডুবায়—সেইরূপ কখন ভগবান্ দর্শন দিয়া ও পর কণে অদর্শন দিয়া সাধকের জীবন গড়িতে থাকেন। তাই নববিধানের ভক্ত গাইলেন :-

“কখন দেখার তর না কহে বচন,

অভিমাণে ঢেকে রাখে প্রসন্ন বচন;

আবার দুই বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইতে এসে,  
কখনও পলকে খেবে চপলা খেমন,  
হাসির কাঁদার করে উত্তর হুতং,  
খাপালে এবার আবার খাপা নিরঞ্জন।”

সাধক দর্শন অর্শমের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে  
তার গতি আবার শিথিল হইয়া পড়ে—তখন পূজা উপাসনাও  
শিথিল হয়, কিংবা বৃত্ত ও নির্জীব ভাবে হয়, ঠিক যেমন  
পঞ্চপ্রান্ত পথিক দিক্ৰান্তিত হইয়া পড়ে। তখন আবার ক্রম  
বন্ধনের আবির্ভাব, তখন প্রাপ্তের ভিতর সেই ক্রম দেবতার  
তর্জনগর্জন-মুক্ত তীর তিরকারধ্বনি উখিত হয়। সাধকের  
অর্শর যেন অশমিনাদে কাঁপিয়া উঠে। সাধক তত্ত্বিত। বিশ্ব-  
রূপের অনেবরূপ দর্শনে মনের বোধ যেন লোপপ্রাপ্ত হয়। সেই  
তগবান্ যে কি ভিন্দি, যন তাহা বুঝিয়াও বুঝিয়া উঠিতে যেন  
পারে না। তগবানের লীলা দেখেও দেখে না, যেন ধরিত্রী  
উঠিতে পারে না। তত্ৰ তাই গাহিয়া উঠিলেন:—

“কখন ধনক দিয়ে, দেয় যুগ তাগাইরে,  
করে তিরকার কত তর্জন গর্জন,  
কাঁপার অশমিনাদে যেন জিতুবন;  
তবু তার মর্শ নাহি বোকে এ অবোধ মন।”

সাধক কিন্তু সঙ্গে “বিবাস”-অন্ত্রী নিয়ে এসেছেন। উঠচেন,  
উঠচেন কতবার, তবু যে পথ মিরেচেন, তা ছেড়ে বেতে  
পারেন না। নিরাশা আসছে, কিন্তু প্রাপ্তের ভিতর থেকে যে  
নিরন্তর আশার ধ্বনি উঠছে, সেটা তুচ্ছ কি অগ্রাহ্য কর্তে  
পারেন না। তিনি যে “বিবাস”-কবজ পরে’ পথে বেরিয়েচেন।  
পিতামাতা পুত্রের মঙ্গল জন্ত আবশ্যকমত শিশুকে তাকনা  
করেন—কখন তাকনা খেয়েও মা বাপের কাছ ছাড়ে না, তখন  
সেই শিশুর একান্ত নির্ভর দেখে, মেরুতরে তাহাকে ক্রোড়ে  
তুলে, তাহার যে পিতামাতাই বর্ষাৎ মৃদু, তাহারই পরিচর দেন;  
এবং ঠিক শিশুর মতন বাবর্জার করিয়াই, শিশুকে সাধনা দিবার  
জন্ত, যেন শিশুর মতন নাচেন ও গান করেন। সেইরূপ তগবান্  
তার শিশুতাবাক্যক কোমল বন্ধন প্রকাশ করিয়া সাধককে তার  
দিকে আকৃষ্ট করেন। বিবাসী তত্ৰ এইরূপে তাহাতে আকৃষ্ট  
হইয়া, তার কাছে কাছে থাকিতে, তার সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে  
প্রয়াসী হন; এবং সে জন্ত সবা আগ্রহ ভাবে তাহার কঁকণার  
উপর নির্ভর করিয়া, সাধন আরও গাঢ় করিতে থাকেন।  
পরিণামে তগবানের সহিত যোগযুক্ত হইয়া, বিমল আনন্দে  
ভাসিতে থাকেন। নববিধানের তত্ত্বের সঙ্গীত তাই এইভাবে  
দেখা দিচ্ছে:—

“কত পিতৃমাতৃসখা মৃদুদের প্রায়,  
কখন রালগোপাল বেশে নাচে গায়;  
আলায়ে বিবাস বাতি, কোমে আক সাঁরায়াতি  
দেখিবে কেনন সেই পুঙ্কনয়ন;

ধরিত্রী ফেলিব তার অতর চরণ;  
বহু মজা হবে যে তাই, হৃদয়ে মিলে তখন।”

বিবাসে যখন তত্ত্বের যোগ হয়, তখন আত্মা ও পরমাআত্ম  
যে যোগ হয়, তাহা যে কত সুমিষ্ট ও রসাল, তাহারই কিঞ্চিৎ  
আভাস এই সঙ্গীতে দেখা যায়। এই যোগ উপলব্ধির সহজ  
উপায় “নববিধান-সাধন”। ইহার মূল “বিবাস”, কল “তত্ত্ব”।  
সর্বপ্রকারে তগবানে নির্ভর ইহার অন্ততম উপাদান—এই জন্তই  
নববিধানের সাধক তগবান ছাড়া আর কাহাকেও গুরু স্বীকার  
করিতে পারেন না। বাহাতে তগবানের তুষ্টি, তাহা ছাড়া  
মহাব্যোম তুষ্টির জন্ত ব্যগ্র হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই  
“চৌদ্ধ ভুবন ধ্বংস হলেও আশ্বিনানেতে বানার ধর”। তার এই  
প্রথা। নববিধানের সাধকের লক্ষ্য—যুগ হুঃখ মান অপমান—  
সকলেতেই সমতা। যোগ শোক তাহাকে মুহুরান করিতে  
পারে না। এরূপ সাধক সৌভাগ্যক্রমে আমরা আমাদের  
জীবনে দেখেছি, ধর হয়েছি। এখন তাহাদের পদ অনুসরণ  
করে, বাহাতে আমরা তাহাদের মতন নববিধানের লোক হতে  
পারি, মা দয়াময়ী পতিতপাবনী তাহাই করুন। আর সাধনের  
সহায়করূপ, উপরোক্ত ও তজ্জপ অমূল্য সংগীতগুলি বাহাতে  
আমরা তব্বাদবংশের জন্ত রক্ষা করিয়া বাইতে পারি, সেইরূপ  
বিধান করুন এবং আশীর্বাদ করুন, বাহাতে আমরা এই কাঁচা  
সমাধার জন্ত অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারি। যে উপায়  
অবলম্বনে তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহারও বিধান বিধাতা  
করিয়া দিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## উদ্বোধন।

( ১৯শে নবেম্বর, ১৯৩২, লন্ডার উড্‌ল্যাণ্ডে, স্বর্গগতা মাননীয়া  
মহারানী সুনীতি দেবীর স্মরণার্থ উপাসনার উদ্দেশ্যে নিম্নতঃ )

সঙ্গীত—“মহাসিদ্ধর ওপার হ’তে কি সঙ্গীত তেমনে মিলে।”

“Consider the lilies of the field how they grow.”

“Seek ye first the Kingdom of God.”

স্বর্গস্থ পিতার প্রিয় সন্তান বলিলেন, “স্বর্গের পারিক্রান্ত  
সকল কেমন আনন্দে প্রফুল্লিত হয়।” “সর্বপ্রথমে স্বর্গরাজ্য  
অধবেশন কর।”

তগবানের আশীর্বাদে, তত্পরিবারে, স্বর্গের কুন্দন  
হুটিয়াছিল; আপন গৌরব, সৌরভ চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া-  
ছিল। ধরাদামে স্বর্গরাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্ত অমূল্য জীবন ব্যয়  
করিয়া, আনন্দময়ী মার আনন্দক্রোড়ে চির আনন্দে নিমগ্ন  
হইলেন।

শিঙ্গুপারে তিনি গিয়াছিলেন; কিছু দিন সেখানে বিদেশে  
বসবাস করেছিলেন; এক মাসের সন্তানজ্ঞানে অনেকের সঙ্গে

আত্মীয়তা সংস্থাপিত করেছিলেন। কিংবে এলেন বনেবে, নিজের জন্মভূমিতে, বক্তব্য যোগ বাদেব সহিত ছিল, তাঁদের আকর্ষণে। শরীরের রোগনিরাকরণের জন্ত, সিদ্ধপারে পুনরায় বাবার প্রভাব উঠিল, বাওরা হইল না। আর একজনের কথা মনে পড়ে, তিনিও অতি আপন জন। রোগনিরাকরণের জন্ত, বখন সিদ্ধপারে বাবার প্রভাব হইল, তিনি বলিলেন, সেই গানটা প্রামোক্ষণে বাজাও—“এই দেশেতেই জন্ম আমার, যেন এই দেশেতেই মরি”। ইহারও মনে অবরহ এই ভাব আগিতেছিল কি না জানি না।

কলিকাতা নহর হইতে বহু দূর রাঁচি নহরে বাহ্যসকলের জন্ত গমন করিলেন। আমরা সেইখানে অবস্থান করিতেছিলাম। শৈশবকাল হইতে ইহাকে দিদি বলিয়া ডাকিবার অধিকার পাইয়াছিলাম; বাগদারীর পদে অতিবিক্ত হইবার পর চইতে, এতাবকাল রানীদিদি বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছি। তাই বোনের সখ, অতি আদরের সখ, অতি ভালবাসার সখ, এই দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্তোষ করিয়াছি। নববিধানবিধাস-ভাণ্ডারসংস্থাপনে, নববিধানের নবস্বাক্ষরপ্রতিষ্ঠায় তিনি মাতিয়াছিলেন, আমাকেও মাতাইয়া ছিলেন। “তাই বোনে মিলে, এবার সকলে, গড়িব ভুবন নুতন করে।” এই প্রতিজ্ঞার আমরা আবদ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু “মিছে আশা, ভাঙ্গা বশা, প্রথমে পছড়ি হল।” মনের সাধ মনেই রক্তিয়া গেল।

আমাদের সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনী রাঁচিতে অবস্থান করেন। তাঁদের কাছেই সংবাদ পাইলাম, রানীদিদি রাঁচিতে আশ্রিত-ছেন। ইশেনেই ছুটিলাম; রেলগাড়ী হইতে তাঁহাকে নামাই-লাম। আমাদের বোধিরা তাঁর কত আনন্দ, কত আনন্দ। সেবাসীর্ষীদে ভবরমন করিয়া দিলেন। পাঁচদিন পরে রাঁচি হইতে কিরিবার আগে, সন্ধ্যার সময় তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। কত মধুর আলোপ, আমাদের সকলের কত খবরাখবর জ্ঞায়েলেন, কত আনন্দ প্রকাশ করলেন। সকল পরিবারে, সংবাদে, সমাজ, বঙালী, আত্মীয় স্বজনের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইলেন; কত সদহৃদানের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কলিকাতার কিরিয়া আসিয়া, তাঁহার রোগবুদ্ধির সংবাদ পাইলাম, সান্ত্বনার চিহ্নিত হইলাম; তাঁর কয়েকদিন পরেই শেব সংবাদ উপস্থিত হইল; সকলে শোকসন্তপ্ত ও মর্মান্বিত হইলাম।

মহাসিদ্ধর ওপার হইতে কি সঙ্গীত ভেসে এল। মধুরতানে, স্বাতন্ত্র্য প্রাণে আর চলে আর বনে’ তাঁহাকে আহ্বান করিল। প্রাণ তাঁর অতিশয় কাতর ছিল, আনন্দময়ীর মধুর ডাক পেয়ে; তিনি তাঁরই আনন্দকোড়ে রূপাইয়া পড়িলেন। মহাসিদ্ধর ওপারে কত আপনার জন অগ্রে গমন করিয়াছেন; পিতামাতা, তাই ভগিনী, দাদী, পুত্র কন্যা, কত আত্মীয় স্বজন, স্নানের যোগ বাদেব সহিত অকাটা। আপনার জনের সংখ্যা অধিক এ

পারে, কি ওপারে, হিসাব করিয়া ঠিক করা যায় না। তাই বখন ডাক এল ওপার থেকে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। প্রকৃত তিনি ত বহুদিন পূর্বে হইতেই হইয়া ছিলেন; তাঁরকল্প প্রতীকার অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে-কার কোন বন্ধনই আর তাঁকে বাধিয়া রাখিতে পারিল না। স্বর্গের কূল চারিদিক সৌরভে সৌরভাষিত করিয়া, বর্ষাদিগতির বেষ্টীতলে, চরণতলে উৎসর্গীকৃত হইল। ভালবাসা, ভালবাসামাথা লেখা, উদার-প্রেমপূর্ণ জীবন সমগ্র কার করিয়া, নববিধানের তরী সুখে আয়োজন করিয়া, বিজ্ঞাননিষ্ঠান উজ্জীৱমান করিয়া, ব্রহ্মকৃপাসোভে ভাসিতে ভাসিতে, অমরভাবে চলিয়া গেলেন।

আর আমরা তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা, বঙালীরা তাই ভগিনীরা এখানে পড়িয়া রহিলাম, তাঁহারই বিরহে, শোক সন্তপ্ত ও সুখ-মান হইয়া। অসংশয় দেহ অসংশয় দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, পাবকসংযোগে তরুীকৃত হইল, পক্ককৃত পক্ককৃত বিলা-ইয়া গেল। সংসারে-সর্বাণেকা সান্ত্বনা যে বড়, বার কোনক মুখ্য কেহ কোন দিন দেয় না, সেই দেহকল্প-জ্ঞানাবশিষ্ট ছাই—তাঁহাও সাদরে গৃহীত হইল, সঞ্চিত হইল। এও যে ভালবাসামাথা; ভাল বাকে যেসেহ, তাকে কি কোনক দিন ভুলিতে পার? ভালবাসার ভিনিবকে কোনক দিন কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? সেই সুন্দর সৃষ্টি, সেই সুন্দর দেহ, সকলেরই মিত, সকলেরই ভালবাসার ছিনিব হইয়াছিল। তাই অবশেষে তাঁহার অবশিষ্ট তত্ত্বও স্বেচ্ছা এত আদরের, এত প্রিয়, এত প্রকার বস্ত হইল; বাবার সান্ত্বনা লইলেন, বুকের ভিতর সাদরে স্থান দিলেন, সমস্তম অতি সন্মোহনে সংস্থাপিত করিবার জন্ত সঞ্চিত রহিল।

আর সেই অবিদ্যাত্মী আত্মা, বাহা সেই দেহের ভিতর ঐতদিন বর্তমান থাকিয়া উহাকে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছিল, শেব মুহূর্ত্তে, কোন্ সময়, কে ন্ দিক দিয়া সেই দেহকে পরিত্যাগ করিল, তাহাও কেহই দেখিতে পাইলেন না। সকলেই ত উৎসুকচিত্তে, সশঙ্কিত ভাবে, সেই প্রিয়জনকে ঘেরিয়া ছিলেন; কিন্তু প্রাণপাতী কখন কিরূপে, দেহশিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া, অনন্ত চিদাকাশে উড়িল, কাহারও অবগতি হইল না। সেই পাবীর সন্ধানে সকলেই ব্যস্ত, কোথায় গেলে, কি করিলে তাঁর বরশন মিলিবে।

জ্ঞানী পণ্ডিতেরা বলিলেন, “কে তোমার দাদী, কে তোমার ভাগ্যা, কে তোমার পুত্র, কে তোমার কন্যা, কোথা হতে তুমি এসেছ, কোথায় বা চলেছ, এ সকলি অতীত মর্যাদার। এই মর্যাদার অকিল সংসার পরিত্যাগ করিয়া, সেই ব্রহ্মপুরুষকে নীত জ্ঞান, এবং তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ কর।” বাউল (বাকুল) গেরে গেল—“মম পাবী চল বাই বরে, আর কি সুখ আছে, থেকে দেহশিঞ্জরে”। বরের সন্ধান কি তুমি জান? কোন্ বরে, চিরদিনে তরে সকলে সুবাহিত করে? দেখায়ে বিরহ নাই,

দিয়েছেন। যেখানে খেতে নাই, সন্ধ্যা নাই, যেখানে "স্বপ্ন-  
দিশ উজলিলে, পূর্ণ ইন্দ্ৰ পুরুষে," সেইখানে খেতে যত্নে ডাক  
কেনেছে, সেই না আনন্দস্বরূপ নিকট হতে। আমাদের সকল  
মিয়ানকে দিরাওয়ারের মত, "আর চলে আর আমার পাশে," এই  
কয়েক দিনে জীবিত আনন্দ কতছেন। তবে চলে সকলে  
তারই কাছে, তারই চরণে বসি, তার প্রসন্ন মুখ দেখি, তারই  
পূজা বন্দনা করি; আর তারই কোড়ে, ইহলগতে যে সকল  
আপনার অন্তরে হারিয়েছি, তাদের দেখে প্রাণমনকে শান্ত ও  
সংযত করি। কখনো কখনো আমাদের একমাত্র ভরসা।  
তারই আশীর্বাদে, তারই দয়ার উপর নির্ভর করি, পুজার  
আরম্ভে তারই চরণে বার বার প্রণাম করি।

ঈশতোজ্ঞনাথ সেন।

## সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৬শে ডিসেম্বর, কলকাতার নব-  
দেবালয়ে, ডাক্তারজ্ঞানেন্দ্রের সহধর্মিণী সতী জগন্মোহিনী দেবীর  
জন্মদিনে, তাই অক্ষরকুমার লব উপাসনা করেন। আচার্য্য-  
কর্তা ঈশতী মদিকা দেবী পিতামাতার আশীর্বাদ পরিবারের  
সকলের জন্মটিকা করিয়া প্রার্থনা করেন।

৭ই জানুয়ারী—এটনিবাগানে ঈশুজ শচীন্দ্র প্রসাদ বোমের  
মদিল উপলক্ষে, তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

নববর্ষোৎসব—গত ১লা জানুয়ারী, নববর্ষদিন উপলক্ষে,  
একুশে সন্মিলিত করিতে করিতে নবদেবালয়ে প্রবেশপূর্বক, ভ্রাতা  
সরলচন্দ্র সেন ঈশৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করিলে,  
নবদেবালয়ের প্রতিষ্ঠার সাবৎসরিক সম্পাদিত হয়। ২টার  
সময় মহামহোৎসবে প্রান্তিক সাধনার উপাসনা তাই প্রিয়নাথ  
সম্পাদন করেন। "ভ্রাতা ডাঃ বিমলচন্দ্র বোম আচার্য্যদেবের  
নববর্ষ উপলক্ষে ইংরাজী বোষণাপত্র পাঠ করেন। ধর্মপিতামহ  
শ্রীকৃষ্ণ ঈশমোহন ও ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি প্রজ্ঞা-  
পূর্ণবিবরণ আচার্য্যদেবের উক্তি ও সতী জ্ঞানমোহিনী দেবীর  
প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া, তাই প্রিয়নাথ শান্তিবাচন উচ্চারণ  
করেন।

৬ই জানুয়ারী—ঈশদাচার্য্য জ্ঞানেন্দ্র কেশবচন্দ্রের বর্গ-  
রোহণ উপলক্ষে, নবদেবালয়ে উপাসনা তাই প্রিয়নাথ মদিক  
করেন। সন্ধ্যার তারতম্যের ব্রহ্মমন্দিরে ঈশুজ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র  
খলোপাধ্যায় উপাসনা করেন। আচার্য্যজীবনী অবলম্বনে  
জ্ঞানেন্দ্রের জন্মকাল ১৮৬৩ খ্রিঃ, ১৮ই জানুয়ারী, সন্ধ্যার এলবার্টলে  
স্মৃতিসভা হয়। প্রিয়নাথ ঈশুজ জ্ঞানেন্দ্রের বখোপাধ্যায়  
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আরম্ভে সন্মিলিত ও প্রার্থনা  
হইলে, সভাপতি মহাশয়, ঈশুজ শচীন্দ্রনাথ খলোপাধ্যায় ও  
ভ্রাতা ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রের ব্রহ্মমন্দিরে জীবনী

অবলম্বনে বক্তৃতা করেন। ভ্রাতার বিমলচন্দ্র বোম সভাপতি  
মহাশয়কে ও অপর বক্তারকে ধন্যবাদ দিয়া নিজের সভ্য  
প্রকাশ করিলে সভাস্ত হয়।

পারলোকগমন—আমরা গভীর চিন্তায় লিপ্ত প্রকাশ  
করিতেছি যে, আমাদের পরম প্রভুর বহু এলাহাবাদ প্রবাসী ঈশুজ  
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র খলোপাধ্যায়ের একমাত্র প্রিয়তমা কত (ব্যক্তিগত  
ঈশুজ জ্ঞানেন্দ্রবোহন বস্তুর সহধর্মিণী) ঈশতী রমলা দেবী  
বহুদিন কঠিন পীড়ার শয্যাশায়ী থাকিয়া, গত ৫ই জানুয়ারী,  
৩নং ফেডারেশন স্ট্রিটে, পিতামাতা, ভ্রাতা, স্বামী, তিন কন্যা ও  
জামাতা প্রভৃতি বহু আত্মীয়স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, ৪৪  
বৎসর বয়সে, শান্তিময়ী পরমজন্মের অন্তর দেহ-কোড়ে স্থান  
লাভ করিয়াছেন। পিতামাতা শেষ সময়ে অনেকদিন কাছে  
থাকিয়া সন্তানের সেবা ওশ্রবা করিয়াছেন। ভগবান্ পারলোক-  
গত আত্মাকে তাঁহার শান্তিকোড়ে স্বকা করুন এবং শোকভিত্তি  
সকলের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সাধনা বিধান করুন।

পারলোকিক—৩রা জানুয়ারী, এটনিবাগানে ঈশুজ  
শচীন্দ্র প্রসাদ বোমের গৃহে, ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বর্গরোহণ  
উপলক্ষে, বিশেষ উপাসনা হয়। শচীনবাবু ভ্রাতার ভ্রাতার  
জীবনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন।

সাবৎসরিক—গত ৩০শে ডিসেম্বর, কলকাতার কক-  
তবনে, বর্গীর বার বাহাজুর বোগেন্দ্রনাথ খাতগীরের সাবৎসরিক  
দিনে তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১লা জানুয়ারী, শান্তসাধক তাই কেশবনাথ দেব  
সহধর্মিণীর সাবৎসরিক দিনে, ৩নং রাস্তা দিনে স্ট্রিটে কত  
ঈশতী অশোকলতা দাসের গৃহে ৫২৭ ৬৪ই ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশন  
স্ট্রিটে পুত্র ঈশুজ মনোজীতধন দেব গৃহে তাই গোপালচন্দ্র গুহ  
উপাসনা করেন। পাটনার কনিষ্ঠা কত ঈশতী বনলতা দেব  
গৃহেও উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে ঈশুজ মনোজীতধন দে  
প্রচারভাণ্ডারে ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

অজ্ঞ হাওড়ার, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বান্যাসিন্দ্র লেনে, ঈশুজ  
বসন্তকুমার দাসের গৃহে, ভ্রাতার পিতৃদেব বর্গীর কলকাতা দাসের  
সাবৎসরিক দিনে তাই অক্ষরকুমার লব উপাসনা করেন।

অজ্ঞ হাওড়ার, বর্গীর কালিদাস দাসের সাবৎসরিক,  
ঈশুজ জগদ্বদ পাল উপাসনা করেন। সহধর্মিণী ঈশতী  
মোহিনী দাস এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১০ টাকা দান  
করিয়াছেন।

৫ই জানুয়ারী, ১০নং নারিকেলবাগান লেনে ঈশুজ বোগেন্দ্র  
চন্দ্র দাসের গৃহে, ভ্রাতার মাতৃদেবী, বর্গগত ভক্তিতাজন তাই  
বসন্তকুমার দাসের সহধর্মিণীর বর্গরোহণের সাবৎসরিক উপলক্ষে,  
তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

৬ই জানুয়ারী, বর্গগত ভক্তিতাজন তাই প্যারীমোহন  
চৌধুরীর বর্গরোহণের সাবৎসরিকস্বরণে ৩নংদেবালয়ে তাই  
গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

পুরীর সংবাদ—পুণী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ নবপর্ণকুটীরে শ্রীঈশ্বর জন্মোৎসব উপলক্ষে, ১৫শে ডিসেম্বর, প্রাতে সন্ধ্যায় বিশেষ উপাসনা হয় এবং ২৬শে সন্ধ্যায় ক্লাক হলে সাধারণ সভা হয়। প্রক্ষেয় ভাট প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া, শ্রীমৎ আচার্যদেবের “শ্রীঈশা কে?” গল্পকে ইংরাজী বক্তৃতার সার সংগ্রহ আবৃত্তি করেন। অতঃপর প্রক্ষেয় শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন এবং প্রক্ষেয় ভ্রাতা বেণীমাধব দাস ঈশ্বর জীবনতত্ত্ব বিষয়ে আত্মনির্দেশন করেন। আরম্ভ ও শেষে যুবকদল নৃতন সংগীত কয়েক।

গত ২৬শে ডিসেম্বর, শ্রীব্রহ্মানন্দসতী ব্রহ্মনন্দিনী লগ্নোহিনী দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে, পুরী নবপর্ণকুটীরে বিশেষ উপাসনা ও শ্রীতিভোজন হয়।

সেবা—কটকবাসী কোন শ্রীষ্টধর্মবিশ্বাসী আত্মীয়ের কন্যা এবং পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে বিশেষ ভাবে আহূত হইয়া, গত ৩১শে ডিসেম্বর, ভাট প্রিয়নাথ উপাসনা, প্রার্থনা ও বরকন্যাকে উপদেশ দিয়া আশীর্বাদ করেন।

নববর্ষ উপলক্ষে পুরী নবপর্ণকুটীরে বিশেষ উপাসনা হয়। প্রক্ষেয় ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করিয়াছেন।

৮ই জাহ্নয়ারী, শ্রীমৎ আচার্যদেবের স্বর্গারোহণদিন স্মরণে ও ঐখানে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

“বিশ্রামকুটীরে” গত সপ্তাহে একদিন তাই প্রিয়নাথ মল্লিক পারিবারিক উপাসনা করেন।

## পত্রপ্রাপ্তি-স্বীকার।

মণ্ডলীর প্রক্ষেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসুর একখানি পত্র হৃদয়সময়ে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার পত্র ও পত্রের উত্তর স্থানভাবে এবারের কাগজে বাহির হইতে পারিলাম না। আগামীবারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইবে।

## উৎসব।

### কার্য্যপ্রণালী।

১লা মাঘ, ১৩৩৯ ১৪ই জাহ্নয়ারী, ১৩৩৩, শনিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৬ টায় আরতি।

২রা মাঘ, ১৫ই জাহ্নয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮টায় ও সন্ধ্যা ৬ টায় উপাসনা।

৩রা মাঘ, ১৬ই জাহ্নয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬ টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে মহিলাগণ কর্তৃক নিশান-বরণ।

৪ঠা মাঘ, ১৭ই জাহ্নয়ারী, মঙ্গলবার—শ্রীদরবারের উৎসব।

৫ই মাঘ, ১৮ই জাহ্নয়ারী, বুধবার—পূর্নাক্ষর ৯টার শান্তিকুটীরে ব্রাহ্মিকা-উৎসব। সন্ধ্যা ৬ টায় ব্রহ্মমন্দিরে যুবকদের উৎসব।

৬ই মাঘ, ১৯শে জাহ্নয়ারী, বৃহস্পতিবার—শ্রীমদ্বহ্মি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বর্গারোহণ-স্মরণসম্বন্ধে; ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭ টায় উপাসনা ও সন্ধ্যা ৬ টায় আরতিসভা।

৭ই মাঘ, ২০শে জাহ্নয়ারী, শুক্রবার—প্রাতে মঙ্গলবাড়ীর উৎসব; সন্ধ্যা ৬ টায় ব্রহ্মমন্দিরে সঙ্কীর্ণ-উপাসনা।

৮ই মাঘ, ২১শে জাহ্নয়ারী, শনিবার—বালকবালিকাদিগের নীতি বিদ্যালয়ের উৎসব। প্রাতে ৮টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; অপরাহ্ন ৪ টায় পুরস্কার-বিতরণ ও বালকবালিকা-সম্মিলন। (প্রবেশের জন্ত নিমন্ত্রণপত্র-প্রদর্শন আবশ্যক হইবে)

৯ই মাঘ, ২২শে জাহ্নয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত-দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে ৭ টায় কীর্তন, ৮ টায় উপাসনা; মধ্যাহ্ন ৩ টায় উপাসনা, তৎপরে পাঠ ও আলোচনা, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা; ৫ টায় কীর্তন ও সন্ধ্যা ৬ টায় উপাসনা।

১০ই মাঘ, ২৩শে জাহ্নয়ারী, সোমবার—প্রাতে ৭ টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; সন্ধ্যা ৬ টায় সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগর-সঙ্কীর্ণন বাহির হইবে।

১১ই মাঘ, ২৪শে জাহ্নয়ারী, মঙ্গলবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭ টায় ও সন্ধ্যা ৬ টায় উপাসনা।

১২ই মাঘ, ২৫শে জাহ্নয়ারী, বুধবার—নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭ টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা; সন্ধ্যা ৬ টায় সময় ব্রহ্মমন্দিরে আনন্দ-সম্মিলন।

১৩ই মাঘ, ২৬শে জাহ্নয়ারী, বৃহস্পতিবার—পূর্নাক্ষর ৯ টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে আর্থ্যানারী-সমাজের উৎসব। সন্ধ্যা ৬ টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা। ও ৮ টায় কেশব একাডেমী বিদ্যালয়ে উৎসব।

১৪ই মাঘ, ২৭শে জাহ্নয়ারী, শুক্রবার—৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিটে, অপরাহ্ন ৫ টায়, প্রচারকার্যালয়ের উৎসব।

১৫ই মাঘ, ২৮শে জাহ্নয়ারী, শনিবার—সন্ধ্যা ৬ টায় শান্তিকুটীরে “আমাদের সম্মেলন” উৎসব।

১৬ই মাঘ, ২৯শে জাহ্নয়ারী, রবিবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৮ টায় ও সন্ধ্যা ৬ টায় উপাসনা। অপরাহ্ন ৩ টায় সময় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানবিশ্বাসিগণের সভা (Conference)।

১৭ই মাঘ, ৩০শে জাহ্নয়ারী, সোমবার—সন্ধ্যা ৬ টায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভা।

১৮ই মাঘ, ৩১শে জাহ্নয়ারী, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬ টায় কমলকুটীরে নবদেবালয়ে শান্তিবাচন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbet New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.  
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, “নববিধান গেসে”  
বি এন, যুগান্তিক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



**Rev. P. C. Mozoomdar's works :—**

England & India	1 0
God's Treasury Part I	0 8
The Apex of Man	2 0
God and Man	1 0

0	8	आशीर्वा (नूतनसंस्करण)	2	40
0	4	The Silent pastor	0	6
1	0	The Spirit of God (New Edition)	2	8
0	8			

**Minister K. C. Sen's works :—**

Lectures in India ( Published in England by Cassell & Cassell & Co.) Part I and II (Cloth) each	3	0
Lectures in England (Part I)	1	4
Yoga—Subjective & Objective	0	4
Keshub Chunder Sens Portrait	1	0
Minister in the Attitude of Prayer	0	8
The New Samhita ( In English )	0	4
Essays. Theological and Ethical—in one Volume.	1	8
Discourses and Writings—Part I	0	8
The New Dispensation—The Religion of Harmony—Vol. I. & Vol. II. each	1	8
প্রচারকগণের সভার নির্দারণ	1	0
দৈনিক প্রার্থনা (কমলকুটার) ৩য়-৮ম, প্রতিপত্র	0	0
হিমালয়ের প্রার্থনা ১ম পত্র (নূতন সংস্করণ)	1	0
হিমালয়ের প্রার্থনা ২য় ও ৩য় (প্রতি পত্র)	0	0
মায়োৎসব (নূতন সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত)	1	0
ব্রহ্মগীতোপনিষৎ (নূতন সংস্করণ)	1	0
সাধুসমাগম	1	0
ঐ (পরিশিষ্ট)	0	0
গোবিন্দ নিবেদন ১ম ও ২য় পত্র (নূতন সংস্করণ)	1	0
ঐ ঐ	0	0
ঐ ঐ	0	0
ঐ ঐ	0	0
ঐ ঐ	0	0
দৈনিক প্রার্থনা, ১ম ও ২য়, প্রতি পত্র	1	0
প্রচারকের উপদেশ ১ম পত্র (নূতন সংস্করণ)	1	0
ঐ ২য় পত্র ঐ	1	0
ঐ ৩য় পত্র ঐ	1	0
ঐ ৪র্থ পত্র ঐ	1	0
ঐ ৫ম পত্র ঐ	1	0
ঐ ৬ষ্ঠ পত্র ঐ	1	0
ঐ ৭ম পত্র ঐ	1	0
ঐ ৮ম পত্র ঐ	1	0
ঐ ৯ম পত্র ঐ	1	0
ঐ ১০ম পত্র ঐ	1	0
দৈনিক উপাসনা (নূতন প্রকাশিত)	1	0
সঙ্গত—(সঙ্গত সভার আলোচনা)	1	0
জীবনবেদ	1	0
প্রার্থনা—(ব্রহ্মমন্দির)	1	0
বিধানভঙ্গীসূত্র (ব্রাহ্মকাঙ্গিগের প্রতি উপদেশ)	1	0
কালোক্তমিক সূচীপত্র	1	0
পরিচারিকাবৃত্ত	1	0
অধিবেশন—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ)	1	0
উপাসনা প্রণালী	1	0
নবসংহিতা (নূতন সংস্করণ)	1	0
আচার্যের উপদেশ (পুরাতন সংস্করণ) প্রতি পত্র	1	0
Brahmo Pocket Diary 1933 (cloth)	0	6
Do. do. (paper)	0	5

## নববিধান টাস্ক ।

Life & Teachings of Keshub Chunder Sen			
	by P. C. Mazumdar (New Ed.)	3 0	2 8
2 8	Life of Protap Chunder Mozumdar Vol. I & II		
1 0	(Bound together)	2 0	1 0
0 3	Life of Benoyendranath Sen (In English)	3 0	2 0
0 8	" (In Bengali)	2 0	1 0
0 4	উপদেশ ১ম খণ্ড ( ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কৃত )	1 0	১/০
3 0	উপদেশ ২য় খণ্ড ঐ	1 0	১/০
	উপদেশ ৩য় খণ্ড ঐ	1 0	১/০
1 0	Intellectual Ideal (By Prof. B. N. Sen	1 0	
0 6	Lectures & Essays Vol. I. (Literary)	do. 1 8	1 0
	Vol. II. (Theological)	do. 1 0	0 12
1 0	Vol. III. (Sermons)	do. 0 12	0 8
1 0	আরতি	do. 4 0	1 0
1 0	বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ ( ভাই মহিমচন্দ্র সেন	১/০	১/০
	ঈশ্বরীতাপ্রসূতি (সংস্কৃতের বঙ্গানুবাদ) ঐ ভাল বাধাই	১/০	১/০
1 0	ব্রহ্মব্রহ্মের প্রকাশ (কাপড়ে বাধাই) ঐ	4 0	1 0
1 0	নববিধানের নূতনবেদ জীবনবেদ (ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ)	১/০	১/০
1 0	বৌদ্ধধর্ম ও নববিধান— ঐ	1 0	1 0
4 0	Fragments, Part I and II, each	Do. 0 1	
4 0	Do. Part III	Do. 0 4	
1 0	Do. Part V	Do. 0 4	
1 0	The Apostles and Missionaries of Navavidhan		
	Prof. N. Niyogi Cloth bound	5 0	4 0
	Do. Paper bound	3 12	3 0
4 0	ভক্ত-কেশব—( অধ্যাপক কেশব নিয়োগী	১/০	১/০
1 0	কেশব-সমাগম—ঈশ্বরীলাল দাস	১/০	1 0
4 0	Keshub as seen by his Opponents—		
	G. C. Banerjee	1 0	0 8
4 0	Keshub Chunder & Ramkrishna		
	G. C. Banerjee	0 8	1 8
4 0	The Way to Prakriti Land—Sujata Das	6/-	4/-
4 0	Why New Dispensation—	Do 1/-	
1 0	পরলোকের সন্ধান— ঐ	1 0	১/০
1 0	Jeevan Veda, Hindi translation	0 8	0 6
1 0	The New Veda (Translation of Jeevan		
	Veda) by J. K. Koar	0 8	0 6
1 0	The Evolution of Navavidhan—		
	By Miss N. Ghosh	1 0	0 12
1 0	Sloka Sangraha—(Translated in Hindi—		
	By Late Hari Sundar Bose	0 8	0 6
1 0	In the Sanctuary of Silence, (Nandalal Sen)	8/-	6/-
	Faith and Culture of the New Dispensation—		
	Part I	2/-	
1 0	১. মানুসার চিহ্ন ১ম ভাগ	১/০	১/০
1 0	২. ঐ ২য় ভাগ	১/০	১/০
	Navavidhan Diary on 1933 (cloth)	0 5	
	Do. (Paper)	0 3	

ଶ୍ରୀ ଅକ୍ୟକ୍ୟୁମାର ଲଥ

**कार्यालय ।**

স্ববিধান প্রেমে—৩নং রমানাথ মজুমদার ইন্ট, কলিকাতা।

ত্রাধিকশততম মাঘোৎসব উপলক্ষে ১লা বাব, ১৯০৩, (১৪ই আশ্বিনী, ১৯০৩) হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০শে মাঘী

(১৪ই ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত, নিম্নলিখিত পুস্তক সকল স্বল্পমূল্যে, ৮৯নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীটে ভারতবর্ষীয়

গ্রন্থালয়ে এবং ৩নং রমানাথ মজুমদারের স্ট্রীট প্রচারকার্যালয়ে পাওয়া যাইবে।

অর্ডার পাইলে মকঃস্বলে ভিঃ পিঃ যোগে বই পাঠান হইবে।

## পুস্তকের তালিকা।

		( স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত )	
ত্রাসসঙ্কীত (নৃতন দ্বাদশ সংস্করণ, পরিবর্তিত)	২১৭	ঐক্যচৈতন্য এবং তাহার বতাবনিষ্ট বোণ	১০
ত্রাসসঙ্কীত, ১ম ভাগ (একাদশ সংস্করণ)	২১০	( প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ) প্রতি অংশ	১০
ত্রাসসঙ্কীত, ২য় ভাগ (১২৮টা সঙ্কীত)	১০	ঐক্যের জীবন ও ধর্ম	১০
অমুঠান-সঙ্কীত ১ম ( ভাই কালীনাথ ঘোষ )	১১০	বেদান্তসময় ( বাদালা )	১০
ঐ ২য়	১০	গীতাসময়জ্যোতিষ্য ( সংস্কৃত )	১০
নামসংহা	১০	বেদান্তসময়: ঐ ( কাপড়ে বাঁধাই )	১০
আত্মদান	১০	গীতাপ্রপুষ্টি: ঐ	১০
বিবিধ স্বর্গসঙ্কীত ৬-সর্গীয় ভাই প্রমথ কুমার সেন	১০	নবসংহিতা ঐ	১০
নগরকীর্তন ( নৃতন প্রকাশিত )	১০	ভাষাসঙ্গমী ( ১ম খণ্ড ) ঐ	১০
হিন্দু শতগান ( শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ )	১০	কেশবচন্দ্র ১ম ভাগ—উপাধ্যায়ের বক্তৃতা	১০
উপদেশাবলী ( প্রেরিতগণের উপদেশ )	১০	কেশবচন্দ্র ২য় ভাগ— ঐ	১০
ধর্মবিজ্ঞানবীজ, চারি খণ্ড ( কালীশঙ্কর দাস )	১০	উপাসনাগ্রন্থালীর ব্যাখ্যা	১০
যোগ ( রায় সাহেব বিপিনমোহন মেহানবিশ )	১০	শ্রোতাচারের পুনরাবৃত্তি	১০
অখণ্ড জীবন ( স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার )	১০	ত্রিবিধ জন্ম	১০
কার্লাইল ও বর্তমান যুগধর্ম (By N. C. Mitter.)	১০	কেশবচন্দ্রের আকৃষ্টাবস্থা	১০
নিবেদন ঐ	১০	বৈদান্তিক পরলোকতত্ত্ব	১০
দীনচরিত ( ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক )	১০	আগাম্য ও তথ্যাত্মকগণ	১০
নববিধান অপরিহার্য	১০	গায়ত্রীমূলক ষট্চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন	১০
ত্রাসসঙ্কীত ( তৃতীয় সংস্করণ )	১০	[ স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত ]	১০
প্রেরিত কালীশঙ্কর দাস ( জীবনচরিত )	১০	রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন ও উক্তি	১০
উপাসনার বাস্তবিকত্ব ( ভাই চন্দ্রশঙ্কর রায় )	১০	মহানিগি	১০
ঐক্য ও আত্মগণনা ( স্বর্গীয় অক্ষিতার সেন )	১০	চারিটা সাধনী মুসলমান নারী ( নৃতন সংস্করণ )	১০
শাক্যমুনিচরিত ( বাধু অবতারনাথ কৃত )	১০	ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য	১০
গোপালী রঘুনাথ দাস ঐ	১০	মহাপুরুষ মোহাম্মদ ও তৎপ্রবর্তিত এললামধর্ম	১০
ঐক্য ও প্রসাদ ঐ	১০	হিন্দুদের বঙ্গভূবাদ (পূর্বা ও উত্তর বিভাগ) প্রতি খণ্ড	১০
দেবদেবীর নবজীবনলাভ	১০	তত্ত্বসন্দর্ভমালা ( নৃতন সংস্করণ )	১০
নানকপ্রকাশ ( ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ) প্রতিখণ্ড ১০	১০	এমাম হসন ও হোগারনের জীবনী (নৃতন সংস্করণ)	১০
নবদেবের স্থান ( ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী )	১০	চারিজন ধর্মনেতা ( নৃতন সংস্করণ )	১০
মহাপরিনির্বাণসূত্র ঐ	১০	হাফেজের বঙ্গভূবাদ ( প্রথম ভাগ ) ভাল বাঁধান	১০
নিত্যভিক্ষা ঐ	১০	হিতোপাখ্যানমালা ১ম ভাগ ( গোল্ডস্টান )	১০
বুঝকদের প্রতি উপদেশ ঐ	১০	২য় ভাগ ( বোস্তান )	১০
জীবনবেদের পরিচয় ( অক্ষয়প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় )	১০	১ম ও ২য় (মেনোনিতাংশ) প্রতি খণ্ড	১০
শ্রী ঐক্যলীলাচার ( তসিন্দু ( জীপুষ্টি শশিভূষণ )	১০	নীতিমালা ( কিমিয়ায় সাদত হইতে সঙ্গলিত )	১০
তালুকদার প্রণীত ) ১ম ও ২য় ( প্রতি খণ্ড )	১০	ভাগমালা ( ৬ ভাগে সমাপ্ত )	১০
নবতত্ত্বাত্ম ( সংস্কৃত ) ( নৃতন পুস্তক ) ঐ	১০	শ্রবণমালা মন্তেকোত্তর ও মণ্ডলানা রোম	১০
সতী জগন্মোহিনী দেবী ( ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক )	১০	মহাপুরুষ চরিত প্রথমভাগ নৃতন সংস্করণ	১০
ঐ ( কাপড়ে বাঁধাই )	১০	দরবেশ	১০
অখণ্ড, ১ম ও ২য় ( অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত ) প্রতিখণ্ড ১০	১০	তত্ত্বকুহল	১০
ক্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ও শঙ্কর দর্শন, ১ম ঐ	১০	আত্মজীবন	১০
ঐ ২য় ঐ	১০	Keshub Chunder Sen—Correct state-	
ইসলাম ঐ	১০	ment of some disputed facts in his life o	8 o 6
কোরানেক্সুরা ও বেদের যুক্তসংগ্রহ ঐ	১০	ভাই ব্রেলোকানাথ সার্যাল প্রণীত :—	
সার্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম বা নববিধান ঐ	১০	ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা	১০
Behold the Man ঐ	১০	ব্রহ্মসীতা সম্পূর্ণ	১০
Rigveda Unveiled Do.	5 o	ঐশ্বর্যচরিত ১ম ও ২য় ভাগ প্রতি খণ্ড	১০
Vedantism Do.	1 o	কেশবচরিত নৃতন সংস্করণ ভাল বাঁধাই	১০
Order of Service	0 1		
G. P. Mazumder's works :—		Rev. P. M. Choudhury's works :—	
Life of Bhai Balodeb Narayan	0 4	১ম ও ২য় ভাগ	১০
The Echoes from Within	0 8	নৃতন পুস্তক	১০
A Glimpse of the life of K. C. Sen	0 8	অনুভূতি কুহল	১০
Keshub Chunder Sen	1 o	প্রতিমা ( নৃতন সংস্করণ )	১০
[ স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত । ]			
ধর্মতত্ত্ব ( বিবেক ও বুদ্ধির কথোপকথন ) ১ম	১০		



জ্বলিশালময়ং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমণ্ডিতম্ ।  
 চেতঃ সূক্ষ্মলব্ধীর্ণং সত্যং শাস্ত্রমনুগমম্ ॥  
 বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।  
 স্বর্ণানশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈবেব প্রকীৰ্ত্ততে ॥

৬৮ ভাগ ।  
৬৯ সংখ্যা ।

১৬ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ।

28th February, 1933.

অগ্রিম বাবিক মূল্য ৩৮

মা, নববিধানাচার্য্য বলিলেন, “কেউ নিলেও আছি, না নিলেও আছি, ছাপ মাঝা দলিল আছে আমাদের হাতে।” এই কথার প্রমাণ দিতেই ত, মা, তুমি আমাদিগকে তোমার নিয়োজিত ভূতাদলভুক্ত করিয়াছ। আমরা ত জানিনা যে, তুমি আমাদের কপালে এই নিয়োগ-পত্র দিয়া আমাদিগকে মাতৃগর্ভেই জন্ম দিয়াছিলে; কেমন করিয়া, কোন ঘটনার ভিতর দিয়া, কোথা হইতে কাহাকে ধরিয়া আনিয়া, এই এক বিশাল বিশ্বজনীন বিধানের ভিতর আমাদিগকে আনিয়া ফেলিলে, আমরা কিছুই জানিনা। তোমার কাণ্ড কারখানাই এক অদ্ভুত। তুমিই না সেই, যে তুমি তোমার প্রিয় পুত্রের সঙ্গে জেলে মালাদের জুটাইয়া দিয়া, তোমার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিতে এক বিধান পাঠাইয়া ছিলে; আর কতই অলৌকিক লীলা দেখাইয়া লোকগুলোকে অবাচ্ করিয়া-ছিলে! এযুগেও, আমাদের পূর্ববর্ত্তী যাঁরা, তাঁহাদিগকেও তোমার বিশ্বমানব ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে মিলাইয়া, কেমনে তাঁহাদিগকে শক্তিসম্পন্ন করিয়া, তোমার নববিধানের অভিনয় করাইয়াছ। সেই তুমিই ত এই মুটে মজুর আমাদিগকে ধরিয়া এই কর্মে লাগাইয়াছ। আমরা যে

এত বড় বিধানের সেবার একেবারেই উপযুক্ত নই, তাহা কি তুমি জান না ? এরং পদে পদে কত আমরা অপ-  
রাধ করি, তাহাও তুমি দেখিতেছ। তথাপি যখন  
তুমি অকস্ম্মণ্য বলিয়া তাড়াইয়া দাও নাই, তখন যতদিন এ  
দেহে রাখিবে, যেন সেবায় বঞ্চিত না হই। পাপী অক্ষম  
অধম বলিয়া পরিত্যাগ করিও না। তোমার অলৌকিক  
অসম্ভবসম্ভবকারিণী কৃপাশ্রুতি আমাদিগের সকল ফ্রেট  
অপরাধ ক্ষমা কর এবং যাহাতে তোমার নিয়োজিত  
সেবকদের প্রমাণ দিয়া স্বধামে চলিয়া যাইতে পারি,  
এমন আশীর্ব্বাদ কর। তোমার নির্দিষ্ট সেবাই  
আমাদের শ্রীবন, সে সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়াই  
আমাদের মৃত্যু।

શાશ્વિઃ !      શાશ્વિઃ !      શાશ્વિઃ !

— ① —

নববিধানের মহামহোৎসব যে ধরায় অর্ণের অব-  
তারণা, ইহা উৎসবযাত্রী মাত্রেই স্বীকার করিবেন।  
হিন্দু ভাই বলেন, দুর্গোৎসবের সময় মা দুর্গা কৈলাস  
হইতে সসস্তানে তিনদিনের জগ্নু শুভাগমন করেন ;  
আবার সন্ধিক্ষণে মাহেন্দ্রক্ষেণে এক নিমেষের জগ্নু মার



শুভদৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এ সকল কথার ভিতর কল্পনা বা ভাবুকতা কিম্বা ভক্তির উচ্ছ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু নববিধানবিশ্বাসী মাত্রেই নিশ্চয় উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন যে, উৎসবোপলক্ষে জীবন্ত ব্রহ্মের সমাগম হয়। তিনি মাতৃরূপে প্রকট হইয়া, স্বর্গস্থ অমরাত্মা সাধু সন্তান সন্ততিগণকে সঙ্গে লইয়া, পৃথিবীর দীনাত্মাদের প্রতি রূপাদৃষ্টি বিধান করেন এবং তাহাদিগের সকলকেই স্বর্গীয় ভাব ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও আনন্দিত করেন। অন্ততঃ উৎসবের এই কয়দিনও যে অপার্থিব ভাবে মন প্রাণ বিগলিত, উৎসাহিত ও আনন্দিত হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

“অন্ধ চক্ষু পায়, বোবায় গীত গায়, পঙ্গুতে গিরি লজ্বায়,” এই যে সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে, ইহা যে অন্ধরে অন্ধরে সত্য, তাহা আমরা অন্ততঃ এই কয় দিন যে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, ইহা মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দান করিবই করিব। কেন যে ইহা হয়, কেমন করিয়া ইহা হয়, তাহা হয়ত বুদ্ধি বিচার করিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। কিম্বা তর্ক যুক্তি দ্বারা, যাঁহারা সন্দ্বিগ্নচিন্তিত বা সংশয়বাদী, তাঁহাদেরকে বুঝাইয়া দিতে পারিব না। কিন্তু এই উৎসবে যে একটা অলৌকিক স্বর্গীয় ভাবের অবতারণা হয়, কি জানি, কোথা হইতে একটা স্বর্গীয় হাওয়া বহিয়া যায়, ইহা বিশ্বাসী মাত্রেই যে সম্ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা নিঃসংকোচে সকলেই বলিবেন।

এই উৎসব-সময়ে যে একেবারেই কিছু বাহ্য-দৃশ্য নাই, বাহিরের আমোদ আশ্বাদের ব্যাপার নাই, কিম্বা মানসীয় মোক্ষিক ভাব কাহারও নাই, ইহা আমরা বলিতেছি না; কিন্তু যাঁহারা ভক্তি প্রাণোদিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন, তাঁহারা বিধাতার অনির্বচনীয় রূপায়, বাহ্যব্যাপারের অভ্যন্তরেও স্বর্গীয় অধ্যাত্ম ব্যাপারই উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এবং তাঁহারা সত্যই যেন ইহলোকেই পরলোক সম্ভোগ করেন।

“চল ভাই বাই সবে, মহা মহোৎসবে, অমরধামে যোগবলে” এই গান উৎসবযাত্রীদিগকে মা অন্ধরে অন্ধরে সম্ভোগ করিতে দেন। অর্থাৎ এ সময় স্বর্গের কি এক মহাযোগবল আসিয়া, আমাদেরকে অমরধামে লইয়া গিয়া, অমরাত্মাদিগের সহিত উৎসবানন্দদানে উন্মত্ত করে। কিন্তু হায়, হিন্দু ভাই যেমন তিন দিন দুর্গোৎসব সম্ভোগ

করিয়া, তিন দিন পরে ইন্দ্ৰদেবীকে বিসর্জন দিয়া, পূজার দালান যেই অন্ধকার, সেই অন্ধকার রাখিয়া, সংসারের দুঃখ ধাক্কায় মজিয়া সম্বৎসর কাটান, নববিধানের জীবন্ত মার উৎসবকারীদেরও কি দুর্গতি, দুর্দশা তেমনই হইবে? আমাদেরও উৎসবের এই উৎসাহ উদ্যান অধ্যাত্ম সম্ভোগ কি এক মাসের পর ফুরাইয়া গিয়া, আমাদের যে পূর্বের অবস্থা, সেই অবস্থায় আমাদেরকে ফেলিয়া যাইবে?

মূর্ত্তি-উপাসকের উৎসব তিন দিনে ফুরাইতে পারে, ফুরাইয়া যাওয়া সম্ভব; কিন্তু অনন্ত জীবন্ত ঈশ্বরের উৎসব-কারীদেরও উৎসবের নেশা ভাঙ্গিয়া গিয়া যদি সে ছরবস্থা হয়, তাহা হইলে আমাদেরও উৎসব যে কেবল বাহ্য-দৃশ্য, যথার্থ অধ্যাত্ম উৎসব নয়, ইহা কি প্রশ্ন হইবে না?

আমাদের জীবনের যে একেবারে উত্থান পতন হইবে না, তাহা বলিতেছি না; কিন্তু প্রত্যেক উৎসব যদি আমাদের জীবনকে খানিকটা স্বর্গের দিকে অগ্রসর করিয়া না দেয়, যে উচ্চ অধ্যাত্ম যোগ ভক্তির সম্ভোগ উৎসবে আমরা সম্ভোগ করিলাম, লাভ করিলাম, তাহার কতকটা ছাপ যদি আমাদের অন্তরে স্থায়ীভাবে বসিয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে আমাদের উৎসব করা বাহিরে বাড়ি হইয়াছে, মার অন্তঃপুরে আমাদের প্রবেশ হয় নাই, কিম্বা মা উৎসব লইয়া আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই, ইহাই বলিতে হইবে।

নদীতে যখন বান ডাকিয়া ডাঙ্গা ডহর ভাসিয়া যায়, বানের জল ভাটিয়া গেলেও জমিতে পলি বা স্তর পড়িয়া থাকে; তেমনি উৎসবের বানের জলে আমাদের হৃদয়ে যদি কিছু যোগ ভক্তি, কর্ম জ্ঞান, নীতি চরিত্র এবং শুদ্ধতা শান্তির স্তর না পড়ে, তবে আমাদের উৎসব প্রকৃত উৎসব হয় নাই।

ফল দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়; জীবনের উন্নতি, চরিত্রের সংকল্প, ব্রহ্মদর্শনপ্রবণের প্রগাঢ়তা, ভ্রাতৃপ্রেমের বৃদ্ধি, দুর্নীতি পাপ সাংসারিকতার প্রতি একটা বিতৃষ্ণা দ্বারা উৎসবের ফল সপ্রমাণ হইবে। তাই আচার্যদেব বলিলেন, “এবার উৎসবে কেবল ব্রহ্মসমাগম নয়, ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা।” অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল এলেন, আবার চলিয়া গেলেন, তাহাতে হইবে না; তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিলেন, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। তিনি হাড়ে হাড়ে বসিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার উৎসবও জীব

বসিয়া গিয়াছে। আমার কোন নীচ কামনা বাসনা তাঁহাকে, তাঁহার উৎসবকে আর তাড়াইতে পারিবে না। কিছুতে আর মনের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারিবে না। পাপ করা, মিথ্যা কথা বলা, কুদৃষ্টি, কুকামনা যেমন এখন আমাদের স্বভাব হইয়া গিয়াছে, তেমনি ব্রহ্মবলে, উৎসবের ঝড়ের প্রভাবে এমনই হইবে যে, ব্রহ্মদর্শন-প্রবণই আমাদের স্বভাব হইবে, ব্রহ্মের ভিতর দিয়াই তখন পরস্পরকে দেখাশুনা, কাজ কর্ম করা হইবে। ইহাই নব-বিধানের উৎসবের ফল। ব্রহ্মরূপায় ইহা যেন কিয়ৎ পরিমাণেও এবার হয়, মা এমন আশীর্বাদ করুন।

## ধর্মতত্ত্ব।

দশজনে একজন।

নববিধানের মানুষের এক মাথা, শত শত চক্ষু, শত শত কর্ণ। শত শত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট একদেহ বিশ্ব-মানব যিনি, তিনিই নববিধানের মানুষ। এ মানুষ একজন মানুষ, যার পশ্চাতে “অদৃশ্য আমরা”, বাহিরে দৃশ্যমান একব্যক্তি। তাই সবার এক রা, এক মত, এক ইচ্ছা, এক কৃতি, এক দর্শন, এক শ্রবণ। এই এক মা, এক সন্তান, এক বিধান; স্বর্গেও এই নবাবিধানম্, মর্ত্তেও একমেবারিতীয়ম্। ইহাই প্রতিষ্ঠা করিতে নববিধানের অবতারণা। একত্বই ইহার বিধি, একত্বই ইহার নীতি, একত্বই ইহার প্রতিষ্ঠান। বহুত্ব, বহুজনমত, স্ব স্ব প্রাধান্ত, স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, ভিন্নতা নববিধানের বিরুদ্ধ। বহুদেহধারী এক মাথা, একাত্মতা, এক নেতা নববিধানে; দশমাথা যেখানে, রাবণের রাজ্য সেখানে। সে রাবণ বধ করিতেই নববিধানের এক প্রাণারাম অবতীর্ণ। দেশের মত এখানে নাই, দেশে মিলে এক হইতেই হইবে। অত্যাধা নববিধান হইবে না।

### বিচার।

আমরা যখনই কাহাকেও বিচার করি, তখনই তাহাকে অমায়ুষ ভাবিয়াই বিচার করি, মানুষের চেয়েও তাহাতে শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করিয়া দেখিয়া থাকি; কাজেই সে ব্যক্তি যত্ন নয়, তাহাই তাহাকে মনে করিয়া, তাহার কতই দোষ দুর্বলতা ত্রুটি দেখিতে পাই, এবং কেন সে সমুদয় দোষ তাহাতে রহিয়াছে, এই বলিয়া তাহাকে দণ্ডিত করিতে বহুপরিকর হই। তাই বিচার করা নিশ্চয়ই ভ্রান্তি-মূলক। মানুষকে মানুষ বলিয়া মনে থাকিলে, আর বিচার কথা যায় না। মানুষ মাত্রেই যে দোষপ্রসূত, দুর্বল, পাপসঙ্কুল, ইহা নিজকে দেখিলেই আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি; এবং আপনার শত দুর্বলতাও যেমন উপেক্ষা করি, বিচার করি না, তেমনি অপর মানুষকেও মানুষ মনে করিলে, আর কি

কাহাকেও বিচার করিতে পারি? শত দোষ ত্রুটি দুর্বলতা ক্ষমা করিয়া আপনি যেমন আপনারকে ভালবাসি, তেমনি অন্যের সম্বন্ধে করাই আমাদের সমুচিত। এই জন্তই বৈশা বলিলেন, “অপরকে আশ্রয় গ্রহীত করিবে।” নববিধানের আচার্য্য আরও বলিলেন, “আপনার চেয়েও তাহাকে অধিক ভালবাসিবে।” বাস্তবিক বিচার যদি করিতে হয়, বরং নিজকে বিচার করিব; অপরকে ভালবাসিব, তক্তি শ্রদ্ধা করিব, সেবা করিব, তার আনুগত্য স্বীকার করিব।

### ভ্রাতৃত্ব-সাধন।

ধর্মের সারতত্ত্ব সাধু বলিলেন, এক ঈশ্বর পিতামাতা, আর নরনারী সকলে ভ্রাতৃত্বময়ী। ঈশ্বর যে পিতামাতা, ইহা পূর্ব পূর্ব সকল বিধানই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঈশ্বর যে আছেন, এবং তিনি যে সবার পিতামাতা, সকল ব্যক্তিই স্বীকার করেন, কোন ধর্মাবলম্বীই ইহার সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত নাই। কিন্তু শাস্ত্রে, নীতিবিধিতে এবং মতে নরনারী যে ভাইভগ্নী ইহা স্বীকৃত হইলেও, কার্যতঃ ইহা এখনও কোন ধর্মই প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। তাহা হইলে পৃথিবীতে এত বিবাদ বিসম্বাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ, অশান্তি অকল্যাণ, পাপ বাতিচার, দুঃখাচার, অনাচার অত্যাচার থাকিত না; প্রেম, সন্তোষ ও শান্তিতে জগৎ পূর্ণ হইত। তাই বিধাতা সেই ভ্রাতৃত্বের মিলনস্থানের জন্তই বিশেষ ভাবে বর্তমান যুগধর্ম-বিধান নববিধান লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ বিধানে কেবল ঈশ্বরের পূজায় সম্যক সাধন হইবে না। নরনারীকে যদি না ঈশ্বরগণ্ড বলিয়া পূজা করিতে, সেবা করিতে পারি, তবে সম্যক জগতে ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হইবে না। পূর্ব পূর্ব বিধানে সাধু ভক্তদিগকে ঈশ্বরগণ্ড, ঈশ্বরবতীর বলিয়া পূজা করা হইয়াছে; সে ভাবে পূজাও ঈশ্বরপূজা। সকল নরনারীই ঈশ্বরপুত্র, ঈশ্বরকন্যা, অতএব ভাই ভগ্নী, আপন মানুষ এই বোধ থাকিবে; ঈশ্বর বা ঈশ্বর-সন্তানের প্রতি যে শ্রদ্ধা তক্তি পূজা সেবা, তাহাও অবিচারে দিতে হইবে। এই জন্তই বর্তমান যুগধর্ম প্রবর্তক আমাদের জগজ্জন ভাই বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিলেন এবং সকল নরনারীকে আপন দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে ভালবাসিলেন, সেবা করিলেন এবং সকলকে ব্রহ্মগণ্ড বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, “ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব জীবের মুখে দেখিতে হইবে। জীব-উৎপাদনে, জীব-অপমানে কলঙ্কিত হইলাম। পরাংপর পরব্রহ্ম জীবশরীরে আছেন, এ ভেবে জীবের সেবা করি নাই, দয়ার পাত্র ভাবিয়া সেবা করিয়াছি। হে জীব, ক্ষমা কর, হে ব্রহ্মের ক্ষুদ্র গণ্ড, দেবতার অংশ, তুমি ক্ষমা কর। তোমার যে টুকু নীচ, সে টুকু আমার দেখিবার নয়। যে টুকু ভাল, সেই টুকু আমার দেখিবার। হে রূপাম্বর, জীবকে অপমান করিলে যে তোমার অপমান হয়, এইটি বিখ্যাত করিয়া, জীবকে যেন খুব ভালবাসি।”

বাস্তবিক বাহ্য দৃষ্টি ক্রীণ হইলে, অদূরস্থ ব্যক্তিও কে কি, তাহা আমরা দেখিতে পাই না ; কেবল দেখি, একজন মানুষমাত্র। তেমনই কে কিরকম মানুষ না দেখিয়া, না বিচার করিয়া, যদি কেবল মানুষরূপে, ব্রহ্মসত্তানরূপে দর্শন করি এবং শ্রদ্ধা করি, তাহা হইলেই আমরা মানুষ, যে ব্রহ্মের প্রতিমা, উপলব্ধি করিয়া যত্ন চাই।

## শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারানী সুনীতি দেবী ।

( পূর্বসমুদ্র )

মহারাজা শ্রীমৎপুত্রনারায়ণ যখন খুব অল্পস্থ হইয়া পড়েন, তখন সমুদ্রতীরে বেক্সিন সহরে একটি বাড়ীভাড়া করিয়া অবস্থান করেন। মহারানী সুনীতি দেবী প্রাণপণে তাঁর সেবায় নিরত হন ; তখনও তিনি জানেন নাই, অচিরে তাঁর ভাগ্যলক্ষী পলায়ন করিবেন। একদিন মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সুনীতি, এখন তোমার কাজের লক্ষ্য কি ?” সুনীতি বলিলেন, “তোমার লক্ষ্য বা, তাই আমার, আমার আর আলাদা কি ?” মহারাজা তখন বলিলেন, “আমার যা করবার, তা ত সিদ্ধান্ত হইছেই গেছে ; এখন তোমার কি, বল ” তখনও দেবী বুকিতে পারেন নাই, বলিলেন, “কেন, তুমি একটু ভাল হলেই, তোমাকে নিয়ে দেশে যাব ।” তখন মহারাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সহধর্মিণীর দিকে প্রেমময়নে এবং সন্তান সমৃদ্ধি ও অনাতাগণের দিকে কতই স্নেহময়নে তাকাইলেন। আচার্য্যদেবের আলোচ্য দেখিয়া একবার মহারানীকে বলিয়াছিলেন, “তুমি কার মেয়ে, মনে রেখো ।” শেষ নিশ্বাসত্যাগের সময়ও চিরসঙ্গিনীর হাত জোরে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “হারি ! চুপবিনী !” এই বলিয়া আচার্য্যদেবের মূর্তি দেখিতে দেখিতে, “পরিণামে শান্ত” বলিয়া প্রার্থনা করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। মুখে কি মুহূর্ত্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল !

সম্রাজ্ঞী আলােকজাদা ও সম্রাট সম্রাজ্ঞী তখনই সংবাদ পাইয়া, মহারানীকে সহস্রভূক্তিক তার পাঠাইলেন এবং মহারাজের বাহ্যতে সৈনিকসম্মানে অস্ত্রোপক্ৰিয়া হয়, তাহার অমুজা পাঠাইলেন। ভাই প্রমথলালও তখন সেখানে ছিলেন, তিনিই অস্ত্রোপক্ৰিয়ার উপাসনা করেন ও মহারাজ রাজরাজেশ্বর নব-সংহিতার প্রার্থনাযোগে অগ্নিদান করেন। কোচবিহারে এই নিদারুণ শোক পৌছিয়া মাত্র, সেদানকার প্রথা অনুসারে অস্ত্রোপক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়। আশ্চর্য্য, নাকি মহারাজার প্রিয় হাতীটি সে শোভাযাত্রায় ছনয়নে বারিধারা বর্ষণ করিতে করিতে বাইতেছে দেখা গিয়াছিল !

মহারানী সম্মুখানে স্বভাজে ফিরিয়া আসিলে, কোচবিহারে নবসংহিতা অনুসারে প্রাক্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভাতৃগণ সঙ্গে শ্রীমৎপুত্রনারায়ণ প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন। দাক্ষণ বৈধব্য-যত্না অমুভব করিয়া মহারানী সুনীতি বলেন,

“আগে স্বামী সঙ্গে যাঁহারা সহমরণ করিতেন, সে অধিকৃষ্টে বাঁপ দেওয়ার যত্নও অপেক্ষা এ যত্না সহস্রগুণ অধিক”। বাস্তবিক তখন রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের লইয়াও তিনি যেন পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিয়াছিলেন।

শ্রীমৎপুত্রনারায়ণের পরলোকগমনে শ্রীমৎপুত্রনারায়ণই রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। রাজপুত্রোচিতগণ তাঁহাকে দেশাচার অনুসারে অভিব্যেকময় পড়াইতে চাহিলে, রাজরাজেশ্বর তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, “পুরোহিতের পর আর কে অভিব্যেক দিতে পারেন ?” তাঁহারা উত্তর করিলেন “আপনার রাজমাতা”। “তবে আমি মার নিকট অভিব্যেক লইব”, এই বলিয়া মাতৃদেবীর নিকটই অভিব্যেক গ্রহণ করেন এবং নববিধানমতে এই অভিব্যেক-অমুষ্ঠান ব্রহ্মোপাসনা-যোগে সম্পন্ন হয়। দরবারে সিংহাসনে বাসবানাত যখনই তাঁহাকে পান আতর ও পুষ্পাৰ্ঘ্য দেওয়া হইল, তখনই তাহা মাতৃদেবীকে দিবার জন্ত পাঠাইয়া দেন। বাস্তবিক তিনি বড়ই মাতৃভক্তিপরায়ণ সন্তান ছিলেন। সুনীতি দেবী পূর্বে যেমন ভাবে থাকিতেন ও যেমন পেনসন পাইতেন, রাজা তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু হায় ! তিনি ত আর অধিকাংশ দেহে রহিলেন না ; দুই বৎসর পরই “আমার ডাক আসিয়াছে, আমার যে জন্তে আসা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে” বলিয়া রাজরাজেশ্বরনারায়ণ দেহত্যাগ করেন।

শ্রীমৎপুত্রনারায়ণ ঐশ্বৰ্য্যের অধিক দেহে থাকিলেন না, ইহা পূর্বেই জানিতে পারিয়া, বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই ; কিন্তু দেহত্যাগের অবাবহিত পূর্বেই, বরদারাজকুমারী শ্রীমতী চন্দ্রিকা দেবীর সন্তান মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমৎজিতেন্দ্রনারায়ণের নববিধানপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়া এবং তাঁহাকেই রাজপদে মনোনীত করিয়া পরলোক বাত্মা করেন।

শ্রীমৎশোকের উপর এই আঘাতের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু-শোক যথার্থই মহারানী সুনীতি দেবীর অন্তরকে একেবারে বজ্রসংচূর্ণ করিয়া দিল। রাজাকেও শেষ চিকিৎসার জন্ত সুনীতি দেবী বিলাতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং সেই পিতৃশ্মশানেই তাঁহারও দেহ ভস্মীভূত হয়। কোচবিহারে তাঁহার নবসংহিতা অনুসারে প্রাক্ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণই প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন।

এই প্রথম পুরুষশোকই মহারানী সুনীতির জীবনে মহা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনয়ন করিল। এতদিন প্রায় দেশাচার অনুসারে অনেকটা অবরুদ্ধ ভাবে কাটাইতেন ; এখন হইতে প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্মের সেবা, মণ্ডলীর সেবা ও নববিধানের সেবার জীবন শেষ করিতে প্রণোদিত হন। ইহার পর চতুর্থ পুত্র হিতেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু, দ্বিতীয় কন্যা প্রতিভার মৃত্যু, তাঁহার যাহা কিছু সংসারের বন্ধন ছিল, সকলই যেন কাড়িয়া লইল। তিনি এখন হইতে যেন শীঘ্র শীঘ্র পরলোকযাত্রার জন্তই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ

করিলেন। তিনি বলেন, “এখন হইতে যেন অজ্ঞান দেশ অতি নিকট বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। এখন আমরা যাহা কিছু করিবার আছে, তাহা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিতে পারি, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলাম।”

দীন লেখক—শ্রীযুনাথ মল্লিক।

## ১২ই মাঘের অভিনন্দন।

( নববিধান-ঘোষণা )

( ১ )

বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন, পৃথিবী প্রাদক্ষিণপথে সময়ে সময়ে সূর্যের নিকটতর হয়। তত্ত্ব প্রমাণ করিলেন, যুগসময়ে অন্তররাজ্য স্বর্গরাজ্যের নিকটবর্তী হয়। নবযুগে নবভক্তের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইল; সেই সংস্পর্শে সামান্য চর্চল মানবজীবনেও তাহা অল্প পরিমাণে প্রমাণিত হইল। বিজ্ঞান এক নূতন আশ্চর্য্য জ্যোতিষ্ময় পদার্থ অবিকার করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিলেন। যুগধর্মের আবির্ভাবে জগতে যে নূতন আলোক আবিষ্কৃত হইল, তাহাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী স্তম্ভিত, আশাবিষ্ট ও ধস্ত হইল। সূর্যের নিকটবর্তী হওয়াতে ধরণী নানারূপে পরিবর্তিত হইল। অন্তররাজ্যে মানবমণ্ডলী যুগধর্মের প্রভাবে এক নূতন জ্যোতিতে জ্যোতিমান হইল। স্বর্গ হইতে নূতন নূতন আশা, নূতন জ্ঞান, নূতন প্রেম লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইলেন।

মানবহৃদয়ে অদ্বুত পরিবর্তন সংঘটিত হইল। নূতন ধর্মের প্রকাশে নিরাশের আশা, শক্তিহীনতার বল, পাপীর নবজীবন লাভ হইল। যুগধর্মপ্রবর্তক ব্রহ্মানন্দ ধর্মরাজ্যে নূতন বার্তা ঘোষণা করিলেন। নববিধানের আগমনে এক নবচেতনা মানবশ্রাণকে অনুপ্রাণিত করিল। নববিধানবিশ্বাসী তাই বোন, আমরা আজ নিজ নিজ জীবনে যাহা দেখিয়াছি ও লাভ করিয়াছি, তাহা বিশেষভাবে স্মরণ করি। আজ বিধাতার নিকট ঋণ স্বীকার ও শাক্যদান করিবার দিন। জীবনের দিন যতই সংক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইয়া এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছি। ইহজীবনের কার্যকলাপ ও নিত্যক্রিয়ার মধ্যে এক অদ্বুত জীবনের সায় লাভ করিতেছি। মৃত্যুর আবরণ ভেদ করিয়া এক নূতন জ্যোতিষ্ময় লোক প্রকাশিত। মর্ত্যলোকের সীমাবদ্ধ জীবনের অন্তরালে এক মহাজীবনের আচ্ছাদনে স্তম্ভিত হইতেছি।

কুটীরবাসী প্রকাণ্ড রাজশাসন-দর্শনে যেমন আনন্দিত হয়, বর্তমান জীবনের অবসানে ভাবী রাজ্যের অতুলানন্দ-সন্দর্শনে প্রাণ পুলকিত। ইহজীবন ও পরজীবনের মধ্যে যে এক অপূর্ণ সংযোগ, যাহা মানবশক্তির উপর অধিষ্ঠিত, নববিধানের আলোকে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত। পরলোক সূত্রে

অবস্থিত নহে। ভবিষ্যতে যাহা পূর্ণতা লাভ করিয়া বিশ্ববাসী রাজ্য বিস্তার করিবে, সেই নববিধানের গুণাশ্রমে স্থান লাভ করিয়া আমরা ধস্ত হইয়াছি। যে রত্ন রাজ্য সম্রাট ধনী জ্ঞানী লাভ করিয়া নিজেদের ধস্ত জ্ঞান করিবেন, আজ আমরা সেই রত্নের অধিকারী। যে নববিধানের আলোকে সকল সংশয় বিদূরিত হইবে, সকল ভেদজ্ঞান যুচিবে, সকল তর্কের সীমাংসা হইবে, সকল সম্প্রদায়ে সমতা ও প্রেম বিস্তারিত হইবে, সকল ধর্মের নোক একত্রে পরমজননীর গুণগান করিবে, সেই প্রাণের নববিধানকে আদরে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হই। বিধানজননীর কৃপাই একমাত্র সখল, সেই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাহারই চরণে শ্রবণত হই।

শ্রীমণিকা দেবী।

— ০ —

( ২ )

অনুভূতা-নিবন্ধন আশঙ্কা হইয়াছিল, আজ এ আনন্দোৎসবে যোগ দিতে পারিব না; কিন্তু আজিকার দিনের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে পারিলাম না। তাই কাতর দেহ ও ভগ্নকণ্ঠ লইয়া আপনাদের মাঝে উপস্থিত হইলাম, তত্ত্বকতার সঙ্গে আমারও নিবেদন জানাইবার জন্ত।

স্বর্গের বাতায়ন মাঝে মাঝে প্রশস্তরূপে উন্মুক্ত হয়, বৃষ্টি বা মর্ত্যের লোকদের সেই দিব্যধানের আভাস দিবার জন্ত। সেই আদিত্যবর্ণ মহান পুরুষের স্বর্গরাজ্য হইতে বিকীরণ হইয়া পুণ্যলোকচ্ছটায় নবযুগের ভারত প্রাণিত—তাহার গোরবে জগৎ বাসীকে উদ্বেগিত করিতে—১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীব্রহ্মানন্দ দেবের স্নগদ্বীপ বাণী উচ্চারিত হইল:—“Behold that heavenly light in the midst of India! How bright! How beautiful! How it ascends, extends, and expands from day to day! Do you see it? It is the light of a *New Dispensation* vouchsafed by Providence for India's salvation.” ভারতের মাঝে ঐ স্বর্গীয় আলোক অবলোকন কর! ইহা কি দীপ্তিময়, কি সুন্দর! ইহা কেমন উজ্জ্বল হইতেছে, কেমন ব্যাপ্ত ও দিন দিন প্রসারিত হইতেছে। তোমরা কি ইহা লক্ষ্য করিয়াছ? ভারতের পরিব্রাজকের জন্ত—ব্রহ্মকৃপায় স্বর্গরাজ্য হইতে এক নববিধান অবতীর্ণ হইয়াছে—এ তাহারই আলোক।

ভক্তমণ্ডলী নববিধানের এই সুস্পষ্ট পূর্ণাভাস পাইয়া আশাবিষ্ট হইলেন এবং ইহার পূর্ণ অভিব্যক্তি দর্শনেচ্ছায় ব্যাকুল ও তাহার ঘোষণা শ্রবণের জন্ত উৎকর্ষ হইয়া রহিলেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে, ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, ২৫শে জ্যৈষ্ঠয়ারী ( ১২ই মাঘ )—যে দিনের বার্ষিক উৎসব আজ অদ্বুত হইতেছে—গুডফ্রায়ে নবশিখর জন্ম হইল। স্বর্গের উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া ব্রহ্মকৃপায় জ্যোতি: মর্ত্যে

আসিল ও শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া তত্ত্বমণ্ডলীকে নিরুপম সৌন্দর্যের ছবি দেখাইল।

বুড়ির কণার রবির কিরণ পড়িয়া কেমন আকাশ জুড়িয়া রামধমু দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক বলিলেন, ঐ ইজ্জতমুকে ধরবেন ! এক ক্ষটিক কাচের ভিতর সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিল,—আর সেই কিরণ অপূর্ণশোভন সমুদ্রেরে পরিণত হইল ! বৈজ্ঞানিকের ক্ষটিক কাচের জার, পুণ্যসলিলবিধোত ব্রহ্মানন্দহৃদয়ের মধ্যে স্বর্গের জ্যোতিঃ প্রবেশ করিল—আর দেখ, তাহা ভুবনমোহন নববিধানের অপূর্ণ ছটায় জগতে প্রকটিত হইল। বিশ্বাসিদল মুগ্ধ হইলেন। সমস্তের ধর্ম—প্রেমের ধর্ম—জগতে প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীব্রহ্মানন্দদেব স্তম্ভুরকণ্ঠে বলিলেন—“The battle-cry is hushed, and the sword of sectarian hate has found rest in the sheath. No longer do we see scriptures arrayed against scriptures, churches against churches, sects against sects—endless groups of fighting zealots. It is one undivided spirit-world, in which there is neither caste nor sect nor nationality. This is heaven indeed.”—সমরহুকার নিবৃত্ত হইয়াছে, জাতিগত ঘৃণার অগ্নি এখন স্বকোষে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। শাস্ত্রে শাস্ত্রবিরোধে প্রতিকূলতা, বিভিন্ন ধর্মালয়ে বিরোধ, দলাদলির বৈষম্য ও অসংখ্য গোড়ামীর যুদ্ধ এখন ঘুচিয়াছে। এক অখণ্ড অধ্যাত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল, যেখানে বর্ণ, দল বা জাতির পার্থক্য নাই। এই শু স্বর্গরাজ্য।

নববিধানে সকল বৈষম্য মিটিল, সকল বিরোধ ঘুচিল। প্রেমের আগুনে গলিয়া সর্বসময়ের সম্ভব হইল। নববিধানের নামান্তর প্রেমের ধর্ম। নববিধানের প্রথম অক্ষর প্রেম—শেষ অক্ষর প্রেম—নববিধানের আদ্যোপান্ত প্রেমময়। নববিধানের মন্ত্র “প্রীতি পরমসাধনং”। নববিধানের অমুজ্ঞা—প্রেমব্রত-গ্রহণ। তাহা প্রেমপ্রাপ্ত নববিধান-প্রবর্তক প্রার্থনা করিলেন, “হে দয়াময় ! প্রেমরূপ, আদর্শ তুমি, গুরু তুমি, দৃষ্টান্ত তুমি, তোমার নাম প্রীতি, তোমার উপাধি প্রেম, স্বভাব তোমার দয়া, বস্ত্র তোমার করুণা। জগদাধর, তোমার সকল প্রকৃতির মধ্যে এই প্রেমটি স্তম্ভময়। তুমি নবধর্ম পাঠাইয়াছ, পৃথিবীতে প্রেমের মিলনের জন্ত। তুমি আচাৰ্য্য হইয়া সর্বত্র প্রেমের মন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত করিলে। যখন ১৮০০ বৎসর পূর্বে শিখ্য মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘প্রথম মন্ত্র কি’ ? তিনি বলিলেন, ‘প্রেম’। মনুদায় শাস্ত্রের আগে প্রেম। অতএব তোমার নিকট প্রার্থনা, আমাদের ভিতর প্রেম প্রচার কর। কলহ বিবাদ মিটাইয়া দাও। মা, দয়া করিয়া তোমার বিধানের ভরীকে বাঁচাও। আজ আমরা পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়া প্রেমের নিশান ধরিলাম।”

প্রায় অর্ধ শতাব্দী হইল, শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের বাণী নীরব

হইয়াছে—কিন্তু সে আকুল প্রার্থনার প্রতিধ্বনি যুগযুগান্তর ভেদ করিয়াও বিধানবিশ্বাসীর হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিবে।

আজ আবার স্বর্গের বাতায়ন উন্মুক্ত হইয়াছে—বিধান-বিশ্বাসী দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন—সে আনন্দলোকে শ্রীদরবার অধিষ্ঠিত—সেখানে আজ নববিধানের বৈজয়ন্তী উড়িতেছে। সে শ্রীদরবারে সকল যুগের সকল সাধু ত্রিলোকবিজয়ী প্রেম মলিয়াছেন। প্রেমময় রূপা করিয়া নববিধানে সেই প্রেমের স্বর্গরাজ্য আমাদের মাঝে আনয়ন করুন।

শ্রীমুখোদয় মহলানবিশ।

## নববিধান-সাধন

( ২৯শে জাম্বুয়ারী, সন্ধ্যা, ব্রহ্মমন্দিরে নিবেদিত )

আজ ‘নববিধান’ এমন মৃতপ্রায় কেন দেখা যাইতেছে? কারণ অবশেষ করিতে গেলে দেখা যায় যে, তাহার মূল অবিশ্বাস। সত্য বলিলে, আমরা ভাবি, তাহা অসত্য। তক্তের বাণীতে আমাদের আস্থা নাই। তক্ত সাধকেরা নিজ নিজ সাধনের ফল বাহা নিজ নিজ জীবনে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনার মধ্যে না রাখিয়া অস্ত্রের উপকারের জন্য প্রকাশ করেন। ইহা বিধাতারই বিধি। কিন্তু আমরা এমন হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাতে কর্ণপাত করি না। অধিকন্তু তাহাদের কথার বিশ্বাস করিতেও চাই না।

আমরা নববিধানের লোক, নববিধানসমাজভুক্ত নিজেদের বলি; কিন্তু নববিধান বস্তুটা কি, তাহা কি জানি? এবং তাহা সাধন করিতেও আমরা একান্ত উদাসীন। আমরা একপক্ষে অতি-শয় সৌভাগ্যশালী, কারণ আমরা যে সময়ে জাম্বুয়ারি, সে সময়ে সাধনলব্ধ অনেক বিষয় আমাদের সম্মুখে বহিয়াছে। বিনা আয়াসে তাহা, আমরা ইচ্ছা করিলে, আমাদের উপকারে লাগাইতে পারি। অতর্কিতক আশ্চর্য্যবশতঃ কিবা ইচ্ছার অভাবে আমাদের হৃদয় সীমা নাই। কত সাধু তক্তের বহুদিনের সাধনের ফল আমাদের সম্মুখে। কত দুতকে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অল্প কত প্রকারে তাহা আমাদের সম্মুখে ও চারিদিকে জাজ্বল্যমান; অথচ আমাদের সেদিকে দৃষ্টিপাত নাই। এত সুবিধা রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কি? ঐ সকল বিষয়ে আমাদের ঘোর অকুচি। যেন মুখের কাছে আনিলেই গা বমি বমি করে। মুখের কাছে আনতে দিই না। শুধু বুদ্ধিরূপ পিত্তে আমাদের মুখ ও উদর পরিপূর্ণ। যে সকল ঔষধে ঐ পিত্ত দমন হয়, তাহার উপর আমাদের ঘোর অবিশ্বাস। পীড়িতের যেমন ঔষধ-সেবনে বিরক্ত, আমরাও আধ্যাত্মিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া তাহার ঔষধ-সেবনে বিরক্ত। সাধনরূপ ঔষধি-সেবনে আমরা বড়ই নারাজ। তক্ত সাধকদিগের অতিজ্ঞতা আমাদের



নিকট অবিশ্বাস ও উপহাসের বস্তু। নিজ শুদ্ধ বুদ্ধি ও আত্মশুদ্ধি-তার উপরই আমাদের প্রগাঢ় আস্থা। নববিধান ইহার বিপরীত কথাই প্রচার (নির্দেশ) করেন। নববিধান বলেন— নিজ বুদ্ধি, মানুষের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিও না—শুভবুদ্ধির সাগর দিবা জ্ঞানের আধার হইতে কলস পূর্ণ কর। করিতে করিতে সকল অন্ধকার দূর হইবে। সকল ভ্রমের, সকল মায়ার, সকল চর্দনার অবসান হইবে।

আজ উৎসবের শেষ সীমার আমরা উপনীত। মহোৎসব শেষ করিয়া শান্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া গৃহে ফিরিব। কি লইয়া আমরা ফিরিব? ফিরিয়া গিয়া এক বৎসর ধরিয়া তাহার ফল ভোগ করিব, কিবা ঐ ফল হইতে বঞ্চিত থাকিব? আমাদের মন ও আত্মা যেরূপ রোগগ্রস্ত, তাহাতে ভয় হয় যে, উৎসবের দান আমাদের রুচিকর হইবে কি না? এখানে যে সকল স্বর্ণের সমাচার পাইলাম, তাহা কি আমাদের প্রাণে বিদ্ধ হইয়া থাকিবে, কিবা বিশ্বস্তির অতল তলে ডুবিয়া যাইবে? উৎসবের হাওয়ার আমাদের প্রাণ তাহা ধারণ করিয়া রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছে কি? সুস্থ অবস্থায় তাহা ধারণ করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু আমাদের ত সুস্থাবস্থা নহে। বত প্রকার রোগ থাকা সম্ভব, তাহার সকল প্রকারই যে আমাদের রহিয়াছে। সত্যের অপলাপ, অপ্রেম, অধৈর্য, আলস্য, অকাপ্রতার অভাব, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, অস্বাভাবিকতা, একত্রে কথা করিতে অক্ষমতা, সম্বন্ধের স্বার্থ গ্রহণ কামনা, সর্ববিধ অসম্বন্ধের ভাব পোষণ, নিজ দোষদর্শনে অক্ষমতা বা ইচ্ছার অভাব, পরদোষদর্শনে তৎপরতা, পরদোষজপমালা, নিজ বুদ্ধির অত্রাস্তা ও অন্তের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞান, নিষ্ঠার অভাব, কুচিন্তা, কুঅভিপ্রায়, ইন্দ্রিয়চঞ্চল্য, স্বেচ্ছাচারিতা, অহঙ্কার, দান্তিকতা, অসত্যাবহার, অবিনয়, বাহ্যভঙ্গ, এই সমস্ত রোগ আমাদিগকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। এতগুলি রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও আমরা ভাবি যে, প্রতিকারার্থে আমাদের কোন ঔষধেরই আবশ্যক নাই। নিজ বুদ্ধির জোরে আমাদের জীবন এক রকম কাটাওয়া যাইতে পারিব। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা ভগবান হইতে ক্রমে বহুদূরে গিয়া পড়িতেছি। নববিধানরাজ্য হইতে তাসিয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি। ক্রমে মণি আবর্তের দিকে সবেগে দৌড়িয়া যাইতেছি। নিজের দোষগুলি আমরা প্রাণপণে লাব্য করিতে উদ্যোগী, এই ব্যাপি যে সকল উন্নতির অন্তরায়, তাহা আমরা জুলিয়া যাই।

এই উৎসবকালে চারিদিক হইতে সাধক ও সূক্ষ্ম নরনারীর সমাবেশ হওয়ায়, এই মহামেলয় এক স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। আকাশের বন মেঘ কণ্ঠস্থ কাটিয়া গিয়া, আমাদের একটু জীবন সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের রোগের ঔষধ যে আবশ্যিক, তাহা মনে হইতেছে। ঔষধের বিষয় পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হইতেছে। ঔষধের তালিকাও অনেক পাওয়া যাইতেছে। নববিধান-আয়ুর্বেদে যে এ সব রোগের মহৌষধ

আছে এবং তাহার প্রস্তুতির প্রক্রিয়া ও তাহার বিশেষ বিশেষ অনুপানের বিষয়ও অনেক আলোচনা হইতেছে। কিন্তু কেবল মাত্র বিবরণ আলোচনা ইত্যাদিতে, ঔষধের গুণ শ্রবণ দ্বারা রোগ-মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। ঔষধ প্রকৃত ভাবে প্রস্তুত ও তাহা সেবন আবশ্যিক। উপযুক্ত ভাবে ঔষধ সেবন করিয়া যে সকল রোগী সুস্থল পাইয়াছেন, রোগমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাঁহারা যে প্রক্রিয়ায় ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ও যে ভাবে ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফলপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল করা আবশ্যিক। তাহা না করিলে, কিরূপে আমরা আশা করিতে পারি? কেবল মাত্র ঔষধের বিজ্ঞাপন পাঠ দ্বারা রোগের উপশম কি সম্ভব?

যাঁহারা ঔষধের ব্যবহার করিয়া হাতে হাতে ফল পাইয়াছেন দেখিতে পাইতেছি, তাঁহাদের কি প্রকারে অবিশ্বাস করিয়া চলিতে পারি? যাঁহারা ঔষধ নিজে ব্যবহার করেন নাই, কিবা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেখেন নাই, তাঁহাদের মুখে ঔষধের গুণ-বর্ণনা কোন কাজেরই নহে। আনাদের প্রকৃতি এতই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, স্বার্থ অভিভক্তা যাঁহাদের হইয়াছে, কুটতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের অভিভক্তা ভ্রমপূর্ণ, ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি, এবং অন্তের প্রকৃত অভিভক্তাকে তুচ্ছ করিয়া নিজ আত্মশুদ্ধিতা ও কুটবুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিই।

একজন একটা সুরমালা স্মিট ফল নিজে আবাদন করিয়া বলিতেছেন যে, ফগটা অতি মিষ্ট, এমন সুন্দর স্মিট ফল কখনও খাই নাই, ইহা অমৃততুল্য। আমরা কন্মিন্ কালেও যে ফল খাই নাই, চক্ষেও দেখি নাই, অথচ জোর গলায়, বিনি স্বার্থই ঐ ফল খাইয়াছেন, আবাদন করিয়াছেন, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ভণ্ড বলিয়া সাব্যস্ত করিতে প্রয়াসী হই। সে বিষয়ে আমাদের কিছু মাত্র কুণ্ঠা নাই। আমরা এইরূপই বিকারগ্রস্ত হইয়াছি।

আমরা লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কিবা স্বার্থভেদের অনুসন্ধানে উদ্যোগী না হইয়া, কখনো কখনো ভক্তের প্রতি অথবা রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করি, তাঁহাদের স্বার্থ স্বভাব বিকৃত কবিতা চারিদিকে রটাই, তাঁহাদিগকে লোকচক্ষে হেয় করিতে চেষ্টা করি, তাঁহাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করি, তাহা আর কি বলিব! ভক্তের অপমান, তাঁহাদের প্রতি অবিশ্বাস, তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা ইত্যাদি প্রকৃত পক্ষে আমাদের সকল উন্নতির পথে অন্তরায় হইয়াছে। এই রোগই আমাদের আত্মশুদ্ধি নববিধান বুদ্ধিতে অপারক করিতেছে। ভক্তের অপমানে ভগবানের অপমান। “যেখানে ভক্তবৃন্দ সেইখানে ভগবান্।” ভক্তের অপমানে স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়।

ভক্ত নিজের বুদ্ধিজাত কথা বলেন না। ভক্তিরাজ্যে শুদ্ধ বুদ্ধি-প্রবেশ নিষেধ। ভক্ত নিজেই বলেন যে, তাহার মুখ হইতে যে ভক্তিসম্বন্ধীয় কথা বহির্গত হয়, তাহা তাঁহার নিজের

কথা নহে। ভগবান্ তাঁহাকে দিয়া বাহা বলান, তিনি তাহাই বলেন, অতএব সেগুলি অত্রান্ত—সাধারণ লোক তাহা শুনিয়া, বুদ্ধিবার ক্ষমতার অভাবে তাহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বসন বলিলেন, “যদি ঈশ্বরকে না দেখিয়া থাক, আমাকে দেখিলেই তাঁহাকে দেখা হইবে”, “আমি বাচা বলিতেছি, তাহা অত্রান্ত”, তখন তাঁহাকে কতই না লালিত হইতে চাইয়াছিল। এই সকল উক্তি যে যোগস্থ অবস্থার কথা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে মহা অহঙ্কারী, দান্তিক এবং আবতারণদপ্রার্থী ইত্যাদি নানাবিধ বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছিল। তিনি দত্তের কথা কিছু মাত্র বলেন নাই। সত্যের খনি চাইতে যে সকল রত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা নিজস্ব না করিয়া, মিছের বলিয়া দাবী না করিয়া, তাহা সকলের সমুখে ধরিয়াছিলেন মাত্র। তবু তাঁর নিস্তার নাই। এ প্রকার হইবে কেন? নববিধান কি, তাহা না বুঝার—যে শাস্ত্রপাঠে তাহা বুঝা যায়, তাহা পাঠ না করার। আমরা নববিধানসমাজভুক্ত হইলেও, নববিধান কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি না এবং নববিধানসাধনপথে যাই না। অহংকে নির্মাণ করিতে পারি না, সে দিকে চেষ্টাও নাই। নববিধানে প্রবেশ করিতে পারিলে, আপাততঃ বাহা উটল বোধ হয়, তাহা অতি পরিষ্কার হইয়া যায়। ভুল সাধকেরা প্রবেশ করিয়াই এমন সকল ভব পাইয়াছিলেন, যাচা আমাদের পক্ষে দুর্য্যোগ। তাঁহারা যে সকল জিনিষের স্মৃতি আশ্বাদন পেয়েছেন, তার আশ্বাদন আমাদের নিকট অপরিচিত। তাঁহারা এত আশ্বাদন পেয়েই, সকলকে তাহা উপভোগ কর্তে না দেখে, তৃপ্তি পান নাই। স্বার্থপরের মত নিজেদের মধ্যেই তাহা বেখে দিতে পারেন নাই, তাহা প্রচার না করে থাকিতে পারেন নাই। প্রচার করে গালা-গালি খাইয়াও, প্রচারে নিরস্ত থাকিতে ক্রিয়া শিথিলতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের ভিত্তর সাধনবলে যে সত্যের অবতরণ হয়, তাহা তাঁহারা প্রকাশ করেন এবং সকলকে সেই সাধন অবলম্বন করিয়া সেইরূপ ফললাভ করিতে আগ্রহ দেখান, যাচাতে তাঁহাদের সুখ শান্তি সকলে প্রাপ্ত করেন। নববিধানের লোকেদের এইতো সেই পথ। নববিধানের উদ্দেশ্য ইহাই। নববিধান সর্বপ্রকার সত্যের সমষ্টি। ইহার রাজ্যে আসিতে হইলে, সর্বপ্রকারে মনে, কাণ্ডে, কথায়, চিন্তায় সত্যের আশ্রয় অবলম্বন করিতে হইবে। সত্যস্বরূপের রাজ্যে, তাঁহার বিদানে অসত্যের স্থান নাই। জীবনে দেখা যায়, একটু সত্যের দিকে আগ্রহ হইলেই, চারিদিক হইতে রাশি রাশি সত্য, স্বর্গের আলোক ও স্বর্গীয় ভাব শ্রোতের ভায় আসিয়া, প্রাণের মধ্যে যেন বস্তুর আবির্ভাব সৃষ্টি করে। তাই বলি, নববিধানসাধনের অজ্ঞানাম সত্যসাধন। সত্যের প্রতি অল্পরাগ যত বাড়িতে থাকে, ততই নববিধানে প্রবেশের দ্বার যুক্ত হয়। তখনই নববিধান যে কি অমূল্য ধন, তাহা বুঝা যাইবে এবং তখনই ইহার রসের আশ্বাদন পাওয়া যাইবে। “নববিধান” শব্দ তখন আর কাণে কর্কশ বোধ হইবে

না। তখন এই শব্দটি এত মিষ্ট, এত রসাল বোধ হইবে যে, আপনা হইতে ঐ শব্দ মুখ হইতে নির্গত হইতে থাকিবে। এত মিষ্ট ইহা যে, এই নাম না লইয়া পারা যাইবে না। অন্তের এই নাম ভাল লাগিবে না বলিয়া ইহার ব্যবহার কম কর—এই যে মানুষের শুক বুদ্ধির উপদেশ, তাঁহার কোন মূল্যই থাকিবে না।

মহুয়ার পরিভ্রমণের জন্ত যে নববিধান অবতীর্ণ, এই নাম যে এত স্মৃতি, চৈতন্য পূর্বে তেমন বৃত্তিভাসনা; সেজন্ত ইহার মর্গগালা পূর্বে তেমন করিতে পারি নাই। ক্রমে ভগবৎরূপায় একটু একটু ইহার রসাস্বাদলাভ হইতেছে এবং ইহা যে কত মিষ্ট এবং ইহা চাড়িয়া একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না, বুঝিতেছি। এ অবলম্বন, এ আশ্রয় ছাড়া আমাদের গতি নাই। তাই সকলের চরণধরে মিনতি করিতেছি যে, এই উৎসব চাইতে এই ব্রতটো লইয়া যান যে, সকলে একান্ত নিষ্ঠা, তত্ত্ব ও বিশ্বাসের সহিত নববিধানসাধনে প্রবৃত্ত হইবেন।

সমগ্র জগতের উপহাস অত্যাচার ঘেন আনাদিগকে এই মহান সংকল্প হইতে এক চুলও হঠাইতে না পারে। আমরা কেবল ভগবানের কথা শুনিতে বাধ্য। মহুয়ার শুক বুদ্ধির সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ভগবৎ-প্রেরণার নিকট মহুয়ার উপদেশ কিছুই নহে।

মা জগজ্জননো কৃপা করিয়া আমাদের উপযুক্ত বল বিধান করুন, তাঁহার বলে বলী করুন এবং আনাদিগকে তাঁহার নববিধান সাধন ও প্রচার করিবার জন্ত উপযুক্ত শক্তি প্রদান করুন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## শ্রীহটে ব্রহ্মোৎসব।

আমি গত নভেম্বর থেকে স্বাস্থ্যগতির জন্ত শ্রীহটে আসিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সচ্চিদানন্দের সঙ্গে বাস করিতেছি। গত ত্র্যাদিক-শততম মাঘোৎসব এবং স্থানীয় শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সম্প্রতিতম ব্রহ্মোৎসবে আত্মোপাস্ত বোগদান করিয়াছিলাম। এতৎ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তালিকাভূমার উৎসবের বিবরণ প্রেরিত হইল।

এই উৎসব উপলক্ষে ভাগলপুর হইতে শ্রীমান্ প্রেমমুন্দর ও ময়মনসিংগ হইতে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় ক্রমান্বয়ে আসিয়া, উৎসবকার্য্য ঈশ্বর-পরিচালিত হইয়া সমাধা করেন। সুন্দর ব্যাপারে ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া আমরা ধৃত হইয়াছি।

এই মাঘ, বুধবার—এই উৎসবের মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নরেশনন্দিনীর পবিত্রস্থিতি উপলক্ষে আমাদের বাসগৃহে প্রাতে উপাসনা হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীবুদ্ধ উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই অস্থান অতি গাভীর্থের সহিত সম্পন্ন করা হয়।

৬ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৭।০টার সময় উৎসবের উদ্বোধন দীন সেবক কর্তৃক ব্রহ্মমন্দিরে করা হয়। সন্ধ্যা ৬।০টার সময় মঠধি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায় বক্তৃতা হয়।

৭ই মাঘ, শুক্রবার—সন্ধ্যা ৬।০টার সময় স্থানীয় যুগ্মসেবা শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাসের বাড়ীতে তাঁর বর্গস্থ পিতৃদেবের সাংস-স্মরিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

৮ই মাঘ, শনিবার—সন্ধ্যা ৬।০টার সময় স্থানীয় রাজার স্কুলগৃহে “ধর্মবিরোধ ও সামঞ্জস্য” বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তা অধ্যাপক ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু। বক্তৃতা গভীর গবেষণাপূর্ণ ও সকলের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

৯ই মাঘ, রবিবার—প্রাতে ৭।০টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে কীর্তন ও তৎপরে উপাসনা। অপরহ্ন ৩।০টার সময় বালকবালিকা-গণের সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬।০টার কীর্তন ও উপাসনা।

১০ই মাঘ, সোমবার—প্রাতে ৭।০টার সময় মন্দিরের উপাসনা দীনসেবক কর্তৃক করা হয়। সন্ধ্যা ৬।০টার সময় ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তন ও তৎপরে মন্দিরে উপাসনা।

১১ই মাঘ, মঙ্গলবার—সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কীর্তনের পর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের উপাসনা। ৩টার সময় আলোচনা ও পাঠ। তৎপরে ভিখারী বিদায়। সন্ধ্যায় কীর্তন ও তৎপরে অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসুর উপাসনা। অদ্যকার সমুদয় ব্যাপারই সুন্দর হইয়াছিল।

১২ই মাঘ, বুধবার—প্রাতে ৭।০টার Lt. Col. J. L. Senএর বাসভবনে পারিবারিক উপাসনা অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং নববিধান ঘোষণা করা হয় ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে পঠিত করা হয়। সন্ধ্যায় মন্দিরে মহিলাগণের উৎসবের প্রার্থনা দীন সেবক কর্তৃক করা হয় ও পরে অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু কর্তৃক “ভক্তমাল” গ্রন্থ হঠতে সাধু সাধ্বী নর-নারীগণের জীবনবৃত্তান্ত পঠিত হয়। তন্মধ্যে কর্ণিকা বাইএর কৃষ্ণানুরাগ আখ্যায়িকা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৭।০টার সময় আমাদের বাসভবনে পারিবারিক উপাসনা শ্রদ্ধেয় মহিমচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। আমি প্রার্থনা করি এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রেমসুন্দর বসু আচার্য্য কেশবচন্দ্রের শেষ প্রার্থনা তাঁর উপদেশ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যায় “আশীষ-ভবনে” (শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় Inspector of Schoolsএর বাড়ীতে) সমস্তসভার উৎসব সম্পন্ন করা হয়।

১৪ই মাঘ, শুক্রবার—আখ্যানিয়ার সর্কানন্দ সদয় ভবনে কীর্তন ও উপাসনা। সন্ধ্যা ৬।০টার সময়ে মন্দিরে শান্তিবাচন।

১৫ই মাঘ, শনিবার—প্রাতে ৮টার সময় শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় মন্দিরে উপাসনা করেন ও সন্ধ্যায় “অতীতের ব্রাহ্মসমাজ” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

১৬ই মাঘ, রবিবার—আজ মন্দিরে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের

সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে কীর্তনান্তে উপাসনা মহিমচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় করিলেন। বৈকালে ৩টার সময় শ্রীহট্ট ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত পাঠ ও আলোচনা। সন্ধ্যায় কীর্তনান্তে উপাসনা শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় করিলেন। উপদেশ—“ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে ঈশ্বরের রূপার পরিচয়”।

১৭ই মাঘ, সোমবার—প্রাতে ১০।০টার সময় সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এক পাহাড়ের উপর বৃক্ষতলে সকলে বসিয়া উপাসনা। অদ্য শ্রীপঞ্চমীর দিন। শ্রদ্ধেয় মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় সরস্বতীপূজা সম্বন্ধে স্ত্রীলোকদের আধ্যাত্মিকভাব বিষয়ে উপদেশ দেন। উপাসনা খুব সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরে নিম্নে অবতরণ করিয়া একস্থানে বৃক্ষতলে খেচরার ভোজন করা হয়। একশতজন আনন্দ উপস্থিত ছিলেন। বেলা ২।০টার সময় প্রত্যাগমন করা হয়।

১৮ই মাঘ, মঙ্গলবার—প্রাতে ৮টার সময় শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দেবের মালিনীতটস্থ উদ্যানে চন্দ্রাতপতলে উপাসনা মহেশবাবু করেন। সর্ব্বথটে ব্রহ্মদর্শন, বিশেষতঃ প্রকৃতির মধ্যে—এইভাবে উপাসনা করা হয়। সন্ধ্যা ৬।০টার সময় বিভিন্নধর্ম্মাবগম্মিগণের সম্মিলন রাজার স্কুলগৃহে হয়। বক্তৃতার বিষয় :—১ম, হৃদয়ত মোহনদের জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ; ২য়, যীশুখ্রীষ্টের জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ; ৩য়, ভারতের ব্রহ্মজ্ঞান।

২০শে মাঘ, রবিবার—প্রাতে ৮টার সময় স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে বৃক্ষ সাধক শ্রীযুক্ত রামদয়াল দাসের (৬০ বৎসর বয়সে) দীক্ষা-গ্রহণ অনুষ্ঠান শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। রামদয়ালবাবু একজন প্রাচীন আত্মতানিক ব্রাহ্ম। তাঁর জীবনের ইতিহাস অলৌকিক কাহিনীতে পূর্ণ। দীক্ষার্থীর জন্ম নূতন সঙ্গীত রচিত ও গীত হয়। সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে আগত শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরিচালনায় সংকীর্তনে ব্রহ্মো-পাসনা হয়। ইহা এখানে একটি নূতন ব্যাপারই মন্দিরগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

দীক্ষার সঙ্গীত।

( সুর—জয় জ্যোতির্ময় জগদাশ্রয়, জীবগণ-জীবন )

আজ দীক্ষার দিনে, দীন সেবকে, কর গাহু বর দান হে।  
যেন, জগতের হিতে, পারি সমর্পিতে, তুচ্ছ মম এ প্রাণ হে ॥  
যেন, পারিগো পালিতে, কায়মনোচিত্তে, মঙ্গল তব বিধান হে।  
যেন, চুঃখে সুখেতে, পারিগো গাইতে, কল্যাণ তব গান হে ॥  
ওহে! তব বাণী শুনে, চলিতে জীবনে, পাই যেন দিবা জ্ঞান হে।  
তুমি, হও হে আমার, ওহে প্রাণাধার! জীবনের লক্ষ্য,  
ধান হে ॥

ওহে, করিতে নির্ভর, তোমার উপর, কর মোরে শিক্ষা দান হে!  
যেন, গীরীক্ষার মাঝে, পারি দেখাইতে, জীবনে তাহার  
প্রমাণ হে ॥



সর্বোপরি হ'ক, তোমার করুণা আশা ভরসার স্থান হে।

তুমি বিনা এবে, কে রাখিবে বল, শরণাগতের মান হে ॥

২৪শে মাঘ, সোমবার—পাতে ৭১টার সময়, Lt. Col. J. L. Senএর বাসভবনে তাঁর স্বর্গগত পিতৃদেবের প্রথম সাধুসরিক অনুষ্ঠান প্রদেয় মনোহর চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত হয়। জ্যোতিলাল পিতৃদেবের জীবনী আবেগে অবরুদ্ধকণ্ঠে পাঠ করেন। সন্ধ্যায় সন্তোজনাথের কীর্তনে অনেকে অহুত হইয়াছিলেন। কীর্তনান্তে চবিঘণ্টা পরিতৃপ্তির সচিত্র ভোজন করান হয়।

বিনীত

শ্রীদামোদর পাল

## ত্ৰ্য্যধিকশততম মাঘোৎসবের বিবরণ

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

৯ই মাঘ, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। পাতে ৭১টার কীর্তন। কীর্তনান্তে ৮১টার উপাসনা আরম্ভ হয়। ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ এ বেলায় উপাসনার কার্য্য করেন। তাঁহার কর্তৃক উদ্বোধন, আরাধনা, পাঠ ও উপদেশাদি তাঁহার স্বাভাবিক গাভীরা ও সরসতায় পূর্ণ ছিল। “বালাথৈলা” আচার্য্যদেবের প্রার্থনা এবং “অখণ্ডজীবন” প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ ও স্বর্গীয় প্রকাশচন্দ্রের উপদেশ তাঁহার পঠিত বিষয়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের বিষয়। এই পঠিত বিষয় অবলম্বনে তিনি উপদেশ দান করেন। উপদেশের বিশেষ কয়েকটি কথা এখানে উল্লেখ করা গেল।

ব্রহ্ম যিনি ক্রমাগত বাড়িতে থাকেন, যিনি কুয়াইয়া যান না, সেই ব্রহ্ম আমাদের উপাস্য। অনন্ত ব্রহ্ম আপনাকে আপনি নিত্য অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সেট বৃহৎ ব্রহ্ম সাধকজীবনে বর্জনশীল। তিনি নিজগুণে দীপ্ত করে নিত্য নূতন দর্শন দেন। তিনি সাধকজীবনে ক্রমাগত বাড়িয়া যান; মানবজীবনে তাঁহার ক্রমাগত বৃদ্ধিতেই মানবাত্মার ক্রমাগত বর্জনশীল অখণ্ড জীবন। সর্বত্র, সকল ধর্ম্মবিধানে, সকল সাধু, ভক্ত, মহাত্মনের জীবনে তিনি বিরাজিত। সকল ধর্ম্মবিধান, সকল সাধু ভক্ত মহাত্মনদিগের জীবন, সকলই আমার জন্ত, আমাদের জন্ত। যত আমরা সকলকে গ্রহণ করি, ততই আমাদের জীবনে ব্রহ্মের প্রকৃতি। যত গ্রহণ করি, ততই তিনি আমাদের মধ্যে বাড়িয়া যান, আমরাও বৃদ্ধি লাভ করি, বিরাট জীবন প্রাপ্ত হই। তোমরা মনে করিতে পার, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার জীবনে যে সাধন সম্ভব হইয়াছিল, আমাদের জীবনে কি করে? সে সাধন সম্ভব হবে? ঐ ডিপুটী ম্যাজিস্ট্রেট প্রকাশচন্দ্র রায়ের কথা—ভাব। তাঁহার উক্তি—যাহা পাইলাম, তাহা ঐ অখণ্ডজীবন।

আমাদের বালা, যৌবন, পৌর, জীবনের বিভিন্ন স্তর আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া, মনে হয়, আমাদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। এখন যে জীবন চলিতেছে, কাল আর থাকিবেনা। কিন্তু সকলই আমাদের মধ্যে থাকিয়া যায়, কিছুই আমরা হারাই না। অপ্রাবস্থায় তাহার ফিরে আসে, তাহা দ্বারা প্রমাণ হয়, কিছুই আমরা হারাই না, সবই আমাদের মধ্যেই আছে। কিছুই আমরা হারাই নাই। পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়, বান্ধাদিগকে হারাইয়াছি, কাহাকেও হারাই নাই। এ বৎসর বান্ধাদিগকে হারাইয়াছি, তাঁহাদের কাহাকেও হারাই নাই। সকলই আমাদের চরে, আমাদের মধ্যে আছেন। সেই অতীত জীবনে দেখেছি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ “মা আমাদের আমরা মায়ের” বলে প্রমত্তভাবে নৃত্য করেছেন। সেই স্পর্শ এখনও পাঠ, হারাই নাই। তাই বলি, কিছুই হারাই নাই, হারাই না।

মধ্যাহ্ন ৩ ঘটিকায় মধ্যাহ্নের উপাসনা ভাই অখিলচন্দ্র রায় নির্বাহ করেন। তৎপর পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ডাক্তার অমৃকুলচন্দ্র মিত্র পাঠের কার্য্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত বলরাম সেন, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রসঙ্গের কার্য্য করেন। জীব ব্রহ্মে মিলনে স্বর্গের পরমানন্দ; ব্রহ্মে ভিতর দিয়া, নিঃস্বার্থ প্রেমের ভিতর দিয়া মানুষে মানুষে মিলনেও স্বর্গের পরমানন্দ। জীব ও ব্রহ্মে মিলনে, সেইযোগে মানুষে মানুষে মিলনে যে পরমানন্দের বাণী, আমাদের এই উৎসবক্ষেত্র তাহারই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—ভাই গোপালচন্দ্র গুহের প্রসঙ্গের ভিতর এই কথা বিশেষ ভাবে ছিল। শ্রীযুক্ত বলরাম সেন বাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এট—ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মানবের ইচ্ছা মিলন করে। তাঁর সঙ্গে মিলন; সম্পদ, বিপদ সকলই তাঁর দান জেনে সম্পদ বিপদের মধ্য দিয়াও তাঁর সঙ্গে মিলন। মানুষে মানুষে কাজের ভিতর দিয়া মিলন, পৃথিবীতে ইহার বিপরীত ভাব আছে, পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে কত দ্বিচ্ছিন্নতা আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহার সহিত যথার্থ মিলন, তাঁর ভিতর দিয়া পরম্পরের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে আমাদের মধ্যে যথার্থ মিলন। ভক্তি হইতে প্রেম শ্রেষ্ঠ। ভক্তির মধ্যে ছোট বড় ভাব আছে, প্রেম একেবারে একভাবে মিলে যাওয়া, এক হয়ে মিলে যাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রবাবুর কথার মর্ম্ম—শ্রীমদাচার্য্যদেবের কথায় জ্যেষ্ঠ ভাই সাধু মহাজনদিগের মধ্যে খৃষ্ট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, জড় জগতে যেমন সূর্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আচার্য্যদেব যে পথ দেখাইয়াছেন, সেই পথে গেলে মিলন হবে, স্ব স্ব ভাবে গেলে মিলন হবে না। ইহার পর ধ্যানের সময়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ধ্যানের উদ্বোধন করিলে কিছু কাল ধ্যান হয়, তৎপর তিনিই প্রার্থনা করেন। তৎপর কীর্তন হয়। শ্রীযুক্ত সন্তোজনাথ দত্ত কীর্তনে নেতৃত্ব করেন। কীর্তনান্তে ৮১টার উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই

অক্ষয়কুমার লখ এ বেলায় উপাসনার কার্য করেন। তাঁহার স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসে তিনি উদ্বোধন আরাধনার কার্য সম্পন্ন করেন। “নিতা নূতন চরি” আচাৰ্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি বিশেষ ভাবে ছিল।

অনিন্দময়ী উৎসব, মায়ের জয় গান করা, যাচাতে শোক, তাপ, দুঃখ, বেদনা সব চলিয়া যায়। গত বৎসর আমাদের মণ্ডলী ভেঙ্গে গিয়েছে। কতজনকে হারিয়েছি। ভাঙা ভাঁড়ি জোড়া লাগে না। জড় শরীর নখর, তা ভেঙ্গে গেলে ফিরে পাই না। কিন্তু জড় শরীরের ভিতর যে আত্মা আছে, তাটা নিত্যা অমর। ভূতবিশ্ব দাঁরা, তাঁরা বাহিরের বিষয় লইয়াই থাকেন না, পৃথিবীর ভিতরেও বহু সংগ্রহ করেন। আজ আমরা কি সেই চক্ষু লাভ করিতেছি না, সেই দৃষ্টিতে দেখিতেছি না, যে দৃষ্টিতে বাহিরের রূপ আর থাকিতেছে না। আছে কেবল অপরূপ অরূপ আত্মা? আজ সকল ভাট বোনের ভিতর যদি আত্মার খোঁজ পাই, তবে দেখবো, আত্মার আত্মায় যে যোগ, যে মিলন, তাটা চিরদিন থাকবে। প্রার্থনায় শুনলাম, ঈশা, গৌর চির নূতন। যদি আত্মার খোঁজ পাই, তবে দেখবো, ঈশ্বরের সব পুত্র কতটা চির নূতন। মৃত্যু নাই, জীবনের শেষ নাই, লোকলোকান্তরে একই অখণ্ডজীবন নিত্যা নূতন। উৎসবের প্রসাদরূপে যদি আমরা এই প্রার্থনার ভাব প্রাণে ধরিয়া যাই, আজ যদি সকলকে সেই ভাবে গ্রহণ করি, তাই নূতন, ভগ্নী নূতন, মণ্ডলী নূতন—যদি এই আত্মার সম্পর্ক জেগে উঠে, আর সকল আত্মাকে নিত্যা নূতনরূপে দেখতে পাই, তবেই দেখবো, ইহপরলোকে আমাদের অখণ্ড মণ্ডলী, কিছুই ভাঙে নি। তবে আর নিরাশা কোথায়?

বেদী হইতে প্রার্থনার মন্তব্যঃ—না, নূতন ভাবে সকলকে মার্জিত করে দেও। আজ উৎসবক্ষেত্রে যেন সকলকে নূতন করে পাই। তুমি নূতন হয়ে প্রকাশিত হও, আর সব নূতন হউক। জীবন, সংসার, গৃহ, পরিবার, দেশ, সব নূতন হউক। তোমার নিত্যা নূতন প্রকাশে সব নূতন হউক। নববিধান জরযুক্ত হউক। নববিধানের নিত্যা নূতনত্বের ভিতরে ইহপরলোকে আমরা এক পরিবার হয়ে থাকি। (ক্রমশঃ)

## একখানি পত্র।

অক্সফোর্ড ধর্মতত্ত্বসম্পাদক মহাশয় সমীপে

সবিনয় নিবেদন,

ধর্মতত্ত্বক্ষে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই, কিন্তু কিছু শিক্ষা পাবার ইচ্ছা সময় সময় মনে হয়, সেজন্য আপনার শরণ গ্রহণ করছি। আশা করি, আপনার বহুল্য সময়ের কিয়দংশ এ ধর্মহীনতার কথায় নষ্ট হ'লে আপনি অপরাধ নেবেন

না। আমি একজন নববিধানপ্রিয়, তাহা আপনি জানেন। আর নববিধানের গৌরবকে আমি আমার নিজের গৌরব বলে মনে করি। নববিধানের আশ্রয়ে গেলে, সকল ধর্মই যে সত্য, আর যুগে যুগে যে সকল ধর্ম প্রচার হয়েছে, সে সমস্তই দেশ, কাল, পাত্র অনুসারে ভীষের ও কণ্ঠের নম্রণের জন্য ভগবানের পোষকের বিধান, এ বিশ্বাস লাভ করেছি। তাই সময়ে সময়ে যখন নববিধানবিশ্বাসীদের লেখায়, উপদেশে কিম্বা আচরণে ইহাও অন্তর্ভুক্ত দেখি, তখন তা বুঝতে না পেরে এক একবার সে সকলের অর্থ জানবার কথা মনে হয়। যখন নববিধান-শ্রীমন্দিরের বেদী থেকে, ধর্মতত্ত্বপত্রিকায় ও অন্তর “হিন্দুধর্ম সচ্চিদানন্দ ভগবান্কে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছেন,” কিম্বা নববিধানপ্রচারের পূর্বে হিন্দুধর্ম “বিরামদায়িনী নিশ্চেষ্টতা” “কাপুরুষোচিত কর্মতাগের,” “একটা এমনি নির্জন সাধন, যাতে সাধারণের কোন কল্যাণ হয় না” এবং “কারণ শিক্ষা ও ভাবই কেবল হিন্দুধর্মের সাধনের উপায় ছিল বলে প্রচার করা হয়, তখন মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে, উপনিষৎ প্রভৃতিতে ও ভগবদ্গীতার আমার নিত্য অসম্পূর্ণজ্ঞানে যে দেখি, ভগবানের অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কেনন উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত এবং বিশেষ করে ভগবদ্গীতায় “বিরামদায়িনী নিশ্চেষ্টতা” “কাপুরুষোচিত কর্মতাগের” কিম্বা এরকম সকল ভাবের যে কেবল বিপরীত কথা ও বিশেষ নিন্দাবাদ দেখি, তখন নিজের বুঝবার ভুল হয়েছে মনে করে, প্রকৃত সত্য জানবার ইচ্ছা হয়। আপনি যদি দয়া করে আমার প্রকৃততত্ত্ব বুঝিয়ে দেন ও যদি হিন্দুধর্মপুস্তকের আমার উল্লিখিত ভাবের সমর্থনে উক্তি সকল, আমার সামান্য যা কিছু জানা আছে তা, উল্লেখ করলে আমার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দেন, তা হ'লে আমি অত্যন্ত কৃতার্থ হ'ব। তবে সংক্ষেপের জন্য এলা যায় যে, ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের পাঠ্যকটীই এক একটী সাধনের তর এবং শেষ তর যখন অনাসক্ত বৈরাগী সাধক—

“বিবিচিনেবা লখাশী যতবাক্যকায়মান্যম্।

ধ্যানযোগপরো নিতাং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥”

তখনও কর্মতাগের কোন কথাই নাই, বরং ভগবান্কে আশ্রয় করে' তাঁরই উদ্দেশ্যে কর্ম করার উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

“সদাকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ন্তাগো মন্যাপাশ্রয়ঃ।

মৎপ্রসাদাদবাপোতি শান্ততঃ পদমব্যয়ম্ ॥”

\* \* \* \*

“স্বভাবজেনকৌন্তেয়! নিবন্ধঃ যেন কর্ম্মণা।

কর্ত্ত্বুং নেচ্ছসি যশ্চোহাং কথিযাম্যবশোহপি ততঃ ॥”

তার পরেও পরমপদপ্রাপ্ত সাধকের প্রতি সর্বগুহ্যতম পরম উপদেশ-বাক্য বলেছেন—

• “সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো যোগয়িষ্যামি মা তুচঃ ॥”

কিন্তু তখনও কৰ্ম্মভাগের কোন কথাই নাই এবং তখন ধর্ম্মপ্রচারত্রয় গ্রহণ করবার উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

“য ইমং পরমং গুহ্যং মন্তুকেষুভিধাস্যতি ।

ভক্তিং মন্ন পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যতাসংশয়ঃ ॥”

কিন্তু তার পূর্বে অশুচি, অনাচারী, অজ্ঞানীর প্রচারক বেশ ধারণ করে ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করার কোন উপদেশ দেবি নাই। আমার মনে হয়, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সাধকের জন্ত গীতার উপদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেশ আর কোথাও নাই। আশা করি, আপনি দয়া করে, ধর্ম্মতত্ত্বপ্রসার এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে, আমার সত্যপ্রাপ্তির সচায়তা করবেন। ইতি।

১০নং অপারসাকুলার রোড, } বিনীত  
কলিকাতা। } শ্রীউপেন্দ্রনাথ বসু ।

পত্র-লেখক শ্রদ্ধেয় বঙ্গু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু ধর্ম্মতত্ত্বে তাঁহার পত্রের বিস্তৃত আলোচনা ইচ্ছা করিয়াছেন। কিন্তু চুঃখের বিষয়, ধর্ম্মতত্ত্বে এ বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিতে অক্ষম। তাঁহার আলোচ্য বিষয়গুলি সহজে, শ্রীমন্দিরের বেদী হইতে, ধর্ম্মতত্ত্বপ্রসার ও অজ্ঞান কখন কে কি ভাবে এই সকল প্রচার করিয়াছেন, তাহা ধরিয়া আলোচনা করিবারও উপায় নাই। তিনি যেমন সাধারণ ভাবে লিখিয়াছেন, আমরাও সাধারণ ভাবে দু'একটা কথা বলিতেছি।

“হিন্দুধর্ম্ম সচিদানন্দ ভগবান্কে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছেন” এই কথা কিরূপ সঙ্গত, এই তাঁহার প্রথম কথা। গীতা বা বেদ বেদান্তের সত্য ধর্ম্ম লইয়া নয়, বঙ্গভারতের সাধারণ প্রচলিত এবং আচারিত ধর্ম্ম লইয়াই, সমাজসংস্কারের ভাবে এসব কথা বলা হয়, তাহা আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে। এ বিষয়ে “সেবকের নিবেদন” প্রথম খণ্ডের “এক কি তেত্রিশকোটি” হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:— “হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় ব্রহ্মকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন এক একটা রূপের তত্ত্ব মুক্তি হ্রাসন করিয়া পূজা অর্চনা করিল। এই ভ্রমে মহা অনিষ্টের উৎপত্তি হইল। বাই বিভিন্নগুণ বিভিন্নরূপ ধারণ করিল, অমনি ব্রাহ্ম হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্ম হইল। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ কারবার জন্ত এবং আদি সনাতন ব্রহ্মরূপকে সাকার গঠন হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্ত নববিধান স্বর্ণ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।” উপরের লিখিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করে, হিন্দুধর্ম্ম, ভিন্ন কথায় হিন্দুধর্ম্মানের সামাজিক আচারিত এবং প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম সচিদানন্দ ভগবান্কে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছেন। প্রকৃত কথা এই, সুদীর্ঘ দিন হইতে হিন্দুধর্ম্মানের প্রচলিত এবং আচারিত ধর্ম্ম উপনিষদের ধর্ম্ম ও গীতার ধর্ম্ম হইতে কতকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। মহাত্মা রামা রামমোহন রায়েয় সময় হইতে এপর্যন্ত নবযুগের নবধর্ম্মপ্রচার-

ক্ষেত্রে প্রচলিত পৌত্তলিকতা বা খণ্ড খণ্ড ভাবের পূজার প্রতিবাদ করিয়া, আবার অখণ্ড ঈশ্বরের পূজার প্রতিষ্ঠা জন্ত, পূর্বোক্ত ভাবের কথা বলা হয়, কি বলা হইয়া থাকে। ইহাতে প্রাচীন ভারতের উপনিষদ্ কি গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিকক্ষে কিছু বলা হয় না, কিংবা অজ্ঞ কোন প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র কি ধর্ম্মের বিকক্ষেও বলা হয় না।

তাঁহার দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়—“বিরামদাফিনী নিশ্চেষ্টতা” “কাপুরুষোচিত কৰ্ম্মভাগ” “একা একা নির্জন সাধন, যাতে সাধারণের কোন কল্যাণ হয় না, এবম্প্রকার শিক্ষা ও ভাবই কেবল হিন্দুধর্ম্মসাধনের উপায় ছিল বলে প্রচার করা হয়”। প্রাচীন ভারতে এক সময়ে ধর্ম্মের ও কৰ্ম্মের উচ্চ যোগ ছিল, ধর্ম্মের উচ্চ নীতি অবলম্বনে কৰ্ম্ম নির্বাহ হইত, কৰ্ম্মের উচ্চ আদর্শ ধরিয়া ধর্ম্মব্রত জীবনে উদ্ভাসিত হইত, গীতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাই তো এখনও আমাদের জাতীয় গৌরব। “ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ সাত্ত্বিজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎকৰ্ম্ম প্রকুর্ব্বাত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥” এখনও নববিধান-ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের অবলম্বিত এই উচ্চ আদর্শ আমাদের কর্তব্যপথের আদর্শ। কিন্তু ভারতের সুদীর্ঘ জীবনে ধর্ম্মক্ষেত্রে কত বিভিন্ন ভাবের, বিভিন্ন আদর্শের, উচ্চ ও গৌন কত ভাবের অভিনয়ই না হইয়া গিয়াছে। স্বর্গীকৃত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রণীত “ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়” গ্রন্থ বাঁহারা একটু পাঠ বা আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতেই মনে হীনভাবের অভিনয়গুলি স্মরণের বিষয় হইতে পারে। বঙ্গ-ভারতের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের অধঃপতি ও অবস্থায়, গৃহভাগী নানাপ্রণীত সন্ন্যাসী ও ভেৎসধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে এবং অনেক গৃহী বাক্তির মধ্যেও বৈষ্ণব হীনভাবের অভিনয় হইয়া গিয়াছে ও এখনও অনেকস্থানে হইতেছে, পূর্বোক্ত বাক্যগুলি সেই সকল দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দেয় এবং সম্ভবতঃ সেই সকলের সংস্কার উপলক্ষেই এই সকল কথার প্রয়োগ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

## সংবাদ ।

শ্রীকানুষ্ঠান—গত ১২ই জাম্বুদ্বীপী, ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা এবং শ্রীমান্ নূপেন্দ্রনাথ মিত্রের পত্নী শ্রীমতী ননীবালা মিত্র বি,এর, শ্রীকানুষ্ঠান শাস্ত্রকুটীরে নবগংহিতাহুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পিতা বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন।

স্থানাভাবে এবার আর সংবাদ দিতে পারা গেল না।

Edited on behalf of the Apostolic Durben New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেসে”

শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক ১৮ই ফাল্গুন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।  
চেতঃ স্তনিস্তলস্তোত্রং সত্যং শাস্ত্রমনন্তরম্ ॥  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।  
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মকীরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ ।  
৫ম সংখ্যা ।

১লা চৈত্র, বুধবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ ।

15th March, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## প্রার্থনা ।

হে নিত্য কৰ্ম্ম, জীবন্ত জাগ্রত পুরুষ! তোমার সৃষ্টিকার্য্যও যেমন নিত্য নূতন ভাবে চলিতেছে, সমস্ত বিশ্বজগতে তোমার লীলাখেলাও তেমনি নিত্য নূতন ভাবে চলিতেছে। সৃষ্টির ব্যাপারও যেমন সাধারণ ও বিশেষ, লীলার ব্যাপারও তেমনি সাধারণ ও বিশেষ। এই যুগকে তুমি বিশেষ ভাবে নূতন যুগে পরিণত করিয়া, এই যুগে তুমি নবযুগধর্ম্ম নববিধান প্রকটন করিয়াছ, এবং তোমার পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে সেই লীলার ব্যাপার পরিচালন করিতে আরম্ভ করিয়াছ। আমরা এই নূতন যুগের মানুষ; যদি আমরা তোমার মনের মত নূতন না হই, তবে আমরা তোমারও হইলাম না, এ যুগেরও লোক হইলাম না, সত্যতঃ আমরা আমাদেরও হইলাম না। এ যুগ যে নূতন যুগ, তাহার প্রমাণ বাহ্যজগতে, অন্তঃজগতে, আমাদের জীবনে ও গৃহ পরিবারে। আমরা নিতান্ত অযোগ্য, অপাত্র, অপরাধী হইয়াও, তোমার নবযুগের ও নবধর্ম্মের কত প্রসাদ সন্তোগ করিতেছি, কত আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেছি। সেই প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদের মধ্যে, তোমার নব নব দর্শন ও তোমার নব নব বাণীশ্রবণ এবং নানা পরীক্ষার মধ্যে

তোমারই বলে তোমার স্বর্গের ইচ্ছার অনুসরণ ও পালন সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। তোমার এত প্রসাদ সন্তোগ করিয়াও দেখিতেছি, এখনও আমরা কত দুর্ব্বল, কত মলিন। “বলেছ বলেছ তুমি হে, পাপী ডাকিলে আসিব আমি”—যখনই অভাবে পড়িয়া, পরীক্ষায় পড়িয়া তোমায় ডাকি, তখনই আমাদের জীবনে তুমি স্বয়ং জীবন্ত জাগ্রত অনন্ত শক্তিময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, আনন্দময় রূপে অবতীর্ণ হইয়া ঐ বাণীকে সত্য কর, সার্থক কর। আমাদের জীবন যে তোমার নিত্যলীলার ক্ষেত্র, তাহার সাক্ষ্য দান কর। যদি আমরা একাধিকবার আমাদের জীবনে তোমার এই অবতরণের সাক্ষ্য, কৃপার সাক্ষ্য লাভ করিয়া থাকি, তবে আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন জীবনের পরীক্ষায় নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়া হতাশ হইয়া না পড়ি, নিরাশ্রয়, অন্ধকারে যেন ডুবিয়া না যাই। জীবনে যখন তোমার কৃপার প্রমাণ পাইয়াছি, তখন জীবনের সকল পরীক্ষায়, সকল অভাব অনটনে, তোমার শরণাপন্ন ভাল করিয়া হইব, প্রাণ খুলিয়া, প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ডাকিব, তোমার নিত্যলীলাধীন হইয়া তোমারই দেওয়া নব নব শক্তিতে, নব নব বলে তোমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ধন্য হইব; এবং প্রত্যক্ষ করিব, অভাব, অনটন, বিপদ, পরী-

ক্ষার মধ্য দিয়াই, বিশেষভাবে আমাদের নিত্য নব জীবন, মুক্তির জীবন, অমরজীবন লাভ হয়। আমরা অবিশ্বাসী হইয়া, যেন আর জীবনের কোন অবস্থায় তোমার শরণাপন্ন হইতে, তোমার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা করিতে, তোমার লীলাধীন হইতে না ভুলি। তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ ! শান্তিঃ !

— — —

## আমাদের দায়িত্ব ।

ধর্মক্ষেত্রে আমাদের দায়িত্ব অতি গুরুতর। যুগে যুগে স্বর্গ হইতে পরিত্রাণপ্রদ ধর্মবিধান জগতে সমাগত হইয়াছে। ধর্মবিধানের প্রথম যুগ বাইতে না বাইতে, যাঁহাদিগের জীবন-যোগে নবভাবে একটি ধর্মবিধান সমাগত হয়, সেই সকল মহাপুরুষদিগের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যধর্মবিধানের মধ্যে নানা প্রকার মানবীয় রুচি, ভাব ও সিদ্ধান্ত সকল প্রবেশ করিয়া, ধর্মবিধানকে অল্পদিনের মধ্যেই বিকৃত করিয়া ফেলে। অন্ততঃ সর্বসাধারণের সামাজিক জীবনের ধর্ম, মানবীয় ভাব, রুচি ও বুদ্ধির সহিত মিশিয়া, স্বর্গীয় বিধানের তুলনায় হীন হইয়া পড়ে। এজন্য যাঁহাদের জীবন-যোগে স্বর্গের ধর্মবিধান সকল সমাগত হয়, সেই সকল মহাপুরুষগণ ধর্মকে বিশুদ্ধ রাখিবার অভিপ্রায়ে, আপনাদের জীবনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া যান, সংহিতার আকারে ধর্মের মূল বিধি ও ত্রুত নিয়মাদির ব্যবস্থা করিয়া যান এবং আপনাদের ছাঁচে অনুবর্ত্তিগণের ধর্মজীবন যথাসম্ভব পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের যথেষ্ট সাবধানতা, ঐশ্বর্য, জীবন্ত ধর্ম জীবন্তভাবে বেশী দিন সাধারণ মানবমণ্ডলীতে প্রতিষ্ঠিত পারেনা, অতীত ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দান করে।

ইহা সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, যতদিন কোন ধর্ম-মণ্ডলীর নরনারীর জীবনে সাধনার তীব্রতা থাকে, ঐশ্বরের পূজা বন্দনা, ধ্যান ধারণা, পাঠ প্রসঙ্গ, সঙ্কল্পে নির্ভজনে তাঁহার অনুধ্যান ও তাঁহাকে জীবনে চরিত্রে গ্রহণের ঐকান্তিকতা থাকে, ততদিন সে সমাজে ধর্ম জীবন্ত থাকে। কেন না, নরনারীর ব্যক্তিগত জীবন লইয়াই পরিবার ও সমাজ। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে সাধনার তীব্রতা কমিয়া গেলে, আর সে সমাজে

ধর্মমণ্ডলী আশামুরূপ গঠিত হইতে পারে না। তাহার ফলে সামাজিক জীবনে জীবন্ত ধর্মের শ্রোত্রঃ বন্ধ হইয়া যায়, ; বাহ্য থাকে, তাহা গতানুগতিক বাহ্য আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এরূপ অবস্থায় ধর্মসমাজ প্রাণহীন হইয়া পড়ে, সামাজিক জীবনে নানা প্রকার দুর্গতি উপস্থিত হয়।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের জীবনে বাহ্য ঘটয়াছে, আমাদের ধর্মজীবনে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাহা অবশ্যই ঘটিতে পারে, এ কথা স্মরণে রাখিয়া, আমাদের কত সাবধান হওয়া কর্তব্য। আমরা জীবন্ত ঐশ্বরের উপাসক, তিনি আমাদের ধর্মপথে পরম গুরু, পরম সহায়, পরম নেতা। তাঁহার পদাশ্রয় ভাল করিয়া গ্রহণ করিলে, তিনি যেমন আমাদের ধর্মপথে প্রয়োজনীয় শিক্ষক, সঙ্গী ও সহায় যোগাইয়া বাহিরের অভাব পূরণ করেন, তেমনি তিনি স্মরণ আমাদের অন্তরে দিব্য বল দান করেন, দিব্য আলোক ঢালিয়া দিব্য চক্ষু উন্মেষ করেন, দিব্য দর্শন দিয়া, দিব্যাবগী শ্রবণ করাইয়া আশা উৎসাহদানে সাধনমিষ্ট্রির পথে অগ্রসর করেন। ইহাতো আমাদের জীবনের অস্বাধিক পরীক্ষিত সত্য।

তাঁহার দিক দিয়া অন্তরে বাহিরে কোন ক্রটি নাই, ক্রটি হইতে পারে না, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য। ক্রটি যাহা কিছু হয়, আমাদের দিক দিয়া। ঐশ্বরের দিক হইতে আয়োজনের স্খু অভাব নাই তাল নহে, তাঁহার দিক হইতে আমাদের সম্মুখে স্বর্গ মর্ত্তের সব লইয়া বিপুল আয়োজন উপস্থিত। সঙ্গীতে ঘোষিত হইল, “অনন্তের মহাপূজায় অনন্ত আয়োজন।” এত আয়োজন সাধনপথে সাধক সাধিকাদিগের জন্য আর কোন যুগে উপস্থিত হইয়াছে ? তাই আমাদের বড় গুরুতর দায়িত্ব। ধর্মের বিপুল আয়োজন আমরা পাইয়াছি বটে, কিন্তু ধর্মের ক, খ, হইতে সাধন আমাদের প্রতিজনের অন্তর ক্ষেত্রে আরম্ভ করিতে হইবে ; সকল দর্শন শ্রবণ, ইচ্ছাপালন, আখিক জীবনের ক্রমিক গঠনলাভ, সকল সাধন ও শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নুতন করিয়া ফলাইয়া লইতে হইবে। ধারে কিছুই হইবে না, এইটাই আমাদের মৌলিক দায়িত্ব, ধর্মজীবনের গোড়ার কথা।

আমরা বলিদাম, আধ্যাত্মিক ধর্মের ক, খ, হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রত্যেক জীবনকে ক্রমাগত সত্যের পথে,

সাধনের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই মিরাকার চিন্ময়রাজ্যে সাধনের পথে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী-শ্রবণই আমাদের প্রত্যেক জীবনে প্রধান ও প্রথম উপায়। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণীশ্রবণ এই দুয়ের উপর, আমাদের ধর্মজীবনে বিশ্বাসের গঠন, ভক্তির উন্মেষ, জ্ঞানের উৎকর্ষ, যোগের সংকার ও ক্রমোন্নতি, কর্মের বল ও বিশুদ্ধতা সকলই নির্ভর করে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র Perception and hearing এই দুইকেই বিশ্বাসের মূলশক্তি ও ভিত্তিরূপে বর্ণনা করিলেন। বিশ্বাস আমাদের অন্ধবিশ্বাস নহে, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত দর্শনে, জীবন্ত উপলব্ধিতে, জীবন্ত বাণীশ্রবণে বর্ধনশীল জীবন্ত বিশ্বাস, অটল অটল বিশ্বাস। আমাদের প্রতিজনকে সত্য চিন্ময় ঈশ্বরের সত্য দর্শনের কথ, হইতে, সত্য চিন্ময় ঈশ্বরের সত্যবাণী-শ্রবণের কথ, হইতে আত্মিক ধর্মজীবন আরম্ভ করিতে হইবে। এখনও বঙ্গ ভারতের সাধনক্ষেত্রে, বিশেষ বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় মধ্যে, মূর্ত্তিপূজা অথবা বাহ্য মূর্ত্তির অবলম্বনে পূজাকে ধর্মজীবনের কথ, অথবা সাধনপথের কথ, বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। কিন্তু সর্বদা স্বরূপে রাখিতে হইবে, চিন্ময় সত্য ঈশ্বরের সত্য দর্শন এবং সত্যবাণীশ্রবণের আরম্ভিক কথ, হইতেই আমাদের আত্মিক ধর্মজীবনের আরম্ভ, এবং এই ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণীশ্রবণের ক্রমবিকাশে, তাঁহার সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয়, বিচিত্র পরিচয়, আত্মীয়তা-স্থাপন ও আত্মীয়তার বৃদ্ধি। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠ পরিণতি হইতেই, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্মের ক্রমবিকাশে, জীবনে শ্রেষ্ঠ সাধন ও উচ্চ সিদ্ধি লাভ হয়।

ঈশ্বর আছে, তাঁহার জীবন্ত সত্তার উপলব্ধিতেই আমাদের জীবনে তাঁহার দর্শনের আরম্ভ। বিধি-নিষেধ-যোগে তাঁহার শ্রীমুখের বাণী আমরা জীবনের সকল স্তরেই শুনিবার অধিকারী। কাহার জীবনে, কোন্ অবস্থার ভিতর দিয়া, প্রথমে তাঁহার কোন্ সত্যবাণী সমাগত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তাঁহার জীবন্ত, জীবনপ্রদ, শক্তিপ্রদ, অগ্নিময় সত্তার দর্শনপিপাসু সাধক-জন্মদেয়ে প্রকাশিত হইয়া, “আমি আছি” “আমি আছি” এই ধ্বনিতে যখন আশা ও উৎসাহপ্রদ আপনার বাণী তিনি প্রকাশ করেন, সাধকের আরম্ভিক জীবনে সে বাণীর গুরুত্ব গৌরব কে বর্ণনা করিবে? এই “আমি

আছি” ধ্বনি শুনিবার অধিকার সকলেরই। যথাসময়ে ঈশ্বর-দর্শনপিপাসু প্রতি সরল সাধকের অন্তরেই এই বাণীর ধ্বনি হইয়া থাকে। এই স্বর্গের দিব্যবাণী-যোগে ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণের সাক্ষাৎ সকলেরই অধিকার। সার্বভৌমিক সাধনপথের সার্বভৌমিক এই ফলস্রোত সকলের ভাগ্যেই সম্ভবপর। “তোমার ‘আমি আছি’ ধ্বনি, তুমি শুনাও জীবে দিন রজনী।”—ইহা কেবল করিবার শৃঙ্খল উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাক্য নয়, কিন্তু ইহা নিত্য-কালের সত্য বৈদ্যবাক্য। ইহা এই নবযুগে প্রতি সাধক-জীবনের অভিজ্ঞতার সত্য সাক্ষ্যদানে প্রকাশিত। প্রেরিত-প্রবর প্রতাপচন্দ্র তাঁহার আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা-পূর্ণ কথায় প্রকাশ করিতেছেন—“Yield thy whole nature to the sense of the Divine presence when it visits you; and believe me there is no man, sinner, mourner infidel or fool whom the spirit of God the veritable unspeakable presence, doth not at times visit and touch.”—যখন পরমর্দেব তোমার নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহার স্বর্গীয় সাক্ষাৎকার তোমাকে দান করেন, তখন তুমি তাঁহার বর্তমানতার উপলব্ধির মধ্যে আপনার প্রকৃতিকে চালিয়া দাও; বিশ্বাস কর, এমন কোন পাপী, সমস্ত এমন কোন আক্ষেপকারী, এমন কোন অবিশ্বাসী, এমন কোন নির্বোধ মানুষ জগতে নাই, যাহার নিকট ঈশ্বর পবিত্রাত্মারূপে সময়ে সময়ে প্রকাশিত না হন এবং তাহাকে আপনার দিব্য স্পর্শ দান না করেন।

এ যুগে সর্বধর্মসম্মতমতাদ্বারা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, “আমি গাপীর সন্দ্বার”, “কেশবচন্দ্র, সকলেব নিকট আশার চন্দ্র” “যাহা আমার জীবনে সম্ভব হইয়াছে, সকলের জীবনেই তাহা সম্ভব হইতে পারে”। ঈশ্বরের কৃপার সীমা নাই, সাধুমহাজনদিগের জীবনের জীবন্ত দৃষ্টান্তের অভাব নাই, অপরদিকে আমাদের দায়িত্বেরও শেষ নাই। তাঁহার সত্যদর্শন, সত্যবাণী-শ্রবণ, তাঁহার স্বর্গের ইচ্ছাপালন ক্রমাগত জীবনে সাধন করিতে হইবে, সাধনের পর সাধন করিয়া নব জীবন লাভ করিতে হইবে, অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনে অগ্রসর হইতে হইবে। প্রাচীন একটি কথা আছে, “মা লক্ষ্মী, দয়া করো, তুমি একটু লড়া চড়া”। এই ছোট কথাটির ভিতরে কি প্রকাণ্ড সত্য রহিয়াছে।



## ধর্মতত্ত্ব।

নববিধানের আলোক কবে জ্বলিল ?

• যদিও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী, ব্রহ্মসমিতির নব-বিধান-ঘোষণা হয়, কিন্তু নববিধানের আলোক নববিধানের প্রব-  
ন্ধক ব্রহ্মসমিতির ধর্মজীবনের আরম্ভ হইতেই তাঁহার স্বপ্নে জলিয়া  
ছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যা-  
পদে বৃত্ত ছিলেন, তখনই “ইণ্ডিয়ান মিরর” পত্রে লিখিয়াছিলেন,  
“এই যুগধর্ম ভারতের ভবিষ্যৎ ধর্ম ‘New Dispensation’ বা  
‘নববিধান’।” তখন হইতেই এই নববিধানের ভাব ক্রমে  
ক্রমে তাঁহার জীবনে ও সাধনে ক্ষুধা লাভ করিতেছিল। সুতরাং  
বাঁচারা ব্রহ্মসমাজকে ধর্ম করিবার চক্র বলিয়া বেড়ান, তিনি  
কোচবিহার বিবাহের অপরাধ ঢাকিবার জন্ত “নববিধান” ঘোষণা  
করিলেন, কিংবা বাঁচারা বলেন, পরমহংস রামকৃষ্ণের কাছে  
তিনি সমন্বয়ধর্ম শিখিয়া তাহাই নববিধান বলিয়া প্রচার করিলেন,  
তাঁহাদিগকে সত্যের অন্বেষণে, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের *Indian*  
*Mirror* পত্রের ফাইল খুঁজিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

### অস্পৃশ্যতা-বর্জন।

স্বপ্নের বিষয়, বর্তমান সময়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রেরণায় দেশে  
অস্পৃশ্যতা-বর্জনের চক্র বিশেষ ভাবে আন্দোলন হইতেছে। এই  
আন্দোলনের মূল অনুসন্ধান করিতে গিয়া, অনেকে কোন কোন  
দেশনেতার উদ্ভাবনী শক্তির উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদিগকেই ইহার  
প্রবর্তক বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন; কিন্তু যদি সত্যের অনুসন্ধান  
হইয়া আমরা অনুসন্ধান করি, তবে দেখি, জীবনের আচরণ দ্বারা  
নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্রই বর্তমান নবযুগে অস্পৃশ্যতা-নিবারণের  
প্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রবর্তক এবং চিন্তানারীদিগের মধ্যে তাঁহার  
সহদম্বিনী শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবী তাঁহার পদান সচায়।  
তিনিই চিন্তা পরিবার হইতে বাহির হইয়া কেশবচন্দ্র যখন  
“পিরানী” ঠাকুর পরিবারের শিষ্য অন্ন গ্রহণ করিলেন, তখন  
তাঁহার বালিকা সজিনীও গোড়া চিন্তা সেন পরিবারের কর্তাদিগের  
শত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিয়াছিলেন; এজন্য  
উভয়ে পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত ও জাতিচ্যুত হন। আবার  
কেশবচন্দ্রই প্রথম কোচবংশীয় কুচবিহারের মহারাজাকে  
কৃতজ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃকও পরিত্যক্ত হন। সুতরাং  
অস্পৃশ্যতা কাব্যতঃ বর্জন করিতে কে এত আত্মত্যাগ করিয়াছেন  
এবং কেই বা এমন উচ্চকণ্ঠে ইহার প্রতিষ্ঠা করিয়া বলিয়াছেন—  
“মেথরের সঙ্গে কেন আপনাকে সমান করিনা? উপকারী  
বন্ধুরা ছাড়াই উপস্থিত। উজ্জল চক্ষে মেথরের ভিতরে  
ঠাকুরকে দেখিব। বাঁচারা বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করে, তাঁহার

সামান্য নয়। যেমন মা বাপ উপকার করে, তেমনি চাকর  
চাকরাণী উপকার করে।” এমন উচ্চ শিক্ষা আর কে দিয়াছেন  
এবং এমন জাতিভেদের মূলে পদাঘাত করিতে কেই বা  
পারিয়াছেন?

### সতীর মহত্ব এত কেন ?

বৈরাগ্য-প্রণোদিত হইয়া ব্রহ্মসমাজ কেশবচন্দ্র নব পরিণীতা  
পত্নীর সহিত প্রথম বহুদিন পরিচিত হন নাই। এমন সময়  
ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত হইবার জন্ত তাঁহার ডাক  
আসিল। “সতীকে ধর্মমাচরেন?” এই ধর্মবাণী তাঁহার প্রাণে  
ধ্বনিত হইল। বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া  
তিনি আচার্য্যত্ব লইবেন? বালিকা পত্নীকে লিখিয়া  
পাঠাইলেন, “তুমি আমার সঙ্গে যাইবে কি, না?” একাদশ-  
বর্ষীয়া বালিকা অপরিচিত স্বামীর ডাক পরম স্বামীর ডাক বলিয়া  
অনুভব করিলেন, পরিবারের কর্তাদের তীব্র প্রতিবাদ, ধন, মান,  
শ্রীতি, কুল ও ঐশ্বর্য্যের সমুদয় প্রলোভন অবাধে তুচ্ছ করিয়া স্বামীর  
সহিত গৃহত্যাগিনী হইলেন। তখনকার কালে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা-  
দের ভিন্নজাতির অন্নগ্রহণে জাতিচ্যুত হওয়া যে কি বিষম পরীক্ষা,  
তথা এমন কে অনুভব করিবে? সেই ভীষণ ক্রমে আত্মদান  
বিনি করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কি সামান্য নারী? কোচ-  
বিহার বিবাহের অনশেও তিনি অগ্নিপরীক্ষা বহন করেন।  
তাঁহাতেই ব্রহ্মসমাজ তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম উদ্বাহ সমাধান করিয়া  
স্বীকার করিলেন, “আমরা দুজনে একজন হইলাম। বামে বামী,  
অস্তরের অভ্যন্তরে ভগবান, এই তিন জনে এক।”

### “ধর্ম-সাধন”।

(আচার্য্য ব্রহ্মসমিতির মন্ত্রের আলোচনা)

৪৫ সংখ্যা—১৫ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৫।

(গিরিধর ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমিতির উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্বাহ্নরুতি)

প্রশ্ন—আমরা ধর্মজীবনে যথার্থ উন্নতি দেখিতে পাই না  
কেন?

উত্তর—ইহার দুটি কারণ আছে। ভার-গ্রহণের ও ভার-  
প্রদানের অভাবের জন্ত আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সংগঠিত  
হইতে পারিতেছে না। এই ভারের আদান প্রদানের উপরেই  
ধর্মজীবনের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি নির্ভর করে।

প্র—আমরা ভারগ্রহণ কাহার করিব?

উ—ভারগ্রহণ নিজের জীবনের করিতে হইবে না, জ্ঞাতা  
ভগিনীর ভার লইতে হইবে। তাই ভগিনীর সেবা করিতে

আপনাকে বিশেষরূপে দায়ী মনে করিয়া, তাঁহাদের শরীর মন আত্মার মুখ ও উন্নতির জন্য যত্ন করাই ভারগ্রহণের প্রকৃত অর্থ।

প্র—আপনার জীবনের ভার কাহার উপরে অর্পণ করিব ?

উ—আমাদের জীবনের ভার আমরা নিজেও লইতে পারি না, আর কাহাকেও দিতে পারি না, তাহা একমাত্র ঈশ্বরেতে সমপিত হইবে। অনন্তগতি হইয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া, শরীর মন আত্মার কল্যাণের জন্য সকল সময়ে, সকল অবস্থাতে একমাত্র তাঁহার প্রতি নির্ভর করা অর্থাৎ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করাই ভারার্পণ।

প্র—আমরা কিরূপ ভাবে ভারগ্রহণ করিতে পারি ?

উ—আমাদের ভারগ্রহণের বিশেষ অভাব। দ্রাষ্টা ভগিনীর সেবার জন্য যে আমরা দায়ী, এই ভাবই আমাদের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয় নাই। আমাদের পিতা পরমেশ্বর সকল সম্বন্ধের ভার লইয়াছেন। পিতার স্বভাবকে আদর্শ করিয়াই আমাদের উন্নতি লাভ করিতে হইবে। দ্রাষ্টা ভগিনীর কিছু না কিছু ভার বহন করা পিতার আদেশ। ভারগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের দান আসে; ধর্মজগতে যিনি সাহায্য করিতে যান, তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন। কোন বন্ধু এক এক সময়ে এই অমূল্য সতীতি বলিয়াছেন যে, “ঈশ্বর অবিশ্রাম দান করেন, কিন্তু কাগড়ে বাঁধিলে আর কিছুই দেন না।” বাস্তবিক যিনি দান পাইয়া দান করেন না, পরে তাহার দান পাইবার পথ রুদ্ধ হয়। মহাত্মা গান্ধী এই উপদেশ যে, “হে জগতের পরিশ্রান্ত ভাণ্ডার্য পণ্ডিতগণ! আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দান করিব। কিন্তু আমি হইতে একটী সহজ ভার লইতে হইবে”। ভার বহন না করিলে শান্তি লাভ হয় না।

প্র—যে ভারটী প্রহণ করিলাম, তাহা ঈশ্বরপ্রতিপ্রেত কি না, তাণ কিরূপে জানিতে পারিব ?

উ—যে ভারটী প্রহণে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ভক্তি বাড়িবে ও তাহার নৈকট্য বোধ হইবে, তাহাই ঈশ্বরের অতিপ্রেত কার্য, তাহাতে নিশ্চয়ই কল্যাণ লাভ হইবে।

### ভক্তের দীনতা।

জগতে পরম সুন্দর কে? কাহার সৌন্দর্য্য-জ্যোতিঃ সমুদায় সৌন্দর্য্যকে পরাস্ত করে, কাহার মুখ পানে তাকাইলে চক্ষু পরিভ্রষ্ট ও প্রাণ শীতল হয়? সে ঈশ্বরের দীন ভক্ত। দেখ, তাহার দীনতাপূর্ণ মুখে কি সৌন্দর্য্যরাশি, কেমন পবিত্র জ্যোতিঃ, তাঁর কাতরতার মধ্যে কি লাবণ্য, অশ্রুধারার মধ্যে কেমন শোভা! তিনি যখন কন্ঠে অশ্রুগত করিতে করিতে দীনভাবে পিতার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন, তখন তাঁকে দেখিলে যে প্রাণ জুড়ায়, তাঁর চরণমূলি মাধুর্য করিতে যে ইচ্ছা হয়। পৃথিবীর সমুদায় সৌন্দর্য্য একত্র কর, ভক্তের সেই দীনতার সঙ্গে তুলনা হইবে না। কল্পনাতে কি

কেহ এমন সুন্দর ছবি চিত্র করিতে পারে, যে সেই দীন ভাইয়ের মুখের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে? কখনই না। তাঁর সেই হ্রিস মলিন বস্ত্র এবং সেই তিথারীর বেশের নিকটে রাজার নগ্নিময় ভূষণ পরিচ্ছদও কিছুই নয়। এমন হইতে পারে, তিনি অন্ধ, খঞ্জ বা কুজ বা ব্যাধিতকলেবর; অথবা এমন হইতে পারে, যে, তাঁহার বাহ্য আকৃতিতে কোনই মূল্য নাই। কিন্তু তথাপি দেখ, তাঁহার কেমন কাণ্ডি, তাঁর মুখের কেমন আকর্ষণ! কেন তাঁকে এত মনোহর দেখি, কেন তাঁকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁর কাছে কাছে থাকিতে কেন প্রাণ ব্যাকুল হয়? এমন দীনহীনকে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে সহস্র আবালবৃদ্ধ নরনারী কেন দৌড়িয়া আসে? সকলে মুগ্ধ অবাক হইয়া কি জন্য তাঁর মুখ নিরীক্ষণ করে? তাঁর মুখের একটা কথা শুনিয়া কেন লোকের চক্ষের জল বিগলিত হয়? এ কিসের আকর্ষণ? ইহার মধ্যে কি কোন পার্শ্ব কারণ বিস্তারমান? তাহা নয়। ভক্তের সেই মলিন বেশ ও দীনতার মধ্যে যে স্বর্গের লাবণ্য, তাহার মুখে যে পিতার প্রেমপূর্ণ জলন্ত মুখজ্যোতিঃ, চক্ষে পিতার পূণ্য দৃষ্টির আলোক পড়িয়া তাহাকে পরম মনোহর করিয়া তুলিয়াছে; তাঁর কথা যে পিতার প্রেম-নিকেতনের সংবাদ, এইজন্য তাঁহার এত আকর্ষণ।

আমি আর কিছুই চাহি না, ঐশ্বর্য্যের বাহ্যভূষণপূর্ণ ধনী মানীদিগকেও ইচ্ছা করি না, জ্ঞানীদিগকে চাহি না; সেই দীন ভাইদিগকে চাহি। আমি তাহাদের কথা শুনিব, তাহাদের কাছে থাকিব ও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পিতাকে ডাকিব; তাহাতেই আমার স্বর্গ, তার মধ্যেই আমার মুক্তি। আমি ধনী হইতে চাহিনা, সেই দীনতা চাই, যাঁহা ভক্তদিগের জীবনে প্রকাশ পায়। ধনমানের সৌন্দর্য্য নয়, চির জীবন দেখিব, দীনতার কি শোভা! আমি তাহারই সাধন করিব, তাহা পাইলেই আমি পিতাকে প্লাইব, পিতার প্রেমরাজ্য আমার হইবে। দূর হউক ধনমান প্রভু, দীনতা আমার জীবনের ভূষণ হউক, পৃথিবীর ধুলির সঙ্গে আমার সন্তক অবনত থাকুক। আমি পিতার প্লাইবারে দীন তিক্কু হইয়া যেন চিরজীবন থাকিতে পারি, তিনি এই আশীর্বাদ করুন।

“যে চায়, সেই পাই”।

ঈশ্বরকে কে পায়? যে চায়, সেই পায়। একথা সহসা শুনিতে যেমন সহজ বোধ হয়, আশার সঞ্চার হয়, তেমনি ইহার অভ্যস্তরে প্রবেশ করিয়া গভীর ভাবে দেখিতে হইলে যেন নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। যিনি বাক্য মনের অতীত, নিরাকার অনন্ত দেব, তাহাকে চাহিলেই পাওয়া যায়, এমন কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে? জানি পারেন? না; ধনী পারেন? না; ধনী, মানী, গুণী, জ্ঞানী, দরিদ্র মুখ রাজা নরনারী কেহই পারেন না। তবে কে পারেন? যিনি সরল সাধক, বিশ্বাসী ভক্ত, তিনি



পারেন। ঈশ্বরকে মুখে চাহিলে পাওয়া যায় না, মুখের চাওয়া চাঁপরা নয়; হৃদয়ের চাওয়া চাই। নতুবা মুখে চাহিবে, “হে ঈশ্বর! আমি কেবল তোমাকেই চাই, আর কিছু নাহি চাই”, হৃদয় অমনি ভিতর হইতে বলিয়া উঠিবে, “না, ঈশ্বর না, আমি কেবল তোমাকে চাই না, সংসারকেও চাই, সংসারের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে চাই। সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য তোমাকে চাই, নতুবা নয়। সংসারই আমার জীবনের লক্ষ্য, ভূমি তাহার উপায়। তোমাকে আমি সেই জন্য চাই, সাংসারিক সুখ যেন পাই। তোমাকে ভিন্ন যদি তা পাই, তাহা হইলে তোমাকে আর কি প্রয়োজন? তোমার জন্য সংসার নয়, সংসারের জন্য তোমাকে চাই।” এই ভাবে চাহিলে অন্তর্যামীকে পাওয়া যায় না। হৃদয়নাথ হৃদয় দেখেন। যার হৃদয় তাঁকে চায়, সেই তাঁকে পায়। সর্বত্রই হৃদয়ের অভাব বোধ হওয়া চাই। অভাব বোধ না হইলে ব্যাকুলতা উপস্থিত হয় না। ব্যাকুলতা না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা হয় না। প্রার্থনা যথার্থ না হইলে প্রার্থনার ফল লাভ হয় না। ঈশ্বরের দান প্রার্থনা-সাপেক্ষ নহে। আমরা যদি প্রার্থনা না করিলে তিনি না দিতেন, তাহা হইলে আমাদের নামও থাকিত না। তিনি উদার করুণার সকলি দিয়াছেন, কেবল প্রার্থনার অপেক্ষার আপনাকে আপনার হাতে রাখিয়াছেন। না চাহিলে সকলি দেন, কেবল আপনাকে দেন না। যেমন পিপাসাতুর জল বিনা প্রাণে বাঁচেনা, তেমনি ঈশ্বর বিনা যাহার প্রাণনাশ হয়, সেই চাইলে ঈশ্বরকে পায়। বে পণ্যস্ত শততা, কপটতা পরিত্যাগ করিয়া, হৃদয়বাহার খুলিয়া দিয়া, সরল অন্তরে ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরকে না চাহিব, সে পণ্যস্ত বলিতে পারি না, “যে চায়, সেই পায়।”

ঈশ্বরকে লাভ করিবার নিমন্ত্ৰণ আমাদের এই সংসারে আসা, আর কিছুই নয়। ধন উপার্জন করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা নয়; সাংসারিক অধিকৃতকর সুখ-ভোগই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহাও নয়; ইন্দ্রিয় সেবা করাই আমাদের জীবনের কার্য্য, তাহাও নয়। এই সমস্ত ঈশ্বরপ্রাপ্তির এক একটা উপায়। ঈশ্বরলাভই আমাদের সমস্ত জীবনের কার্য্য ও লক্ষ্য। রোগীর পক্ষে ঔষধ-সেবন যেমন রোগ-শান্তির উপায়, তেমনি ঈশ্বরলাভ জন্য সংসার। পীড়িত ব্যক্তির ঔষধ-সেবনই উদ্দেশ্য নহে, তেমনি সংসার ভোগ ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যেমন ঔষধ-সেবন রোগশান্তির জন্য প্রয়োজন, তেমনি সংসারার্থ্য পালন করা ঈশ্বরলাভের জন্য আবশ্যক। ঈশ্বর যদি সাংসারিক সুখ দেন, ভালই; ঈশ্বরের দান অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে তাহা উপভোগ করিব। ঈশ্বর যদি সংসারকে পরিত্যাগ করিতে বলেন, তৎক্ষণাৎ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিব। ঈশ্বরকে লইয়া ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল থাকিব। প্রাণ

দিয়া পরিত্যাগ লইব। যে সাধকের এইরূপ ভাব, পাপ তাঁহার সন্তাপদায়ক হয় না, তিনি পাপের সন্তাপক করেন। ছিদ্ৰাধেয়ী পাপ ঈশ্বরপ্রাপ্ত সাধকের অস্বঃকরণে প্রবিষ্ট হইবার পথ না পাইয়া দূর হইতেই পলায়ন করে। পাপ কোন্ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে? ইন্দ্রিয় ও সংসারাসক্তির স্তৌক্ষ বাণ দ্বারা যে হৃদয় সচ্ছিন্ন হইয়াছে। পাপাকার দূর করিয়া দিয়া, ঈশ্বরের জ্যোতিঃ সাধকের হৃদয় নিত্য আলোকময় করিয়া রাখে। বাঁচার চরিত্র পবিত্র হইয়াছে, মনে মুখে কাজে বাঁহার মিল হইয়াছে, সেই মহাত্মাই বলিতে পারেন, ‘ঈশ্বরকে যে চায়, সেই পায়’।

( ক্রমশঃ )

## শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী ।

( পূর্বাহ্নবৃত্তি )

শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী পুত্রকন্যা-শোকে অসহ্য হইয়া হৃদয়ের উজ্জ্বল এই সময় গিনিয়াছিলেন, “আমি কতই সুখে সুখী হইয়াছিলাম, ভগবান্ কতই অমূল্য নিধি দিয়াছিলেন। আমাকে যে সুখের দর দিয়াছিলেন, তাহার চারিটা পাথরের মত দেওয়াল এবং ছাদটা শক্ত, যাহা আমাকে আশ্রয় দিয়াছিল, সে ছাদও ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দুইটা দেওয়ালও খসিয়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। আমার শরীরের সকল শক্তিই যেন চলিয়া গিয়াছে। জানিনা, কেন এতদিন আমি বাঁচিয়া আছি। সে সুখের স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে। এখন যেন আমি অশ্রু এক জগতে বিচরণ করিতেছি। জীবনের স্রোতঃ তৎক্ষণাৎ পোকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া বাইতেছে। আমার এখন এই মাত্র সাধ, যেন শেষ কটা দিন আমার আত্মীয় স্বজনদের ও আমার নববিধানমণ্ডলীর সেবায় কাটাইয়া বাইতে পারি।”

তিনি অন্তরঃ গিনিয়াছেন, “মৃত্যু যেন পরলোকে যার আমার জন্য আরও একটু বেশী করিয়া খুলিয়া দিয়াছে, আমার প্রিয়জনরা যেন আরো একটু নিকটতর হইয়াছে।” যখন এ সব কথা লেখেন, তখনও তিনি মনে ভাবেন নাই, তাঁহার “প্রত্ননির্মিত গৃহের” আর একটি দেওয়ালও অচিরে ভূমিসাৎ হইয়া বাইবে।

যাহা হউক, তখনও তাঁহার কতই আশা, মেহের সন্তান নিতেসুনানারায়ণ দীর্ঘজীবী হইয়া, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, কোচবিহারে পিতৃদেবের আশাস্বরূপ রাজ্য পালন করিবেন এবং তাঁহার কীর্ত্তি সকল অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। মহারাজকুমার তিষ্ঠির বাবাও তাঁহার সহযোগী হইয়া, দুই সন্তোদরে রাজ্য পরিচালন

করিবেন, এই আশাতে তাঁহারও বিবাহ নবসংহিতানুসারে দিয়াছিলেন।

বাস্তবিক মহারানী ইন্দিরা দেবীর সাহচর্যে, শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথায়ণ যথার্থই পিতৃ-ভ্রাতৃ-বৎসল হইয়া, রাজ্যের সুশাসন ও পালনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রথম নবকুমারের জাতকস্মার্ত্তান নবসংহিতানুসারে এ দীন সেবক দ্বারা সম্পন্ন হয়, মহারানী মাতা সুনীতি দেবীও প্রার্থনা-যোগে কতই আশীর্বাদ করেন।

ইহার অনতিবিলম্বে কোন রাজকীর হৃৎটনাবশতঃ, নববিধান-সমাজের একনিষ্ঠ সেবক এবং সম্পাদক কুমার গজেন্দ্রনাথায়ণ সাহেবকে সপরিবারে রাজ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। তখন মহারাজকুমার ভিষ্ঠর বাবা সম্পাদকের কার্যভার লইয়া সমাজপরিচালনে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথায়ণের সমাপ্তিপ্রতিষ্ঠাকালে, কোন প্রচারক তথায় উপস্থিত না থাকায়, জিতেন্দ্রনাথায়ণ স্বয়ংই নবসংহিতার প্রার্থনা পাঠ করিয়া সমাধিতে ভস্মস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু জানি না, কি দৈব হুর্দ্বিপাকে মহারাজা জিতেন্দ্রনাথায়ণের নববিধানের প্রতি আস্থা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

মহারানী সুনীতি দেবীর মণ্ডলীর সেবা-স্পৃহা তখন হইতে বিশেষ ভাবে উদ্দীপিত হয়। যখন তিনি ১৯১৪সনে লক্ষ্মীয়ে নববিধানসংঘ উপলক্ষে সন্তানেন্দ্রীর পদে বৃত্ত হন, তখন হইতে তিনি কতই নূতন নূতন সঙ্গীত রচনা করিয়া এবং কতই নূতন নূতন চুটানের প্রবর্তন দ্বারা মণ্ডলীতে নব জাগরণ সঞ্চার করেন।

প্রাচীন পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক গল্প সকল কথকতা-চ্ছলে অভিভাষণ করা তাঁহার প্রচারের বিশেষ অঙ্গ ছিল। এমন সুললিত ভাষার ও স্বাভাবিক পৈতৃক মধুরকণ্ঠে যখন কথকতা করিতেন, শত সহস্র শ্রোতা মস্তকচিহ্নিত্তে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত। উপাসনা প্রার্থনাও বেশ মিষ্ট ও ভক্তিগদগদভাবে সম্পন্ন করিতেন। আর্গ্যানারীসমাজের উৎসবে প্রতি বৎসরই এক একটি সুন্দর উপদেশ দিতেন।

উৎসব-উপলক্ষে প্রতিবর্ষে কমলকুটীরের ছাদে ও নবদেবালয়ে নিশান-উত্তোলন, ঠিক নববর্ষের আরম্ভ-মুহুর্ত্তে রাজি ১২টা বাজিয়া মাত্র ঘড়ী ধরিয়া হয়; অতি নিষ্ঠার সহিত তিনি তাহা সম্পন্ন করাইতেন। উৎসবের নিশানবরণ ও নবদেবালয়ের দৈনন্দিন ফুল সাজান এবং অস্ত্রাশ্রয় পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি বাহ্যতে নিয়মিত নিষ্ঠার সহিত পবিত্রভাবে সম্পাদিত হয়, তাহার জগৎ তাঁর কতই আগ্রহ। তাই ফোঁটা ও বিশেষভাবে নববিধান-বোষণার সাধন-সঙ্গীত-দিন উপলক্ষে আনন্দমিলনে, আপনার সচোদর ভ্রাতাদিগের সঙ্গে মণ্ডলীত ভ্রাতৃগণকে চন্দনের ফোঁটা দিয়া ভ্রাতৃসন্তোষ করা মহারানী সুনীতি দেবীর এক বিশেষ সাধন ছিল।

লক্ষ্মী সংবের পর গিরিধি ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানও মহারানী সুনীতি দেবীর দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাহার পর

১৯১৫সালের মকোৎসব উপলক্ষে, মহারানী সুনীতি দেবী ও মহারানী সূচাক দেবী উভয়েই প্রকাশ্য ভাবে ব্রহ্মমন্দিরে সেবিকা-ব্রত যখন গ্রহণ করেন এবং সাশ্রু-লোচনে প্রার্থনা-যোগে প্রেরিত অভিভাবক ভক্তিভাজন “কাকাবাবু” কাশ্মিরচন্দ্র যখন তাঁহাদিগকে উপস্থিত করেন, তখনকার সে পবিত্র দৃশ্য যাহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাহাতে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আচাৰ্য্য ব্রহ্মানন্দ কোচবিহার-বিবাহের সময় দেবী সুনীতিকে বলিয়াছিলেন, “আমি রানী চাই না, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী”। মহারানীম্বরের সেবিকা-ব্রত-গ্রহণে ভক্ত পিতৃ-দেবের সেই অমুজ্জা কার্যতঃ সম্পাদিত হইতে দেখিয়া, কোন বিশ্বাসীরা প্রাণ না মুগ্ধ হইরাছিল? মহারানী হইয়া সেবিকা-ব্রতধারিণী ঈশ্বরের দাসী হইলেন, ইহা নববিধানের এক নূতন ব্যাপার। দেবী সুনীতি ইহাই তাঁর ঈশ্বরদত্ত ব্রত বিশ্বাস করিয়া, এতদনুসরণে সমস্ত শেব জীবন যাপন করেন।

নববিধানের ঈশ্বর এবং মণ্ডলীর সেবার এই ভাবে জীবন উৎসর্গ করিলেও, তাঁহার জীবনের পরীক্ষা তখনও শেষ হয় নাই। তাই বুঝি, তাঁর দ্বিতীয় অঞ্চলের নিধি, বৃদ্ধ বয়সের যষ্টি, ভবিষ্যৎ জীবনের আশা, কোচবিহারের রাজসিংহাসনে ব্রহ্মানন্দের পবিত্র রক্তবিন্দু মহারাজা শ্রীমৎ জিতেন্দ্রনাথায়ণকেও ভগবান্ অকালে তুলিয়া লইলেন। প্রথম মহারাজকুমার রাজরাজেন্দ্রনাথায়ণ যেমন পিতামাতার পরম আদরেত, মধ্যম মহারাজকুমার জিতেন্দ্রনাথায়ণও কম আদরের ছিলেন না। প্রথম বাজকুমারের জন্মে যেমন আনন্দোৎসব, দ্বিতীয় রাজকুমারের জন্মেও ততোধিক; কেন না, তিনি জন্ম গ্রহণ না করিলে, তরত বিরোধিগণের বড়বস্ত্রে, মহারাজা নৃপেন্দ্রনাথায়ণকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইতে হইত ও সুনীতিকে সপত্নীর স্বর্গে সহিতে হইত। তাই জিতেন্দ্রনাথায়ণের কত অধিক আদর। তাহার উপর রাজকাধার পরিচালন, শিক্ষার সচিত ইংরাজী পদ্যরচনা, গ্রন্থরচনা ইত্যাদি ও বৈদ্য সঙ্গলতান শিষ্টাচার দয়া দাক্ষিণ্যাদি কত গুণেই তিনি ভূষিত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়মন আদরের গুণধর পুত্রের পরলোকগমনে, বিশেষতঃ জিতেন্দ্রনাথায়ণ যে বিদ্রূষী পরমাত্মন্দরী বরোদারাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহার সহায়তায় রাজ্যের কতই কল্যাণ-সাধনে নিরত হইয়াছিলেন, সেই বধুও অকালে বিদবা হইলেন বলিয়া, এই শোককর ঘটনা যথার্থই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের তায় মহারানী সুনীতির প্রাণকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করিল। ইহার সঙ্গে তদীয় স্বয়ের বৈধব্য অর্থাৎ ময়ূরভজের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যু ও কুমার গজেন্দ্রনাথায়ণের মৃত্যু এবং পুত্র ভিষ্ঠরের পারিবারিক পরীক্ষা ও তাঁহার প্রথম পুত্র সন্তানের বিয়োগ মহারানী সুনীতির প্রাণের প্রত্যেক পঞ্জরাস্থি পর্য্যন্ত বেন চূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। অজ্ঞ কেহ হইলে, এত দূর পরীক্ষা বহন করিতে পারিত কিন্ন, জানি না। কিন্তু এ সকল সহ করিয়াও তিনি জীবন্ত বিশ্বাস

কখনও হারান নাই এবং তাঁহার গভীর বিদ্যাবিনিমিত্ত অধরে মধুর হাস্য কখনও পরিত্যাগ করে নাই।

(ক্রমশঃ)

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মল্লিক ।

## ব্রাহ্মিকাসমাজের উদ্দেশ্য ।

(শান্তিকুটীর, ১৮ই ভাদ্রয়ারী, ১৯৩৩)

শ্রীমদ্ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভারতাপ্রসঙ্গ, ১৯শে মার্চ, ১৮৭৪ সনে প্রদত্ত উপদেশ পাঠ ও স্থানস্থানে তাহার ব্যাখ্যানমূলের নিয়মিত ভাবে কথামূল্য বলা হয়।

ব্রাহ্মিকাসমাজ বঙ্গদেশে একটি প্রাণহীন মৃত অস্তিত্ব মাত্র নহে। ইহার যে জন্ত উদ্ভূত, তাহা স্বর্গে রাখা নিত্যত্ব প্রয়োজন। শ্রীমদাচার্য্যদেব যে জন্ত ইহা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করা ও ভাবিয়া দেখা একান্ত আবশ্যিক। তিনি স্বয়ং নানাস্থানে, নানা সময়ে, নানা উপলক্ষে তাহা বিশদ ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ভক্তিকাজন প্রদেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, উপদেশ ও কথাবর্তী প্রভৃতিতে তাহা প্রাঞ্জল ভাবে অনেকবার আলোচনা করিয়াছেন।

ব্রাহ্মিকাসমাজই তটক, আর সমগ্র ব্রাহ্মসমাজই তটক, উভয়ের উদ্দেশ্য একই। ব্রাহ্মসমাজ শিক্ষা দিতেছেন যে, আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মার উন্নতি। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জগতের সেবার নিযুক্ত হইতে হইবে, স্বার্থকে পরিত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থভাবে জগতের কার্য্য করিতে হইবে, অসংসার পরিচর্য্য করিয়া বিনয় অবলম্বন করিতে হইবে, চরিত্র নির্মাণ করিতে হইবে এবং নির্দিষ্ট কার্য্যে অবহেলা ভাগ করিতে হইবে। সর্বোপরি ভগবানে স্বেচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, প্রেম, ভক্তি, হৃদয়পরতা ও নিষ্ঠা সাধনপূর্ব্বক, ঈশ্বরের আদেশানুযায়ী জীবন যাপন করিয়া, আমাদের চিরবাসস্থান পরলোকের কল্য প্রাপ্ত হইবে; এবং ইহ সংসারে অবস্থানকালে, বিশ্বাসী পরিবার গঠনপূর্ব্বক, তাহারই মধ্যে সাধনের স্থান রচনা করিতে হইবে। এক কথায় “নববিধান-সাধন” করিতে হইবে।

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মিকাসমাজে যোগ দিবার মাত্র এক দিনেই কেহ সকল দোষ তটতে মুক্ত হইয়া, দেবতা হইয়া যাইতে পারেন না। আত্মার উন্নতির জন্ত নিরন্তর সাধন আবশ্যিক। অনবরত সাধন ব্যতিরেকে মনুষ্যচরিত্র গঠন হয় না। কতবার উত্থান পতনের মধ্য দিয়া মানুষের চরিত্র গড়ে। জগতে আসিয়া যদি চরিত্র শুদ্ধভাবে গঠিত না হইল, তদপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? এই চরিত্রগঠন-সাধন ব্রাহ্মিকাসমাজের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। নচেৎ বঙ্গদেশে একদিন সকলে মিলিত

হইয়া, উপাসনাদি করিয়া নিরম রক্ষা করা ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য একরূপ একত্রে মিলনে অনেক উপকার আছে বটে, কিন্তু আত্মার প্রধান উদ্দেশ্য ভুলিলে চলিবে না। চরিত্র-সাধনই একটি প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা স্বয়ং রাখিতে হইবে। অপর প্রধান সাধন—ঈশ্বরের দিকে চক্ষু রাখিয়া, তাঁহার আদেশানুযায়ী হইয়া কার্য্য করা। মনুষ্যমতের উপর নির্ভর না করিয়া, আলোকের নিমিত্ত নিরন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা। মনুষ্য আমাদের সর্ববিষয়ে পথপ্রদর্শক হইতে পারে না। এমন যদি কেহ থাকেন, যাহার উপর সকল বিষয়েই নির্ভর করা যায়, তিনি ভগবানই। যে সাধন অবলম্বন করিলে মানুষ সেই উপায়ের আলোক পাইতে পারে, সেই সাধনও ব্রাহ্মিকাসমাজের অন্ততম উদ্দেশ্য। নববিধানপ্রণী নরনারী ঈশ্বর ভিন্ন অন্যদিকে তাকাইতে পারেন না। ইহকাল অপেক্ষা পরকালের সঙ্গেই তাঁহাদের সম্পর্ক বেশী। ইহকাল সেই পরকালে প্রবেশের শিক্ষা-ভূমি। ইহকাল অন্তরিকে বড়ই বিপদস্থল। “এ সংসার বড় বিষম ঠাই।” সাধ্য কি, মানুষ নিজ বলে সেই বিপদ-রাশির মধ্যে নিরীক্রে বাস করিতে পারে বা তাহাদের তীব্র দংশন সহ করিয়া উঠিতে পারে? একমাত্র ভগবানের কৃপা অবলম্বন ভিন্ন তাহাদের হস্ত হইতে পৃথক হইতে পারে না। ভগবানের কৃপা-বলেই মানুষ এ সংসারের দুঃখ কষ্ট শোক তাপের জ্বালায় স্থির থাকিতে পারে। এই যে সব দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি, তাহাও সেই ভগবানের লীলার বিধিতেই উপস্থিত হয়। তিনি চান, তাহার ভিতরে পড়িয়াও, মানুষ তাহার চক্ষু ভগবানের দিকেই রাখে, অনেকেই দুঃখ কষ্টেতে অভিভূত হইয়া পড়েন; এমন কি, ঈশ্বরে বিশ্বাস পলায় চারাইয়া ফেলেন। শেষে পথভ্রষ্ট হইয়া নানা দুর্দশায় পড়েন। কিন্তু ভগবানের দানস্বরূপে দুঃখ কষ্ট আইসে, তাহা ভুলিয়া যান।

মানবসমাজের এইরূপ দৃশ্য যখন সীমা অতিক্রম করে, তখনই বিধির ক্রপায় নব নব বিধান জগতে অবতীর্ণ হয়। আমরা সুসময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমাদের জন্ত যুগধর্ম নববিধান আসিয়াছেন। জগতের দুঃখ কষ্টের জ্বালা হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় নববিধানের আশ্রয়গ্রহণ। যাহারা এই দুর্গে আশ্রয় লইয়াছেন, তাহারা নিরাপদ স্থান অধিকার করিয়াছেন। এই নববিধানপথের পথিক এই নববিধানরূপ অমৃতের খনির সুমিষ্ট রসের আবাদন পাইয়া, অত্র সকল কিছু ভুলিয়া যান। এমন কি, সংসারের দুঃখ কষ্টেও তাঁহাদের প্রাণের শান্তি চলিয়া যায় না। বতই দুঃখ কষ্টে রোগ শোক তাপ ভীত হইতে থাকে, ততই তাঁহাদের প্রাণে বিশ্বাসের অগ্নি প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। ততই তাঁহারা ভগবচ্চরণ আরো দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরেন। তাঁহাদের নিকট ঐ চরণতুল্যা মিষ্ট আর কিছুই নাই। তাহারা উহা ছাড়িতে পারেন না, ছাড়িবার সাধ্য তাঁহাদের থাকে না। সমস্ত জগৎ তাঁহাদের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইলেও তাঁহাদের ক্রক্ষেপ নাই। নববিধানের দেবতা অনন্তমার্ধ্যবরী, সুখশান্তিদায়িনী, ক্ষেমকরী, জগজ্জননী যে সমুখে বর্তমান। তাঁহারা যে দিবাক্ষে তাঁহাকে দেখিতেছেন ও তাঁহারা তাঁহারই পত্র কড়া ইহা স্পষ্ট বুঝিতেছেন। তাঁহারা অল্প কাগরও আর ভয় রাখেন না। কেহই তাঁহাদিগকে আর পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। যে পথ ধরিলে মানুষকে নববিধানের মধুর রস আশ্বাদন করিতে সমর্থ করে, নারীদিগকে সেই পথ প্রদর্শন করিবার জন্যে ব্রাহ্মিকাসমাজের অভ্যুদয়। ব্রাহ্মিকাসমাজ সঙ্কুচিত অবিশ্বাসিনীদের সমাজ নহে। ভগবানের অস্তিত্ব, ব্রাহ্মিকাসমাজ চেষ্টাতে ক্রমাগত বিশ্বাসিনীর দল—স্বার্থপরতা-বিহীন। কুটিলতাবিহীন, সেবাপরায়ণ, ভক্তিমতী, সাধন-পরায়ণ, সরলা, কোমলহৃদয়া, দ্রোহশীলা, মাতৃভাবসম্পন্ন, দয়াদ্রুদয়া, শীলতা-শোভিতা, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসিনী, বিধান-বিশ্বাসিনী সেবিকার দল বাতির ওয়। ভয়গণ, কড়াগণ, চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মিকাসমাজের এই প্রধান উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে কি, না। নহিলে যাহাতে হয়, সে কড়া বক্রপরিকর হইতে হইবে, এবং তাহা অতিশয় দৃঢ়পণের সঙ্গে করিতে হইবে, কারণ আজকাল সময় বড়ই মন্দ। চারিদিকে নিরীশ্বর-ভার, সাংসারিকভার, নীতিহীনতার জঘন্য বিষাক্ত হাওয়ার ঝড় বহিতেছে। সকল সং উদ্দেশ্যের তরু তাহাতে নিস্তেজ ও মৃত-প্রায় হইয়া পড়িতেছে।

এই বিষমোক্তকে রোধ করিতে হইবে, প্রবলভাবে বাধা দিতে হইবে। ব্রাহ্মিকাসমাজকে যথার্থ ব্রাহ্মিকাসমাজ হইতে হইলে, এই নিরীশ্বর উত্তপ্ত মরুভূমির সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে নামিতে হইবে। তাঁহাদের দেখিতে চাইবে যে, মণ্ডলীর কঠোরা জঁখরে বিশ্বাস চারাইতেছেন কি না—তাঁহাদের নীতিজ্ঞান শিথিল হইতেছে কি না—তাঁহারা জাতীয় ভাব চারাইতেছেন কি না—তাঁহারা কোমলতা-বিচ্যুত হইতেছেন কি না—স্বকোমল নারীরা কঠোর পুরুষতাবাপন্ন হইতেছেন কি না—তাঁহারা অস্বাভাবিক ভাবগ্রস্ত হইতেছেন কি না।

শ্রদ্ধেয় আচার্য্যাদেব এই কথাই ব্রাহ্মিকাদিগকে পঠিত উপদেশে বলিয়াছেন। ভগবান্ কল্পন, নারীগণ এই তুমুল যুদ্ধে মা করালী শক্তিরূপার আশীর্ব্বাদে জয়যুক্ত হউন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

## আর্য্যনারীসমাজের উৎসব।

( ১৩ই মাঘ, কমলকুটীরে, মাননীয়া মহারাজী সূচাক্ষর দেবীর আরাধনা ও প্রার্থনা )

আজ আমরা সর্ব্বসর পরে আর্য্যনারীসমাজের উৎসবে মিলিত হোলাম। আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, আমরা তক্তের

নববিধানের আশ্রয় পেয়েছি। শোক হুঃখ ভুলে, মা, তোমার চরণতলে বসে, পরলোকস্থ প্রাণপ্রিয়জনদের হৃদয়ের মধ্যে দখলি। আজ আমাদের পূজনীয় ভগীর আসন শূন্য, তাঁর সুমিষ্ট উপদেশ আর আর্য্যনারীসমাজের উৎসবে শুন্তে পাবো না; কিন্তু তিনি অন্তরের মধ্যে রয়েছেন। তাঁর আশ্রয় আমাদের সঙ্গে মিলিত। এই মিলনের আর বিচ্ছেদ নাই। মা, তোমার তক্ত সন্তানেরা তোমার ডাকলে তো তুমি দেখা দাও; আর বারা হোমাকে ডাকে না, তোমা থেকে দূরে থাকে, তাদেরও কাছে ছুটে এসে, সুযোগ পেলেই তাদের মন অধিকার কর। হুঃখী সন্তান, বাদের কোন যোগ্যতা নেই, তাদের তুমি ফেলে দাও না; তাদের অন্তরে এসে তোমার মধুররূপে ভুলিয়ে, মধুর স্পর্শ দিয়ে সকল বেদনা দূর করে দাও। মা, তুমি এত শুলভ, সহজ হয়েছ, তাই তোমার আদর কোরতে পারি নি। বিনা সাধনে, মনের ভিতর এমন রত্ন পেয়েছি, তাই তার মূল্য বুঝি নি। মা, তুমি বোলছো, হুঃখের বোকা ফেলে দিয়ে আনন্দধামের যাত্রী হোতে।

হে চির সত্য! তোমার কত রূপ, কত বেশ—তোমার প্রকাশ আজ দেখি ভাল করে। তুমি অনিমেব স্নেহদৃষ্টিতে দেখছো। তুমি কাকেও ফেলতে পার না। যেমন ক্ষুদ্র তোমার বিচার, তেমনি পরিভ্রাণের জন্য আমাদের উপায়, মন্ত্র বলে দাও। তুমি নিরত বোলছো, প্রার্থনা বিফল হবে না। যদি আকুলপ্রাণে তোমার ডাকি, তোমার কাছে যদি নীরবে প্রাণ পৌছিয়ে দিই, তুমি তার উত্তর দাও। প্রতিজ্ঞনের প্রাণের অভাব, বেদনা খুঁজে তুমি মোচন কর। কত সময় তোমায় ভুলি, অস্বীকার করি, কিন্তু তুমি কণেকের জন্য আমাদের ভোলো না। কত শুভ মুহূর্ত্ত আসে, তার ভিতর তোমার মধুর ডাক শুন্তে পাই—যদি চক্ষু খুলি, হৃদয়বার খুলি, তবে তোমায় দেখি, হৃদয়ে পাই। আবার যখন দেবত্ব হারিয়ে পশু হয়ে যাই, তখন জীবন্তরূপ ধরে' জলন্ত বাণীতে প্রাণে চেতনা এনে দাও। তোমার অনন্ত ডাকতো দূরায় না। আজ আর্য্যনারীসমাজের উৎসবে, ভগীরূপ সকলে তোমার চরণতলে মিলেছি। প্রাণের ভিতর তোমার সুমিষ্ট স্বর শুনাও, সব অভাবচলে যাবে। অনন্তের সন্তান আমরা—যদিও অযোগ্য, তবু তোমার অমৃতের অধিকারী। আজ সকল হুঃখ, রোগ, শোক ভুলে যাবার জন্য, তোমার হাতের নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। আমরা চিন্ময়ী নিরাকার জননীর সন্তান; এ শুধু কল্পনা নয়। কেবল মা মা বলে ডাকতে পারলে সকল অভাব হুঃখ মোচন হবে—সাধনার দরকার হবে না। শিশু জামে কেমন করে মাকে ডাকতে হয়, তাব সাধনার প্রয়োজন হয় না। সকল অবস্থায়, সুখে হুঃখে, বিপদে সম্পদে মা বলে তোমার কাছে ছুটে আসবার অধিকার দিয়েছ। যে যে ভাবে ডাকুক,—তাকে সাড়া দাও। ডাক শুনে নীরব থাকতে পার না। যে তোমায় ডাকে না, তারও প্রাণে দেখা দাও। মা, আজ এ উৎসবে যোগদান যেন রূখা না হয়। তুমি অদ্বিতীয় দেবতা, মহাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছ।

আমরা এই অনন্ত দেবতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎময়। এত ক্ষুদ্র ছোট, তবু আমরা তোমার বিধানে পরিচিত। তুমি বিশ্বজননী হয়ে এক প্রকাণ্ড বিশ্বপরিবার রচনা করেছ। তোমার উপর যদি এ জীবনের তার দিতে পারি, তবে এ জীবন বার্থ হবে না। মা, তোমার পুণের জ্যোতিতে আমাদের পাপকলঙ্কিত জীবনকে স্পর্শ করে, পুণ্যময় জীবন করে দাও। মা, তুমি যেথায় সমুখে পুণ্যময়, তার তিতর ডুবতে হবে, সব মরলা পাপ ধূয়ে শুদ্ধ হতে হবে। আমরা বংশ কুল, পিতামাতার নষ্ট তুলে, আত্মকিয়তিতে জীবন কাটাচ্ছি। তুমি চেতনা এনে দাও। শোকের আঘাত দিয়ে তোমার কাছে টেনে নাও, প্রাণের জিনিস কেড়ে নিয়ে তোমার দিকে মন আকৃষ্ট কর। তোমার মঙ্গল উচ্চা পূর্ণ হউক। দুঃখ না পেলে সুখ এত মধুর হোত না। না কঁাদলে, হাসির মূল্য আমরা বুঝি না। মা, দেখাও আমাদের তোমার স্বর্গের ছবি, যাঁহা আমরা আমাদের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলনের স্থান। তোমার আনন্দময় রূপের হাসি আমাদের অশ্রুস্রুত কোচ্ছে। আজ, বিচ্ছেদ বেদনা সব ভুলে বাই, অশ্রুগারা মুছিয়ে দাও। তোমার অমৃত স্পর্শে মৃত দেহ মন সঞ্জীবিত কর। শূন্যমনকে তোমাতে পূর্ণ কর। তোমার আজ প্রাণতরে মা বলে ডাকি। তুমি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার চরণে সকল ভয়ী মিলে বার বার প্রণিপাত করি।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ধ্যানরাজ্যে তাঁর মধুময় প্রকাশ দেখে খুশি হই।

উৎসবের দেবতা আজ স্বর্গের সিংহাসন ততে নেমে এসেছেন, ক্ষুদ্র জনের সিংহাসনে। প্রতি ভয়ীর প্রাণের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন। শোকের প্রহারে আজ প্রাণের তিতর একটা দিক ভেঙ্গে গিয়েছে। আজ আবার উঠে এসে এ উৎসবে যোগ দিতে পারবো, ভাবি নি। মঙ্গলময়ী জননী, তুমি যে নিয়ত সত্যানের মঙ্গল সাধন কোচ্ছ, তবে আর কেন আমরা কঁাদবো। তোমার হাতের দান তুমি দাও, আবার তুমিই তুলে নিয়ে যাও ভালর জন্তে। যদি সুখের অন্ন পেতে পারি, তবে দুঃখের অন্নও অনুত বলে মিলিত হবে। তোমার সান্ত্বনা-বাণী শুনাও, সকল বোকা বহন করবার ক্ষমতা দাও। কত তোমার গীতা অভিনয়। চির মঙ্গলময়ী মা, তুমি হাসাও কঁাদাও, ভাঙ্গ গড়, সব তোমার হাতের দান। আমাদের প্রতিজনকে নতুন ব্রতে ব্রতী কর। সত্যীর প্রার্থনার এই শুনলাম যে, নববিধানের আলোকে পুরাকালের ধর্ম মেশানো। যখন জীবনটা নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন তোমার অনন্ত আশার ছবি দেখাও। মুখে আজ আর কি চাইব, মা, তোমার কাছে, সবই তো তুমি জান। যখন ডাক আসবে, তখন হাসিমুখে যেন যেতে পারি। হোলামই বা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শক্তি মিলিত হলে একখানি মণিশক্তি হবে। ভয়ীর সুন্দর প্রবন্ধ শুনলাম, আমরা সকলে মিলিত হয়ে এ জগতে তোমার কাজ করবার লজ্ঞ এসেছি। যদি পরম্পরের উপকার করি, একমনে

জগতের সেবা করি—তবেই আমাদের মঙ্গল, দেশের ও জাতির উন্নতি, মঙ্গল হয়। মা, তোমার মঙ্গল স্পর্শাশীর্ষাদ আজ দাও। যে ভয়ী আজ স্বর্গে, তাঁর সুন্দর উপদেশ, মাতৃদেবীর আশীর্ষাদ, ব্রহ্মানন্দের আশার বাণী আমাদের জীবনকে উপযুক্ত করে অমুপ্রাপিত করুক। নিরাশ হব না, যদি তাঁদের শক্তি প্রত্যেক আমাদের মনকে জীবিত থাকে। উৎসবের দিনে আজ, মা, সকলকে তোমার মঙ্গল আশীর্ষাদ দাও। সব দুঃখ আজ দূর হয়ে যাক, আজ পূর্ণ মিলনের ছবি দেখি। অমৃতে পূর্ণ মন নিয়ে ফিরে যাব। উৎসবান্তে তোমার মঙ্গলময় ইচ্ছা আমাদের সকলে মিলে বার বার প্রণিপাত করি।

ঐশ্বর্যলতা দত্ত।

## আর্থানারীসমাজের কার্যবিবরণ।

পরমজননীর রূপায় আর্থানারীসমাজের আর একবৎসর বয়োবৃদ্ধি হইল। চতুঃপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে ঐমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ দেব নারীগণের হিতকমে আর্থানারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। এতদিন তাঁহার প্রতিনিধিরূপে যিনি উৎসাহ, দয়া ও বক্র দ্বারা ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন, আমাদের প্রকোষে স্নেহময়ী ভগিনী মহারানী সুনীতি দেবী পরমজননীর আচ্ছাদনে পরলোকধামে চলিয়া গিয়াছেন। যিনি সর্বদা ইহার মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, প্রবাসবাসকালেও ইহার সহিত নিত্যযোগ রাখিয়া ইহাকে দয়া ও অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন, যিনি উৎসবে অধিবেশনে উপদেশ ও প্রার্থনা দ্বারা ইহাকে নতুন জীবন দান করিয়াছিলেন, সেই সত্যী কন্ঠার অভাবে সমিতি শোকে মুহমান। আজ সমিতির সভাগণের কাতর অন্তর হইতে সেট মহানু আশ্রয় উদ্দেশে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উদ্ভিত হইতেছে। যে লোকে অন্ধকার নিরাশা রোগ শোক বিচ্ছেদ নাই, সেই পরমলোক গতে তিনি আশীর্ষাদ করেন, এই সমিতির মঙ্গল হউক, দিন দিন সতেজ ও উন্নত হউক।

গত বৎসর মহারানী সুনীতি দেবী প্রবাস হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, তাঁহার গৃহে মহাসমারোহে আর্থানারীসমাজের অধিবেশন ও তৎপরে প্রীতিভোজে সকলকে পরিভূষ্ট করিয়াছিলেন। গত বৎসর সাধবৎসরিক উৎসবে তাঁহার উৎসাহপূর্ণ স্বাভাবিক স্মৃষ্টি ও তেজোময় উপাসনা ভয়ীগণের প্রাণে চিরমুদ্রিত থাকিবে। গত সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের মাননীয় প্রিয়তমা ভয়ী ঐশ্বরী মাধবী দেবী, ঐমদাচার্য্যদেবের দ্বিতীয় কন্ঠা সমিতির আসন শূন্য করিয়া পরমমাতার অনুতনিকতনে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন প্রকৃত আর্থানারীসমাজের জীবন ছিল। তিনি সদাচার্য্য, পতিব্রতা, হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন ছিলেন; তাঁহার চরিত্র আমাদের দৃষ্টান্ত ছিল। আজ তাঁহাকে হারা ইয়া আর্থানারীসমাজ শোকের অশ্রুপাত করিতেছেন। তিনি আত্মবল পরমার্থ্য পিতৃদেবের



আদর্শ সমুখে রাখিয়া, জীবনের শত পরীক্ষা জয় করিয়াছিলেন। সমাজস্থ আর একটি ভগিনীও আমাদের কাঁদাইয়া অসময়ে স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন। স্বৈচ্ছিক ভগিনী শ্রীমতী সুনীতি রায় অরাস্য জীবনে নববিধানের আদর্শ সাধন করিয়া পরম জননীর আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। সুনীতি আমাদের অতি আদরের ও স্নেহের পাত্রী। তাঁহার জীবন আমাদের সমুখে দৃষ্টান্তস্থল হইয়া চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

গত বৎসর সম্পাদিকার অমৃততার জন্য নিয়মিত অধিবেশন হয় নাই। প্রার্থনা করি, এ বৎসর সেই পরমজননীর আশীর্বাদ ও পরলোকগতা প্রিয়তমা ভগ্নী সুনীতি দেবীর উৎসাহের ভাব হৃদয়ে ধারণপূর্বক, এই সমাজের কার্য সকলে করিতে পারিবে। এখন সভ্যগণের নিকট বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা উৎসাহ ও দয়া দ্বারা এই সমিতির মঙ্গল সাধন করিয়া আমাদের কৃতার্থ করুন। যে সকল ভগ্নী এই সমিতির জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন, উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীতাদি ও অর্থ দ্বারা সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সমিতি চিরঞ্জয়ী। মাননীয় ভগ্নী শ্রীমতী মহারানী সূচাক দেবী তাঁহার হৃদয়ের স্নেহ, উৎসাহ ও দয়া দ্বারা ইত্যাক কতরূপে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকট সমিতি বিশেষরূপে ধন্য। শ্রীমতী সরলা দাস বহুদিন ধরিয়া বহু পরিশ্রম করিয়া সম্পাদিকার কার্য করিয়া আশাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পরম জননী তাঁহার স্নেহস্পর্শে সকলকে আশীর্বাদ করিবেন। গত বৎসরের আর ও বায়ের হিসাবের তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল।

আয় :—

শ্রীমতী মহারানী সুনীতি দেবীর

চাঁদা জামুয়ারী হইতে নবেম্বর

অর্থ—২৬৪৮

অল্প চাঁদা জামুয়ারী হইতে

ডিসেম্বর অর্থ—৬২১০

মোট— ৩২৬৯৮

হাতে জমা ৩১ টাকা।

ব্যয়কে জমা ১২৬ টাকা।

ব্যয় :—

জামুয়ারী হইতে ডিসেম্বর

অর্থ দাতব্য—২১২৫০

দরোয়ানের বাহিনা—৩৬৮

বিপদা আশ্রম— ১৫

গাড়ীভাড়া— ১২৮

মনি অর্ডার— ৪৮

প্রেস, খাতা বাঁধানো

ও পোষ্টকার্ড—১৫১৮

শ্রীমদিকা দেবী।

## সংবাদ।

নামকরণ—গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৮২ লোয়ার সাকুলার রোডে, ডাঃ অমরেন্দ্রনাথ বসুর দ্বিতীয় শিশু কন্ডার স্তন্যদানকরণ অমৃতানে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন ও শিশুকে “নন্দিতা” নাম প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাঁহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ৩নং রায় ষ্ট্রীটে অমরগড়ী-নিবাসী, মারোয়াড়ী হাসপাতালের ডাঃ রায় সাহেব প্রবোধচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কলদশীর শ্রীমান্ প্রশান্তকুমারের সহিত, শ্রীমতী-দ্বিবাসী শ্রীযুক্ত রাধামাধব রায়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী গীতার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যীশচন্দ্র রায় উপাসনা ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দাসগুপ্ত পৌরোহিত্যের কার্য করেন। ভগবান্ নবম্পতিক শুভাশীষ দান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার, সন্ধ্যা কালে, লাহিড়িয়াগরাই শ্রীমতী গিরবালা ঘোষের “বিনয়ভূষণ বালিকাবিদ্যালয়” গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীমতী নিখিলা বহু উপাসনার কার্য করেন, কল্যাণীয়া সূরমা দত্ত সঙ্গীত করেন। স্থানীয় মহিলাসমিতির অনেকগুলি মহিলা যোগদান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, কয়েকটি মহিলা স্বর্গীয় ভক্ত কুবেরের হিন্দি সঙ্গীত শিখিবার চেষ্টা করেন। ভক্তের সঙ্গীত-গুলির প্রতি অনেকের শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে দেখা গেল।

কৃতজ্ঞতা-দান—শ্রীব্রজানন্দাশ্রমের সেবিকা হেমন্তকুমারী মল্লিক বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া ভগ্নীর বাড়ীতে শয্যাশায়ী হন। ভগ্নীর সেবায় ও কবিরাজের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করিয়া আশ্রমে পুনরায় গমন করিলে, ঈশ্বরের করুণায় গতে ৬ই মার্চ আশ্রম-দেওয়ানে কৃতজ্ঞতাদানসূচক বিশেষ উপাসনা হয়। যাহারা সেবা, চিকিৎসা ও সাণ্ডাযাদান করিয়াছেন, সকলকার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া কৃতজ্ঞতা দান করা হয়। তাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও দেবিকা প্রাণগত প্রার্থনা করেন।

পারলৌকিক—আমরা সমুদ্রতটে প্রকাশ করিতেছি, স্বর্গীয় ক্ষীরোদচন্দ্র সিংহের পত্নী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী গত ১১ই ফেব্রুয়ারী, বর্ধমান জেলার আবুলহাটী গ্রামে তাঁহার পিতৃভবনে দেহমুক্ত হইয়া মাতৃকোড়ে আরোহণ করিয়াছেন। ইনি বেশ নিষ্ঠাবতী সন্তানবৎসলা ও স্নগৃহিণী ছিলেন। পুত্রস্বর শ্রীমান্ সত্যীশচন্দ্র ও ক্রীতীশচন্দ্র সিংহ নবসংহিতাসুমায়ে গত ১০ই মার্চ, তাঁহাদের ৯নং ঠার লেন ভবনে, শ্রাদ্ধসম্পাদন করেন। তাই শ্রিয়নাথ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য করেন। সামুজ্জ শ্রীমান্ সত্যীশচন্দ্র প্রধান শোককারীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমান্ ক্রীতীশচন্দ্র কলিকাতা নববিধান-প্রচারকদিগের সেবার্থে ২৮, পুরীর সার্কজননীন নববিধান প্রতিষ্ঠানে ২৮ ও শ্রীব্রজানন্দাশ্রমে ১৮ দান উৎসর্গ করিয়াছেন।

গত ১লা মার্চ, ৬৫১১ হারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে, তাঁহার শ্যালক স্বর্গীয় বসন্তকুমার চৌধুরীর আদ্যাশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন, তাই অক্ষয়কুমার লখ শাস্ত্রাণ্ডি পাঠ করেন। পুত্র শ্রীমান্ সুরকুমার নবসংহিতার প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২৮, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৮ ও সাধনাপ্রমে ২৮ টাকা দান করা হইয়াছে।



ভগবান্ পরলোকস্থ আত্মার কল্যাণ করুন এবং শোকাক্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সাধনা বিধান করুন।

সেবা—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পুরীতে গিয়া, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী, নবপূর্ণকুটীরে সামাজিক উপাসনা, ১৪ই ফেব্রুয়ারী কটকে গিয়া মধুভবনে সন্ধ্যার বিশেষ উপাসনা, ৫ই মার্চ, চাণ্ডা ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ উপাসনা করেন। ৯ই মার্চ, নিমজ্জনাস্থান সাহেড়াগ্রামে কন্ডার সমাধিতীর্থে উপাসনা ও “গঙ্গানারায়ণ-নবশিষ্টপাঠশালায়” বালকবালিকাদিগকে নীতি উপদেশ দেন।

স্মৃতি-সভা—গত ৮ই জামুয়ারী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণ দিনে, শান্তিপুরে, রামনগর বালিকাবিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে, শ্রীযুক্ত বলিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস পঞ্চ পাঠ করেন, শ্রীযুক্ত বিশ্বমোহন সায়াল, শ্রীযুক্ত নবীনীমোহন সায়াল, শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রমোহন গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বাণীকর্ষ, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

সাহসংসরিক—১২ই জামুয়ারী, ৪৭।১ হাজরা রোডে, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেবের সাহসংসরিকে, ২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১০নং আলিপুর নিউরোডে, শ্রীযুক্ত ক্ষোত্রনাথ সেনের মাতৃদেবীর সাহসংসরিকে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

গত ৩১শে জামুয়ারী, শ্রদ্ধের ভাই রামচন্দ্র সিংহের স্বস্ত্রী তাকুরাণীর স্বর্গদিন, ১লা ফেব্রুয়ারী স্বর্গীয় সাধক রাজমোহন বসুর কন্যা শ্রীমতী কুণ্ডনকুমারীর সাহসংসরিক দিন স্বরণে নবদেবালয়ে এবং ১৪শে ফেব্রুয়ারী, স্বর্গীয় লোকনাথ মল্লিকের সাহসংসরিকে রানকুপুর্বে “নিভাধামে” ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১এ মন্থ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় দদনমোহন সেনের সাহসংসরিক দিনে উপাসনা, দান ১ টাকা। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ৩৫।১নং হ্যারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের কন্যা গঙ্গীয়া সুরমা দত্তের সাহসংসরিক দিনে উপাসনা। ২২শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যাকালে, বেবেছাটায়, স্বর্গীয় মোহিতলাল সেনের কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীযুক্ত শিখিরকুমার গুপ্তের সহস্মিণী স্বর্গীয়া উমা দেবীর সাহসংসরিকে উপাসনা। ২৬শে ১১১ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গদারের সহস্মিণীর সাহসংসরিকে উপাসনা—কন্যা শ্রীমতী সুখা বাগচির দান প্রচারভাণ্ডারে ১ টাকা। এই সকল স্থানে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মথুরতঞ্জের রাজ্যি মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেবের সাহসংসরিক দিন স্বরণে, ৭নং বজ্রবজ্র রোডে, বাজাবাগ প্রাসাদস্থ সমাধিমণ্ডপে বিশেষ উপাসনা হয়। আচার্য্যপরিবারস্থ ও মণ্ডলীস্থ অনেকেই এই পারলৌকিক তীর্থযাত্রায় যোগদান করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লখ শান্তিপাঠে সহায়তা

করেন। শ্রীমতী মহারাজী সূচাক দেবী আকুল প্রাণে প্রার্থনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহও প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে কথনকথা হয়, সন্ধ্যার ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গত ১লা মার্চ, শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের পত্নী শ্রীমতী ব্রহ্মনন্দিনী সতী ভগ্নমোহিনী দেবীর স্বর্গারোহণের সাহসংসরিক দিন উপলক্ষে নবদেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। এই দিন উপাধ্যায় শ্রদ্ধের ভাই ঋষি গৌরগোবিন্দ রায়ের এবং ভাই উমানাথের পুত্রবধু শ্রীমতী যুগলিনী দেবীরও স্বর্গদিন। উপাসনা-যোগে সকল পরলোকগত আত্মাকে স্মরণ করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভ্রাতা মাধবমালা বসু এবং মহারাজী সূচাক দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা মিথিলচন্দ্র আচার্য্য দেবের প্রার্থনা এবং ভ্রাতা সরলচন্দ্র সতী দেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করেন।

৮ই মার্চ, শান্ত সাধক স্বর্গগত ভাই কেদারনাথ দেব সাহসংসরিক দিনে, কলিকাতার ৬৪ই ওয়ার্ডস্ ইন্সটিটিউটসন্ ষ্ট্রীটে, পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দেব গৃহে, ভাই অক্ষয়কুমার লখ এবং ৩২নং রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাসের গৃহে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। পটনার Girls' High Schoolএর লেডি প্লিনসিপ্যাল শ্রীমতী বনলতা দেব গৃহেও উপাসনা হয়। এই উপলক্ষে কোর্টা কন্যা শ্রীমতী হেমগতা চন্দ কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২, বীকিপুর ছীমানন্দ-কুটারনির্মাণে ২, ও দরিত্রদিগকে চাউল ও পয়সা ১ এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী বনলতা দে প্রচারভাণ্ডারে ১০ এবং পুত্র শ্রীযুক্ত মনোনীতধন দে প্রচারভাণ্ডারে ২ টাকা দান করিয়াছেন।

দান—স্বর্গীয় ডাঃ শরচ্চন্দ্র দত্তের সহস্মিণী স্বর্গীয়া কুমারী দেবীর আদ্যশ্রদ্ধে প্রচারভাণ্ডারে ১০, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসমাজে ১০ ও বদ্বাদিতে ১০ টাকা দান করা হইরাছে। এবং পৌত্রী শ্রীমতী মনোরমা সেন ব্রাক্সিলিফ কলেজে ৫ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ দাতাদিগকে আশীর্বাদ করুন।

কোচবিহারের সংবাদ—১৫ই ডিসেম্বর, শ্রীমান্ মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণের শুভ জন্মদিনে প্রচারপ্রশ্নে, এই দিনে শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্ডার শুভ জন্মদিনে তাঁহার কুটীরে, ২০শে ডিসেম্বর, স্বর্গীয় মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের শুভ জন্মদিন ও স্বর্গদিন স্বরণে প্রচারপ্রশ্নে, ১লা জামুয়ারী নববর্ষ উপলক্ষে প্রাতে কেশবপ্রশ্নে ও মধ্যাহ্নে প্রিন্সিপ্যাল মনোরথধন দেব মাতৃদেবীর সাহসংসরিক উপলক্ষে তাঁহার বাসভবনে, ৮ই জামুয়ারী ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণদিনে আশ্রমকুটীরে, ১১ই মাঘ, মাঘোৎসব উপলক্ষে ছইবেলা ব্রহ্মমন্দিরে, ৩০শে জামুয়ারী, কেদারবাবুর মাতৃদেবীর সাহসংসরিকে তাঁহার কুটীরে, ৭ই ফেব্রুয়ারী নবীনবাবুর দৌহিত্রের (পূর্ববাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের) শুভ জন্মদিনে প্রচারপ্রশ্নে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ সর্বত্র উপাসনা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durben New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha, কলিকাতা—৩নং রমানাথ মহম্মদার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেসে”, উপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক ২রা চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

সুবিশালমিহং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।

চেতঃ স্তনির্গলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনখরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।

স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ত্র্যক্ষরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৩৯ সাল, ১৮৫৪ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

30th March, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## প্রার্থনা।

মা, তুমি প্রকৃতিরূপিণী, তুমিই আবার প্রকৃতি-প্রসবিনী। জড়প্রকৃতি, জীবপ্রকৃতি দুইই তুমি আপন প্রকৃতিস্বরূপে প্রসব করেছ। জড় প্রকৃতিকে প্রসব করিয়া, যখন যেমন তোমার ইচ্ছা, তাহাকে সাজাইতেছ; জীবপ্রকৃতিকেও তুমি প্রসব করিয়া, তাহাকেও তোমার প্রকৃতি অনুসারে গঠিত করিতেছ। জীবের মধ্যে আবার মানবকে তোমারই প্রতিকৃতিতে গঠিত করিয়াছ, তাহাকে বিশেষভাবে তোমার আত্মশক্তি, ইচ্ছা-শক্তি দিয়াছ; এই জন্য যে, সে স্বাধীনভাবে তোমার অনুরূপ আদর্শ অবলম্বনে গঠিত হইবে। তাই তোমার জড় প্রকৃতিকে তোমার ইচ্ছামত যেমন সাজে সজ্জিত করিতেছ, মানবপ্রকৃতিকে ঠিক তেমন ভাবে গঠন কর না। মানুষ ইচ্ছাপূর্বক তোমার মনের মত তোমার দ্বারা গঠিত হইতে চাহিলে, তবে তুমি তাহাকে তেমনি সাজে সজ্জিত কর। জড় প্রকৃতি যেমন ইচ্ছাবিহীন হইয়া, যখন যেমন সাজে তাহাকে সাজাইতেছ, তেমনি ভাবে সাজিতেছে, মানুষও যাহাতে স্ব ইচ্ছার বলিদান দিয়া, তোমার ইচ্ছামত সজ্জিত হয়, ইহাই তুমি চাও। এই জন্যই তোমার ভক্ত মানবপ্রকৃতিতে জন্ম লাভ করিয়া,

তুমি যখন যেমন ভাবে তাঁকে সাজাও, তেমনি ভাবে সাজেন এবং তেমনি ভাবে তোমারই দ্বারা গঠিত হইয়া মানবজীবনের উৎকর্ষ ও আদর্শ প্রদর্শন করেন। তাই দেখি, এই জড় প্রকৃতিকে যেমন ষড় ঋতুতে বিচিত্র ভাবে সজ্জিত করিয়া আমাদিগকে তাহারই আদর্শানুরূপ গঠিত করিতে চাহিতেছ, তেমনি তোমার এক এক ভক্তকেও এক এক আদর্শে তব ইচ্ছায় গঠিত করিয়া, মানুষ হইয়াও কেমনে তোমার দেব সন্তান হইতে হয় বা তোমার প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ হইতে হয়, তাহাই তাঁহাদের জীবনে তুমি দেখাইলে। এই সময়ে যেমন তুমি প্রকৃতিতে বসন্তপূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ করিলে, বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহিত করিলে, কোকিলকণ্ঠে তোমার মধুর নাম ধ্বনিত করিলে, নব পত্র পুষ্পে বৃক্ষলতাকে কতই নব সাজে সজ্জিত করিলে, তেমনি আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তচন্দ্রকেও নবদীপে মানব-কূলে জন্ম দিয়া, তোমার গৌরাস্বরূপে তাঁহাকে প্রতিভাত করিলে। আকাশে বসন্ত-পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র যেমন তোমার আলোকে উদ্ভাসিত, পৃথিবীতে গৌরচন্দ্রও তেমনি আশ্ব-ইচ্ছা, বিদ্যা বুদ্ধি, গৃহ সংসার সকলই তোমার চরণে উৎসর্গ করিয়া, তব প্রকৃতির চির বসন্তের সমাগমে, মানবচন্দ্ররূপে তোমারই দ্বারা গঠিত হইলেন। মা, তাই

করযোড়ে শিক্ষা করি, আশীর্বাদ কর, এই পুণ্য বসন্তসমাগমে, জড় প্রকৃতিকে যেমন এমন সুন্দর শোভায় শোভিত করিলে, আকাশের পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার বিকাশে অমানিশার অন্ধকার দূর করিলে, স্নিগ্ধ সমীরণের হিলোলে শীত গ্রীষ্মের সমন্বয়ে বিশ্ব-প্রকৃতিকে মধুময় করিলে, নব নব পল্লব ও ফুলের সৌরভে চারিদিক প্রফুল্ল এবং আমোদিত করিলে, পক্ষিগণের স্মিহিত সঙ্গীতধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত মুখরিত করিলে, আবার তোমার মানবপ্রকৃতিতে গৌরচন্দ্রের জীবনেও এই প্রকৃতির ভাবই যেমন একাধারে বিকশিত করিলে, তেমনি এই আদর্শেই যেন আমাদের জীবনও তোমার হস্তে সর্বাস্তুঃকরণে সমর্পণ করিয়া, তোমারই ইচ্ছামত গঠিত হই এবং তদ্বারা প্রকৃত মানবসন্তান হই বা দেবহ প্রাপ্ত হইয়া মানবজন্ম সার্থক করি।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

## বসন্তোৎসব ও চৈত্রোৎসব।

শ্রীনববিধানাচার্য্য বলেন, “তুমি চিন্তা করিয়া থাক, ‘কি আমার হওয়া উচিত?’ যখন তোমার বসন্তকাল মনে হইবে, তখন তোমার ইচ্ছা হইবে, ‘চিরবসন্ত যেন আমার জীবনের অবস্থা হয়’। বসন্তের সঙ্গে জীবনের উৎকৃষ্ট অবস্থার তুলনা হয়। বসন্তকালে শুষ্ক তরু মুঞ্জ-রিত হয়, বসন্তকালে বিচিত্র পক্ষী সকল স্বর্গের গান করে। এই সময় মানুষের মন অত্যন্ত সুখী হয়। দয়াসিদ্ধ ঈশ্বর আমাদের সুখী করিবার জন্ত, তাঁহার স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে বসন্তকালকে প্রেরণ করেন। ভাবুক বান্ধি অভিলাষ করেন, বসন্তকালে যেমন শরীরের অবস্থা হয়, আত্মার অবস্থা যেন সেইরূপ হয়। আত্মার চিরবসন্ত যথার্থ মোক্ষধামের অবস্থা। বসন্ত স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে।”

তিনি আরো বলেন, “যেমন বসন্তকাল স্বর্গীয় লক্ষণা-ক্রান্ত, সেইরূপ পূর্ণিমার চন্দ্রও স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে। চন্দ্র যেন ভাবুককে বলিতে থাকে, ‘আমি স্বর্গে আছি, স্বর্গের ভিতর থাকিয়া পৃথিবীকে আমার কিয়দংশ রূপ লাভণ্য দেখাইতেছি।’ এইরূপে পূর্ণিমার চন্দ্রে, সুশীতল সমীরণে, ক্ষুদ্র শিশুর মুখে এবং পাখীর স্মিহিত কণ্ঠে তরু ভাবুক স্বর্গ অনুভব করেন। এই ফুলগুলিও নিশ্চিত স্বর্গের জিনিষ।”

বাস্তবিক বসন্তকাল যেন সত্যই পৃথিবীতে স্বর্গ-ইহার সকলগুলিই স্বর্গীয় বা স্বর্গের আভাসবাক্যক। বিশ্বপ্রকৃতি যে স্বর্গের প্রকৃতি, স্বর্গের ছাঁচে ঢালাই করিয়া যেন বিশ্বপতি এই প্রকৃতিকে গঠন করিয়াছেন। স্বর্গ কি? যেখানে ঈশ্বর এবং যাহা ঈশ্বরের স্বহস্ত-রচিত বা ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ প্রকাশ করে, তাহাই ত স্বর্গ। আমরা কল্পিত স্বর্গ মানি। আমাদের ঈশ্বরও যেমন কল্পনা নন, প্রত্যক্ষ, তেমনি তাঁহার স্বর্গও কল্পিত বস্তু নয়। এই বিশ্বপ্রকৃতিই যাহা কিছু, সকলই ত আমাদের ঈশ্বর স্বহস্তে রচনা করিয়া, তাঁহার শোভা সৌন্দর্য্যের, তাঁহার কারুকার্য্যের এবং নিজ স্বরূপের পরিচয় দিতেছেন; তাই প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশ ও প্রকাশ সকলই ঈশ্বরের এবং স্বর্গের পরিচায়ক; সেই জন্মই ত আমাদের বৈদিক পুরুষগণ এই বিশ্বপ্রকৃতিকেই ঈশ্বরবোধে পূজা করিতেন বা তিনি এবং তাঁর প্রকৃতি অভেদ জানিয়া, প্রকৃতিতেই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন।

দ্বৈতবাদ-প্রণোদিত বিজ্ঞান-চক্ষে যদিও চৈতন্যময় স্রষ্টা ও জড় সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ বা ভিন্ন করিয়া আমরা দেখিতে শিখিয়াছি, কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈত চক্ষে আমরা প্রকৃতিকে দেখিলেই প্রকৃতির ঈশ্বরকে দেখিতে পাই। ব্রহ্মানন্দ যেমন বলিলেন, তেমনি বিশ্বপ্রকৃতিও আমা-দিগকে বলেন, “যে আমাকে দেখিয়াছে, সেই আমার ঈশ্বরকেও দেখিয়াছে”। তাই ভাবুক ভক্ত যোগী যিনি, তিনি প্রকৃতিদর্শনেই ব্রহ্মদর্শন-যোগে মগ্ন হন এবং প্রকৃতির বিচিত্র বিকাশ দর্শনে উৎসবানন্দে উন্মত্ত হন। এই জন্মই নববিধান শরৎসমাগমে আমাদের শারদীয় উৎসবসম্রোগে প্রণোদিত করেন; বসন্তসমাগমে বসন্তোৎসবসাধনে ধন্য করেন।

বাস্তবিক প্রকৃতির সকল বিকাশই স্বর্গের উদ্দীপক। আবার বিশেষ ভাবে বসন্তকালদর্শনে মানব-মন যেমন উৎফুল্ল আনন্দিত এবং নব জীবনে সঞ্জীবিত হয়, এমন আর অন্মকালে হয় না। সত্যই বসন্তকাল স্বর্গের ও চির মোক্ষধামের বিশেষ আভাস দান করে। এই জন্মই নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্য নববিধানকেই পৃথিবীতে বসন্তসমীরণ বলিয়া তুলনা করিয়াছেন এবং ভক্তজীবনকে চিরবসন্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার কারণ আর কিছু নয়, বসন্তকালের বাতাস

স্নিগ্ধ এবং মনোরম, ইহার পাখীর গান, ইহার ফুলের সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ, ইহার পূর্ণচন্দ্রের মধুর জ্যোৎস্না সকলই অপার্থিব। একে ত ইহার কিছুই মানুষের রচিত নয়, আবার ইহা সর্ববিদা সর্বত্র সচরাচর পাওয়াও যায় না; তাই প্রকৃতির সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মনোরম ভাব এই কালে বিকাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, ইহা নিশ্চয়ই মহোৎসবব্যঞ্জক।

যাহা দেখিলে, সন্তোষ করিলে, সহজেই মন আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং শরীর মনের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট অপসারিত হয়, তাহাই ত উৎসবানন্দদায়ক এবং তাহাই ত মনের ভক্তিভাব-উদ্দীপক। চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিয়াই ত আমরা ঈশ্বরকে “প্রমচন্দ্র” বলিয়া ভক্তির উচ্ছ্বাসে নামকরণ করিতে প্রণোদিত হই। ফুলের কোমলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিয়াই ত আমরা তাঁর চরণকে “কমল” বলিয়া অশ্রুভব করি। বসন্ত-সমীরণ সন্তোষ করিয়াই ত ভক্তজীবনের স্নিগ্ধতা ও আনন্দ আমরা উপলব্ধি করি। নিকলঙ্ক শিশুর মুখকমল এবং পবিত্র হাসি দেখিয়াই ত আমরা প্রত্যক্ষ স্বর্গের নিদর্শন দর্শন করি। এ সকল কথা ভাবের কথা, ভক্তির উচ্ছ্বাস; কিন্তু যাহা ভাব ভক্তি উদ্দীপন বা উচ্ছ্বাসিত করে, তাহা ধর্মসাধন ও ভক্তিসাধনের সহায় বলিয়া কেন না গ্রহণ করিব?

সাধারণতঃ লোকে বলেন বটে, ভক্ত ভাবুক প্রকৃতির উপমা-দর্শনে, অপনোপন মনের ভাবানুসারে, ভক্তিভাব উদ্ভাবন করেন। কিন্তু বিশ্বাসী যোগী ভক্ত বলেন, স্বয়ং ভক্তসখা ভগবানই আপন প্রকৃতি হইতে স্বর্গের প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিকে ভক্ত মানবের ভক্তিলাভে আদর্শপ্রদর্শন জগাই রচনা করিয়াছেন। এবং তদ্বারা স্বয়ং তাঁহাদের প্রাণে ভক্তি সঞ্চার করেন। এই ভাবে আমাদের জীবনে ভক্তির সঞ্চার করিয়া উৎসবানন্দে পূর্ণ করিবার জগাই, তিনি বসন্তকাল এমন স্বর্গীয় ভাবে রচনা করিয়াছেন। ইহার তাঁহারই স্বরূপের প্রকাশ। সূর্য্য এবং সূর্য্যরশ্মি যেমন অভেদ, তেমনি এই বসন্তকালে তাঁহারই প্রকৃতি বিকশিত।

এই বসন্তসমাগমে পুরাতন পত্র স্থলিত হইয়া নব পত্র পুষ্পে বৃক্ষলতা সজ্জিত হয়, আকাশে পূর্ণচন্দ্রোদয়ে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী জ্যোতির্ময় হয়, বসন্তসমীরণে শরীর মন স্বাস্থ্যসুখে পূর্ণ হয়, ফুলের

হৃগন্ধে ও সৌন্দর্য্যে চারিদিক শুদ্ধতা ও আনন্দে ভরিয়া যায় এবং পক্ষীর স্রমিষ্ঠ গানে সবার মন উৎফুল্ল হয়; এবং ইহারই প্রভাবে যেমন আমরা এ সময় বসন্তোৎসব-সন্তোষে ধগ্গ হইলাম, তেমনি আমরা কেবল বাহ্যভাবে সম্পাদন করিয়া যেন ক্ষান্ত না হই, সত্যি যাহাতে আমাদের জীবন চিরবসন্তময় হয়, তাহারই জগ্গ আমরা আকাঙ্ক্ষিত হই।

আবার এই বসন্তসমাগম-সময়ে যেমন বিধাতার অনির্বচনীয় বিধানে, নিত্য বসন্তোপম জীবন, পুণ্য-প্রেমোন্মত্ত ভক্ত শ্রীগৌরানন্দদেবের অবতারণা হইল, তেমনি তাঁহারও আদর্শজীবনের সমাগমসাধনে আমাদেরও জীবন যেন গৌরাসময় হয়।

নববিধানে কেবল উৎসবসমাগম সাধন করাই আমাদের সম্যক নয়। প্রকৃতি যেমন সহজে মার কৃপায়, মার প্রভাবে বসন্তের সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইল, ভক্ত শ্রীগৌরানন্দ ও যেমন ভগবৎকৃপায় এবং তাঁহারই স্বরূপ-গঠনে, তাঁহারই স্বরূপসম্পন্ন হইয়া ভক্তাবতার হইলেন বা নর হইয়াও নারায়ণ হইলেন, আমরাও যেন নীচ মানব-প্রকৃতিপরিস্ফুটন প্রকৃপাবলে সেই জীবনলাভে একান্ত আকাঙ্ক্ষী হই। তিনি তাঁহারই অনির্বচনীয় শক্তি-প্রভাবে ও কৃপাশ্রমে, আমাদের শূন্য তরুণম জীবনকেও নববিধানের নবজীবনে মুগ্ধরিত করিয়া লইবেন। নববিধানে সাধন ও জীবনে প্রদর্শন যেন একই হয় এবং ইহার জগ্গ যখন তিনি আমাদের জীবনে বিধানে স্থান দিয়াছেন, তখন তিনিই আমাদের জীবনে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া লইবেন। এই বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করি।

## নিশ্বাস ও বিশ্বাস।

### নিশ্বাস ও বিশ্বাস।

শরীরের পক্ষে নিশ্বাস যেমন, আত্মার পক্ষে বিশ্বাস তেমনি। শরীর বাঁচিয়া আছে নিশ্বাস দ্বারা বুঝা যায়, দেহাত্মারে যে জীবনীশক্তি আছে, তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না, নিশ্বাস দ্বারা সে নিরাকার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নিশ্বাস প্রকাশিত করে, “আমি আছি”। তেমনি বিশ্বাস প্রকাশিত করে, “তুমি আছ”। বিশ্বাসই ঈশ্বরকে অন্তরে সত্যাক করিয়া, তাঁহার উপর নির্ভর, নির্ভাবনায়, নিশ্চয় মনে নির্ভর করে, তাঁহার সহিত

মনে মনে কথা কর এবং তিনি যে দিকে টানেন সেই দিকে যায়, বাহা করিতে বলেন তাহাই করে, যেখানে রাখেন সেইখানে থাকে, বাহা থাকিতে পরিতে দেন তাহাই থাকিয়া পরিয়া আনন্দমনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বিশ্বাস আছে যার, দুঃখ অভাব নাই তার।

### সহজ ও স্বাভাবিক সাধন নববিধান।

নিবাস ফেলা যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, নববিধানসাধন তেমনি সহজ ও স্বাভাবিক। কোন রকম অসহজ অস্বাভাবিকতা নববিধানে নাই। আচার পান যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, সন্তোষ লভ্য ও যেমন সহজে ও স্বাভাবিকভাবে আচার পান করে, নববিধানের উপাসনাসাধনও তেমনি। সহজে স্বাভাবিক ভাবে মনে যে আচার অভাব বোধ হয়, তাহাই অমুভব করিয়া প্রার্থনা করা নববিধানের প্রার্থনা-সাধন। সমুৎপন্ন আকাশ দর্শন ও বাতাস সন্তোষ যেমন সহজ ও স্বাভাবিক, বিশ্বাসচক্ষে, এই সমুৎপন্ন ঈশ্বর আছেন, দর্শন করা ও তাঁহার উপাসনা সন্তোষ করা তেমনি সহজ এবং স্বাভাবিক। শরীর-নিগ্রহ বা কষ্টসাধ্য উপাসন বা দুঃখ-কষ্ট-বহন নববিধানের অমুযোজিত নয়। দুঃখ কষ্ট, অনাচার, বিপদ পরীক্ষা, রোগ শোক সকলই মার অমুগ্রহ জানিয়া এবং সন্তানপালনের বিবিধ স্নেহবিধান-বোধে আনন্দমনে সহজে ও স্বাভাবিক ভাবে তাঁহা বহন ও কল্যাণপ্রদ আশীর্বাদ বলিয়া সন্তোষ করাই নববিধানের বৈরাগ্য-সাধন।

### ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাধনা।

( বরিশাল ব্রহ্মসন্ধিরে, ৮ই জাম্বুরী, স্মরণার্থ সভায়,  
কুমারী মণিকুন্তলা সেন বি, এ, কর্তৃক পঠিত )

জীবলোকের অন্তরে বাহিরে যে প্রবাহ বা গতি অবিশ্রাম্য চলিয়া যায়, তাহার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিয়া দেখি—কেবল দন্দ, কেবল বিরোধ। প্রবল দুর্জল, সত্য অসত্য, সুন্দর অসুন্দরে যে অনিল অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয়, তাহা লইয়াই এত গতি সচল ও সজীব এবং যে চিরপ্রবহমান লহরীলীলার সৃষ্টি করে, তাহারই চলার পথে ইহার উত্থান ও পতন। দন্দ যেখানে, বিরোধ সেখানে—জয় পরাজয়, শাস্তি অরাজকতাও সেখানে থাকিবেই। এত দ্যুতপ্রতিবাত, বিরোধ বিদ্রোহ মানুষের অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই বর্তমান এবং এই দন্দ বিরোধ লইয়া গতির ধারা যে দিকে মুখ ফিরাইবে, সে দিকের শেষ সীমানায় না পৌছিয়া তাহার বিরাম নাই—পরাজয় নাই। অত্যাধ অসত্য যখন বাড়িয়াই চলে, গতি তার তখন এমনই অপ্রতিহত এবং শেষ সীমানায় যখন উপস্থিত হয়, তখনই জমিয়া ওঠে, পুঞ্জীভূত মানি। দুর্জলতা অক্ষমতার অগরাধে যত লাঞ্ছনাই অদৃষ্টে

ঘটুক, চিরকাল মানুষ তাহাকে ক্ষমা করে না, সহিয়া যায় না। মানবের সৌভাগ্য অথবা বিধাতার বিধান—যত নিম্নেই সে নামিকা আসুক, তাহার এ গতিবেগ এক স্রবের শেষ ঘাটে আসিয়াই বিলীন হইয়া যায় না, আবার নূতন স্রবের নূতন সঙ্গীতের সাধনা তাহার আরম্ভ হইয়া যায়। পতন যেখানে শেষ হয়, তাহারই চিত্তান্তের উপর উত্থানের জরযাত্রা ঘোষণা করে। কোন এক অন্তত মুহূর্তে মানবের দুর্জলতার স্রবোৎসর্গ লইয়া অনেক অসত্যের ভিত্তি পতন হয়, মানুষ তাহা জানিতেও পারে না; কিন্তু ফুলের হার যে দিন সত্যি গলার ফাসি টানিয়া দেয়, সেই দিনই মানুষ লুপ্ত চেতনাকে ফিরিয়া পায় এবং বাচিবার জন্ত পাগল হইয়া ওঠে। এক একটা জাতি এমন করিয়াই এক একবার মরে এবং তাহাকে বাঁচাইতে আবার এমনই পাগলের প্রয়োজন হয়।

এমনি একবার মরণের মুখে এই বাংলার জাতিকে প্রাপ দিতে আসিয়াছিলেন কেশবচন্দ্র। মরণের বৃকে নির্ভয়ে পাই রাখিয়া কেশবচন্দ্র প্রথমেই দীক্ষা নিলেন অগ্নিস্নেহে এবং অগ্নির পূজারী হইয়া বাংলার পাষণবৃকে হোমানল জ্বালাইতে বসিলেন। যত কিছু মানি, যত কিছু দুর্যোগে আগুন জ্বালাইয়া নূতন জীবনের মস্তোচ্চারণ করিলেন। অন্ধতার অন্ধকারে নিমজ্জিত এই জাতির সমুখে নূতন প্রাণের প্রথম প্রদীপ জ্বালাইয়া ছিলেন রামমোহন। বেদের সাধনায় তৃপ্ত না হইয়া ভারতীয় ঋষি অমুভূতির সাধনায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং উপনিষদের ব্রহ্ম-সত্যায় পৌছিয়া নির্বাণ-প্রদায়ী হইলেন। উপনিষদের এই সত্যাত্মত্বকে সাধনালব্ধ সত্য বলিয়া পাইয়াও ভারতীয় সমাজ বেদের আচার অনুষ্ঠানকে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, এবং দীর্ঘে দীর্ঘে আত্মশূলন হইতে বিচ্যুত হইয়া ইহলোকের লাল ক্ষতিতেই ধংসে টানিয়া আনিয়া। বাংলার ধর্ম, ভারতের সাধনা কুসংস্কারের বোঝা বহিয়া শুধু কঙ্কালমূর্তিতেই পরিণত হইল। হিন্দুধর্মের এই শোচনীয় অবস্থাতে শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্মের নূতন আলো লইয়া আসিল খ্রীষ্টান সমাজ। আত্ম-বিশুদ্ধ ভারতীয় জাতি পঞ্চপালের মত সেই আলোতে ঝাপাইয়া পড়িল। আর্ধ্য ঋষির শিক্ষা, সভ্যতা, উপনিষদের ব্রহ্মজ্যোতি তাহাদের আর গতি রোধ করিতে পারিল না।

জাতির জীবন মৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে রামমোহনের প্রতিভা ও শক্তি তাহাকে রক্ষা করিল। ব্রাহ্মণের কাল্পনিক ব্যাখ্যা হইতে উপনিষদকে মুক্ত করিয়া রামমোহন তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। ভারতবাসী বুঝিল, তাহাদের ঋষির উপলব্ধ তত্ত্ব-দর্শনকে অতিক্রম করিয়া খ্রীষ্টান সমাজ নূতন কিছু প্রকাশ করে নাই। রামমোহনের চেষ্টায় জাতি আবার আত্মপ্রতিষ্ঠা হইল— তাহার গতির মুখ ফিরিয়া গেল; কিন্তু যে প্রাণধারা লইয়া রামমোহন আসিয়াছিলেন, তাহার উজ্জ্বলতর বিকাশ দেখিতে পাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রহ্মানন্দ কেশব



চক্রে মধ্য। জাতিকে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মবিশ্বাসী করিলেন রামমোহন, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার চরম পরিণতিতে লইয়া চলিলেন এই ধর্মমণ্ডলী। সমস্ত কুসংস্কার হইতে জীবাত্মকে মুক্ত স্বাধীন পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিলেন কেশবচন্দ্র। মানবা-  
 ত্মার স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন বিকাশ এবং বিশ্বাত্মার সহিত মিলনেই তাঁহার পরম গতি—আপন জীবনে কেশবচন্দ্র এই সত্তা অমুভব করিলেন এবং অকুণ্ঠিতচিত্তে সকলের সম্মুখে তাঁহার সাক্ষ্য দিলেন। বিরূপ মানবা-  
 ত্মার অধীনতার অবমাননা তিনি কোন দিন সন্নিবেশ পারিলেন না। যে অগ্রিমন্ত্র জীবনপ্রভাবে তাঁহার গতি নির্দেশ করিয়া দিল, যে আশ্রয় অহরহ বৃকের ভিতর জলিয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল, সেই অগ্রিকুণ্ডে একে একে তাঁহার মুক্ত আত্মার সকল বন্ধন, সকল শৃঙ্খল অহুতি  
 কইয়া গেল। দেহের বন্ধন, মনের কুসংস্কার, আত্মার জড়তা সব সে অগ্নিসাধনার উগ্রতায় দগ্ধ হইয়া গেল। সেট মুক্ত হৃদয়ের সুনির্মল আত্মার পরমা-  
 ত্মার প্রকাশ অতি সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া কেশবচন্দ্রের সমীপ অস্তিত্বকে অসীম সত্যের উপনীত করিল। সকল সংস্কার, সকল বন্ধন, সকল অসত্যকে মনের  
 উন্নয়ন হইতে রুদ্ধ করিয়া, সেট মুক্ত মনের নির্জনপুরে বসিয়া পরমহৃদয়ের, চরম সত্যের আবির্ভাব লাভ করাই ছিল কেশব-  
 চন্দ্রের জীবন এবং এই সত্যের ও হৃদয়ের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার সাধনা। মানবসমাজের অবিকৃত ও প্রতিষ্ঠিত সকল  
 সংস্কার তিনি সাগ্রহে স্বীকার করিলেন, সকল সত্যদর্শী পুরুষকে হৃদয়ের অতি বড় প্রকার অঞ্জলি দান করিলেন; কিন্তু কাহারও  
 চরণতলে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেন না। খ্রীষ্ট তাঁহাকে প্রেমোদ্বাহিত করিলেন, বুদ্ধ তাঁহাকে তপস্যায় ডুবাইলেন, চৈতন্য  
 তাঁহাকে চরিত্রনামে নৃত্য করাইলেন; কিন্তু নিঃসংশয়ে কাহারও পারে আপনাকে অঞ্জলি দিতে তিনি পারিলেন না। সত্যের  
 সন্ধানে সকল প্রশ্ন, সকল সমস্যা তিনি ভগবানের চরণেই নিবেদন করিতেন এবং সেখানেই তাঁহার সকল সমস্যার মীমাংসা  
 হইত।

কেশবচন্দ্রের এই স্বাধীন আত্মজ্ঞানীশন এবং সুস্পষ্ট আত্ম-  
 দর্শনের সাধনা আরম্ভও হইল পরমা-  
 ত্মার সহিত যোগে এবং  
 তাহার পরিসমাপ্তিও করিলেন অপূর্ণ মিলনানন্দে। মানুষ  
 বাহ্যকে সাধনার সিদ্ধি ও পরাকাষ্ঠা বলিয়া জানে, ভগবানের  
 সহিত সেই একাত্মবোধ ও যুক্তাবস্থা হইল কেশবের সাধনার  
 গোড়ার কথা। তাঁহার স্বাধীন আত্মা যে কাহারও পারে মাথা  
 নত করে নাই, সে আশ্রয় ও নির্ভরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ  
 করিয়াছিল বলিয়াই। কোন সত্যকে যে পূর্ণ বলিয়া নিঃসন্দেহে  
 গ্রহণ করিতে পারেন নাই, সে তাঁহার পরম সত্যের সহিত  
 সাক্ষাৎকারলাভ হইয়াছিল বলিয়াই। পরমা-  
 ত্মার সহিত তাঁহার এই যোগকে সম্ভব করিয়া দিল তাঁহার অকপট বিশ্বাস এবং  
 তাঁহাকে পাইবার অস্ত্র তীব্র ব্যাকুলতা। যে ব্যক্তি এক মুহূর্তের

জগৎ কাহারও অধীনতাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই, প্রতি  
 মুহূর্তে তাঁহার ভগবানের চরণে কত প্রার্থনা, কত কাতরতা, কত  
 ভিক্ষা! কেশবচন্দ্র ভগবানকে সাধনার পথে সঙ্গী রূপে, সহায়-  
 রূপে সর্বদা সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে রাখিয়া চলিয়াছেন। যখন  
 সংশয় আসিয়া পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়, দৈন্ত আসিয়া জীবনের  
 আশা আনন্দকে নির্মূল করে, প্রশ্ন আসিয়া জীবনকে জটিল করিয়া  
 তোলে, তখন প্রার্থনাই তাঁহার পক্ষে আলো জালিয়া দেয়। বাল্য-  
 কালে কোন দিন কে তাঁহার বৃকের ভিতর বলিয়া গেল, “প্রার্থনা  
 কর”—সেই দিন হইতে শেষ পর্বাংশ এই প্রার্থনাই তাঁহার সকল  
 অভাব পূর্ণ করিয়াছে। কেশবচন্দ্র চাহিতে জানিতেন, তাই  
 তিনি চাহিয়া একবারও বিমুগ্ধ হইয়া ফিরিয়া আসেন নাই।  
 এই প্রার্থনা ও বিশ্বাসের ভিতর দিয়াই তিনি ভগবানকে হৃদয়ে  
 খুঁজিয়া পাইলেন। হৃদয়ে দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া  
 সেখানে শুধু তিনি এই দেবতারই অধীন হইয়া রহিলেন। সুখ,  
 শান্তি, ভোগ, আরাম, মোহ, ভয় কোন কিছুই বাহ্যকে এতটুকু  
 আটকাইতে পারে নাই, তাঁহার এ অধীনতা কেন? মুহূর্ত  
 আপনার অক্ষমতা জানাইয়া ভিক্ষা চাহিতে তো সঙ্কোচ হইল  
 না। স্বাধীনতা আমরা জানি না, বুঝি না; তাই স্বাধীন হইতে  
 গিয়া বাহিরে সাজি উচ্ছৃঙ্খল, ভিতরে ফণা তুলিয়া দাঁড়ায় অহং-  
 কার। তাই বিশ্বাসে আমরা শিথিল, প্রার্থনার আমাদের  
 সঙ্কোচ। সত্যকে বারা চিনিয়াছে, তাহার অসত্যকে ভাঙিতে  
 পারে, কারণ গড়িতেও তারা জানে। কিন্তু ধ্বংসই বাহার  
 প্রকৃতি, সে যে সত্যকেও গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে। কেশব-  
 চন্দ্র সত্য পাইয়াছিলেন, তাই সত্যের সঙ্গে তাঁর এত সখা, সত্যের  
 কাছে তাঁর এই মিনতি। এই সত্যকে রক্ষা করিতে সুপ্রতি-  
 ঠিত করিতে আত্মপরীক্ষার হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতেন—  
 পাপের গন্ধও সেখানে সত্যকে মলিন না করে। তীব্র বিচারে  
 হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া পাকা সোণা করিয়া তুলিতেন, সে সোণার  
 সত্যের যে ছাফ লাগিয়া বাইত, তাহা নিখুঁত, তাহা অবিকৃত,  
 তাহা সুন্দর।

কেশবচন্দ্রের এই যোগের সাধনা তাঁহার নিকট মধুর হইয়া  
 ফুটিয়া উঠিল ভক্তি ও প্রেমের রস লইয়া। বিচারে যোগ সিদ্ধি  
 দিয়াছে, কিন্তু তৃপ্তি আনিয়া নাই। বিচারের সাধনার তীব্রতায়,  
 উত্তেজনার দেহের সর্বত্র বিন্দু বিন্দু রক্ত বহিয়া বাইত, চোখ  
 ফাটিয়া রক্তের ফোটা পড়িয়া বাইত; কিন্তু এও তাঁহাকে আনন্দ  
 দিল না, তৃপ্তি দিল না, বতদিনে না রক্তের পরিবর্তে আবেগ,  
 উচ্ছ্বাসে অশ্রুবত্তা তাঁহার বক্ষ ভাসাইয়া দিয়াছে। এই অপূর্ণ  
 মিলনানন্দে বিভোর হইয়া যেদিন উন্মত্ত নৃত্য করিতে পারিলেন,  
 সেই দিনই চিত্ত শান্ত হইল, প্রাণ তৃপ্ত লাভ করিল। ভগবানের  
 বিশাল বিশ্বমুখি, আবার মধুর প্রেমধ্বন মুখি ভক্ত হইই চায়,  
 নতুবা তার তৃপ্তি কোথায়?

নিজের বৃকের ভিতরে যে নূতন আলো, নূতন সত্য কেশবচন্দ্র



খুঁজিয়া পাইলেন, মানবের নিকট সে অমূল্য রত্ন স্থাপন করিতে তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যিনি মানবাত্মার স্বাধীন সত্য বিশ্বাসবান, স্বাধীন অশ্রুশীলনের একান্ত অমুরাগী, তিনি মানবের নিকট ঘোষণাও করিলেন তাহাই। যিনি অপরের নিকট আপনাকে সমর্পণ করিতে কোন দিন পারেন নাই, তিনি অপরকেও আপনার নিকট সমর্পিত করিয়া লইতে স্বীকার করিলেন না। যে যোগ তাঁহাকে পথ দেখাটাইছে, তাহা অসাধারণ, আশাসনক বস্ত্র নয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সুতরাং এই বোগই সকলের গণের কথা কতিয়া দিবে নিজের জীবনের সাক্ষ্যদ্বারা, শুধু এই কথাটাই তিনি সকলকে জানাইলেন। তাই তিনি গুরু হইতে চাহিলেন না, বন্ধুরূপে পরস্পরে ঘেঁষ ভাল-বাগার বিনিময়েই সকলকে আপন করিয়া লইলেন। আচার্য্য হইয়া উগ্বেশ দেওয়া তাঁহার সহ্য হইল না, সেবক হইয়া নিবেদন জানানোই ছিল তাঁর প্রকৃতি। প্রভু হইয়া সেবা ও সম্মান গ্রহণ করিতে তিনি পারিলেন না। বন্ধুদের পায়ের জুতার উপরে মাথা রাখিয়া ভুক্তাবশিষ্ট খুঁড়াইয়া খাইয়াই তাঁহার তৃপ্তি হইল। অতবড় স্বাধীনচেতা বীর প্রেমে বিনয়ে এ বৈষ্ণবধর্ম কোণার শিখিলেন, ভাবিয়া অবাক হইল। তিনি শুধু আত্মসমর্পণকে ভালবাসিলেন না, অপরের মর্যাদাকেও সমান চোখেই দেখিলেন। যে লেগেমের উদ্ভাদনা তাঁহাকে হরিসকীর্তনে টানিয়া নিল, সেই প্রেমধারার স্পর্শ পাইয়া তাঁহার সন্নিগণ তৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া বাইতেন। দ্বিধা সন্দোহ বলিয়া কোন জিনিষ কেশবচন্দ্রের নিকটে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ জানিতেন না, এমন কি প্রভু ভক্তের সম্পর্কটিও ছিল এইরূপ। শাসন করিয়া মানুষকে তিনি সংশোধন করিতে তেমন সুবিধা পাইতেন না, কাঁদিয়া বুকে জড়াইয়া সংশোধন করাই তাঁহার পক্ষে সচল হইত বেশী। বন্ধুবান্ধবকে পরিবারের বাহিরে বাহিরে রাখিয়া তিনি ভালবাসিতে পারিলেন না, তাই 'ভারত আশ্রম' গড়িয়া সকলকে লইয়া এক বিরাট পরিবার সৃষ্টি করিলেন। পিতার বিশ্বপ্রপন্ন সম্মানগণও বুঝিতে পারে নাই, কান্ বাচ্চি তাহাদের অনাচার, কে তাহাদের পর। নিজেই এমন করিয়া সকলের সঙ্গে সমান করিয়া রাখিতেন। বন্ধু, দরদী ছাড়া কাহারও প্রভু হইতে পারিতেন না বলিয়াই, লোক তাঁহার নিকট আপনাই আত্মসমর্পণ করিয়া যাইত।

আত্মহারা প্রেমিক কেশবচন্দ্র নিজেই এমন করিয়া বিলুপ্ত করিলেন, কিন্তু এ প্রেমবারি তাঁহার অগ্নিময়, তাঁহার স্বাধীন-তাকে কখনও নিস্তেজ, হ্রস্বল করিতে পারে নাই। যে নীতি, যে পথ বিবেকরূপে ভগবদ্বাকী তাঁহার অন্তরে থাকিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, সে নীতি, সে পথকে শিথিল করিতে পারে, টলাইতে পারে, এমন কোন শক্তি বা প্রভাব তাঁহাকে জয় করিতে পারে নাই। বাহ্য সত্য জানিরাছেন, তাহা প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার বিদ্যুৎ ভয় ছিল না। তাঁহার ধর্ম, তাঁহার বিনয়

কোন দিন তাঁহাকে হ্রস্বল করে নাই। বীরত্ব ও বিনয়ের এই অপূর্ণ সংমিশ্রণই ছিল কেশবচন্দ্রের জীবনের বড় কথা।

এই বীরত্ব, এই আত্মসমর্পণবোধ তাঁহার নিকট ধরাইয়া দিল তাঁহার জাতির হ্রস্বলতা। জাতির অড়তা, হ্রস্বলতা এবং আত্মবিশ্বাসি দেখিয়াই তিনি আগুনের সাধনা লইয়া দাঁড়াইলেন। আত্মসমর্পণাবোধে, জাতীয়তাবোধে, তাহাদেরে প্রবুদ্ধ করিতেই ছিল তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগঠনেই ছিল সে অফুরন্ত কল্পপেরণার অভিব্যক্তি। আপনার অর্থ, আপনার সামর্থ্য সব কিছু এই কর্মক্ষেত্রে নিঃশেষে দান করিয়া আপনি ককির হইয়া দাঁড়াইলেন। শক্তিমান সমাজই শক্তিমান জাতি সংগঠন করে। তাই সমাজগঠনেই ছিল তাঁর আগ্রহ। শিক্ষাহীনতা এবং কুশিক্ষা, ধর্মহীনতা এবং কুসংস্কার পাষণ্ডের মত বাংলার বুকে ঢাপিয়া বসিয়াছিল, কাজেই নরনারীকে সুশিক্ষা ও সুধর্ম দান করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এই ব্রত উন্মোচনে আপনার সকল শক্তি সম্পূর্ণ ব্যয় করিয়া তবে তিনি তৃপ্ত হইলেন, নিশ্চিন্ত হইলেন।

জাতির অধঃপতন যখন ঘটে, যুগ্ম যখন ঘনাইয়া আসে, তখনই হয় এই সব ব্রতধারী জীবনের আবির্ভাব। যে শক্তি, যে প্রেরণা, যেনক চেতনা তাঁহারা জাতিকে দান করিয়া বান, তাহাই হয় আবার জাতির বহুদিন ধরিয়া বাঁচিবার উপাদান। বাংলার সমাজে কেশবচন্দ্রের দান এমনই বহুকালের সম্পত্তি। বিদ্যায় ও পাণ্ডিত্যে কেশবচন্দ্র বাংলার শ্রেষ্ঠ পুরুষ নহেন, কিন্তু প্রাণের শাচুর্গে, সাধনার তীব্রতায়, শক্তির প্রভায় কেশবচন্দ্র বাংলায় যে আগুনের চেতনা আনিয়া দিলেন, যে বিকাশের প্রেরণা আনিয়া দিলেন, তাহা লইয়া বাংলা সত্যি বাঁচিয়া উঠিয়াছে এবং সত্যি বহুদিন বাঁচিবে। ধ্যানী কেশবচন্দ্র, বিবেকবান কেশবচন্দ্র, বিরাগী কেশবচন্দ্র মানবতার যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, মানবাত্মার ক্ষুদ্রতাকে যে অসীমবে পৌঁছাইয়া দিলেন, তাঁহার পরিচয়, তাঁহার আদর্শ বাংলায় নূতন, সন্দেহ নাই। মানবাত্মার স্বাধীনতার এমন হৃদয়বাহ বহুদিন এ জাতি পায় নাই, তাই কেশবচন্দ্রের দান বাংলায় অপরিমেয়। ব্রহ্মের সহিত মিলনলাভের এমন সচল স্বাভাবিক প্রণালী ও কোশল কেশবচন্দ্রই প্রথম আপন জীবন দিয়া দেখাইলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, সকল মানুষই অনাগ্রাসে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে, কিন্তু তিনি জানিতে পারেন নাই, কত সঙ্কীর্ণ মালিন্য সাধারণ মানবহৃদয়ে ব্রহ্মবিকাশের পথ রোধ করিয়া দেয়, কত ক্রেশ যে মলিনভায় তাহারা পায়; কিন্তু তাহাকে দূর করিবার ক্ষমতা ভাগ্যবানেরই থাকে। কেশবচন্দ্র বাহ্য বিশ্বাস করিতেন, আজ তাহাই আশীর্বাদ বলিয়া তাঁহার প্রেমিক প্রাণের নিকট প্রার্থনা করি।

(১৩৩৯ সালের মাঘের 'ব্রহ্মবাদী' হইতে উদ্ধৃত)

## অনুভূতিকে রূপ দান করো।

অনুভূতিকে রূপ দেওয়াই মানবের ধর্ম। অনুভূতিকে রূপে রূপে অলঙ্কৃত করিতে গিয়া জগতে এক একটি ধর্ম বা সাধনার সৃষ্টি হইয়াছে। অনুভূতির প্রথম রূপ ভাব, ভাব হইতে অন্তরে রসোদয় হয়। এই রস হইতে যেমন একদিকে কবিতা ছন্দ ও সংগীতের সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যদিকে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সেবা, শিল্প ও কর্মের সৃচনা হইয়াছে। অনুভূতিই সৃষ্টির মূল। পরিবার-প্রতিষ্ঠা, মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠা, সমাজ-প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের মূল সত্যের অনুভূতি আছে। মহাপুরুষ-দিগের অনুভূতির পূর্ণ অবয়ব ধর্মমণ্ডলী বা ধর্মসমুদয়। মণ্ডলী-প্রতিষ্ঠান সাধকদিগের দীর্ঘ সাধনার সাক্ষ্য সিদ্ধি।

ঐতোক মহাপুরুষ বা সাধক নিজের অনুভূতিকে নিজের মধো রূপ দান করেন, তখন তাহার নিজের অন্তরে একটি নূতন সৃষ্টির বীজ অঙ্কুরিত হয়। সৃষ্টির প্রকাশ হয় বাহিরে—ভিতরের বীজ বাহিরে ফল ফুলে ফুটিয়া উঠে। ইহাই প্রকৃতির বিধান। চক্ষুর অগোচর একটি হৃদয় জীবাত্মবীজ মাতৃগর্ভে রোপিত হয়, অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হয়, একটি রূপের পর আর একটি রূপ পরিবর্তন করিয়া একটি সর্গাঙ্গসুন্দর মানবদেহে বাহিরে ফুটিয়া উঠে। ভিতরে বাহ্য বীজরূপে স্থিতি করে, তাহার প্রকাশ বাহিরে। সৃষ্টির মূল কি? তাহার ভিতরের প্রাণ। প্রাণের প্রাণশেই সৃষ্টি শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়। বাহিরের দিক হইতে সৃষ্টি কোন দিন প্রস্ফুটিত হয় না।

হে সাধক! তোমার অনুভূতিকে তোমার নিজের মধো রূপ দান কর। তোমার অনুভূতি যখন তোমার অন্তরে রূপে রূপে পূর্ণ হইবে, তাহার প্রকাশ হইবে তখন বাহিরের আদরে—দেহে, মনে, আচারে, দৃষ্টিতে চিন্তায়, বাক্যে, সেবায় ও কর্মে; বহির্জগতে তাহার প্রকাশ ফুটিয়া উঠিবে—তোমার পরিবার, তোমার মণ্ডলী, তোমার সমাজ তাহার শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইবে। তখন তুমিই হইবে তোমার নূতন সৃষ্টি—অনুভূতির ছাঁচে ঢালাই করা একটি নূতন মানুষ।

হে সাধক! এমন একটি সাহ্যকর নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যে, নিজের ভিতর সেখানে বাহ্য কিছু দ্বিত ও ভ্রগন্ধ, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই নূতন আবহাওয়ার ভিতর বাস করিলে, শ্বাস প্রশ্বাস নূতন হইবে, চিন্তা নূতন হইবে, এবং কর্ম নূতন হইবে; স্থূল কথা, একটি রূপান্তরিত নূতন মানুষ গড়িয়া উঠিবে। এই নূতন মানুষের ভিতর দিয়া যে ভাব-ধারা উৎপত্তি হইবে, তাহাই হইবে বাহিরে কর্মের প্রাণ। এই ভাবধারার অমৃত স্পর্শে নূতন কন্দনন্দির গজাইয়া উঠিবে। কর্ম দেহ, ভাব প্রাণ—ভাব কর্মের প্রসূতি। কর্ম অনুভূতির বাহ্য অবয়ব—অনুভূতির বাহিরের রূপ মণ্ডলী ও সমাজ।

নববিধানের নূতন অনুভূতি কি? মিলিত জীবন বা

Collective life। একত্রে উপাসনা করিলে বা সহস্র সহস্র লোক মিলিত হইয়া কোন বৃহৎ অমুষ্ঠানের আয়োজন করিলে, তাহাকে প্রকৃত মিলিত জীবন বলা যায় না; যদিও বাহ্যতঃ তাহা মিলিত জীবনের লক্ষণ প্রকাশ করে। আদি যুগ হইতে মানব-জীবন ক্রমবিকাশের ধারা বহিয়া যে নূতন ক্রমপূর্ণ জীবনে ফুটিয়া উঠে, তাহাই সাক্ষ্য মিলিত জীবন বা Collective life। পাঁচটা বিভিন্ন ধাতু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন একটি ধাতুতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে মিশ্র (বা Compound) ধাতু বলে। এই মিশ্র ধাতু একটি সম্পূর্ণ গুণাবলিষ্ট স্বাধীন পদার্থ, একটি রূপান্তরিত ধাতু। যে জীবন প্রাচীন যুগের সত্য, ভাব, গুণ ও কর্ম গঠিয়া নবযুগের নূতন জীবন সৃষ্টি করে, তাহাই মিলিত জীবন (Collective life); ইহা একটি অঙ্গাঙ্গীভূত নূতন সত্য, নূতন জীবন (New organism)। প্রাচীন ও নবীনের সমাবেশে ইহা একটি নূতন প্রাণধারা। এই নূতন প্রাণধারার ভিতর সকল ধারা মিলিত হইয়াছে। সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ পবাহ যেমন সাগরসঙ্গমে মিলিত হয়, সেইরূপ প্রাচীন যুগের সকল সত্য, ভাব, গুণ ও কর্ম নূতন জীবনের সাগরসঙ্গমে আসিয়া একাকার হয়। প্রকৃতির মধো যে বিধান প্রস্ফুটিত হইয়াছে, মানবপ্রকৃতিতেও সেই বিধান কার্য্য করিতেছে। ইহাই সৃষ্টির সনাতন বিধি।

মিলিত জীবনের (বা Collective life) আর একটি ধারা জীবনসময়। এক একটি জীবন এক একটি খণ্ড সত্য, ভাব ও গুণের আধার। শ্রীভগবান্ অখণ্ড ও অব্যয়। সচ্চিদানন্দ শ্রীহরি অখণ্ড ও অব্যয় হইয়া, খণ্ড মানবাত্মার বিচিত্র ভাব ও রসের সৃষ্টি করিয়াছেন। সকল খণ্ড ভাব, খণ্ড সত্য, খণ্ড গুণ ও খণ্ড রসের সমাবেশে, এক অখণ্ড সত্য ও ভাবের অভিব্যক্তিই নববিধানের নূতন অনুভূতি। এই নূতন অনুভূতিকে রূপ দিতে হইলে, এক অখণ্ড মানবাত্মাকে অন্তরে জাগ্রত করিতে হইবে, অবিভক্ত প্রাণধারা আত্মায় সৃষ্টি করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিরাট বিশ্বরূপ দেখাইয়া অর্জুনকে আশ্বর্ষ্য, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, নবযুগের সাধকের ভিতরও সেই বিরাট বিশ্বরূপ সৃষ্টি করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের বিরাট বিশ্বরূপ, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের অখণ্ড জীবাত্মা, এবং মহর্ষি ঈশ্বর "I and my Father are one" একই অনুভূতি—একই যোগশাস্ত্রের কথা। এই মহাযোগের অনুভূতি হইতে জগতে নব নব সৃষ্টিধারা রচিত হইতেছে, নব নব বিধানের আদ্যদয় হইতেছে। বাহ্য অখণ্ড, তাহাই বিরাট। জীবাত্মায় এই অখণ্ড আবেশ করো, জীবাত্মাও বিরাটরূপে প্রকটত হইবে।

সৃষ্টির বিধানই একত্বের বিধান, যোগের বিধান, এক অবিভক্ত্য যোগের ভিতর দিয়া সৃষ্টি পূর্ণ হইতেছে। প্রাচীন ও নবীন যুগের পণ্ডিত সনিকার কর, তাহা এক অখণ্ড যুগে পূর্ণ হইবে। সকল খণ্ড ধর্মবিধানের ক্রমবিকাশ স্বীকার কর, তাহা এক

অখণ্ড ধর্মবিধানের আভাস দান করিবে। মানবাত্মার সকল খণ্ড সত্য, খণ্ড ভাব, খণ্ড গুণ ও ধর্মকে এক ধারাবাহিক ক্রমস্থজে গ্রথিত কর, তাহা এক অখণ্ড সত্য ও ভাবে পরিণত হইবে। আত্মার এই অখণ্ড সত্যের আবির্ভাবই অখণ্ড জীবাত্মার পরিচয়। জীবাত্মার এই নূতন জন্মই তাহার বিরাট বিধিক্রমের সাক্ষাৎ উপলব্ধি।

হে লোক! তোমার অমৃতভূতিই তোমার নিকট অমৃত। এই অমৃতভূতিবোণেই তুমি আপনি আপনাকে জয় করিতে পারিবে। “যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি জয় করিয়াছে, সেই আপনিই আপনার বন্ধু”। (গীতা) তুমি তোমার অমৃতভূতিকে যখন নিজের অন্তরে রূপদান করিবে, তখনই তুমি শক্তিসম্পন্ন হইবে যে শক্তির নিকট পৃথিবী পরাজয় সীকার করিবে। তোমার অমৃতভূতির অজের শক্তিতে তোমার সৃজনী শক্তিকে উদ্ভূত করিবে। নিজেকে একরূপ ভাবে সৃষ্টি করে, যেন তুমিই তোমার সকল অভাবের পূর্ণতা হও। তুমি তোমার উপাসনামন্দির হইবে, তুমিই তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবন্ধু হইবে, তুমিই তোমার আত্মারাম হইবে অর্থাৎ আপনাতে আপনি রমণ করিবে, তুমিই তোমার ভক্তিভাজন গুরু হইবে, তখন “নিজ পদধূলি, নিজ মাথে তুলি, লইবে ভক্তি করি” এই মহাবাক্য তোমার জীবনে সার্থক হইবে। তুমিই নরচরিত্র হইবে। এই নরচরিত্ররূপ ধারণ করা, আর অমৃতভূতিকে রূপদান করা একই কথা।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

—•—

## নদীর বেলায় উৎসব ।

হাই নাই আমি উৎসবে এবার,

উৎসব এবার এই নদীর বেলায়,

সেই যে নীরব মূর্তি নীরব “মীরার”

দেখিয়াছি সেট নুপে উৎসব চেণার !

দেখিয়াছি আমি হেথা নবীন উৎসব,

নবীন সমাধি সেট নবীন মূর্তিতে,

নবীন উৎসবে সেই “মীরা” যে নীরব,

দেখিলাম বসে’ তাই হৃদয় ভূমিতে !

যোগিনী মীরার মূর্তি নিষ্পন্দ নয়ন,

যোগিনীর নব যোগ সমাধি ঠাঁহার,

পার্শ্বে বসে’ তাই আমি করিমু দর্শন,

যোগিনীর যোগভঙ্গ হালোনা এবার !

বিগত উৎসবে সেই এসেছি দেখিয়া

“মীরার” মূর্তি সেই উৎসবপ্রাঙ্গণে ;

কি দেখিব আজ আর সেই স্থানে গিয়া,

দেখেছি উৎসব আমি এবার অশানে !

উৎসবের দিনে তাই অশানেতে গিয়া

বসিমু এবার সেই নদীর বেলায়,  
“সুবর্ণ রেখার” স্রোত বেতেছে চলিয়া  
উৎসবসঙ্গীত ধরি ছুটেছে তথায়।  
“মীরার” উৎসব, তথা “মীরার” সঙ্গীত,  
“মীরার” সে ভক্তিকথা মীরার অশানে—  
তনিলার বসে’ তথা “মীরার” সহিত,  
উৎসব এবার তাই হইল এখানে।  
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে সেই সমাধিতে বসি,  
সেই কুচবিহারেতে সেই যে যোগিনী,  
“নুপেজ” সমাধিপার্শ্বে অক্ষপণে তাসি,  
দেখেছি তথায় সেই নব তপস্বিনী।  
সে উৎসব পূর্ণ তাঁর এবার এখানে,  
নীরব অশানভূমে নীরব বেলায়,  
দেখিলাম তাই আমি বসিয়া অশানে,  
“মীরার” উৎসব এই সুবর্ণরেখার।

নামকুম,

পোঃ রাঁচি।

অশান-উৎসবের যাত্রী—

মৌরী প্রসাদ মজুমদার

## ত্যাধিকশততম মাঘোৎসবের বিবরণ ।

(পূর্ণাহুত্ব)

১০ই মাঘ, সোমবার—প্রাতে ৭টাের ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু নির্বাহ করেন। সন্ধ্যা ৬টার সময় ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরকীর্তন বাহির হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে মণ্ডলীর পুরুষ মহিলা অনেকে মন্দিরে সমবেত হন। কীর্তনের দল ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া প্রথমে কীর্তন করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটা প্রার্থনা করিলে পর, কীর্তনের দল কীর্তন করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া, অন্তান্ত বৎসরের ছায় বামাপুকুরের রাস্তা ধরিয়া কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে উপস্থিত হন। তৎপর কীর্তন করিতে করিতে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া কিছুকাল কীর্তন করিয়া, সুখিয়া স্ট্রীট ধরিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হন ও স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া জমাট কীর্তন করেন। পরে রামমোহন রায় রোড, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রীট, গড়পার রোড হইয়া কীর্তনের দল অপার সাকুলার রোডে উপস্থিত হন এবং কীর্তন করিতে করিতে কমলকূটারে উপনীত হইয়া, নবদেবালয়ের সম্মুখ রোয়াকে দাঁড়াইয়া জমাট কীর্তনান্তে, কীর্তনের কার্য শেষ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্তনে নেতৃত্ব করেন। কীর্তনান্তে শ্রীতিভোজন হয়।

১১ই মাঘ, বঙ্গলবার—ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টাের ৩ সন্ধ্যা ৬টাের উপাসনা হয়। প্রাতে তাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপাসনা করেন। “আচার্যের উপদেশ” প্রথম ভাগ হইতে ১১ই মাঘের নিবেদন পাঠ করিয়া, সরল স্মৃতি প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা আটায় ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার স্বাভাবিক গাভীয়া ও ভাবোচ্ছাস সহকারে উপাসনা করেন।

১২ই মাঘ, বুধবার—নববিধান-ঘোষণার দিন। প্রাতে ৭টায়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ডাক্তার সত্যানন্দ রায় সম্পন্ন করেন। তাঁহার স্বাভাবিক বিধান-নিষ্ঠা, গাভীয়া ও মিষ্টতা সহকারে এ বেলায় আরাধনা, পাঠ, প্রসঙ্গ ও প্রার্থনাদি সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যা আটায় ব্রহ্মমন্দিরে আনন্দসম্মিলন হয়। প্রথমে বৃকগণ একটা সঙ্গীত করেন। সঙ্গীতের পর ভাই গোপালচন্দ্র গুহ “নববিধানকে জয়ী করিব” আচার্যদেবের এই প্রার্থনাটা পাঠ করেন। তৎপর ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক “আচার্যের উপদেশ” হইতে “নবশিগুর জন্ম” নববিধান-ঘোষণার দিনের উপদেশটা পাঠ করেন। তৎপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পুণেন্দ্রনাথ মজুমদার তাঁহার স্মৃতি ও সুললিত ভাষায় বিধানবাহক ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে ব্রহ্মলীলা বর্ণনা করিয়া, নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা নববিধানের মহিমা বিবৃত করেন। তৎপর ভক্ত-কল্পা শ্রীমতী মণিকা মল্লিকানবিশ এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ-চন্দ্র মল্লিকানবিশ তাঁহাদের সুনিখিত সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নববিধানের মহিমা ঘোষণা করেন। এই দুইটা প্রবন্ধ পূর্বে তত্তে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর শ্রীমতী শোভা সেন ধর্মের বিকাশ বিষয়ে তাঁহার লিখিত সাক্ষর্গত প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত মেমেন্দ্রনাথ রায় স্বাভাবিক উচ্ছাসপূর্ণ ভাবে কেশবচন্দ্রের জন্মদিনে উর্দু ভাষায় নিজরচিত সঙ্গীতটির বঙ্গাভাব বলিয়া তাহা গান করেন। তৎপর মাননীয়া মহারাণী সূচাক দেবী সংক্ষেপে স্মৃতি ভাষায় বিধানের মহিমা কীর্তন করিয়া সকলকে উৎসাহিত করেন। সর্বশেষে ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিলে অদ্যকার কার্য শেষ হয়।

১৩ই মাঘ, বৃহস্পতিবার—পূর্নাই নাতার সময় কমলকুটিরস্থ তিষ্ঠোরিয়া স্থলের প্রশস্ত গৃহে আধ্যাত্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও তৎপরে প্রীতিভোজন হইয়াছে। ভগিনী মাননীয়া মহারাণী সূচাক দেবী তাঁহার সুস্বপ্ন আরাধনা ও প্রার্থনায় শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি আরাধনাদি গতবারে ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মসমাজের ভূতপূর্ব সভানেত্রী ও প্রতিনিধি শ্রীমতী মহারাণী স্মৃতি দেবীর তিরোয়ানে, তাঁহার উৎসাহপূর্ণ উপাসনাদি স্মরণ করিয়া, সকলেই তাঁহার অভাব বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছেন। তিনি ভগ্নদিককে নথোদন করিয়া শেষ যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, শ্রীমতী মণিকা দেবী তাহা পাঠ করেন। উহা ধর্মতত্ত্বে পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীমতী কলিমতি মিত্র ও শ্রীমতী মাধবমোহিনী বসু স্বগীয়া শ্রদ্ধেয় ভগিনীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীমতী মণিকা

গুপ্ত, শ্রীমতী বাণী চাটার্জী ও শ্রীমতী সুধা সেন স্মৃতিকর্তে সঙ্গীত করিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য ব্রহ্মানন্দদেব ও শ্রীমতী ব্রহ্মমন্দির প্রার্থনাপাঠান্তে শ্রীমতী সৃণালিনী দেবী তাঁহার স্মৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সকলকে সুখী করিয়াছেন।

ঐ দিন পূর্নাই ৮টায়, কেশব একাডেমী বিদ্যালয়ে উৎসব হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যা আটায় ব্রহ্মমন্দিরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা হয়।

১৪ই মাঘ, শুক্রবার—৩নং রমানাথ মজুমদার ট্রাস্টে, প্রচার-কার্যালয়ের উৎসবে, অপরাহ্ন ৫টায় ব্রহ্মমন্দিরের খোলবাদক গোপীনাথ বাবাজি তাঁহার মধুর কণ্ঠে হরিনামগুণাত্মক সঙ্গীত করেন। কীর্তনান্তে মাননীয়া মহারাণী শ্রীমতী সূচাক দেবী স্মৃতি উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, অতীতে এখানে যে সকল প্রেরিত প্রচারক নববিধানপ্রচার-ক্ষেত্রের পুণ্য কার্যে আত্মজীবন দান করিয়া সেবার্ধ্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনের প্রভাব এখনও এখানে কেমন জীবন্ত অনুভূতির বিষয়, তাহা উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক শ্রীমদাচার্যদেবের ভারতপ্রমের একটি বিশেষ প্রার্থনা পাঠ করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজন হয়।

১৫ই মাঘ, শনিবার—সন্ধ্যা আটায় শান্তিকুটিরে “আমাদের সম্ভব” উৎসব হয়। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। উপাসনার পূর্বাঙ্গ ‘গৌরলীলা’ বিষয়ক যাত্রাগান হয়। প্রীতিভোজনে অদ্যকার অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১৬ই মাঘ, রবিবার—পূর্নাই ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু তাঁহার স্মৃতি সঙ্গীত করিয়া উপাসনার বিশেষ সহায়তা করেন। অপরাহ্ন ৩টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানবিশ্বাসিগণের সভা হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য করেন। তাহার লিখিত উপদেশ বারাস্তরে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৭ই মাঘ, শোমবার—ব্রহ্মমন্দিরে পূর্নাই ও অপরাহ্নে শ্রীদরবারের উৎসব হয়। সন্ধ্যা আটায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর বার্ষিক সভার কার্য হয়। শ্রীদরবারের উৎসব উপলক্ষে পূর্নাই ৯টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার প্রথমংশ নির্বাহ করেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পাঠ ও শেষ প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে শ্রীদরবারের বার্ষিক সভা হয়।

১৮ই মাঘ, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা আটায় কমলকুটিরে নবদেবালয়ে শান্তিবাচন হয়। নবদেবালয়ে ও দেবালয়ের সম্মুখস্থ রোয়াকে মহিলাগণের স্থান হয় এবং নবদেবালয়ের সম্মুখস্থ সমাধি-ক্ষেত্রে পুরুষগণের বসিবার স্থান হয়। পূর্বাঙ্গের কীর্তন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্তনের নেতৃত্ব করেন। মধ্যে ভাই

গোপালচন্দ্র গুহ সমরোপযোগী প্রার্থনা করেন, ঐশ্বর্য নিষ্ঠলচন্দ্র সেন ঐশ্বর্যদেবকৃত শাস্তিবাচনের প্রার্থনা পাঠ করেন। এইরূপে এবারের উৎসবের কার্য শেষ হয়। নববিধান-জননীর কুপার এবারকার উৎসব সকলের জীবনে সার্থক হউক।

## স্বর্গীয় ভাই শান্ত সাধক ।

প্রেরিত ভাই কেদারনাথ বর্গাব শান্তসাধক ছিলেন, তাই ঐশ্বর্য আচাধ্যাদেব দেখিয়া বুঝিয়া শান্ত সাধক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। ভাই কেদারনাথ অতি শৈশবকাল হইতেই এই প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন। ছোট বড় সকলের সঙ্গে স্থলী বালকের মত মিষ্ট ব্যবহার করিয়া সকলের মন তুষ্ট করিতেন।

বিদ্যার্জন করিয়া বড় হইয়া ২১ বছর বয়সে যখন বিবাহ করিলেন পরিত্রাশ মন্দিরটকে, সেখানে অনেক মেয়েরা ভাই কেদারনাথকে উপহাসাস্পদ করিবার জন্য নানা প্রকার বাক্যাড়-ঘর করিতে লাগিল। তিনি শান্তভাবেই রহিলেন দেখিয়া মেয়েরা নানা রকম কৌতুক আরম্ভ করিতেছিল। কিছুতেই ভাই কেদারনাথকে টলাইতে না পারিয়া অবশেষে বলিতে লাগিল, “বাড়ী বা কোথা, নাম বা কি? থাক বা কোথা, খাও বা কি?” তৎক্ষণাৎ ভাই কেদারনাথ নিজের মন থেকে বলে-ছিলেন, “বাড়ী আমার হরিমাতী, নাম আমার হরিদাস, খাই আমি হরিতকী, হরিগদে বসবাস।” সত্যি চিরকাল দেখেছি, পিতৃদেব হঠকু খুব ভালবেসে খাইতেন। আমাদের কনিষ্ঠ ভাইটিও এ বিষয়ে তাঁর মত হয়েছেন। পিতৃদেব স্বমাহারী ছিলেন। বেল, বাতাবী লেবু, কালজাম, আনারস ইত্যাদি পেট ও লিভারের উপকারী যে সকল ফল, তাহাই আদর করিয়া খাইতেন। সর্কদা কোন দ্রব্য মুখে দিতেন না।

ভাই কেদারনাথ ক্রিয়াকর্ম সহিষ্ণু ও শান্তিপ্রিয় ছিলেন, তাহা মণ্ডলীতে, পরিবারে ও জগতে অনেকেই অংগত আছেন। শরীরসম্বন্ধে ঐশ্বর্য মনে তাঁর সহিষ্ণুতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইত। পৃথিবীতে যোগ শোক ও নানা পরাকার মধ্যে কখনও তাঁকে ব্যাকুল হইতে দেখা যায় নাই। সংসারে অপ-মানিত হইয়া লোকে বিরক্ত হয়, কিন্তু ভাই কেদারনাথের প্রকৃতি সে পরণের ছিল না। সবার সহিত কোমলভাবে বাক্যালাপ করিতেন। সহিষ্ণুতার অবতার হইয়াই যেন ভাই কেদারনাথ দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাই কেদারনাথ দেব উত্তরাধিকারী বংশধরগণ তাঁর সকল গুণগ্রাম প্রাপ্ত হউক এবং নববিধানের জগতে তিনি চিরজীবী থাকুন।

ভাই কেদারনাথ দে খাঁড়ুরা মঙ্গলালয়ে, ৮ই মার্চ (১৮৯৭খঃ), ২৫শে ফাল্গুন, রবিবার, শিৱরাত্রি তিথিতে, রাত্রি ৯টার সময় স্বর্গারোহণ করেন। সেই রাত্রি আমরা সকলে জাগিয়া

ব্রজনাথ গান করিতে লাগিলাম। মহাদেবের মত প্রকৃতিটা তাঁর ছিল; তাই মা বলেছিলেন, আহা, যেন মহাদেব মহাপ্রাণ শয়ন করিয়া চিরমগ্ন হয়েছেন।

এ বৎসর ভাই কেদারনাথ দেব স্বর্গারোহণ দিন স্মরণ উপ-লক্ষে, কনিষ্ঠা কস্তা Patna G. H. School এর Principal কুমারী বনলতা দেবীর আবাসে, প্রাতে ৭টার সময় তত্ত্বাক্ষর ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন। কস্তাগণ সঙ্গীত প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্যদেবের “দলমত্রে শব্দশ্রবণ” ৮ই মার্চের প্রার্থনা হেমলতা পাঠ করেন। ডাক্তার পরেশনাথও মণ্ডলী ও দলের কথা এবং স্বর্গীয় ভাইয়ের শান্ত সাধন উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন।

প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দেব সুন্দর ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ জীবন-চরিত পাঠ করিলে, তাঁর পবিত্র জীবন বুঝিতে শিখিতে পারিয়া, শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হয়। সেই মহৎ জীবনের কিছু কিছু ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতে প্রকাশ করা আছে, সকলেই জানেন। আজ বৎসরকার স্মরণীয় পবিত্র দিনে, প্রজ্ঞার সহিত এই শান্ত সহিষ্ণু ভাবের দিক অল্পই বর্ণিত হইল। প্রজ্ঞার সহিত ৫ টাকা দান করা হইল।

সেবিকা—হেমলতা ।

## সংবাদ ।

পুরী নববিধানপ্রতিষ্ঠান—গত ৭ই মার্চ, তনং জীক রো ভবনে, পুরী সর্বসম্মত-নববিধান-প্রতিষ্ঠান কমিটির কলিকাতা মহা সভাগণের সভাপতিত্ব হয়। উপস্থিত ভাই গোপালচন্দ্র গুহ, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ, ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক; মহারানী সূচক দেবী উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু সভার কার্যে সম্মতি দান করেন। প্রার্থনা করিয়া কার্য আরম্ভ হয়। পুরী স্থানীয় কমিটির ১৮ই অক্টোবরের অধিবেশনের কার্যাবলীর পঠিত হয় ও তাহার নির্ধারণ সকল গৃহীত হইয়া নির্ধারণ হয় এবং তত্ত্বাক্ষর নবপ্রতিষ্ঠিত নবপর্ণকুটারনির্মাণের জন্য আয় ব্যয় তালিকাও পঠিত হইয়া স্থির হয়, কুটিরের দরজা জানালা নির্মাণ ও সংস্কারাদির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ও কুটিরনির্মাণের জন্য যে অল্প ঋণ হইয়াছে, তাহার জন্য অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা হউক। হিসাব দৃষ্টে দেখা গেল, কুটিরনির্মাণাদি কার্যে ৪৬৪৮/১০ ব্যয় হইয়াছে এবং এজন্য ৩৯৭ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে; সুতরাং এখনও ৬৭৮/১০ ঋণ আছে। আয়দার-বিবরণী অভূত করিয়া প্রকাশ করা হউক। সম্পাদক যে নবপর্ণকুটার ও নবঐশ্বর্য তুমি রক্ষণাবেক্ষণ জন্য একটা মালী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহাও কমিটি অনুমোদন করেন।

তীর্থ-যাত্রা—ভাই প্রিয়নাথ সঙ্গীক তীর্থবাস ও সেবা-সাধনের জন্য পুরী নবঐশ্বর্যে গমন করিয়াছেন।



**বসন্তোৎসব**—গত বসন্ত পূর্ণিমা উপলক্ষে, নবদেবালয়ের রোয়াকে, সন্ধ্যা ৫টার সময় বসন্তোৎসবের বিশেষ উপাসনা হয়। তাই প্রিন্সনাথ উপাসনা করেন ও তাই অক্ষয়কুমার লখ আচার্য্য-দেবের বসন্তোৎসবের উপদেশপাঠে সহায়তা করেন। তাই অখিলচন্দ্র রায় ভ্রাতা স্বতন্ত্রনাথ বহুর সহযোগিতায় সঙ্গীত ও সংকীর্ণন করেন। মঙ্গলবাড়ীর ভগ্নীগণ কেহ কেহ যোগদান করেন।

**গৌরান্দ-উৎসব**—গত ১৩ই মার্চ, সন্ধ্যা ৭টার, ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, গৌরান্দ-উৎসবে ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

**বিলাত-যাত্রা**—গত ১০ই মার্চ, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র, কেবল মেডিকেল স্কুলের জুনিয়র স্টেণ্ডেণ্ট বেকার এস, এম, মুখার্জি, অসুস্থ শরীরে চিকিৎসা-লাভার্থ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে ২০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ট্রাঙ্ক, তাঁহার ভ্রাতা মিঃ এন, এন, মুখার্জির গৃহে, বাজার পূর্বকণ্ঠে পরিবারের প্রায় সকলে সম্মিলিত হইলে, তাই অক্ষয়কুমার লখ শুভকামনা করিয়া প্রার্থনা করেন, মাতৃদেবী ও সন্তানের মঙ্গল ভিক্ষা করিয়া কাতরে প্রার্থনা করেন। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা তাঁহার সন্তানের জীবনে পূর্ণ হোক, তিনি তাঁহার সন্তানকে নিরাময় করুন।

**সেবা**—খাঁটুরা (গোবরডাঙ্গা) নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবকাণ্ড ও নববিধানবিধানী সাধক স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের স্বর্গারোহণের সাধ্বসঙ্গিক উপলক্ষে উপাসনা করিবার জন্ত, তাই গোপালচন্দ্র গুহ সঙ্গীক ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে খাঁটুরা যান। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার, পূর্বাঙ্কে খাঁটুরা চণ্ডীতলাতে স্বর্গীয়া কুমুদিনী দেবীর ধর্মজীবনের মহা পবিত্র হইতে উত্তীর্ণ হওয়া ঘটনা স্মরণে ব্রহ্মোপাসনা হয়। এ দিন পূর্বাঙ্কে ডাক্তার অমূলচন্দ্র মিত্র সঙ্গীক খাঁটুরা উপস্থিত হন। চণ্ডীতলার উপাসনায় তিনি সঙ্গীত করেন ও বিশেষ প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে খাঁটুরাপ্রবাসী, উপনিষৎ গীতা প্রভৃতি হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থাগারী কাজি সাহেবের সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ হয়। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। এ বেলা সঙ্গীতের কার্য্য শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায় নিকাহ করেন। পরদিন পূর্বাঙ্কে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়, অপরাহ্নে ৫টার পর মঙ্গললয়ে শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী রায়ের গৃহে পারিবারিক ভাবে উপাসনা হয়। তৎপর দিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার পূর্বাঙ্কে ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাধ্বসঙ্গিক উপাসনা হয়। কয়েক দিনের উপাসনাই তাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত কাজি সাহেব সঙ্গীক অধিকাংশ উপাসনার যোগদান করেন। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায় ও পারিবারিক উপাসনায় অপর কয়েকটি মহিলাও যোগদান করেন। এ দিন অপরাহ্নে প্রায় দুই ঘটিকার সময় স্থানীয় বালিকাবিদ্যালয়ে

ছাত্রীদিগকে তাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীযুক্ত শ্বেদেননাথ গুপ্ত উপদেশ দান করেন। অপরাহ্নে তাই গোপালচন্দ্র গুহ সঙ্গীক কলিকাতায় ফিরেন।

**নববিধানট্রাফ্ট**—গত ১২শে ফেব্রুয়ারী, পূর্বাঙ্কে, উন্টা-ভিগি ব্রহ্মমন্দিরে, নববিধানট্রাফ্টের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঈশ্বরভক্তের মাননীয় মহারানী শ্রীমতী সুরচাক দেবী সত্যেন্দ্রীর কার্য্য করেন। তিনি হৃদিত উপাসনা করিলে, সুযোগ্য সেক্রেটারী ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন রিপোর্ট আদি পাঠ করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। কার্য্যসমাপনান্তে জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। আমরা এই ট্রাফ্টের উত্তরোত্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করি।

**সাম্বৎসরিক**—গত ১৬ই ফাল্গুন, ৪নং ময়রা ট্রাফ্টে, স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্তের সাধ্বসঙ্গিকে এবং ২০শে ফাল্গুন ৯নং নিউ-পার্ক ট্রাফ্টে, স্বর্গীয় বি, এল, চৌধুরীর সাধ্বসঙ্গিক দিনে শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

গত ৭ই মার্চ, মঙ্গলবার স্বর্গগত ভক্তিভাজন প্রচারক তাই রামচন্দ্র সিংহের গৃহে, তাঁহার স্বর্গীয়া সহধর্মিণীর সাধ্বসঙ্গিক উপলক্ষে তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রবধূ শ্রীমতী ইন্দু প্রচার ভাণ্ডারে ২ টাকা দান করেন।

গত ১লা চৈত্র, ১১এ ময়মা তট্টাচাণ্ডা ট্রাফ্টে, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র দাসের সাধ্বসঙ্গিকে তাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন, ভগ্নী শ্রীমতী বিন্দুবাগিনী সেন প্রার্থনা করেন এবং প্রচারভাণ্ডারে ১ টাকা দান করেন।

গত ২৩শে মার্চ, কানীপুরে, ২৯নং হরেকৃষ্ণ শেঠ রোডে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সাধ্বসঙ্গিক দিনে তাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে সহধর্মিণী প্রচারভাণ্ডারে ১৫০, অনাথ আশ্রমে ৫০, অন্ধশূলে ৫০, নৃকবধির শূলে ৫০, কুষ্ঠাশ্রমে ৫০, আতুর আশ্রমে ৫০ ও বিধবা আশ্রমে ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১লা মার্চ, স্বর্গগত উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের সাধ্বসঙ্গিক দিনে, পাটনায়, তাঁহার পৌত্রী ও পৌত্রীজামাতা শ্রীমতী চিত্ততোষিণী ও শ্রীমান পূর্ণানন্দ পালের গৃহে, প্রিন্সিপাল এই দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন এবং স্বর্গগত আত্মার প্রাণ হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। নববিধানসমাজের প্রাণ তুমি সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

**দানপ্রাপ্তি**—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত দা দিগকে প্রণাম করিয়া, নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ভগবান্ দাতাদিগকে আশীর্বাদ করুন।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩—শ্রীযুক্ত মতিরাম আদভানী মাসিকদান ২৫০, শ্রীমতী সলো সেন মাসিকদান ২০, শ্রীযুক্ত কিত্তেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২০, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জি মাসিকদান ১০, শ্রীমতী মামবীলতা চাটার্জি মাসিকদান ১০, শ্রীযুক্ত গগন



মিহারী সেন মাসিকদান ১৯, স্বর্গীর অমৃতলাল ঘোষের পুণ্য-  
স্মৃতিতে মাসিকদান ২৯, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক-  
কালীন ১০৯, শ্রীযুক্ত মনোজীতধন দে মাস্তাসংস্রিক ২৯, শ্রীমতী  
বিনোদিনী দাস স্বামীর সাহসংস্রিক ১৯, ডাঃ উমাঙ্গসর ঘোষ  
মাসিকদান ২৯, মানমীরা মহারানী স্মৃতিতে দেবী এককালীন ৫০৯,  
রায় বাহাদুর জনিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২৯, শ্রীমতী  
মনোরমা মুখার্জি মাসিকদান ২৯, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার  
মাসিকদান ৫৯, স্বর্গগতা মানমীরা মহারানী স্মৃতিতে দেবীর দুই  
বাসের দান কুচবিহারে ছোট হইতে ৩০৯, রায় ব্রাদার্স ১১৮/০,  
শ্রীমতী ব্রজকুমারী নিয়োগী স্বামীমাতার সাহসংস্রিক ২৯ ও  
লেন্টেনার্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) পিতৃসাহসংস্রিক  
১০৯ টাকা।

## পুস্তক-পরিচয়।

১। Oriental Christ by P. C. Mazumdar.

২। True Faith by Minister K. C. Sen.

Navavidhan Publication Committee-র উদ্যমে ও  
চেষ্টায় সুন্দরভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। দুইখানিই অতি অমূল্য  
আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। ইহা প্রত্যেক গৃহে গৃহে আবৃত্ত্য হয়, ইহাই  
প্রার্থনীয়। Publication Committee-র উদ্যম সফল  
হউক, সর্বাত্মকরূপে কামনা করি।

৩। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সংকীর্তন—দ্বাদশ সংস্করণ। এবার উৎসব  
উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসঙ্ঘের উপাসকমণ্ডলীর চেষ্টায়  
এই সংস্করণ অতি নূতন ভাবে সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত  
হইয়াছে। ইচ্ছাতে সঙ্গীতগুলি যেরূপ নূতনভাবে শ্রেণীবদ্ধ  
হইয়াছে, তাহাতে উপাসনা, প্রার্থনা ও অন্তঃস্থানাদি উপলক্ষে  
সকলেরই বিশেষ সাহায্য হইবে। ইহারও বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।  
পুস্তকের আকার বর্ধিত হইলেও, মূল্য পূর্ববৎ ২৫০ টাকাই ধার্য  
হইয়াছে।

পূর্ব পূর্ব সংস্করণে নববিধানের অভিব্যক্তির ক্রম অনুসারে  
সঙ্গীত সকল সংকলিত ছিল; তাহাতে সংগীতে সাধনের ক্রম-  
প্রকাশ ও নির্দেশ করা বাহ্যতে পারিত। এবারে তাহার অনেক  
নিমিত্ত টপাকট হইয়াছে। এবার এবার যেমন কতকগুলি উৎকৃষ্ট  
সংগীত সংগীত সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, তেমনি বহু পুরাতন সাধনো-  
পায়ে নবী সঙ্গীত বাদও দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের কভরের বৃদ্ধি  
কমপক্ষে তথ্যই সম্ভব একরূপ করিতে হইয়াছে। তাই আমাদের  
আশা, সেই সমুদয় পরিত্যক্ত সঙ্গীত এবং আরো বিভিন্ন সাধ-  
কের বাছা বাছা সাধনসঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া, আর এক খণ্ড  
সঙ্গীতপুস্তক বাহির করিতে পারিলে ভাল হয়। এ সম্বন্ধে মিশন  
আফিস কিংবা নববিধান পাবলিকেশন কমিটিকে উদ্যোগী হইতে  
আমরা অনুরোধ করি।

৪। Keshub Chunder Sen And The Cooch Behar  
Betrothal 1878 by Rosanto Kumar Sen M.A (Cal),

M.A.L.L.D. (Cantab). The Book Company Ltd, 41-4A  
College Square, Calcutta, 1933, কর্তৃক প্রকাশিত। এই  
পুস্তকখানিতে কোচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত  
শ্রীমতী সুনীতি দেবীর বাগদান স্বাক্ষর অমূল্য বৃত্তান্ত হস্তলিপির  
কটো সংলিখিত বহু প্রমাণ প্রমাণ সহ লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত  
হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেওয়ান প্রশান্তকুমার সেন তাঁহার বিবিধ  
বৈষয়িক কার্যের বাস্তবতার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়াও যেরূপ গবেষণা-  
পূর্ণ, স্থলিত সুন্দর ইংরাজীভাষায়, নৈপুণ্যসহকারে পুস্তকখানি  
প্রণয়ন করিয়াছেন, তজ্জন্ত সমগ্র বিধানমণ্ডলীর সহিত তাঁহাকে  
অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া থাকিতে পারি না। ভ্রাতৃ  
প্রশান্তকুমার বাস্তবিকই কোচবিহার-বিবাহের অপ্রকাশিত  
তথ্য, যাহা না জানিয়া কত সরল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিও নানা প্রকার  
ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশবর্তী হইয়াছিলেন এবং বাহার জন্ত  
ব্রাহ্মসমাজে বিবাদানল প্রজলিত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া  
কেবল এ মণ্ডলীর নয়, সমগ্র বিশ্বজনীন ধর্মসমাজেরই পরম  
উপকার সাধন করিয়াছেন। যথাসময়ে ইহা বাহির হইলে,  
এ দেশের ও নানবসমাজের আরো যে কত উপকার হইত,  
বলা যায় না। যাহা হউক, বিবাহের বিধানে যখন বাহ্য হইবার  
তাহাই হয়, বাহ্য দ্বারা বাহ্য করাইবার তিনিই করাইয়া থাকেন।  
ভ্রাতা প্রশান্তকুমার তাঁহার হস্তের যত্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া যে  
ধন্য হইলেন এবং আমাদিগকেও ধন্য করিলেন, এতত্ত্ব অপর  
সহিত তাঁহার প্রভুত কলাগণ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।  
তিনি স্ত্র শরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া, নববিধানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা  
এই জীবনে প্রকাশ করিয়া বিধানের গৌরব রক্ষা করুন,  
এই প্রার্থনা করি।

৫। নৈবেদ্য—শ্রীযুক্ত কামাখানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং  
কলিকাতা ৪৪নং নিউথিগেটের রোড হইতে প্রকাশিত, কাপড়ে  
বাঁধাই, মূল্য ১৯ টাকা মাত্র।

ঐচ্ছিকতার অভিজ্ঞতাপূর্ণ সাধনশীল জীবনে, শুভমুহুর্তে যে  
সকল চিন্তা ও ভাবধারা উদ্ভিত হইয়াছে, এবং সাধন-ক্ষেত্রে  
সময় সময় যাহা নিবেদন করা হইয়াছে, তৎসমুদয় একত্রিত হইয়া,  
ভগবৎপ্রেম জীবনের “নৈবেদ্য” রূপে গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ইহা পাঠ  
করিয়া সকলে আনন্দ পাইবেন এবং জীবনের ধর্মজিজ্ঞাসা ও  
তত্ত্বাসন্ধানের পথে কিছু না কিছু আলো লাভ করিবেন, আমরা  
আশা ও বিশ্বাস করি।

Edited on behalf of the Apostolic Durban  
New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-  
nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেসে”

শ্রীপরিভোষ ঘোষ কর্তৃক ১৭ই চৈত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

সুবিশালমিথং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।

চেতঃ সুনির্মলস্তীর্ণং সত্যং শাস্ত্রমনন্তরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।

স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ত্রাশ্চৈবৈবং প্রকীৰ্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

৭ম সংখ্যা।

১লা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

14th April, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা।

হে বিশ্বরাজ, কোন্ স্মরণাতীত যুগে প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ ধ্বনি করিলেন, “ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি।” মানবকুল সে ধ্বনি কাণে লইল না। তৎপর তোমার প্রেরিত সন্তান শ্রীবুদ্ধ রাজ্যধনে জলাঞ্জলি দিয়া, আপনার জীবন ও আপনার প্রতিষ্ঠিত সজ্জ্ব দ্বারা ঘোষণা করিলেন, সকল প্রকার বাসনা-নির্বাসনে শাস্তি ও শাস্তত আনন্দ। পৃথিবী তাঁহার কথাও কর্ণে লইল না। তৎপর তোমার প্রিয়পুত্র শ্রীঈশা ঘোষণা করিলেন, “অগ্রে স্বর্গরাজ্য ও ধর্ম অন্বেষণ কর, পৃথিবীর আর যাহা কিছু তোমাদের প্রয়োজনীয়, তোমাঙ্গিকে দেওয়া হইবে”, “ধর্মের জন্ম ক্লুধিত ও পিপাসু যাহারা, তাহারা ধন্য, কেন না তাহারা পূর্ণ হইবে”, “যাহারা সত্যতঃ অন্তরে গরিব, সেই দীন-আরা ধন্য, কেন না স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই”, “সূচির ছিদ্রমধ্যে উষ্ট্রের প্রবেশ বরং সম্ভব, কিন্তু ধনীর স্বর্গগমন সম্ভব নয়; তবে মনুষ্যের পক্ষে যাহা সম্ভব নয়, ঈশ্বরের কৃপায় তাহা সম্ভব হয়”। তোমার প্রিয়পুত্র আপনার প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়াও, তাঁহার এ সব স্বর্গীয় বাণীর প্রতি পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। হে চির জাগ্রত, চির জীবন্ত দেবতা।

তুমি আপনার চক্ষে দেখিতেছ, পৃথিবীর জ্ঞানে, গুণে, বিদ্যা, বুদ্ধিতে, ধন ঐশ্বর্যে শ্রেষ্ঠ যে সকল জাতি, শ্রেষ্ঠ যে সকল সম্প্রদায়, তাঁহারা আরও পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্যের লালসার অগ্নি আপনাদের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত করিয়া, আপনারাও তাহাতে দগ্ধ হইতে চলিয়াছেন, পাড়া প্রতিবাসিগণকেও সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্ম আহ্বান করিতেছেন। পৃথিবীর রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, গরিব, কাঙ্গাল আজ এই কামনা বাসনার এবং অসার ধনৈশ্বর্যের কামনাজনিত হিংসা ঘেষের বিষম দাবাঘিতে দগ্ধ বিদগ্ধ হইয়া মরিতেছে। আজ রাজা প্রজা কাহারও প্রাণে শাস্তি নাই, স্বদেশে শাস্তি নাই, বিদেশে শাস্তি নাই; শাস্তিহারা হইয়া মানবকুল আর কতদিন জীবন ধারণ করিবে? তাই স্বদেশের জন্ম, বিদেশের জন্ম, রাজার জন্ম, প্রজার জন্ম, সকল মানবকুলের জন্ম এই প্রার্থনা করি, তুমি স্বয়ং প্রতি মানবের অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া, তোমার স্বর্গরাজ্যের অবতরণের ব্যবস্থা তুমি কর; তোমার পাষণবিদারণ বজ্রধ্বনিতে সকলের প্রাণ বিকম্পিত করিয়া, তোমার মাধুভক্তদিগের বিঘোষিত বাণী আপনার শ্রীমুখের নূতন বাণীতে ঘোষণা কর। সকলে অসার ছাড়িয়া, হে সারাৎসার তোমাকেই আশ্রয় করুক, অবলম্বন করুক, জীবনের গৌরব বলিয়া গ্রহণ

করুক। তুমি স্বয়ং পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য, সন্মিলনের রাজ্য আনয়ন কর, প্রতিষ্ঠিত কর। নিরুপায় হইয়া, হে নিরুপায়ের উপায়, এই নববর্ষান্ত্রে তোমার চরণে সকলের জন্ত শান্তি প্রার্থনা করিয়া, বার বার প্রণাম করি।

শান্তি:                      শান্তি:                      শান্তি: !

## নববর্ষাগমে।

নববর্ষাগমে মার নবশিশু ব্রহ্মানন্দ সনে মাতৃচরণ বন্দনা করি। যুগে যুগে যুগধর্মবিধান লইয়া যত ভক্তাবতার অবতীর্ণ হইয়াছেন, নব নব বিধান প্রচারপূর্বক মানবসমাজে নব নব জাগরণ, নব নব জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে স্মরণ করি, প্রণাম করি, বরণ করি। যাঁহারা জ্ঞানবিজ্ঞানসঞ্চারে, দেশহিতৈষণা-প্রবর্তনে ও পরার্থপর সেবাসাধনায় জগজ্জনের নানা প্রকারে কল্যাণ বিধান করিয়াছেন ও করিতেছেন, সকলকে অভিবাদন করি।

হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান, শিখ, পার্সী, আর্য্য ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের যত প্রেরিত প্রবর্তক, যোগী ঋষি ভক্ত, ফুজী, মোল্লা, পাদ্রী, প্রচারক, সেবক, সাধক সকলকে প্রণাম করি। রাজা, রাষ্ট্র-প্রতিনিধি, দেশসেবক এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ সহযোগী, সহকর্মী এবং সহসাধক সকলকেই অবলুপ্তি চিতে অভিবাদন করি।

নববিধান সর্বধর্মসম্মতবিধান, সর্বজাতীয় বিধান; তাই সর্বস্বান্বলম্বীকেই এই নববিধানান্তর্গত বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি এবং অসাম্প্রদায়িক প্রেমে, যাঁহাকে আর্হি দেয়, তাঁহাকে তাহা অর্পণ করি। যাঁহার নিকট যাহা গ্রহণীয়, তাঁহার নিকট হইতে তাহা গ্রহণের আলোকে গ্রহণ করি।

অদ্যকার ১লা বৈশাখ দিনে, নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ সতী ব্রহ্মানন্দিনী সহযোগে গৃহভ্যাগী হইয়া, প্রধানাচার্য্য মহর্ষিদেব কর্তৃক আচার্য্যপদে অভিষেক লাভ করিলেন; এবং তিনিই আবার এই নববর্ষোপলক্ষে, নববিধানের প্রেরিতগণকে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা, শুদ্ধতার ব্রত গ্রহণপ্রেরণায় দান করিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া

অন্ত আমরাও বিশেষভাবে বিশেষ বিশেষ ব্রতগ্রহণে, নববিধানের মহিমা নিজ নিজ জীবনে সাধনে নিরত হই।

এই পুরাতন বর্ষের বিদায়কালে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকগণ কেহ বা সন্ন্যাস, কেহ বা রোজা, কেহ বা "লেষ্ঠ" সাধনে আত্মসংযমব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্মোন্নতিকল্পে নিরত হন; প্রকৃতিতেও এ সময়ে বৃষ্কাতির পুরাতন পল্লব নিঃশেষ হইয়া নবপল্লবের উদগম হয় এবং বসন্ত সমীরণে বিশ্ব যেন নবজীবনে মুখরিত হয়। নববিধান আমাদের কাছে ও বিশ্বকে নিত্য নব নব জীবনে সঞ্জীবিত করিবার জন্তই অবতীর্ণ; সুতরাং পুরাতন বর্ষের সহিত আমরাও পুরাতন জীবনকে বিদায় দিয়া, নববর্ষসমাগমে নববিধানের প্রভাবে সত্যি যেন আমরা, সমগ্র দেশ, জাতি এবং বিশ্ব নববিশ্বমানবসঙ্গে নবজীবনলাভে ধ্যস্ত হই এবং তদ্বারা নববিধানকে গৌরবান্বিত ও সপ্ৰমাণিত করিতে সক্ষম হই, মা আমাদেরকে এমন আশীর্ব্বাদ করুন। বিধাতার বিধানে এ বৎসর শুভ শুক্রবার দিনেই নববর্ষারম্ভ; তাই ব্রহ্মানন্দন-শ্রীঙ্গেশ্বর সনে পুরাতন পাপজীবনকে ক্রুশাহত করিয়া, দ্বিজহুলাতে যথার্থই নববিধানের নবজীবনে পুনরুত্থান করি।

## পুণ্য বৈশাখ।

বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ মাস, ভারতের আর্য্য-জাতির নিকট বিশেষ পুণ্যমাস। গ্রন্থ পড়িয়া শিখিতে হয় না, সাধু ভক্তের উপদেশ লইয়া জানিতে হয় না, প্রকৃতিই এ বিষয়ে পরম গুরু। সময় চক্রবৎ ঘুরিতেছে, বাইতেছে, আসিতেছে; সময় আপনার বিশিষ্টতার পরিচয় আপনি প্রদর্শন করিয়া, আপনার গুরুত্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বাহিরে সময়ের কোন ভাষা নাই, বাঙ্গলা, ইংরেজি, আরবি ইত্যাদি ভাষা সময়ের ভাষা নহে, আপনার প্রকৃতিই সময়ের নীরব ভাষা। শীত আপনার ভাষায় কথা বলে, বসন্ত আপনার ভাষায় কথা বলে, গ্রীষ্ম আপনার ভাষায় কথা বলে, নব বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখও আপনার ভাষায় কথা বলিয়া আপনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দান করে। নব বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ মাস নূতন আকাশ লইয়া, নূতন বাতাস লইয়া, নূতন বেশ লইয়া, সর্ববিপারি নূতন সূর্য্যকে

আপনার বল, সম্বল ও ঐশ্বর্যরূপে ভূষণ করিয়া, বঙ্গ ভারতে উদীয়মান হইয়া থাকে। শীত ও বসন্তের পরে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, বৈশাখের সূর্য্যকে প্রবলপ্রভাপান্বিত মনে হয়, বৈশাখ হইতে দিনও ক্রমে বাড়িতে থাকে।

বৈশাখের অমুক্ত আকাশে মধ্যাহ্ন সূর্য্য খুব প্রখর হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে মানবের কর্মজীবন নবোদ্যমে পূর্ণ হয়ে উঠে, এবং ধর্মজীবনও তপস্যার তীব্রতায় অগ্নিময় হয়। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি ভিতরে ভিতরে চায়, সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যময় যিনি তাঁহাকে ধরিতে, সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি তাঁহাকে পাইতে। গন ছোট কিছু লইয়া যেন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না। বৈশাখের সূর্য্য আপনার প্রবল প্রভাপ পরিচালনা করিয়া, সূর্য্যের সূর্য্য পরম সূর্য্য যিনি, তাঁহার একটু পরিচয় দান করে; বৈশাখের দীর্ঘ ও প্রখর দিন আলসা, জড়তা ও ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া, হৃদয় মন আত্মার প্রসারের দিকে মানবের সাধনাকে প্রখর করিয়া তোলে।

আবার বৈশাখের সূর্য্যের প্রখরতায়, অগ্নিময় তেজে পৃথিবীর দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। কোন স্থানে কোন দুর্গন্ধময় পদার্থ, কোন দূষিত সামগ্রী পুঞ্জীকৃত হইলে, তাহা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া, সে স্থানকে লোকে নিরাপদ করিয়া থাকে। এমন সকল দূষিত পদার্থ নানা স্থানে, নানা ভাবে, মানুষের জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে, এমন বহুল পরিমাণে পৃথিবীবক্ষে পুঞ্জীকৃত হয়, মানবীয় কোন শক্তি, মানবীয় কোন চেষ্টা, মানবের বুদ্ধি কোন উপায়ে তাহা দূর করিয়া পৃথিবীবক্ষকে আবর্জ্ঞানামুক্ত করিতে পারে না। বৈশাখের সূর্য্য বিধাতৃশক্তির নিয়োগে আপনার উত্তাপ দ্বারা সে সকল ভস্ম করিয়া, নষ্ট করিয়া, পৃথিবীবক্ষকে সকল প্রকার দূষিত পদার্থ হইতে মুক্ত করে। তাই বৈশাখের সূর্য্য বুদ্ধি ঈশ্বরের পুণ্যস্বরূপের প্রতীক। তাই বুঝিয়া না বুঝিয়া, স্বভাবের নিয়মে, বঙ্গভারতের নরনারীর সরল প্রাণ সহজে বৈশাখ মাসকে পুণ্য মাস বলিয়া গ্রহণ করে, স্বীকার করে, বৈশাখ মাসে দান তপস্যাাদি পুণ্য কার্য্য সম্পাদন করে। সত্যই বৈশাখ মাস তাহার স্বাভাবিক নানা আয়োজনের ভিতর দিয়া পুণ্যের পোষাক পরিধান করে, বঙ্গভারতের সরল ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীর অন্তরে বিশেষরূপে ঈশ্বরের পুণ্য-স্বরূপের স্ফূর্ত্তি দাখ করে; তাই বঙ্গভারতের নরনারীর নিকট অজানিতকাল হইতে বৈশাখ মাস পুণ্য মাস।

অর্থীজাতির জীবনে বৈশাখ মাস বিশেষ তীর্থমাস বঙ্গভারতের নরনারী এই বৈশাখ মাসে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মতত্ত্বাদি গ্রহণ করিয়া, আপনার ইচ্ছা দেবতার পূজা বন্দনা, দান ও তপস্যার দ্বারা নিজের ধর্ম্মভাবের পরিপুষ্টি সাধন করেন, নিজেরা উচ্চ তৃপ্তি লাভ করেন, অগ্নকেও উচ্চ তৃপ্তি দান করেন। পুণ্যমাখা বৈশাখ মাস, সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রতপ্ত বৈশাখ মাস, সাধারণ নর-নারীর জীবনে ধর্ম্মজীবন এবং উচ্চ আশা ও উৎসাহদান-কারী বৈশাখ মাস গীতার এই শ্লোকটি আপনার কার্য্য দ্বারা নীরবে ব্যাখ্যা করে:—“পুণ্যগন্ধঃ পৃথিব্যাক্ষ তেজ-শ্চাস্মি বিভাবসৌ। জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপস্যাস্মি তপ-স্বিধুঃ॥” শ্রীভগবানের উক্তি:—“আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, আমি চন্দ্র সূর্য্যের তেজ, আমি সকল ভূতের জীবনস্বরূপ এবং আমিই তপস্বিগণের তপসা।”

আমাদের নবধর্ম্ম, নববিধান জাতীয় বিধান। আমরা নববিধানের লোক। প্রাচীন হিন্দুর জাতীর আচরণ ও অনুষ্ঠানে যাহা কিছু স্বর্গীয়, তাহাই আমাদের অতি আদরে গ্রহণীয়। আমরা বঙ্গ ভারতের সকল ভাই ভগ্নীর সহিত একপ্রাণ ও একহৃদয় হইয়া, পুণ্য বৈশাখে পুণ্য ত্রুত যথাসম্ভব সাধন করি। বৈশাখের সূর্য্যোত্তাপ আমাদের সূর্য্যের সূর্য্য, পরম সূর্য্য, পর ত্রেক্সের তীব্র উত্তাপ গ্রহণ উদ্বুদ্ধ করুক। বৈশাখের নদীবক্ষঃপ্রবাহিত স্নানীতল তরুণ বারিরাশিতে আরামপ্রদ অদগাহিত স্নান আমাদের জীবন্ত ঈশ্বরের নবজীবন-প্রদ, অমৃতময়, পুণ্যময় আবির্ভাবরূপ পুণ্য গঙ্গাতে, পুণ্য সমুদ্রে অবগাহনস্নানের দিব্য আশীর্ব্বাদলাভের জন্ত ব্যাকুল করিয়া তুলুক। এ সময় আমাদের সকল প্রকার আধ্যাত্মিক জড়তা ও আলসা বিদূরিত হউক। জীবনে তপস্যার অগ্নি ধপ্ ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠুক। আমরা বাহিরের চন্দ্র সূর্য্যের তেজের মধ্যে আমাদের পরম ইচ্ছা দেবতা ঈশ্বরের স্বর্গীয় তেজ প্রত্যক্ষ করি। এই পুণ্য মাসে গৃঢ় ভাবে সেই পরম পুণ্যময়ের প্রকাশ, নদ নদী, ফল ফুলে, সকলের পূজা বন্দনায়, দান তপস্যায়, আচার ব্যবহারে দর্শন করি, সন্তোষ করি। আমাদের নিজ জীবনের তপস্যার ভিতরে পূজা বন্দনা যোগে প্রত্যক্ষ করি, কেমন তিনি আমাদের জীবনে জীবনস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতে জীবনস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের সকল তপস্যায় পরম তপ, পাম অগ্নি তিনি, ইহা প্রত্যক্ষ

করিয়া, সেই অগ্নিতে, সেই তাপে এখন বিশেষ ভাবে আমরা উত্তপ্ত হই।

## ধর্মতত্ত্ব।

নববিধানের বিশেষত্ব ও মূতনত্ব।

১। নববিধানের ঈশ্বর জীবন্ত সত্য ঈশ্বর। যিনি চির পুরাতন, তিনি নিত্য নূতন। তিনি চিন্ময় নিরাকার হইরাও, প্রত্যক্ষ ব্যক্তির জ্ঞান তাঁহাকে যে দেখিতে চায়, তাহাকেই প্রত্যক্ষ দর্শন দেন; যে তাঁর কথা শুনিতে চায়, তাহার সঙ্গে কথা কন। এই ঈশ্বর ভিন্ন আর অল্প ঈশ্বরের নববিধান পূজা করেন না, আর তাহারও নিকট মাথা হেঁট করেন না; কারণ ইহার জ্ঞান সর্বোচ্চ-জ্ঞানের ঈশ্বর আর নাই। ইনি সচিদানন্দবিগ্রহ, অথচ স্নেহময়ী জননীরূপে প্রকট।

২। নববিধানের উপাসনা নিত্য নব নব প্রাণপ্রদ, জীবন-প্রদ। ইহা যোগ, ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, সেবা, সংসারধর্ম প্রভৃতি সকলের পরাকাষ্ঠাভাৱের উপায়। ইহা সর্বধর্ম, সর্বশাস্ত্র, সর্বসাধনের মিলন ও তত্ত্ববাখ্যানের সন্ধান। ইহা বিশ্বমানব-জীবনলাভের অঙ্গপান বা উপাদান। মাতৃস্বত্ত্বে যেমন দেহ-পুষ্টির সমুদয় উপাদান নিহিত, নববিধানের উপাসনাও তদ্রূপ সর্বোচ্চ ধর্মজীবনপুষ্টির উপাদান।

৩। নববিধানের শাস্ত্রমত জীবন। জীবনের প্রত্যক্ষ, অভিজ্ঞাত ও সাধিত সত্য বিনা নববিধান অল্প শাস্ত্রের আদর করেন না এবং সর্বধর্মের সর্বশাস্ত্রকেই নিষ্ঠার সহিত জীবনে সাধন করেন; কেবল সর্বশাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানলাভে ইহার তুষ্টি বা তৃপ্তি হয় না।

৪। নববিধান কোন ধর্মসম্প্রদায়কে পর বলিয়া মনে করেন না। সম্পূর্ণ অসম্প্রদায়িক প্রেমে সকলকে এক মার সন্তান বলিয়া ভালবাসেন ও আদর করেন। যাহার যাহা বিশেষত্ব, তাহা গ্রহণ করেন; যাহার যাহা অভাব বা অপূর্ণতা, তাহা মানবীয় বলিয়া রূপাপাত্রবোধে তাহার অল্প মার কাছে প্রার্থনা করেন। নববিধান কোন মানুষকে ঘৃণা করেন না। শরীরের রোগে রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি যেমন স্নেহবাবহার কর্তব্য, পাপরোগে রুগ্ন ব্যক্তির প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করেন। নববিধান আরো বিশ্বাস করেন, সমগ্র মানবজাতি একই পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করিয়া, কেবল এক পরিবার নয়, কিন্তু একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ, তেমনি সকল মানব একটি দেহ, সেই ভাবে পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করা নববিধানের অঙ্গুষ্ঠ।

৫। সকল বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য, বিচিত্রতার একতা, স্বাধীনতার অধীনতা, মূর্ত্যে সত্যে অভেদ ভাব ও সময়সাধন, ইহাই নববিধানে বিশেষ নূতন।

ভিতর বাহির সমান নয়।

ভিতরে বৈরাগ্যের গৈরিক পরিধান করিবে, বাহিরে গৃহী ব্যক্তি যেমন বেশ ভূষা করেন, তেমনি করিবে। ইহার বিপরীত যে করে, সে প্রবন্ধক। সবার সহিত সমান ব্যবহারও করিবে না, যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা দিবে। ধার্মিককে সম্মান করিবে, অধার্মিককে রূপাপাত্র জানিরা স্নেহে সংশোধন করিবে।

নববিধানের বসন্তসমীর্ণ।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ বালুকণাকে পৃথক উত্তপ্ত করিতেছে, কিন্তু মহাসাগরের দ্বিধ সন্নিবেশ এমনই প্রবলবেগে বহিতেছে যে, সে উত্তাপ গারেও লাগে না, সে সমীরণে শরীর কতই শীতল হইতেছে। নববিধানের বসন্তসমীর্ণও সংসারের উত্তাপে উত্তপ্ত আত্মার পক্ষে এমনই আরামদায়ক ও শান্তিপ্রদ।

মহাসাগরের উপকূলে।

সংকীর্ণ মনকে যদি উদার ও প্রশস্ত করিতে চাও, তবে মহাসাগরের উপকূলে আদিরা অনিমেষনয়নে তাকাইয়া দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে পড়িতেছে যেমন, তেমনি সমুদ্র বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। উপরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ, ভিতরে প্রশান্ত ভাব ও অপ্রশস্তা। পৃথিবীতে স্বর্গের বাতাস সন্তোষ করিয়া যদি শাস্ত হইতে চাও, মহাসাগরের পবিত্র নিশ্বাস সমীরণ সেবন কর। শরীর মন আত্মা স্নিগ্ধ হইবে।

## ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহনের শতবার্ষিক সান্মৎসরিক।

আমাদিগের ধর্মপিতামহ মহাত্মা রাজর্ষি রামমোহন ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডস্থ ব্রিষ্টল নগরে দেহ রক্ষা করিয়া মতাপ্রসারণ করেন। বর্তমান ১৯৩৩ অব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজর্ষির স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী হইবে। এই মহাদীন যথাযোগ্যভাবে সম্পাদনের জন্ত মাননীয় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে একটি সভা সংগঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহিত দেশমণ্ডল অস্তিত্ব সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে লইয়া এই সভা গঠিত হইয়াছে। আশা করি, এই মহা অনুষ্ঠান সর্বোচ্চরূপে সুসম্পাদন করিয়া, মহাত্মা রাজর্ষির প্রতি প্রজ্ঞাদানে সমগ্র দেশ এবং সমগ্র জাতি বাহাতে ধৃত হয়, উদ্যোগকারী সভ্যমহাশয়গণ এমন আয়োজন ও ব্যবস্থা করিবেন।

সত্যই ত্রীনববিধানাচার্য্য যেমন বলিলেন, “শত সহস্র টাকার ঋণে আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী। তিনি আমাদিগের তত্ত্বি-



ভাজন, কৃতজ্ঞতাভাজন। আমরা তাঁহার নিকট একটি বিস্তীর্ণ জমিদারী পাইরাছি, সেই তালুকের প্রজা আমরা। তরানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি একখণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলির প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। অরবিকারে কণ্টকবনে লোকে মরিতেছিল। এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড, ইহা হইতে ব্রহ্মের আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল, আবার কয়েকটা লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে লাগিল। ভগবান তাঁহার পুত্র রামমোহনকে পাঠাইলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের তিনি ধর্ম্মপিতামহ। তাঁহার জন্ম ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনাদের মস্তক উন্মোচন করিয়াছে। তাঁহার স্তব স্তুতিতে, বিদ্যা বুদ্ধিতে, পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা চলে। এই জন্ম তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতাকুলে গলার জড়াইয়া রাধি। সেই ধর্ম্মপিতামহ এত উপকার করিয়া গেলেন, তিনি হাতে হাতে ধর্ম্মদান দিয়া গেলেন।”

বাস্তবিক তিনি কতই বড়লোক বা রাজা ছিলেন, অথবা কিরূপ কার্যকুশল ছিলেন, কি প্রকারে তিনি আপনাকে সুবিধাত করিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি এদেশের ও পাশ্চাত্য দেশের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এ সমুদয় আমাদের বিচার করিবার নয়। এ সমুদয় অপেক্ষা তিনি যে বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বর্তমান নবযুগধর্ম্মবিধানের বীজ বপন করিলেন ও সর্বধর্ম্মশাস্ত্র মন্বন করিয়া একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং সর্বধর্ম্মসম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিদিগের, একত্রে মিলিত হইয়া, একেশ্বরের স্তব স্তুতি বন্দনা আরাধনার জন্ম ব্রাহ্মসভা গঠন করিয়া উপাসনাগৃহ স্থাপন করিলেন, ইহাই তাঁহার সর্বোচ্চ কৃতিত্ব এবং এই জন্মই তাঁহার নাম জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চির খোদিত থাকিবে, এবং এই জন্মই তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ ব্যক্তিগত ও ধর্ম্মগত সম্বন্ধ। তিনি আমাদের ধর্ম্মপিতামহ, ইহাই উপলব্ধি করিয়া বাহাতে আমরা তাঁহার শতবার্ষিক শ্রাদ্ধসম্মেলন সম্পাদন করিতে পারি, ওজ্জ্বল যেন এখন হইতে আমরা বিশেষ প্রস্তুত হই।

এই উপলক্ষে রাজর্ষির প্রতি শ্রদ্ধার্পণার্থ, আমরা উদ্যোগ-কর্ত্তাদিগকে যেমন লিখিয়াছিলাম, তাহার অনেকগুলি প্রস্তাবই তাঁহার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। তাঁহার হৃদয় করিয়াছেন, মহাত্মা রাজর্ষির প্রকাশিত ও অপকাশিত লেখা, বক্তৃতা ও পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবেন ও অল্প মূল্যে তাহা প্রচার করিতে চেষ্টা করিবেন। তাঁহার লব্ধক্রে এ দেশের ও বিদেশের মনীষিগণ যিনি যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাও সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের দ্বারা ধর্ম্মসংঘ সংগঠন করিয়া, বাহাতে স্থানে স্থানে তাঁহার সন্মুখে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃগণ আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইবে।

এদেশের ও বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের নেতৃগণ এবং বিশেষতঃ বিলাতের ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের বন্ধুগণ বাহাতে রাজর্ষির শতবার্ষিকী সম্পাদন করেন, তাহার জন্ম তাঁহাদিগকে অহুরোধ করা হইবে। এতদ্বিধা আরো দুইটা অহুষ্ঠান এই বিশেষ সমরোপযোগী বলিয়া আমরা মনে করি। উদ্যোগকর্ত্তাগণ এ সম্বন্ধে আলোচনা ও কর্তব্য নির্ধারণ করেন, এই অহুরোধ।

১। মহাত্মা রাজা রামমোহন বিধি করিয়াছিলেন, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ, যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উপাসনাসভাগৃহে একত্রে এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। ইহাই বর্তমান সময়ের Parliament of Religions বা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকধর্ম্মমিলনসংঘের মূল ভিত্তি এবং বিধাতার বিধান ইহা হইতেই ক্রমে নববিধানের ধর্ম্মসম্বন্ধ উদ্গত বা ক্রমবিকাশিত। বাহা ইউক, রাজর্ষির শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাহাতে এইরূপ একটি “সর্বধর্ম্মমিলনসংঘ” স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার যেন ব্যবস্থা হয়। এই সংঘে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতা ও অধ্যক্ষগণ মানে মানে মিলিত হইয়া নিজ নিজ শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন এবং সকল প্রকার বিভিন্নতা-প্রতিপাদক তত্ত্ববিষয় পরিহার করিয়া, পরস্পরের ভাব বিনিময় করিবেন এবং ক্রমে উদার ভাবে পরস্পরের ভাবগ্রহণে ও সাধনে নিরত হইবেন। এবং এইরূপ সংঘের শাখা বিভিন্ন স্থানে সংস্থাপিত হইলে, সমগ্র ভারতে ধর্ম্মবিষয়ক বিবাদ-মীমাংসার এবং ভ্রাতৃত্বপ্রতিষ্ঠার সুযোগ হইতে পারিবে।

২। এইরূপ এই উপলক্ষে বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন দলেরও একটি মিলনসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাও বাঞ্ছনীয়। সকল দলের নেতৃগণ, প্রচারকগণ ও কন্মিগণ একত্রে মিলিত হইয়া, এখানে পরস্পরের মত, সাধনতত্ত্ব ও কর্ম্মসুষ্ঠানাদি বিষয়ে আলোচনা ও পাঠ প্রসঙ্গাদি দ্বারা পরস্পরের ভাব বিনিময় করিবেন। তাঁহার বিভিন্নতাপ্রতিপাদক বিষয় লইয়া বিবাদ না করিয়া, শিক্ষার্থীর ভাবে পরস্পরের ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন, কেহ কাহাকেও কোন বিষয়ে আক্রমণ করিবেন না; কিন্তু প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীন মতের সম্মানরক্ষা করিয়া, ভ্রাতৃত্বপ্রেমে পরস্পরের সহিত মিলিবেন। সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের অহু-মোদিত “সত্যং জ্ঞানমনসং” মন্ত্র উচ্চারণে বা প্রার্থনা-যোগে সংঘের অধিবেশন আরম্ভ হইতে পারিবে। ক্রমে উপাসনাতত্ত্ব বিষয়ে ভাব-যোগ মিলিলে, মিলিত উপাসনাও হইতে পারিবে। ফলে পরস্পরের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈরতাব, এক অন্তের উপর নিজ ধর্ম্মমত চাপাইবার ভাব পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পরকে গ্রহণ ও ভ্রাতৃত্বপ্রেমে মিলনই এই সংঘের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবেন, ইহাই যেন ব্যবস্থাপিত হয়।

আমাদিগের ধর্ম্মপিতামহের পবিত্র শতবার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, এইরূপ দুইটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সকলে সাম্প্রদায়িক ভিন্নত্ব অপনোদনে কৃতসংকল্প হইলে, আমরা নিশ্চয়ই আশা করি,



রাজর্ষি যে নব নববিধানের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অচিরেই সফল হইবে ।

## শ্রীব্রজানন্দদেবের কন্যা মহারানী সুশ্রীতি দেবী ।

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

শ্রীমতী মহারানী সুশ্রীতি দেবী বৈধবা ও পুত্রশোকে আহত হইয়া সংকল্প করিয়াছিলেন, “স্বজন, আত্মজন এবং নববিধান-মণ্ডলীর সেবার যেন শেষ কটা দিন কাটাইয়া বাইতে পারি”; ইহারই অমূল্য হইয়া, তিনি প্রথম তক্ত পিতৃদেবের শেষ সাধন-তীর্থ গিয়া পাহাড়স্থ “তারাতিউ” ক্রয় করেন, এবং এই বাড়ীতে বাহাতে একটি আশ্রম হয়, ইহা তাঁহার প্রাণের একটি বিশেষ সাধ হইয়াছিল । বাড়ীটি ক্রয় করিয়া এই দীন সেবককে সেখানে আশ্রমস্থাপনের জন্ত অমুরোধ করেন । নানা প্রতিবন্ধকতা বশতঃ তাহা কার্য্যতঃ পরিণত হয় নাই ।

তাঁহার পুত্র ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতৃপুত্রগণ বধন “কমলকুটীর” বিক্রয় করিতে রাজি হন, মহারানী ইহার ঋণতার গ্রহণ করিয়া বাড়ীটি ক্রয় করেন এবং তক্তের চিহ্নিত তীর্থরূপে ইহা রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন । শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর কমলকুটীরের বাহা কিছু পরিবর্তন ও উন্নতি, তাহা সুশ্রীতি দেবীরই কৃত । নবদেবালয়ের গৃহটি অসম্পন্ন অবস্থায় রাখিয়া আচার্য্যদেব বর্গারোহণ করেন; ইহার বেদী ও বলিবার স্থান তিনিই খেত পাথরের দ্বারা বাঁধাইয়া দেন, এবং যেমন ভাবে প্রেরিত প্রচারক মহাশয়গণ আচার্য্যদেবের সমুখ ঘিরিয়া কমলকুটীরস্থ দেবালয়ে বসিতেন, সেই ভাবে আসন চিহ্নিত করিয়া দেন । কমলকুটীরের যে ঘর যেমন ভাবে আচার্য্যদেবের দেহাবস্থানকালে ব্যবহৃত হইত, তাহা প্রস্তরকলক দ্বারা চিহ্নিত করা মহারানীরই কীর্ত্তি । তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই বাড়ী ব্রজানন্দধাম রূপে তিরস্কৃত হয়; কিন্তু হায়, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃই তিনি তাহা করিয়া রাখিয়া বাইতে পারিলেন না । তবে মনের তাল, শেষে পিতৃ-প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া নারীবিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে ট্রাষ্টী করিয়া তাঁহাদেরই তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ ইহা উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন । নবদেবালয়ের সেবাদির ব্যবস্থা অবশ্যই নববিধানপ্রচারক ও আচার্য্যপরিবার দ্বারা নির্বাহ হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা এবং এ দীন সেবককে একবার লিখিয়াছিলেন, “আমরাও দেখিলাম তাবির, তুমিই এখন দেবালয়সেবার উপযুক্ত সেবক ।” ইহার তার লইয়া সেবার্ত্তের কার্য্য সম্পাদন করি, ইহাই তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল ।

আচার্য্যদেবের পুস্তকাদি বহুলরূপে মুদ্রণ ও প্রচার করিবার

জন্ত যে ‘ব্রাহ্মস্ট্রাট সোসাইটি’ শ্রীমৎ আচার্য্যদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, সে প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ ও সাহায্য দান করিয়া তিনি কতই কার্য্য করাইয়াছেন । আচার্য্যদেবের অমূল্য প্রেছ সকল, বাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই মহারানী সুশ্রীতি দেবীর অমূল্যগ্রহে ও অর্থসাহায্যে । তিনি যদি অন্য কিছু না করিয়া বাইতেন, কেবল এই অক্ষয় কীর্ত্তির জন্তও তাঁহার নিকট নববিধানমণ্ডলী ও জগৎ চিরঞ্চণী থাকিবে । প্রতি বর্ষে বর্ষে বাহাতে “ব্রাহ্ম পকেট ডায়েরী” প্রকাশিত হয়, তজ্জন্ত তাহার সমুদয় ব্যয়ভার তিনি বহন করিতেন । আচার্য্যদেব যে নামে যে জিনিষ বা প্রতিষ্ঠানটী রাখিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই নামে সাহায্যে তাহা রক্ষিত হয়, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ও নিষ্ঠা ছিল । তিনি কোনরূপ পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না ।

কলিকাতায় যেমন, কোচবিহারেও নববিধানের অধিনেত্রী-রূপে তিনি অনেক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন । কোচবিহারের নববিধানমন্দির, কেশবাপ্রস্থ, নববিধানপন্নীর বাড়ীগুলি তাঁহার প্রাণের জিনিষ ছিল । তিনি বলিতেন, “এসব আমার নয়, আমার মহারাজার বর্গীর প্রতিষ্ঠান; ইহার কোনরূপ অপব্যবহার হইলে, কিংবা ইহার প্রতি কেহ কোনরূপ প্রজ্ঞাহীন হইলে, আমার অত্যন্ত মর্শ্বেদনা হয় । এ সমুদয় মহারাজার কীর্ত্তি বলে চির রক্ষিত হয়, ইহাই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ।”

তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন, “কুচবিহাররাজ্য তক্তের প্রিয় এবং মনোনিীত স্থান, ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে । জানি না, কোন পুণ্য কলে এ রাজ্য তক্ত এবং ভগবানের স্বীকৃতি ও আশীর্বাদে পৃথিবীতে চিহ্নিত হইয়া রহিল । কোচবিহার আমাদের সকলের প্রণম্য ।”

আর একবার আমাকে সেই বিলাত হইতেই লেখেন, “জানি না, কোচবিহারের উৎসবের জন্ত এ বৎসর কে বাইতে পারিবেন । পৃথিবী হইতে বাইবার আগে কি নববিধান-পতাকা আবার কুচবিহারের আকাশে শোভাময় হইয়া উড়িবে না ? এ দৃশ্যটি কি দেখিব না ?

কুচবিহারে এতদিনে একটিও স্থানীয় লোক নববিধানে বিশ্বাসী হইল না বা নীচা গ্রহণ করিল না, ইহাতে কতই তিনি দুঃখ প্রকাশ করিতেন; তথাপি এখানে একজন প্রচারক নিয়োজিত রূপে থাকেন ও কার্য্য করেন, এজন্য শ্রীমৎদেবের সত্যদিগকে ব্যয়ব্যয় অমুরোধ করিতে এ দীন সেবককে বলিয়াছিলেন । গত বৎসর স্থানীয় প্রচারককে টেট হইতে অবসর দিতে চাহিলে, তিনি নিজ হইতে তাঁহার ভরণ পোষণের ক্রয়দংশ ভার বহন করিতে কৃতসংকল্প হন । এ সকল মহারাজার কীর্ত্তি বলিয়া অক্ষুরূপে রক্ষিত হয় এবং তাহার এক চুলও এদিক ওদিক না হয়, ইহাই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল ।

শ্রীমৎ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে,

তিনি বৈশেষ্য ধোমারে অক্ষরপরিচর ও শিক্ষা লাভ করেন, সেই উদ্যানে তাঁহার সমাধি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শ্রীরাধাক্ষেত্র-  
প্রাঙ্গণেরও নির্দেশ অনুসারে পিতৃসমাধিপার্শ্বে তাঁহারও  
সমাধি প্রতিষ্ঠিত হয়। মহাভাজা শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ খরং  
স্বকসংকিত্তার প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া, অমূল্য হিতেন্দ্রনারায়ণের  
ভগ্নস্থাপন তাহারই অনতিদূরে করেন। কিন্তু শ্রীদানু ভিতেন্দ্র-  
নারায়ণের পরলোকগমনের পর, সকল সমাধিই সে উদ্যান হইতে  
স্থানান্তর করিয়া কেন্দ্রবাগ্ৰমে রক্ষিত হয়। আবার মহাভাজা  
জিতেন্দ্রনারায়ণের চিতাভস্ম বিলাত হইতে আনীত হইয়াও, তাহা  
রক্ষিত না হইয়া বেনারসে গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।  
মহারানী সুনীতি দেবীর একমিষ্ট ধর্মপ্রাণে এ সকল ঘটনা  
বড়ই আঘাত দিয়াছিল; তথাপি তিনি সিরীস্ হইয়া সকলই  
সহ করেন এবং মির্জানে ভগবচ্চরণে কতই অশ্রু বিসর্জন করেন।  
পরিবারের বা মণ্ডলীতে কাচারও কোন নিষ্ঠার অভাব দেখিলে  
তিনি বড়ই মর্শবেদনা অনুভব করিতেন। আবার তাঁহার  
লাজুক স্বভাববশতঃ সকল সমর সকলকার অনিষ্ট কার্যেরও  
প্রতিবাদ করিতে পারিতেন না। তাঁহার এই লাজুকতা,  
অকাতর মাতৃস্নেহ ও ভাল মানুষীর সুযোগ লইয়া, প্রজ্ঞকল্পাগণও  
তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কার্য করিয়া তাঁহার প্রাণে বিষম শেল বিদ্ধ  
করিলেও, তিনি বড় কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না।  
এই কারণে তাঁহাদের কাহারও কাহারও ঋণভারও যথেষ্ট  
তীক্ষ্ণকে বহন করিতে হইয়াছিল।

শাকে ভাপে ও নানা প্রকার মনসিক কষ্টে বিধ্বস্ত হইয়া, মহারানী স্ত্রীশ্রীতি দেবী, স্বামী ও পুত্র সব যেখানে দেহরক্ষা করিয়াছেন, সেখানে গিয়াই মিজেও শেষে দেহ রক্ষা করিবেন, এই বাসনা করিয়া, নিত্যন্ত জরাজীর্ণ দেহে গত ১৯২৯ সনে বিলাত যাত্রা করেন এবং একাদিক্রমে প্রায় তিন বৎসর কাল সেখানে অবস্থান করেন। তাঁহার অসুস্থত্ববিশিষ্টে এখানে উৎসবাদি সময়ে বিশেষ ভাবে তাঁহার অতাব মণ্ডলীস্থ সকলেই কতই অসুস্থত্ব করিতেছিলেন; তিনিও সেখানে একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই, মণ্ডলীর কার্যাদির ভাবনা তাঁহাকে সেখানেও স্থির থাকিতে দেয় নাই। এখানকার বিষয় যখন বাহা মনে হইত, তখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইতেন। এই সময় একটি বিষয় মনে পড়াতে কেমন ব্যস্ত হইয়া আশানুগিক, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩১, বে পত্র লেখেন, তাহার কিয়ৎংশ উল্লেখ করিলেই তাঁহার এখনকার মনের ভাব বেশ বরা হইবে। পত্রাংশ এই :—

“শ্রদ্ধের ভ্রাতা প্রিয়বাবু, গতরাত্রে অনিদ্রিত ভাবে বখন  
সময় কাটাইতে ছিলাম, তখন ‘অতীতরাজ্য’ স্মৃতির রাজ্যে  
অতি নিকটে বোধ হইল; সে রাজ্যে বেড়াইতে, আনন্দ হইল  
বর্তমান আর ভাবিতে পারিলাম না, কিন্তু সমুখে তবিস্যৎ  
দেখিয়া তর হইল, কিছু দেখাধিরা গেলাম না, ভাবিরা

কষ্টও হইল। তর হইল যে, হঠাৎ যদি মৃত্যু লইয়া যায়, অসমাপ্ত কাজগুলির কি হইবে? সেই জন্ত তোমাকে দুই চারিটা কথা আজই লিখিব হির করিলাম। যদি আজ না লিখিবার সুবিধা হইত, বড় একটা অভাব থাকিত, কারণ সময় যে কাহারও জন্ত অপেক্ষা করে না। তুমি এই পত্র পাইয়া বত্নী পীর কাজ আরম্ভ করিও।

“দেবত ও ভোমার মেয়েদের আমার আশীর্বাদ দিও। সকলে আমরা যেন বার্থ আর্থানারী নামের উপাক্ত হই। তোমাদের বার বার প্রণাম করিয়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমাকে যে তোমাদের সঙ্গে ভক্তের কাজ করিবার অঙ্গ ডাকিতেছ, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। যদি কিছু মাত্র তত্ত্ব-ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারি, স্বর্গে যাব নিশ্চয়। যদি বাঁচিয়া থাকি, আর কয়মাস পরে দেশে ফিরিবার কথা; কিন্তু দেহ এত গুণ্য-বহায় আসিয়াছে, কিছু যে বেশী করিতে পারিব, মনে হয় না।”

পরে একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন,  
“সেদিন রাতে বড় সুন্দর স্বপ্ন দেখিলাম। আমার প্রাণাধিক  
রাজ্যরাজেন্দ্র এবং ভ্রতিভ্র বাবা সংকীৰ্ত্তনে যোগ দিরাছেন, কি  
সুন্দর মূৰ্ত্তি ! আর বৈশাখাবাবু, কাকাবাবু প্রভৃতি সকলে কি  
গানই করিতেছেন ! দুপে পৰ্ব্বতে একটা সহর, কিন্তু অস্পষ্ট ;  
হঠাৎ রাজিবাবা একটা কল হাতে টিপিরা দিলেন, সমস্ত পাহাড়  
উজ্জল আলোর এবং বাতীগুলির আনন্দের আলোর এক  
আলোর রাজ্য হইল, কি মনোহর দৃশ্য ! এ ভূখিনী যাকে  
কি রাজিবাবা সে আলোর রাজ্যে লইয়া বাইবেন ? কবে  
যাইব ? সে যে উচ্চ রাজ্য পৰ্ব্বতে । সত্যই সে আনন্দরাজ্য  
কেবল কীর্ত্তন মত্ততা মুখ।”

**क्रमः**

দীন সেবক—প্রিয়নাথ

—

জননী মঙ্গলা দেবী ও ভ্রাতা  
বিনয়েন্দ্রনাথ ।

ক্রমাধরে দেবী মঙ্গলা ও ভ্রাতা বিনয়েশ্বনাথের জীবিত বর্ণনা-  
রোহণের দিন আসিয়া পড়িল। জননী মঙ্গলা ১০ই এবং ভ্রাতা  
বিনয়েশ্বনাথ ১২ই এপ্রিল নম্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিনশ্বর  
ধামে চলিয়া গিয়াছেন। দেবী মঙ্গলার বালাজীবনের ইতিহাস  
বর্তমান সময়ের নরনারীদিগের অধিতব্য বিষয়। তিনি যে  
সময়ে বিধাতার বিধানে ব্রাহ্মসমাজের তরঙ্গপূর্ণ অবস্থার ভিতর  
আসিয়া পড়িয়াছিলেন, বর্তমান যুগে সে অবস্থার অভিজ্ঞতা  
করজন অনুভব করিতে পারেন? সে সময়ে কত নির্যাতন,  
মিপীড়ন ও লোকনিন্দার ভিতর দিয়া হিন্দু নরনারীকে ব্রাহ্ম-  
সমাজে আসিতে হইয়াছিল। সে পরীক্ষার ভিতরে ব্রাহ্মসমাজে  
নবাগত নরনারীদিগের অটল ও অবিচলিত বিশ্বাসের মহা  
পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। দেবী মঙ্গলা হালিসহরের সন্নিকটবর্তী

বৈদ্যপ্রধান কাঁচড়াপাড়া গ্রামে বিশিষ্ট বৈদ্য বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বর্ণগত সারদাপ্রসাদ রায় মহাশয় একজন গণ্যমান্য স্নায়ু-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহার জাতীয় বিধানে ও তাঁহার বিশ্বাসানুযায়ী, ত্রিবেণী-নিবাসী, বিশিষ্ট বৈদ্যবংশসম্ভূত, শিক্ষিত ও চরিত্রবান্ যুবক মধুসূদন সেন মহাশয়ের সঙ্গে কলিকাতা বিবাহ দিয়াছিলেন। বিধাতার বিচিত্র বিধান কে বুঝিতে পারে? তাঁহার তুর্কোধ্য গুপ্ত রহস্য ধর্ম-জগতে চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। যুবক মধুসূদন কলিকাতায় হেরার স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ও তৎকালীন প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতার আফিস সক্রিয় কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। এই সময়ে আমাদের গুরুপাদ আচার্যদেব তত্ত্ব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্ম-ধর্মের জয় ঘোষণা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। যুবক মধুসূদন তত্ত্ব ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-তার সূত্রে আবদ্ধ থাকিতে, ব্রহ্মানন্দের বাটীর নিকটবর্তী একটা বাটীতে বাস করিতেন ও তাঁহার সঙ্গে উপাসনা ও প্রকাশ্য সভা সমিতিতে মিলিত হইতেন। তত্ত্ব হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার ভিতরে ধর্মের আভাস ও ধর্মপ্রবণতা স্বাভাবিক ভাবে বর্তমান ছিল। বলিতে গেলে এই সহবাস যেন ননি কাঞ্চনের যোগ হইয়া গেল। দেবী মঙ্গলা এই মহা অনুকূল শ্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। একদিকে তত্ত্ব ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে মহাবাগ, অপরদিকে ধর্মের নবোন্মেষসম্পন্ন স্বামীর জীবনের মহাকর্ষণ। তিনি যে সময়ে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িলেন, সে সময়ে তাঁহার ভক্তিমামু হিন্দু পিতা বর্তমান এবং সেই সময়ে তাঁহার ছোট ভ্রাতা রায় বাগদত্ত ডাক্তার ভাণ্ডারসর রায় মহাশয় কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে রাগারনিক বিভাগে রাসায়নিক পরীক্ষকরূপে ব্রতী। দেবী মঙ্গলা ও তত্ত্ব মধুসূদনের সম্মুখে মহা পরীক্ষা। একদিকে হিন্দু পিতা ও হিন্দু ভ্রাতা এবং অপরদিকে প্রাকৃতিক বৈদ্য সমাজের বহু আত্মীয়। জীবনে মহা অগ্নি পরীক্ষা। অবশ্য একদিকে দেবী মঙ্গলা ও তত্ত্ব মধুসূদন জাতীয় সহাত্মত্ব চারাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অটল বিশ্বাস, ধ্যানমগ্ন ও চরিত্রের উচ্চতা তাঁহাদের সম্বন্ধে সকলের প্রেম ভাববাসী চিরদিন অটল রাখিয়াছিল। নারীশিক্ষা-সম্বন্ধে পুণ্ড্রতন বঙ্গদেশে কিরূপ ভাব পোষিত হইয়াছিল, তাহা এখনও প্রাচীনদিগের ভিতরে সে ভাব জাগ্রত। আমবাঁই দেখিয়াছি, তৎকালীন কোন কোন পিতামাতা লোকসাপারণের অগোচরে গৃহের বালিকাদিগকে কিছু কিছু পড়িতে লিখিতে শিখাইতেন। বিদ্যালয়ে বালিকা-প্রেরণ একটা মহাসামাজিক বিপ্লব। দেবী মঙ্গলা ও তত্ত্ব মধুসূদন বঙ্গের সেই ভীষণ দিনে বীরের স্তায় তাঁহাদের প্রথম কন্যা দেবী স্মৃতিকে ব্রহ্মানন্দপ্রতিষ্ঠিত “নেটাল মেডিক্যাল স্কুল” বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। এই বিদ্যালয় পথে

“ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন” নামে অভিহিত হইয়াছিল। ১৮৭৮ সনে দেবী স্মৃতির সঙ্গে আমার বিবাহ হওয়ার পরও তাঁহাকে ঐ বিদ্যালয়ে পাঠাইতে থাকেন। ব্রহ্মানন্দ যখন শরীরে বর্তমান, তখন এই বিদ্যালয় হইতেই দেবী স্মৃতি সেই বিদ্যালয়নির্ধারিত ক্রনিয়ার স্থলারশিপ্ উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময়ের ইতিহাসে বীরত্বপূর্ণ শান্ত ঋষি স্বামী ও ঋষিপত্নীর সাহসিকতা ও নির্ভীকতা বর্ণনায় লিখিতব্য।

এই স্থানে ইহাদের জীবনের আর একটি বিশেষ কাহিনী না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। বর্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম মানের ভিতরেও ঘাঘা করিয়া উঠিতে পারেন না, দেবী মঙ্গলা এবং তত্ত্ব মধুসূদন তাঁহাদের সামান্য আয়ের ভিতর তাহা করিয়া গিয়াছেন। কেবল তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণকে অবহোচিত ভাবে লালন পালন করিয়াই কর্তব্যপালন শেষ করিতে পারেন না, তাহাদিগকে উচ্চ শিক্ষা দান করা তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বিধাতার কৃপায় সে ব্রত পালন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের এই পরিবারে তাঁহাদের সুখোজ্জ্বল করিবার জন্য ঋষিকল্প ভ্রাতা বিনয়েন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রথম পুত্র হইয়া আসিয়াছিলেন। বাগক বিনয়েন্দ্রনাথ পিতামাতার উচ্চ আদর্শ টুকু খুব ধরিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শৈশব জীবনেই পিতামাতার সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরে গিয়া সাপ্তাহিক উপাসনা পিতার পার্শ্বে বসিয়া নীরবে শ্রবণ করিতেন। এই শৈশব জীবনেই তাঁহার ভিতরে ধর্মভাবের অক্ষুর উন্মেষিত হইয়াছিল। যখন তিনি শ্রীমদার্চ্যদেব প্রোত্ঠিত কলিকাতায় আলবার্ট স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, তখনই তাঁহার শ্রেণীর সমপাঠীদিগকে লইয়া কোন নির্দিষ্ট স্থানে গোপনে উপাসনা করিতেন। যখন তিনি কলেজের ছাত্র, তখনও সেইরূপ ভাবে সমপাঠীদিগকে লইয়া উপাসনা ও বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার পর যখন কলেজের অধ্যাপক, তখন প্রকাশ্য ভাবে মন্দিরে উপাসনা ও প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ বিশেষ কার্যে অবতরণ করিয়াছিলেন। যুবক জীবন হইতেই তাঁহার ভিতরে বক্তৃতা-শক্তি বিশেষভাবে উন্মেষিত হইয়াছিল। অধ্যাপকজীবনে তিনি, ভ্রাতা মোহিতচন্দ্র ও ব্রহ্মসমাজ ভ্রাতা বরদাপ্রসাদ বোষ এবং আরো কয়েকটি যুবক-ভক্তভ্রাতার প্রচারণক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত তাঁহার “শান্তিকুটীরে” সর্বদাই মিলিত হইতেন। তাঁহাদের এই উৎসাহের যুগে শ্রীমদার্চ্যদেব শরীরে বর্তমান ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার মহাত্ম্য এই যুবকদের ভিতর একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। তত্ত্ব প্রতাপচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের অব্যবহিত পরেই পাশ্চাত্য ইউরোপের জেনিভানগরে সমগ্র পৃথিবীর সার্বজনিক ধর্মভাবের মহামিলনের কেন্দ্ররূপে এক মহতী ধর্ম-সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসাহী বিনয়েন্দ্রনাথ সেই মহা সভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে আহূত হইয়াছিলেন।

তিনি সেই সভায় যে উৎসাহের সহিত দাঁড়াইয়াছিলেন, মনে হয়, সে উৎসাহের চিত্র এখনও আমার সমক্ষে নৃতনের মত বর্তমান। তাঁহার জেনিভা যাত্রার সময় আমরা বাকিপুরে অবস্থান করিতে ছিলাম। তিনি যে ট্রেনে বসে বাইতেছিলেন, আমি ও আমার সহধর্মিণী স্মৃতি দেবী সেই ট্রেনে তাঁহার সঙ্গে দানাপুর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলাম। তাঁহার সেই উজ্জ্বল মুখ, তাঁহার সেই উৎসাহপূর্ণ আলাপ ও তাঁহার সেই নবোদ্যম এখনও আমাদের মনে জাগরুক। তাঁহার পর উৎসাহী বিনয়েন্দ্রনাথ ইংলণ্ড ও আমেরিকার আবহাৱে সেই সকল স্থানে মহা উৎসাহের সহিত নববিধান প্রচার করিলেন। পাশ্চাত্য পৃথিবাদী উদার ভক্ত সাউদারল্যাণ্ড তাঁতাকে ঐ সকল স্থানে অনেক বৃহত্তী সভায় বক্তৃতা করিয়া আহ্বান করেন। আমেরিকার কোন ভক্তিমতী মহিলা তাঁহার ফটোও তুলিয়া লইয়াছিলেন। আজ সেই উৎসাহী বিনয়েন্দ্রনাথ আর শরীরে নাই! তাঁহার সেই প্রতিভাসম্পন্ন মনোজীবন, তাঁহার ধর্ম্মানুবাগ ও নববিধানের জন্য তাঁহার আত্মদান বর্তমান ধর্ম্মপিপাসু যুবকদিগের সম্মুখে এক জীবনগ্রন্থ রূপে বিকশিত হইতে থাকুক।

পোঃ নামকুম, রাঁচি।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

## পুণ্যাশ্রমের অধিবেশন।

গত ২৭শে জানুয়ারী, বালিগঞ্জ জগবন্ধু বিদ্যালয়ে পুণ্যাশ্রমের একটি অধিবেশন হয়। নানারূপ অহুবিধা নিবন্ধন সেদিন আশাহুগুপ্ত অনেকেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নিম্নলিখিত করজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী শকুন্তলা সেন, চেম্বারলা চাটার্জি, সুধা সেন, মণিকা গুপ্ত, উমা চাটার্জি, প্রতিমা বানার্জি, দেবী বানার্জি, স্বর্ণলতা সেন, বিভা বসু, মিসেস সেন, মিসেস সরকার, মিসেস মজুমদার, মিসেস খগেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী অনিলা রায়, কমলা সেন, পুণ্যপ্রভা বোস, সুধা দাস, সরলা দাস এবং পুণ্যাশ্রমের কয়েকটি মেয়ে। শ্রীমতী শকুন্তলা সেন প্রার্থনা করিয়া আশ্রমের মঙ্গল কামনা করেন। সুধা সেন প্রভৃতি সংগীত করেন, পুণ্যপ্রভা বসু আশ্রমের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তৎপরে কমলা সেন নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তারপর সভাসম্পন্ন হয়। আজ আশা ও বিশ্বাস লইয়া এই আশ্রমের কার্যনির্বাহক সমিতি ও পৃষ্ঠপোষকগণ সকলের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার বুলি নিয়ে উপস্থিত। আশ্রমের নিজস্ব গৃহ না থাকিলে আশ্রমের স্থায়িত্ব সুদূর হয় না। অতঃ ৩০টি অনাথার বাসোপযোগী একটি গৃহের জন্য তাঁরা আপনাদের দ্বারে উপস্থিত। স্থলের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য, নানা প্রকার শিল্প ও রোগীর সেবাকার্য্য শিক্ষার জন্য মাসিক আরও একশত টাকা সাহায্যবৃদ্ধির প্রয়োজন। ভগবানের প্রেরণায় যিনি বাহা দিবেন, তাহাই তাঁহার কৃতজ্ঞদ্বয়ে গ্রহণ করিবেন।

যিনি বাহা দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা ৬৭/১নং একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ ঠিকানায়, সম্পাদিকা, পুণ্যাশ্রম—এই নামে পাঠাইলেই, এই অনাথা হুঃখিনী মহিলাদের নীরব কৃতজ্ঞতা ভরা, ভগবানের চরণে তাঁদের জন্য প্রার্থনা উত্থিত হইবে। সম্পাদিকা প্রাপ্তি-স্বীকারপূর্ব্বক পত্র লিখিবেন ও বার্ষিক রিপোর্ট তাঁদের নিকট পাঠাইবেন।

নিবেদিকা—সরলা দাস।

## পুণ্যাশ্রমের জন্য নিবেদন।

সুখ হুঃখ ভাসি কারা আশা নিরাশা দিয়ে ঘেরা এই মানবজীবন পরম বিচিত্র। যুগে যুগে ভগবান্ মানবজীবনে তাঁর কত গীতা দেখিয়েছেন। আমাদের এই হৃদ্যাঙ্গ দেশের বুকেই ভগবানের প্রেরিত কত মহাপুরুষ কতবার এসে দেশকে ধ্বংস করেছেন, মহাশয়ের মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে, জগৎবাসীকে ধর্ম্মের পথ, সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সংসারের হুঃখ শোক দারিদ্র্য ও পাপ মলিনতা অত্যাচার সে পথ মাঝে মাঝে কত অন্ধকারে ঢেকে দেয়, সে আদর্শ আবিল-তায় ম্লান করে তোলে, প্রাণ তাই মোহে অজ্ঞানতার আচ্ছন্ন ও অবসর হয়ে পড়ে। তখন হুঃখীর ক্রন্দন শুনতে পাওয়া যায় না, বাথিতের বাণী শ্রাণে অহুত্ব করা যায় না। তবু ভগবান্ তাঁর সন্তানদের ভূলে থাকেন না, কতভাবে কতবার এসে কত জনের হৃদয়ব্বারে আঘাত করেন, প্রাণের তারে ঝড়ার দেন। তাই আজ দেশে দেশে কতজন আত্মের সেবার, হুঃখীর হুঃখ দূর করিবার চেষ্টার পানমন ধন নিয়োজিত করে নিজেরা ধ্বংস হচ্ছেন। প্রায় ৪ বৎসর আগে আমাদের পূজনীয় মা ভগবানের প্রেরণা শ্রাণে অহুত্ব করে, শত বাধা-বিলম্ব অগ্রাহ করে, কয়েকটি হুঃখিনী বোনের হুঃখের বোঝা একটু খানি লাঘব করবার জন্য এই পুণ্যাশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অনাথা, স্বামিহীন, স্বামিপরিভ্রান্ত অভাগিনীদের হুঃখে শ্রাণ আকুল হয়ে, তাদের কয়েকটীরও চোখের জল মুছিয়ে দেবার জন্য, প্রাণপণ যত্নে ও সাধ্যাতীত ব্যয় ও পরিশ্রমে, প্রায় ৪ বৎসর এই আশ্রমটিকে রক্ষা করে এসেছেন। কিন্তু এই চেষ্টা সফল করে তোলা কত সহজ হয়, যদি সকলের সহায়ভূতি ও সহযোগিতা লাভ করা যায়। যথেষ্ট অর্থ ও সাহায্যের অভাবে আশাহুগুপ্ত ভাবে এই আশ্রমটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় নি। আজ আপনাদের কাছে সেই সহায়ভূতি, সহযোগিতা ও উপদেশ প্রার্থনা করতে এসেছি।

এই কলিকাতা সহরে এই রকম আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান আরো কয়েকটি আছে ও সুযোগ্য তত্ত্বাবধানের ফলে বেশ সুপরিচালিত হচ্ছে, জানতে পেরেছি। কিন্তু এই রকম একজাজার আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেও, আমাদের বাঙ্গালা দেশের লক্ষ লক্ষ অভাগিনী নিরক্ষরা বোনের হাহাকার থামান যায় না, তাদের তিল তিল

করে মৃত্যুপ্রাপ্ত পড়ার হাত থেকে বাঁচান যায় না। দুঃখভাষে প্রীতিভিত্তি, অমীনভাষাশ্রমে অর্জিত। এই ভারতের যথো বৃষ্টি সবচেয়ে দুঃখী এই বাংলাদেশের অনাথা বিধবারা। তাদের মধ্যে অধিকাংশের ক্ষুধার অন্ন নেই, স্থখ নেই, আশা নেই, ভাল-বাসার শ্রিয়জন নেই, কোনও মঙ্গল কাজে যোগদানের অধিকার নেই, আছে শুধু আত্মীয় স্বজনের গঞ্জন লাঞ্ছনা, আর ঐ সর্বস্থখে বঞ্চিত জীবনপথের সামনে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি। তাদের মধ্যে কয়েকটিকে কিছুদিন আশ্রয় দিয়ে, কিছু লেখাপড়া ও কাজকর্ম শেখবার সুযোগ দিয়ে যদি স্বাধীন করে দেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রচেষ্টা। এখন এখানে দশবারজন দুঃখিনী নারী রয়েছে, তারা স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে হাফ স্কীতে পড়বার সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু তাদের আরও কোনও কার্যক্রমী ও Practical শিক্ষা দেওয়া দরকার, যাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষা লাভ করার জন্য অনেক দিন অপেক্ষা না করিয়া, অল্প কয়েক বৎসর মধ্যেই স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে। স্থান ও অর্থের অভাবে অনেক আবেদনকারীকে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে। এই অধিবেশনে এই আশ্রয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব করিতেছি। অন্ততঃ ২০ জনকে নিয়ে একটি জেনারেল কমিটি ও তার মধ্য থেকে ৮ জনকে নিয়ে একটি Executive কমিটি গঠন করিবার প্রস্তাব করিতেছি। মাসে অন্ততঃ একবার করে কার্যক্রমী সমিতির অধিবেশন হইবে, তাতে আশ্রয়-পরিচালনার সকল রকম ব্যবস্থা ঠিক করা হবে, আরবুজির ব্যবস্থা করা হবে।

ভগবানের করুণা লাভ করে ও আপনাদের মত অভিজ্ঞ কল্পিতা নারীদের সাহায্য লাভ করে, যদি এই আশ্রমটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এই ভারতের উন্নয়নিত অশ্রমসাগরের কয়েক বিন্দুও যদি শুষ্ক দিতে পারে। বাকি, নিজেদের ধর্ম মনে করব।

কমলা সেন।

## ভগ্নি-সমিতি ।

### ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ বর্ষের কার্যবিবরণী ।

( ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১—আগস্ট, ১৯৩৩ )

গত ২০শে মার্চ, সোমবার, সন্ধ্যা ৬টার সময়, ২৮নং নিউরোড, আলিপুর, ভবনে ভগ্নিসমিতির বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাননীয় মহারানী শ্রীমতী সুচারু দেবী অগ্রহণপূর্বক সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক-গুলি ভগ্নিনী সমবেত হইয়াছিলেন। মহারানী শ্রীমতী সুচারু দেবী সুমিষ্ট প্রার্থনা করিলে, সম্পাদিকা শ্রীমতী কিরন্ময়ী সেন বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। পরে মহারানী শ্রীমতী সুচারু দেবী ও শ্রীমতী সবালা দেবী সমিতি সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান

করিলে, সভার কার্য শেষ হয়। কার্যবিবরণী হইতে নিম্ন-লিখিত অংশ ও আর বায় বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

গত দুই বৎসর, তত্ত্বিভাজন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ৮৪নং অপার সাকুলার রোডে “শান্তিকুটার” ভবনে ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনের বাটীতে, সর্বসম্মত ৬টা অধিবেশন হইয়াছে। ১৯৩১ সনের ৬ই এপ্রিল, শান্তিকুটারে, সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। মাননীয় মহারানী শ্রীমতী সুচারু দেবী, অগ্রহণপূর্বক সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট উপাসনায় ও গৃহকর্তা স্বর্গীয় প্রজ্ঞা মোহামিনী দেবীর শ্রেষ্ঠ আদর অভ্যর্থনায় সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

গত বৎসর সমিতির কোন বার্ষিক অধিবেশন করা হয় নাই। সমিতির নিয়মানুসারে এক্ষণে প্রতিমাসে মাসিক অধিবেশন করা হয় না, গাড়ী ভাড়ার অধিক ব্যয়ের জন্য ইহা বন্ধ থাকে, কার্য অগ্রসারে মাসিক অধিবেশন হয়। এক্ষণে শুক্রবারে অগ্রবিধায়ক সভা মাসের যে কোন শনিবারে হয়।

উপস্থিত সভ্যসংখ্যা ১২০ জন। গত দুই বৎসরের মধ্যে সমিতির কতকজন নাম কাটাইয়া দিয়াছেন, সেজন্য সভ্যসংখ্যা ও আর কমিয়া গিয়াছে। ২৪ জন নতুন সভ্যপ্রার্থী ভুক্ত হইয়াছেন।

বাঁহারা মাসিক ও অগ্রহণাদি উপলক্ষে এককালীন দান করিয়াছেন এবং এই ক্ষুদ্র সমিতিতে যোগদান ও সহায়ত্বী দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩২ সনের আগস্ট

পর্যন্ত এক বৎসরের আর বায় :—

আর—পূর্ববৎসরের হস্তে স্থিতি (সাধারণ ফণ্ড) ১১১২৮/০, মাসিকদান ৭১৩৮/০, এককালীন দান ৩১, পূজার বস্ত্রের সংগ্রহীত দান ৩৫, মোট ১৮৯৮৮/০।

ব্যয়—ছাত্রগণের মাসিক দান ৭৬, ছাত্রীগণের মাসিক দান ৭২, দুঃস্থ পরিবারের মাসিক সাহায্য ৪২৫, এককালীন দান ১০১০, পূজার বস্ত্র ৩৫, নৈশ বিদ্যালয় ৩৬, পুণ্যাশ্রম ২৪, গাড়ীভাড়া ২৪১, দরওয়ানের বেতন ৩৬, রিপোর্ট ও কার্ড ছাপান ১৮, ডাক ও দরওয়ানের বাস খরচ ১৭৮, ফুল, চাদর ও বক্শিস ৪, খাতা ২, মোট ৭৮০৮/০।

হস্তে স্থিতি :—পোষ্ট অফিস ব্যাশ সার্টিফিকেট ১০০০, নগদ ১১৮৮/০, মোট ১১৮৮/০।

১৯৩১ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩২ সনের আগস্ট

পর্যন্ত এককালীন দাতাগণের নাম ।

শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন (পিতার শ্রাদ্ধার্থে) ১০, শ্রীমতী শ্রীমোহন বীর (পিতার শ্রাদ্ধার্থে) ১০, শ্রীমতী সরোজকামিনী মিত্র ১, শ্রীমতী চারুবালা বামাজির গৌরিত (স্বস্ত্রের ভগ্নিনীগণ) ৪, স্বর্গীয় গৌরাঙ্গমন্দির দেবীর পুত্র



১২, স্বর্গগতা সরলা খাস্তগিরের সাধুসরিকে (নববিধান ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে) ৫৮। মোট ৩১ টাকা।

১৯৩২ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৩ সনের জানুয়ারী

পর্যন্ত এক বৎসরের আয় ব্যয় :—

আয় :—পূর্ববৎসরের হস্তে স্থিতি (সাধারণ ফণ্ড) ১১১৮৮/০, মাসিকদান ৭৪১০, এককালীন দান ৩৮, পূজার বস্ত্রের সংগৃহীত দান ৩৯ টাকা। মোট ১২৩৮৬/০।

ব্যয় :—ছাত্রগণের মাসিকদান ৭৮, ছাত্রীগণের মাসিকদান ৭০, চঃস্থ পরিবারের মাসিক সাহায্য ৪২৯, এককালীন দান ২১, পূজার বস্ত্র ৩৮০, নৈশ বিদ্যালয় ৩৬, পণ্যাশ্রম ২৪, নিম্নোক্ত বিধবা আশ্রম ৪, গাড়ীভাড়া ১৯, দরোয়ানের বেতন ৩৬, ও দরোয়ানের বাস খরচ ৮৬/০। মোট ৭৬৪১/০।

হস্তে স্থিতি—পোস্ট অফিস ক্যাস সাটিফিকেট—১০০০, মগদ ১৭২১/০, মোট ১১৭২১/০।

১৯৩২ সনের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৩ সনের জানুয়ারী

পর্যন্ত এককালীন দাতাগণের নাম :—

শ্রী আশীষকুমার ও ভ্রাতাভগিনীগণ (পিতা স্বর্গগত মনোগতধন দেব প্রাক্কাহুঠানে) ৫, শ্রী হরবিমল রায় ও ভ্রাতাভগিনীগণ (মাতা স্বর্গগতা স্নেহলতা রায়ের প্রাক্কাহুঠানে) ৫, স্বর্গগতা সৌদামিনী দেবীর প্রাক্কাহুঠানে ১০, শ্রী সত্যানন্দ রায় (পত্নীর প্রাক্কাহুঠানে) ৫, শ্রী বিনয়কুমার দাস (ঈশ্বরমাতার প্রাক্কাহুঠানে) ৫, শ্রীমতী প্রমদা দেবী ৩, নববিধান ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে স্বর্গগতা সরলা খাস্তগিরের সাধুসরিকে ৫, মোট ৩৮ টাকা।

শ্রীকিরণী সেন।

## সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১৬ই মার্চ, রবিবার, নামকুমার ডাঃ বিধানপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার পুত্র শ্রীমান অজিতপ্রসাদ মজুমদারের নবম বার্ষিক শুভ জন্মদিনে, পিতামহ শ্রীযুক্ত গৌরী-প্রসাদ মজুমদার উপাসনা করেন, পিতামহী শ্রীমতী স্মৃতি দেবী প্রার্থনা করেন। ভগবান্ তাঁহার পুত্রকে শুভাশীষ দান করেন।

নামবন্ধন—গত ১৯শে মার্চ, রবিবার, শান্তিপুত্রের শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ প্রামাণিকের প্রথম শিশুকন্ডার শুভনামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কালনার শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায় উপাসনা করেন ও শিশুকে “বাণী” নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২, প্রচারক শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন দাসের জন্ত ৩, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২, কালনা ব্রাহ্মসমাজ ২, শান্তিপুত্র ব্রাহ্মসমাজে ২ টাকা দান করা হইয়াছে। ভগবান্ শিশুকে ও তাঁহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করেন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের নিয়ন্ত্রিত হইয়া পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ১২ই মার্চ, ২৪.৩ বাহির মির্জাপুর ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ সন্তোষ-কুমার দত্তের প্রথম সন্তান শিশু পুত্রটি পিতামাতার বক্ষঃ পুত্র করিয়া স্বর্গস্থ পরম জনক জননীর কোড়ে চলিয়া গিয়াছে। গত ১৯শে মার্চ, এতদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। পরম জননী শিশুর আত্মাকে আপন কোড়ে মঙ্গলে কল্যাণে রক্ষা করুন এবং পিতামাতার শোকার্তি প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সাধনা বিধান করুন।

গত ৫ই এপ্রিল, প্রাতে ৬টার সময়, আসানসোলে, ব্রাহ্ম-সমাজের গৃহস্থ সাধক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হঠাৎ সন্ধ্যাস-যোগে স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল প্রাতে ৮ ঘটিকার সময়, আসানসোলে তাঁহার ৪র্থ জামাতা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের গৃহে, তাঁহার তিন কন্যা (শ্রীমতী চারুবালা মজুমদার, প্রতিভা মৈত্র ও সুধমা সিংহ) তাঁহার প্রাক্কাহুঠান সম্পন্ন করেন। নবায় জামাতা ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার উপাসনা করেন। ভগবান্ পরলোক-গত আত্মাকে নিত্য শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং সকল শোকার্তি প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সাধনা বিধান করুন।

মুন্সের ভক্তিভীষ—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন :—গত ডিসেম্বর মাসে মুন্সের ভক্তিভীষমন্দিরের একষষ্ঠিতম প্রতিষ্ঠার সাধুসরিক উৎসব অতি জমটভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অখিলচন্দ্র রায়, ভ্রাতা স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস ও ডাঃ অম্বকুলচন্দ্র মিত্র এবং ভাগলপুর হতে সমাগত মহিলাগণের মধ্যে কেহ কেহ উপাসনাদি করিয়াছিলেন। এই তীর্থভূমির পূর্বাংশে যে স্থানটিতে “প্রমথলাল যাত্রিনিবাস” নিষ্ঠাণের জন্ত নক্সা স্থানীয় মিউনিসিপালিটি মঞ্জুর করা সত্ত্বেও কালেক্টর সাহেব ঐ স্থানটি দখল করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা প্রকারান্তরে হগিত হইয়াছে। উক্ত কালেক্টর সাহেবেই খাসমহলের বিধানাঙ্গুসারে মুন্সের ব্রহ্মমন্দিরের সমস্ত ভূমিখণ্ড পুনরায় পূর্ববৎ বার্ষিক ৬ খাজনার ৩০ বৎসরের জন্ত জমা ধাণ্যে মাননীয় সম্পাদক মিঃ প্রশান্তকুমার সেনের নামেই কবুলতি রেজিষ্টারী করাইয়া লইয়াছেন। ঐ স্থানেই যাত্রিনিবাসনিষ্ঠাণের জন্ত পুনরায় বাস মহলের কর্তৃপক্ষের অমুমতি লইয়া বাহাতে যাত্রিনিবাসটী নির্মিত হয়, তাহার চেষ্টা করা আবশ্যিক। যা নববিধানজননী তাঁর নবভক্তের প্রাণের মুন্সেরকে সোণার মুন্সেরে পরিণত করুন, এই প্রার্থনা।

তীর্থবাস ও সেবা—ভাই শ্রিয়নাথ সন্ন্যাসী তীর্থবাস ও সেবা-সাধন জন্ত পুরী নবশ্রীক্ষেত্রস্থ নবপর্ণকুতীরে অবস্থান করিয়া, নিত্য উপাসনা ও ধ্যানানুষ্ঠানে যুগাদিগের মুহিত প্রসঙ্গাদি করিতেছেন। এখানে প্রতি রবিবার দুই বেলা সামাজিক



উপাসনাও হইতেছে। হাসপাতালে রোগীর নিকটও প্রার্থনা করা হয়। গত ৩০শে মার্চ, বিশ্রামকুটীরে সাংসারিক বিশেষ উপাসনা হয়। সেখানে রেজুনের মিসেস পি, সি, সেন অবস্থান করিতেছেন।

**সাম্বৎসরিক**—গত ১৭ই মার্চ, ১৯১৯ং রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সাংসারিকে এবং ১৮ই মার্চ, ১৭৯ং রামমোহন দত্ত রোডে, স্বর্গীয় কাশ্যাপ কল্যাণকুমার সুধাকর্জির সাংসারিক দিনে, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বিভাদেবীর গৃহে ভীঃ : ‘নন্দ’ রায় উপাসনা করেন।

গত ৫ই এপ্রিল, ৩৭৯ং ব্রজদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় হর-গোপাল সরকারের সাংসারিকে, তদীয় পুত্র অধ্যাপক প্রিয়ব্রত সরকারের গৃহে, ভাই অক্ষরকুমার লখ উপাসনা করেন।

গত ১০ই এপ্রিল, ৭৬৯ং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত অপ্রকাশচন্দ্র দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বালক “ঐবেদ্য” সাংসারিক দিনে, ভাই অক্ষরকুমার লখ উপাসনা করেন। পিতা বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ২২ প্রচারভাণ্ডারে দান করা হইয়াছে।

**দানপ্রাপ্তি**—শ্রদ্ধা, বিনিয় ও কৃতজ্ঞতার সন্তোষ দাতা-দিগকে প্রণাম করিয়া, নিম্নলিখিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। ভগবান্ দাতাদিগকে অশীর্বাদ করুন।

ক্ষেত্রাবতী, ১২৩৩—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক-কালীন ১০২, শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানী মাসিকদান ২৫২, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২২, শ্রীযুক্ত কিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২২, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জি মাসিকদান ১২, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জি মাসিকদান ১২, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১২, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২২, শ্রীমতী সুমতি মজুমদার মাসিকদান ১২, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান তিন মাসের ৩২, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান তিনমাসের ৩২, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ শুক্ল মাসিকদান দুইমাসের ৫২, শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্তী পিতৃসংসারিকে ১২, শ্রীমতী আনন্দদায়িনী চট্টোপাধ্যায় পিতৃসংসারিকে ১২, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু পিতৃসংসারিকে ৪২, শ্রীমতী কুমুমকুমারী ঘোষ পিতৃসংসারিকে ২২, শ্রীমতী প্রিয়বালা ঘোষ মাসিকদান ছয়মাসের ৬২, ডাঃ সচ্চিদানন্দ হোসেন পাল মাতৃসংসারিকে ৩২, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বলিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিকদান ২২, লেপ্টেন্যান্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন ( আই, এম্, এস, ) মাসিক দান চারিমাসের ৮২, মিসেস কমললোচন দাস স্বামীর আদ্যশ্রাদ্ধে ১০২, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন স্বামীর সাংসারিকে ১২, শ্রীমতী চাক্রবালা বানার্জি মাসিকদান চারিমাসের ৪২, স্বর্গীয়া সাবিত্রী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে পুত্রকৃত্যগণ ৫২, স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দত্তের সহ-ধর্মিণী স্বর্গীয়া কুমারী দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে ১০২, শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার হালদার মাসিকদান ৫২, শ্রীমতী সুসমা বাগ্‌চি মাতৃ-টাকা দান করিয়াছেন।

## পুস্তক-পরিচয়।

১। সর্বধর্ম-সম্বন্ধ—পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিজয়দাস দত্ত প্রণীত এবং কুমিল্লা, “সর্বধর্মসম্বন্ধ আশ্রম” হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১২ টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, “অসাম্প্রদায়িক উপাসনা দ্বারা প্রকৃত একতার দ্বার উন্মুক্ত হইবে। সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনা বা ‘সালোতে’ই প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব, প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের বিকাশেই একত্ব। এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া যে ‘সর্বধর্মসম্বন্ধ আশ্রম’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারই কার্যের সাহায্যার্থ এই গ্রন্থ রচিত।” বর্তমান সময়ের যুগে বাঁহারা সর্বধর্মের সারতত্ত্ব জানিতে সমুৎসুক, আমরা তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। অধ্যাপক দত্ত মহাশয় এই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও, যেরূপ কঠোর পরিশ্রম সহকারে, নববিধানের আলোকে বেদ কোরাণাদি সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম অভি-জ্ঞতা সহকারে আরত করিয়া, তৎসকলনে ব্যাপ্ত আছেন, তাহার এই চেষ্টা সার্থক হউক, এবং ধর্ম্যে ধর্ম্যে প্রকৃত মিলন ও একত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক।

২। জীবনস্মৃতি—শ্রীমতী সুদক্ষিণা সেন ( মিসেস, এ, সি, সেন ) বিরচিত, আটগ্রসে মুদ্রিত, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর, মূল্য একটাকা মাত্র। ৫৭ং গ্যান্সডাউন্ রোড, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রাপ্য।

গ্রন্থকারী ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “প্রায় অর্ধশতাব্দীর আমাদের দেশ কুসংস্কারের কুজ্বাটিকার কুরুপ আচ্ছন্ন ছিল, সেই ঘোর কুজ্বাটিকাজাল ভেদ করিয়া কুরুপে ব্রাহ্মসমাজের আলোকে আসলাম এবং সেই সময়কার ব্রাহ্মদের অবস্থাই বা কুরুপ ছিল, তাহাই বলিবার অজ্ঞ আমার এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে।” তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা সুন্দররূপেই বলিয়াছেন। তাহার ভাষা সরল, সুন্দর, স্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী। বর্ণনাবৈচিত্র্যের মধুরতার মনোরম। তিনি কেশবচন্দ্রপ্রতিষ্ঠিত “ভারত আশ্রমে” থাকিয়া কুরুপে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রথমেই “ভারত আশ্রমের” ১৮৭৪সনের একখানি ছবি ( কেশবচন্দ্র ও আশ্রমবাসিনীগণ ) দেওয়াতে পুস্তকের গৌরব যথোচিত বর্দ্ধিত হইয়াছে। জীবনস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে, লেখিকার বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের বিভিন্ন স্তরে, তাহার সুন্দর জীবনের মনোরম ছবিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩৯ং রমানাথ বজ্রঙ্গার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেসে” প্রথম অর্ধেক হস্তিত ও প্রকাশিত।



# ধর্ম্যতত্ত্ব

স্বাধীনতাশ্রমিক বিপ্লব পবিত্র ব্রহ্মসন্ধি।

চেতঃ স্তনিস্থলভ্যঃ সত্যং শাস্ত্রমনন্তরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।

স্বাধীনতাশ্রমিক বিপ্লবঃ ব্রাহ্মসন্ধিঃ প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

৮ম সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৩ ব্রাহ্মাব্দ।

29th April, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## প্রার্থনা।

মা, কালের প্রবাহে ভাসাতে ভাসাতে কোথায়  
আনিলে, হায়! বৎসরের পর বৎসর জীবনের দিন  
চলিয়া গেল। আবার একটা নূতন বৎসর আনিয়া  
উপস্থিত করিলে। জীবনের পূর্ব কথা স্মরণ করিলে  
কত সৌভাগ্যবান আপনাদিগকে মনে হয়। কোথায়  
জন্ম দিলে, কোন্ সঙ্গে বালা শিক্ষা দিলে, আবার  
তোমারই অনির্বচনীয় কৃপায় ও আশ্চর্য্য কৌশলে যৌবনে  
নবযুগধর্ম্মপ্রবর্তক রবভক্তের প্রভাবাধীনে ক্ষুধু আনিলে  
তাঁহা নয়, তাঁহার দ্বারা শিক্ষিত দীক্ষিত করিয়া, তাঁহার  
অমুগত নববিধান-ছাত্র-সংঘে গাঁথিয়া শিক্ষার্থিত্রিত দান  
করিলে; প্রেরিতদলের এবং সাধক সাধিকা ও ভক্তপরি-  
বারের সহিত নিগূঢ় অধ্যাত্ম সম্বন্ধেও সংবদ্ধ করিলে।  
শেষে নববিধান-সেবকদলের পদপ্রাপ্তে স্থান দিয়া, তোমার  
সর্বসমমুখ্য যুগধর্ম্মবিধান নববিধানের সেবায় নিয়োগ-  
দানে ধন্য করিলে। তোমার কৃপায় যে অসম্ভব  
সম্ভব হয়, নারকী স্বর্গের নিয়োগ পায়, তাঁহারই জীবন্ত  
নিদর্শন দেখাইবে বলিয়া কি এত করিলে? কিন্তু  
যেমন সৌভাগ্য দিয়াছ, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মহান উচ্চ-  
সারিত্বও কত দিয়াছ; এ দায়িত্ব-বহনের এক ভিলও যে

শক্তি নাই, ইহা অনুভব করিয়া বড়ই বিপন্ন হইতেছি।  
দিনের পর দিন যত যাইতেছে, ততই ভয় ও ভাবনা  
হইতেছে, “যা করতে এলাম ভবে, তার কি হল?”  
জ্বলে মালা মুখকে দিয়া পূর্ব পূর্ব বিধানে কতই  
অলৌকিক লীলা দেখাইয়াছ; বর্তমান যুগেও সেইরূপ  
মুখ অধম পাপী নীচ চণ্ডালসম এমন লোককে তোমার  
বিধানের রথ টানিতে আনিলে! তুমি তো এবার  
মাতৃস্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মানবৎসলা হইয়াছ;  
দুর্বল রোগা ছেলের প্রতি তোমার যে অতুল স্নেহ। সেই  
স্নেহগুণে যদি দিয়াছ তব নব রথ টানিতে তোমার মহারথী  
দলের সঙ্গে, তবে দেখো যেন তোমার বলে, তোমার  
ভক্তবলে বলীয়ান হয়ে জীবনের মহৎ ব্রত পূর্ণভাবে সমা-  
ধান করে ধন্য হইতে পারি; যেন অক্ষম অকর্ম্মণ্য বলিয়া  
পরিত্যক্ত না হই। কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

## নববিধানাচার্য্যের অভিযোগ।

আমরা নববিধানবাদী, নববিধানবিশ্বাসী, নববিধান-  
সাধক, নববিধান-সেবক সকলেই নববিধান-সম্বন্ধে  
যাহাতে ঐক্যমত, ঐক্যভাব, ঐক্যজীবন হইতে পারি,

ইহাই আমাদের অভিযোগের যে সরল প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা, ইহা নিঃসন্দেহ। নববিধান একতার বিধান; নববিধানের মত এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে যদি আমাদের ভিন্নতা থাকে, তবে কেমন করিয়া আমরা এ বিধানের লোক হইব? তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই নববিধানের পরিত্যক্ত হইব, বা যে মহত্বদ্দেশ্য সম্পাদন করিতে নববিধান প্রেরিত, তাহা ব্যর্থ করিব।

তাই নববিধানাচার্য্য ঘাছা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তদ্বিষয়ে ঈশ্বরালোকে আলোচনা করিয়া, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা উচিত মনে করি। তিনি বলিলেন, “হে নববিধানের রাজা, আমার যদি বিচার হয়, আমি বলিতে পারিব না, এ সমুদয় আমারই। দশজন কারিকরে এই নববিধান গড়িয়াছে। খুব ভক্তির, কম ভক্তির, খুব জ্ঞান, কম জ্ঞান, খুব উপাসনা, কম উপাসনা, নিয়মিত উপাসনা, অনিয়মিত উপাসনা, হরিদর্শন, অস্পষ্ট দর্শন, পরের মুখে শুনে দর্শন, এই সমুদয় একটি দড়ি দিয়া বাঁধিলে যা হয়, তাই নববিধান হয়েছে। দশ জনের জন কারিকরে মিলে গড়ছে। ক্রমাগত যার মনে যে ছাঁচ আছে, সেই রকম সে করছে। দয়াময়, কি হইল? আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। যদি পূর্ণ আদর্শটা পৃথিবীতে দিয়ে যেতে পারিতাম, তবুও অনেকটা সুখী হইতাম; তা না হয়ে আমি একটা ছবি আঁকিলাম, \* গোড়ার নক্সা যে আমার, তাতে কেন অশ্রু রং মিশাইলেন? আমার আদর্শ বদলে দিলেন কেন? গরিবের আদর্শটা পৃথিবীতে রইল না যে, গোড়াটা ঠিক থাকা চাই যে।”

“প্রেমস্বরূপ, পাঁচ কাজের ভিতর গোলমাল করে আমি চলতে ভাবে আসি নাই, কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আমি আসি নাই। আমি বে একখানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি। তবে কেন পাঁচজনে আমার কাজের সঙ্গে গোলমাল করিলেন? পাঁচরকম মত মিশাইলেন? গরমেখর, পবিত্রাত্মা-সম্ভূত একতাব্রজাত স্জাত স্কুমার নববিধানকে এনে দাও। তোমার সত্য বজায় থাকিবে। পৃথিবী জানিবে, যথার্থ বিধান কি।”

এই সে অভিযোগ বা আক্ষেপোক্তি নববিধানাচার্য্য তাঁর ঈশ্বরসমিধান করিয়াছেন, ইহা কি তৎসাময়িক কোন অবস্থা দর্শনে করিয়াছেন? না, এখনও ইহার

কিছু কারণ আছে? এই অভিযোগের কারণ কি? এবং এখনও আমাদের সম্বন্ধে এ অভিযোগের কারণ আছে কি না, আমাদের চিন্তা করা উচিত।

নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান, ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি; সুতরাং “পবিত্রাত্মাজাত” এবং “একতাব্রজাত, স্জাত, স্কুমার নববিধানই” যে যথার্থ নববিধান, তাহা আমরা কেহই অস্বীকার করিতে পারি না; এবং সেই “নববিধানই” যে আমাদের সবার নববিধান হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?

কিন্তু আমরা যদি মানবীয় ইচ্ছা রুচি এই নববিধানে চালাই, বা এক এক জনে এক এক রকম নববিধান গড়ি, কিম্বা আচার্য্য যেমন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “খুব ভক্তির, কম ভক্তির, খুব জ্ঞান, কম জ্ঞান, খুব উপাসনা, কম উপাসনা, নিয়মিত উপাসনা, অনিয়মিত উপাসনা, হরিদর্শন, অস্পষ্ট দর্শন, পরের মুখে শুনে দর্শন, এই সমুদয় দড়ি দিয়া বাঁধিলে যা হয়” তাকেই আমরা নববিধান বলিয়া অভিহিত করি, কিম্বা “ক্রমাগত যার মনে যে ছাঁচ আছে, সেই রকম” করি ও তাহাকেই নববিধান বলিয়া প্রচার করি, তাহা কি ঠিক?

এই জগত্বে আচার্য্য যেন ভীত হইয়া বলিলেন: “দয়াময় কি হইল? আমার জিনিষ বলে আমি স্বীকার করিতে পারিতেছি না। যদি পূর্ণ আদর্শটা পৃথিবীতে দিয়ে যেতে পারিতাম, তবুও সুখী হতাম। আমার আদর্শটা বদলে দিলেন কেন? পরিবের আদর্শটা পৃথিবীতে রইল না যে?”

এইটাই আমাদের বিশেষ চিন্তা ও ভাবনার বিষয় কি নয়? পবিত্রাত্মার প্রেরণায় প্রেরিত হইয়া তিনি নববিধানের ছবি আঁকিলেন, তাঁহার আদর্শ যদি আমরা মানবীয় জ্ঞান বুদ্ধি আনিয়া বদলাইয়া দিতে চাই, তাহা অপেক্ষা ভয়ঙ্কর অপরাধ আর আমাদের কি হইতে পারে? এবং এইরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ যদি আচার্য্যদেব তাঁহার সহযোগীদের মধ্যে দেখিয়া থাকেন, আর বাঁহারা তাঁহার সজলাভের বা তাঁহার মনোভাব অধ্যয়ন করিতে স্বেচ্ছা ও লিপ্সা পান নাই, তাঁহারা যে এ ভ্রান্তিতে পড়িতে পারেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক বর্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন, বাঁহারা নববিধান মানে নতুনতা, কিন্তু নববিধান সম্বন্ধে আচার্য্যদেবের যে স্থান, তা স্বীকার করিতে চান

না। তাই এ সম্বন্ধেও আমাদের স্থির মত হওয়া প্রয়োজন।

বিধান মানিতে হইলেই বিধানাচার্য্যকে বা বিধানবাহক একজনকে মানিতে হইবে। পবিত্রাত্মা যে আদেশ করেন, তাহা বাস্তবিকভাবে যুগে যুগে বাহকরূপে বাবহার করিয়া করেন; তাই আচার্য্যদের অন্তর বলিলেন, “আমি বুঝছি, একটা মাঝে খুঁটা চাই। কোথা থেকে আসবে আদেশ মা? এ সব গোপনের কথা বটে। কিন্তু তুমি একজনকে দাঁড় করিয়েছ।”

এইটিই নিগূঢ় কথা, এবং এই জন্তই নববিধান সম্বন্ধে তিনি দাবী করিয়া বলিলেন, “আমার আদর্শ বদলে দিলেন কেন? গোড়াটা ঠিক থাকা চাই যে। গোড়ার নকসটা যে আমার।” অর্থাৎ সে নকসা তিনি ঈশ্বরাদেশে আঁকিয়াছেন। এইটি আমাদের মানিতেই হইবে এবং ঈশ্বরাদেশে নববিধানবাহক যে নববিধান প্রচার করিলেন, তাহাই নববিধানের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

আবার কেবল তিনি বলিয়াছেন বলিয়াও যেন আমরা গ্রহণ না করি; কেননা তিনিই বলিয়াছেন, তাঁহার কথা প্রত্যক্ষ পবিত্রাত্মার আলোকে মিলাইয়া লইতে হইবে। সুতরাং নববিধানাচার্য্যের আদর্শ আমরা ঈশ্বরালোকে মিলাইয়া লইলে তৎসম্বন্ধে আর ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। তাহা না করিয়া যদি আমরাও তাহাতে আমাদের বিচার-বুদ্ধির মত চালাই, ভুল হইবে। নববিধান সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া তিনি যে বলিলেন, “আমি পাঁচ-কাজে গোলমাল করিতে আসি নাই, কাপড়ে রিপু করিতে তালি দিতে আসি নাই। আমি যে একখানি নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছি।”

এইটিও আমাদের বিশেষ চিন্তার ও শিক্ষার বিষয়। অনেকে যে মনে করেন, পাঁচকুলের সাজি যেমন, পাঁচ জায়গা থেকে পাঁচটা সত্য সংকলন করিয়া এই নববিধানও তেমনি হইয়াছে। ইহা কখনই সত্য নহে। কাপড়ে রিপু করা বা তালি দেওয়া যেমন, নববিধান তাহাও নয়। ইহা একখানি আগাগোড়া নূতন বস্ত্র, আমাদের পরিধানের জন্ত—আমাদের জীবনের নগ্নতা দূর করিবার জন্ত—পবিত্রাত্মা স্বয়ং বয়ন করিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহা সর্বাবয়বপূর্ণ একটি নূতন ধর্ম্মবিধান; সর্ববস্ত্রের সত্য, সর্ববস্ত্রের সাধন ইহাতে

নিহিত আছে সত্য, কিন্তু সকলই নবজীবনীশক্তিসম্পন্ন নূতন। ইহা পাঁচটা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সংকলিত শাস্ত্র নয়। তাই এক জায়গায় বলিলেন, “যাবতীয় নূতন একত্র করিলে কি হয়? নূতন বিধান। ইহার আগাগোড়া সব নূতন।”

আচার্য্যদের অন্তর বলিলেন, “ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র বিক্রেতাগণ খাটী বলিয়া বিক্রয় করিতেছেন, আমি ছুড়িয়া ছুড়িয়া ফেলি, আবার সকলে আনিয়া রাখিতেছে। কৃত্রিম জিনিষ, মিশাল জিনিষ এখানে থাকিবে না। ঘোল আনা পুণ্য, ঘোল আনা শাস্ত্র, ঘোল আনা ভক্তি, ঘোল আনা পবিত্রতা ঠিক থাকিবে।”

সত্যই পুরাতন ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্রের দোহাই বা ভেজাল মিশাল ধর্ম্ম নববিধানের ধর্ম্ম নয়। এ বিধান আসল খাটী সর্ববাস্তব পূর্ণ বিধান স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ। ইহা বর্তমান যুগের মানবকুলের পরিভ্রাণের জন্য আসিয়াছে। ইহাতে মানুষের হস্ত কিছুই নাই। সুতরাং মানুষ যে যাহা খুসি নববিধানের নাম দিয়া চালাইবে, তাহা হইবে না। তাই একস্থানে আরো বলিলেন, “স্বর্গের খাটী অমৃত তুমি তৈয়ার করে পাঠাবে, আমরা কেবল বিক্রয় করিব।” কি সুন্দর কথা! সত্যই নববিধান স্বর্গের অমৃত স্বয়ং মা প্রস্তুত করিয়াছেন, আমরা ইহা যেন প্রস্তুত করিতে না চাই। আমরা কেবল বিক্রয় করিবার, প্রচার করিবার অধিকারী। অতএব আমরা যেন এ সম্বন্ধে প্রবক্তা আর না করি। কিন্তু বথার্থ পবিত্রাত্মাজাত নববিধানধর্ম্মের জীবনে যাহা মুক্তিমান হইয়াছে, তাহা যে আগাগোড়া একখানি নূতন বস্ত্র, তাহাই আমরাও পরিধান করিব এবং সেই নববিধান মাতৃহস্ত-প্রস্তুত অমৃত জানিয়া তাহাই পান করিব ও দান বিক্রয় করিব, অর্থাৎ স্বয়ং পবিত্রাত্মাজাত এবং নববিধানাচার্য্যজীবনে সাধিত যে নববিধান, তাহাই আমাদের অঙ্গবস্ত্র করিয়া, তাহাই সকলকে বিলাইল। তাহাতে আপন আপন মত ইচ্ছা রুচি চালাইব না, অথচ পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইয়া প্রচার করিব, তাহা হইলেই নববিধানাচার্য্যের সকল আক্ষেপ দূর হইবে। আমরা যেন আপন আপন মন গড়া এক এক নববিধান খাড়া করিয়া তাহা চালাইতে প্রয়াসী না হই, বা আচার্য্যপ্রদর্শিত নববিধানে কলম চালাইয়া তাহা বিকৃত না করি, ঈশ্বর আমাদের একত্র ধৃষ্টতা হইতে রক্ষা করুন।

## ধর্মতত্ত্ব।

### ধর্মের মোহ।

বিষয়ের মোহে ত জগৎ মুক্ত লোক জড়িত, জর্জরিত। তাহাতেও বিষয়ের সযত্নে মাহুষের বখেটে উন্নতিলাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্মের মোহ যে ভয়ানক। এই ধর্মের মোহ-জালে পড়িয়াই লোকে আসল ধর্ম হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; অধু ভাঙা নয়, আত্মবিত্ত্ববশতঃ সর্বলোকের ধর্মোন্নতির পথও সঙ্কট করিয়া রাখিয়াছে। জ্ঞানবিচার, শাস্ত্রজ্ঞান, জড়পূজা, কুসংস্কার ও অহংকার এই ধর্ম-মোহের প্রধান লক্ষণ ও উপাদান। প্রায় সর্বসম্প্রদায়ের লোককেই এই ধর্মের মোহ আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে; ব্রাহ্ম, এমন কি নববিধানবাদীদিগকেও ইহা গ্রাস করিতে মুখ ব্যাদান করিতেছে। বিদ্যা বুদ্ধি, সাধন-সিদ্ধি ও উপাসনা-শক্তির অহং হইতেই ধর্মের মোহ উৎপন্ন হবার আশঙ্কা। তাই এ সম্বন্ধে আমাদের সর্বদাই সতর্ক ও খুব সাবধান হওয়া উচিত। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁহার প্রেরণা ভিন্ন ধর্ম-সম্বন্ধে কিছু করিতে চাটিলেই, মোহ আসিবার সম্ভাবনা। মোহ একবার প্রবেশ করিলে আর রক্ষা নাই।

### অভাবের বোধই উন্নতির সোপান।

আমি মহা পাপী, আমি চির শিষ্য, আমি দীন সেবক, আমি রুগ্ন শিশু, এই আত্মজ্ঞান, এই আত্মবোধ সর্বদা জাগ্রত রাখিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিলে, তিনি মা হইয়া প্রহর আমাদেরকে ধর্মসম্বন্ধে যাহা কিছু প্রয়োজন দান করেন, প্রতিদিন ধর্মজীবনে নব নব শক্তি সঞ্চার করেন এবং নব নব উন্নতি বিধান করেন। নববিধানাচরণের জীবনে ইহা প্রমাণিত। তাঁহার অনুগামী হইয়া দীনত্বা তহলে, আমরাও ইহার সাক্ষাদান করিতে পারি। অভাব-বোধই সর্বপ্রকার উন্নতির সোপান। সর্ব বিষয়ে আপনাকে নিত্য অভাবগ্রস্ত জানিয়া, ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা-শীল হওয়াই নববিধানের শিক্ষা ও সাধন। নববিধানে তাই “গুরু”, “খামো”, “শিক্ষক”, “মহাপুরুষ” ইত্যাদি অখ্যায় কেহ আপ্যায়িত হন নাই।

### বিশ্বাস।

নিখাস বন্ধ হইলেই দেহের মৃত্যু হয়। বিশ্বাস চলিয়া গেলেই ধর্মজীবনেরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ বিশ্বাস, ততক্ষণ আশা। যতক্ষণ মনে বিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ ধর্মের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও নব জীবনলাভের আশা থাকে। এই জন্ত দেশ বলিলেন, “এক সর্বপক্ষণার ভায়ও যদি বিশ্বাস থাকে, তুমি পর্ত্তকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, তখনই পর্ত্ত (পর্যাপ্ত হক্

তুমি) স্থানান্তরিত হইবে এবং কিছুই তোমার পক্ষে অসম্ভব থাকিবে না।” কিন্তু বিশ্বাস গেলেই সব গেল, ধর্মজীবনের মৃত্যু হইল। আবার বিশ্বাস কর্ত্তসাধ্য সাধনসাপেক্ষও নয়। বিশ্বাসের ভায় বিশ্বাসও সহজ ও স্বাভাবিক। বিশ্বাসক্রিয়া মুক্তবায়ু-সেবনে যেমন আরো সহজ ও শক্তিশালী হয়, তেমনি অনন্ত ঈশ্বরের উপাসনা ও ভক্তসঙ্গসহবাসরূপ স্বর্গের মুক্ত সমীপ সেবনেও বিশ্বাস সহজে বৃদ্ধি পায়। খাসকষ্ট রোগ বার, মহাসাগরের মুক্তবায়ু-সেবন ঔষধ তাহার। ক্ষীণ বিশ্বাস বার, জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা অমোঘ ঔষধ তাহার।

### “ধর্ম-সাধন”।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৪৬—৪৭ সংখ্যা—২২শে—২৯শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৭৯৪।

(গিরিধর ডাঃ কি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্নিরের উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্বানুবর্ত্তা)

প্রশ্ন—জন্মের অসাড়, পাপ আছে জানিতেছি, তথাপি কষ্ট অনুভব হয় না, এ রোগ প্রতিকারের উপায় কি?

উত্তর—(১) প্রার্থনার সময় এই অসাড় ভাব দূর করিবার জন্য সরল ভাবে ঈশ্বরের সাহায্য চাওয়া। ইহাতে আপনাদের বত অকিঞ্চন ভাব হইবে, ততই ঈশ্বরের উপর নির্ভর বাড়িতে থাকিবে, এবং পবিত্রতার জন্ত অমুরাগ হইবে। (২) বে পাপ বহুদিনের পোষিত হইয়া জন্মকে অচেতন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা হইতে কতদূর পৃথক ও গুরুতর বিপদ ও অমঙ্গল ঘটতে পারে, সর্বতোভাবে এই চিন্তা করা। ইহাতে চৈত্র-জ্ঞান হইবার অনেক সম্ভাবনা।

প্র—জীলোক সম্বন্ধে ভাল ভাব কি সে হয়?

উ—(১) উপাসনা দ্বারা পুরাতন মন্দভাব সকল ফিরাইয়া জীলোক সম্বন্ধে পবিত্র ভাব অর্জন করা। (২) পবিত্র জীলোকের সংসর্গে মনের ভাব ভাল করা।

প্র—যে রিপুটি অধিক প্রবল, কি প্রকার বিশেষ চেষ্টার তাহাকে ধ্বংস করা যাইতে পারে?

উ—রিপু সকল মনের এক একটা অংশ নয়, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা মাত্র। জন্মের মূল এবং মনের সাধারণ ভাব পবিত্র না হইলে প্রকৃত পক্ষে তাহাদিগকে জয় করা যায় না। যিনি আর সকল পাপ পুষ্টি রাখিয়া কেবল কামরিপুকে দমন করিতে চান, তাঁহার চেষ্টা কখন সফল হয় না। রিপু সকল পদস্পর্শের সহকারী, মনের মধ্যে একটীর বাসস্থান থাকিলে তাহার কুটুখ-গণের আর আসিবার ভাবনা থাকে না। বাহার লোভ কি ক্রোধ আছে, তদ্বারা তাহার কামপ্রযুক্তিও বৃদ্ধি হইবে।



পাপকে ছোট বড় জ্ঞান না করিয়া, সকল পাপের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে সংগ্রামপূর্বক জয়লাভ করা কর্তব্য।

প্র—যাহার মনে অনেকদিন হইতে কুপ্রবৃত্তি এমন প্রবল যে, হাজার চেষ্টা করিলেও বিফল হয়, তাহার পক্ষে দুর্দম রিপু সকলকে জয় করিবার নিশ্চয় উপায় কি ?

উ—“Passion should be conquered by passion.” প্রবৃত্তির দ্বারাই প্রবৃত্তির জয় সাধন করিতে হইবে। যাহার যত কেন প্রবল রিপু হউক না, তিনি যদি ঈশ্বরের অস্ত্র প্রবল অমুরাগী হন, কোন সাধু ভাবে বা সাধু কার্যে সম্পূর্ণ ব্যাপ্ত ও উন্নত হইতে পারেন, তবে অতি সহজে পাপের হাত হইতে পরি-  
জ্ঞা লাভ করেন।

প্র—কামরিপু-দমনের ভাব ও অভাব পক্ষে কি কি উপায় আছে ?

উ—ভাব পক্ষে উপরে যেরূপ বলা হইয়াছে, অপাং পবিত্র ক্রীলোকদিগের সংসর্গে মনের কুভাব পরিবর্তন করা। অভাব পক্ষে অসৎ গ্রন্থ পাঠ, অসৎ আলাপ ও সংসর্গ তইতে দূরে থাক।

প্র—পাপ ছাড়িলেও মন কল্পনা আসিয়া মনকে কেন কলুষিত করে ?

উ—কুকল্পনা সকল আমাদের মনের সাধারণ ও প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেয়। যখন আমরা ভাল হইয়া গিয়াছি বলিয়া অহংকার করি, তখন পুনরায় পাপে পতিত হই। মনের মন কল্পনা সকল আমাদের সাবধান করিয়া দেয় যে, “অহংকার করিও না, দেখ, এখনও তুমি নরকে বাস করিতেছ”।

শ্রদ্ধাম্পদ বাবু রামতনু লাহিড়ী এই দিবস সম্বন্ধে উপস্থিত থাকিয়া আপনার যে কয়েকটি সত্য ও বহুদর্শনের কথা বলেন, তাহা পরে লেখা যাইতেছে।

“আমার মনে অনেক সময় অনেক রিপু প্রবল হয়, লজ্জার কথা বলিয়া রাখিলাম, মরিলে কম শাস্তি পাব। পাপের উদ্বেগ হইলে আমি ছুটিয়া বাটা হইতে পলাইয়া কোন বন্ধুর মুখ দেখিতে যাই। পাপ-নিবারণের এমন উপায় আর আনিত দেখিতে পাই না।”

পরে তিনি শিক্ষিতদলদিগের হইতে কি কি বিষয়ে নীতি-শিক্ষা লাভ করা যায়, তাহাও অনেক করিয়া বলিলেন। “পুঙ্খের শিক্ষিত দল উপকার করাই ধর্ম জানিতেন এবং সর্কাসকার ভ্রম, কুসংস্কার ও মিথ্যার বিনাশ করিতে গাঢ়ে থাকিতেন। আমি যত জন জানি, তাহাদিগের মধ্যে নাস্তিক ছিলেন এমন কেহ বোধ হয় না; কুসংস্কারের ধর্ম জানিতেন না বলিয়া লোকে তাহাদিগকে নাস্তিক বলিত। তবে এই বলা যায় যে, তাহারা নীতির অস্ত্র যত মনোযোগী ছিলেন, ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্ত্র তত নয়। তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল, যে কোন উপায়ে সত্য প্রতিপালন করিব; বাহারা ধৃত কপট, তাহাদিগের মুখও দেখিব

না। অঙ্গীকার করিয়া তাহা প্রতিপালন না করিলে কি হয়? এ কথা যে জিজ্ঞাসা করিতে পারে, সে অস্বাভাবিক জ্ঞ। তদ্রূপে আপনার গোরবের হানিকর কোন কার্য করিতে পারেন না। আমি বা বলিতেছি, মনে থাকিলে আমার উপকার হয়। আমাদের বাঙ্গালিদের প্রধান দোষ ভীকৃত্য, জীবনের যে অংশই কর্তব্য বলিয়া হির হইবে, তাহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাপূর্বক জীবন সমর্পণ করা চাই। থিয়োডোর পার্কারের কি নাহস! সহস্র বিপদের সম্মুখে সত্যসমর্থনার্থ নির্ভয়ে বলিলেন, ‘I am Theodore Parker’ ‘আমি লোকভয়ে ভীত হইবার লোক নহি’। তিনি নীতির সহিত ধর্মের যোগ হওয়া আবশ্যক বলিলেন। ‘কেবল নীতিতে একটি বন্ধন হয়, কিন্তু তৎসঙ্গে ধর্ম থাকিলে দুইটি বন্ধন রহিল।’ যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহার উপর বিশ্বাস অধিক হইবেই হইবে। কিন্তু ধর্ম নীতি-শূন্য হইলে, কুনীতি জীবনে থাকিলে ধর্ম বলা মিছা।”

প্রাপ্ত।

( পারস্য পুস্তক সেকেনার নামা হইতে অনুবাদিত )

হে ঈশ্বর! বিশ্বব্রাহ্মের রাজত্ব তোমার। আমাদের দ্বার দাসত্ব হয়, কর্তৃত্ব তোমার।

হালোক ভুলোকের আশ্রয় তুমি, সমুদায় পদার্থ ই নম্র, তুমি মাত্র চির সত্য।

অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে বাহা কিছু আছে, সমুদায় তুমিই সৃষ্টি করিয়াছ, তুমিই একমাত্র সকলের সৃষ্টিকর্তা।

তুমি উচ্চ জ্ঞানের শিক্ষাদাতা, ভুলকে জ্ঞান-লেখনী চালনা করিয়াছ।

যখন ঈশ্বরদ্বয়ের বিষয় প্রকৃত বিচার হয়, বুঝিই সর্কাসে তোমার প্রতি সাক্ষাদান করে।

বুদ্ধিকে তুমিই দর্শনের আলোক দান কর। ধর্মপণের দীপ তুমিই প্রজ্জ্বলিত কর।

তুমি নভোমণ্ডলকে উন্নত করিয়াছ এবং পৃথিবীকে তাহার নিম্নে স্থাপন করিয়াছ।

তুমি একবিন্দু জলেতে সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল মূক্তাকণ সকল সৃজন কর।

তুমি মণি মণিকোর প্রকাশক এবং তাহার জ্যোতির কারণ। তুমি পাষাণগর্ভে মণির সৃষ্টি করিলে, মণির উপর মনোহর বর্ণের যোজনা করিলে।

তোমার আজ্ঞা না হইলে বায়ু প্রবাহিত হয় না, ভূমি শস্য প্রদান করে না।

তুমিই একমাত্র সৌন্দর্য্যে অগংকে শোভিত করিয়াছ, তুমি কাহার সাহায্য আকাজ্ঞা কর না।

আকাশকে তুমি একমাত্র প্রসারিত ও সৃষ্টিজিত করিয়াছ যে, তাহা চিন্তা করিতে যাইয়া বুঝি পরাত হয়।



জ্যোতিবিদেহা তাহার তব বহু অঙ্গসন্ধান করিয়াছে, কিন্তু কেহই জানিতে পারে নাই যে, কি প্রকারে তুমি জ্বালোক ও তুলোকের রচনা করিলে ।

আমাদের দ্বারা দর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? শয়ন ভোজন আবাদিগের অস্ত্র হই কার্য্য ।

সমুদায় তোমার মহিমাতে হয়, ইহা স্বীকার করিয়া জিহ্বা সতেজ হউক, তোমার কার্য্যে দোষারোপ না করুক ।

এতদপেক্ষা বাহা কিছু গণনা, তাহা আমাদের জ্ঞাপ্তি, যে যেতু তোমার তব চিন্তার অগোচর ।

তুমি যে নানা বিচিত্র রচনা করিয়াছ, তাহার কিছুতেই তোমার কামনা নাই, তুমি নিকাম জেথর ।

হই কার্য্যই শ্রেষ্ঠ, তোমার প্রভু এবং আমাদের দাসত্ব ।

আকাশ ও ভূমি, নক্ষত্র ও নভোমণ্ডল তুমি এরূপে সৃষ্টি করিয়াছ যে, চিন্তা যত কেন উচ্চ হউক না, কিছুতে তোমার কোশলকাল অতিক্রম করিতে পারে না ।

কিছুই ছিল না, তুমি ছিলে, কিছুই থাকিবে না, তুমিই থাকিবে ।

তুমি সৃষ্টির পূর্বে বিশ্রাম করিতেছিলে এমত নহে, সৃষ্টি হওয়ারও তোমার কষ্ট হয় নাই ।

জগতের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব তোমার নিকটে সমান ।

জ্ঞানের আলোক তোমার নিকটে পরাস্ত হয়, যে যেতু তুমি হুর্গম প্রদেশে বাস কর ।

তুমি বিক্লিষ্ট নও যে সংযুক্ত হইবে; প্রবর্তিত নও যে নুন হইবে ।

তোমার পথে কল্পনার চক্ষু অন্ধ; তোমার মন্দির অটল ।

বাহ্যকে তুমি উন্নত কর, তাহাকে কেহ নত করিতে পারে না; বাহ্যকে তুমি নত কর, কাহারো বলে সে উন্নত হইতে পারে না ।

(ক্রমশঃ)

## শ্রীব্রহ্মানন্দদেবের কন্যা মহারানী সুনীতি দেবী ।

(পূর্বাঙ্গবৃত্তি)

নববিধানের পঞ্চাশবার্ষিক অর্থাৎ জুবিলী উৎসব সময়ে মহারানী সুনীতি দেবী বিলাতে অবতান করিতেছিলেন । সেই সময়ে এদেশে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিবেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু চিকিৎসকগণ আসিতে যেন নাই বলিয়া বিশেষ সঙ্কট হইল ।

এই উৎসবের পরে আমাদের একখানি পত্রে লেখেন,—  
পরম প্রভুর ভ্রাতা, তোমার দ্বিতীয় পত্নখানি আজ পাইলাম,

বড় ভাল লাগিল । ৬ই মার্চের ( কোচবিহার বাগদানের দিন ) সব বেন চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ আমোদ ও আচ্ছাদ করিবার প্রয়োজনগুলি যেন লুকাইয়াছেন । কিন্তু ৩ই মার্চ পৃথিবীর বুকে খোদিত, নববিধান-ইতিহাসের ৬ই মার্চ বিশেষ পরিচ্ছেদ । এমন দিনটা এখন কেন এমনভাবে কাটাইতেছি, বুঝিতে পারি-  
তেছি না । বৎসরের পর বৎসর ঘুরিতেছে, কিন্তু সে দিনের সে ছবিখানি বহুদূরে অতীতের অন্ধেই ঢলিতেছে দেখিতে পাই । ভবিষ্যতে আবার অনুতথ্যে এই দিনে আনন্দ সন্তোষ করিব, বিশ্বাস করি । \* \* \*

“তোমাদের জীবন যত, নববিধানের জুবিলী উৎসব, এই উৎসবে সন্দেহে যোগদান করিয়াছ । ধর্মতত্ত্বের বিবরণগুলি হৃদয়ের হৃদয়গ্রাহী । \* \* ধর্মতত্ত্বের তত্ত্বগুলি গভীর এবং আশা শ্রদ্ধ হইয়া যেন গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি করবে । \* \* তোমার প্রথম চিঠি এবং তৎসঙ্গে শ্রীমাদ্ভগবদ্গীতার উক্তি পাইয়াছি । ভিত্তরবার্ষিক কাগজখানি পড়িয়া বড় ভাল লাগিল । আমি সেখানি প্রবেশের শিক্ষককে পাঠাইয়া দিয়াছি, বড় ভাল লোক ।

“আমার শরীর বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে । \* \* দেশে বাইবার অস্ত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ডাক্তার এখনও বাইতে নিষেধ করিতেছে । \* \* \*

“এখানে সমুদ্রধারে আছি । অনন্তের পূজা সাগরই জানে, আকাশই পারে । অসীম সমুদ্রে, এখানে ছোট মন লইয়া কি কেহ অনন্তের উপাসনা করিতে পারে ? আচ্ছাদন-পথে অনন্তের পূজার অধিকার আমাদের দিয়াছেন, ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে ?

“জানিনা, কোচবিহারের উৎসবের অস্ত্র ও বৎসর কে মাইতে পারিবেন ? পৃথিবী হইতে বাইবার আগে কি নববিধান-পতাকা আবার কোচবিহার আকাশে শোভাময় হইয়া উড়িবেনা, এ দৃশ্যটি কি দেখিব না ?”

ব্যক্তিক আমরাও বিজ্ঞানসাধক, নববিধানে গৌরবিতা তত ব্রহ্মানন্দ-কর্তার এ সাধ কি কোচবিহারে পূর্ণ হইবে না ?

ইহার পর আর এক বৎসর অতীত হইলে, মহারানী দেবী এদেশে পুনরাগমন করেন । এবং আগমনের পর মাত্র একবার মাঘোৎসবে যোগদান করেন । এই উৎসবে তাঁহার আগমনে যেন মণ্ডলীতে এক নবজাগরণ আসিল । কয়েক বৎসর উৎসব সময়ে তিনি না থাকতে বড়ই যেন খালি খালি বোধ হইতে ছিল । বাহা হউক, এবারকার উৎসব সময়ে তাঁহার উৎসাহ-প্রভাবে কয়েকটি অল্পজ্ঞান অতি সুন্দররূপে প্রসঙ্গ হয় । “নিশানবরণ” কমলকুটারের অস্ত্রপূরে যেমন হইত, এবার তেমনি হইল; আর্ধ্যানারীসমাজের উৎসব বহিঃপ্রাঙ্গণের মুক্ত ভূমিতে তাঁর খাটাইয়া হইল । এখানেই তিনি আর্ধ্যানারী ভগ্নদিককে অগ্ররের শেখ নিবেদন জানাইয়া বলিয়াছিলেন, নারীর সত্যকে প্রত্যবে ও ভয়ঙ্কর প্রত্যবে সত্যের উপরও যেমন জয়লাভ হয়;

ইহা স্নান করিয়া গলফলে তিনি বিবৃত করেন। এবারকার মঙ্গল-পাড়ার উৎসবেও তিনি উপাসনা করেন এবং পাড়ার গরিব প্রচারকপরিবারবর্গের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন।

এবার নববিধান-বোধবার দিনে, অনেকদিন পরে দুইটা ভাই প্রচারকত্ব গ্রহণ করিতে, মহারাণীর আনন্দের আর সীমা ছিল না। এট উপলক্ষে আমান্দমিলন কমলকুটীরেই হয়, তাঁহার বড় সাধ হইয়াছিল; কিন্তু নারীবিদ্যালয়ভূমিতে মনোরম মিলন বিধিসম্মত হইবে না বলিয়া, বাধা পাঠিয়া ব্রহ্মমন্দিরেই এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করেন। কমলকুটীর নারীবিদ্যালয়ে পরিণত হওয়াতে, এখানে পূর্ববৎ পারিবারিক উৎসবানুষ্ঠান সকল সম্পন্ন হওয়া যে সম্ভবপর হইবে না, ইহা তিনি পূর্বে ধারণা করিতে পারেন নাই। তাই উৎসবের পরে এবার এট বাড়ীর কোন ঘর আচার্য্যদেবের দেহাবস্থানকালে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, তথা পশুরফলকে অঙ্কিত করিয়া চিহ্নিত করিয়া-ছিলেন। এই বৎসর কমলকুটীরের সান্নিধ্যে ভ্রাতা সরলচন্দ্রের ত্রীকুটীরে অবস্থান করিয়া উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের পর কয়েকদিনের জন্য কোচবিহারে যান। সেখানে গিয়া সকলকে উৎসবানন্দ দান করেন।

সেখানকার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষেও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হইয়া উঠে নাই। তাই এই দীন সেবককে বিশেষভাবে আশ্বাস করিয়া সেখানকার উৎসব-সম্পাদনে উৎসাহী করেন এবং এই উৎসবের উপলক্ষে পবিত্রাত্মার লীলাকাহিনী শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। শ্রীমহারাণী নৃপেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণের সাংসদগিক দিন সম্পাদনের জন্যও এ দীন সেবককে অনুরোধ করেন। এই উপলক্ষেও তাঁর এবার কোচবিহার যাইবার বিশেষ ইচ্ছা হয়, কিন্তু তথাৎ একটি পরদার ডাঙি মাথায় পড়িয়া বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন। এবং এখন হইতেই তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এই ঘটনার অমরদিন পূর্বেই ( ৩১শে মে, ১৯৩২ ) আমাদিগকে তিনি প্রাণের আবেগে আক্ষেপ করিয়া এক পত্র লিখেছিলেন, পত্রখানি এই :—“পরম শ্রদ্ধের ভ্রাতা, অনেক কাজ থাকি রছিল, যাইবার দিনও কাছে আসিল, ‘কি করিব, কি করিব’ এই কেবল মনে হইতেছে। তুমি সমুদ্রের তীরে বসিয়া অনন্তের কোলে আঁপ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, সন্দেহ নাই। কাজও করিতেছ, কিন্তু এখানে যে অনেক কাজ। কাহারও সঙ্গে কাহারও মিল নাই। রেহের অভাব, বিশ্বাসের অভাব দিন দিন বাড়িতেছে।” তাঁহার পর আচার্য্যদেব ও মাতৃদেবীর কতকগুলি জিনিষের বিষয় জানিতে চাহিয়া, তাঁহার বিবরণ ধর্মতত্ত্বে লিখিতে অনুরোধ করেন ও শেষে বলেন, “যদি কিছু মনে না কর, একটি কথা বলি, আমাদের মহাতীর্থ দেবালয় ও কমলকুটীর। আচার্য্য-দেবের গৃহ দুইটির সেবা করিলে আমাদের মুক্তি ও মোক্ষলাভ।”

শ্রীমতী সাবিজী দেবীর পীড়া এই সময়ে বৃদ্ধি পায়। মহারাণী নিজের কাছে রাখিয়া তাঁহাকে কত মেহে সেবা করেন, তাঁহার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরীতেও পাঠাইতে চান, এবং আমাদিগকে বাড়ী দেখিতে বলেন; কিন্তু তাঁহার জোষ্ঠা কড়া শ্রীমতী সুধা দেবী তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া, অক্লান্ত সেবা-সহকারে যথেষ্ট সুস্থ করিয়া তুলিলেন। এ সময় মহারাণী কামাক্ষী ষ্ট্রীটের ভাড়াবাড়ী ছাড়িয়া “উডলাও” প্রাসাদে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীমতী সাবিজী দেবী সুস্থ হইয়া, একদিন সন্ধ্যায় বায়ুসেবনে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইতে আকস্মিক ভাবে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া দেহমুক্ত হন। কোলের পিঠের চুই বোন যেন অভিন্নজনম ছিলেন, আবার এক কোচবিহার-রাজপরিবারে বিবাহিত হইয়া দুইটিতে আরো অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া-ছিলেন। তাই বিনয় আকস্মিক দেহপাত দিদির বক্ষে যেন বিনা মেঘে বজ্রের তায় আঘাত করিল। শ্রীমতী বক্ষের উপর পড়িয়া তিনি কতই ক্রন্দন করিলেন। প্রাণের শ্রীমতী বিনয় শ্রাদ্ধ-বাসরে মনোবালরে আসিয়া আর মুখে প্রার্থনা নাহির হইল না, অবিরল অশ্রুধারায় গভীর শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন। উপাসনাস্থে এ দীন সেবকের হাত ধরিয়া কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। দেখিলাম, যেন আধখানি হইয়া গিয়াছেন। বলিলাম, “এ শোক-শেলে আপনাদের জন্যই আমাদের বেশী ভয়।” কার্য্যতঃ ভাই হইল। কই বেশী দিন এ শোক-শেল বচন করিতে পারিলেন?

ইহার কয়দিন পরেই রাঁচিতে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ডাক্তারের আদেশ লইয়া গমন করেন। কিন্তু ভায়। সেখানে মাত্র দুই সপ্তাহ থাকিতে না থাকিতেই, ২২ নবেম্বর ১৯৩২, বুধবার রাত্রি আটার সময়, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া, মহারাণী স্মৃতি দেবী যোগ শোক জরা বাক্কিকো ভয় জীর্ণ স্নান তলুখানি ভাগ করিয়া, অমরধামে গিয়া শুভ্র পিতামাতা এবং রাক্ষসি স্বামিদেব, পুত্রদ্বয় ও কন্যা সঙ্গে হাসিতে হাসিতে মিলিত হইলেন। পরদিন এই ভীষণ শোকসংবাদ বিশ্বমথ ঘোষিত হইয়া, সন্ন্যাসী হইতে দীন পন-কুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকলে কতই না হাহাকার করেন। রাঁচিবাসী সঙ্কল্পের বহু নরনারী সঙ্গে ভ্রাতা নিয়মচক্র এবং আত্মীয় স্বজন বহুসংখ্যক যখন করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন, সে পবিত্র দেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়া প্রার্থনা-যোগে প্রাচীন সুবর্ণরেখার উপকূলে অগ্নিসংকার করেন, তাঁহার বিশদ বিবরণ ইতিপূর্বেই ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং সেখান হইতে তাঁহার দেহাবশিষ্ট পবিত্র ভস্ম আনীত হইয়া, যে স্থানকে তিনি “মহাতীর্থ এবং মোক্ষদাম” বলিয়া আমাদিগকে লিখিয়াছেন বিধা-তার আশ্রয় বিধানে সেখানেই, শুভ্র পিতামাতার সমাধিপাশে তাঁহার সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্মৃতির ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। সময়েশ্বর ভো বিধাতার মঙ্গল বিধানে স্বামী পুত্রের সমাধিপাশে কোচবিহারেও তদ্রূপ রক্ষিত হইতে পারে।

মহারাজী দেবী সুনীতির জীবনের ইতিহাস আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিলাম, লিপিবদ্ধ করিয়া দত্ত হইলাম। এই অপূর্ণ জীবনে বিধাতার অপূর্ণলীলা-কাহিনী অধ্যয়ন করিয়া কত আত্মাই ভবিষ্যতে ধন্ত হইবেন। সত্যই নববিধানে তাঁহার স্থান বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। তিনি নববিধানপ্রবর্তক নবভক্তের ঔরসে এবং সত্যীমাতার গর্ভে, তাঁহারিগের বৈরাগ্য-প্রণোদিত দারিদ্র্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া, দারিদ্র্যে প্রতিপালিত হইয়াও, তিনি বিধাতার অলৌকিক বিধানে স্বাধীন রাজ্যের রাজমহিষী হইলেন, ইংলণ্ডেশ্বরীর সখা-লাভে কতই সম্মানিত হইলেন, পাখির ঐশ্বর্যের কতই উচ্চ অবস্থায় অবস্থাপিত হইলেন, স্বাধীন রাজত্বের রাজমাতারূপে রাজ্যে পুজিত হইলেন। আবার অত্মদিকে তাঁহার বিবাহের আন্দোলন-ফলেই ব্রাহ্মসমাজ নববিধানে সমুন্নত হইল। সুধু তাহাই নয়, তাহার ফলে আর কিছু হটক না হটক, “সুনীতির সঙ্গে সুনীতি আলোক এবং পরিজ্ঞাপ কুচবিহারে প্রবেশ করিল,” এবং সমগ্র জগতের পরিজ্ঞাপপ্রদ সর্বসময়কারী নবযুগধর্মবিধান অভিযুক্ত হইল। ইণ্ডা সামান্য ব্যাপার নহে। তিনি এই বিধানে এক বিশেষ যত্নরূপে ব্যবহৃত হইয়া, সুখ সৌভাগ্য ঐশ্বর্য যেমন, তেমনি বৈধন্য শোক তাপ রোগ দুঃখাদি কতই ক্রম বহন করিয়াও, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিধান-ঘোষণায়, বিধান-সেবায় ত্রুট্যারিণী হইয়া জীবনের ত্রুট উদ্‌ঘাপন করিলেন। ভক্ত পিতা যেমন চাতিয়াছিলেন, “আমি রাণী চাই না, আমি চাই ঐশ্বরের দাসী”, তাহাই ত জীবনে সংসাধন করিয়া, রাজ্য দেশ যত্নগণ হইতে দূরে স্বর্ণরেখার কূলে জীবনলীলা শেষ করিলেন। এই জীবনচিত্র সেই মহাচিত্রকরেরই স্বস্ত-অঙ্কিত চিত্র ভিন্ন আমরা আর কি বলিব? উপসংহারে সত্যকিত্তিতে বলি :—

নমি ব্রহ্মানন্দদেবকৃত্য দেবী সুনীতি

শ্রীমূপেন্দ্রমহাবাগী, রাজাকিৎসাকমাতা সত্যী,

নববিধান-প্রেরিতা, সংভ্রমী, সেবিকাত্রয়ী,

সঞ্চারিলেন কোচবিহারে “আলোক, জ্ঞান, সুনীতি।”

দীন সেবক—প্রিয়নাথ মলিক ।

প্রাণে যখন ভাবি, তখন বেন তাই প্রতাপচন্দ্রের সেই অমরতত্ত্ব উপদেশগুলি অর্গে উপনীত করে! আজ তাঁরা দুজনই সেখানে অনন্ত শান্তি সন্তোষ করছেন।

মাসীমার স্বস্ত-লিখিত সেই চিঠিখানির অংশবিশেষ ধর্মতত্ত্বে প্রদান করিতেছি। আশা করি, পাঠক পাঠিকা সকলে সুখী হবেন।

শান্তিকুটীর,

২০শে আগষ্ট,

মেহের হেমলতা,

তোমার চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। যা লিখেছি, সবই ঠিক, নিরাপদে এসে পৌঁছেছিলাম বটে। কোথায় এলাম, কার কাছে এলাম, কেউ তো আমার জন্ত অপেক্ষা করে বসে ছিলেন না। শূত্র প্রাণে, শূত্র বাড়তে প্রবেশ হল। যিনি অনন্ত পূর্ণ, তিনি তাঁর সন্তান আত্মা বক্ষে নিয়ে বয় ভরপুর করে ছিলেন। এই তো আমার শাস্ত্রের আলয়, এখানে সমাধি, এখানে আমার পূজা; চিরশরণ্য দেব স্বামীর অক্ষর চরিত্র সাধন করেই পড়ে থাক। শ্রেয়, যেন তাই পারি, শান্তিকুটীরেই শেষ নিশ্বাস রেখে চলে যাই।

মা! হেম, তোমাদের জন্ত মন কেমন করেছিল, মনে হচ্ছিল, সুযোগ পেয়ে তোমাদের সঙ্গে আরো বেশী থাকা হলো না। তোমরা কত আদর, যত্ন, সেবা আমাকে করিলে; আরও পাবার সাধ হয়ে গেল, এটা কি ভাল নয়?

বনলতার শরীর ভাল দেখে আসিনি। যতদিন ভগবান্ দেহে রেখেছেন, তাঁর আশীর্বাদ মনে করে, দেহটা রক্ষা করে চলো। তাঁরই নিকট হইতে সংসারে জীব-প্রবাহের, বিশেষ মানবের সাধ্যমত সেবাত্রুট গ্রহণ কর, উদ্‌ঘাপন কর, মুক্তি সংজ্ঞে হইবে। শরীর যাতে রক্ষা হইয়া না পড়ে, তা করিবে।

আজ আমি বিদায় হই। মঙ্গলময় সকল প্রকারে তোমাদের কুশল বিধান করুন।

তোমাদের একান্ত শুভপ্রার্থিনী

মাসীমা

সেবিকা হেমলতা চক্র।

## দেবী সৌদামিনী মজুমদার ।

( ১ )

প্রেরিত তাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহধর্মিণী সৌদামিনী দেবী একবার পাটনার ব্রহ্মস্পদ ডাক্তার পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কিছুদিনের জন্ত আসিয়াছিলেন। পাটনা থেকে ফিরে গিয়ে আমাদের যে চিঠিখানি লেখেন, হঠাৎ সে চিঠিখানি পেলাম। এই সময়ে সেখানি আমরা পাঠ করে কত পুরাতন স্মৃতি মনে জাগিয়ে তুললাম। শান্তিকুটীরের সেই পূর্বেকার বর্ণীর দৃশ্য

( ২ )

সেই বহা শ্রমণের দিন সম্মুখে উপস্থিত, যে গভীর রজনীতে সেই দেবী আত্মা নিঃশব্দে ও নীরবে লোকচন্দ্রের অগোচরে সেই অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। ক্রমশঃ প্রতি মুহূর্তে আমাদেরিগের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। দেবী সৌদামিনী ক্রমবশতঃ যোগী ভক্ত প্রতাপচন্দ্রের সহধর্মিণী হইয়া আসিয়াছিলেন। সেই যে দেবী সৌদামিনী যোগী প্রতাপের পার্শ্বে যোগরতা হইয়া ভগবৎ-প্রেমে ডুবিয়া বাটতেন, তিনি সেই প্রেমেই যোগী প্রতাপের নীরব প্রকোষ্ঠে ক্রমে যোগিনীর মত আত্মদান করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ-পথের পথিক প্রতাপচন্দ্র ভক্তিমতী সহধর্মিণীর ভিতরে যে ক্রম-প্রেম ঢালিয়া দিয়াছিলেন, সেই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ২৬শে এপ্রিল রজনীতে। দেবী সোদামিনীর ভিতর দিয়া আমাদের নিকট মহাশক্তি শিক্ষা আসিয়াছে। এই শিক্ষাই নববিধানের পূর্ণ শিক্ষা। এই নববিধান ভক্ত ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছিল। সমুখে কত পর্বতসম বিষ বাধা, অত্যাচারীর কত অত্যাচার এবং বিক্রমকারীর কত ; বিক্রম কিন্তু সেই জলাপথের মহা পথিক সমস্ত ক্রমভার বহন করিয়া, নববিধানের পথে চলিয়া ছিলেন। ভক্ত প্রতাপও পারিপাশ্বিকের মত সেই নেতার সঙ্গে চলিয়া ছিলেন। নববিধানের এই নূতন বায়ুর মধ্যে ব্রহ্মানন্দসঙ্গিনী “দেবী জগন্মোহিনী” এবং ভক্ত প্রতাপসঙ্গিনী “দেবী সোদামিনী” বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তাই আজ বলিতে আদিত্য যে, নববিধানে বর্দ্ধিতা দেবী সোদামিনী তাঁহার জীবনপ্রসূত ফল “মহাপ্রসূতি” আমাদের সমক্ষে রাখিয়া গেলেন। অসংখ্য অসংখ্য কণ্টকে বিদ্ধ গোলাপতরু ; কিন্তু ভিতর হইতে মহাসৌন্দর্য ও সুরভিপূর্ণ গোলাপ পুষ্প বিনির্গত হইতেছে। সংগ্রহকারী পুষ্প সংগ্রহ করেন।

দেবী সোদামিনী তাঁহার পারিবারিক জীবনে “জননী” আখ্যাধারণ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু তিনি বর্তমান নববিধানমণ্ডলীর ভিতরে মহা জননীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মেহ, প্রেম ও ভালবাসা মণ্ডলীর রক্তে রক্তে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় জননীভাব এবং তাঁহার নববিধানধর্ম্যে মহাদীক্ষা ও মহাশক্তি তাঁহার নীরব জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে তাঁহার মস্তকের প্রত্যেক কোণটি পর্যন্ত নববিধানের জন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাসী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তিনি তাঁহার মহা প্রহরার পূর্বেই তাঁহার প্রত্যেক কপর্দকটি পণ্য নববিধানের নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। শাস্তিকুটীরে তিনি এই শাস্তিই লাভ করিয়াছিলেন।

উপসংহারে বলিয়া যে, দেবী সোদামিনীর জীবনগ্রন্থ আমাদের নিকট এক পঠনীয় ও অনুকরণীয় বস্তু। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। নববিধান জয়যুক্ত হউক।

গোপালনাথকুম, রাঁচি।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—•—

## শোণিত ও অশ্রুপাত।

ভক্ত শ্রীগৌরদেবের জীবনে অশ্রুতত্ত্বের বিষয় পাঠ করিয়াছি ; বর্তমান বিধানে অমরাগড়ীর দ্বার একটি ক্ষুদ্র পল্লিতে, ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে প্রথম হইতে এখনও যে অশ্রু ও শোণিত-শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহারই বিষয় আজ বিধানমণ্ডলীর চরণে নিবেদন করিতেছি। নববিধানের নবভক্ত বলিলেন, “মা! আমি জন্মসম্মানী, আমার জীবনটা সুখ ও দুঃখের ভিতর দিয়াই গঠিত। নবভক্তের প্রাণ হইতে এই যে অজ্ঞাত বেদবাণী উঠিল,

ইহা আমার মত চির দুঃখীকেও কতই আশাবিত্ত করিতেছে। কুল, মান ছাড়িয়া যে অভিনব মণ্ডলীতে বোণ দিলাম, সেই মণ্ডলীর তাই ভগিনীদিগকে আমরা বার্থ্য দেব ভাবে কৈ গ্রহণ করিলাম? স্বর্গীয় দেবদেবীরূপে আমরা পরস্পরকে লইতে না পারায়, তাহার বিপরীত মলিনভাব আনিয়া, আমরা ভগিনীদ্রোহী ও ভ্রাতৃদ্রোহী হইয়া অনেক পাপ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে কতদিনে হইবে, তাহা বলিতে পারি না ; সেই জন্তই আমরা এতটা নীচগামী হইয়া পরস্পরকে অস্বীকার করিতেছি। এই জন্তই অকিঞ্চন ভক্ত ফকির দাস নিতান্ত ব্যথিত প্রাণে প্রার্থনা করিলেন, “মা! তুমি আমাকে প্রথম হইতে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে রেখেছ, আমার জীবনটা আগাগোড়া এই ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যেই আছে”; তাই তাঁর শোণিতপাত ও অশ্রুপাত জীবনের চিরসঙ্গী হইয়াছিল। বিশেষভাবে এদেশের নরনারীদের সেবার ভক্ত ফকিরদাসকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে। দেশের শিক্ষা, ধর্ম, চরিত্রগঠনের জন্ত নীতিসভা, মাদকনিবারনী সভা, সুনীতিসংস্কারনী ও বন্ধুসম্মিলনীসভা স্থাপন করিলেন। এ দেশের নরনারীর ধর্ম্মসাধনের জন্ত বৃকের রক্ত ও চক্ষের জল দিয়া ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিলেন এবং সজনে নিরুজনে এ দেশের জন্ত কতই কাঁদিলেন ; কিন্তু এ দেশ-বাসীরাই তাঁর জীবনসংহারের চেষ্টা করিয়াছে, তাঁর বাসগৃহে আগুন দিয়াছে, তাঁকে পুত্র, কন্যা, পরিবার এবং দলসং প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করিয়াছে। তাঁর দলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে বিবিধ রকমে চেষ্টা করিয়াছে, তাঁদের প্রাণের বিদ্যালয়টিকে আগুনে পোড়াইয়া দিয়াছে, তাঁদের হৃদয়ের শোণিতে গঠিত ব্রহ্মমন্দিরকে ধূলিসাৎ করিবার জন্ত প্রকাশ্য আদালতে মোকদ্দমা করিয়াছে ; কিন্তু অকিঞ্চন ভক্তের কাতর প্রার্থনায় এবং দলের দুর্জয় বিশ্বাসের বলে ও প্রমত্ত হরিনামসংকীর্তনের ধ্বনিতে শত্রুদিগের সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। তাঁদের বিদ্যালয়টী এখন রাজ-অট্টালিকার পরিণত, ব্রহ্মমন্দিরের গগনভেদী চূড়ায় নববিধানের বিজয়নিশান উড়িতেছে এবং সমুখে “ব্রহ্মরূপাহি কেবলম্” ও পুষ্পমালা মধ্যে “মা” এই মহানাম অঙ্কিত হইয়া দর্শক ও পথিকদিগকে কতই আশাবিত্ত করিতেছে। ভক্ত ফকিরদাস তাই তাঁর দলকে শিখাইয়া গেলেন, “সহ কর, ভালবাস এবং পদাঘাতকারীর পদ চূষন কর”। ভক্ত ফকির দাসকে সদলে চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার জন্ত এ দেশের যে তিন জন ধনশালী ব্যক্তি বন্ধুপরিষদ হইয়াছিলেন, তাঁদেরই মধ্যে সেই সময় এক জন এক দিবস তাঁর সহিত দেখা করিতে আসায়, ফকির দাস তাঁর প্রতি বোধোচিত সম্মান ও ভক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া, প্রাণ ধুলে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। ভক্তের এই স্নমধুর ব্যবহারে সেই ধনী ব্যক্তি বলিয়া ফেলিলেন, “বাবা ফকির! বখন তোমার সহিত দেখা হয়, তখন তোমার ভক্তি ও ভালবাসায় আমাদের প্রাণ গলিয়া যায়, আমাদের যে সংকল্প তোমাকে ও

তোমার দলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা, সে সংকল্প আর থাকে না, আমরা তোমাকে দেখিলেই সব ভুলে যাই। বাহা হউক, বাবা, তোমার চেহারায় ও কথায় এবং ব্যবহারে একটা মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তির কাছে আমরা হারিয়া যাই”। ঐ ধনী ব্যক্তিই কিছুদিন পরে ফকির দাসের বাস্তবিতা খরিদ ও বিদ্যালয়ের জন্ম ২৩০০০ ৩০০ বা ৪০০ টাকা দীর্ঘকালের জন্ম বিনা সুদে ধার দিয়া ছিলেন। ফকির দাস ও তাঁর দলের নির্ধ্যাতনকারী একব্যক্তি তাঁর স্বর্ণগমনের পর প্রেরিত তাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে কাঁদিয়া বলিলেন, “ভক্ত তাই ফকির চলে গেলেন, আর আমরা পাপী পাবও এখনও পড়ে রইলাম।” এদেশে আমরা দীর্ঘকাল নানা ঘটনা ও অবস্থার তিতরে কেবল বিধান-জননীর ও তাঁর ভক্তদিগের অশ্রু ও শোণিতপাতের অমোঘ-শক্তি দেখিয়া ধন্ত ও কৃতার্থ হইতেছি। ইতি।

প্রণত—ঐ অখিলচন্দ্র রায়।

## নমস্কারসপ্তক।

৫০ বৎসরের অধিক হইয়াছে, নিম্ন প্রদত্ত নমস্কারসপ্তক রচিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নববিধান বিধোচিত হইলে, গৃহ-প্রচারক স্বর্ণগত কানীকুমার বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া, আমরা কতিপয় বন্ধু নববিধানের নিশান এবং খোল করতাল ও একতারা লইয়া নদীরাবাদ সহরবাসী অনেক বন্ধুর গৃহে ও শত্ৰুগজ, হরিবোলা, কেওটবালী প্রভৃতি গ্রামে, “শুন হে নুতন বিধি আনন্দের সমাচার” এই বিধানসঙ্গীত উৎসাহসহকারে গাইয়া-ছিলাম। তৎকালে আমাদের প্রতিদিন পূর্বাহ্নে সমবেত উপাসনা হইত। উপাসনান্তে (১) সাধু মঠাঙ্গনদিগের চরিত্রে ও জীবনে এবং পশুপক্ষী বৃক্ষলতা প্রভৃতি সর্বভূতে, (২) বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে, (৩) নারীজাতিতে, (৪) শিশুদিগের মধ্যে, (৫) শত্রু, মিত্র সকলেতে, (৬) নববিধানে, (৭) জীবন্ত ঈশ্বরকে বর্তমান আনিয়া উপাসকগণ সঞ্জিলিত ভাবে প্রণাম করিতেন। এই প্রণাম শ্লোকাধারে রচিত হইয়া তৎকালে ঐঐহরিতকিতরঙ্গিনী নারী ত্রৈমাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। কুচবিহারে এবং ঢাকাতে কোন কোন বন্ধু উহা দৈনিক সমবেত উপাসনান্তে ব্যবহার জন্ত আমাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও, আমি তাহা ব্যবহার করি নাই। কেন না, সর্বসাধারণের জন্ত যে উপাসনা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ঠিক সেইরূপই থাকা বিধেয়। তবে বাহ্যিক চরিত্রে এবং জীবনে বিশেষভাবে নবধর্ম সাধন করিলে, তাহাদের জন্তই এই নমস্কারসপ্তক। স্মরণ্য ইহা ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার উপলব্ধি থাকে, ইহাই একান্ত বাসনা। এ জন্ত ইহা ইতিপূর্বে ধর্মতত্ত্বে দেওয়া হয় নাই। এই ভাবে থাকিলে হয় ত শ্লোক করটি বিশেষণ হইয়া সইতে পারে, এ আশঙ্কা আছে।

তাহা ছাড়া, ইহা প্রকাশ করিলে যদি কাহারও উপকার হয়, তাহাও মনে হইতেছে। এ জন্ত শ্লোক করটি সামান্য পরিবর্তন করিয়া এবং ধর্মপিতামহ রাজা রামমোহন, ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং নববিধানের প্রেরিতগণের মধ্যে কয়েকটি নাম দিয়া কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়া, ধর্মতত্ত্বে প্রকাশ জন্ত প্রেরণ করিতেছি।

### নমস্কারসপ্তকম্।

নমস্তভ্যং মহর্ষীশা দাসামুক্তে: সুসাম্বিধে।  
পিতৃপ্রাপ্তদেবকাম্যনু জনহায় জনাঙ্গনে ॥  
নমোনমোহস্ত কৃষ্ণায় বোগাচাৰ্যায় দীমতে।  
সত্যপন্থপ্রতিষ্ঠাত্রে হরিত্তেবিবিমর্দিনে ॥  
নমোহস্ত গৌরচন্দ্রায় তত্ত্বপন্থপ্রদপিনে।  
প্রমোদ্যস্তায় ভক্তায় প্রেমিকায় নমোনম: ॥  
নমস্তুৎকেশবদাদার মহামদার হজরতে।  
নারদায় মোসেসায় বুদ্ধিতিরায় বৈ নম: ॥  
নমো দেবেন্দ্রনাথায় ঐরামমোহনায় চ।  
কেশবায় প্রতাপায় চাখোরায় নমোহস্ত তে ॥  
ইহামুজনিবাসিত্যো ভক্তেভ্যোহস্ত নমোনম: ॥  
বিধানবাদিনে তুভ্যং বিধাতৃবিধিধারিণে ॥ ১ ॥  
নম: পুরাণগীতাভ্যং বাইবেলার ছন্দসে।  
ঐতরে স্মৃত্যে চৈব কোরাণার নমোনম: ॥  
জৈন্মাভেস্তে নমস্তভ্যং নমো ললিতবিস্তর।  
হরমুখগমুখায় সত্যশাস্ত্রায় তে নম: ॥ ২ ॥  
নমোহস্ত গুরবে নৃণাং ধৈর্যশিক্ষা প্রদারিকে।  
ললনে পতিগেহস্ত্রী মাতৃস্নেহরূপিনি ॥  
নমস্তভ্যং পতিপ্রাণে মানবকুলভূষণে।  
স্নেহবতৌ মহামটৌ পত্যোকাব্যবিধারিণি ॥ ৩ ॥  
নমোহস্ত তে পবিত্রাণ্যনু শিশবে দেবমূর্তয়ে।  
পুণ্যালয় সহাস্যাস্য নেত্রাজনায় তে নম: ॥  
কমাশীল নমস্তভ্যং বিনয়বিনতায় তে।  
অহংকারবিহীনায় প্রশান্তচেতসে নম: ॥ ৪ ॥  
বিরোধিনো নমোবোহস্ত ব্রহ্মব্রহ্মরূপকা:।  
পীড়য়া সত্যসন্ধ্যায় মুক্তিপথাবধারিণ: ॥ ৫ ॥  
বিধাতৃবিধয়ে তুভ্যং ভক্ত্যা প্রীত্যা নমোনম:।  
স্বপ্ৰসাদানুসন্ধানায় জীবমুক্তিভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥  
নমোহস্ত হরয়ে নিত্যং পাবনদলনায় তে।  
বিধানং সূর্য্যতে তুভ্যং তত্ত্বমুক্তিপ্রদারিনে ॥ ৭ ॥

ঐ অখিলচন্দ্র সেন



## সংবাদ ।

**জাতকর্ষু**—বিগত ২৭শে চৈত্র, ১০ই এপ্রিল, সোমবার, মালমদিরহাটে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্তীর গৃহে, ঈশ্বরকৃপায় নিরাপদে একটি পুত্র এসব করিয়াছেন। গত ১৭ই এপ্রিল, সোমবার, শিশুর মাতামহ শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী ধর্ম-রীতি শিশুর জাতকর্ষ সম্পন্ন করিয়াছেন। শিশুটি তাহার পিতামাতার ৪র্থ সন্তান।

গত ১০ই বৈশাখ, রবিবার প্রাতে, হাওড়া-বাঁটরা-নিবাসী স্বর্গীয় ডাঃ শরৎকুমার দাসের পৌত্র, শ্রীমান প্রভাতকুমার দাসের মনজাত শিশুপুত্রের শুভজাতকর্ষে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

ভগবান্ নবজাত শিশুদিগকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

**নামকরণ**—গত ১৩ই এপ্রিল, বাঁটরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবোপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায়, শ্রীমান প্রভাতকুমার দাসের পুত্রের নামকরণ হয়। শিশুর নাম “প্রণতিকুমার” দেওয়া হয়।

গত ১২শে এপ্রিল, রাত্রে, ২৩নং বাহুরবাগান রোডে ভবনে, শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র দত্তের কন্যা ও শিশুপুত্রের নামকরণ অনুষ্ঠানে ভাই কঙ্গকুমার লখ উপাসনা করেন এবং কন্যাকে “নমিতা” ও শিশুপুত্রকে “রঞ্জিতকুমার” নাম প্রদান করেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

**নববর্ষ**—নববর্ষাগমে গত ১৪ই এপ্রিল, প্রাতে, নবদেবা-লয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও শ্রীমতী মাধমবালা বসু বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং আচার্যদেবপুত্র শ্রীযুক্ত ভ্রাতা মিশ্রলচন্দ্র আচার্য-দেবের প্রার্থনা এবং ভ্রাতা সরলচন্দ্র “মাতৃদেবীর” প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। “মামবজীবন সময়ের সমষ্টি ঈশ্বরের কৃপায় সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ, জীবন মরণের তিতর দিয়া, সময়ের সদ্যবহার করিয়া মানবাত্মা অনন্ত জীবনপথে অগ্রসর হয়,” এইভাবে উপদেশ প্রদত্ত হয়।

**নূতন থাতি**—গত ১৪ই এপ্রিল, ১লা বৈশাখ, পূর্বাঙ্কে, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মন্দির দোকানে “হালখাতি” উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

**উৎসব**—গত ১৩ই এপ্রিল, চৈত্রমংক্রান্তির দিনে, হাওড়া বাঁটরায়, ভ্রাতা বসন্তকুমার দাসের গৃহে, বাঁটরা ব্রাহ্মসমাজের সাধারণিক উৎসব হয়। প্রাতে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক এবং সন্ধ্যায় ডাঃ কামাখ্যানাথ বল্লোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ভ্রাতা

বসন্তকুমার ও তাহার পুত্রগণ বহুজন নিমন্ত্রণ করিয়া দুই বেলাই প্রীতিভোজন করান।

**সেবা**—গত ১১ই এপ্রিল, পুরী থেকে কটকে আসিয়া, ভাই প্রিয়নাথ মন্তকঘূর্ণন-রোগে আক্রান্ত হন। অনুরূপতা সবেও ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওর পরিবারবর্গগৃহ সন্ধ্যায় উপাসনা করিয়া, পরদিন শ্রীকৃষ্ণানন্দাশ্রমে আসেন। ১৩ই সন্ধ্যায় বর্ষবিদায় উপলক্ষে ও ১৪ই সন্ধ্যায় নববর্ষাগম উপলক্ষে এখানে উপাসনা হয়। স্থানীয় বহুগণ যোগ দেন।

ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার ১৭ই ফেব্রুয়ারী রেঙ্গুনে পৌছছেন। তিনি ১২শে ফেব্রুয়ারী, ৫ই, ১২শে ও ২৩শে মার্চ, চারি রবিবার সন্ধ্যাকালে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। ক্রমান্বয়ে উপদেশের বিষয় ছিল,—সর্বধর্মসম্মত, ধর্ম ও অস্পৃশ্যতা, পাপ ও পুণ্য কণ্ঠের ফল এবং সত্যই মানুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ও সুদৃঢ় আশ্রয়। ১৩ই মার্চ, সন্ধ্যায়, ব্যারিষ্টার ইন্ডুবর্ণ সেনের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তাহার ভাগিনেরী-জামাতা ব্যারিষ্টার রঞ্জনকুমার রায়ের রেঙ্গুনস্থ বাসায় এবং ১২শে মার্চ প্রাতে স্বর্গীয় কালীচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠ জাকাতা, প্রফেসার বিজয়কুমার বসাকের গৃহে, তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা করেন। ইহা তিন্ন ডাঃ মজুমদার রেঙ্গুনের প্রত্যেক ব্রাহ্মের বাসায় বাইরা সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন। ২রা এপ্রিল তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

**ভিক্ষা চাই**—ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিয়াছেন:—পুণী মন্বর্ণকুটীরনির্মাণ হেতু প্রায় ৭০-এক হইয়াছে। বি. এম. রেলের কর্তৃপক্ষগণ যদিও অল্প মূল্যে পুরাতন স্পিয়ার কাঠ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা অনান্যিবার সুযোগ হয় নাই। ভাই কুটীরের দরজা জানালা সব এখনও প্রস্তুত হয় নাই। উপরে লিখিত করিতে হইবে। বার্ষিক সংস্কারকার্য্যেও প্রায় পঁতালিক টাকা ব্যয় হইবে। এই সকলের জন্য অর্থ ভিক্ষা চাই, এবং ধর্মপ্রাণ দাতৃগণের অগ্রহই ভিক্ষা করি। যিনি যাহা দয়াজ্ঞচিত্তে দান করিবেন, পুণী নবপর্ণকুটীরে সেবকের নামে, কিম্বা ডাঃ বি. সি. ঘোষ—৩নং ক্রীক রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায়, কিম্বা ৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে, প্রচারকার্য্যালয়ের কাৰ্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

**কোচবিহারে মহোৎসব**—বিধান-জননীর অনির্বচনীয় নীলার, এবার কোচবিহারের নববিধানমন্দিরপ্রতিষ্ঠার সাধুসঙ্গিক উপলক্ষে, গত ১৬ই এপ্রিল হইতে ২১শে এপ্রিল পর্য্যন্ত মহোৎসব হইয়াছে। ষ্টেটের অর্থসাহায্য-সংকোচ হেতু পাণ্ডেয়-প্রার্থী না হইয়া, ভাই প্রিয়নাথ তীর্থযাত্রীর ভাবে, শারীরিক বার্জিক্য এবং স্নায়ুদৌর্বল্য সবেও আসিয়া, উৎসব-সম্পাদন-কার্য্যে ব্যবসৃত হন। ১৬ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় আরতি-যোগে উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, রবিবার বলিয়া সংক্ষেপে উপাসনাও হয়। ১৭ই প্রাতে শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণ বার স্মরণে কেশবা-



শ্রমস্থ সমাধিমণ্ডপে পরলোকভীর্ণ সাধন হয়। অদ্য ত্রিদিশার পুনরুত্থানের দিন; এই দিন ত্রিনূপেন্দ্রনারায়ণের সহিত মহারানী স্নানীতি দেবীর পুনরুত্থানে পুনর্মিলন উপলব্ধ হয়। সন্ধ্যায় সর্ব-ধর্মাবলম্বীদিগের সম্মিলনের উৎসব হয়। রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জে, এম্, সেন গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা ও আচার্য্যদেবের বিধানঘোষণাবাদী পাঠ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল কবিরাজ হিন্দুধর্মবিষয়ে, মিঃ পল ক্রীষ্টধর্ম বিষয়ে ও শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী বর্ণধর্মসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কুমারী কোহিমুর রায় মধুর সঙ্গীত করেন। ১৮ই সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী উপাসনা করেন, অপরাহ্নে পাঠ, প্রসঙ্গ ও কীর্তনাদির পর ভাই প্রিয়নাথ বেদীর কার্য্য করেন। এ বেদীর উপাসনার ভ্রাতৃগণের সহিত ভগ্নীগণ ও পক্ষীর অন্তরাল হইতে কয়েকটি মিষ্ট সঙ্গীত করিয়া উৎসবানন্দ বর্ধন করেন। ১৯শে কেশবপ্রসন্ন আগুনানারীসমাজের উৎসব হয়, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, ভগ্নীগণ ও কন্ডাগণ অনেকেই মধুর সঙ্গীত করেন এবং পরে পাঠ প্রসঙ্গাদির পর শ্রীতিভোজন হয়। এই দিনেই ভ্রাতৃমণ্ডলীর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু ও বুঝা কন্ডাগণ শ্রীতিভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে শ্রীতিভোজন করেন। অপরাহ্নে শিশু-সম্মিলন হয়, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া শিশুকেশবের গল্প বলিলে, শিশুগণও কিছু কিছু আবৃত্তি করেন। ভগ্নীগণ সঙ্গীত করিয়া শিশুদিগকে উৎসাহিত করেন। ২০শে প্রাতে কেশবপ্রসন্ন উপাসনা হয়, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও ভ্রাতা কেদারনাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই দিন সন্ধ্যা আটায় বিদ্যাসী ও সহোদয়-কীর্তিদিগের সভাপতিবেশন কেশবপ্রসন্ন হয়। মাননীয় রেভেনিউ অফিসার ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ দত্ত মণ্ডলীর সভাপতিগণের সহিত আনন্দিত হইয়া শুভাগমন করেন এবং নূতন কাণ্ডানির্দাহক সভার সভ্য হইতে স্বীকৃত হন। এ দিনকার কার্য্যবিবরণী পরে প্রকাশ করা হইবে। ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিলে কয়েকটি নির্দাহন হয়, একটা কাণ্ডানির্দাহক সভা গঠিত হয়, ভ্রাতা মনোরথখন দে (এম্, এ) সম্পাদক ও ভ্রাতা কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় সভাকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সন্ধ্যায় যুবকগণ কেশবপ্রসন্নের উদ্যানে একটা ধর্ম্মভিনয় করেন। ২১শে এপ্রিল শ্রীযুক্ত মনোরথখন দে গৃহে পারিবারিক উপাসনার উৎসব হয়, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন, ভ্রাতা মনোরথখন দে ভক্তি-উচ্ছ্বাসিতভাবে সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যায় কেশবপ্রসন্ন শান্তিবাচন হয়। ভ্রাতৃগণ ও ভগ্নীগণ মধুর সঙ্গীত করেন। ২২শে প্রাতে ভ্রাতা কেদারনাথের গৃহে উপাসনা করিয়া ভাই প্রিয়নাথ সন্ধ্যায় মেলে পুনর্বাচন করেন।

পারলোকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত দুইটা পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

বিগত ২৭শে মার্চ, নববিধানে দৃঢ়নিষ্ঠ বৃদ্ধ বন্ধু কন্ডাগীকান্ত চন্দ্র, নিজবাড়ী মতগ্রামে দেহরক্ষা করিয়া বিশ্বজননীর ক্রোড়স্থ হইয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে যে চারিজন বোং, ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানের শিক্ষার্থী হইয়াছিলেন, কন্ডাগীবাবু তন্মধ্যে বোংগীকান্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দ্রের কনিষ্ঠ এবং স্বর্গীয় রমণীকান্ত চন্দ্রের অগ্রজ। তিনি বরাবর ঢাকায় ভ্রাতৃত্বসংঘে বোংগদান করিতেন। সকল প্রচারকের প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি এবং অটল প্রজ্ঞা ছিল। তাঁহার বয়স নানাদিক অশীতি বৎসর হইয়াছিল। এখানে বাস করিয়া কবিরাজি করিতেন।

গত ১০ই এপ্রিল, কলিকাতায়, রাধানগর-রামমোহনস্মৃতি-ভবনের উদ্যোক্তা ও কতিপয় অসহায় বালকবালিকাদের প্রতি-পালক শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রনাথ পাল দীর্ঘকাল রোগযাতনা ভোগ করিয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ২৩শে এপ্রিল, তাঁহার পবিত্র ভ্রাতৃভ্রাতৃপুত্র সন্ধ্যায় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১০ টাকা দান করা হইয়াছে।

পরলোকগত অমর আত্মা সকল মাতৃকোড়ে শান্তিলাভ করুন এবং পোকার্ত্তপ্রাণে স্বর্গের পান্ডিত্য ও সাধনা বর্ধিত হউক।

সাংস্ফটিক—বিগত ২৬শে চৈত্র, অমরাগড়ীতে, স্বর্গীয় বশোদাকুমার রায়ের সাংস্ফটিক উপলক্ষে, তাঁর সমাধি-মন্দিরে, ভাই অধিনাচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। ২৭শে চৈত্র, প্রাতে, জয়পুর ফকিরদাস হাইস্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ মিলিত হইয়া বশোদাবাবুর স্মৃতিসভায় তাঁর স্বদেশাত্মবোধাদি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

গত ১১ই এপ্রিল, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের পুত্রের ও ১৮ই এপ্রিল তাঁহার কন্ডার স্বর্গারোহণের সাংস্ফটিক উপলক্ষে কলকাতায় ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ৩০শে চৈত্র, প্রাতে, গনং মধুরভঞ্জ রোডে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন বীরের গৃহে, স্বর্গীয় বিনয়মোহন সেনানবিশের সাংস্ফটিকে এবং সন্ধ্যায় গনং পটারিরোডে, কুচবিহারের দেওয়ান স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেনের সাংস্ফটিকে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। শ্রীমতী স্মৃতি সেহানবিশ স্বামী সাংস্ফটিকে প্রচারভাণ্ডারে ২ টাকা দান করিয়াছেন।

আলিপুরে, ২৮শে নিউরোডে, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, ১০ই এপ্রিল, তাঁহাদের জননী স্বর্গীয় মঙ্গলা দেবীর ও ১২ই এপ্রিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাংস্ফটিকে অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন। ১২ই এপ্রিল, ইউনিভার্সিটি-ইনস্টিটিউট হলে স্মৃতিসভাও হইয়াছিল। উক্ত দুই দিবস কলিকাতায় শ্রীযুক্ত গোবীন্দ্রনাথ মজুমদারের গৃহেও উপাসনা হয়।

বিগত ৬ই বৈশাখ, প্রাতে ও রাত্রিতে, ডাঃ অমূলচন্দ্র মিত্রের বাসভবনে, তাঁর স্বশ্রমভার সাংস্ফটিক উপলক্ষে ভাই অধিনাচন্দ্র রায় করেন। অমূলচন্দ্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" প্রিয়ারিভোব যোব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মবর্তা

অবিশালমিতং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ সুনিস্কলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনবরম্।  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ত্রাণকরং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।  
৯ম সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৪৭ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

15th May, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## অর্থনাশ

হে ধর্মের পরম প্রস্রবণ! তুমি স্বয়ং ধর্মরাজ,  
তুমি স্বয়ং ধর্ম এবং তুমিই ধর্মের পরম আদর্শ। স্থান ও  
কালের প্রয়োজন বুঝিয়া, তুমি জগতে বিশেষ বিশেষ  
সময়ে, বিশেষ বিশেষ স্থানে, তোমার মনোনীত সাধু পুত্র  
যোগে ধর্মের বিশেষ বিশেষ দিক প্রকাশিত কর। তুমি  
যখন যে ধর্মবিধি প্রকাশিত করিয়াছ, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ,  
তাহাতেই জগতের কল্যাণ হইয়াছে। তুমি যে বিধি কর  
বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি। অতীতে ও বর্তমানে তোমা  
হইতে যত বিধি সমাগত হইয়াছে, তোমার মঙ্গল হস্তের  
দান বলিয়া, তাহা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ নবধর্মবিধানে  
আমাদের কাজ। আমরা কিছু দিন পূর্বে তোমার  
প্রেরিত ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্যকে গ্রহণ করিতে যাইয়া,  
তোমার প্রেরিত ভক্তির বিধান যথাসম্ভব আলোচনা  
ও গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। তৎপর তোমার  
প্রেরিত সুপুত্র শ্রীকৃষ্ণের জীবনও আলোচনা ও গ্রহণ  
করিতে যাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বিধান বা পুত্রত্বের বিধান গ্রহণ  
করিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি। বৈশাখের পূর্ণিমায়  
তুমি আমাদের নিকট তোমার প্রেরিত জীবন্ত বৈরাগ্যের  
অবতার, নির্ব্যাণশাস্তির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া

উপস্থিত হইয়াছ। আমরা তাঁহাকে তোমারই মনোনীত  
প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়া এবং তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম-  
বিধানকেও তোমার অভিপ্রেত ধর্মবিধান বলিয়া গ্রহণ  
করি। তোমার প্রেরিত অন্যান্য মহাজনগণ তোমাকে  
বিশেষ বিশেষ নামে, বিশেষ বিশেষ স্বরূপে ব্যক্ত করি-  
লেন; তোমার প্রেরিত শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কোন্ নামে,  
কোন্ ভাবে ব্যক্ত করিলেন? পৃথিবী বলে, তিনি  
তোমার নাম পর্যাস্ত করেন নাই; তাই অনেকে তাঁহাকে  
নাস্তিক বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। পৃথিবী বলে, তিনি  
তো কোন্ ভাবে তোমার পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান  
নাই। হে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেরয়িতা! তুমি শ্রীকৃষ্ণের  
জীবনের সত্যধর্মকে আমাদের নিকট ব্যক্ত কর। অতঃপর  
নিকট কোন ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া পূর্ণ তৃপ্তি লাভ হয়  
না। তোমার বাণীতে যখন মহাপুরুষদিগের জীবন ও  
তাঁহাদের জীবনের ধর্ম বর্ণিত হয়, ব্যাখ্যাত হয়, তখনই সে  
ধর্ম আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি, গ্রহণ করিতে পারি।  
শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বিশেষ কোন নামে ব্যক্ত করেন নাই  
সত্য; কিন্তু তিনি কি তোমাকে ধর্ম নাম প্রদান করেন  
নাই? মুসলমান ধর্মে আল্লাহকে স্মরণ ও গ্রহণ, প্রেরিত  
পুরুষ মহম্মদকে স্মরণ ও গ্রহণ এবং ধর্মশাস্ত্র কোরাণকে  
স্মরণ ও গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। আর বৌদ্ধ ধর্মের

শ্রীমন্তঃ শরণং গচ্ছামি, সজ্জং  
একই সমাধিমণ্ডপে। যিনি মৃত্যু ওয়া, আর অনাম  
পুনরুত্থানের দিন; এ... লওয়া কি  
অনীতি দেবীর পুনরুত্থানে  
ঈশ্বরদেবীর সন্নিহিত ভবনকে বা... ককে ধারণ  
করি, এম, সেন গুপ্ত মহাশয় ভবনকে... এতাকে  
তোম প্রিয়নাথ প্রার্থনা ও... কই ধর্ম,  
... কাঁচা আরম্ভ করেন।... কি অণু  
... বিবরে, মি: পল জীউ... আমার  
... সর্বদা সর্বদা সর্বদা সর্বদা  
জীবনে... তিনি বাহিরে তোমার পূজার  
কোন আয়োজন প্রবর্তনা করিলেন না, কোন পূজা বাহ্য-  
ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিলেন না; কিন্তু তিনি মহাত্ম্যের  
মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, মহাতপস্যার উদ্ভাপে  
উত্তপ্ত হইতে হইতে, ধ্যানের পর ধ্যান ধারণায় তোমাকে  
ধারণা করিতে করিতে, তোমার অন্তর্মুখীন মহাপূজা,  
সত্য পূজা কি প্রতিষ্ঠিত করিলেন না? বাহ্যপূজার  
বিকৃতিতে বুঝি পৃথিবী ভারাক্রান্ত ও বিকল হইয়া পড়িয়া-  
ছিল, তাই বুঝি শ্রেষ্ঠত্ব্যগের ভিতর দিয়া বুদ্ধজীবনে  
তোমার অন্তর্মুখীন গুঢ় সত্য পূজা প্রতিষ্ঠিত হইল।  
আমরা কি জানি, কি বুঝি। তুমি নিজ রূপাণ্ডনে  
শ্রীবুদ্ধের জীবনের ধর্ম আমাদিগকে বুঝাইয়া এবং গ্রহণ  
করিতে দিয়া ধন্য কর, তব চরণে এই বিনীত প্রার্থনা।

শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

## সত্য সূর্যের আকর্ষণ।

প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে, কপিলাস্থ নগরে,  
শ্রীবুদ্ধ রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুদ্ধধন  
রাজার একমাত্র পুত্র। কত সুখৈশ্বর্যের মধ্যে তিনি  
বাল্যে ও যৌবনে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।  
বাহিরে তিনি যথেষ্ট আমোদ প্রমোদ, সুখ ঐশ্বর্য, ভোগ  
বিলাসিতার মধ্যে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াও, কৈশোর  
ও যৌবনের আরম্ভে, সাধারণ লোকের জীবন যেমন বহি-  
র্মুখীন হয়, মনের গতি প্রবৃত্তি যেমন বাহিরের আহার  
পরিচ্ছদ, আমোদ আশ্লাদ ও ভোগ বিলাসিতার বিবিধ  
সামগ্রীর প্রতি উন্মুখীন ও আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা  
না হইয়া শ্রীবুদ্ধের জীবন অন্তর্মুখীন হইয়া পড়িল।  
বাহিরে এত আকর্ষণ, সে দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হয়

না; কিন্তু অন্তরে কি যেন নিগূঢ় আকর্ষণ, কি যেন টান,  
সেই দিকে তাঁহার মনের গতি, সেই দিকে তাঁহার চিন্তা,  
সেই দিকে তাঁহার ধ্যান, ধারণা। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা,  
ধ্যান চিন্তনে কাটাইয়া দিতে লাগিলেন।

এই অন্তর্মুখীন আকর্ষণ কি? সত্যের আকর্ষণ।  
যাহা কিছু কণিক, যাহা কিছু অসার, যাহা কিছু  
অনিত্য ও অনাস্থ্য, তাহাতে বিমুখতা, তাহার প্রতি উদা-  
সীনতা; যাহা কিছু নিত্য, সত্য ও অমায়্য, তাহার প্রতি  
টান, তাহার প্রতি গূঢ় আকর্ষণ। ভিতরে এক অজানিত  
দুর্দমনীয় শক্তি তাঁহার চিন্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ  
করিতে লাগিল যে, তাঁহার চিন্তকে ধন ঐশ্বর্য ও ভোগ-  
বিলাসিতার দিকে লইয়া যাইবার জগৎ তাঁহার পিতামাতার  
শত চেষ্টা, বিনিধি বিপুল আয়োজন ব্যর্থ হইয়া গেল।  
অবশেষে তিনি রাজা, সংসার, ধন, ঐশ্বর্য শিয়তম এক  
মাত্র শিশু পুত্র, শ্রিয়তমা পতিপ্রাণা পত্নীর আকর্ষণ ও ছিন্ন  
করিয়া, অন্তরের সেই অজানিত, অব্যক্ত গূঢ় শক্তির  
আকর্ষণে, রাজপুরী হইতে বহির্গত হইতে বাধ্য হইলেন।  
তিনি দীর্ঘ ছয়টি বৎসর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট  
অনুসন্ধান করিলেন, যাহা শিখিবার শিক্ষা করিলেন, পাঠ  
প্রসঙ্গ যাহা করিবার করিলেন, যাহা কিছু জানিবার জ-  
লেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণের তৃপ্তি হইল না। তিনি  
বুঝিলেন, তাঁহার প্রাণ যে গূঢ় সত্যের টানে আকৃষ্ট হইয়া  
সেই সত্যের পূর্ণ আলোক লাভের জগৎ বাহির হইয়াছে,  
পুরাতন কোন বিধি ব্যবস্থার ভিতরে, পুরাতন কোন  
শিক্ষার ভিতরে, মানুষ গুরুর কোন পরিচালনার ভিতরে  
সে পূর্ণালোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। সে যে নূতন  
পথ, সে যে এক নূতন পথে নূতন সিদ্ধি, শাস্তত শান্তির  
নূতন সুসমাচারলাভ; পুরাতন পথে, পুরাতন শিক্ষায়  
তাহা মিলিবে কেন? তিনি নূতন পথে নূতন  
আলোক লাভ করিবার জগৎ বিখাতা কর্তৃক প্রেরিত।  
তাঁহার জীবনের মঙ্গল্যে সে পথের সকল আয়োজন  
নিগূঢ় ভাবে বর্তমান, যথাবিধি প্রচেষ্টায় যথাসময়ে কেবল  
তাঁহার পরিষ্করণ প্রয়োজন। তাই তিনি অবশেষে  
আপনার প্রকৃতির প্রেরণায়, বাহিরের কোন মানুষ গুরুর  
শিক্ষা সহায়তা ও প্রাচীন কোন ধর্মগ্রন্থানুমোদিত  
ব্যবস্থাদির অনুসরণ না করিয়া, আপনার ভাবে সাধন-  
পথে অগ্রসর হইলেন। ভিতরে কি এক অপ্রতিহত  
সত্যের দুর্জয় আকর্ষণ। যে অজানিত অব্যক্ত সত্যের

দুর্জয় আকর্ষণে রাজ্য, ধন, স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, সেই সত্যের গুঢ় আকর্ষণে বাহিরের কোন মানুষ গুরুর শিক্ষা দীক্ষা ও প্রাচীন বিধি ব্যবস্থার সকল প্রকার আকর্ষণকেও অতিক্রম করিয়া, মুক্ত ভাবে মুক্ত পথে শান্ত শান্তির মুক্তালোক লাভের জন্ম অগ্রসর হইলেন। অন্তরের চিদাকাশে পূর্ণ জ্ঞানচন্দ্রের পূর্ণালোক-লাভের সহায় কেবল বাহিরের মুক্তাকাশ ও মুক্তাকাশের পূর্ণচন্দ্রের মুক্তালোক রহিল। তিনি সিকিলাভের জন্ম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আসন পরিগ্রহণ করিলেন, সিকিলাভের জন্ম একনিষ্ঠ হইয়া সকল প্রকার স্থূল আহার পরিত্যাগ করিলেন, সামান্য তিল ও জল সম্বল রহিল। এরূপ কৃচ্ছ্র সাধনে শরীর কঙ্কালসার হইল, শারীরিক বল শক্তি একে-বারে হারাইলেন। তাঁহার শরীর ও মনোরাজ্যে এক অস্বাভাবিকতা উপস্থিত হইল। এ অবস্থায় তাঁহার অন্তরস্থ প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইজিত করিলেন, সিদ্ধি স্বাভাবিক পথে, অতি আহারেও নয়, নিত্য অনাহারেও নয়, মধ্য পথ অবলম্বন কর। তিনি অবশেষে অন্তরের প্রেরণায় স্নান আহার অবলম্বন করিলেন, ক্রমে শরীর মন প্রকৃতিস্থ হইল। সেই শরীর মন লইয়া যখন একাগ্রভাবে সিকিলাভের পথে আসন গ্রহণ করিলেন, তখন শরীর মনের স্বাভাবিকতার মধ্যে তাঁহার আত্মিক প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবে উচ্চ হইতে উচ্চতর বল লাভ করিল। একদিকে আত্মিক প্রকৃতির উচ্চ হইতে উচ্চতর, উচ্চতম স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে, অপব দিকে বাহ্যাকাশে সুরূপক্ষের পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণালোকের সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার চিদাকাশে অনন্ত সত্য সূর্যের স্ফায়ময়, শান্তিময়, আনন্দময় দিব্য কিরণের দিব্যচ্ছটায় পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি অভূতপূর্ব বিমলানন্দে নিমগ্ন হইয়া আত্মহার হইয়া গেলেন। কথিত আছে, সাতদিন সাতরাত্রি তিনি এক অখণ্ড অচ্ছেদ্য আনন্দ-স্রোতে ভাসমান রহিলেন। এ আনন্দ বাহিরের স্বাভাবিক ভাগে, সর্ববিধ কাননার বিনাশে, জীবাত্তার সঙ্গে পরমাত্মার পূর্ণযোগের শ্রেষ্ঠফল ভিন্ন কিছুই নহে। জীবাত্তারূপী খণ্ড চৈতন্যের সঙ্গে পরমাত্মারূপী পূর্ণ চৈতন্যের উচ্চ মিলনে যে আনন্দ, এ সেই আনন্দ, সেই শান্তি। জীবাত্তারূপী জ্ঞানখণ্ডের মধ্যে পরমাত্মারূপী অনন্ত জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ এখানে বিশিষ্ট ব্যাপার। শ্রীবুদ্ধ এই অনন্ত জ্ঞানের দাক্ষিণ্য লাভ করিয়া, বোধিসত্ত্ব বা শ্রীবুদ্ধ নাম প্রাপ্ত হইলেন। নবদীপের

নিমাই পণ্ডিতও পরমাত্মারূপী শ্রীবুদ্ধের মুক্ত চৈতন্য লাভ করিয়া, শ্রীবুদ্ধচৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবুদ্ধের নামবিশীন ঈশ্বরের সাধনা চর্চা করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন, শ্রীবুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন; কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বরালোকের পথে নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ বুদ্ধির পথে চলিয়া মানবজীবনের একটা শান্তির পথ তিনি আবিষ্কার করিলেন, তাই তিনি শ্রীবুদ্ধ নাম গ্রহণ করিলেন। সকল ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদিত, স্বদেশের বিদেশের সকল মহাপুরুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনার সত্য সংবাদ—সেই এতদ অনন্ত ভূমি সত্যস্বরূপ পরমাত্মার সহিত জীবাত্তার মধুময় অমৃতময় অচ্ছেদ্য মিলন এবং সেই অনন্ত পরমাখ্যতে ক্রমাগত উদ্বিগতলাভ। ইহাতেই শান্ত শান্তি ও শান্ত আনন্দ। শ্রীবুদ্ধের জীবনেও তাহাই। বিশিষ্টতায় যেমন প্রত্যেক মহাপুরুষই বিশেষ এবং এক অন্য হইতে ভিন্ন, তেমনি জীবনের বিশিষ্টতায়, স্বর্গের নিয়োগের বিশিষ্টতায় শ্রীবুদ্ধ মহাপুরুষদিগের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তি এবং অন্যান্য মহাপুরুষ হইতে স্তত্ব। অন্যান্য সাধু ভক্ত মহাজনগণ তাঁহাদের জীবনে প্রকাশিত পরম দেবতার বিশিষ্ট প্রকাশকে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করিলেন; শ্রীবুদ্ধও আপনার জীবনে স্বর্গের নিরোগপত্রানুসারে এবং সেই সময়ে জগতের প্রয়োজনানুসারে, আপনার জীবনে প্রকাশিত অনন্ত চৈতন্য, অনন্ত জ্ঞানরূপী পরমাত্মাকে অনাম অধামরূপেই উপলব্ধি করিয়া, অনাম অধামরূপেই তাঁহাকে রাখিয়া ছিলেন। অনন্তস্বরূপের অনন্ত ঐশ্বর্যময় প্রকাশে আকৃষ্ট হইয়া, অভিভূত হইয়া, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর “আস্কানক” নামক ধ্যানে তিনি নিমগ্ন হইলেন। এ প্রকাশকে কোন নামে অভিহিত করিব? তাঁহার অবনর ও অধিকার কোথায়? ইহাই তাঁহার জীবনে অনন্তের বিশিষ্ট লীলা। শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে লীলাময় ঈশ্বর কত বিচিত্ররূপেই প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি কি তাঁহার জীবনে ঈশ্বরের সকল প্রকাশের স্বরূপাত্মক নাম দিতে পারিয়াছেন? তিনি তো বলিলেন, আমার জীবনের প্রকাশিত ঈশ্বরকে পিতা বলিলাম, মাতা বলিলাম, শ্রীহরি বলিলাম, তাহাতেও সত্য বলা হইল না, তিনি একটা অবস্থা ইত্যাদি। শ্রীবুদ্ধ তাঁহার অন্তরের প্রকাশিত দেবতাকে অন্য কোন স্বরূপাত্মক নাম দিলেন না, নাম দিলেন ধর্ম।

যাঁহা দ্বারা ত্রিলোকের সকল ধৃত হইয়া আছে, এবং যাঁহাকে ধারণ করিয়া জীব পরম গতি, পরম শাস্তি প্রাপ্ত হয় তাঁহারই নাম ধর্ম। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “এক এব স্নহকর্মো নিধনেহপাসুযাতি যঃ”—ধর্মই একমাত্র স্নহদ, যিনি মৃত্যুর পরও জীবের অশুগমন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে ঈশ্বরের স্থানে ধর্ম নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তাই বৌদ্ধ ধর্ম্যে অবলম্বিত মূল ত্রিমন্ত্র—“ধর্ম্যং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সত্ত্বং শরণং গচ্ছামি”।

ধর্মজগতে একই সত্য সূর্যের বিচিত্র প্রকাশ এবং একই সত্য সূর্যের বিচিত্র আকর্ষণে মহাজন, ক্ষুদ্রজন সকলেরই উজ্জগতি-লাভ।

## ধর্মতত্ত্ব।

### প্রার্থনা।

“প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। প্রার্থনা কর, যাঁহা কিছু পাটবার সকলই পাটবে।” বর্তমান নব্যযুগধর্মবিধান নব্যবিধানে ইহাই প্রথম ব্রহ্মবাণী, এই বাণীর অমুসরণেই নব্যবিধানের মুর্ত্তমান জীবন গঠিত। সুতরাং নব্যবিধানের নব্যজীবন লাভ করিতে হইলে, নব্যবিধানপ্রবর্তকের অমুগমনে এই বাণীর অমুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক প্রার্থনা নব্যবিধানের প্রধান এবং সর্বোচ্চ সাধন। তাই প্রার্থনা করার দাড়াই অতি গুরুতর। মুখের কথা, ভাব-ভক্তিবিহীন দাড়া তাহা বলা, বা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করা প্রার্থনা নয়। ক্ষুধিত শিশুর ক্রন্দন যেমন, ক্ষুধিত তৃষিত আত্মার প্রাণের উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তিই তেমনি প্রার্থনা। যথার্থ ক্ষুধা অশুভব করিয়া, শিশু যখনই ক্রন্দন করে, না তখনই তাহাকে স্তন্য দান করিয়া তৃপ্ত করেন; ঠিক সেই ভাবে যথার্থ আত্মার অভাব অশুভব করিয়া, প্রত্যেক ব্রহ্মমার কাছে আত্মনিবেদন করাই প্রার্থনা। সেই ভাবে প্রার্থনা করিলেই হাতে হাতে তাহার ফল লাভ হয়। ভাবের স্রোতে বা ভাবার স্রোতে ভাসিয়া গেলে প্রার্থনা করা হয় না। প্রার্থনা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তাই আচার্য্য বলিলেন, “বিমল রাধিবে প্রার্থনা।”

### তৃণের শোভা।

উর্বর ভূমিতে যে তৃণ অবাধে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, অহরহর বালুকামর ক্ষেত্রে সে তৃণকেও অনেক সাধা সাধনা করিয়া, অনেক জল সিঞ্চন করিয়া রোপণ করিতে হয়। কিন্তু যখন রোপিত হয়, পুষ্পতরুর দ্বার কতই তাহার শোভা।

তত্ত্বজীবনের উর্বর ভূমি যেমন বহু সঙ্গুণে পূর্ণ, তেমনি তৃণ-গমান দীনতাও তাহাতে পরিপূর্ণ; কিন্তু জ্ঞানান্ধিমানে ও অহং-ভাবাপন্ন শুক বালুকামর জীবনে অনেক সাধা সাধনা না করিলে, তগবানের কৃপাবারিসিঞ্চন বা ক্রন্দনের অশ্রুবর্ষণ না হইলে, সে দীনতা অর্জন বা রোপণ করা যায় না। রোপিত হইলে সে দীনতাতেই জীবনের উদ্যান অধিকতর গোভাসম্বিত হয়। তৃণের ন্যায় দীনতা-সাধনই তাই আমাদের জীবন-উদ্যান-রচনার প্রধান উপাদান।

### নিজ বাসভূমে প্রবাসীর মত।

আমার বাড়ীর চাষিটা অন্যকে দিরাছিলাম। নানারূপ পর্যাটন করিয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, দ্বার বন্ধ। নিজের ঘরে নিজেই প্রবেশ করিতে পাইলাম না, পরের মত বাহিরে বসিয়া রহিলাম। দুর্কিপাকবশতঃ দ্বার-দেখে বসিয়াই বৃষ্টি ও ঝড়াবাতে কষ্ট পাইতে হইল। গুরুবাদী বা মধ্যবর্ত্তিতাবাদী—পরের হাতে ধর্ম্য দ্বার—তাহারও অবস্থা এইরূপ। আমার মায় ঘরে প্রবেশের চাবি আমার নিজ হস্তে রাখিলে, আর আমাকে কখনই এ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। দ্বারে আঘাত করিলেই বা চাবি খুলিলেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারি ও বাহিরের সকল ঝড়াবাত হঠাতে রক্ষা পাইতে পারি।

### প্রেম ও শাসন।

উদ্যানে কতকগুলি গাছ আছে, তাহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়। আবার কতকগুলি গাছ আছে, তাহাতে জলসিঞ্চন করিলে পচিয়া মরিয়া যায়; তাহার ওলায় জল না দিয়া ছাই দিতে হয়, তাহাতেই তাহার পুষ্টি হয়, বৃদ্ধি হয়। বিধাতার বিধানে ইহা কি সুন্দর শিক্ষাপ্রদ। এইরূপে প্রেম ও শাসন দ্বারাই তিনি, বাহার যেমন প্রয়োজন, তাহাই বিধান করিয়া মানবজীবনকে পুষ্টি দান করিয়া থাকেন। বাহার শাসন প্রয়োজন, তাহাকে কেবল প্রেমদান করিলে তাহাতে তাহার অনিষ্ট হইয়া থাকে।

### রামপ্রসাদী।

মা হারয়ে পড়েছিঁসু ধরা। (ও মা)

(তুই) আপন প্রেমে আপনি পাগল,

(ঐ) প্রেম তোর করেছে সারা।

ছিল যখন বেদের ব্রহ্ম, অগম্য তুই পরাৎপর,

(ঐ) দুজের অজের বলে জানুতো তোরে সারাধরা।

পুরাণে লীলাময় হরি, হলি যখন সারাৎসারা,

(ঐ) পুরুষকার তপে লপে কে ক'জন পেলে তোর ধরা।



নববিধানেন্তে তুই মা, হ'লেও সেই নিরাকারা,  
(স্নেহে) অন্তঃপুরের বের করে মা, হয়েছি যে ছেলে ধরা।  
(পাপ) রোগের খালে থাকলে ছেলে, দূরে দূরে মায় ছাড়া,  
(ওরে) মায় প্রাণ ত খ'কত নারে, পলেক কোলের  
ছেলে ছাড়া।

ধরবি যখন ধর মা তখন, দিলাম চিরতরে ধরা,  
নবশিশু সঙ্গে রাখিস অঙ্কে, করিস্নেহে মা কোলছাড়া।

—দীন সেবক

## “ধর্ম-সাধন”।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৪৯ সংখ্যা—৬ই শ্রাবণ, ববিবার, ১৭২৫।

(গিরিধির ডাঃ সি. রায় চর্চিতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

প্রশ্ন—সকল ধর্মসাধনের মূল কথা কি?

উত্তর—সরল ভাবে প্রতিজ্ঞা করা, আমি চেষ্টা করিব।

প্র—চেষ্টা করিব, কে বলিতে পারে?

উ—বে ইচ্ছা করে, সেই পারে। কিন্তু বর্থাৎ প্রাণগত সরল ইচ্ছা না চলে, ‘চেষ্টা করিব’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা আসিতে পারে না। আমরা অনেক সময় বাতা ইচ্ছা করি মনে করি, বাস্তবিক তাচ্ছ ইচ্ছা করি না, আমাদের হৃদয়ের গূঢ় প্রার্থনা অতীতকে ধাবমান হয়; সুতরাং ইচ্ছা ও চেষ্টা সেই দিকেই খাতিয়ে হইয়া থাকে। আমি ভাল হইব, বর্থাৎ এই ইচ্ছা হইলেই ভাল হওয়া যায়।

প্র—আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু তাহা সাধ্যানুসারে করিব, বলা যায় কি না?

উ—আমাদিগের বাহ্য সাধ্য, তাহা করিলেই যথেষ্ট; তাহার অতিরিক্ত আর কিছু করি:ত আমরা দায়ী নহি, জৈবরও তাহা আমাদিগের নিকট চাহেন না। কিন্তু কতদূর আমাদিগের সাধ্য, আমবা পূর্ব হইতে তাহার সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। বাহ্য কর্তব্য বুঝি, সরল ভাবে তাহার অনুসরণ করিয়া যতদূর যাইতে পাতি, ততদূর আমাদিগের সাধ্য। সাধন না করিলে কতদূর আমাদিগের সাধ্য বা অসাধ্য, বুঝিতে পারা যায় না।

প্র—কি রূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে চরিত্রগত দোষ সংশোধন হইতে পারে?

উ—আমাদিগের চরিত্রগত দোষ সকল দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, (১) জঘন্ড, (২) সামান্য। সাধনের সুবিধার জন্য এই দুই শ্রেণীর প্রধান পাপগুলি প্রথমে গ্রহণ করা যাইতেছে।

(১) জঘন্ড পাপ ৫টি—কাম, ক্রোধ, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা, নিষ্ঠুরতা এবং উপাসনাহীনতা।

(২) সামান্য পাপ ৫টি—অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, পরনিন্দা, আলসা ও অকৃতজ্ঞতা।

আমরা প্রতিদিন এই সকল দোষে কতবার দোষী হই, তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেকের নিকট এক একখানি ক্ষুদ্র অরণ-পুস্তক রাখা আবশ্যিক। ঐ পুস্তকে প্রত্যেক দোষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিহ্ন বাবতার করা যাইতে পারে এবং প্রতিদিন যে দোষে যতবার দোষী হওয়া যায়, তাহা চিহ্ন করিয়া রাখা কর্তব্য। ইহা অন্তর্কে দেখাইবার প্রয়োজন নাই, প্রত্যেকে আত্মপরীক্ষার জন্য আপনার নিকটেই রাখিবেন এবং দিন দিন কোন পাপ কত হইতেছে, ততার দ্বারা নিরূপণ করিবেন। প্রথমতঃ দৈনিক অরণ-পুস্তকে প্রথম শ্রেণীর পাপের দাগ দিয়া কিছু দিন সাধন করা ভাল। তাহাতে জঘন্ড পাপ কত কম হয়, বুঝা যাইবে।

প্র—কোন দোষ কার্য্যে অশুভিত না হইলেও কি পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

উ—দোষের কার্য্য হইলে তো পাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবেই; কিন্তু যেখানে কার্য্যের সুবিধা হয় নাই, কিন্তু মনে মনে তজ্জন্ত সম্পূর্ণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে, সেখানে তাহাকেও পাপ বলিয়া ধরিতে হইবে। মনেতেই পাপ। দশদিন বনে বসিয়া চিন্তা করিয়া এত পাপ করা যায় যে, দশ বৎসর সহরে থাকিয়াও তত হয় না।

প্র—মনেতে পাপের যে কোন প্রকার চিন্তা আশ্রক, তাহাকেই কি পাপ বলিয়া ধরিতে হইবে?

উ—অনেকে এই কথা লইয়া বড় গোল করেন; কিন্তু দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সহজে নীমাংসা করা যাইতে পারে। (১) একটা পানী ঘরের এক জানালা দিয়া আসিয়া আর এক জানালা দিয়া উড়িয়া গেল। (২) ঘরের মেজের উপর দিয়া একটা ছুঁটা চলিয়া গেল। প্রথমটা এণো গেণো, কিছুমাত্র তাহার চিহ্ন রহিল না। দ্বিতীয়টা ময়লাপূর্ণ নর্দমা হইতে আসিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু একটা কাল দাগ রাখিয়া গেল, আধঘণ্টা দুর্গন্ধ রহিল। পাপচিন্তাও এইরূপ দুই প্রকারে হইয়া থাকে।

প্রথমটা অরণমাত্র, তাহাতে পাপ নাই। পূর্বের মদ খাইতাম, এখন ছাড়িয়াছি; কিন্তু পাঁচজনকে মদ খাইতে দেখিয়া আপনার পূর্ব অভ্যাস অরণ হইল, তাহাতে পাপ হইল না। সেই পাপের প্রতি বরণ যত আশ্চর্য্যিক ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়, ততই আপনার চরিত্রের সাধুতা প্রতিপন্ন হয়।

দ্বিতীয়টা বাসনাভূমি। পাপ চিন্তা মনে আসিবামাত্র ইচ্ছা হয়, আর একটু থাক। অনেকে মদ খাইতেছে দেখিলাম, আর একটু দেখি, ক্রমে ইচ্ছা হইবে একটু খাই, পরে মাতালের দ্বার জ্বাচেনন হইয়া পড়ি। পাপ আসিবামাত্র অমনি অমনি চলিয়া যাওয়া কম লোকের ঘটে। অধিকাংশ হলে ইচ্ছা হয়,



দ্বিতীয় পাপকে আসন পাতিয়া বসাই, তাকে শীঘ্র বিদায় হইতে না দি। যে ব্যক্তি আধ মিনিট বা ৫ সেকেন্ড মন্দ ইচ্ছাকে মনে থাকিতে দেয়, তাহাকে চিরজীবন তাহার কুফল ভোগ করিতে হয়।

প্র—যদি স্বপ্নে কোন পাপ করা যায়, তাহাও ধর্মব্য কি না ?

উ—স্বপ্ন জাগ্রৎ অবস্থার বাহ্যক। স্বপ্নেতে এমন কিছু হয় না, বা জাগ্রৎ অবস্থায় না হয়। স্বপ্নের কার্যটি পাপ নয় বটে, তাহা মিথ্যা; কিন্তু তাহা পাঠ ও আলোচনা করিয়া অনেক শিক্ষা করা যায়। স্বপ্নে যদি কোন পাপ কার্য্য করি, জাগ্রৎ অবস্থায় যে সে পাপ করিতে পারি, তাহা অসম্ভব বোধ হয় না। অতএব স্বপ্ন দ্বারাও আপনার অবস্থা বুঝিয়া সাবধান হওয়া যায়।

প্র—পাপ সকলের পরস্পরের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ ?

উ—পাপ সকল পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিয়া থাকে এবং পাপের পরিবার বাহাতে বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্ত সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে। কাহারো একটি নবকুমার হইলে চারিদিক হইতে ঢাকী, ঢুলী আসিয়া নাচ বাদ্য করিতে থাকে; একটি নতুন পাপ জন্মিলে তেমনি সকল পাপ ঢাক ঢোল লইয়া আনন্দোৎসব করিতে থাকে।

প্র—চরিত্র-সংশোধন ও উপাসনা এ দুয়ের মধ্যে কতটুকু কোনটুকু ?

উ—সাধারণতঃ ধরিলে উপাসনা করা সহজ, কেননা তাহাতে আপনার নিকট আপনি দাখী, অন্তের সঙ্গে গোল বাধে না। তাহাতে কোন ক্রটি হইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। চরিত্র-সম্বন্ধে অন্তের সহিত সম্বন্ধ, তাহাতে ক্রটি হইলে ধরা পড়িতে হয় এবং নিজের চরিত্রের দোষে সহস্র লোকের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মের চরিত্র-সংশোধন না হইলে ধর্ম মিথ্যা, সমাজ মিথ্যা, সব মিথ্যা।

প্র—ষড়রিপুর মধ্যে সর্ব প্রধান কোনটুকু ?

উ—কাম ও দোষ এই রিপু দুইটি সর্বাপেক্ষা অধম। ইহাদের সহিত শরীরের অতি গূঢ় সম্বন্ধ আছে। এইজন্ত ব্যক্তির কার্য্যে ইহারা প্রকাশিত হয় এবং বাহ্যর শরীরে ইহারা বাস করে, আর শরীরের পতন না হইলে তাহাকে ত্যাগ করে না; এইজন্ত এই দুইটির প্রতি দৃষ্টি থাকা আবশ্যক এবং বাহ্যতে ইহারা দমন থাকে, সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য।

প্র—ইন্দ্রিয় সকল যৌবনে প্রবল হয়, বয়োবৃদ্ধি হইলে কি নিস্তেজ হয় না ?

উ—ইন্দ্রিয়-শাখা প্রথম যৌবনেই থাকে, পূর্বে অনেকের খারগা ছিল; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, যৌবনকালের ফল বহু বৎসর বয়সে ভোগ করিতে হয়। যৌবনে ইন্দ্রিয় দমন না করিলে, বৃদ্ধকালেও তাহার দাগ দিতে হইবে। রিপুদিগকে

রাখিয়া দিলে চিরকাল ( তাহার ফলভোগ করিতে হয় )। আমরা দেখিতেছি, এ সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবিশ্বাসও আছে। যতদিন এইরূপ অবিশ্বাস থাকিবে, ততদিন পরস্পরেরই অপকার। আমাদের মধ্যে ৫০টা মানুষ কেহই খুন করিতে পারে না, ইহা যেমন সাহস করিয়া বলা যায়, কেউ রিপুসেবা করিতে পারে না, একথা ত তেমন বলা যায় না। আমরা পরস্পরের হাতে টাকা কড়ি গচ্ছিত রাখিতে যেমন পারি, কাগাণে নিকট আপনার ভগিনী ভাৰ্য্যাকে সেইরূপ গচ্ছিত রাখিয়া যথা ইচ্ছা নিশ্চিন্তভাবে কি যাইতে পারি? যে দিন এরূপ হইবে, সে দিন পৃথিবী স্বর্গ হইবে।

প্র—আমরা আত্মশাসনের জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে পারি ?

উ—আত্মশাসনের জন্য উপায় :—সাধুসঙ্গ প্রভৃতি যে সকল উপায় আছে, তাহাতো ধরিতে হইবে। পূর্বে আত্ম-পরীক্ষার জন্য স্মরণপুস্তক ও পাপ চিহ্ন করিবার যে কথা হইয়াছে, তাহাই এখনকার বিশেষ কথা। যে পাপ প্রবৃত্তি অধিক প্রবল হইবে, তৎশাসনের জন্য একটা কোন প্রকার দণ্ড স্বীকার করিলে অনেক উপকার হয়। যেমন একটা ক্রোধের কার্য্য করিয়া তৎপরে ঠিক আহ্বারের সময়ে আহ্বার না করা অথবা কোনরূপ সুবিধা পরিত্যাগ করা। এ সকল এইরূপ বাহ্যক প্রাপ্তিস্থিত। কিন্তু যিনি আপনার প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বুঝিয়া এই প্রকার উপায় গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার ঈশ্বর উপকার হইতে পারে।

প্র—স্মরণপুস্তকে পাপের দাগ দিলেই কি উপকার হইবে? মনে রাখিলেই তো হয় ?

উ—প্রত্যেকের ২১টা পাপ খুব প্রবল, তাহারই প্রতি তার দৃষ্টি থাকে, অথ পাপ সামান্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করা হয়। যার কাম, ক্রোধ, বেগী, মিথ্যা কথাকে দোষ বলিয়া তত দেখে না। কেবল চিন্তায় আত্মপরীক্ষা করিতে গেলে আপাততঃ ২৪ সপ্তাহ চলিতে পারে, কিন্তু পরে ঠিক থাকিবে না। দাগ দিবার নিয়ম করিলে বিশেষরূপে আত্মপরীক্ষা হয় এবং সকল পাপ ধরা পড়ে। কিন্তু দাগ দেওয়ার আসল অর্থ কাগজে দেওয়া নয়, মনে দেওয়া। ইহার মধ্যে আর একটি স্মরণ কথা মনে রাখা উচিত। কাগজ, কলম, কালী এই তিন পৃথিবীর জিনিষ লইয়া যে দাগ দিলাম, তাহা পার্থিব, তাহার কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই। কিন্তু সেইটিকে যদি প্রতিজ্ঞার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহার স্বর্গীয় ভাব হইল, তদ্বারা নিশ্চয়ই বাঁচিয়া যাইব। ঈশ্বর হাতে যদি একটা ঘাস দেন, তাহা ধরিয়াই রক্ষা পাইতে পারি; ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে ঘাস ঘাসই থাকে, তাহা পরিচালনের উপায় হইতে পারে না।

( ক্রমশঃ )

## সাধু হীরানন্দ।

বাঁহারা সত্যের সন্ধানে যাঁজা করেন, বাঁহারা বহুশতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কার-কুচেলিকাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করেন, বাঁহারা অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও দীন হৃৎখীর ও শোকার্তের করুণ ক্রন্দনে বাথিত হইয়া মুক্তির বাণী শুনাইবার জন্য পথের কাঙ্গাল হন, তাঁহাদের শক্তি অদম্য, গতি দুর্দমনীয়, প্রভাব অজয়ের, প্রেম অসীম। বিশ্বের কোনও শক্তিই সেই স্রোতকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। যেদিন বিশ্বের কল্যাণে যুগাবতার রাজা রামমোহন রায় 'শান্তং শিবং অষ্টৈতৎ' এই বাণী প্রচার করিলেন, ভারতের বুকে একটা নবযুগের বিরাট প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহারি বিজয়পতাকা লইয়া, তাঁহারি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, তাঁহারি প্রেরণার উদ্দোষিত হইয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সেই প্রবাহকে বেগবান করিয়া গিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞান ও বৈবাগ্য এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সাধনা ও প্রচার এই সনাতন পন্থাকে চির প্রাতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং মোহময়ী বক্তৃতার দ্বারা এই মুক্তির বাণী, এই আনন্দের বাণী হাজার হাজার নর-নারীকে মুগ্ধ করিয়া, মঙ্গলময়ের মঙ্গলবিধান দেশবিদেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আনন্দময়ের আনন্দনিকেতন, ভক্তের প্রেম-নিকেতন, শোকার্তের শান্তিনিকেতন চিরপবিত্রময় ব্রহ্ম-মন্দির বহুস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ভবিষ্যতের উৎসাহ ও আশার সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। সুদূর সিদ্ধুদেশে হাইদ্রাবাদে এই প্রকার একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনকোলাহলের অতিদূরে শান্তিময় নির্জন স্থানে, পত্রপুষ্পে শোভিত কাননের মধ্যে, প্রকৃতির মনোরম সৌন্দর্যের মৌলানিকেতনের মাঝে, বহুশাখাপ্রাশাখাবিশারিত অশ্বখবৃক্ষের নিম্নে শীতল ছায়ার কোমল ফোড়ে আনন্দময়ের আনন্দনিকেতন স্থাপিত হইয়াছিল। অতি সন্ধ্যায় যে মন্দির মুখরিত করিয়া ভক্তের প্রাণস্পর্শী করুণ প্রার্থনা চতুর্দিকের ধার্মিক, শোকার্ত জনগণের প্রাণে শীতল-ধারা ঢালিয়া, তাহারি বক্ষে আশ্রয় লইবার জন্য আহ্বান করিত। এই প্রেমের আহ্বান কোনও এক সংলম্বিত ধর্মপ্রাণ বালককে বিস্তার করিয়াছিল। এই বালক ভবিষ্যতে সিদ্ধুদেশে সর্বজন-পূজ্য হইয়াছিলেন এবং মহৎ জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হওয়ার, তাঁহার দেশবাসী ভক্তিতরে তাঁহার নামের পূর্বে "সাধু" পদটি যোজনা করিয়া, "সাধু হীরানন্দ" নামে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। বাঁহারা অন্তর সাধু, তিনিই প্রকৃত সাধু। অন্তরে অসাধু, অথচ বাহ্যিক অসুষ্ঠানের বৃথা আড়ম্বর, গৈরিকরসনে ভূষিত, অটাজুটশিরে, কমণ্ডলুহস্তে শোভিত সাধুকে কখনই সাধু নামের মর্যাদা দেওয়া হইতে পারে না। বাঁহারা অন্তরে বাহ্যে পবিত্রতা, বাঁহারা অন্তরে বাহ্যে নিঃশব্দতা,

বাঁহারা অন্তরে বাহ্যে স্বচ্ছতা, বাঁহারা অন্তর বাহির বৈরাগ্যের গৈরিকরাগে রঞ্জিত, তাঁহার হস্ত ত সাধুবেশের কোনই প্রয়োজন হয় না। তাঁহার হৃদয়ের দান, তাঁহার উন্নত প্রাণই তাঁহাকে বিশ্বজগতে সাধু নামে প্রচার করে, তাঁহার মহান কার্যকলাপই সাধুত্বের পূর্ণ সার্থকতা আনিয়ন করে। হীরানন্দের উদার হৃদয়, হীরানন্দের দীন হৃৎখীর অক্লান্ত সেবা, হীরানন্দের অটুট ভগবদ্-ভক্তি, হীরানন্দের উৎসর্গিত জীবন দেখিয়াই তাঁহার স্বদেশবাসী ভক্তিতরে "সাধু হীরানন্দ" নামেই তাঁহাকে পূজা করিয়া সাধু শব্দের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সেই বিদ্যমান ছিলেন; এই অল্প সময়ের মধ্যে, সিদ্ধুদেশের যত প্রকার সংকল্প, সং অসুষ্ঠান ও সং অভিবান আজকাল সিদ্ধুদেশে প্রতিষ্ঠিত, এই সমস্তেরই প্রবর্তক ছিলেন সাধু হীরানন্দ।

সাধু হীরানন্দের সহিত বাঙ্গালার নিবিড় সংলগ্ন ছিল। বাঙ্গালার কোমল ফোড়ে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা, বাঙ্গালীর প্রেম ও মেহে তিনি লালিতপালিত, বাঙ্গালীর ভাব ও ভাবায় তিনি অনুপ্রাণিত, বাঙ্গালীর বদ্ব ও সেবার মাঝে তাঁহার চিরনিদ্রা। বাঙ্গালী তাঁহার চিরবন্ধু ছিল, বাঙ্গালী তাঁহার প্রাণপ্রিয় ছিল। বাঙ্গালীও প্রতিবৎসর তাঁহার মণিনিদ্রার তিথিতে, তাঁহার পবিত্র স্মৃতির চরণতলে পূজার অর্ঘ্য ঢালিয়া দিয়া নিভেছে চিৎখেনা মনে করে।

সাধু হীরানন্দ ২৩শে মার্চ, ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, হাইদ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুর আনন্দময় হৃদয় মুখমণ্ডল দেখিয়া জননী আদর করিয়া তাঁহার নাম রাখিলেন—হীরানন্দ—সমস্ত আনন্দের হীরকখনি।

হীরানন্দের পিতা দেওয়ান সৌকিরাম নন্দীরাম হাইদ্রাবাদে একজন অতি ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম ও কর্ম তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। কর্তব্যসাধনে তিনি কখনও পরাশ্রয় ছিলেন না। সত্য এবং সত্যতার পথ হইতে তিনি কখনও বিচলিত হন নাই। একাধারে তিনি যেমন বিচক্ষণ রাজকর্মচারী ছিলেন, সিদ্ধুদেশের ক্ষত্রিয় আমিলজাতির ঐতিষ্ঠাবান সমাজপতি ছিলেন, পারস্যভাষার একজন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন, তেমনি তিনি মেহময় পিতা, গেমময় স্বামী এবং মধুময় সখা ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, চরিত্রের মাধুর্য্য ও চরিত্রের সৌন্দর্য্য ফুটন্ত গোলাপের জায় চতুর্দিক আলোকিত ও আমোদিত করিয়া রাখিয়াছিল। পুত্রগণ পিতৃহৃদয়ের সমস্ত সম্পদই উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন।

হীরানন্দের জননী গম্ভীররূপিণী ছিলেন। আদর্শ গৃহিণীর সেবা ও সৌজন্য, দয়া ও দাক্ষিণ্য, মায়া ও মমতায় সৌকিরাম নন্দীরামের সংসার নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছিল। যদিও তিনি নিরক্ষর ছিলেন, তবুও তিনি জানিতেন, ভাষাহীন মহান আদর্শের ছবি যদি সন্তানদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া যে শিক্ষা দেওয়া যায়, সেই শিক্ষা পুণিগত হইলেও কখনও পাওয়া যায়

না। সেই আদর্শ, সেই শিক্ষা তিনি সন্তানদের দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার শিক্ষার গুণে আজ তাঁহার সন্তানগণ দেশপুঞ্জ। হীরানন্দের করুণাময়ী জননীর জন্মের যেমন দীন ভূখীর করুণ ক্রন্দনে নিতা আলোড়িত হইত, তেমনি শোকভূখের প্রবল ঝটিকায় তাঁহার জন্মের পশান্ত মহাসাগরের জায় ধীর, স্থির, অটল এবং ভগবদ্ নির্ভরতার পরিপূর্ণ থাকিত। তাঁহার পরিবারবর্গ নানকপন্থী ছিলেন। সদগুরু ত্রীচরণে তাঁহার সমস্ত ভূখের ও বেদনার নিবেদন ঢালিয়া দিয়া, মেঘযুক্ত শারদ উষার জায় তাঁহার জন্মের বহু, নির্মল আকাশের জায় আনন্দের হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। আনন্দের পরশমণি, শোকান্তের একমাত্র অবলম্বন, নানকপন্থীর অমূল্য সম্পদ, সদগুরুর শ্রীমুখশানী, গুরুগ্রন্থের সারাংশের ‘অপজী’ ও ‘সুপমণির’ অমৃতময় প্লোকগুলি তাঁহার কর্ণধর ছিল এবং সেইগুলি তাঁহার সরলমতি সন্তানদের আরত করাটয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহারা ভবিষ্যতে সুখ ভূখে এই প্লোকগুলির মর্মার্থ জন্মে অনুভব করিয়া আনন্দ পান। জননীর কোমলতা, সেবাপরায়ণতা এবং ভগবদ্ নির্ভরতা সাধু হীরানন্দ উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়া, হাজার হাজার দীন ভূখীকে আপন করিয়া লইয়াছিলেন, হাজার হাজার রোগ-শোক-ক্লিষ্ট আত্মরকে দিবারাত্রি অক্লান্ত সেবা ও শুক্রযায় নিবাস্য করিয়াছিলেন, হাজার হাজার কুষ্ঠ-রাগীর গলিত কুষ্ঠ ধোয়াইয়া দিয়া অসহ বহুবার হাত হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। ধন্ত জননীর ধন্ত সন্তান।

শৌকীরাম নন্দীরামের চারিটি পুত্র—চারিটি কুলের জায় একই বৃক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নভলরায় জ্যেষ্ঠ, তারানাথ মধ্যম, হীরানন্দ তৃতীয় এবং নতিরাম কনিষ্ঠ। তাঁহাদের ভায়ে ভায়ে খুব মিল, সম্প্রীতি ও সম্ভাব চিহ্নদিন ছিল। হিন্দু পরিবারে জ্যেষ্ঠের দায়িত্ব ও কর্তব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। পারিবারিক গৌরব ও প্রতিষ্ঠার বৃদ্ধি করা, পারিবারিক সুখ ও স্বচ্ছন্দতার বিস্তার করা, সংসারকে সুশৃঙ্খলার ও সুনিয়ন্ত্রণে আবদ্ধ করা, অমুজদের সংরক্ষণ ও সংকর্ষণে নিয়োজিত করা এবং সংসারের সমস্ত রোগ, শোক, ভূখ অত্যাচার এবং অভিযোগের প্রবল কণা বনস্পতির দ্বারা অচল ও অটলভাবে শিবে বহন করা, হীরানন্দের অগ্রজ-শ্রেষ্ঠ এই সমস্ত সদগুরুই সুশোভিত ছিলেন। ধর্মপিপাসু নভলরায় কর্ণজীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, ধর্মের মহান আদর্শের জন্য উন্মত্ত হইলেন। গুরু নানকের প্রবর্তিত ধর্মপথ তাঁহার মনঃপূত হইল না, পারিবারিক ধর্মবিশ্বাসে তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলেন না। আরও কিছু উদার, আরও কিছু সুশৃঙ্খলিত পথের জন্য তিনি পাগল হইলেন। বাঁহারা পথের পাগল, বিধাতা তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া দেন। নভলরায়ের সেই সৌভাগ্য হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মগ্রন্থের অলৌকিক আখ্যায়িকা শুনিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন, যিনি অনিত্যতাকে ওজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্মের উদার পন্থা, মহান আদর্শ ও আনন্দের বাণী দেশ বিদেশে প্রচার করিয়া, সহস্র সহস্র

ধর্মপিপাসু ও শোকসন্তপ্ত নয়নারীর প্রাণে শান্তিবারি সিকন করিয়া নবজীবন দান করিতেছেন। পথের পাগল পথ খুঁজিয়া পাইলেন। নভলরায় সুদূর সিদ্ধদেশ হইতে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিয়া, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শ্রীচরণে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া, চরম তপ্তি, শীতল সাত্বনা ও আনন্দময় জীবন লাভ করিয়া, তিনি সিদ্ধদেশে ফিরিয়া গেলেন। প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ব্রাহ্মধর্মের আচার ও অনুষ্ঠান, ধ্যান ও ধারণা, উদার ও উজ্জ্বল পথ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা তারানাথ পরিশেষে তাঁহার পথের পথিক হইলেন। যে ধর্মের লক্ষ্য সাম্য ও সামঞ্জস্য, যে ধর্মের পথ উদার ও উন্মুক্ত, যে ধর্মের মস্ত একমেবা-বিতীয়ম্, সেই ধর্মের ধর্মগ্রন্থের নিকট ব্রাহ্মণ কি শূত্রের, ধনী কি নিধনের, পাপী কি পুণ্যাত্মার কোনও ভেদাভেদ নাই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন এবং সেই একই ঈশ্বরের সন্তানসন্ততিগণ বিশ্ব ছড়াইয়া বহিয়াছে। বিশ্ব-রূপী বিধাতাকে নিজ কল্পনাবলে মূর্তিদান করা অসম্ভব এই ভাবিয়া, তাঁহারা পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দেন নাট, অথবা কোনও বিশিষ্ট সমাজ যে ঈশ্বরের অতি প্রিয়, সমস্ত ধর্মগ্রন্থের কাণ্ডারী এবং সমস্ত ঐশ্বরিক ঐশ্বরের ভাণ্ডারী, এই সংকীর্ণতা তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। বাঙালাদেশে ব্রাহ্মণদের জায় সিদ্ধদেশে বাওরাগণের প্রাধান্য হৃদমণীয় ছিল। চরিত্র-নির্কর্ষণে বাওরাগণের চরণ পূজা করিলে স্বর্গলোক পাওয়া যায়, এই অন্ধ বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিতে নভলরায় ও তাঁহার ভ্রাতা কোনও প্রস্তত হন না। সামাজিক সংকীর্ণতার কঠিন নিগড় ভাজিতে তাঁহারা দৃঢ়পণ করিলেন। পুণ্যবান্ পিতার প্রতি তাঁহাদের অটল শ্রদ্ধা ও অটুট ভক্তি চিরদিনই ছিল। স্নেহপ্রবণ পিতাও পুত্রগত-প্রাণ ছিলেন। প্রাচীন পিতা পুত্রদ্বয়ের এই নবীন ধর্মবিশ্বাসের অন্তরায় হন না। নিজের সমাজের উপর তাঁহার অধিক আধিপত্য ছিল, সেইজন্য তাঁহার নবধর্মাবগমী পুত্রদ্বয়কে সামাজিক নির্ধাতন ও নিষ্পেষণ ভোগ করিতে কিংবা সমাজ হইতে বিতাড়িত হইতে হয় নাই। ব্রাহ্মধর্মের প্রথম প্রবর্তকের জায় সিদ্ধদেশের প্রথম ভক্তের নিগৃহীত ও নিপীড়িত জীবন ভোগ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

ক্রীড়াকৌতুক ও হাস্য কোলাহলে গৃহখানি মুখরিত করিয়া হীরানন্দের বালাজীবন কাটিয়া গেল। দশ বৎসর বয়সে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্র্যাক্টিসিং ক্লাসে ভর্তি হইলেন। বয়ো-বৃদ্ধির সহিত তাঁহার বিদ্যালিপ্সা ও চরিত্রসংগঠনের প্রবল ইচ্ছা বলবতী হইল। হীরানন্দ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগত ছিলেন। নভলরায়ের নবীন চিন্তার ধারা সুকুমার বালাকের জন্মের প্রাণিত করিয়া দিয়াছিল। অগ্রজের সহিত প্রতি সন্ধ্যায় ব্রাহ্মধর্মের বাতায়নের কলে ব্রাহ্মধর্মের উদার ও উন্মুক্তবানী তাঁহার জন্মধর্মের প্রতিকলিত হইয়াছিল।

প্র্যাক্টিসিং স্কুলের ছই বৎসরের পাঠ সমাপন করিয়া, পরীক্ষার

অতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হওয়ার পর, পুরস্কারস্বরূপ বিনা বেতনে তিনি ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হইলেন। পর বৎসর হীরানন্দ অতি বিচক্ষণ এবং যশসী প্রধান শিক্ষক কেশবরায় বাপুজির তত্ত্বাবধানে হাইদ্রাবাদে গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে চতুর্থশ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। কেশবরায়ের শ্যালক পুরুষোত্তম তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পুরুষোত্তম হীরানন্দের জ্ঞান অতি মত ছিলেন, 'সেইকাল উভয়েই উভয়ের চরিত্রে যুগ্ম হইয়া, অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বের ডোরে বন্ধ হইয়া, পরোপকার ও সেবাব্রতে ব্রতী হইলেন।

হীরানন্দের পিতা গোবীন্দ্রাম নন্দীরাম বালাবিবাহের পক্ষ-পাতী ছিলেন না; কিন্তু হীরানন্দের পিতামহ দেওয়ান নন্দীরাম সেকালের লোক, পুরাতনের জীব সংস্কার ও আচার পদ্ধতি লইয়াই জীবনসঙ্গী। অতি আনন্দেই কাটাইতেন। তাঁহার ক্রীড়াকৌতুক ও হাস্যরসের সম্মুখিত অতি আদরের পৌত্র হীরানন্দের পাশে একটা মধুমতী সঙ্গিনী না দেখিয়া, তিনি জীবনের পরপারে যাত্রা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। গৃহের জীলোক-দেরও এ বিষয়ের অরুরোধ তাঁহাকে আরও উৎসাহিত করিয়া ছিল। উপরন্তু হীরানন্দের একটা ভগ্নিও বিবাহযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশের নায় সিদ্ধেশ্বরও কস্তাধ বিবাহ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সেইকাল হীরানন্দের বিবাহের যৌতুকাদি হীরানন্দের ভগ্নির বিবাহে ব্যয়িত হইল। বিনা ব্যয়ে তাঁহার পৌত্রীয় বিবাহ হইয়া গেল, অথচ তাঁহার আশাও পূর্ণ হইল। দ্বাদশ বর্ষীয় হীরানন্দের পাশে বালিকা বধূটিকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিংহ (এ্যাডভোকেট, পাটনা)।

## স্নেহময়ী মাতৃদেবীর চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য।

আজ কতদিন কেটে গেল, আমাদের স্নেহময়ী জননী আমাদের ছেড়ে এ পৃথিবী থেকে স্বর্গধামে স্বর্গের জননীর কোলে চলে গেছেন। কতদিন হয়ে গেল, স্নানমাথা মা নাম বলে মাকে ডাকি নাই। মা আমাদের যে কত ভাল ছিলেন, তাঁর গুণের কথা ভাবার প্রকাশ করা যায় না, কথায় বলে শেষ করা যায় না। মার কি অকুরন্ত অমিয়মাথা স্নেহ ভালবাসা আদর বন্ধ পেয়েছিলাম, এ জীবনে তাহা কখনও ভুলিবার নহে। মা আমাদের সংসারের শত অভাব অনাটনের মধ্যেও, কেমন আদর বন্ধের সহিত স্নানর ভাবে ছেলেমেয়েদের ভাল করে মানুষ করেছিলেন। কোনও দিন কোনও কষ্ট, কোনও অভাব বুদ্ধিতে দেন নাই। চিরদিন মেহের অঞ্চলে ঢাকিয়া নিরাপদে রক্ষা করিয়াছেন। কত স্নানর ধর্মশিক্ষা দিয়া ও নানাপ্রকার

নীতি ভক্তির উপদেশদানে সন্তানদের ক্ষুদ্র জীবনগুলি পবিত্র ফুলের মত কুটিয়ে তুলিতে প্রাণপণ চেষ্টা যত্ন করিয়াছেন। আমাদের স্নেহময়ী মার জীবনখানি কত পবিত্র স্নানর স্নেহময় ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। নববিধানাচার্য্য ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মানন্দের খুব নিকট সম্পর্কের ভগিনী ছিলেন আমাদের মা। আমাদের মাকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন ও আপন সহোদরা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। মাও তাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত পরম সমাদরে কেশবদাদা বলিয়া ডাকিতেন। শুনিতে আমাদের বড় ভাল লাগিত। মার মুখে তাঁর বড় আদরের পরম শ্রদ্ধাষ্পদ কেশবদাদার গল্প শুনিতে ছোটবেলা থেকে আমাদের বড় আনন্দ হইত। আমাদের বাবা মা চিরদিন তাঁর উচ্চ পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অতিশয় ভক্তিপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ আমাদের মাতামহ ও মাতুলগণের একান্ত অরুরোধে পড়িয়া, স্পাত্ত পাওয়াতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হিন্দুমতে দিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। সেইকাল বাবা মা বিশেষ দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং মা কিছুদিন তাঁহাদের কাছে মনের দুঃখে ও লজ্জায় যাইতে পারেন নাই। কিন্তু মা বলেছিলেন, কিছুদিন পরে মার আদরের পরম স্নেহময় কেশবদাদা একখানি স্নানর সাড়ী কিনে একখানা নানারকম স্নানর খাবার দিয়া তত্ত্ব পাঠাইয়াছিলেন। মার এই কথা বলিতে বলিতে চক্ষে জল আসিত। কি আশ্চর্য্য ক্রমা, সহিষ্ণুতা, কি অপূর্ণ স্নেহ ভালবাসা, সেই গৌর নিতাইয়ের ছোট ভাই দেখিয়ে গেছেন! এ প্রাণ থাকিতে তা কি ভুলিতে পারা যায়? সেই প্রেমের আদর্শ, স্নেহের অবতার ভক্তের জয় হইল। তাঁর নুতন ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠিত হইল, এই ভক্তের ভক্ত দীন পরিবারের মধ্যে। পরে তাঁদের সমস্ত কার্য্য অগ্রগুণাদি পবিত্র ব্রাহ্মধর্মের নবসংহিতামতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আর বাহাদের তখন হিন্দুমতে বিবাহ হইয়াছিল, তাহারাও অচিরে চিরপ্রিয় পবিত্র স্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সেই বাল্যকাল হইতে যে অপূর্ণ পিতৃস্নেহের দৃষ্টান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কথা সাদরে তাঁহার শৈশবসঙ্গিনী সহপাঠিনী আমাদের দিদিকে নিজেদের গাড়ী করিয়া প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যেতেন, পরে রাজরাজেশ্বরী মহারাজী হয়েও সেই বাল্যসঙ্গিনীকে আপন বোনের মত সারাজীবন শেষদিন পর্য্যন্ত স্নেহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও কখনও ভুলিবার নহে।

মার অপূর্ণ ভগবদ্ভক্তি, অটল ধর্মবিশ্বাস এবং অসীম ধৈর্য্য সহিষ্ণুতার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই সংসার-সংগ্রামে কত ভীষণ বড় তুফান বিপদ পরীক্ষা মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহা কি অসীম ধৈর্য্য বিশ্বাসের সহিত মাথা পাতিয়া বহন করিয়াছেন! কত বড় বড় বজ্রাবাত আনিয়া বক্ষকে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, তিনি অপূর্ণ ভক্তি বিশ্বাসের সহিত সেই সব প্রাণ প্রিয়জনদের বিরহ-শোক-বজ্রপাত বুক পাতিয়া সহ্য

করিয়া গিয়াছেন। তাই বলি, মা, আজ তুমি সেই অমৃতময় অক্ষয় স্বর্গধাম থেকে তোমার এই অধম অযোগ্য অমুণ্ডবৃত্ত সন্তানের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তোমার সেই স্বর্গীয় অসীম ভগবৎপ্রেম ও ঐশ্বর্য বিশ্বাসের এককণা দান করিয়া আশীর্বাদ কর, যেন বিশ্বাসের বলে এই চুঃখময় জীবন-সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে ভবসিন্ধুপারে চলে যেতে পারি।

শ্রীসরলা দাস।

## চরন।

( স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের "Heart Beats" হইতে গিরিদয় শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখার্জি কর্তৃক অনুবাদিত )

*Prophets*—তোমার এবং মহাপুরুষদের মধ্যে প্রভেদ কি? একথা সত্য নয় যে, ভগবান্ তোমার যত নিকটে, তিনি তাহা অপেক্ষা মহাপুরুষদের অধিক নিকটে ছিলেন। তাঁহার করুণা সকলের প্রতি সমান। তোমার এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তুমি তাঁর করুণার বিশ্বাস করিতে পার না, কিন্তু তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। পিতা তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন; কিন্তু তাঁহার সন্তানদের ভক্ত বথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে, তাঁর সান্নিধ্য তুমি অমুভব করিতে পারিবে না। অবিশ্বাস পাপের নিত্য সঙ্গী।

*Matter and Spirit*—জড় ও চেতন। আমি দিব্যচক্ষু দেখিতেছি যে ভগবান্ এক তন্তু জড়রাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছেন, আর এক তন্তু যাঁহারায় নরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবদ লাভ করেন, তাঁহাদিগকে অপূর্ণ গৌরবে বিমগ্নিত করিতেছেন। তাঁহাবই মূখ্যের জ্যোতিঃ বাহ্য প্রকৃতিকে এবং আধ্যাত্মিক জগৎকে সমুদ্ভূত করিতেছে।

*Love*.—সত্য ভাবে এবং সত্যরূপে পরমেশ্বরকে ও মানুষকে ভালবাসিবে; নারীকে ভালবাসিবে, কিন্তু কামনা করিবে না; ধনী ও সম্রাট ব্যক্তিদ্বিগকে ভালবাসিবে, কিন্তু তাঁহাদের নিকটে কোন প্রত্যাশা করিবে না; জীবনকে ভালবাসিবে, কিন্তু মৃত্যু শাস্তিকে মনে স্থান দিবে না। এক কথায় স্বর্গ ও লালসাকে হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়া, জগতে বাহ্য কিছু ভাল দেখিবে, সমুদয়কে ভালবাসিবে; এবং তোমার নির্মল নিঃকল্ল প্রেমদিয়া ভগবান্ ও মানুষের সেবা করিবে। তখন তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীকে জয় করিবে। নিজের স্বার্থনিষ্কির উপায় বলিয়া নয়, কিন্তু ভগবানের নামে সংসারের সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তিকে ভালবাসিবে।

*God is Life*.—পরমেশ্বরকে যখন আমার জীবন বলিয়া অমুভব করি, তখন নিজের প্রতি একটা সত্যমের উদয় হয়। তখন আমার এই শরীর ও আমার প্রতি সমাদর না করিয়া

পাকিতে পারি না। আমার জীবন আমার নচে, আমার মধ্যে দৈব শক্তি। আমার জীবনকে কলঙ্কিত করা দূরে থাক, আমার জীবনকে আমি তুচ্ছ করিতে পারি না, বা হীনদৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। ধন্য তুমি, হে পরমেশ্বর, যে তুমি আমাকে জীবন দান করিয়াছ।

## নববিধানের লোক কে?

নববিধান সর্বগ্রাসী উদার ধর্ম, স্মৃতিরাং কাহাকেও ছাড়িতে পারেন না। একজন আচাৰ্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, "কোথায় ইহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরান্দ্র বিধান, কোথায় মুসলমান বিধান, কোথায় শিখ বিধান, সমুদয়ের সঙ্গে ইনি সম্বন্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি সমুদয় ধর্ম-বিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইহার নিকটে কোন ধর্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদহ বা উপেক্ষিত হইবে না। ইহার যে অভাব, তাহা ইনি পূর্ণ করিবেন। ইহাতে সমস্ত ধর্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধান টানিতে গেলে জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকুট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি যোগ, ভক্তি, সেনা, সেবা, ককিরী, বৈরাগ্য পদ্ধতি ধর্মের সমুদয় অঙ্গকে আঁকার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান সজ্ঞন, নির্জ্ঞন, পারিবারিক, সামাজিক সকল প্রকার সাধন ভক্তনের প্রতি অমুরাগী। ইনি ধনী, নিদান, পণ্ডিত, মূর্থ, সাধু, অসাধু, অদভা, স্তম্ভা, সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবদা করেন না। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক প্রভৃতি ধর্মবিজ্ঞানের বস্তু গুঢ় সত্য আছে, সমুদয় স্বীকার করেন। নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম, ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার অথবা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন যত্ন স্থান পাইতে পারে না।....." ইত্যাদি। প্রেমদাস গাইলেন, "রচিলেন ভগবান্, উদার নববিধান, যাতে হবে জগতের পরিদ্রাণ।" ঢাকাতে আচাৰ্য্য বসুচন্দ্রের প্রার্থনা এইরূপে গ্রথিত হইল, যথা:—"নূতন বিধানে কারো সঙ্গে ছাড়া ছাড়ি নাই, ছোট বড়, নারী নর, সকলে ভগিনী ভাই। পবিত্রাত্মা গুণনিধি, করেছেন এই নববিধি, সবার দিবে শুদ্ধ প্রীতি, বাছা বাছি কিছু নাই।.....পবিত্রাত্মা হরির গুণে, যে দেশেই যে বিধানে, পাইয়াছে পরিদ্রাণ, যত পাপী চুঃখী ভাই; তাহাদের সঙ্গে মিলে, গাই হরিনাম প্রেমে গলে, পতিত মানবের হৃৎথে অশ্রুজলে স্তেপে যাই।"

দেবদানন্দ ঈশা মানবজাতির সহিত এক হইয়া তাহাদের পাপ-ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাহার প্রাপ্তিভক্ত ভক্ত আত্মোৎসর্গ করিলেন। অথচ তিনি বলিলেন, "বাহার আমার পিতার ইচ্ছা



পালন করে, তাঁহারা আমার পিতামাতা, ভ্রাতা।” আর ব্রহ্মা-  
নন্দ বলিলেন, “অভিভূতদয় পরিবার।” “গুরুরা যেমন আপনার  
গোয়ালের গরু চিনিতে পারে, তেমনি আপনার লোক চেনা  
যায়।” সুতরাং বিশ্বাসীরা চিরকাল আপনাদের অন্তরঙ্গদিগকে  
চিনিয়া থাকেন। অতএব নববিধানের লোক কে? এ প্রশ্নের  
সত্ত্বর আপন আপন অন্তরে তাঁহারা প্রাপ্ত হন। প্রবাদ আছে  
যে, “রাম না জন্মিতেই রামায়ণ রচনা হয়,” তদ্রূপ নববিধান  
ঘোষণার অনেক বৎসর পূর্বে, নববিধানের লোক কে হইবে,  
তাঁহা কলিকাতা মহানগরীর রাজপথে গীত হয়। যথা :—  
“জীবনের মহাযোগ কর রে সাধন, বিশ্বাসনয়নে ব্রহ্ম কর দর্শন ;  
জীবে দয়া, নামে ভক্তি কর এই সার, ওরে মন আমার, সে  
ত্রিগুণে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার। পিতার মধুরবাণী, শুনি  
শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে কাম মন প্রাণে।” এই ত  
নববিধানের লোকের সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞানুসারে মহাত্মা গান্ধী  
যে নববিধানের লোক, এ কথা কে অস্বীকার করিতে সাহসী  
হইতে পারে? মহাত্মাজি নববিধানের নাম করেন না, ব্রহ্মা-  
নন্দ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে কোন কথা বলেন নাই ;  
অথচ তিনি সর্বসাক্ষী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন, তাঁহার  
আদেশ গুলিয়া কার্য্য করিতে যত্ন করেন, হরিনন্দনিগের অস্পৃ-  
শ্যতা দূর করিবার জন্য আপনার প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প হইয়া-  
ছেন। এই মহাত্মার ছায় এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমে-  
রিকা ও পৃথিবীর অন্তর আরও যে কত কত মহাত্মা আছেন,  
তাঁহা, পাঠক, তুমি আমি জানি না। আমরা জানি না বলিয়া কি  
পৃথিবী ঈশ্বরবিশ্বাসিশূন্য হইয়াছে? না, তাঁহা কখনই নহে ;  
ঈশ্বর বলিতেছেন, “বিশ্বাসী বিহনে ভবে, কে আছে আমার ?  
বিশ্বাসী রেখেছে নাম ভগতে আমার।” “আমরা নববিধানের  
গোঁড়া হইব” সত্য, অগচ নববিধানের লোক আমাদের অজ্ঞাত-  
সায়ে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়  
मध्ये থাকিতে পারে ও আছে, ইহাও স্বীকার করিব। নববিধানের  
শাস্ত্র বলেন, “ঈশ্বর ব্যক্তি বিশেষের মূখ্যোপেক্ষা করেন না ; কিন্তু  
জাতি দ্বারেরই মধ্যে যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ভয় করে এবং  
ধর্ম্মকার্য্য করে, তিনি তাহাকে গ্রহণ করেন।” নববিধানের  
লোকের একটি বিশেষত্ব এই যে, তিনি নিত্য প্রার্থনামূলক। এই  
প্রার্থনা প্রেমদান এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা :—“দেহি  
নাথ, অনাসক্তি, নব ভাব নব ভক্তি, জপ তপ নিষ্ঠা ভক্তি, জীবে  
দয়া নামে রতি, ধর্ম্মজীবনের অরপান ; হৃদে হৃদে করি যেন  
তব জয় গান। দেহি দেব শুদ্ধ বুদ্ধি, বিবেক, সন্তোষ, শুদ্ধি, নিত্য  
শান্তি দাস্যভূক্তি, পরমার্থ পরাগতি, শব্দ, দন্দ, নিরতি নির্দাণ ;  
ভক্তি তরে, বারে বারে, করি ও পদে প্রণাম।” নববিধান  
কাহারও এবং কোন দেশ বা জাতির একচেটিয়া সম্পত্তি  
নহে। যিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা শ্রবণ করেন এবং পালন করেন,  
তিনিই নববিধানের লোক। অতএব নববিধান সম্বন্ধে “বদি

কেহ কথা বলে, তবে সে ঈশ্বরবাণীপূর্ণ প্রবক্তার দায় কথা  
বলুক।”

আলোচনা—২২।

( দেব-উক্তি )

“বিশ্বাসী বিহনে ভবে কে আছে আমার।

বিশ্বাসী রেখেছে নাম ভগতে আমার।

পেলে আমাতে বিশ্বাসী, আমি তার হৃদয়ে বসি, ( করি )  
ভগতের উদ্ধার তরে, বিধান বিস্তার।

আমি রে তার অঙ্গুল, আমি প্রেম পূর্ণা বল ; আনন্দ ভিন্ন  
দেখে সব শূন্য অন্ধকার।

বিশ্বাসী তনয় যখন, করে আমার বিধি পূরণ, রক্তপাত করে  
আহা, পৃথিবী তাহার।

বিশ্বাসীয়ে বলিচারি, আমার সর্বস্বের অধিকারী, সংসারে কি  
স্বর্গরাজ্যে পূর্ণ অধিকার। ( তার )

আমার খেয়ে আমার পরে, থেকে আমার বৃকের ভিতরে,  
অবিশ্বাস করে আমার পামণ্ড সংসার।”

শ্রীমদ্বিমচন্দ্র সেন।

—০—

## সংবাদ ।

জন্মদিন—গত ২৫শে এপ্রিল, অপরাহ্ন ৫টার সময়, ময়ূহ-  
ভক্ত-রাজপাসাদে রাজবাগে নন্দগাঁ মহারাজা ও মহারানী জয়তি  
দেবীর একটি রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে  
মহারানী সুভাষা দেবীর সহযোগে ভাই প্রিয়নাথ শিত্তর ভ্রাতৃ  
মাতার প্রকোষ্ঠে বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ শিত্তকে ও  
পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

নামকরণ ও বিদ্যারম্ভ—সর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর  
পৌত্র শ্রীমান্ অমরনাথ ভট্টাচার্য্যের পঞ্চম সন্তানের ( কন্যা )  
নামকরণ ও বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান শিত্তর চারি বৎসর বয়সে,  
গত ২২শে এপ্রিল, শনিবার, ২৬নং বিডন স্ট্রীটস্থ বাটিতে সম্পন্ন  
হইয়াছে। কন্যার নাম “অপর্ণা” রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত  
সত্যীশচন্দ্র চক্রবর্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে  
নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ৫ টাকা দান করা হইয়াছে।  
ভগবান্ শিত্তকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১৮ই বৈশাখ, ১লা মে, সোমবার,  
প্রাত্যহ্নে ভাই হর্গনাথ রায়ের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীর শ্রীমান্  
সুখান্তনাথের সহিত, শ্রীযুক্ত প্রভাতরঞ্জন বোষের বিত্তীয়া কন্যা  
কল্যাণীয়া শ্রীমতী মায়ার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত  
সত্যীশচন্দ্র চক্রবর্তী আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত  
মিলনানন্দ রায় ভ্রাতার শুভবিবাহে প্রচারভাণ্ডারে ২ টাকা দান  
করিয়াছেন।

গত ১১ই মে, ২৩নং বাহুবল্লভান রোডে, বঙ্গবন্ধু প্রেরিত  
ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত বোগেশচন্দ্র রায়ের কনিকা



কতা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ললিতাকার সহিত, গিরিধি-প্রবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীয়া শ্রীমান্ সুখাংকুমারের শুভবিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লখ আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ভগবান্ নবদম্পতিগণকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করুন।

সেবা—কোচবিচারে উৎসব-সামান্যে কলিকাতা আসিয়া, গত ২৩শে এপ্রিল, প্রাতে মঙ্গলপাড়াস্থ ভগ্নিরিগকে লইয়া ভাই প্রিয়নাথ নবদেবালয়ে প্রাতঃকালীন উপাসনা করেন। এইদিন সন্ধ্যায় ব্রহ্মানন্দাশ্রমে সাং সামাজিক উপাসনা হয়। ২৬শে শ্রীমতী সোদামিনী দেবীর সাংসারিক দিন স্মরণে এবং ২৭শে শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃতলাল বসুর সাংসারিক দিন স্মরণে শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমেই বিশেষ উপাসনা হয় এবং ২৮শে প্রাতে কটকে ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওয়ের বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা করেন। সে স্থান হইতে পুরীতে গিয়া ভাই প্রিয়নাথ সন্ন্যাসী নবশ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন।

পরলোকগমন—আমরা গভীর হঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, গত ৪ঠা মে, প্রত্যাষ, ভাগলপুরে, ভক্ত হরিশুন্দর বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু ৭৫ বৎসর বয়সে, করাতর্জনে দেহ পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গধামে অমর জননীর নিত্য শান্তিক্রোড়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। বিধানজননী তাঁহার আত্মাকে স্বর্গধামে দেবদেবীর দলে স্থান দান করুন এবং শোকার্ভ পুত্র, কন্যা, আত্মীয় সজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সাধনা বিধান করুন।

গুডফ্রাইডে—গত ১৪ই এপ্রিল, প্রাতে, শান্তিকুটীরে, ৮৪নং অপার সাকুলার রোডে, গুডফ্রাইডে উপলক্ষে, ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। এই দিনে রাঁচি নামক্কে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও, নববর্ষ ও খ্রীষ্টশার মহা-ক্রম উপলক্ষে উপাসনাদি হইয়াছিল।

সাংসারিক—গত ২৬শে এপ্রিল, ৮৪নং অপারসাকুলার রোডে, শান্তিকুটীরে, স্বর্গগত প্রেরিত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া সোদামিনী দেবীর সাংসারিক উপলক্ষে প্রাতে পেন্সিওন্স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন; সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মণিকলাল দেব নেতৃত্বে জমাট কীর্তন হয়।

গত ২৭শে এপ্রিল, ৫০১২ রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গগত ভাই অমৃতলাল বসুর সাংসারিকে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

গত ২৭শে এপ্রিল, ১৫১১বি প্রিয়নাথ মল্লিক ঘোড়ে, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের গৃহে, তাঁহাদের পিতৃদেব স্বর্গীয় রায় বাগুহর ডাঃ নবীনচন্দ্র দত্তের সাংসারিকে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন; শৈলেন্দ্রবাবু এবং শ্রীমতী কুমুদিনী দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৪৮ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ৩০শে এপ্রিল, ৬১২ একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের সহধর্মিণী সাংসারিক দিনে, পুত্রদের গৃহে, শ্রীযুক্ত বেণীমাধবদাস উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্র, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত প্রচারভাণ্ডারে ২৮ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৫ই মে, ৮৩১ অপার সাকুলার রোডে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের জামাতা, স্বর্গীয় কিশোরীমোহন দাস বড়ুয়ার সাংসারিক দিনে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৮ টাকা দান করা হইয়াছে।

উৎসব—হাজারিবাগ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে, গত ১৩ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী উৎসবের উদ্বোধনসূচক উপাসনা করেন। ১৪ই এপ্রিল, “গুডফ্রাইডের” দিন প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে অধ্যাপক খজাংসিংহ ঘোষ সন্ধ্যায় উপাসনা করেন এবং খ্রীষ্টশার জীবনের গুণতত্ত্ব উপদেশে বিবৃত করেন। সন্ধ্যায় কেশবমোহোরিয়েল হলে, সঙ্গীতান্ত্রে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী পার্থনা করিলে, অধ্যাপক খজাংসিংহ ঘোষ এদেশের ওদেশের দার্শনিক তত্ত্বের ভিতর দিয়া, খ্রীষ্টশার সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ কত নিগূঢ়, তাহা তাঁহার ভূয়ঃদর্শনপূর্ণ পাণ্ডিত্যের সহিত ব্যক্ত করেন। ১৫ই এপ্রিল, শনিবার, প্রাতে, ব্রহ্মমন্দিরে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। শ্রী ভগবান্ তাঁহার খ্রীষ্টা প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত দিনে রূপের ডাকতির মত, আমাদের সর্বস্ব হরণ করিয়া, দীনাত্মা করিয়া যে আমাদের গিকে তাঁহার আপনাব এবং ভক্তদের আপনাব করে নিচ্ছেন, এই ভাব নিবেদন ব্যক্ত হয়। সন্ধ্যায় অধ্যাপক খজাংসিংহ ঘোষের গৃহে পারিবারিক উৎসব হয়। ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। উপাসনান্তে প্রীতিভোজনে সকলে পরিহৃত হন। ১৬ই এপ্রিল, রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে উপাসনার পূর্বে, মন্দিরের সমুখস্থ প্রাঙ্গণে, নালুদার পবিত্র সমাধি-প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। “চল চল ভাই মার কাছে বাই” এই সঙ্গীতান্ত্রে ভাই অক্ষয়কুমার লখ প্রার্থনা করিয়া সমাধির পরিদর্শন করেন। তিনি প্রার্থনায় বলেন, “নিত্যোৎসবময় নালুদার জীবনের সঙ্গে হাজারিবাগ নববিধানমণ্ডলীর বিশেষ যোগ, তাহার প্রমাণ স্বরূপ এখানে এই গুণ্য সমাধি-প্রতিষ্ঠা। সাধুর এই গুণ্যস্মৃতি-যোগে হাজারিবাগ মণ্ডলীর নিকট পরমতীর্থ। নববিধানের এই স্মরণ সাধুজীবনের অমরত্বের আকর্ষণে একদিন হাজারিবাগের আপামর আকৃষ্ট হইবে, এই জন্তই বিধাতার এই অপূর্ণ কোশল। সশরীরে নালুদা কতবার সকলকে ডেকে নিয়ে এসে এখানে উৎসব করেছেন, এখন অশরীরী ভাবে স্বর্গ মর্ত্য নিয়ে এখানে উৎসব করছেন। আমরা তাঁহারই সঙ্গে, সকল ভক্তদের সঙ্গে মিলে উৎসব করি; তা হলেই আমাদের উৎসব করা সার্থক হবে।” নালুদার আত্মার সঙ্গে এইরূপ ভাব-যোগে যুক্ত হইয়া ভাই অক্ষয়কুমার লখ এই বেলায় উপাসনার কাণ্ড করেন। মধ্যাহ্নে “চকলাকুটীরে” পরমতৃপ্তির সহিত প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিয়োগী উপাসনা করেন। তিনি উপদেশে, ব্রহ্মমন্দিরের প্রতি “মণ্ডলীর কর্তব্য ও দায়িত্ব” বিষয়ে প্রাণের আকুল আবেদন জ্ঞাপন করেন। তাগুলাপুরের শ্রীমতী কৈন্যবতী চট্টোপাধ্যায় উপাসনানিতে ভাবোপযোগী সুমিষ্ট সঙ্গীত করিয়া, এবার উৎসবের সফলতা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbon New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেবে,”

খ্রীপরিভাষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।

চেতঃসুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনন্দরম্।

বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি শ্রীতিঃ পরমসাধনম্।

স্বার্থনাশকং বৈরাগ্যং ব্রাহ্মকীর্তনং প্রকীর্ত্যতে।

ভাগ।

১১শ সংখ্যা।

১লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

15th June, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## প্রার্থনা :

জগতের হিতের জন্য, সর্বজাতীন উন্নতি ও সদগতির জন্য, হে চিরকর্ত্ত দেবতা! তুমি যেমন চির বাস্তব, তেমনি আমরাও আমাদের পার্থিব ও অপার্থিব কোন বিষয়ে উদাসীন, অলস ও কর্মবিহীন হইয়া থাকি, ইহা তুমি ইচ্ছা করনা। “এক দণ্ড দেয় না বসিতে, নাকে দড়ি দিয়ে টানে মারে পিঠেতে।” এই বাক্য যে তোমার নবধর্মবিধানে নববেদের বিশেষ অঙ্গ। তুমি আমাদেরকে সকল প্রকার উচ্চ কর্ত্তব্যে নিত্য কর্ত্ত করিয়া রাখিতে চাও। তোমার নববিধানের ধর্ম পার্থিব ও অপার্থিব সকল প্রকার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ত্তকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। এখন আর তো “ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা”, এই বাক্যকে আমরা বেদবাক্য, শাস্ত্রবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তোমার স্মরণ, মনন, পূজা, বন্দনা, ধ্যান, ধারণা যোগে আমাদের আত্মিক কল্যাণ-সাধন যেমন আমাদের পক্ষে নিত্য কর্ত্তব্য কর্ম, তেমনি যতদিন পৃথিবীতে আছি, জনসমাজে, আছি, লোকমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেছি, ততদিন তো আমাদের শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, জাগতিক সকল প্রকার কর্ত্তব্যের ক্ষমতা তুমি আমাদেরকে দায়ী করিতেছ।

নিত্য উপাসনা বন্দনারূপ আধ্যাত্মিক ব্যাপারও তুমি আমাদেরকে স্বার্থপর হইয়া স্তম্ভ নিজের পরিব্রাজনের জন্য সম্পাদন করিতে দেও না। আমি যতই ক্ষুদ্র হই না কেন, তোমার উপাসনা বন্দনা যেমন আমার নিজের কল্যাণের জন্য, তেমনি তাহা জগতের কল্যাণের জন্য, ইহা তোমারই ইচ্ছিত, তোমারই শিক্ষা। আমাদের পার্থিব কার্যগুলি, পার্থিব কর্ত্তব্যগুলি যদি নিজের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইতে গিয়া পরার্থকে আঘাত করে, তবে তো আমার মধ্যেই স্ববিরোধিতা উপস্থিত হইল। স্বার্থ ও পরার্থ, পরার্থ ও স্বার্থ যদি মিলিয়া মিশিয়া সকল বিষয়ে এক হইয়া যায়, তবেই দেখি, জীবনের উচ্চ তৃপ্তি ও শ্রেষ্ঠ সদগতি। তাই কাতরপ্রাণে তব চরণে প্রার্থনা, আমরা যেমন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে স্বার্থপর হইব না, তেমনি পার্থিব ব্যাপারেও যাহাতে সকল কার্যব্যস্ততার মধ্যে, আমাদের নিজের ব্যক্তিগত, কি পরিবারগত সীমাবদ্ধ স্বার্থসিদ্ধির কোন কার্য দ্বারা পরার্থকে কোনরূপে আঘাত না করি; বরং আমাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল স্বার্থসিদ্ধিই যেন গুঢ় ভাবে পরার্থসাধনে, পরার্থহিতে পরিণত হয়, এবং সকল পরসেবা পরার্থসাধনও যেন আমাদের ব্যক্তিগত ও পরিবারগত মঙ্গল-সাধনেই পরিণত হইতেছে দেখিয়া

জীবনে শান্তি ও আনন্দ  
আমাদের সহায় হও।

শান্তি: ! শান্তি: ! শান্তি: !

## ধর্মপিতামহ রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী।

মহাত্মা রামমোহন যেমন জাতিবর্ণ ও ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে মিলিত ভাবে ত্র্যক্ষোপাসনা সম্পন্ন করিবার জন্য সার্বভৌমিক ধর্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন, তিনি যেমন এ দেশের সর্বস্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে নব যুগের নব শিক্ষা-বিস্তারের পথ খুলিয়া দিলেন, দেশের সর্বস্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনে আত্মজীবন নিয়োগ করিলেন, তিনি যেমন ধর্মনীতিক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের এবং দেশের সর্বপ্রকার উচ্চ সংস্কারব্যাপারে আপনার স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা, স্বাধীন কার্য দ্বারা জীবনের মহান আদর্শ সকলের জন্য রাখিয়া গেলেন, তেমনি আজ জাতি, বর্ণ, ধর্মসম্প্রদায়নির্বিশেষে দেশের সর্বশ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া, তাঁহার স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক উৎসব যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন, আপনার দেশের মহাপুরুষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিবেন, ইহা অতি স্বাভাবিক ও প্রকৃত সত্যতাই লক্ষণ। আমরা যদি এই মহাপুরুষের মহাজীবনের সর্বপ্রকার মহৎ কার্যের গুরুত্ব প্রাণে ধারণ করিয়া উদ্বুদ্ধ না হই, তাহা হইলে আমরা প্রাণের ঐকান্তিক আগ্রহ, হৃদয়ের উচ্চ ভক্তি, অনুরাগ ও শ্রদ্ধা সেই মহাপুরুষের চরণে অর্পণ করিয়া, কি প্রকারে এই শতবার্ষিকীরূপ মহৎ অমুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারিব ?

তাঁহার জীবনের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম কার্য এবং জীবনব্যাপী প্রচেষ্টা ও সাধনার শেষ ফল সার্বভৌমিক ভিত্তিতে এক অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের পূজা-প্রতিষ্ঠা এবং সেই সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর ব্রাহ্মসমাজ বা নব ধর্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। আমরা দেখিতে পাই, তিনি নবযুগের মহাসংগ্রাম-সংগঠন-ভাব-মূলক মহাধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, যে নবসমগ্রধর্মের বীজ বপন করিয়া গেলেন, পরবর্ত্তী সময়ে সে ধর্মবীজ ক্রমে কি মহা-ধর্মরূপে পরিণত হইয়াছে এবং এখনও সে ধর্মরূপ

কেমন অনন্তবর্দ্ধনশীলতার সাক্ষ্য দান করিয়া ধীরে ধীরে আপনার নিয়তিনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহা আমাদের এখন প্রতি জীবনেই দিব্য উপলব্ধির ব্যাপার এবং আমরা এখন প্রতি জীবনে তাহার দিব্য সাক্ষ্যও লাভ করিতেছি।

এই মহামানবের জীবন একটা পূর্ণতার দিক্, একটা পূর্ণতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গেলেন। শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা লইয়া মানবজীবন। অনেক সাধু মহাপুরুষ শরীর ও সংসারকে উপেক্ষা করিয়া, হৃদয়, মন ও আত্মার উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন। রামমোহন রায় শরীর, মন, আত্মার কোনটাকেই উপেক্ষা করেন নাই; ইহকাল ও পরকাল এই উভয় লোক লইয়া জীবনের সর্বস্বাঙ্গীন কর্তব্যের উচ্চ আদর্শ তিনি জীবনে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শরীরের সম্পর্কে বলিতে গেলে, পারীক্ষিক স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি ছিল; তাঁহার মত বলিষ্ঠ দেহ সেই সময়ে বঙ্গভারতে কয়জনের ছিল ? তিনি জানিতেন, দেহে প্রভূত বল না থাকিলে, পৃথিবীর উচ্চ কর্তব্য সম্পন্ন হইতে পারেনা। তিনি অতি বড় মনোবী ব্যক্তি ছিলেন; পৃথিবীর প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্রগুলি কৃতিত্বের সহিত পাঠ ও আলোচনা করিয়া, তাহা হইতে প্রকৃত সত্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। তুলনা-মূলক ধর্মশাস্ত্রের চর্চা ও আলোচনার অবর্ত্তন তাঁহার জীবনের একটা প্রধান কীর্তি। তাঁহার হৃদয় কত প্রশস্ত ছিল, কোমল ছিল, সহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আমরা পাই, সতীদাহনিবারণকার্যে, দেশের মঙ্গলসূচক নানা-বিধ সদানুষ্ঠানে, সংস্কারকার্যে ও নবপ্রণালীতে ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে, বিশ্বব্যাপী সকল জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে স্বাভাবিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা-দর্শনে।

তাঁহার আত্মা সত্যধর্মের অন্বেষণ, সত্যধর্মের নির্ধারণ ও সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কি ব্যাকুলই ছিল, কি চেষ্টা-শীলই ছিল ! ষোড়শবর্ষ বয়সে ধর্মের অন্বেষণে বাহির হওয়া, দেশপর্যটন, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ধর্মশাস্ত্র-গুলি পাঠ, আলোচনা, সাধনা ও ধর্মের উচ্চ সিদ্ধান্তে সিদ্ধিলাভ তাঁহার আত্মার বিশালতার সাক্ষ্য দান করে। পার্থিব ও অপার্থিব সকল ব্যাপারে, মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য স্বাধীন ভাবে, মুক্ত জীবনে কিরূপে সম্পন্ন করিতে হয়, তিনি তাহা জীবনে আচরণে দেখাইয়া গিয়াছেন এবং

নবযুগপ্রবর্তনার আদি ব্যক্তিরূপে তিনি তাহার বিশিষ্ট আদর্শ হইয়া রহিয়াছেন। সংক্ষেপে এইভাবে তাঁহার জীবনের পূর্ণতার আদর্শের দিক্ আমরা আলোচনা করিলাম। ধর্ম্মপিতামহ রামমোহন রায় সম্পর্কে ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, আমরা আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করি।

“তাঁহাকে স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে আর কোন বিষয় স্থান পায় না। অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হয়, ভক্তি প্রদীপ্তে পূর্ণ হয়, শরীর রোমাঞ্চিত ও প্রেমাত্মক নিগির্ভ হয়। সেই পরমেশ্বর-পরায়ণ অসাধারণ আশ্চর্য্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিই প্রথমে এ দেশে অজ্ঞান-বন ছেদন ও জ্ঞানাকুর-রোপণের পথ প্রদর্শন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল অন্বেষণ করিলে, তিনিই এই ব্রাহ্মসমাজরূপ সুরমা বৃক্ষের মূল বীজ রূপে দৃষ্ট হইলেন। \* \* \* যাহাতে ভারতবর্ষের বিষম দুঃস্থতা দূরীকৃত হয়, বিশেষতঃ কাল্পনিক ধর্ম্ম সকল নিরাকৃত হইয়া স্থিতি-স্থিতি-ভঙ্গ-কারণ একমাত্র অদ্বিতীয় নিরবয়ব পরাংপর পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচলিত হয়, তাহাই তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ও সমস্ত কার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। জননী জন্মভূমির দুঃখ-মোচনার্থ যেরূপ যত্ন করা কর্তব্য, তাহা তিনিই জানিতেন এবং তিনিই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার যত্ন ও চেষ্টা কি কেবল এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশের উপকার মাত্রে পর্য্যাপ্ত ছিল? তাঁহার স্বভাব যেমন উদার ও অভিশ্রায় যেমন মহৎ, তাঁহার কার্য্যও সেই প্রকার অসাধারণ। বেগবান্ সিদ্ধনন্দ, তুষারমণ্ডিত হিমালয় এবং আবা ও আসামের বনাকীর্ণ পর্ব্বতও তাঁহার জন্মভূমির সীমা ছিল না। তাঁহার জন্মভূমি পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ এই চতুর্মহাসাগর দ্বারা আবদ্ধ ছিল। তিনি সমুদয় ভূমণ্ডলকে স্বকীয় দেশ, ভারতবর্ষকে গৃহস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। \* \* \* তাঁহাকে স্মরণ করিলে আমাদের নির্বীৰ্য্যমানেও বীৰ্য্য সঞ্চার হয়, আশানিল প্রবল হয়, সাহস অতি বর্দ্ধিত হয়, উৎসাহালন প্রজ্জ্বলিত হয়, শরীরের শোণিত দ্রুতবেগে সঞ্চালন করে এবং মনের ভাব ও রসনার শব্দ সকল চতুঃশৃংগ তেজ ধারণ করে। তিনি এই ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ না করিলে, কোথায় বা ব্রাহ্মসমাজ, কোথায় বা তত্ত্ববেদিনী, কোথায় বা ব্রহ্ম-বিচার আলোচনা, কোথায় বা ব্রাহ্ম, কোথায় বা ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিত? \* \* \* তিনি

আমাদিগের হিতের নিমিত্ত, স্বদেশকর্ষণী উদঘাটনপূর্ব্বক দয়া-স্রোত প্রবল করিয়া, যে অপার উপকার করিয়াছেন, যে মহাধন প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিরূপে পরিশোধ করিব? তিনি আমাদিগকে রক্তত দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই এবং হীরক বা মুক্তাকল ও প্রদান করেন নাই বটে; কিন্তু তদপেক্ষা সহস্রগুণ, কোটিগুণ, অনন্তগুণ উৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব রত্ন প্রদান করিয়া গিয়াছেন। সে রত্নের মূল্য নাই, জগতে তাহার উপমা নাই। যিনি আমাদের কল্যাণার্থ চির জীবন সমর্পণ করিয়া ছিলেন, তাঁহার ঋণ কিরূপে পরিশোধ করিব? তাঁহার উদ্দেশ্য কার্য্য অবলম্বন ও সম্পাদন করা ব্যতিরেকে এ ঋণ পরিশোধের আর উপায়ান্তর নাই।”

## ধর্ম্ম্যতত্ত্ব।

### বিচার ও ভালবাসা।

আমরা অত্কে বিচার করি, আপনাকে করি না। আপনাকে কতই কমা করি। আপনার শত দোষ সত্ত্বেও কই তাহার বিচার করি? কিন্তু অত্কে একটু ক্ষুদ্র দোষ দেখিলেই, তাহার কতই বিচার করি! সাধুভক্তগণের স্বভাব ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহারা আপনার দোষের জন্ত আপনাকে “সবসে বুঝে” সন্তোষপক্ষা মন্য মনে করেন ও অত্কে দোষ ত্রুটি দেখিলে কৃপাপাত্র ভাবিয়া, মানবীর দুর্জলতাবশতঃ দোষ করিয়াছে, এই বলিয়া কমা করেন এবং ভালবাসিয়া তাহার জন্ত প্রার্থনা করেন। আত্মবৎ অত্কে মনে করিলে, আর বিচার আসে না, ভালবাসাই আসে।

### বিচারের উপকারিতা।

কেহ যখন আমার বিচার করেন, তখন তিনি চান, আমি কেন দেবতার দ্বায় হইলাম না; সুতরাং আমার জীবনের উৎকর্ষ-বৃদ্ধির জন্তই বিচার করিতেছেন, ইহা ভাবিলে আমাদের উপকারই হয়। যিনি বিচার করিতেছেন, তিনি আমাকে ভালবাসিয়াই বিচার করিতেছেন, আমাকে আরো শুদ্ধ, আরো খাঁটি করিবার জন্তই তাহা করিতেছেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত না হইয়া, কৃতজ্ঞ হইতে কি পারি না? কোন ব্যক্তি এক সাধুর সর্ব্বদাই বিচার বা নিন্দা করিত; তাহার সন্তা-সংবাদ পাইয়া সাধু কাদিয়া বলিয়াছিলেন, “কে আমাকে তেমন করিয়া ঘোত করিবে?”

নববিধান হ'বে কবে ?

স্বার্থপর পৃথিবী চায়, আমি স্মৃথে থাকি, আর সকলে হুঃখে থাকুক । ধার্মিক চান, আমি স্মৃথে থাকি, তাইও স্মৃথে থাকুন ; আমি যদি হুঃখে থাকি, তাইও হুঃখে থাকুন । কিন্তু নববিধান চান, আমি হুঃখী হই, তাহাতে ক্ষতি নাই ; তাই বেন স্মৃথে থাকেন । এ বিধান কবে আসিবে জগতে ?

### বিধানরাজ্য ।

ভারতে ব্যবসায় করিতে আসিয়া ইংরাজ বণিকগণ এ দেশের রাজ্য লাভ করিলেন । বণিকের রাজ্যশাসন পাছে ব্যবসাদারী ব্যাপার হয়, তাই ইংলণ্ডের দারভেখরী হইয়া ইহার রাজ্য শাসন ভার বহন গ্রহণ করিলেন এবং ইহার স্বেচ্ছাসনৈব ব্যবস্থা করিলেন । ধর্মের নামেও ব্যবসাদারী যেন পাতোক ধর্ম-সম্প্রদায়েই প্রবল চটতেছে ; তাই দেখিয়াই বহন বিবেখরী পৃথিবীর ধর্মরাজ্যের স্বেচ্ছাসন ও সুপরিচালনার ভার বহন লইয়া, এই নববিধানের বিধি প্রবর্তন করিয়াছেন । প্রত্যেক রাজ-রাজেশ্বরীর শাসনাধীনে এই বিধানরাজ্য পরিচালিত । এখানে কোন প্রকার মানবীয় ব্যবসাদারী প্রশ্রয় পাইবে না ।

### খাঁটি ও ভেজাল ধর্ম ।

খাঁটি জিনিষের দাম চড়া বলিয়া, ঠিক তাহার নকল করিয়া ভেজাল বিশাল জিনিষ বাজারে খাঁটি বলিয়া বিক্রয় হয় এবং দলে দলে লোক তাহা ক্রয় করে । সে সকল জিনিষের ক্রেতা-দের নানা প্রকারে অপকার চলেও, সস্তার পার বলিয়া, কত জনেই তাহা ক্রয় করে এবং তাহাতেই ভুট্ট হইয়া থাকে । সত্য সত্যই তেমনি নববিধান যেমন আবির্ভূত হইল, অমনি ইহারই অন্তর্গত করিয়া কতই সস্তার ধর্ম বাজারে চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে । তাই নববিধানার্চ্যা সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, 'বারার সকলেই বুটে জরি, ছেঁড়া ছেঁড়া শাস্ত্র, জলো দুধ, পচা দুধ বিক্রয় করছেন । আমি ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলি, আমার সকলে আনিয়া রাখিতেছেন । এখানে কেবল খাঁটি জিনিষ বিক্রয় চাইবে । কৃত্রিম জিনিষ এখানে বিক্রয় হবে না । কোন ধর্মভাব লাট হবে না ।'

### সাধু হীরানন্দ ।

( পূর্বাহ্নবৃত্তি )

সিদ্ধেশে জীশিকার প্রচার শ্রীনভলরার ও হীরানন্দের উদ্যমেই প্রথম প্রবর্তিত হয় । তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতার স্মৃতি কোনও পৈশিত্যের কার্যে সংযোজিত করিয়া অমর করিবার আশায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হইলেন ; কিন্তু

তাহা অতি ব্যয়সাধ্য, সেইজন্য প্রথমে সেই উৎসাহ হইতে বিরত হইয়াছিলেন । পরিশেষে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার প্রিয়তম বন্ধুর পুত্র দেওয়ান চণ্ডুল, স্বীয় পিতার নাম সেই বিদ্যালয়ে সংলিষ্ট থাকিলে তিনি অর্দ্ধেক ব্যয় বহন করিবেন, ইহাই জানাইলেন । উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্রের সৌজন্তে ও দানে, ৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে, হাইদ্রাবাদে "সৌকরাম ও চণ্ডুল বালিকাবিদ্যালয়" প্রথম স্থাপিত হয় ।

দেশে বাহ্যতে উচ্চশিক্ষার প্রচার ও প্রভাব বিস্তারিত হয়, ইহাই আলোচনা করিয়া সাধু হীরানন্দ ও নগেন্দ্রবাবু 'সিদ্ধেশ্বর' ও 'সিদ্ধুটাইমসেস' নির্ভৌকভাবে লিখিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদের লেখার ফলে ও সিদ্ধপত্নীর আন্দোলনে, ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, ব্রদেশ-প্রেমিক ও দানবীর শ্রীদরারাম তেঠালের অর্থে সিদ্ধুলেজ স্থাপিত হয় এবং শ্রীদরারামের মৃত্যুর পর সেই মহাপুরুষের নাম এই কলেজে সংলিষ্ট হইয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল ।

ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান এবং পীড়িতকে অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষা করা যাহার জীবনের লক্ষ্য, তাঁহার পক্ষে গৃহের এককোণে বসিয়া সংবাদপত্রের পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্বগ্রহণ অসম্ভব । কল্যাণময়ী কামনা কার্যে পরিণত করাই প্রকৃত কর্মযোগীর মুখ্য উদ্দেশ্য । জীবনে যে ব্রত সাধু হীরানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সে ব্রত পূর্ণ হইতেছে না দেখিয়া, তিনি "সিদ্ধেশ্বর" ও "সিদ্ধুটাইমসেস" সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিয়া, চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্ত সংকল্প করিলেন ।

অপত্রে, অচিকিৎসায় ও অপথ্যে জীলোকদের হুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা দেখিয়া, শ্রীনভলরার হাইদ্রাবাদে জীলোকদের জন্ত একটি হাসপাতাল নির্মাণ করিবেন, ইহা সংকল্প করিলেন । সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে জ্ঞানদাল এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে লেডি ডাকরিণ ভারতের গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রদেশে প্রদেশে জীলোকদের হাসপাতাল স্থাপিত করিবার আশায়, ভারতবাসীর নিকট আর্থিক সাহায্য ও সহায়ত্বের জন্ত প্রার্থনা করিয়া ছিলেন । শ্রীনভলরার আশা পূর্ণ হইল এবং জনসাধারণের মুক্তদানে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির তত্ত্বাবধানে জীলোকদের হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল । সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রণে পরিচালনার ভার সাধু হীরানন্দের উপর ছিল এবং তিনি বিনা বেতনে কার্য্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া ছিলেন । মিস্ এলবি ইহার প্রথম লেডি ডাক্তার হইয়া আসেন । তিনি অতি নিপুণা, বিচক্ষণা ও দয়াবতী লেডি ডাক্তার বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল । সাধু হীরানন্দের অমুরোধে তিনি স্থানীয় দাইদিগকে ধাত্মীয় কার্যে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার জন্ত একটি ক্লাস খুলিলেন ।

দীন দরিদ্রের সেবা ও দেশহিতকর কার্যে এতটা তিনি জড়িত ছিলেন যে, রাজনীতির চর্চা, আন্দোলন ও তর্কবিতর্কে



যোগ দিবার তাঁহার অবকাশ ছিল না; কিন্তু মহামতি মিষ্টার এ, ও, হিউমের বিশেষ অমুরোধে তিনি সিন্ধুদেশে কংগ্রেসের প্রচার ও প্রভাব বিস্তারের জন্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে সিন্ধুদেশের প্রতিনিধিরূপে কলিকাতা ও বোম্বাই কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশের জ্ঞান সিন্ধুদেশেও কলার বিবাহ ও সামাজিক অমুষ্ঠানের উৎসব অভ্যাস্ত ব্যবসাধ্য। কন্যার পিতা ও গৃহস্থামীকে দারিদ্র্যের করাল কবল হইতে রক্ষা করিতে চাইলে সমাজসংস্কারের একান্ত প্রয়োজন, ইহাই চিন্তা করিয়া, সাধু হীরানন্দ এবং কতিপয় দয়ালু সমাজপতি এই সামাজিক গণ্যের বিরুদ্ধে বিপুল আন্দোলন করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্টের সহায়তা ও সহায়ত্বিত পাইয়াও তাঁহারা কৃতকার্য করিতে পারেন নাই। কতকগুলি লেভী, স্বার্থ-পর ও ঈর্ষাপরায়ণ বৃদ্ধ সমাজপতির বিরুদ্ধে তাঁহারা এই উদার অমুষ্ঠান সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে নাই। শ্রীনভলরায় ও সাধু হীরানন্দ ইহাতে নিরাশ হইলেন না। একমাত্র তরুণদের নবীন অভিযানে, অন্ধকারময় কুৎসারপূর্ণ বৃদ্ধের সমাজকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া উবার অরুণ আলোতে উদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইবেন, সেট আশায় শ্রীনভলরায় ও সাধু হীরানন্দ স্কুল ও কলেজে জীবনের উচ্চ আদর্শের বিষয় বক্তৃতা দিয়া ছাত্রদের সহায়তা ও সহায়ত্বিতর প্রত্যাশী হইলেন। গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত স্কুলে এই প্রকার বক্তৃতা দিবার অমুমতি না পাওয়ার, তাঁহারা নিজ বায়ে "ইউনিয়ন একাডেমি" নামে একটি আদর্শ স্কুল ২৮শে অক্টোবর, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত করিলেন। স্বার্থহানী কর্মীর সদমুষ্ঠান যে বিধাতার করুণায় পরিপুষ্ট হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হইবে, ইহা প্রবিশিষ্ট। যুধা বাক্যবাহুরে কালক্ষেপ করা কিংবা ক্ষুদ্রগ্রাহী উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হওয়া তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল না। তিনি ছিলেন প্রকৃত কর্মযোগী, কর্মজীবনের দ্বারা নিজের উচ্চ আদর্শ প্রচার করিতেন। দেশের আশা ও ভরসা তরুণ-দলকে শুলিকা ও সূচরিত্রে সূশোভিত করিয়া, দেশমাতৃকার পূজার নিয়োজিত করা বিপুল কষ্টসাধ্য ও বহুবাধাবিশিষ্ট, ইহা জানিয়াও তিনি নিরাশ হইলেন না। ইউনিয়ন একাডেমির সমস্ত তার তিনি নিজস্ব লইলেন। বিধাতার পুণ্যপ্রতিষ্ঠা ভক্তের জ্বরের দানে পরিপুষ্ট হইয়া মনোরম হয়। বিধাতার আশীর্বাদই ইউনিয়ন একাডেমির ভিত্তি, প্রকৃত ভক্তের সমাবেশে তাহা পূর্ণ হইবেই। সাধু হীরানন্দের একই ভাবের ভাবুক, একই পথের পথিক, জ্যাগী ও চরিত্রবান প্রিয়সখা তাঁহাকে এই মহৎ কার্যে সাহায্য করিতে আসিলেন। সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী আকুমার ব্রহ্মচারী শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ভবিষ্যতে শ্রীব্রহ্মবাক্য উপাধ্যায় নামে সর্বজনবিদিত ও সর্বজনপূজ্য ছিলেন, তিনি সংস্কৃত শিক্ষক হইয়া আসেন। মদীর পূজ্যপাদ সাধু টি, এল, ভাণ্ডারী তাঁহারি ছাত্র। আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াছি যে, শ্রীব্রহ্মবাক্য যে শুধু সংস্কৃতই অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা

নহে; তিনি ইংরাজি সাহিত্যে, গণিত এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রেও অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যেও অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। জ্যামিতি ও বীজগণিত অনেক ছাত্রের নিকট বোধগম্য হইত না, সেজন্য অনেক ছাত্র জ্যামিতি ও বীজগণিত পাঠে অবহেলা করিত। তাহাই দেখিয়া শ্রীব্রহ্মবাক্য গণিত-শিক্ষারও ভার নিজ স্বন্ধে লইয়াছিলেন এবং গল্পচ্ছলে ও নানাবিধ সহজ উদাহরণ দ্বারা এমন জটিল অবোধগম্য শিক্ষা ছাত্রদের বোধগম্য করিয়া দিতেন, বাহাতে ছাত্রদের জ্যামিতি ও বীজগণিতপাঠে আশ্চর্য উৎসাহ দেখা দিয়াছিল।

শ্রীব্রহ্মবাক্যের সহিত শ্রীকেশবচন্দ্রের ভ্রাতৃপুত্র শ্রীনন্দলাল সেন (ভুলুবা) এবং সিন্ধুদেশবাসী গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদাভিষিক্ত পৃথ্বীদাস অর্থ ও সম্মানের প্রলোভনের মোহে মোহিত না হইয়া, নিজ কর্ম ত্যাগ করিয়া হীরানন্দের সহকর্মী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুর শজা, চক্র, গদা ও পদ্মের জ্ঞান এই চারটি বিরাট শক্তি ইউনিয়ন একাডেমির সম্মান, সমৃদ্ধি ও শৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া সিন্ধুদেশের গৌরবভাজন হইয়াছেন।

বিধাতার নিজ হাতে গড়া ধর্ম—সত্য, সুন্দর ও শান্ত; কিন্তু মানুষের নিজ হাতে গড়া সমাজ অবিনশ্বর হইতে পারে না। যুগে যুগে তাহার পরিবর্তন ঘটরাছে, কালোপযোগী প্রচণ্ড প্রবাহে অতীতের জীর্ণ অমুষ্ঠান ভাঙ্গিয়া গিয়া নূতনের প্রবর্তন হইয়াছে। সাধু হীরানন্দ দেখিলেন যে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রাণহীন, নির্জীব সমাজের অমুষ্ঠান কখনই আশাপ্রদ নহে। অতীতের পরিবর্তন, নূতনের প্রবর্তন সাধু হীরানন্দের উদ্দেশ্য ছিল। প্রচলিত আচার অমুষ্ঠান স্বদেশবাসীর স্বাধীনতা-লাভের মঙ্গলদায়ক নহে। মাতৃভাটিকে গৃহের দানী না করিয়া, গৃহলক্ষ্মী বীরপ্রসবিনী করিতে চাইবে। যেখানে ঘরে বাহিরে অন্ধকার, ও যেখানে পরাধীনতার কারাগার, সেখানে স্বাধীনতার অরুণ আলোক কি পকারে উদ্ভাসিত হইবে? দেশের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা, দেশের পরাধীনতার কাহিনী শুনিয়া শুধু পুরুষেরাই স্বাধীনতার সময়ের জন্ত প্রস্তুত হইলে হইবে না, নারীদেরও সে অধিকারলাভে উদ্বোধিত করা নিতান্ত প্রয়োজন, এই ভাবিয়া সাধু হীরানন্দ শুধু নারীশিক্ষা-বিস্তারের জন্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, দেশের সংবাদ বাহাতে তাঁহাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, সেই আশায় দেশীয় ভাষায় গঠিত "সরস্বতী" এবং "সুধার পত্রিকা" নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকার প্রবর্তন এবং বহুল প্রচারের জন্ত উদ্যোগী হইলেন। সাধু হীরানন্দ আশাতীত ফল পাইলেন, বহু গৃহ এই দুখানি পত্রিকা সমাদৃত হইল। পত্রিকার উপদেশাভ্যাসী সদমুষ্ঠানের আশাপ্রদ সংবাদ পাইয়াছিলেন। নারীর নারীর কুটাইয়া তুলিয়া, দেশমাতৃকার এবং জগন্মাতার সেবার জন্ত নিদ্রিত সিন্ধুদেশে নারীজাগরণের ক্ষীণ শব্দ তাঁহার কর্ণকূহরে পড়িয়াছিল। তাঁহাকে উৎক্লষ করিয়াছিল। সেই ক্ষীণশব্দই আজ আশার হ্রস্বভি বাজাইয়া স্বাধীনতার অরুণ

আলোকের আবাহন গাহিতেছে।

বিধাতার আশ্বিন সাধু হীরানন্দকে কখনও নিশ্চিত জীবন বাপন করিতে দেয় নাই। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রচণ্ডবেগে বিসৃটিকা বধন হাইড্রাবাদকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল, তখন সাধু হীরানন্দ কতকগুলি আর্থভাগী সেবা-পরায়ণ যুবককে লইয়া, বম্বের করাল কবল হইতে অসংখ্য রোগীকে বাঁচাইতে পারিয়াছিলেন। দিব্যাত্মি অক্লান্ত সেবার ও শুশ্রূষার সুস্বর্ণের শীর্ণ বিবর্ণ অথরেও জীবনের কৌণ রেখার হাসিটি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। বিধাতার আশীর্বাদ, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ও নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ যুবকদলকে অবলম্বন করিয়া, তিনি এই প্রচণ্ড মহামারীর নিদারুণ ধ্বংসের অভিযানকে প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন। এই সেবাপরায়ণতার মহান আদর্শ তুলিয়া ধরিয়া, যুবকদিগকে দেশের ও দেশের সেবার উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। সেই আদর্শে আদর্শিত জীবন লক্ষ্য করিয়া, অসংখ্য যুবক আজ যে কোনও মহৎ ও পবিত্র কার্যে সহায়-বদনে জীবন উৎসর্গ করিতেছে।

দেশবিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতালব্ধে এবং বিদেশীর সহিত জন্মের আদান প্রদানে শিক্ষা ও প্রচারের উপকারিতা ভাবিয়া, তিনি তাঁহার একটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহিত দেশভ্রমণে বাহির হইলেন। পথের দেশা তাঁহাকে পাগল করিয়াছে, সুন্দর পথের মোহন ছবি তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে। পথের দুই-ধারে বাহা কিছু সুন্দর, বাহা কিছু প্রস্তুতিত জীবনের আদর্শ খুঁজিয়া পাইলেন, তাহাই তিনি মধুকরের ডায় সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক সাধু এবং পণ্ডিতের সহিত আলাপ পরিচয়ে তৃপ্তি লাভ করিয়া, অতুল আনন্দ পাইয়া, পরিশেষে বাকীপুরে আসিয়া প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীশুকপ্রসাদ সেনের আতিথা গ্রহণ করেন। দুই জন উন্নত-মনা ব্রাহ্মমহিলার তত্ত্বাবধানে একটি বাণিকাবিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খলা-পূর্ণ পরিচালনার কার্যকলাপ দেখিয়া, তিনি এতই মুগ্ধ হইয়া ছিলেন যে, তাঁহার দুইটি কন্যাকে এই দুইটি উন্নতমণা মহিলার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষিত করাইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসের প্রথমেই তাঁহার দুইটি কন্যাকে সিদ্ধেশ্বর হইতে বাকীপুরে আনিবার পথে লাহোরে কন্যা দুটি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু শ্রদ্ধের শ্রীপ্রমথলাল সেন মহাশয়ের এবং নিজের অক্লান্ত সেবা ও শুশ্রূষার গুণে কন্যা দুটি শীঘ্র সুস্থ হইয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে, ২১শে জুন, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, সামান্য অসুস্থতা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহার কন্যা দুটিকে লইয়া বাকীপুরে আসিয়া ভক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের আতিথা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কন্যা দুটিকে তাঁহারি আশ্রয়ে রাখিয়া শীঘ্র তিনি হাইড্রাবাদে ফিরিবেন, ইহাই মনস্থ করিলেন। বিধাতার ইচ্ছা মাহুষের চিন্তার অগম্য। বাকীপুরে

তাঁহার রোগবৃদ্ধি হইল—দিব্যাত্মি দীন দুঃখী ও রোগীসেবায় এবং ভগবৎ-করণীয় প্রচারকার্যে অদম্য পরিশ্রমে তিনি এতটা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ায়, যেন বিশ্বজননী তাঁহার পরিশ্রান্ত সন্তানকে আপন কোড়ে ফিরাইয়া লইয়া চির বিশ্রাম দিব্যত জন্ত ব্যাকুল হইলেন। দিন দিন রোগবৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাকীপুরের প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীপরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার রায় বাহাদুর সূর্যানারায়ণ সিংহ, ভক্ত প্রকাশ-চন্দ্র রায়ের পরিবারবর্গের এবং বন্ধুবান্ধবদের ঐকান্তিক সেবা ও শুশ্রূষা উপেক্ষা করিয়া, কঠিন টাইফয়েড রোগের অসহ্য বস্ত্রণা ও অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া, ক্রীর্ণ ও পরিশ্রান্ত হীরানন্দ ১৪ই জুলাই, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে, বেলা ১১টার বিশ্বজননীর কোমল কোড়ে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সিদ্ধেশ্বরের ধ্রুবতারার, স্বদেশের চিরন্তন, দীনদুঃখীর নিত্য-সঙ্গী, ব্রাহ্মধর্মের অক্লান্ত প্রচারক, কংগ্রেসের দীন সেবক, ভগবানের প্রিয়তম, ভারতমাতার আশার মঞ্জরী মুকুলেই বসিয়া পড়িল। নিজের জীবনের মধ্য দিয়া যে বৈজ্ঞানিক তিনি দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন, সেই অমূল্য সম্পদ, দীন দুঃখীর সেবাপরায়ণতা, দেশমাতৃকার পূজ্যবেদীতে জীবন উৎসর্গ করবার অমিত উৎসাহ পাইয়া, তাঁহার দেশবাসী আজ আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছেন এবং কৃতজ্ঞতার আনন্দ্র নতশিরে প্রণাম করিয়া তত্ত্বের পূজ্যজলিতে তাঁহার স্মৃতিমন্দির পরিপূর্ণ করিতেছেন।

শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিংহ (এ্যাডভোকেট, পাটনা)।

## সমবেত ব্রহ্মোপাসনা।

আর্য্য ঋষির চিরদিন একাকী সাধন তপস করিয়াছেন। নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবার্ষিক বজে শনক সনাতনাদি ঋষিগণ একত্র মিলিয়া হরিকথা-শ্রবণে বিমলানন্দ লাভ করিলেও, তাঁহাদের ব্যক্তিগত অর্জনা বন্দনাদি একাকীই ছিল। যানবজাতির বর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, সমবেতভাবে ঐশ্বরোপাসনা প্রথমে হজরত মুসা প্রবর্তিত করেন। তাঁহার নিজের বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য-দেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এয়েরনকে রিহদীদিগের প্রথম আচার্য্য নিযুক্ত করেন। এরেরণ ৪০ বৎসর কাল আচার্য্যের কার্য্য করিয়া রিহদীদিগকে সমবেত উপাসনা শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সমবেত উপাসনা রিহদীরাজ দায়ুদের সময় অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দায়ুদ স্বয়ং সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রচলিত ঐশ্বরের করুণা এবং মহিমা-স্মৃতি সঙ্গীত (যাহা অদ্যাপি সত্যাসত্য বিবিধ জাতির মধ্যে প্রবর্তিত) তিনি সর্বসাধারণের সন্তি মিলিত হইয়া কীর্তন করিতেন এবং প্রেমে বিভোর হইয়া নৃত্য করিতেন। দায়ুদের পুত্র সলিমানের রাজত্ব-কালে জেরুজালেম নগরে সমবেত উপাসনা ভক্ত মন্দির নির্মিত

হয়। এই মন্দিরে রিইলী উপাসকগণ দৈনিক উপাসনার জন্য মিলিত হইতেন কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে মন্দির নগরস্থ কাবামন্দির উপাসকগণ যে দৈনিক উপাসনাতে মিলিত হইতেন এবং এখনও হন, তাহার প্রমাণ করিতে বন্ধ করা নিশ্চায়ক। কথিত আছে, এই কাবামন্দির মহাপুরুষ এভ্রাহিম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এখানে অতি প্রাচীন কাল হইতে সমবেত উপাসনা হইয়া আসিতেছে। এভ্রাহিম একজন রিইলীবংশীয় পরাক্রমশালী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তৎ-প্রতিষ্ঠিত কাবামন্দিরে কালক্রমে অনেক দেবদেবীর মূর্তি প্রতি-  
 ঠিত হয়। হজরত মহম্মদ মক্কাভয়ের পর ঐ মন্দিরে পুনরায় এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সমবেত উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমবেত উপা-  
 সনা এক্ষণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশলোকবাসী ইসলাম ধর্ম-  
 বলবিশ্বগণের মধ্যে প্রবর্তিত দেখা যায়। জুম্মা (শুক্র)বারের সমবেত উপাসনা একটা মহাব্যাপার।

ব্রাহ্মসমাজ এই সমবেত উপাসনার জন্মই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধীহার্য এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার একপ্রাণ একহৃদয় হইয়া সমস্তের মিলিতভাবে পরমেশ্বরের অর্চনা বন্দনা করিবেন, ভূমিসাং হইয়া বিনীত ভাবে সমস্তু করিবেন, এই জন্মই ব্রাহ্মসমাজ এবং পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা প্রতি-  
 ঠিত হইয়াছে। ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন সমবেত ব্রহ্মো-  
 পাসনার উপযোগিতা জীবনের প্রথম হইতেই অতি গভীরভাবে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি খৃষ্টীয় গির্জাতে গিয়া একেশ্বরবাদীদের সঙ্গে মিলিত ভাবে উপাসনাতে যোগদান করিতেম। এই খৃষ্টীয় ভক্তনালয়ে গমনের পথেই ব্রাহ্মোপাসনার জন্য ব্রহ্মবাদীদের স্বতন্ত্র মন্দিরের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এবং সেই প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত হইয়া, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির জোড়াসেকোতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজর্ষি রামমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আচার্য্যের পদে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে নিয়োগ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই ইংলণ্ডে চলিয়া যান। সামাজিক সমবেত উপাসনা তৎকালে কি আকারের ছিল, তাহা এখানে আলোচনা নিস্প্রয়োজন। তবে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালী পূজাপাদ প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যোগবল এবং ব্রহ্মানন্দ-সন্তোষের ফল, তাহা বলিলে অধিক কিছু বলা হয় না। মহর্ষি বীর প্রাণে অনন্তের জন্য অদম্য স্পৃহা লইয়া, আশা ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে হিমালয়ে চলিয়া যান। এবং তথায় অধ্যাত্মবিদের ন্যায় একাকী নির্জনে বলিয়া ব্রহ্মধ্যান করিতে করিতে, ব্রহ্মরূপাণ্ডে মনে প্রাণে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হন। কিন্তু অধিদীপ্তের ন্যায় হিমালয়বাসী হইয়া তিনি অবিব্রাম ব্রহ্মানন্দ-রসপানে মজিয়া থাকিবেন, ইহা তাঁহার জীবনের নিয়তি ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের সমবেত উপাসনাতে তাঁহার যে বিশেষ

কার্য্য ছিল, তাহা তিনি স্বয়ং বীর অন্তরে পরিগ্রহ করিতে না পারিলেও, দেবালোকে (Inspiration) তিনি তাহা পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইলেন। একদা তিনি পাছাড়ের নিম্নস্থ ক্রান্তগামী জলশ্রোতের নিকট বসিয়া বরষার স্রোত নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঈশ্বরাদেশ প্রাপ্ত হইলেন—“এই স্রোত যেমন নিম্নগামী এবং নিম্নগামী হওয়াতেই ইহা পৃথিবীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া সাগরজলে মিলিত হইতেছে, তদ্রূপ তোমাকেও বঙ্গদেশে গিয়া তাহার কল্যাণ সাধন করিতে হইবে।” এইরূপে মহর্ষি প্রত্যাশিত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন।

( ক্রমশঃ )

শ্রীমতিমন্ডল সেন

## চয়ন।

( স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের “Heart Beats” হইতে গিরিশির শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখার্জি কর্তৃক অধ্বাদিত )

*Prayer*—হে অনির্বচনীয়, আমি তোমার নিকট অসীমতা প্রার্থনা করিতেছি। তুমি আমার বৃদ্ধি হও, তুমি আমার শ্রেষ্ঠ হও, দিন দিন তুমি আমার মধ্যে বর্দ্ধিত হও এবং আমাকে অধিকার কর। তুমি বিবেকরূপে আমার জীবনের বন্ধনরত্ন হইয়া আমাকে তোমার পথে রক্ষা কর। গত কল্য বেষানে ছিলাম, যেন আজ সেখান হইতে আরও কিছু দূর তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি।

*Communion*—বখন তোমার সন্তিত যোগে যুক্ত হই, সেই পরম মুহূর্ত্তে আমি রাজ্যধিরাজ। সেই মুহূর্ত্তের কি গভীর শান্তি, কি অপূর্ণ মহিমা! সর্বত্র তুমি, সকল বস্তুতে তুমি, বাহিরে তুমি, অন্তরে তুমি! তোমার আবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ড পরি-  
 বাপ্ত; কিন্তু তোমার পরিপূর্ণ মহিমা আমার আত্মাতে। আমার সমুদয় হৃদয় মন তোমার পূজা ও বন্দনা করে, তোমার চরণে আশ্রয়ান করে, তোমাকে সত্যরূপে দর্শন করে।

যোগের কি মত্ততা! কি বিহ্বলতা! ইহাতে চেষ্টা নাই, কষ্ট নাই, পরিশ্রম নাই। ইহা সহজ। ইহা কেবল সহজে তাঁর মধ্যে নিমগ্ন হওয়া। ইহাতে পরিপূর্ণ আত্মবিস্তৃতি, ইহাতে অনির্বচনীয় আনন্দ।

*Test of the Ideal*—আদর্শের পরীক্ষা—তুমি যাহাকে সত্য বলিতেছ, তাহা যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তবে প্রতিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যেও তাহা তোমার জীবনের ভিত্তি হইবে। যদি জীবনের ঘটনার সহিত তোমার আদর্শের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, জানিও যে, তোমার আদর্শ কলঙ্কিত হইবে। এই মিথ্যা-আদর্শকে পরিহার করিয়া, সত্য আদর্শের সন্ধান অগ্রসর হও।

*Sanctity*—পাপ আবার কি? পাপ সামগ্রীটা স্বপ্নমাত্র—এই কুসংস্কারকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। আবার ভগবানের হারবিচারের সহিত যে প্রেম ও ক্রমার সামঞ্জস্য অসম্ভব, এই কুসংস্কার আরও ভয়ানক; এই কুসংস্কারকেও মন হইতে উন্মূলিত কর। তাঁহার প্রেম ও ক্রমা যেমন সত্য, পাপের শাস্তি তেমন অবশ্যসত্তাবী। অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের গুণ-তব আমাদের বুদ্ধির অতীত। কাহার প্রতি কিরূপ শাস্তি বিধান করিবেন এবং কখন কি পরিমাণে সেই শাস্তি দিবেন, তাহা তিনি জানেন। তিনি জানেন, কাহার মাধার অক্ষর পুণ্য মুকুট স্থাপন করিবেন। তোমার সম্বন্ধে এই বিধি যে, জ্ঞাতসারে পাপ ও মলিনতার পথে পদাঙ্গণ করিও না।

*Asceticism*—অনশন, ছিন্নবস্ত্র এবং ক্রুদ্ধসাধন প্রকৃত বৈরাগ্য নহে। ভগবান্ জীবনে যে রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য বিধান করেন এবং লোকের নিকট হইতে সেবার পরিবর্তে যে ওচ্ছল্য ও অকৃতজ্ঞতা প্রাপ্ত হও, তাহা প্রসন্নমনে বহন করাই প্রকৃত বৈরাগ্য। ঘৃণা, বিবেচ ও প্রতিহিংসাকে মন হইতে দূর করিয়া দাও। সকল প্রকার সাংসারিক সুবিধার লোভ পরিত্যাগ করিয়া, মানুষকে ভালবাস ও মানুষের সেবা কর—ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য আর কিছুই নাই।

—o—

## সার্বভৌমিক নবদেবালয়।

( এই মাস, মাঘোৎসবে, উদ্বোধনের দিনে, সন্ধ্যা আটায়,  
ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজে নিবেদনের মর্্ম )

ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে বিশ্বজননী সবাইকে ডাকেন, সবাইকে স্পর্শ করেন। এই স্পর্শে সবাই পাপ তাপ, শোক দুঃখ, অপমান নির্ব্যাতন ঝাড়িয়া ফেলিয়া, শক্তিশালী হইয়া উঠে। মায়ের মধ্য দিয়া, মায়ের চক্ষু পাঠিয়া সবাইকে না দেখিলে যে দেখা হবে না, মা স্বয়ং চিনাইয়া না দিলে যে আমরা চিনিতে পারিব না। নিজের খালী চক্ষে এত দিন মায়ের পুত্র কন্যাদিগকে দেখিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পাই নাই, অথবা ভুল দেখিয়াছি। লোকেরা মাকে চিনেনা বলিয়া, ভাইবোনকেও চিনিতে পারে না; তাই উচ্চ নীচ, স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া, ঘৃণা অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়া, মায়ের বিত্ত প্রাঙ্গণকে বেড়া দিয়া থণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। আজ ব্রহ্মোৎসবের শব্দ বাজাইয়া ইহপরলোকের সবাইকে আহ্বান করিতেছি। এস স্বর্গের দেবতার সাপুরা, তোমরাই ত সবাই ব্রহ্মের উপাসক উপাসিকা, আমাদের বড় ভাই বোন। তোমরা না আসিলে, কে আমাদের সঙ্গে স্বর্গের পথ দেখাইয়া গিয়া যাইবে? সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে প্রত্যেক মানব বুদ্ধিতে পারে, সে বিশ্বব্রহ্মের পুত্র কন্যা। তুমি আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বুদ্ধিতে পারে, কে তাহাকে খাট করিবে? কে তাহাকে অস্পৃশ্য করিবে?

কে তাহাকে তাহার জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবে? আজ উৎসব-মন্দিরে ঈশ্বর সবাইকে ডাকিয়া বলিতেছেন—ওরে আমার পুত্র কন্যা, কে কোথায় আছ, এস, আমার প্রিয় কাণ্ড সাধন কর। বাহার আমার নাম শুনিয়াছ, আমার স্পর্শ অহুতব করিয়াছ, বাও তারা আমার অজ্ঞান সন্তানদের মধ্যে, শুনাও আমার নাম সবাইকে। বাহার উঠিতে পারে না, সামান্য একটু সাহায্যের প্রার্থী, প্রসারণ কর সাহায্যের হস্ত তাহাদের জন্ত। বার বড়টুকু শক্তি আছে, সে ততটুকু কর। বার অর্থ আছে, সে অর্থ দাও; বার সময় আছে, সে সময় দাও; বার অর্থ ও সময় নাই, সে শুধু আপনার সদিচ্ছা ও সচ্চিন্তাধারা অসমর্থকে উত্তোলন করিতে সাহায্য কর।

পৃথিবীর ক্ষুদ্র মন্দিরে সসীম দেবতা স্থাপন করিয়া, তথাকথিত উচ্চ বর্ণের লোকেরা হরিজন বা তথাকথিত অস্পৃশ্যদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেছেন। তোমরা বাইরা তাহা-দিগকে বল, এস ভাই, এস বোন, বিশ্বজননী তোমাদের জন্ত বিশাল মন্দিরে, অসীম অনন্ত যিনি, তিনি আপনি আসিয়া বসিয়াছেন, সবার পূজা গ্রহণ করিতে এবং সবাইকে স্পর্শ করিতে। এ মন্দিরে সকলের প্রবেশের ও পূজা করিবার সমান অধিকার। এখানে মা স্বয়ং নরনারীনির্কীর্ষেই সকলের নিজ হস্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন, স্বহস্তে পাপের ময়লা ঝাড়িয়া পুণ্যের বসন পরাইয়া কোলে তুলিয়া গাইতেছেন। তথাকথিত ছোট জাতি বা অস্পৃশ্যের স্পর্শে পার্থিব ক্ষুদ্র মন্দিরের সসীম দেবতা অগুচি হইয়া যায়; কিন্তু এখানে মাকে স্পর্শ করিলে মা অগুচি হন না, বরং মায়ের স্পর্শে অগুচি গুচি হয়, অস্পৃশ্য সাধু ও দেবতা হইয়া যায়। দেব-পূজা করিয়া, দেবতাকে স্পর্শ করিয়া যদি অগুচি গুচি না হয়, পার্শ্বীয় পাপক্ষর হইয়া পুণ্যবান্ না হয়, অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণ ও দেবতা না হয়, তবে সে দেবতার পূজা করিয়া কি লাভ? যুগ যুগ ধরিয়া শূদ্রেরা, অস্পৃশ্যেরা পুরোহিত বা মধ্যবর্তী সাক্ষ্যে দেবপূজা করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কাহারও অস্পৃশ্যতা, শূদ্রতা বা অগুচিতা দূর হইল না। যে বেখানে ছিল, ঠিক সে সেইখানেই পড়িয়া আছে, এক চুল শ্রমাণও কেহ অগ্রসর হয় নাই। একজন ক্ষুণ্ণিত তৃষিত হইলে, অল্প জন আহাৰ পান করিলে যেমন ক্ষুধিত তৃষিতের ক্ষুণ্ণিপাসা নিবারণ হয় না, তেমনি ধর্মের জন্ত একজন ব্যাকুল হইলে, অন্য জন তাহার হইয়া, দেবতার পূজা করিলে, ব্যাকুল আত্মার তাহাতে তৃপ্তি হয় না, ধন্যতাও হয় না। যুগে যুগে মা তাঁহার ধার্মিক বীর সন্তানদিগকে পাঠাইয়া, স্বাধীন ও সাক্ষাৎ ভাবে মায়ের পূজা করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নিরাকার একেশ্বরবাদের পতাকা-তলে, যে সর্বধর্মসম্মুখের বা নববিধানের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল সত্যের, সকল ধার্মিক লোকের, সকল জাতির স্থান রহিয়াছে। যাহা গাঙ্গী

এই নববিধান বা সর্কধর্মসম্বন্ধের বিধানের অন্তর্গত হইয়া আপন মনে ঐকান্তিক যত্নের সহিত, ভগবৎ-নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যাইতেছেন।

সৃষ্টিমের উচ্চবর্ণের লোক যদি লক্ষ লক্ষ হরিজনদিগকে সীমাবদ্ধ দেবতার ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রবেশ করিতে বা দেবতাকে ছুঁইতে না দেয়, না দিক ; তাহাতে ক্ষতি নাই। হে ধর্মের জন্য ক্ষুধিত হৃদিত ভাই বোন, যেওনা তোমরা সে মন্দিরে। সে মন্দির পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, সবাই মিলে নিরাকারা বিশ্বজননীর পূজার মন্দির নির্মাণ কর। সে মন্দিরে অশরীরী অনন্ত অগ্ন্যধকে ও অগ্ন-জ্বলনকে প্রতিষ্ঠিত কর। সবাই মিলে সাক্ষাৎভাবে তাঁর পূজা করিতে, তাঁকে দেখিতে চেষ্টা কর। “যেই ধানে ভক্তবৃন্দ, সেইখানে ভগবান্।” বিশাল অনন্ত দেবতা তীর্থস্থান, মন্দির, গির্জা বা কোন স্থান কালে আবদ্ধ হইতে পারেন না। তিনি প্রত্যেক মানবের হৃদয়মন্দিরে নিত্য বিরাজিত রহিয়াছেন। উপাসক উপাসিকা যেখানেই তাঁর পূজা করিতে বসিবে, সেখানেই তিনি ভক্তবৃন্দ লইয়া পূজারীর পূজা গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইবেন।

পাপী তাপী অস্পৃশ্য সবাই স্বর্গীয় মায়ের সন্তান। সন্তানের স্পর্শে বা অপবিভ্রা হইতে পারেন না, মায়ের স্পর্শে সন্তানের অপবিভ্রতা, পাপ, তাপ, ব্যাধি সব দূর হইয়া যায়। স্পর্শকারী সন্তান সাধু ও দেবতা হইয়া উঠে। এই মন্দিরের বিহীনালোকের বাল্বেব অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণবর্ণ লোহ তার বিদ্যুতের কণ্টকের স্পর্শে যেমন উজ্জ্বল লাল বর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ও মন্দিরের অন্ধকার দূর করিয়া আমাদের উজ্জ্বল আলো প্রদান করিতেছে, মলিন অঙ্গার যেমন আগুনের স্পর্শে মলিনহ পরিত্যাগ করিয়া টুক টুক্ লাল উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং আলো ও উত্তাপ প্রদান করে, তেমনি প্রতি মানবাত্মা বাল্বেব অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণবর্ণ লোহ তার কিম্বা মলিন অঙ্গার সদৃশ, স্বয়ং ভগবান্‌ইলেকট্রিক কারেন্ট বা অগ্নিসদৃশ, তাঁর স্পর্শে মানবাত্মা পাপ-তাপ-মুক্ত হইয়া সুন্দর উজ্জ্বল পুণ্যবান্ হইয়া উঠিবে ও পৃথিবীতে পুণ্যের আলো ও উত্তাপ প্রদান করিয়া অন্ধকারময় হিমশীতল বহু মানবাত্মাকে আলো ও উত্তাপ প্রদান করিবে। তার বা অঙ্গার কারেন্ট বা আগুনের স্পর্শ হারাইলে, তৎক্ষণাৎ যেমন মলিন হইয়া যায়, তেমনি মানুষ ভগবানের স্পর্শ হারাইলে পাপ তাপ আসিয়া তাহাকে মলিন করে। একান্ত উপাসনা, নামজপ, সংকল্প, সেবা ও প্রার্থনা-যোগে সর্কধর্ম ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকিতে চেষ্টা করা প্রতি মানবের কর্তব্য। সাক্ষাৎ ভাবে ভগবৎ-পূজা দ্বারা আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগ হয় ও তাঁর স্পর্শে আমরা মুক্তি লাভ করি।

ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মপূজারীর পক্ষে সুবিত্তীর্ণ বিশ্বই ব্রহ্মমন্দির, নির্মূল্য পবিত্র চিত্ত তীর্থস্থান, সত্যই অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয় ধর্মশাস্ত্র, জৈববিশ্বাস ধর্মের মূল, ভগবৎপ্রীতি ও জীবপ্রীতিই পরম সাধনা, স্বার্থনাশই বৈরাগ্য।

“সুবিশালমিৎ বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ॥

চেতঃ সুনির্মূল্যতীর্থং সত্যং শাস্ত্রমবিনশ্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ॥

স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈবং প্রকীর্ত্যতে ॥”

( ধর্মতত্ত্ব )

আমরা সকল জাতির ও সকল ধর্মের লোকেরা এই সার্ব-ভৌমিক নবদেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া, এক অধিতীয়, নিরাকার, সর্কজাতির উপাস্য, পিতামাতা প্রভৃ প্রতিপালক পরমেশ্বরের অর্চনা করি। তাঁর নিকট সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহার জন্ত প্রার্থনা করি। তাঁহাকে একমাত্র দয়ালু দাতা ও পরিত্রাতা জানিয়া, সবাই প্রাণে প্রাণে মিলিত হইয়া প্রণাম করি।

শ্রী প্রসন্নকুমার মজুমদার।

## নূতন গান।

( ১ )

( ব্রহ্মস্বরূপসাধনে বিধানের ক্রমবিকাশ )

বাউল—স্বর

[ সত্য ] ( মুই ) শব্ব হলৈ সে শিব যে হই,

এ যে নাচিল নিজে আদ্যাশক্তি হৃদে তুই,

তাই বাঁচি মুই।

[ জ্ঞান ] দে সকেটিসের আশ্রয়ান,

বুঝি মুই কিছুই নই ;

[ অনন্ত ] শ্রীবুদ্ধের নির্মাণ দেনা,

একবারে মুই নির্মাণ হই।

[ প্রেম ] ( কর্ ) জৈশ-ক্রশাহত, হ'হাত প্রসারি,

( পাপ ) ধরা বুকে লই ;

[ অদ্বৈত ] ( হেরি ) দিগন্ত তাকাই, নাই

মোহমদের আশ্রয় বই।

[ শুদ্ধ ] ( কর্ ) প্রেমপুণ্যানলে গোরা,

হ'বাহ তুলি নাচি মুই ;

[ আনন্দ ] ( হই ) ব্রহ্মানন্দে লীন, যোগে দেখি শুনি,

মু নাই, এক তুই।

( যোগে দেখি শুনি এক তুই মুই )

গরিব।

( ২ )

( ব্রহ্মানন্দ-সঙ্গীতধানে রচিত ও গীত )

রাজরাজেশ্বর হে, রাজ হৃদয়মাঝে ;

দিবারাতি আমি উৎসবে মাতি,

মাতি তোমারি কাজে ॥



হাও কহে স্বয়ং মণীষী আশা,  
নবীন বল, নবীন শিরাসা,  
নব নব শক্তি, পুণ্য প্রেম তক্তি,

( বেন ) জ্বলে বধুস বাজে ॥

নূতন বসনে সাজাও আমারে,  
নূতন ভাবে, নূতন আকারে—  
বেন হেরি পুরাতন, জীর্ণ লাগ মন,  
নাহি মরি ( আর ) মাজে ॥

ঐবিপিনচন্দ্র দত্ত ।

## প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসু ।

( অমরাগড়ীর মণ্ডলীর সহিত যোগ )

নববিধান-প্রেরিতমণ্ডলীর মধ্যে তত্ত্ব অমৃতলালের সহিত চুঃখী অমরাগড়ীর মণ্ডলীর যোগাযোগের বিষয় ইংপুর্বে ধর্মতত্ত্ব পত্রিকাতেই প্রকাশ করিয়াছি। আজ তাঁর উৎসাহপূর্ণ কয়েকখানি পত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁর উপদেশে এখানে কিরূপ ফল হইয়াছে, তাহারই সাক্ষ্যদান করিতেছি। বাং ১২৯২ সালের ফাল্গুন মাসে, অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপনের বিষয় স্থির হইলে, তত্ত্ব অমৃতলাল ফকিরদাসকে লিখিয়াছিলেন :—“যদি সংকীর্ণন করিয়া সমলে তথার যাওয়া হয়, সে ভাল ; নতুবা বৈকালে মগরসংকীর্ণনের যে সময় খুব লোক হইবে, সেই সময় দল গিয়া অমৃতলাল করা ভাল। \* \* \* যখন ( শ্রী ) দরবার এক হইবে, সকলের আশীর্বাদ লওয়া চাই। তুমিই এখন সকল কার্য্য ভগবান এবং তত্ত্বগণের মুশপানে চাতিয়া করিয়া যাও, সব এর হইবে। আমি ভগবানের নিকট ছদরের সহিত প্রার্থনা করি, তিনি তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁর কার্য্য করাইয়া লউন, যেন তুমি তাঁর বিধানের বলে প্রেরিতদিগের অপেক্ষা দশগুণ অধিক উৎসাহের সহিত বন্ধের হিত সাধন করিয়া কৃতার্থ হও ; হুঃখী অজ্ঞান ভাই ভগিনীদিগকে দয়াময় চরিত্র্যে মাতাইয়া বিধান-বিশ্বাসী করিয়া সুখী করিতে পার। না, আমার মা ! তোমার সহায় হউন।” এই পত্র পাবার পর মহা উৎসাহের সহিত বাং ১২৯২ সালের ৩ই ফাল্গুন অপরাহ্নে যখন অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিস্থাপনা হইতেছে, ঠিক সেই সময়েই তত্ত্ব ফকির দাসের ও তাঁর সহকারী ভ্রাতাদিগের সাধের বিদ্যালয়ের খড়্গা বাজালা গৃহখানি সংসারের কীনবুদ্ধি ব্যক্তিগণ চক্রান্ত করিয়া পোড়াইয়া দিল। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়াই প্রেরিত তত্ত্ব ব্যাখ্যিত হইয়া গাছীপুর সহর হইতে লিখিলেন—“ভাই ফকিরদাস, ‘মা তোর রক্ত দেখে রক্তময়ী অবাক হয়েচি, তালিব না কাঁদিব ভাই বসে কাঁবতেছি।’ বিদ্যামন্দির পুড়িয়া গিয়াছে, তালিব, ন

কাঁদিব ? মা দেখিলেন, আমার ঘর পাকা হইতেছে ; কিন্তু আমার জানের ঘর কি কুঁড়ে থাকবে ? তাই বুকি, মা এমন করিয়াছেন। মা আছে বার, ভয় কি তার ? \* \* \* মায়ের কাছে প্রতিদিন আব্দার করিতে হইবে, মা, বিদ্যামন্দির পাকা করিয়া দাও। শত্রুগণ বাঁচিয়া খুব নিপাণতন করিলেই তোমাদের কল্যাণ হইবে। \* \* \* সব তাই মিলে নন্দবাহুকে লয়ে একবার স্কুলের জন্ত তিকা আরম্ভ কর। সকল লোকের পায়ে ধরে ছেলের মত কাঁদিবে। দেখ, মা জজ্ঞা নিধারণ করেন কিনা ? স্কুল ঘর পাকা করিতে কত টাকা লাগিবে ? অঃমায় শরীর খাতিয়ার মত থাকিলে, একবার তোমাদের সহিত লাগিভাষ। তোমাদের চেটোর বাদ লাগিয়া পাৰ্শ্বেরা কৃতকার্য্য হইবে ? মাকে বলিয়া দিব। মা যদি না শুনে, কাঁদিও। একবার বলতো ভাই, কুঁড়ে এবার পাকা ঘর হইবে। তবু মাই, সন্তোর জর, ধর্মের জর, বিধানের জর হইবেই ; প্রাণলপে লাগিয়া থাক।” এই উৎসাহপূর্ণ উপদেশবাহীতে তত্ত্ব ফকিরদাস ও তাঁর সহকারী বহুগণ যিগুণ উৎসাহে প্রভুর কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, স্কুল গৃহখানি এক বৎসর মধ্যে নির্মাণ করাষ্টয়া, মহা-সমারোহের সহিত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই, তত্ত্ব ফকিরদাস মধুরদেব ভাগ্য করার, প্রেরিতদেব এ সেবককে লিখেছিলেন—“গুরু-শোকের কি তীব্র ব্যস্ততা, তা ফকিরের দেহভাগে ভোগ করিলাম ; মন আমার কিছুতেই স্থির হচ্ছে না, ফকির-বিরহে বড়ই ব্যস্ত হয়েছি। ফকির দাসের পরলোকের পর হইতে এই অনাক্ষমণ্ডলীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও বাড়িয়াছিল। ইং ১৯০২। ১লা আগষ্ট, তত্ত্ব ফকির দাসের সমাধিপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রেরিত ভাই অমৃতলাল পুত্র-শোকাতুর পিতার ত্রায় সমাধিপার্শ্বে দাড়ায়মান হইয়া কাকরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন, “আমার ফকিরের তম্ব ইহাতে স্থাপিত হইয়াছে, সেই দেবাত্মার দেহভঙ্গ ইহাতে যে চিরকাল থাকিবেনা, কালে ইহাও ধ্বংস হইবে ; কিন্তু তাঁর আত্মার সমাধি আশু, অখিল প্রভূতির অন্তরে হউক। ইহারা ফকিরের পবিত্র চরিত্রে চরিত্রবান না হইলে কিছুই হইবেনা ; মা, তুমি ফকিরকে ইহাদের বুকের ভিতর সমাধিস্থ কর”। প্রেরিতদেবের সেই সুসন্মিত কাকরকণ্ঠ প্রার্থনা কেবল সে সময়ে আমাদের এাংকে বিগণিত করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই ; সে প্রার্থনা এ সেবকদিগের জীবনের চিরসম্বল হইয়া, প্রাণের ভিতর তত্ত্ব ফকিরের পবিত্র চরিত্রের ও তত্ত্বময় জীবনের প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভাই মাকে মাকে ভগবান ও তত্ত্বসবকে যে অপরাধ হয়, তাহার জন্য প্রাণে কতই না বেদনা অনুভব করি। আবার সেই মহাদি কেশব কথা মনে পড়ে, “অবিদ্যাত্ত প্রার্থনা কর, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে”। তত্ত্ব অমৃতলাল এ অধমদিগকে সঙ্গে লয়ে গাহিয়াছিলেন, “তোমার আয়ত্তে পুরবাসিগণ, আনন্দভুক্ত করি সংকীর্ণন। তোমাদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন ; এই দেশ লক্ষ্মণে দাঁড়িয়ে

আজ্ঞেয় পূর্ণ ত্রয়োদশতম"। এই যে সমুদ্রে দাঁড়াইয়া ত্রয়োদশতম  
মা হয়ে বল্টেন, "বাচ্চা! ভয় নাই, ভয় নাই," তাতো আমরা  
দেখিনা, তাতো আমরা শুনিয়া, জানিনা। ফকির দাঁদ গাহিলেন,  
"অহ, অহ ত্রয়োদশতমী বলে, যোগবলে চল প্রেমধাম"। এই ত্রয়োদশতম  
মধুর আহ্বান, সেই কোমল করে স্পর্শ বধন অকৃতব করি, তখন  
আমার পাণ উৎকৃষ্ট হয়ে যায়; বলি, তাই ভগিনীগণ, "সাধুপুত্র  
বিনা এসংসারে শান্তি কোথায়!" অসংসারের সুখ ও ভোগ-  
বিলাসে আর যেম আমরা ভুলে না থাকি। প্রাণাধিক ব্রহ্মান-  
ন্দের নাকে মা বলে ডেকে ডেকে, এস, আমরা সকলে প্রেমধামে  
যাত্রা করি।

অমরাগড়ী।

শ্রীঅখিলমজ্ঞ রায়

## সংবাদ।

পরলোকগমন—আমরা গভীর হৃৎখের সহিত প্রকাশ  
করিতেছি যে, গত ১৪ই জুন (৩১শে জ্যৈষ্ঠ), বুধবার, রাত্রি  
৯টাটার সময়, কানীপুরের রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়-  
য়ের সচক্ষুদ্বারা প্রায় অশীতিবর্ষ রয়সে, শোকতাপজরাজীর্ণ দেহ  
ত্যাগ করিয়া অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ঠিক এক মাস  
পূর্বে (গত ১৫ই মে), তাঁহার বধাম পুত্র মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি  
জুড়িত পরলোকগমন করেন। সেই দারুণ শোকের আঘাতে  
তাঁর শরীর মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিধানভঙ্গনী তাই  
তাঁর শ্রিতমতা কতাকে ইহলোকে আর অধিকদিন হৃৎখতার  
বহন করিতে দিলেন না। অমরলোকে তুলিয়া লইয়া পুত্র ও  
পত্নির সঙ্গে পুনর্মিলিত করিয়া দিলেন। ভগবান তাঁহার  
আত্মাকে অনন্ত শান্তিপূর্ণ প্রেমবক্ষে স্থানদান করুন এবং পুনরীত  
শোকলুপ্ত পরিবারে ও আত্মীয় স্বজনগণের প্রাণে শান্তি ও সাহসনা  
বিধান করুন।

জন্মদিন—গত ১২ই জুন, ২নং টার লেনে, শ্রীযুক্ত  
কিশোরচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বাহুবল সিংহের শুভ  
জন্মদিন উপলক্ষে, শিশুর মাতামহী শ্রীমতী হেমন্তকুমারী মল্লিক  
উপাসনা করেন। পরম জননী শিশুকে আশীর্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ১০ই জুন, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীটে, শ্রীযুক্ত  
অন্নদাচরণ সেনের বাটিতে, বাগনান-নিবাসী জ্ঞাতা যতীন্দ্রনাথ  
বহুর বধ্যমা কস্তা কল্যাণীয়া কুমারী সুলতিকার সহিত, রাজসাহী-  
নিবাসী কল্যাণীর শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শুভ পরিণয়সম্পন্ন  
সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমতী অবতী দেবী উপাসনা করেন। পর  
দিন প্রাতে বরকৃত্যকে আশীর্বাদস্বত্ব উপাসনা তাই শ্রিয়নাথ  
মল্লিক করেন। নবদম্পতীকে দ্বৈত আশীর্বাদ করুন।

উৎসব—গত ১০ই জুন হইতে ১২ই পর্যন্ত বাগনান  
ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষে

শনিবার সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধনস্বত্ব শ্রীমান জ্ঞাতা রসিক-  
শাল রায় সম্পন্ন করেন। রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত অর্পণা চট্টো-  
পাধ্যায় এর সন্ধ্যায় তাই শ্রিয়নাথ বেদীর কার্য করেন।  
মধ্যাহ্নে ভক্তভোজন ও অপরাহ্নে পাঠ ও সংকীর্তন হয়।  
কলিকাতার ভক্তিমাতৃগায়ক মণিকবাবু সঙ্গীত ও সংকীর্তন  
করেন। তমোলুক, বাণীবন, দেউলটা প্রভৃতি স্থান হইতেও  
স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের যোগদান করিয়া উৎসবানন্দ বর্ধন করেন।  
১২ই জুন, প্রাতে তাই শ্রিয়নাথই উৎসবের শান্তিবাচনের  
উপাসনা করেন।

টাকাইল নববিধান প্রাক্কসনাজের শ্রীমতী সাপ্তাহিক  
উৎসবোপলক্ষে, বহু দিনের পর টাকাইলের নববিধানপরিবারের,  
দুয়ের ও নিকটের, বিধানভঙ্গনী শ্রিয় পুত্র কস্তাগণ সমবেত  
হইয়াছিলেন। ফরিদপুর হইতে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু, দিমাজপুর  
চুড়ামণ এড্‌ট হইতে শ্রীযুক্ত বিমলভূষণ বসু, হাজারিবাগ হইতে  
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ সপরিবারে, কলিকাতা হইতে  
তাই গোপালচন্দ্র গুহ যোগদান করিয়াছিলেন। ২৩শে মে  
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধনস্বত্ব উপাসনা অধ্যাপক  
শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ করেন। ২৪শে মে বুধবার পূর্বাহ্নে  
শ্রীযুক্ত প্রেমাদিত্য ঘোষের বাসায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ  
ঘোষ উপাসনার কার্য করেন। তাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ  
প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যায়  
স্থানীয় টাউনহলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ "ধর্মের  
রূপ ও অরূপ বিষয়ে" বাঙ্গালীর বক্তৃত্ত্ব দান করেন। তিনি  
বলেন, সচিদানন্দ পরব্রহ্মই ধর্মের স্বরূপ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক  
ধর্ম তাঁহারই নানারূপ এবং ঐ সকলের সমন্বয়ে বিধানের আবি-  
র্ভাবে আমরা ধর্মের আজ বিশেষ পরিচয় পাইতেছি। ২৫শে মে,  
বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা  
করেন। জীবন্ত জৈবের জীবন্ত অবতরণের আশীর্বাদ প্রতি  
জীবনে লাভ করিয়া, সেই আশীর্বাদের সাক্ষ্য চতুর্দিকে তাই ভরি-  
দিগের মধ্যে প্রচার করা আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, এই ভাবে এ  
বেলায় আত্মনিবেদন করা হয়।

সন্ধ্যায় পর মতিলাদিগের উৎসব ব্রহ্মমন্দিরে সম্পন্ন হয়। শ্রীমতী  
কমলা ঘোষ মধুবকণ্ঠে স্তুতি সঙ্গীত করেন। তাই গোপালচন্দ্র  
গুহ উপাসনার কার্য করেন। ২৬শে মে, পূর্বাহ্নে ডাক্তার শ্রীযুক্ত  
হরুনার বহুর বাসায় অধ্যাপক খড়্গসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন।  
তাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে কীর্ত-  
নাদি হয়। তাই গোপালচন্দ্র একটা প্রার্থনা করেন। ২৭শে মে,  
পূর্বাহ্নে ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গগত ভক্তভাজন প্রেরিত-প্রবর তাই  
প্রতাপচন্দ্রের বর্গারোহণ সাপ্তাহিক উপলক্ষে তাই গোপালচন্দ্র  
গুহ উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু "বাণীব" হইতে  
এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খড়্গসিংহ ঘোষ Silent Pastor হইতে  
প্রতাপচন্দ্রের লেখা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউন

হল "Faith at the Cross Road" বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খজাসিংহ ঘোষ ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলেন। সাব ডিভিশনাল অফিসার Mr. F. O. Bell, I.C.S, সভাপতিত্ব আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতার বর্তমান যুগে নানা আদর্শের সঙ্গে যুক্ত ধর্মের সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ করা হয়। Economic, Nationalism, Humanism, Creative revolutionism প্রভৃতির আলোচনা করিয়া, তিনি Theism সমর্থন করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন। ২৮শে মে রবিবারঃ দিনব্যাপী উৎসব। পূর্বাঙ্কে ব্রহ্মমন্দিরে কীর্তনের পর উপাসনা হয়। তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় হরিদাসদ্বারের পর প্রীতিভোজন হয়। সন্ধ্যায় কীর্তনান্তে উপাসনা হয়। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খজাসিংহ ঘোষ উপাসনা করেন। "অতীতের ভারতে অখণ্ড ব্রহ্মের পূজা-প্রতিষ্ঠা, খৃষ্টধর্মে অখণ্ড মানবত্বের প্রতিষ্ঠা এবং বর্তমান যুগে অখণ্ড ধর্মের প্রতিষ্ঠা তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল। ২৯শে মে, সোমবার অপরাহ্ন ব্রহ্মমন্দিরে বালকবালিকাগণ সঙ্গীত ও আবৃত্তি ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খজাসিংহ ঘোষ উপস্থিত বালকবালিকাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দেন। সন্ধ্যায় শান্তিবাচনের উপাসনা তাই গোপালচন্দ্র গুহ সম্পন্ন করেন।

**বিশেষ উপাসনা**—গত ৫ই জুন, পুরীর সাগরোগকূলে, মিসেস পি. সি. সেন এবং আরো কতিপয় ভাই ভগ্নী সঙ্গে তাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। গত ৭ই জুন, পুরীর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ আই. এন্. দে মহাশয়ের নিমন্ত্রণে, স্থানীয় অনেকগুলি পদস্থ ব্যক্তি ও মহিলা তাঁহার ভবনে সমবেত হন। এখানে তাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমান অধ্যাপক পুণোক্তনাথ মজুমদার আচার্য্যদেবের ইংরাজী প্রার্থনা আবৃত্তি করেন এবং বর্তমান কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র সঙ্গীত করেন।

**সাম্প্রদায়িক**—গত ২৯শে মে, কলুটোলায় ফুগতবনে, শ্রীকেশবমুখী কৃষ্ণবিহারী সেনের স্বর্গারোহণের সাধুসঙ্গিক দান উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা তাই প্রিয়নাথ দ্বারা সম্পন্ন হয়। কস্তা কুমারী বেলা মধুর সঙ্গীত করেন।

**সেবা**—তাঁই গোপালচন্দ্র গুহ গত ১৬ই মে কলিকাতা হইতে রওরানা হইয়া, ১৮ই মে টাঙ্গাইলস্থ বাঘিল গ্রামে, নব বিধানবিশ্বাসী বহু মহাশয়দিগের গৃহে, নববিধানে অটল বিশ্বাসী-গৃহস্থ প্রচারক ও সাধক স্বর্গীয় কালীকুমার বহুর স্বর্গারোহণের সাধুসঙ্গিক উপলক্ষে তাঁহাদের গৃহ-দেবালয়ে উপাসনা করেন। টাঙ্গাইল হইতে নববিধানমণ্ডলীর অনেকে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীমান কালিদাস তালুকদার সঙ্গীত করেন। স্বর্গগত বহু মহাশয়ের তিন পুত্র শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বহু, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বহু, ডাক্তার সুকুমার বহু আপন আপন কর্মক্ষেত্রে হইতে

আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বহু বিশেষ প্রার্থনা করেন। বেশ গভীর ভাবে অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৪ টাকা দান করা হইয়াছে। ১৯শে মে মধ্যাহ্নে বহু মহাশয়ের নিজের গৃহদেবালয়ে পারিবারিক ভাবে উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় বাঘিল হইতে রওরানা হইয়া তাই গোপালচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বহু ও শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বহু টাঙ্গাইল উপস্থিত হন।

২০শে মে, পূর্বাঙ্কে টাঙ্গাইল নৈমিষারণ্য নববিধানপঞ্জিতে স্বর্গীয় শশিভূষণ তালুকদারের জামাতা শ্রীমান তবানীচরণ উকিলের গৃহে তাঁহার মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের সাধুসঙ্গিক উপলক্ষে উপাসনা হয়। সন্ধ্যায় স্বর্গীয় শশিভূষণ বাবুর আশাকুটির নামক গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়।

২১শে মে, রবিবার দুই বেলা টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। এদিনের প্রথম বেলায় উপাসনা টাঙ্গাইল নববিধান সমাজের সাধুসঙ্গিক উৎসবের প্রস্তুতির ভাবে সম্পন্ন হয়। সন্ধ্যায় উপাসনার স্থানীয় ও দেশের সকলের মঙ্গল কামনা করিয়া বিশেষ প্রার্থনাদি হয়।

৪ঠা জুন, রবিবার, টাঙ্গাইল ব্রহ্মমন্দিরে পূর্বাঙ্কে সাপ্তাহিক উপাসনার "সাধুসঙ্গে বাস" বিষয়ে আত্মনিবেদন করা হয়। ৫ই জুন, টাঙ্গাইল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে তথাকার সাধুসঙ্গিক উৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন। ইহলোক পরমোক্ত লইয়া আমাদের উৎসব। অতীতের বর্তমানের, স্বদেশের বিদেশের সকল সাধু ভক্ত মহাপুরুষদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদের উৎসব, উদ্বোধনে ইহা বিবৃত হয়। বিশ্বাসী অমূল্য সাধকজীবনে, সে জীবনের প্রস্তুতি ও প্রয়োজনের অমুরোধে, জীবন্ত আগ্রহ লীলাময় জৈব কখন পরব্রহ্মরূপে, কখন ক্ষুদ্রবদ্ধ শ্রীহরিরূপে, কখন মাতুরূপে সাক্ষাৎ ভাবে শিক্ষা দান করেন। সর্বাবস্থায় তিনি পরিচালনা করেন, সকল ব্যক্তিকে সুপথ প্রদর্শন করেন, এবং আমাদের ভ্রায় নিত্য কীটামুক্ত মলিন জীবনও সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার পূজা বন্দনার অধিকারী, জীবনের সর্বস্বরূপে তাঁহাকে গ্রহণের অধিকারী, এ নব যুগে এ অধিকার তিনিই তাঁহার বিশ্বাসী মণ্ডলীকে দান করিয়া থাকেন। এই ভাব উপাসনার ও আত্মনিবেদনে প্রকাশিত হয়।

Edited on behalf of the Apostolic Durben New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রিট, "নববিধান প্রেস", প্রিন্টিং ঘোষ কর্তৃক ২রা আষাঢ় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্ম্যতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।

চেতঃ সূনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনখরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।

স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ত্র্যম্বকৈরব্যং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

১০ম সংখ্যা।

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

30th May, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা।

মা জগৎপ্রসবিনি, এই বিশ্বজগৎ তুমিই প্রসব করিয়াছ। এই প্রকৃতিকে তোমারই প্রকৃতি হইতে জন্মদান করিয়াছ। জড় জীব সকলকেই তোমার জীবনীশক্তি হইতে প্রসূত; কিন্তু মানব-সন্তানকে তোমার প্রকৃতি হইতে জন্ম দিয়া, বিশেষ ভাবে তোমার সন্তানত্বের অধিকারী করিয়াছ; তাই তোমার আমিহ হইতেই সে “আমি” “আমি” বলিতে শিখিয়াছে; তোমারই চৈতন্য-শক্তি হইতে সে জ্ঞান-চৈতন্য-লাভের ও বিদ্যাবুদ্ধি-অর্জনের অধিকারী হইয়াছে; তোমার অনন্ত শক্তি হইতে তার অনন্ত উন্নতিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা; তোমার প্রেমই মানব-প্রাণে প্রেম, স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, সেবা, অনুরাগাদি সঞ্চার করিয়াছে; তোমার অদ্বৈতত্বই তাহাকে কর্তৃত্ব উদ্দীপ্ত করিয়াছে; তোমার পুণ্যেই তাহার নীতিজ্ঞান, পাপের প্রতি ঘৃণা ও শাসনপ্রবৃত্তি এবং তোমার আনন্দস্বরূপেই তাহার সুখ-সম্পূর্ণতা, আনন্দ ও শান্তি-লাভের পিপাসা সঞ্চারিত। মানুষ তাই তোমার সন্তান হইয়া, তোমার স্বরূপে স্বরূপবান্ স্বরূপবতী হইতে চাহিলেই তোমার মত দেবতা হইতে পারে। তোমার মত পূর্ণ হইবার আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হইলেই, তোমার

দেবত্ব লাভ করিয়া নর দেব দেবী হন। তোমার অবতার-স্বরূপ মহাপুরুষ বা তোমার প্রেরিত ভক্তগণ ত তাহাই হইয়াছেন এবং অপর সাধারণ জনগণেরও পূজ্য হইয়াছেন। আবার অপরদিকে আত্মবিস্মৃত হইয়া, আমিহে স্মৃতি হইয়া, তোমার স্বরূপশক্তি জ্ঞান, প্রেম পুণ্য ও কর্তৃত্বের অপব্যবহারে এই মানুষই নরাধম পাষাণ হইয়াছে। যে মানুষ যত দেবত্ব সমুন্নত, তিনি তত আপনার আমিহ, ব্যক্তিক বিসর্জন দিয়া “সব গুণ তোরা ময় নাহি কই”, “আমি কিছুই নই”, “আমার আমি নাই” বলিয়া মানব-জীবনে দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। আর যে মানুষ যত আপনার আমিহ জাহির করিতে উৎসুক হইয়াছে, সেই তত মনুষ্যত্ব হইতে স্থলিত বা পতিত হইয়াছে। তাই, মা, করযোড়ে এই মিনতি করি, তুমি মানুষকে যে তোমার সন্তানত্বের অধিকারী করিয়া জন্মদান করিয়াছ, সেই উচ্চ জন্ম যেন লাভ করি। মোহ, অজ্ঞানতা ও আমিহ বা আত্মাভিমান বশতঃ সে অধিকার হইতে আমরা যেন বঞ্চিত বা বিচ্যুত না হই। আমার জ্ঞান, আমার প্রেম, আমার পুণ্য—আমার ত কিছুই নয়, তুমি না দিলে আমি কিছুই পাই না, ইহা সর্ববধা মনে রাখিয়া, যেন দীন বিনীত অন্তরে নিত্য তোমারই মুখাপেক্ষী ও কৃপার ভিখারী হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারি। আমাদের জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যাহারা

মানবকুলকে উজ্জ্বল করিয়া দেবত্বলাভে ধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তোমার সম্ভানব্দের উপযুক্ত হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া আমাদেরকে এমন আশীর্বাদ কর।

শান্তিঃ ! শান্তিঃ ! শান্তিঃ !

## রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গগমনের শতবার্ষিকী ও ব্রহ্মানন্দ কেশব- চন্দ্রের জন্মগ্রহণের শতবার্ষিকী।

রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকীর বিপুল আয়োজন হইতেছে ; ইহা দেখিয়া আমরা যথার্থই আনন্দে পুলকিত হইতেছি। মহাপুরুষদিগের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মানদানে আমরা আপনারাই সম্মানিত হই। তাহা না করিলে কখনই কোন জাতি সমুন্নত হইতে পারে না।

মহাপুরুষগণ দেশের ও জাতির শিরোভূষণ। মস্তক যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি মহাপুরুষগণ জাতির মস্তকস্বরূপ। তাঁহারা আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের জাতীয় গৌরব সমৃদ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছেন।

সাধারণ ভাষে তাঁহাদের মহত্ব তাঁহাদেরই সোপার্জিত বলিয়া আমরা মনে করি। কিন্তু বস্তুতঃ স্বয়ং বিধাতা পুরুষ তাঁহাদিগকে জাতীয় জীবনের সমুন্নতি-বিধানের জন্যই অলৌকিক দৈবশক্তিসম্পন্ন করিয়া প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা কতই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সম্পাদন করাইয়া অগতের কল্যাণ বিধান করেন। তাই পুরুষের মধ্যে আমরা তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বা মানবজাতির প্রতিনিধি বলিয়া অভিনন্দন করি।

রাজর্ষি রামমোহন বর্তমান যুগে যথার্থই এক ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁই বলিয়া, ভক্তির আতিশয়পরতন্ত্র হইয়া, অনেকে যেমন মহাপুরুষদিগকে দেবতারূপে ঈশ্বর্য্যবতার-বোধে পূজা করে, আমরা অবশ্যই রাজা রামমোহনকে বা কোন মহাপুরুষকে সে ভাবে পূজা করিব না ; কিন্তু তাঁহাদিগকে আমাদের পূজ্যপাদ

মানিয়া, বাঁহার যাহা প্রাপ্য, তাঁহাকে সেই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা দান করিব।

আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনের ও ধর্মজীবনের পূর্ণ আদর্শের বীজ রাজর্ষি যে বপন করিয়াছেন এবং তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সে বীজ হইতে এখন বিধাতার রূপায় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, সে ভিত্তি হইতে এখন অট্টালিকা নিৰ্ম্মাণ হইয়াছে। বীজবপন বা মূলপত্তন সামান্য ব্যাপার নহে, সে গৌরব তাঁহারই। তাঁহার পরবর্তী যাঁহারা, তাঁহারা তাঁহারই রোপিত বীজ বা ভিত্তির উপর বিধাতার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া, বৃক্ষোৎপাদনের বা অট্টালিকা-নিৰ্ম্মাণের কার্য্য করিয়াছেন।

রামমোহন ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন, এবং ভীষণ নির্যাতন ও পরীক্ষা বহন করিয়া যে অলোক-সামান্য তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা না করিলে, পরে যাহা হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারিত না।

রাজা রামমোহন যাহা করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই অলৌকিক। তিনি পৌত্তলিক হিন্দু পরিবারে জন্মলাভ করিয়া, পিতৃধর্ম্য পৌত্তলিকতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া পিতাকর্তৃক ত্যাগিত হইলেন, ধর্ম্মান্বেষী হইয়া ত্রিবিধ পর্য্যন্ত গমন করিলেন, সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রতিপন্ন করিয়া সর্ব্বধর্ম্মবাদীদিগের একত্রে এক ঈশ্বরের উপাসনার মন্দির স্থাপন করিলেন। সতীদাহনিবারণ, ইংরাজীশিক্ষাপ্রাবর্তন, বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যালিখন ইত্যাদিও তাঁহারই অমানুষিক মহত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই ; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনে স্বাধীন চিন্তাধারার যে একটা সূত্রপাত করিলেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ভক্তি অর্পণ না করিয়া কি থাকিতে পারি ?

বিধাতা তাঁহাকে দিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, পরে যাঁহারা আসিলেন, বিশেষভাবে আমাদের ধর্ম্মপিতা মহর্ষি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ এবং ধর্ম্মগ্রন্থ ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্র তাহা পূর্ণ করিলেন। বাস্তবিক ইহাদের পরম্পর অধ্যাত্ম সম্বন্ধ যেন অবিচ্ছিন্ন। তাই রাজা রামমোহনকে ইহাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া যদি দেখি, কেবল একটি অট্টালিকার কাঠামো মাত্র দেখিতে পাইব, পূর্ণ শোভাসৌন্দর্য্যপূর্ণ গৃহ দেখিতে পাইব না।

রাজা রামমোহন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে, নিজ নিজ মতের পার্থক্য রক্ষা করিয়া, একত্রে এক ঈশ্বরের



উপাসনা করিবার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম নামাভিধানে তাঁহার ধর্মের নামকরণ করিয়া ও মণ্ডলীবন্ধ হইয়া এক উপাসনা করিবার শ্রাণালী প্রবর্তন করিলেন। শেষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্ম যে বর্তমান যুগধর্ম বিধাতার নববিধান, ইহা ঘোষণা করিয়া এক নবালোক প্রকাশ করিলেন। সর্ব-ধর্মাবলম্বিগণ নিজ নিজ বিভিন্নতা পরিহার করিয়া অগচ্ছ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিবে শুধু নয়, এক অখণ্ড পরিবার হইবে, ইহাই বিধাতার বিধান বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন; এবং সর্বধর্মশাস্ত্রকেই এক সমন্বয়শাস্ত্রে এবং সকল সম্প্রদায়কে এক সম্প্রদায়ে কার্যতঃ পরিণত করিলেন। ধর্মের ঐক্যবন্ধনে জাতীয় ঐক্যবন্ধন, এবং তাহা হইতে সর্বজাতীয় মহা মিলনের প্রশস্তভূমি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

সুতরাং এই তিন মহাপুরুষের অধ্যাত্মযোগ যে অবিচ্ছিন্ন, ইহা আমাদেরই স্বীকার করিতেই হইবে। তিনজন যেন একটা সূত্রে গাঁথা। একই বিধাতা ইহাদিগকে যন্ত্র-রূপে ব্যবহার করিয়া, বর্তমান যুগধর্ম সমন্বয়বিধান জগতে প্রবর্তন করিয়াছেন। তাই ব্রহ্মানন্দ রাজর্ষি রামমোহনকে ধর্মপ্রতিষ্ঠাতামহ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে ধর্মপিতা বলিলেন এবং নিজকে আমাদের ধর্মভ্রাতা বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিলেন। বাস্তবিক কোন প্রকার ভ্রান্তসংস্কারবিবর্জিত হইয়া, বিধাতার অলোকে বর্তমান যুগধর্মের আভ্যন্তরিক ইতিহাস যদি আমরা অধ্যয়ন করি এবং এই ইতিহাসে বিধাতার হস্ত-লেখনী পাঠ করি, আমরা ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ যে এই ভাবেই নির্দিষ্ট, কখনই তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না।

আবার বংশাবলীর ধারা অনুসারে যেমন দেখা যায়, পিতামহের গুণাবলী পৌত্রের অধিক প্রতিফলিত হয়, তেমনি রাজর্ষি রামমোহন ধর্ম বা সংস্কারকার্যের যাহা পণ্ডন বা সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাহারই পূর্ণতা সংসাধন করিয়াছেন। রামমোহন হিন্দু, খ্রীষ্টীয়, এসলাম, সকল ধর্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ সংকলন করিয়া আপন ধর্ম প্রতিপন্ন করিলেন; ব্রহ্মানন্দ সেই সকল ধর্মশাস্ত্রকে সমন্বিত করিয়া নববিধানশাস্ত্র বাখ্যাত করিলেন। রামমোহন আপন ধর্মের বিশেষ নামকরণ করেন নাই, কেবল ব্রাহ্মীয় ধর্ম বা এক ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ধর্ম বলিয়া আখ্যাত করেন; ব্রহ্মানন্দ তাহা প্রত্যক্ষ

ঈশ্বরালোকে বিধাতার “নববিধান” বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হিন্দু, এসলাম, খ্রীষ্টান্ সকলে নিজ নিজ ধর্মামুষ্ঠান করিয়াও, একত্রে এক মন্দিরে একেশ্বরের পূজা করিতে পারিবেন, রামমোহন এই ব্যবস্থা করেন; আর সর্বধর্মাবলম্বিগণ ভ্রাতৃনির্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের ধর্মকে একই অখণ্ড ধর্মামুগত জানিয়া, সম্প্রদায়িক বিভিন্নতা পরিত্যাগপূর্বক, সর্বধর্মের বিশিষ্ট ভাব সমন্বয়সাধনে একধর্মাবলম্বী হইবেন এবং প্রত্যেকেই সর্বধর্মাবলম্বী হইয়া এক অখণ্ড ধর্মমণ্ডলী হইবেন, ব্রহ্মানন্দ ইহা বিধান করেন। এই সকল রামমোহনের অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের পূর্ণতা ভিন্ন আর কি?

রামমোহন যে সকল সমাজসংস্কারের আভাস মাত্র দিয়াছিলেন, কেশবচন্দ্র তাহা উদার নবধর্মসাধনের জন্য অবশ্য আচরণীয় বলিয়া অনুষ্ঠান করেন। তাই ত্রীশিক্ষা, জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতাবজ্ঞন, মাদকনিবারণ, জুর্নীতি-দূরীকরণ, বাল্যবিবাহ-নিবারণ, বাল্যবিধবাবিবাহ-প্রচলন ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গরূপে তিনি প্রবর্তন করেন।

আমাদের বিশ্বাস, রাজর্ষি রামমোহন বর্তমান যুগধর্ম নববিধানের ক্ষেত্র নির্মাণ করিতেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের শতবার্ষিকীও, বিধাতার অনির্বচনীয় বিধানে, নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের শত বার্ষিকীরই প্রাস্তৃতিক রূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামমোহনের স্বর্গগমনোৎসবের শতবার্ষিকী হইবে, ১৯৩৮ সনের ১৯শে নবেম্বর কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের শতবার্ষিকী হইবে; অতএব ইহা স্মরণে রাখিয়া, আমরা রাজর্ষির যথোপযুক্ত শতবার্ষিকী সাধনে যেন ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসবের শতবার্ষিকীর জগৎ প্রস্তুত হই।

## ধর্মতত্ত্ব।

### ব্রহ্মসাগরসঙ্গমে।

সাগরের উপকূলে বসিবামাত্র সমীরণ-সম্ভোগ হয়, সাগরের নিম্ন দর্শনগোচর হয়, আনন্দহিজলো নয়নকে আকৃষ্ট করে, অনন্তের চিন্তায় মন মগ্ন হয়, সাগরে নানাবিধ বহু ব্যাধি নিবারণ হয়, ইহা যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি ব্রহ্মসাগরসমীপে উপাসনায়, বসিলেও এমনই তাহার সপ্তস্বরূপের প্রভাব জীবনে প্রত্যক্ষীভূত হয়। কোন সাধ্য সাধনা বা চেষ্টা করিয়া তাহা

করিতে হয় না। চেষ্টাসাধ্য সাধনা যেখানে, আমি আমার কষ্ট  
কল্পনা সেখানে।

### নববিধানের রেডিও।

নববিধানাচার্য্য বলিলেন, “আমি এখানে কথা বলিতেছি, আর  
এণ্ডিস পর্বতে তাহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে”। একবার সুগ্ধের  
এক বন্ধু তাঁহার সহিত উপাসনা করিয়া আকিসে জলিয়া বান।  
তিনি অনেক দূর পথ চলিয়া গিয়াছেন, তখন আচার্য্যের ইচ্ছা  
হইল, তিনি ফিরিয়া আসেন। তাঁর নাম করিয়া আচার্য্যদেব  
খোলে তিনবার চাটা দিলেন, এবং বলিলেন, “ঠিক তিনি শুনিয়া  
ফিরিবেন।” আশ্চর্য্য বন্ধুটির মনে হইল, আচার্য্যদেব যেন তাঁহাকে  
ডাকিতেছেন, আর তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তখনকার কালে  
রেডিও যন্ত্র বাহির হয় নাই। বৈজ্ঞানিক রেডিও দ্বারা যেমন  
কোন দেশের কোন গান, কোন বক্তৃতা, কোন কথা অল্প দেশে  
শুনা যাইতেছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞান নববিধানেও আমরা বিশ্বাস করি,  
আমরা যখন উপাসনা করি, পবিত্রাত্মার প্রভাবে তাহার প্রভাব  
সমগ্র মানবপরিবারে সঞ্চারিত হয়, তাবের ভাষ্যক প্রত্যেক  
প্রাণেই তাহা প্রতিধ্বনিত হয়। এই জন্ত যখনই আমরা উপা-  
সনা করি, তখন একা একা বসিলেও, পরিবার, দল, জাতি,  
জগতের সঙ্গে একাত্মতা-যোগে প্রার্থনা করি, “অসত্য হইতে  
আমাদিগকে সত্যোতে লইয়া যাও”। অসত্য হইতে সকলকে  
সত্যোতে লইয়া যাইবেন, বিশ্বাস করি। তাই আপাততঃ বাহিরে  
আমাদের দগ, মণ্ডলী বা পরিবার ক্ষুদ্র হইলেও, নববিধানের অদৃশ্য  
মণ্ডলী বিশ্বব্যাপী, ইহা প্রত্যেক ভাবে আমরা যেন অনুভব  
করি।

### উপাসনার রাজ্য।

উপাসনার রাজ্য অধ্যাত্ম রাজ্য। এক রাজার রাজ্য হইতে  
অল্প রাজার রাজ্যে প্রবেশ করিলে যেমন দেখা যায়, অনেক  
বিষয়ে আর্টন কাছন নিয়ম পদ্ধতি আচার ব্যবহার ভিন্ন এবং  
সেই রাজারই অধিকারে অধিকৃত হইয়া চলিতে ফিরিতে হয়;  
তেমনি যখনই আমরা উপাসনার রাজ্যে প্রবেশ করি, তখন  
আমরা সংসারের রাজ্য হইতে স্বর্গের অধ্যাত্ম রাজ্যে প্রবেশ  
করি, তখন আর আমাদের আমরা থাকি না, আমাদের  
স্বাধীনতাও থাকে না, বাহ্যিক রাজ্যে প্রবেশ করি, তাঁহার অধীন  
হইতে হয়। তিনি তাঁহার ইচ্ছা ও হুকুম অনুসারে আমাদের  
বাঁকা, চিন্তা, ইচ্ছা, ক্রটি, কামনা বাসনা, এমন কি দেহ ও জীবন  
পণ্যস্ত যেমন করিয়া অধিকৃত ও পরিচালিত করেন, তেমনি  
করিয়া পরিচালিত হইতে হয়। বাস্তবিক এখানে আসিলে  
সতাই রূপান্তরিত হইতে হয়। এই রূপান্তরিত হওয়াই প্রকৃত  
উপাসনা।

### শ্রীবুদ্ধ-সমাগম।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন শ্রীবুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন, নির্ঝাঁপ  
লাভ করেন এবং মহাপ্ররোণও করেন। তাই বৌদ্ধ জগতে  
এই দিন মহাদিন। নববিধান সর্বধর্মসম্বন্ধবিধান, স্মৃত্তাং এদিস  
নববিধানেও বিশেষ স্মরণীয় ও পালনীয় দিন। শ্রীবুদ্ধ প্রাচীন  
হিন্দুধর্মের অশ্বৈতবাদ, জড়বাদ, জাতিভেদ, কুসংস্কারাদি উচ্ছেদ  
করিয়া, এক নববিধান বিধানের জন্ত রাষ্ট্রস্বর্ষের মধ্যে জন্মগ্রহণ  
করিয়া, জগতের রোগ, দুঃখ, ক্লেশ, মৃত্যুর শোকতাপ হইতে  
কেমনে জগজ্জন মুক্তি ও নির্ঝাঁপলাভ লাভ করিতে পারে,  
তাহারই পথ উদ্ভাবন করিয়া, তিনি এক নববিধান—  
নির্ঝাঁপের বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। মনের কামনা বাসনা চিন্তা  
খান-যোগে নির্ঝাঁপ বা নিবৃত্ত করিতে পারিলেই, দুঃখ  
শোকের শাস্তি হয়, ইহাই তিনি আবিষ্কার করিয়া, বর্তমান  
যুগধর্ম নববিধানের প্রথমাদ প্রবর্তন করিয়াছেন। নিবৃত্তির  
পর যে প্রবৃত্তি, বৈরাগ্যের পর যে সংসার, কামনা বাসনার  
নির্ঝাঁপে যে নিকাম নির্গুণ যোগ সংসারে থাকিয়াই হয়, তাহা  
সাধন ও শিক্ষা দিবার জন্ত নববিধান অবতীর্ণ। তাই শ্রীবুদ্ধদেবকে  
প্রথম গ্রহণ না করিলে, নববিধানের সংসারে যোগ সাধন হয় না।  
স্মৃত্তাং এই দিন নববিধানে বিশেষ সাধনের দিন। শ্রীবুদ্ধ-  
সমাগম-সাধনে বুদ্ধের নির্ঝাঁপ বৈরাগ্য প্রেম আত্মস্থ করিয়া,  
বাঁকাতে আমরা নববিধান সাধনের উপযুক্ত হইতে পারি, তাই  
আমাদিগকে এমন আশীর্বাদ করুন।

### “ধর্ম-সাধন”।

(আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সঙ্গতের আলোচনা)

৫০ সংখ্যা—২৭শে শ্রাবণ, রবিবার, ১৭২৫।

(গিরিধির ডাঃ ভি, রায় হইতে প্রাপ্ত)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী।

(পূর্বাশ্রুতি)

প্রশ্ন—অল্প লোকের অন্যান্য ব্যবহারই আমাদেরই রাগের  
কারণ কি না?

উত্তর—যে রাগিস্বভাব, তাহার রাগ উত্তেজনার নিমিত্ত  
অন্য লোকের সহায়তা আশ্রয় করে না। কাছে কোন লোক  
না পাইলে সে ঘর ছাড়ার সঙ্গে সগুণ্ডা করে। একটা ছুরারে  
মাথা ঠেকিলে, ‘লাগ্, লাগ্, লাগ্’ বলিয়া সে রক্তপাত করে।  
কাগজে মনের মত লেখা না হইলে, সে সজোরে মুড়িয়া ওড়িয়া  
ছিঁড়িয়া কুটী কুটী করিয়া ফেলিলে ভবে অস্থির হয়। রাগ  
এমনি শরীরে উৎপন্ন হইয়া আপনাকে পোড়াইয়া যারে।

প্র—কেহ রাগের কথা বলিলে থামাইবার উপায় কি?

উ—রাগের উত্তরে রাগের কথা শুনাইলে রাগের আল্লাহ হয়, কেননা উত্তরদাতাও তাহার সমান ভূমিতে দাঁড়াইরাছেন, সে আরো আফালনপূর্বক যুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাগের কথা শুনিয়া চূপ করিয়া থাকা ভাল, তাহাতে তাহার অহঙ্কারে যা লাগে। সে অপমানিত হইয়া আপনা আপনি চূপ করিয়া যায়। কেবল চূপ না করিয়া সে সময় তাঁহার (ভগবানের) নিকট প্রার্থনা করিলে উত্তরের পক্ষে আরো ভাল হয়।

প্র—আমরা অনেক সময় রাগ করা কর্তব্য বোধ করিয়া, লোকের প্রতি যে রাগ প্রকাশ করি, তাহাতে কি দোষ আছে?

উ—সচরাচর দেখা যায়, কাহারো প্রতি কোন কারণে মনে মনে রাগিয়া আছি, শেষে ছল করিয়া সেই রাগ চরিতার্থ হয়। সে স্থলে রাগের কারণ অসুসন্ধান করিয়া প্রতীত হয়, বাহার উপর রাগ করিয়াছি, তাহার ভাল করিবার ইচ্ছা সহস্রাংশের একাংশ আছে কি না। তাহাকে শুনাইয়া দিব, জব্ব করিয়া দিব, এই ইচ্ছাটা পনের আনা।

প্র—অন্তের মঙ্গলসাধন কি রাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য?

উ—অন্তের ভাল করা রাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, কেননা তজ্জন্ত ভ্রায়পরতা প্রভৃতি বৃত্তি আছে। রাগের অত্যাচার, অহায়-নিবারণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য। যেখানে হ্রস্বত সকল গীড়ন কবিতোছে, কি অসহায় নিরাশ্রয়ের প্রাণবধে উদাত, সে স্থলে রাগ উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। ধর্মগত রাগ (Righteous Indignation) হইলে তাহাতে হ্রস্বলকে শত গুণ বলবান করে, নিদ্রিত লোককে জাগাইয়া তোলে, ধর্মগত রাগের কথার লোকের জীবনবৃত্তিকে উৎসাহিত করিয়া দেয়। অত্যাচারিত ব্যক্তির সাহায্যার্থ টাকা সংগ্রহ করে। দশ ঘণ্টায় যে কার্য হয় না, এক ঘণ্টায় করিয়া ফেলে।

প্র—কি রূপ স্থলে ক্ষমা করা কর্তব্য?

উ—অন্যের সখ্যে অত্যাচার হইলে রাগ হইবে। নিজের সখ্যে কেউ অত্যাচার করিলে ক্ষমা করিতে হইবে। কেউ সত্য, ধর্ম, ন্যায়, এ সকলের বিরুদ্ধাচারী হইলে রাগ প্রকাশপূর্বক শাসন করা কর্তব্য; কিন্তু নিজের বিরুদ্ধাচারণ করিলে মুহূর্ত্ত পর্যন্ত স্বীকার করিয়া ক্ষমা করা যাইতে পারে।

প্র—ক্ষমা দেখাইতে গিয়া যদি প্রাণ যায়, সে কি ভাল?

উ—ক্রাইষ্টের ক্ষমা আমাদের আদর্শ। বাহার তাঁর প্রাণ বিনাশ করিতে আসিল, তাহাদের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, ‘পিতা। ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে জানে না।’ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিনিরত আমরা অত্যাচার করিতেছি। তিনি অনন্ত দয়ালুগুণে আমাদের ক্ষমা করিতেছেন। কে বলিবে, তাহার অত ক্ষমা ভাল নয়?

প্র—অপরিজ্ঞ রাগের লক্ষণ কি?

উ—বাহার উপর রাগ হইতেছে, তাহার হ্রঃ দেখিলে স্তব্ধ হয় এবং স্তব্ধ দেখিলে কষ্ট হয়। তাহার ধর্মলব্ধজনিত

অনুতাপ দেখিলে যে স্তব্ধ হয়, তাহা নহে; কিন্তু ধৈর্যে হটক, তাহাকে যত বিপন্ন ও নিপীড়িত দেখা যায়, মনোমধ্যে ততই আন্দোলনের সঞ্চার হইয়া থাকে।

প্র—ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে কেউ কথা রাগিয়া বলিলে সে সময় তাহার প্রতিকার করা উচিত কি না?

উ—অনেক সময় না করাই ভাল। শূকরের নিকট মুক্তা ছড়াইবার নিষেধ আছে। রাগের মুখে প্রতিবাদ না করা হয়, ইহা একটা নিয়ম বলিয়া লিখিয়া রাখা উচিত। রাগের সময়ে প্রতিবন্ধকতা করিলে কেবল যে রাগ বাড়ি তাহা নয়, হিংসা, বৈরনির্যাতন-স্পৃহা প্রভৃতি কুভাবও উত্তেজিত হইয়া থাকে।

প্র—বাহার উপর রাগ করা যায়, তাহার প্রতি ক্ষমা অভ্যাস করিবার উপায় কি?

উ—আমরা অনেক সময় মনে করি, অন্তের নিকট কিছু পাইবার আমাদের (Right) অধিকার আছে। সে তাহা না দিলে বা তাহার বিপরীত আচরণ করিলে রাগ হয়; কিন্তু লোকের দুর্ব্যবহার মনে পড়িলে যেমন রাগ হয়, দুর্বলতা স্রবণ করিলে ক্ষমা আইসে। আমি বাহা অধিকার বলিয়া চাই, তাহা দিবার পক্ষে তাহার কত অক্ষমতা ও কত অবস্থার প্রতিকূলতা থাকিতে পারে। তাহার মত আমার অবস্থা হইলে আমি কি করিতাম? এইরূপ অক্ষমতা ও দুর্বলতা দেখিয়া ক্ষমা আইসে। সেইরূপ কথা অধিক ভাবিতে হইবে। লোকের কতদূর পর্যন্ত দোষ ক্ষমা করিতে পারি, চিন্তার দ্বারা ইহা ক্রমে মনের আশ্রয় করিতে চেষ্টা করা উচিত।

(সমাপ্ত)

## সাধু হীরানন্দ।

(পূর্বস্মৃতি)

পঞ্চদশ বৎসর বয়সে প্রথম শ্রেণীর শেষ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াও, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মামুসারে বোড়শ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, প্রবেশিকা পরীক্ষার অধিকার তাঁহার ছিল না। বিন্যা বৃত্তিতে প্রবীণ হইয়াও বয়সে নবীন বলিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পাশের ঐশ্বর্য ও গরিমা হইতে হীরানন্দ বঞ্চিত হইলেন। অনেক গবেষণায়, অনেক যুক্তিতর্কের পর স্থির হইল, হীরানন্দকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় পাঠান হইবে। তদনুযায়ী ১৭ই জানুয়ারী, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে হীরানন্দ ত্রীকেশবচরণে উপস্থিত হইলেন। পারিপার্শ্বিক নির্মণ ও পবিত্র আবহাওয়ার গুণে চরিত্রের সৌন্দর্য ও হৃদয়ের প্রসারতা লাভ হয়। ত্রীকেশব সেইজন্য হীরানন্দের আবাসস্থল স্থির করিলেন, কতিপয় ভক্তপ্রাণ ব্রাহ্মচারকের আবাসস্থল ৬নং কলেজ স্টোরারের বাগীতে। চতুর্দিকের

পবিত্রতা, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অকণ্ট আত্মরিকতা ও প্রফুল্লতা, অনাড়ম্বর সেবা ও সৌজন্য হীরানন্দের জীবনকে আনন্দময় করিয়া দিয়াছিল।

বৈদিক যুগের ঋষি-বালকের নাম সাধু হীরানন্দের পাঠ্য-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। নৈতিক ব্রহ্মচারীর নাম কঠোর নিয়ম পালন করিয়া হীরানন্দ বিদ্যাচর্চা ও ধর্মচর্চা করিতে লাগিলেন। আচার বিচারে সংযম, বেশভূষার সংযম, শ্রিষ্ঠা ক্রীড়াকৌতুকে সংযম, চতুর্দিকে নিবিড় সংঘের নিগড়ে নিজেকে আবদ্ধ করিলেন।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হেয়ার স্কুল হইতে ডিসেম্বর মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষার দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন। ত্রিকেশবের নিকট হইতে নভলরায় সংবাদ পাইলেন যে, হীরানন্দ সর্ববিষয়েই—কি পাঠে, কি নৈতিক জীবনে—উন্নতি লাভ করিতেছে। এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া, বালক মতিরামকে ও সংশ্লিষ্ট-লোকের অন্ত্র ত্রিকেশবের চরণে নিবেদন করিবেন এই আশায়, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আশ্বিনয়ারী মাসে নভলরায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিরামকে লইয়া কলিকাতার আসিলেন এবং ত্রিকেশবের চরণাশ্রয়ে রাখিয়া তিনি বেশে কিরিয়া গেলেন। হীরার নিকট থাকিয়া মতি ত্রিকেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রিকৃষ্ণবিহারী সেনের পরিচালিত এলবার্ট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন।

বাণ্যাবধি পীড়িত ও অসুস্থতার সেবা এবং দীন দুঃখীকে সাহায্য করা স্বভাবোচিত দৌল্যে তাঁহার জীবন সুশোভিত ছিল। কেহ অসুস্থ, কেহ পীড়িত, কেহ আহত এই সংবাদ পাইলে, তিনি কখনই ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিতেন না। কত পীড়িতকে, কত আহতকে সেবা করিয়া জীবন দান করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবনের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে, তাঁহার পূজনীয় পিতার মৃত্যুশয্যায় সেবা শুশ্রূষায় নিজের জীবনকে ধন্য করিতে পারিলেন না। বিধাতা তাঁহার সেবাপরায়ণ পুত্রকে সুদূর বাঙ্গলার গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠাইয়াছিলেন। পরীক্ষার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। সমুদ্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, পশ্চাতে জীবন-পরীক্ষা। ২১শে জুলাই, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সংবাদ আসিল, তাঁহার স্নেহময় পিতা আর ইহলগতে নাই। ব্রহ্মচারী হীরানন্দ নীরবে সে সংবাদ গ্রহণ করিলেন। শোক ব্রহ্মচারীর জন্য নয়, ভগবদ্বক্তার জন্য নয়। নির্জিকার হীরানন্দ পরদিন প্রাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মতিরামকে এই সংবাদ দিলেন। মতিরামের নিদারুণ আর্তনাদ শুনিয়া তিনি করুণকণ্ঠে কহিলেন, “মতি, ধৈর্য্য ধর! এই শোক আমাদের, জগৎকে করুণ আর্তনাদে ব্যথিত করিও না। এল, আমরা পরম পিতার চরণতলে আমা-  
দের পুণ্যময় পিতার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করি, তাহাতে ‘আমরা সাঙ্ঘ্য পাইব, জগৎ শান্তিতে পূর্ণ হইবে।’ ‘করুণ পার্শ্বনার শীতল সাঙ্ঘ্য লাভ করিয়া, মতিরাম অগ্রজের নিকট ভগবদ্বিভূততার পুণ্য প্রতীক প্রথম অমৃতব করিলেন। সুখ

দুঃখে, সম্পদে বিপদে সেই দুটি তাই হীরা ও মতি কখনও করুণাময় বিধাতাকে ভুলেন নাই, নিত্য ভগবচ্চরণে হৃদয়ের দীন প্রার্থনা জানাইয়া, তাহাদের জীবনকে আনন্দময় করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে এক,এ, পরীক্ষার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, পুরস্কারস্বরূপ মাসিক বিংশতি মুদ্রা করিয়া বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাঁহার কোমল হৃদয় ব্যথিতের দুঃখে নিত্য আহত হয়, বাঁহার জীবন পীড়িত ও আত্মবিরোধের সেবার উৎসর্গিত, তাঁহার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিলাভ অতি তুচ্ছ সম্পদ। যিনি কারমনোবাক্যে জগতের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি করুণাময় বিধাতার শাস্তিবাণী প্রচার করিয়া হৃদয়ের ব্যাধি দূর করেন, তিনি কি প্রকারে দীন দুঃখীর শরীরের ব্যাধি দূর করিবেন, সেই চিন্তার আকুল হন। চিকিৎসা-শাস্ত্রে জানগাভই তাঁহার আদর্শের উপযুক্ত শিক্ষা। হীরানন্দ জেডিকেল কলেজে ভর্তি হইবার জন্য উৎসুক হইলেন, কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নভলরায় সেই উদ্যম হইতে তাঁহাকে বিরত করিয়াছিলেন। অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য্য। কহিয়া, নিত্য অনিচ্ছাসত্ত্বে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, ক্লাসে ভর্তি হইলেন।

ছাত্রজীবনে সাধু হীরানন্দের সহিত বাঙ্গলার অনেক মনীষী ও মনবীর পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তিনি সকলেরই প্রেমে ও মেহে আবদ্ধ ছিলেন। সকলেই তাঁহার মধুর স্বভাব ও নিকলক চরিত্রে মুগ্ধ ছিলেন। প্রথম শ্রমশীল হইয়াই সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেন। বসন্ত যদিও নিষ্ঠুর মত্যাচারে তাঁহার মুখমণ্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ত্রিহীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি তাঁহার হৃদয়ের চির বসন্ত গৌলন্দ্যে ও মাধুর্য্যে তাঁহার মুখমণ্ডলকে কমলীয় ও রমনীয় করিয়া রাখিয়াছিল। পবিত্রতার গুহ্রতা, ব্রহ্মচর্য্যের দীপ্তি ও করুণার কাজি তাঁহার মুখটিকে মধুর ও মনোহর করিয়া দর্শকের নরনাতিরাম করিয়াছিল। প্রিয়দর্শন হীরানন্দ যে ত্রিকেশবচন্দ্রের সমস্ত পরিবারের অতি প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, ত্রিপুরারামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রফেসার টাউনী প্রভৃতি অনেক মনীষীর প্রেম ও ঐতিলাভের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

সাধু হীরানন্দের আরাধ্য দেবতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সংসার-পর পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন। ত্রিকেশবচন্দ্রের অন্ত উদ্বেগে, তাঁহার সেবার জন্য উৎসুক হীরানন্দের পাঠ্য জীবনের কর্তব্য এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছিল। নিত্য অনিচ্ছাসত্ত্বে ও বন্ধুদের অনুরোধে তিনি বি, এ, পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষাজীবী বাঙ্গালী যুৎকের নাম পরীক্ষার ফলাফলের জন্য তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তিত ছিলেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কি প্রকারে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিবেন, সেই চিন্তাই দিব্যরাত্রি তাঁহাকে চিন্তিত করিয়া রাখিয়াছিল। তরুণের অক্লান্ত সেবা ও

পরিশ্রমের মধ্যে ত্র্যম্বক কেশবচন্দ্র ভারতকে শোকসাগরে ডুবাইয়া, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, রাত্রি ১০টার সময় চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। এই নিদ্রারূপ শোকের মধ্যে আশাতীত পরীকার পাশের সংবাদ পাঠিয়া হীরামন্ড বিন্দু মাত্র আনন্দিত হইলেন না। বন্ধুবান্ধবেরা ভাবিরাহিলেন যে, হীরামন্ড এষ্ট আনন্দ-সংবাদ পাঠিয়া মিস্টার আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, সেই আশার তাঁহার আনন্দের পতিত্বনি জামাটেতে দোড়িয়া আসিয়া নিরাশ চটরা-হিলেন। তিনি যে আনন্দের অমূল্য সম্পদ হারাইয়া চিরকাল হইরাছেন, এই মনের ভাব তাঁহাদিগের নিকট কোন মতেই প্রকাশ করিতে না পারিয়া, বন্ধুদের নিকট শুধু নীরব ছিলেন। জন্ম-ভাঙ্গা ক্ষীরব নিখাস ও অজস্র নয়নের গারার সিক্ত করিয়া, তাঁহার জন্ম-দেহভার শেষ আশীর্বাদ মাধার তুলিয়া লইয়া কাজে লাগিলেন, ইচ্ছাই পতিত্ব করিলেন। “সং ও পবিত্র হও, বিবেকের বাণী তুলিয়া নিজ ধর্ম্ম ও নিজ দেশকে পূজা করিও।” স্বর্গগত মহাপুরুষের এই শেষ আশীর্বাদই তাঁহার জীবনের চিরলক্ষ্য ছিল এবং মরণ পর্য্যন্ত এ আশীর্বাদ তিনি কখনও ভুলেন নাই।

বহুদিন প্রবাসবাসের পর সাধু হীরামন্ড ত্র্যৈশবচন্দ্রের তিরোধানের পর জমিনী ও জম্মত্বির কোমল কোড়ে ফিরিয়া আসিলেন। তখন সিদ্ধুদেশে বি.এ. পাশ করা উচ্চশিক্ষিত যুবকের খুবই অভাব ছিল। আশীর স্বজন সকলেরই চোখা, হীরামন্ড যেন জীবনব্যয়ের কোমল উচ্চপদের প্রত্যাশী হন। এটরূপ নানা জল্পনা কল্পনার মধ্যে তাঁহার একজন প্রিয়তম বন্ধু আসিয়া কহিলেন—“তাই হীরামন্ড! তুমি উচ্চ শিক্ষিত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছ। ইচ্ছা আমাদের অতি গৌরবের বিষয়। তোমার শিক্ষা ও দীক্ষা যদি দেশের কল্যাণে নিয়োজিত কর, তাহা হইলে তুমিও ধন্য হইবে, স্বদেশও ধন্য হইবে।” বন্ধুর বাক্যে তিনি দেশমাতৃকার আকুল আহ্বান, বাণিত ও অত্যাচারিত কাল দেশবাসীর করুণ ক্রন্দন শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি জীবনের পথ স্থির করিয়া লইয়া, দেশসেবার জন্ত চির দারিদ্র্য ও চির নির্ঘাতন আমন্ত্রণ করিলেন।

সিদ্ধুদেশের প্রসিদ্ধ উকিল, দেশভক্ত ও দানবীর শ্রীহরারাম জেঠমলের উৎসাহে ও সৌজন্যে সিদ্ধুলেজ ও সিদ্ধুসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের হিতকর কাজকর্ম্ম করিবার এবং দেশের অভাব অভিযোগ দূর করিবার মন্ত্রণাগার সিদ্ধুসভা ছিল। দেশীয় ভাষায় দেশের সংবাদ দেশবাসীকে জানাইয়া দেশের প্রতি আকর্ষিত করিবার মত কোমল নির্ভীক সংবাদপত্রের প্রচার সিদ্ধু-দেশে ছিল না। শ্রীদরারাম জেঠমল এবং অক্লান্ত সিদ্ধুসভার সহকর্ম্মীগণ ইংরেজি সংবাদপত্র সিদ্ধুটাইমস্‌র সম্বাদিকারী মিস্টার এন, এন, পোচাঁজি এবং মিঃ ডোরাবজকে বিশেষ অনুরোধে সম্মত করাইয়া স্থির করিলেন, সিদ্ধুসভার মুখপত্ররূপে ‘সিদ্ধু-

টাইমস্‌’ ও ‘সিদ্ধুসভার’ প্রকাশিত হইবে। উত্তর পত্রিকার কর্ম্ম-সচিব হইবেম সিদ্ধুসভার মনোনীত একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। এত বড় দায়িত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি সিদ্ধুদেশে একমাত্র সাধু হীরামন্ড ছিলেন। নামমাত্র ১৭৫ টাকা বেতনে তিনি সম্পাদকের কর্ম্ম করিতে স্বীকৃত হইলেন। দেশসেবা বাঁচার লক্ষ্য, তাগাই বাঁচার মন্ত্র, অর্থ তাঁহার নিকট অতি তুচ্ছ। সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ কখনও সুখ ও স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পান না। নির্ভীকভাবে দেশের ও দেশের সেবা করিতে হইলে, হস্ত সম্পাদকগণ রাজ-আক্রোশে পড়েন এবং স্বার্থপর ব্যক্তিদের অতি বিরাগভাজন হন; কিন্তু তাই বলিয়া সম্পাদকগণ তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কখনও ভুলেন না। নির্ভীক, তেজস্বী ও সত্যবাদী হীরামন্ডের ভাগ্যে এই প্রকার কতকগুলি অসম্ভব ব্যক্তির নিদারুণ আক্রমণ-লাভের সৌভাগ্য হইরাছিল; কিন্তু তিনি কখনও সত্যের পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। স্বদেশ এবং দেশদেশান্তরের নানাবিধ সংবাদে, চিত্তানীল লেখকের ব্যবস্থাপূর্ণ প্রবন্ধে এবং কল্যাণময়ী সচ্চিন্তার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া ‘সিদ্ধুটাইমস্‌’ ও ‘সিদ্ধুসভার’ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভারতের ও দেশবিদেশের সত্য এবং সমুচিত সংবাদ বাচাতে এই সংবাদপত্রে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়, তাহার ভক্ত প্রত্যেক স্থানে এক একটি সংবাদ-পত্রকের অনুসন্ধান করিয়া কতক কুতূহলীও হইরাছিলেন। তাঁহার অন্তরতম প্রিয়তম বন্ধু, সর্স-জনপূজ্য, নির্ভীক দেশকর্ম্মী শ্রীব্রহ্মবাকব উপাধ্যায়কেও প্রবন্ধের জন্ত অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন এবং শ্রীব্রহ্মবাকব প্রিয়তম বন্ধুর অনুরোধে নিয়মিতরূপে প্রাণস্পর্শী ও তেজোময় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্ত হীরামন্ডকে পাঠাইতেন। হীরামন্ডের অদম্য উৎসাহে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে ‘সিদ্ধুটাইমস্‌’ ‘সিদ্ধুসভার’ প্রবল জনমতের নির্ভীক মুখপত্ররূপে সিদ্ধুদেশে আদৃত হইল এবং অল্পসময়ের মধ্যে পাঠকের ও গ্রাহকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া, একাকী পত্রিকাঘরের পরিচালনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সিদ্ধুসভার অনুমোদনে শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে একশত টাকা বেতনে, ১৮৮৪খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে তাঁহার সহকর্ম্মি-রূপে কলিকাতা হইতে তথায় আনাইলেন। দেশের ও দেশের অর্থ লইয়া সচ্ছলতালভ তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ ছিল, সেইজন্য হীরামন্ড নিজের বেতনের হার কমাইয়া মাত্র ৭৫ লইতে স্বীকৃত হইলেন।

মহামতি লউরিপণের স্বায়ত্তশাসন বিল কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড এ্যাক্ট ও ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট অনুযায়ী কার্য্যের সূচনা ১লা মডেম্বর হইতেই আরম্ভ হয়। সভানির্বাচনের প্রবল উৎসাহ ও উত্তমের করাচি সহর আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীদরারাম জেঠমল ও সাধু হীরামন্ডের একান্ত চেষ্টায় উপযুক্ত দেশগোষক করুণোপদেশের সত্য নির্বাচিত হইরাছিলেন।



নীচপ্রবর্তি ব্যক্তিদের কোনও নিকট পছন্দ তাঁহার আশা ও উত্তমকে বার্থ করিতে পারে নাই।

ভারতবাসীর সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন-লাভের চেষ্টা ও উদ্যম মহামতি নর্ডরিপণ খ্রীতি ও সহায়ত্বের চক্রে দেখিয়া অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য কাকাল ভারতবাসীর নিকট তিনি প্রেমময় ভারতবন্ধুরূপে গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার কার্যাবসানের পর যখন তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন ভারতবাসীর বেদনার পুষ্পাঞ্জলিতে তিনি ভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত ভারতবাসীর নিকট হইতে এমন আন্তরিক বিদায়বাণী লাভ করিবার সৌভাগ্য আর কোনও রাজপ্রতিনিধির হয় নাই। সাধু হীরানন্দের যত্ন ও উদ্যমে সিদ্ধদেশে নর্ডরিপণের মর্মান্বর্ণী বিদায় উৎসবে সর্বাত্মকরণে যোগদান করিয়াছিল।

বাল্লভার শ্যামল ও কোমল ক্রোড়ে তিনি বিকশিত জীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বাল্লভার মহাপুরুষ, মনীষী ও দীনবন্ধুর পবিত্রজীবনের মহান আদর্শ তাঁহার জীবনের পথে অমূল্য পাথের ছিল। ত্রীমক্কেসদেবের ভগবৎপ্রোয়াদ, ত্রীকেশবচন্দ্রের ধর্মপরাগতা ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের দীন দরিদ্রের বাক্যবতা গঙ্গার ত্রিধারার ন্যায় তাঁহার মধ্যম জীবনকে প্রাবিত করিয়াছিল। সেই প্রবাহ বাহাতে সিদ্ধদেশকে প্রাবিত করে, সেই আশার তাঁহার কর্ম-প্রণালী শতমুখী করিলেন।

ধর্মই জাতীয় শক্তির সূত্রভিত্তিক, এই জ্ঞান সাধু হীরানন্দের চিরদিন ছিল। হৃদয়ের নিষ্ঠুরতার, উদ্বুদ্ধতার ও প্রসারতার পথ একমাত্র ধর্মই দেখাইয়া দিবে। প্রত্যেক ধর্মের প্রাণ যে প্রেম, সেই প্রেমই সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত ধর্মাবলম্বী ও সমস্ত মনুষ্য-জাতিকে উন্নত ও উদ্বুদ্ধ করিয়া মিলনস্থলে বাঁধিয়া রাখিবে। যেখানে সন্ধীর্ণতা সেখানে সংঘর্ষ, যেখানে স্বার্থসিক্তির প্রয়াস সেখানে বিরোধ, যেখানে বিদ্বেষ সেখানে বিচ্ছেদ, যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠা সেখানে বিশৃঙ্খলতা; কিন্তু যেখানে প্রেম, যেখানে ত্যাগ, সেখানে উদারতা, যেখানে ধর্মপ্রতিষ্ঠা, সেখানে মিলনের পুণ্যবেদী চির প্রতিষ্ঠিত। পারিপার্শ্বিক অসংখ্য অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার শ্বাস গ্রন্থাসে মানুষ পীড়িত হইয়া মতিভ্রান্ত হয়। হিংসা, ঘেঁষ, ঈর্ষা ও সংঘর্ষের সূচনার হৃদয় কলুষিত হয় এবং প্রেমের পুণ্য প্রভাব মলিন হইয়া পড়ে। এই নিদারুণ দৃশ্য দেখিয়া সাধু হীরানন্দ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। ধর্মই হৃদয়ের প্রেম-শতদল প্রস্ফুট করিয়া, চতুর্দিক আমোদিত করিয়া মিলনের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবে, এই উদারবাণী তিনি সিদ্ধদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। সমস্ত ধর্মই এক, সমস্ত ধর্মের মহামন্ত্র প্রেম। প্রেমের পুণ্যপ্রভাবে বিধাতার পূর্ণপ্রকট। বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন আরাধনা-প্রণালী যে মহৎ এবং একই বিরাট অবিনশ্বর প্রেমপুরুষের চরণে পঁছাইয়া দিবার উজ্জ্বল পথ এবং বিধাতার লীলা-

নিকেতন, ভক্তের আরাধনাগুলি চিরপবিত্র এবং সমস্ত ধর্মাবলম্বীর প্রকার সম্পদ। সমস্ত ধর্মের আরাধনামন্দির সিদ্ধদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু ত্রাশ্বধর্মের সৃষ্টিত মন্দির না থাকায় তিনি মর্মান্বিত হইলেন। অর্থের অভাবে মন্দির-নির্মাণ অসম্ভব; কিন্তু ধর্ম যখন সকলের সম্পদ, তখন সমস্ত ধর্ম-পরাগণ ব্যক্তির সহায়তা ও সহায়ত্বভিতে ধর্মমন্দির নির্মিত হইবে, এই আশায় তিনি কতিপয় সহকর্মী লইয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সর্বজনপুজ্য সাধু হীরানন্দ ধর্মের জন্ত ভিক্ষার ঝুলি ঝুঞ্জে লইয়া পথের ভিখারী হইলেন। হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর মুক্তদানে তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ হইয়াছিল এবং সেই অর্থের তিনি সমস্ত ভগবদ্ভক্তের হৃদয়রঞ্জন করিয়া মনোরম ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন; এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীনভলরায়ের প্রচুর দানে ও নিজের সঞ্চিত অর্থ হাইদ্রাবাদে আর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রী হমরেশচন্দ্র সিংহ (এ্যাডভোকেট, পাটনা)।

## একখানি পত্র।

প্রজ্ঞাপদেষু

ধর্মতত্ত্বসম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

আমার নিম্নলিখিত কথাগুলি ধর্মতত্ত্বের হান দিয়া স্মৃতি করিবেন।

নববিধান "পবিত্রাচার বিধান", একথা কেন বলা হইল? বিশেষ করে একথা নববিধান সন্ধকে কেন বলা হইল, তাহা কি আমরা ভেবে দেখেছি? অন্যান্য সমস্ত বিধানে দেখা যায়, এক একজন Prophet-এর জীবনের সঙ্গে সেই সব বিধান অতি ঘনিষ্ঠ সন্ধকে সন্ধ; এমন কি, তাঁহাদের নামেই উক্ত বিধান সকল পরিচিত। কিন্তু বর্তমান বিধান কোনও মানুষের নামের সঙ্গে গ্রথিত হয় নাই। বরং পবিত্রাচার বিধান বলিয়াই পরিচিত। অন্যান্য বিধান কি পবিত্রাচার প্রণোদিত নয়? সকল বিধানই দেবনিখাসে নিষ্পত্তি করে, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পেয়েছে। ভগবানের যে লীলা উক্ত সব জীবনে প্রকাশিত হয়েছে, তাহা নিম্নাই উক্ত সব বিধান ভিন্ন ভিন্ন Prophet-এর নামে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিধান কোনও মানুষের নামে গ্রথিত না হয়ে, বলা হয়েছে, ইহা নববিধান—ইহা পবিত্রাচার বিধান—এই বিধানের কোনও বিশেষ high priest নাই। অনন্ত কালপ্রবাহের মধ্য দিয়া—অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতের কত স্থানে—এশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকার, কিংবা অজানিত কোনও গ্রহতারকাবাসী মহাব্যালোকে—এই আদর্শের স্বর্ণরশ্মি সকল কত কত জ্ঞান ভক্তির high peaks সকলের মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়া, evolution

এর অনিবার্য ফলে অদ্য নববিধান নাম ধারণা করিয়া—পবিত্রা-  
আর অজ্ঞাত প্রেরণার, অনন্তের আদর্শ বক্ষে ধারণ করিয়া—  
মানবজাতির হৃদয়ের স্তর সকল আন্দোলিত করিয়া—সামঞ্জস্যের  
নব নব রসে পুষ্ট হইয়া—নব হইতে নবতর পূর্ণতার মণ্ডিত হইয়া  
—বিশু সকলের সামঞ্জস্য মিলিত প্রবাহ সিদ্ধ পানে আবেগের  
পূর্ণতার বাধিত হইতেছে। এই বিশেষত্বই এই বিধানের  
নুতনত্ব। ইহার আর একটা নুতনত্ব স্বীকৃত হয়েছে যে, ইহা  
পূর্বে পূর্বে সকল বিধানের সামঞ্জস্য ; কিন্তু এরূপ সামঞ্জস্য কি  
অজ্ঞাত বিধানে নাই? দেখা যায়, সকল Prophetই বলিয়া  
গিয়াছেন, “I have come to fulfil and not to destroy.”  
এই কথা দ্বারা কি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, সকল  
বিধানই তাহার পূর্বে পূর্বে জানিত বিধান সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য  
রক্ষা করে প্রচারিত হয়েছে? তাহা হইলে আমরা দেখতে  
পাই যে, নববিধানের বিশেষত্ব ও নুতনত্ব সামঞ্জস্যের ভূমিতে তত  
উজ্জল নহে, তত সর্ববাদিসম্মত হইবার কারণ নাই।—( যদিও  
নববিধানের সামঞ্জস্য সাধুভক্তগণের রক্ত মাংস পান ভোজনের  
আদর্শে একটা বিশেষ গৌরব আছে। একথা সত্য, বীণ  
সাধুর রক্ত মাংস পান ভোজনের আদর্শের প্রথম প্রবক্তা।  
কিন্তু তিনি কেবল তাহার নিজের রক্ত মাংস পান ভোজনের  
কথাই বলে গেছেন। এবং এজন্যই তাহার বিধান তাহার  
নাথের সঙ্গে co-terminus। নববিধানের আদর্শে সকল সাধুর  
রক্ত মাংস পান ভোজনের কথা—ইহা একটা নুতন জিনিস  
এবং ইহা ইহাকে অজ্ঞাত বিধান হইতে স্বতন্ত্র করিয়াছে এবং  
ইহা যে কোনও মানুষের জীবনের সঙ্গে co-terminus নহে,  
তাহাই প্রমাণ করিতেছে। এরূপ না হলে, ইহাকে একটা  
নুতন বিধান বলে ঘোষণা করার কোনও প্রয়োজন ছিল না।  
সামঞ্জস্যের বিধান চিরকালই আছে। তাহা হইলে প্রমাণ  
হচ্ছে যে, নববিধানের বিশেষত্ব ও নুতনত্ব—ইহা যে পবিত্রা-  
বিধান বলে স্বীকৃত হয়েছে এবং ইহা যে কোন মানুষের জীবন-  
লীলার সঙ্গে co-terminus নহে—তাঁহাতেই প্রধান ভাবে ও  
উজ্জল ভাবে ফুটে উঠেছে। তবে কি কেশবচন্দ্রের ইহাতে  
বিশেষ কোনও স্থান নাই? অবশ্যই আছে। সমস্ত Apostles  
গণের ইহার মধ্যে বিশেষ স্থান আছে। প্রত্যেক প্রকৃত নব-  
বিধান-বিশ্বাসীর ইহার মধ্যে বিশেষ স্থান আছে। পবিত্রা-  
নির্ধারিত হয়ে যিনি বাহা বলিয়াছেন ও করিয়াছেন, তাহারই কথার  
ও জীবনের এ বিধানে বিশেষ স্থান আছে। তবে কেশবের স্থান  
কোথায়? Prophet সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কেশব সকল  
Prophetএর বিশেষত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু ঈশাকে  
সকলের centre বলিয়া গিয়াছেন—পুত্রকে centreএ স্থান  
দিয়াছেন। সেইরূপ এই নুতন বিধানে কেশবকে—সকল  
ভাবের ভাবুক বলে, তাহার জীবনে সকল ভাবের সামঞ্জস্যের  
সমতা দেখে (perfection দেখে)—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম

কোনটা কোনটাকে অতিক্রম করিতে না পারা দেখে—  
central place দিতে আমার ইচ্ছা হয়। নিজের জীবনে  
যে ভগবানের লীলা, তাহার সঙ্গে তিনি এই বিধানকে co-  
terminus করিলেন না; কিন্তু তিনি যে এ বিধানের centre,  
তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। সকল সামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য  
তাঁহার জীবনে হয়েছে, তাই তাঁহার স্থান centreএ। অজ্ঞাত  
Apostlesএর জীবনে দেখা যায় যে, যদিও তাঁহারা সকলেই  
সকল ভাবের ভাবুক, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ভাব তাঁহাদের জীবনে  
অধিকতর পরিপুষ্ট লাভ করেছে। কেশব-জীবনে সকল  
ভাবেরই এক অপূর্ণ সমতা দেখা যায়। এই সমতাব্যঞ্জক  
সামঞ্জস্যই তাঁহার বিশেষত্ব এবং ইহাই তাঁহাকে এ বিধানে  
central figure করেছে। ভাবের intensityর দিক  
দিয়ে নহে, কিন্তু সমতার দিক দিয়াই কেশবজীবনের  
বিশেষত্ব। আর একটা কথা। এই যে সমতা-  
মূলক সামঞ্জস্য, তাহার চাবিটা ভগবান কেশবের হাতে  
দিয়াছেন। কিন্তু সম্মুখে যে আছে, “সম্মুখে অনন্ত জীবন-  
বিস্তার, নীরব নিস্তর নিবিড় আঁধার” ইহাও পরম সত্য কথা  
এবং এই কথা যেন আমাদের ভুল না হয়। কেশব এই  
সমতামূলক সামঞ্জস্য-বিধানের keyটা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু  
ইহার বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্বন্ধে কেশব নিজেই বলেছেন,  
“নববিধানের পূর্ণ ধর্ম ভবিষ্যতে”। ঋষিহুলা অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র-  
নাথ লিখেছেন, “Does any man know the limits and  
full contents of the world?.....Whose is the  
'Reason' that can take at one view the entire  
range of time and space as one whole, hold in a  
single grasp the infinite contents that fill them?”  
এই ধর্মের পূর্ণ বিকাশ humanityর বক্ষে অনন্ত কাল চলবে।  
ইহার High Priest একমাত্র পবিত্রা-। শ্রদ্ধের ভাই মহিম  
চন্দ্র সেন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, কেশব বখন Town Hallএ  
“Am I an inspired Prophet” এই বক্তৃতা দেন ও বক্তৃতায়  
নিজে Prophetএর position ত্যাগ করেন, তখন বন্ধুদের মধ্যে  
অনেকে তাঁহার এই কথার প্রতিবাদ করেন। তখন কেশব  
উত্তরে বলেন যে—“Prophet কখনও মিথ্যা কথা বলতে পারেন  
না। আমি বলেছি, আমি Prophet নহি। আমি Prophet  
হইলে মিথ্যাবাদিতার দোষ আমাতে বর্তে। কিন্তু Prophet  
যখন মিথ্যাবাদী হতে পারেন না, তখন আমি Prophet নহি।”  
কেশব নববিধানের আচার্য (Central figure), Prophet  
নহেন। এই positionই কেশবকে অজ্ঞাত Prophet হইতে  
Single out করিয়া, তাঁহাকে গৌরবাবিহীন ও মহিমাবিহীন  
করিয়াছে। ভগবানের ও পবিত্রা-মহিমা ও গৌরব গৌর-  
বাবিহীন করিয়া নিজেও গৌরবাবিহীন হইয়াছেন ও মহিমার মুকুট  
মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। ঈশা কণ্টকের মুকুট ধারণ করিয়া,

মানবজাতির সঙ্গে, পানীয় সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া, পানীয় অস্ত্র প্রাণভাগ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু কেশব মানবের নিকট ভগবানকে ও পবিত্রাত্মাকে উপস্থিত করিয়া, ভগবানের সঙ্গে ও পবিত্রাত্মার সঙ্গে মানবের direct সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যে অনন্ত উন্নতির পথ অঙ্গুলী-নির্দেশে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি যে মহিমার মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তাহা চিরকাল উজ্জ্বল থাকিরা মানবাত্মার পরিজ্ঞানের পথ স্পষ্ট করিয়া রাখিবে। এ বিধানের বাহক কেশব একা নহেন। মানবজাতি—অতীতের, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের—সকলে ইহার বাহক। সকলের মধ্যে যে পবিত্রাত্মা বাস করিতেছেন, সেই পবিত্রাত্মার নিখাসে এই বিধান গঠিত হইয়াছে এবং চিরকাল নব নব ভাবে ও রূপে পরিপুষ্ট হইয়া চির নবীন থাকিরা, জগতের পরিজ্ঞানের কারণ হইবে। এ বিধান একটা সর্বাপেক্ষার finally গঠিত পুতুল নহে। ইহা একটা জীবন্ত নব শিশু। এখনও অনেক অপূর্ণতা রয়েছে। “It doth not yet appear what it shall be.” কিন্তু এই নবশিশু অনন্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অনন্তের বক্ষে, অনন্তজীবন-প্রবাহের সংগ্রবে, ইহা অনন্তকাল বিকাশ পাইবে। অনেক দেবনিখাস ইহার জীবনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হয়েছে। অনন্তকাল আরও পবিত্রাত্মার কণ্ঠ নিখাস ইহাকে পরিপুষ্ট করিবে, তাহা চিন্তার অগোচর। “অবাঙ্মনসো গোচরঃ”। “কেশব একখানা নূতন কাপড়ের আগা গোড়া করিতে আসিয়াছিলেন” একথা বিখ্যাত নহে। তিনি যে কাপড়-খানা বুনিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর। প্রত্যেক part অত্যন্ত সমস্ত part-এর সঙ্গে কেমন সুন্দর সামঞ্জস্য বুন হইয়াছে। এটা অতি মিথুঁত হইয়াছে, এবং নানা রঙ্গ রঞ্জিত হয়ে অতি চিত্তসুখকারী হয়েছে। এমতই কাপড় খানা হয়েছে যে, প্রাণ সহজেই প্রস্তুত হয় যে, ঐ কাপড় খানা পরিধান করে একবার প্রাণভরে হরিবোল হরিবোল করি। কিন্তু ভবিষ্যৎ বংশ পবিত্রাত্মার আলোকে, ইহার চারিপাশে ও centreএ অনেক নূতন বুনট করিবেন। তাহাও খাপে খাপে এমত সুন্দর ভাবে সামঞ্জস্য মিলায়ে বসিবে যে, কাপড়খানা উজ্জলতর ও সুন্দরতরই হইবে, এবং প্রত্যেক বুনটই বৈশ সামঞ্জস্য মিলায়ে বসিবে। নানা রঙ্গের নানা সূতা এমত ভাবে পাশে পাশে বসিবে যে, ইহাকে আরও ঘনবুনটে দৃঢ় ও সবল করিবে। এমতভাবে ইহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে ও নূতন সূতার এমন দৃঢ়বন্ধ হইবে যে, ইহা ছিন্ন হইবার আর কোনও কারণ থাকিবে না। ইহার নূতনত্ব চিরনূতন থাকিবে, কিন্তু কোথাও কোনও অসামঞ্জস্যের রেখাও পড়িবে না।

“Ever ascending by ever transcending.” (Vaswani)—Keshub holds the key of ever ascending by ever transcending. এবং ইহাই কেশবের নববিধান

নির্দিষ্ট স্থান। আরও অনেক কথা মনে আসে। কিন্তু আশা করি, আমার মনের তাব ইহাতেই স্তব্ধগণ বুঝিয়া লইতে পারিবেন। আর একটা কথা বলি। যদি কেশবকে পবিত্রাত্মার আলোকে বুকে, শুধু তাঁহার utterance ধরে চলে গেলেই হইত, তবে কেশব এত আড়ম্বর করে Pilgrimage to Saints—ঈশাসমাগম, বুদ্ধসমাগম, চৈতন্যসমাগম প্রভৃতি মণ্ডলীর সাধনের মধ্যে প্রবর্তিত করে গেলেন কেন? নিজে ও সব সাধন করে, আমাদের জন্ত ও মণ্ডলীর জন্ত, অত্যান্ত Prophetদের তায়, শুধু কেশব-সমাগম প্রবর্তিত করে গেলেইতো পারিতেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, কেশব মনে করিতেন যে, প্রত্যেক মহাজনের মধ্য দিরাই এত সব বিশেষত্ব পাওয়া যায়, বাহা তিনি একা দিতে পারেন না। সকল বিশেষত্বের ছাপ কেশবের মধ্যে আছে বটে, এবং সমস্ত প্রাপ্ত হয়ে আছে; কিন্তু প্রত্যেক বিশেষত্বের পূর্ণ বিকাশ পেতে হলে, প্রত্যেক মহাজনের নিকট যেতে হবে। এর জন্তই আমি বলিতে চাই যে, কেশবের নিকট নববিধানের চাবী রয়েছে। কিন্তু চাবী দিরা দরজা খুলে, সকল গতির কথা, ভুলে বেয়ে, সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধানের প্রধান কথা, ভক্ত-সঙ্গে ভগবানকে পেতে হবে। সকল ভক্ত-চরিত্র as-imitate করে নববিধানী হতে হবে। ভূতের, বর্তমানের, ভবিষ্যতের সকল সাধককে প্রাণে স্থান দিরা পথে চলতে হবে। এখানে কোনও গতির রেখা টাঙ্কিবার দরকার নাই। কেশব এই পথের পথ-প্রদর্শক। কিন্তু তিনি কোনও পূর্ণ ও অত্যান্ত Prophet-এর স্থান চান নাই। ইহাই তাঁহার গৌরব। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, “পূর্ণমর্ণের আদর্শ যদি রেখে যেতে পারিতাম, তবে ভাল ছিল।” তাহার অর্থ, তাহা পারেন নাই। আরও বলিলেন, “নববিধানের পূর্ণ ধর্ম ভবিষ্যৎ”। আমার শেষ কথা—হে নববিধান-বিশ্বাসী ভাই, এত centre, radius ও circumference-এর কথার দরকার আছে কি? “অনন্তের টানে, অনন্তের পানে, ধার প্রাণ-নদী বাধা নাহি মানে; বাঁধা আছি বার সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহারেই প্রাণ চার।”

এই অনন্তের বক্ষে, কেশবেরই মত সমস্ত গতি ছিঁড়ে, পক্ষপুট বিস্তার করে উড়তে শিখি। এই অনন্তের টানে সব ভুলে—centre, radius ও circumference সব ভুলে—এই অনন্তের অনীমে চলে বাই। “Ever ascending by ever transcending.” (Vaswani) পরিজ্ঞানের কোনও ভুল হবে না। হে নববিধান-বিশ্বাসী ভাই, এক্ষণ হলেই নববিধান মহিমাবিত হবে ও নববিধান জগতে পুঞ্জিত হবে। ভাই, নববিধানকে কেশবের গতিতেও বাঁধিও না। নববিধান “freedom itself”। ইহা বয়ঃশব্দ। ইহা ব্রহ্মের সূত্রবের সঙ্গে co-terminus। এই নববিধানকে কোন বন্ধনে বাঁধিও না। ইহা অনন্ত আকাশে পক্ষপুট বিস্তার করে, সমস্ত বাধা ও গতি অতিক্রম করে, অনন্ত জীবনে অনন্ত স্থায়ী

কোড়ে স্থান পাবে। সেখানেও স্থির নহে। অমৃত্ত জীবন প্রবাহ চলিবে। এবং “ভক্তগণ কোলে ভগবতীকে” ক্রমাগত পেয়ে পেয়ে ধন্ত হবে।

শ্রীমদ্রামায়ণে যোগ্য।

চিকিৎসা ব্যবস্থা ভিন্ন তিনি একজন ভাল খেলোয়াড় ও ক্রিকেট খেলাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

(“আনন্দবাজার” হইতে উদ্ধৃত)

—৬—

## সংবাদ ১

### পরলোকে মেজর মুখার্জি।

(ইউরোপে ক্যাম্বেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের মৃত্যু)

জুরিচ (সুইজারল্যান্ড) হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উদ্যোগ গত সোমবার ১৫ই মে তারিখে, কলিকাতা ক্যাম্বেল হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী এম, বি, এফ, আর, সি, এস (এডিম) আই, এম, এস, মারা গিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

কিছুকাল বাবু মেজর মুখার্জীর স্বাস্থ্য ভাল যাইতে ছিল না। স্যার নীলরতন সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ পরীক্ষার পর তাঁহার বন্দা হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিছুকাল দার্জিলিংএ বায়ুপরিবর্তনের পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং অনেকের পরামর্শে চিকিৎসার্থে ইউরোপ গমন করেন। সঙ্গে তাঁহার পত্নীও ছিলেন। জুরিচের চিকিৎসকগণ তাঁহার পত্নীকে পরীক্ষার পর বলেন যে, বন্দা নহে, বক্তৃতের রোগ। ইতিপূর্বে বন্দা সন্দেহে কলিকাতায় যে চিকিৎসা হইয়াছে, তাহাতে উপকার না হইয়া বরং ক্ষতিই হইয়াছে। জুরিচ হইতে শেষ পত্রে মেজর মুখার্জী লিখিয়া জানান যে, তাঁহার অবস্থা লক্ষ্যপূর্ণ এবং যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

মেজর মুখার্জী স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জীর ভ্রাতৃপুত্র রায় বাহাদুর মতিলাল মুখার্জীর পুত্র। প্রথমে তিনি সুবিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক এল, কে, লাহিড়ীর কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বি, এল, গুপ্তের কন্যাকে বিবাহ করেন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম, বি পাশ করিয়া তিনি বিলাত যাইয়া এডিনবরা হইতে এফ, আর, সি, এস, উপাধি লাভ করেন। ভারতে প্রত্যাগত হইয়া প্রথমেই তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থা আরম্ভ করেন। পরে বিগত মহাযুদ্ধের সময় এন্ডুলেন্স কোরে যোগদান করেন। যুদ্ধের পর ভারতীয়দিগের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন নিযুক্ত হন। কিছুকাল দিল্লি সার্জনও হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালের সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতীয়দিগের মধ্যে ক্যাম্বেল হাসপাতালেও তিনি সর্বপ্রথম এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ৩ পুত্র ও বিধবা পত্নী বর্তমান আছে।

জন্মদিন—গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ রাজা দিমেল্ল দ্বীপে, শ্রীমান বীরেন্দ্রনাথ বানার্জির শিশুকন্যা “লীলার” জন্মদিনে তাই অক্ষরকুমার লখ উপাসনা করেন। পিতা এই উপলক্ষে প্রচার তাওয়ায়ে ১১ দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও পিতামাতাকে আশীর্বাদ করেন।

নামকরণ—গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ মনোপ তটচাচী দ্বীপে, স্বর্গীয় শ্রীশঙ্কর দাসের পুত্র শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র দাসের প্রথম সন্তান শিশু কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠানে তাই অক্ষরকুমার লখ উপাসনা করেন এবং শিশুকে “আভারানী” নাম প্রদান করেন।

গত ২৪শে মে, নিউপার্কদ্বীপে, শ্রীযুক্ত নীহার সেন গুপ্তের শিশুপুত্রের নামকরণে, শিশুর দিদিমাহানীরা শ্রীমতী বিন্দুগানিনী সেন উপাসনা করেন এবং শিশুকে “শিশিরকুমার” নাম প্রদান করেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্বাদ করেন।

জাতকর্মা ও নামকরণ—গত ২৬শে মে, ময়ূরভঞ্জ-রাজপ্রাসাদে রাজাবাগে, নন্দগাঁওর রাজসাহেব শ্রীমান সর্বেশ্বর দাস বাহাদুরের এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজকুমারী ও মহারানী সূচাক দেবীর শ্রিয়তমা কন্যা রানীসাহেবা শ্রীমতী জয়তী দেবীর নবজাত শিশু রাজকুমারের জাতকর্ম ও নামকরণ অনুষ্ঠানে নবসংহিতাচুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন এবং রাজা-সাহেব নবসংহিতার প্রার্থনা ইংরেজীতে আবৃত্তি করেন। রাজকুমারের নাম “দিগ্বিজয়” রাখা হইয়াছে। উপলক্ষ্যে তাই প্রিয়নাথ মল্লিক আশীর্ষচন্দন উচ্চারণে ধাতুদুর্লভনন্দাদি দিয়া শিশুকে অভিনন্দন করেন। গত ২৫শে এপ্রিল এই শিশুরাজকুমার রাজাবাগ রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন। ভগবান্ শিশু রাজকুমারকে, পিতামাতা রাজসাহেব ও রানীসাহেবাকে এবং নন্দগাঁও রাজ্যকে আশীর্বাদ করেন। এই উপলক্ষে শিশুরাজকুমারের মাতামহী মহারানী শ্রীমতী সূচাক দেবী ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ১০০ টাকা দান করিবেন।

পারলৌকিক—আমরা গভীর দুঃখের সহিত, শোক-মহামুহূর্ত্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে:—

গত ১৫ই মে (১লা জ্যৈষ্ঠ) সুইজারল্যান্ডে, জুরিচ নগরে, কালীপুত্রের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের মহামমুহূর্ত্ত, কলিকাতা ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট,

পিতার উপযুক্ত গুণধর পুত্র, অস্বচিৎসায় স্নানপুণ, সর্বজন-প্রিয়, পরোপকারী, বিনীত, অমারিক মেজর সত্যোজনাথ মুখোপাধ্যায় ৫১ বৎসর বয়সে, প্রায় অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা মাতা, তিনপুত্র, দ্বিতীয়া পত্নী, ভাই বোন, বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (২৮শে মে) কালীপুরে, ২৯নং হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনস্থ ভবনে, তাঁহার আদ্যাশ্রদ্ধ জ্যৈষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অমিরকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক নবসংহিতাহুগারে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়-কুমার লখ উদ্বোধন ও আরাধনা, ডাঃ সত্যানন্দ রায় শাস্ত্রপাঠ এবং ভাই শ্রিয়নাথ মল্লিক অমৃত্যুচেন্নের শাস্তিবাচন অংশ সম্পন্ন করেন। এই পবিত্র অমৃত্যুচেন্নে বন্ধুবান্ধব অনেকেই যোগদান করিয়া, পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা ও শ্রীতি অর্পণ করিয়াছেন। এই অমৃত্যুচেন্নে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ১০০, নববিধান সমাজ ১০০, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০০, ব্রাহ্মবিলিক ফণ্ড ১০০, কালী বোবা স্কুল ৫০, অরু স্কুল ৫০, *Little Sisters of the Poor* ৫০, অনাথ-আশ্রম ৫০, প্রমথলাল শিক্ষার্থী ৫০, পুরী নববিধানমন্দির ৫০, এবং ক্যাথল *Poor Fund* ১০০ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৫ই মে, ময়মনসিংহে, স্বর্গীয় বিহারীকান্ত চন্দ্রের পৌত্র, শ্রীবৃদ্ধ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের বর্তমান জ্যৈষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুশান্তকুমার বহুদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, ২১ বৎসর বয়সে, পিতামাতা, ভাই বোন, আত্মীয় স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরজননীর কোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। গত ২১শে মে, ময়মনসিংহে তাঁহার আদ্যাশ্রদ্ধ নবসংহিতাহুগারে সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার শ্রীবৃদ্ধ নিরঞ্জনদাস উপাসনা করেন। এই অমৃত্যুচেন্নে কলিকাতা নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২০, ময়মনসিংহ নববিধান সমাজে ২০, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২০, টাকা নববিধান সমাজে ২০, পাটনা নববিধান সমাজে ২০, গিরিধি নববিধান সমাজে ২০ টাকা এবং গরিবদিগের ৮০ টাকার চাউল দান করা হইয়াছে।

গত ৪ঠা মে, ভাগলপুরে, তত্ত্ব সাধক স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী মনোমোহিনী বসু স্বর্গারোহণ করেন। গত ২১শে মে, গোলকুটিতে, স্বকীর ভবনে, তাঁহার আদ্যাশ্রদ্ধ নবসংহিতাহুগারে সম্পন্ন হইয়াছে। কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীবৃদ্ধ নিরঞ্জন নিয়োগী উপাসনা করেন। মধ্যম পুত্র ডাঃ প্রেমসুন্দর বসু ভক্তিমতী মাতৃদেবীর স্মরণ জীবনী বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করেন। ভাগলপুরের অনেকেই পবিত্র অমৃত্যুচেন্নে যোগদান করিয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মা সকলকে তাঁর অনন্ত প্রেমবক্ষে নিত্য শান্তিতে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ শোকার্তজনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সাহায্য বিধান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ১২ই মে, পুরীর নবগত, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ অর্থাৎ দে মহাশয়ের আমন্ত্রণে, তাঁহার গৃহে ভাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন। মিঃ দে নিজে সঙ্গীত করেন।

গত ১৬ই মে কটকে গিয়া মধুতবনে প্রাতে এবং ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওর পরিবারে সন্ধ্যায় আমাদের ভাই উপাসনা করেন। আরো কয়েক বাড়ীতে প্রার্থনা ও প্রসঙ্গাদি করেন।

পুরীতে নবশ্রীক্ষেত্রে শ্রীবৃদ্ধসমাগম—গত বৈশাখী পূর্ণিমায়, ২৫ই মে, মঙ্গলবার, পুরী নবশ্রীক্ষেত্র নবপর্ণকুটীরে বিশেষ ভাবে শ্রীবৃদ্ধ-সমাগম সাধন হয়। প্রাতঃকালীন উপাসনার পর, ভাই শ্রিয়নাথ ভিক্ষার কুলি লইয়া, মোনাবলম্বনে সাতটা বাড়ী হইতে দক্ষিণ-সেবার জন্ত চাউল পরসাদি ভিক্ষা সংগ্রহ ও দাতা-দিগের দ্বারে দ্বারে প্রার্থনা করেন। সপ্ততদিন নির্দ্বৈত ধ্যান চিন্তাদিতে যাপন করিয়া, সন্ধ্যায় সামাজিক ভাবে কয়েকটি পরিবার সঙ্গে ভাই শ্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন। ভ্রাতা প্রফেসর শ্রীমান্ পুণ্যোজনাথ মজুমদার “সাধুসমাগম” হইতে আচার্য্য-দেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসর ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্মিণী ও কন্যা মধুর সঙ্গীত করেন।

সাম্বৎসরিক—গত ২৫শে এপ্রিল, দেবদ্বাদশে, ২৪নং লিটন রোডে, স্বর্গীয়া সারদাসুন্দরী ঘোষের ৪র্থ সাবৎসরিক উপলক্ষে, শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমতী সরলা মজুমদার প্রভৃতি কল্যাণ মাতৃদেবীর পুণ্যস্মৃতিতে প্রচারভাণ্ডারে ৪০ এবং মৃতের প্রমথলাল আশ্রমের জন্ত ৪০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২০শে মে, গঙ্গামের অন্তর্গত সমুদ্রতীরস্থ গোপালপুরে, শ্রীবৃদ্ধ মনোমোহন দের প্রবাসভবনে, তাঁহার স্বপুত্র স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের সাবৎসরিক উপলক্ষে শ্রীবৃদ্ধ বৈষ্ণোমাধব দাস উপাসনা করেন এবং কণ্ঠবীর, চিন্তাশীল, আদর্শবাদী তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া সারগর্ভ উপদেশ দান করেন। মনোমোহন বাবু সহধর্মিণী হৃদয়ের আবেগে প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে মে, শান্তিকুটীরে, নববিধানের পেরিতপ্রবর বিশ্ব-ভ্রমণে বিধানবার্তা-ঘোষণাকারী প্রজ্ঞেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সাবৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী সুধা দেবী সঙ্গীত করেন। সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে স্মৃতিসভা হয়। স্মৃতিসভার বিবরণ পরে দেবার ইচ্ছা রহিল।

## ভ্রম-সংশোধন।

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্মতত্ত্বের ১০২ পৃষ্ঠার “চয়ন” শীর্ষক প্রস্তাবে, স্বর্গগত ভক্তিতাজন ভাই প্রতাপচন্দ্রের Heart Beats হইতে যে কয়েকটি অমৃতবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে Love এর অন্তর্গত ৫ম ছন্দে “সুখশান্তি”র স্থানে “সুখাসক্তি” হইবে।

Edited on behalf of the Apostolic Durban New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেস”, উপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত।





# ধর্মতত্ত্ব

অবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ সূনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনন্দরম্ ॥  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ত্র্যৈক্যেরবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।  
১২শ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

30th June, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা।

মা নববিধানেশ্বর, তুমি তোমার অপার করুণা-  
গুণে আমাদেরকে নববিধানে বিশ্বাসী করিয়াছ। বর্তমান  
যুগ বা নবযুগের সকল মানবের মুক্তির জন্তই যে এই  
নবযুগধর্ম নববিধান আনিয়াছ, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে  
বিশ্বাস করি; কিন্তু ইহার সকল তত্ত্ব, সকল তাৎপর্য কি  
সম্যক রূপে আমরা শিখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি?  
তবে কেমন করিয়া আমরা অপরকে তাহা শিখাইব?  
বস্তুতঃ আমরা ত্রুটিশীল। নববিধানের প্রবর্তক যিনি,  
তিনিও যখন আপনাকে চিরশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন,  
তখন আমরা কে যে, আমরা অশ্রুকে শিক্ষা দিব, অশ্রুর  
কাছে গুরুগরি করিব? এই বিধানে একমাত্র গুরু,  
মা, তুমি; তুমি না শিখাইলে তোমার কোন মানবসন্তান  
কাহারও কথা শুনিবে না, কেহ “পরের মুখে বাল  
খাইবে না”, ইহাই তুমি বিশেষ ভাবে বিধান করিয়াছ।  
কেন তবে আমরা কাহাকেও শিখাইতে যাই? তাহা  
করিতে যাওয়া আমাদের ‘অহং’ ভিন্ন আর কিছুই ত নয়।  
সে অহংকার তুমি আমাদের দূর কর। আমাদের দীন  
বিনীত শিষ্যপ্রকৃতি দাও। আমরা কাহাকেও শিখা-  
ইতে আসি নাই, আসিয়াছি কেবল শিখিতে। আচার্য্য

যেমন বলিলেন, “আমি শিখিলেই শিখান হইবে।”  
ইহাই সত্য কথা। আমরা নিজ জীবনে যাহা শিখিয়াছি,  
তাহাই যেন বলি। বিশেষতঃ তুমি যেমন অনন্ত, তোমার  
বিধানও তেমনি অনন্ত; তাই আমাদের যে এখনও কত  
শিখিতে হইবে, কত জানিতে হইবে, তাহা কি আমরা  
জানি? তুমি যে নিত্য নিত্য নূতন নূতন পাঠ দিয়া আমা-  
দিগকে নববিধানতত্ত্ব শিক্ষা দাও; কেন না তুমি জান,  
আমরা কত অহংকৃত, প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে অনিচ্ছুক,  
ইহার গভীর জ্ঞান আরম্ভ করিতে কত অক্ষম। এই জগৎ  
প্রকৃত শিক্ষার্থী না হইলে এবং তোমার শিক্ষা আশ্রয়,  
জীবনগত, চরিত্রগত না করিতে পারিলে, তুমি কাহাকেও  
কিছুই শিক্ষা দাও না। অতএব, মা, আমরা নিজে  
সম্যক জ্ঞান লাভ না করিয়াই যে অপরকে উপদেশ দিতে,  
শিক্ষা দিতে যাই, এই যে আমাদের অহমিকা, ইহা  
নিবারণ কর। আমরা যেন তোমার চির দীন শিষ্য হইয়া,  
সকলকার পদানত হইয়া, কেবলই শিক্ষার্থী হই এবং  
নিত্য নিত্য জীবনের সাধনে তুমি যাহা শিখাইবে, তাহাই  
শিক্ষা করিয়া নববিধানের সেবা করিবার উপযুক্ত হই,  
মা, দয়ী করিয়া আমাদেরকে তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ !

শান্তিঃ !!

শান্তিঃ !!!

## শ্রীকেশবচন্দ্র ও নববিধান।

শ্রীকেশবচন্দ্র কে? নববিধান কি? এবং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি? এ বিষয়ে যে আমাদের এখনও কত শিথিলতা ও জ্ঞানবিহার বাকী আছে, তাহা বলিতে পারি না। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমাদের যাহার যাহা জ্ঞান, যাহার যাহা ধারণা, তাহাই যে সম্যক নহে, ইহা জানিয়া, অশ্রুত উপর আমাদের মত চাপাইতে যেন চেষ্টা না করি।

শ্রীকেশবচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে তাঁর মাকে বলিলেন, “আমি যে কে, তাহা চিনাইয়া দিবে না?” আবার অশ্রুত বলিলেন, “আত্মপরিচয় দিলাম অনেক দিন, কিন্তু এ আত্মা পরিচিত হইল না; একজনের কাছে এক রকম আমি, আর একজনের কাছে আর এক রকম। হৃদয়ের ঠাকুর, ইহারা বলিতে পারিলেন না, কে আমি, কি আমি। ইহাদের বুঝাইয়া দাও, আমি কে?” ইহা দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হয়, ঈশ্বর না বুঝাইলে কি আমরা বুঝিতে পারি? সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীর ভাবে স্বয়ং ঈশ্বর গুরু নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা-যোগে আলোক লাভ বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে প্রয়াসী হইলে, তবে বুঝিতে ও জানিতে পারিব; এবং তিনি যাহা বুঝাইয়া ও হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে, তাহাই অনন্ত হইবে। তাই আচার্য্যদেব সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, “বুদ্ধি খাঁড়া দিয়া আমাকে কাটিও না। বুদ্ধির শুক ভূমিতে আমাকে রাখিও না”।

তাঁহার নিজের কথার গ্রহণ-সম্বন্ধে যদিও বলিলেন, “আমি বাণী শুনিয়া বলি, বানিয়ে বলি না,” তথাপি বলিলেন, “আমার কথা মেনো না, যদি না পবিত্রাত্মার আলোতে মিলে।” সুতরাং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরালোকই আমাদের সকল তত্ত্ব বুঝিবার পথ-প্রদর্শক। এবং তিনি যতক্ষণ না বুঝাইবেন, আমরা কেহ কাহাকেও কোন সত্য বুঝাইতে পারিব না।

শ্রীকেশবচন্দ্র ও নববিধান সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে এখনও যথেষ্টই মতভেদ বা ভাবভেদ রহিয়াছে, দেখিতে পাই। এ সম্বন্ধে শ্রীকেশব স্বয়ং তাঁর ঈশ্বরের নিকট বলিয়াছেন, “প্রেমের হরি, যদি ইহারা পাঁচ পথে না গিয়া এক পথে যান, তবে বুঝাইতে পারি, যা' কিছু না বুঝিয়াছেন”। বাস্তবিক আমরা এই পাঁচজনে পাঁচ পথে যাইতেছি বলিয়াই, শ্রীকেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে

পারিতেছি না, নববিধান কি, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না, এবং নববিধানবাদী হইয়াও নববিধান জীবনে লাভ করিতে পারিতেছি না। কারণ নববিধান কেবল মতে বুঝিবার বিধান নয়, ইহা জীবনে সাধন ও সন্তোষের বিষয়। তাই “নববিধান নববিধান” যাহা বলেন, তাহাই যে নববিধান গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না।

আসল কথা এই, ব্রাহ্মসমাজ এক ঈশ্বরকে উপাসনা সাধন করিতেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তাহা লইয়াই ইহা নিবদ্ধ। ঈশ্বরের উপাসনার পূর্ণতাসাধন মানবপ্রীতি-সাধনে হয়। তাহা কার্য্যতঃ করিতে হইলে, ঈশ্বরের সহিত ঈশ্বরের সম্মিলনকেও গ্রহণ করিতে হয়। ব্রাহ্ম-সমাজ এখনও সম্যক ভাবে বা কার্য্যতঃ ইহা করিতে পারেন নাই। এই জগতই নববিধানে যাহা অভিযান্ত্রিক হইল, তাহা গৃহীত হইল না; এবং তাহা গৃহীত হইল না বলিয়াই, শ্রীকেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মসমাজে গৃহীত হইলেন না। কেশব পাছে ঈশ্বরবতার বলিয়া গৃহীত হন এবং নববিধানও কেশব-কেন্দ্রীভূত হয়, এই আশঙ্কা অনেকেরই আছে।

কিন্তু যদি নববিধানের গূঢ় তাৎপর্য্য আমরা বুঝি এবং নববিধানের ঈশ্বর যে জীবন্ত ঈশ্বর, ইহা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে কখনই এ সকল আতঙ্ক আমাদের মনে আসিতে পারে না। কেন না, জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধানে কোন মানুষের মানবীয়তা কখনই গণ্ডী দিতে পারিবে না। জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী যিনি, তিনি নিশ্চয়ই নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করিবেন, কোন মানুষ কখনও ঈশ্বরের সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবে না। আবার পবিত্রাত্মার জীবন্ত বিধানেও যিনি বিশ্বাসী, তিনিই বা কেমনে বিশ্বাস করিবেন, কোন মানুষে জীবন্ত বিধান কেন্দ্রীভূত হইবে? পবিত্রাত্মার অনন্ত প্রবাহ কি হিমালয়ও আটকাইতে পারে।

ঈশ্বর যেমন অনন্ত, তাঁহার বিধানও তেমনি অনন্ত; অনন্ত বিধান-স্রোতঃ কি কখনও কোন মানবীয় গণ্ডিতে নিবদ্ধ হইতে পারে? নব নব জীবনের অনন্ত অভি-যান্ত্রিকই যে নববিধান। সুতরাং প্রকৃত বিশ্বাসী হইলে আমাদের কোন কিছুতে আতঙ্ক হইবার কারণ নাই।

এই সঙ্গে ইহাও আমাদেরকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিতে হইবে, “Unless the spirit is made flesh

no man seeth.” আত্মা আকার না ধরিলে কেহ দেখিতে পায় না। নিরাকার ঈশ্বর তাঁহার সন্তান বা ভক্তজীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়া জগৎকে দর্শন দান করেন। সাকার সৃষ্টি নিরাকারের প্রকাশ, ইহা স্বীকার করিলে কি মানুষকে পূর্ণব্রহ্ম দিতে হয়? প্রকৃত বিশ্বাস বা প্রকৃত ভক্তি তাহা করিতে সলে না। ঘাঁহার বাহা প্রাপ্য, তাঁহাকে তাহা দিতেই হইবে, আতিশয্য হইলেই ভ্রান্তি আলিবে। অত্যাধিক কখনই নয়।

বিধান মানিতে হইলেই, বিধানের মানুষকেও মানিতে বা স্বীকার করিতে হইবে। মানুষ বিনা বিধান হয় না। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস যখন জীবনে সাধিত হইল, তখনই নববিধান হইল। নববিধান মানে নব জীবন, নিত্য নিত্য নব নব জীবন। এই নববিধান যখন এক জন মানুষে মুর্ত্তিমান হইল, তখনই ইহা নববিধান বলিয়া ঘোষিত হইল। নববিধান কেবল আকাশকুসুম বা মত বা শব্দ মাত্র নয়। এই নববিধান ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশব-চন্দ্রের জীবন।

তিনি অপূর্ণ মানুষ, আমরা জানি; কিন্তু তাঁহার জীবন অধিকার করিয়া, তাঁহার মানবীয় অপূর্ণতা, পাপ-প্রকৃতি, দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা সস্বৈর, জীবন্ত ঈশ্বরই যে তাঁহাকে নববিধানবাহকরূপে দাঁড় করাইয়াছেন, তাঁহাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া, তাঁহার জীবনকে নববিধানের ছাঁচে শৈশব হইতে শেষ নিখাস পর্যন্ত ঢালাই করিয়া গঠন করিয়াছেন, এবং বর্তমান যুগে কেমন করিয়া নববিধান জীবনে পাইতে হয়, নববিধানকে জীবনে সাধন ও প্রতি-ফলিত করিতে হয়, তাহাই দৃষ্টান্তরূপে দেখাইয়াছেন।

তিনিও ঈশ্বর-সন্নিধানে বলিলেন, “যদি এ জীবনে নববিধানের কিছু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া থাক, তবে ইহারা একজনকে বন্ধু করিয়া বরণ করিয়া হৃদয়ে লইয়া যান।” আরো বলিলেন, “মানুষ যদি না হয়ে থাকে কেউ নববিধানের ভিতর, সব মিথ্যা। মোহাই, হরি, দৃষ্টান্ত দাও, মানুষ দেখাও। গরীব বলিতে চায় যে, ঈশা, মুঘার বিধানের সঙ্গে এ বিধান মিলেছে, যদিও স্তম্ভতা আছে। এ গরীব বলিতে চায়, কাল পাপী বাঙ্গালী সিদ্ধ হইয়া আসে নাই, মহাপুরুষদের সঙ্গে কিছুতেই তুলনা হয় না। কিন্তু সে অপ্রেমিক ছিল, প্রেমিক হইল; সাম্প্রদায়িক ছিল, হইল সার্বভৌমিক; কাপ মলিন ছিল, ক্রমে জ্যোতির্গয় হইল; কঠিন ছিল,

কোমল হইল। সাধুদের পদধূলি শরীরে মুখে সে মেখেছে; তোমার প্রসাদে, তোমার নববিধানের প্রসাদে অনেক সাধন করে, অনেক কেঁদে, অনেক কষ্ট করে নববিধান পেয়েছে। আমার জীবনের পরিবর্তন সকলের অশা-প্রদ। আমি নিশ্চয় বলছি, আমার জীবন দেখ, বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র চন্দ্র হবে। নারকী উদ্ধার হন্তে পারে, এ যদি দেখিতে চাও, তবে জাহ্নবী, এই বন্ধুকে লও, সঙ্গে রাখ। জগৎ সংসারকে ভালবাসিব, বিরুদ্ধ ধর্ম-শাস্ত্রকে এক করে নেব। সমস্ত সাধুদের হৃদয়ে রাখিব। ক্ষমা প্রেম দেব। সর্ববাসুসুন্দর নববিধানের দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই। স্বদেশ বিদেশকে, হিন্দু মুসলমানকে, তেল জলকে, সকল ধর্মকে মিলাইতে চাই। আমি পাপী হয়ে পুণ্যাত্মা হতে চাই না। আমি সিদ্ধ হয়ে জন্মেছি, তা বলছি না। আমি এই একটা আশার কথা বলিতে চাই যে, একটা খুব পাপী ছিল, মার প্রসাদে তার জীবনে খুব পরিবর্তন হয়েছে। হয় নি যা, তা হবে। অসম্ভব যা, তাও হবে। একটা কাল ছেলে সুন্দর হয়েছে, একটা ছেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাচ্ছে।”

কেশবচন্দ্র বা, নববিধানের নবজীবনও তা। তাঁহার দৃষ্টান্তে পাপী হয়েও আমরা সুন্দর হতে পারি, কাল ছেলে হয়েও অনন্ত উন্নতির পথে মার কাছে দৌড়ে যেতে পারি, ইহাই দেখাইতে নববিধান অতীর্ণ। ইহাই ত দেখাইলেন জীবনের সাধনায় শ্রীকেশবচন্দ্র। নববিধানের মানুষ বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করার অর্থ, তাঁহার সঙ্গে এক হওয়া, তাঁহার সঙ্গে একাত্ম হইয়া নববিধানকে জীবনে মুর্ত্তিমান করা, নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বরের দ্বারা গঠিত হইতে আত্মসমর্পণ করা এবং অনন্ত নববিধানের অনন্ত জীবনে “মার কাছে দৌড়ে” যাওয়া।

কেশব বাহা হইয়াছেন, তাহা নিজ পুরুষকারে হন নাই; স্মরণ্য তিনি যে ব্রহ্মকৃপায় ও যে পবিত্রাত্মার বলে হইয়াছেন, আমরাও সেই ব্রহ্মকৃপায় ও সেই পবিত্রাত্মা-প্রভাবে হইব। আমরাও কেবল পুরুষকারসাধনায় হইব না। সেই একই ব্রহ্মের যে অনন্ত স্রোত নব-বিধানে প্রবাহিত, সেই অনন্ত স্রোতে কেশবকেও বিধাতা গা ভাসাইয়া দিয়াছেন, আমাদেরও ভাসাইবেন, ইহাই নববিধান। মানবীয় পুরুষকারের সীমায় যখন নববিধানসাধন আবদ্ধ নয়, ইহা যখন বিধাতার বিধান,

অনন্তের বিধান, তখন ইহা কোন সীমা বা গণ্ডিতে বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ?

কেশব বাহা হইয়াছেন, তাহা হওয়া আমাদের কোন রূপেই সম্ভাবনা নাই, ইহা যদি মনে করিতাম, তবে নব-বিধানকে কেশব-কেন্দ্রীভূত করিতে পারিতাম। প্রকৃত নববিধানবিশ্বাসীর পক্ষে তাহা অসম্ভব; কেন না, নব-বিধানবিশ্বাসী মাত্রই বিশ্বাস করেন, এ বিধানে মানুষের হাতে ধর্মজীবনগঠন নয়, পবিত্রাত্মার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা Self-consecrationই নববিধান। তাই কেশব বলিলেন, “আপনার হাতে ধর্ম যার, তার কুপ্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবেই। দয়াসিদ্ধি, ধর্মসাধন তার ক্ষমতার অতীত করিয়া দাও।” ইহাই ত নববিধানের কথা।

যাঁর জীবনে নববিধান মূর্তিমান হইল, সেই কেশবের সঙ্গে এক হয়ে বা সকলে “কেশব” হয়ে, কেশব যেমন বলিলেন, “এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন, তেমনি সকলে এক হয়ে, এক মনুষ্য প্রাপ্ত হয়ে, বিধান-সাগরে ভাসিতে থাকি এবং তোমার প্রেমের জ্যোৎস্নায় খেলা করিতে থাকি”, তেমনি নববিধান সাধন করিলে, আর “সীমা অন্তরেখা নাহি যার দেখা”—এক সিদ্ধিতে সব বিন্দু মিশিয়া একাকার হইয়া যাইবে।

## ধর্মতত্ত্ব ।

### ভ্রমের আত্মদান ।

বাইবেল শাস্ত্রে আছে, “ঈশ্বর মানবকে এতই প্রেম করিলেন যে, তিনি তাঁহার একমাত্র আত্মজাত সন্তানকে দান করিলেন; যেকোনো তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিবে, সে অমর জীবন প্রাপ্ত হইবে।” ঈশ্বরের সন্তানত্বদান নিশ্চয়ই ঈশ্বরের মানব-প্রেমের পরম দান। কিন্তু নববিধানে তদপেক্ষা অধিকতর দান এই যে, তিনি মানবকে আপনাকে দান করিয়াছেন। মানব তাঁহাকেই সর্ব্ব বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহার বাহা কিছু পাইবার সকল পাইবে, তাহার পক্ষে অশ্রাব্য কিছুই থাকিবে না। তিনি আনাদিগকে একেবারে আপনাকে দিয়া দিয়াছেন। স্বর্গ এবং পৃথিবীতে এক তিনি তির এমন বস্তু আমাদের কি আছে? আর এমন বস্তু করতলস্থ হইলে, কিসের আর অভাব? তিনি নিজে যে আমাদের সব হইয়া সব করিতেছেন এবং সব ক্রুর বহন করিতেছেন। ইহা সহজে উপলব্ধি করিতে তিনিই দিয়াছেন।

### দীক্ষা ও বিবাহ ।

নবসংহিতার বিধি এই যে, বালকবালিকাগণ বাল্যশিক্ষা সমাপন করিয়া ধর্মপ্রবেশের উপযুক্ত বিবেচিত হইলে, বোড়শবৎসর বয়ঃপ্রাপ্তিতে বিবাহের পূর্বে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। কিন্তু এখন দেখা যায়, অনেক পরিবারে ছেলে মেয়েদের বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পূর্বেই যেন কোন রকমে বিধিরক্ষার জন্য দীক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়। নবসংহিতাপালন সম্বন্ধে নববিধানবিশ্বাসিগণের শৈথিল্য অমার্জনীয়। যদিও ইহার অক্ষর আমাদের অমূল্যগীত নয়, ইহার ভাবই গ্রন্থী ও পালনীয়, কিন্তু সে সম্বন্ধেই বা নিষ্ঠা আমাদের কোথায়? অনেকে আবার দীক্ষার প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করেন না। বাস্তবিক বিবাহের পূর্বে দীক্ষার বিধির তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে নববিধানের ঈশ্বর ও ইহার মূল সত্যে বিশ্বাসবীকারপূর্ব্বক মণ্ডলী বা বিধান-পরিবারে অঙ্গরূপে গ্রহিত না হইলে, কেমন করিয়া কোন ব্যক্তি নববিধানের সংসারপত্তনে অধিকারী হইবে? ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপুত্র বা ব্রাহ্মকণ্ঠা বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে না পারিলে, কোন্ পাত্র পাত্রী পরস্পরকে ধর্মনিষ্ঠ পতি পত্নী রূপে বরণ বা গ্রহণ করিতে পারেন? অগ্রে ঈশ্বরবিশ্বাসী যিনি হইয়াছেন, তিনিই কেবল বিবাহমন্ত্রে বলিতে পারেন, “আমার হৃদয় তোমার হটক, তোমার হৃদয় আমার হটক, এবং আমাদের উভয়ের মিশ্রিত হৃদয় ঈশ্বরের হটক।” এই নিমিত্ত বিবাহের বহুপূর্বেই বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ কালেই, ছেলে মেয়েদের দীক্ষা দান করা নিতান্ত কর্তব্য। বিদ্যালয়শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে মেয়েদের প্রার্থনা-সাধন ও উপাসনা-সাধন শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা হয় না বলিয়াই, আমাদের ছেলেমেয়েরা ধর্মবিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল হইবার উপক্রম হইয়াছে। পিতামাতাগণ এ বিষয়ে চিন্তা করুন।

### জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ।

সাধারণ চলিত কথায় “জন্মের” পর “মৃত্যু”, তাহার পর “বিবাহ” এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহার কারণ নির্দেশ করিয়া ইহা উপলব্ধ হয়, যদিও বিধাতার পার্থিব বিধানের প্রথমে জন্ম, তাহার পর বিবাহ, তাহার পর মৃত্যু সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু অধ্যাত্ম বিধানে জন্মের পরই দৈহিক জীবনের বা আশিষের মৃত্যু সংসাধিত না হলে প্রকৃত বিবাহসুষ্ঠান হয় না। “আমি আমার” বলিদান বা ত্যাগ না করিলে কই প্রকৃত বিবাহ হয়? বিবাহের অর্থ, এক অন্তকে বিশেষ রূপে বহন করিবে। পাত্র পাত্রী বিবাহের পূর্বে যে তার নিজে নিজে বহন করিতেছিলেন, বিবাহকালে আপনামর বাহা কিছু ত্যাগ করিয়া অপরকে তারগ্রহণে আত্মসমর্পণ করিবেন।

কথার পক্ষে ত ইহা বিশেষ ভাবে সাধিত হয়। তিনি তাঁর নিজ গোত্র, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করিয়া বরকে আশ্রয় দান করেন; বরও সর্কাপেক্ষা অধিক ভালবাসা আপন পত্নীকে অর্পণ করেন। পুরাণের আখ্যানিকা—যোগী শিব মৃত সতীকে স্বক্ষে লইয়া বহন করিয়াছিলেন, কোলে লইয়া যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। সতী পতির যোগ-বিলন-সাধন এইরূপই। বিবাহের অপর কথা উদাহ, উর্দ্ধে বহন করা। কেবল শরীরিক ভার বহন নয়, আত্মাকে উর্দ্ধে বহন করাই প্রকৃত উদাহ। পরস্পর পরস্পরকে ধর্মসাধনার উর্দ্ধগামী করিবেন। পাপ ব্যভিচারের সম্ভাবনা উচ্ছেদ করিয়া নরনারী পরস্পরকে নীতিতে, ধর্মেতে, প্রেমেতে, যোগেতে সমুন্নত করাই বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে স্বর্গের প্রেম-পরিবার, স্থলী পরিবার স্থাপন করিতেই বিবাহ নির্দিষ্ট। জন্মগত আমিষ ও বার্থ-পরতার মৃত্যু না হইলে, কি প্রকৃত স্বর্গীয় বিবাহ হয়? চুই অর্দ্ধাঙ্গি আত্মা একাত্ম হইয়া পরমপতি পরমাত্মার আত্মসমর্পণই বিবাহের পরিণতি। ইহাই প্রকৃত উদাহ। পার্থিব সকল বিবাহ যেন এই উদাহে পরিণত হয়।

## নির্সাক শক্তি।

জীবন একটা মহাশক্তি, একটা দৈবশক্তি! কোন্‌ স্রষ্টা ধরিয়। এই শক্তি মানবের অন্তরে অবতীর্ণ হয়, তাহা আমরা অবগত নহি। তবে শক্তির বাহ্য প্রকাশে যে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তাহার সাক্ষ্য প্রমাণ আমরা, প্রাপ্ত হই। যেখানে জীবন আছে, অথচ সৃষ্টি নাই, সেখানে বৃত্তিতে হটেবে যে, জীবন শক্তিহীন, প্রাণহীন অথবা মৃতকল্প। মৃতজীবন কখন ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। জ্যোতিক-মণ্ডলী হইতে যেমন আলোকধারা পৃথিবীকে শোভা সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করে, জীবন হইতে সেইরূপ নূতন জ্যোতিঃপাতে সংসারের কুস্মাটিকায় অন্ধকার বিদূরিত হয়।

জীবনে নূতন শক্তি কোথা হইতে আসে? এই শক্তির মূল কি? নূতন ভাব (idea) বা নূতন আদর্শ। এই আদর্শ নূতন প্রাণ হইয়া শরীর ও মনে নূতন শক্তি সঞ্চার করে। তখন শক্তি শতধা হইয়া নানা প্রতিষ্ঠানের ভিতর নিজের রূপ ফুটাইয়া তোলে। “Life begets life” একটা আদর্শ জীবন অল্প একটা আদর্শ জীবনের জন্মদাতা। একটা জীবন হইতে দশটা জীবন উৎপন্ন হয়, দশটা হইতে শত সহস্র জীবন জন্মলাভ করে। যৌবন তাহার অরূপকে নব নব জন্মে ফুটাইয়া তোলে। উদ্ভিদ লতা পল্লব যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তখনই তাহা ফল ফুলে ফুটিয়া উঠে জীবজগৎ এই নিয়মের অধীন। আত্মিক জগতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না।

কথা জীবনের রূপ বা বাহ্যবস্তু। কথার প্রাণ আছে,

কথার শক্তি আছে, কথা রক্তমাংস ভেদ করিয়া স্পর্শ করিতে পারে, কথা জীবনবেদ হইয়া, জীবনভাগবত হইয়া অক্ষর শাস্ত্র রচনা করে, কথা আরাধনার জীবন্ত দ্রব্য। মস্তিষ্ক ভগবানের সঙ্গে ভক্তের নিগূঢ় যোগ নিবদ্ধ করে। মস্তিষ্ক সাধনার প্রথম সোপান।

কথা অসাড়, প্রাণহীন ও নির্জীব হয় কখন? যখন জীবন হইতে কথা বিভিন্ন হয়, যখন জীবন একরূপ, আর কথা অপরূপ। সাগরের অবিশ্রান্ত স্রোতের উচ্ছৃঙ্খিত প্রকাশ তাহার তরঙ্গ। সেইরূপ প্রাণের উদ্ভূত ভাবের বাহ্যপ্রকাশ বাহ্য। কথা ভাব-বহীন হইলে, অসত্য হইলে, জীবন হইতে পৃথক হইলে, সে কথা আর মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, শুক তৃণথণ্ডের তায় বায়ুতে উড়িয়া যায়। বজ্রগণ, তোমার আমার কথায় ক’জনের প্রাণ জাগ্রত হয়, ক’জনের প্রাণ উচ্ছৃঙ্খল হয়, ক’জনের প্রাণে আশার উদ্দীপনা আনে, ক’জনের প্রাণে নূতন আলোকের সন্ধান দেয়? অসার কথা মত সৃষ্টি করে, ভেদবুদ্ধি রচনা করে, মনস্তত্ত্ব আনয়ন করে; এজন্ত বোধ হয়, প্রাচীন সাধকেরা মৌনব্রত ধারণ করিতেন।

মৌনীর শক্তি অজেন্ন। শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া মৌনীর শক্তি ক্ষণপ্রভার মত বৈশ্ভাতিক আলোকে বিচ্ছুরিত হয়! নির্সাক সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা, যদি কথা আর জীবন এক না হয়। সৈন্যসাধ্যক্ষর তর্জ্জনী-হেলনে সহস্র সহস্র সৈনিক যেমন পরিচালিত হয়, মৃত্যুকে আদরে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ মৌনীর দৃষ্টি-সঞ্চালন সাধকের গতি নির্দেশ করে, চঞ্চল মন অচঞ্চল ও স্থির-লক্ষ্য হয়। মৌন সাধকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভিতরের প্রাণধারা যদি দুর্বল ও সংকল্পসাধনে বিরুদ্ধ হয়, তখন নির্সাক হওয়া প্রয়োজন। অসার কথা যেমন মনস্তত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সৃষ্টি করে, তদ্রূপ কথার সংঘর্ষে দুর্বল প্রাণ আত্মঘাতী হয়।

ধর্ম্মরাজ্যের আর একটা বিশেষ কথা অমুভূতি। প্রাণের ক্ষীণ অমুভূতি টুকুকে উজ্জ্বল করিতে হইলে, তাহাকে আকার দিতে হইলে, বাহ্যের সকল বিক্ষিপ্ত ভাব হইতে তাহাকে দূরে রাখিতে হয়। কথা ভাবকে বিক্ষিপ্ত করিবার অপরিহার্য্য অন্তরায়। ক্ষীণ অমুভূতিকে শরীর মনে আকার দিতে হইলে, মৌনব্রত প্রধান সহায়। নির্সাক না হইলে, লক্ষ্যহীন মন শক্তিসঞ্চয় করিতে পারে না। বহুক্ষণ আপনাতে আপনি স্থিতি না করিলে, ভাব ঘন হয় না, ভাব রক্তমাংসে পরিণত হয় না।

আপনার অমুভূতিতে আপনি তন্ময় হইয়া থাকাই সাধনার সিদ্ধি। উপাসনার সময় বহুভাবী হওয়া নিষিদ্ধ। এক একটা কথা এক একটা ভাবের উদ্দীপক। ভাব কথার জন্মদাতা। ভাবহীন কথা, আর প্রাণহীন দেহ ছইই পরিতাজ্য। যে কথার ভিতর সত্যের অমুভূতি নাই, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ অর্থ্যরূপে



বাবহার করা নিষিদ্ধ—পূজার সময় বুধা কথা উচ্চারণ করা মহাপরাধ। বুধা কথা পূজার মন্ত্র হইতে পারে না। মন্ত্রের ভিতর প্রাণ আছে, শক্তি আছে, আলোক আছে। কার্যমান মিলাইয়া সত্যের অমুভূতিকে বাক্যে প্রকাশ করাই মন্ত্র। সাধকের পক্ষে নির্বাক উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। উপাসনার সময় ভগবানের সহিত তত্ত্বের ভাবের বিনিময় হয়, তখন কথা আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, কথা বিষ় উপাদান করে, কথার ভাবের বিক্ষেপ হয়। কথার অমুভূতির ঘনত্ব লগ্ন হইয়া যায়। ভাবের মধ্যে গাঢ় স্থিতি বা ডুবিয়া যাওয়াই সমাধি। সমাধিস্থ হইলে রসোদয় হয়, নূতন সত্যের অমুভূতি দেহ মনকে নূতন রাজ্যে লইয়া যায়। সমাধির ভিতর যে রসের আবাদন, যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা অজ্ঞাত সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্বযুগে সমাজে একটা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। বিশ্বাস ও কর্মের ঐক্য সাধন করিতে গিয়া এই বিপ্লবের উৎপত্তি হয়। এটা ছিল সামাজিক বিপ্লব। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির সহিত বিশ্বাসের সামঞ্জস্য রাখিতে না পারলেই, একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সংঘর্ষের ফলে একদিকটা যেমন ভাঙিয়া যায়, সেইরূপ অন্য দিকটা গড়িয়া উঠে। এই ভাঙা গড়ার ভিতর সমাজ একটা নূতন আকার গ্রহণ করে। সেই নূতন আকারই বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ। ভৌতিক জগতে যেমন জলপ্লাবনে ক্ষেত্রের শস্যগুলি গচিয়া যায়, নির্মূল হইয়া যায় এবং প্লাবন অন্তর্হিত হইলে নূতন ভূগ ও শস্যাদি গজাইয়া উঠে, সেইরূপ সমাজেও নূতন পুরাতনের সংগ্রামে এমনি নূতন সমাজের অভ্যুদয় হয়। যেখানে সংঘর্ষ, সেখানেই প্রলয়; যেখানে প্রলয়, সেইখানেই নব সৃষ্টির সঞ্চার। কিন্তু বাহিরের প্রতিষ্ঠান পৃষ্ঠ ও পরিবর্দ্ধিত হয়, ব্যক্তিগত জীবনের সংস্কার হইতে। ব্যক্তির (Individual) জীবনে যদি উন্নতি বন্ধ হইয়া যায়, অথবা যে পরিমাণে ব্যক্তিগত জীবনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে সমাজজীবন আহত হয়, সেই পরিমাণে সমাজের প্রাণধারা গতিহীন হয়। ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চ বিশ্বাস, সুনীতি, নব নব সত্যের অমুভূতি ও আত্মতত্ত্বের সহিত কর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্ত একটা অবিরল সংগ্রাম উপস্থিত হইবেই। এই সংগ্রামের ফলে জীবনে প্রতিনিয়ত ভাঙা গড়া চলিতেছে। এই ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়া ব্যক্তির জীবন যত নূতন রূপ ধারণ করিতেছে, মণ্ডলীও তার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ রূপ পরিবর্তন করিতেছে।

ছোট ছোট অসংখ্য ধারা মিলিত হইয়া যখন একটা প্রবল ধারা রচনা করে, তখন সেই প্রবল ধারাই একটা মহাবেগবান্ প্রপাত সৃষ্টিকরে। এক একটা মহাপরাক্রমশালী প্রপাতই বড় বড় নদীকে চিরসরগ করিয়া রাখিয়াছে; নদীর নিম্নতটী জনপদকে শস্যশ্যামলা করিয়া, নব নব দৌভাগ্যের চির মধুস্রাব

আবেষ্টনে, মানবের সকল অভাবের, অভিযোগের নিরাকরণ করিতেছে। ব্যক্তি মণ্ডলীকে বাঁচাইয়া রাখে। ব্যক্তির জীবনে অগ্রগতি রুদ্ধ হইলেই, মণ্ডলীর জীবন বা সমাজের জীবনও শুষ্ক ও মৃতকর হইবেই। বাহিরের দিক দিয়া যদি সমাজে কেহ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে চান, তবে তাহার সে চেষ্টা যে পদে পদে বিফল হবে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ব্যক্তির সাধনা, শিক্ষা, সেবা ও বিশ্বাস মণ্ডলীতে সঞ্চারিত হইবে; ব্যক্তি প্রাণ, মণ্ডলী দেহ। প্রাণহীন দেহের সহস্র চেষ্টায় জীবন রক্ষা করা যায় না বা ফিরিয়া আসে না। যেখানে বড় বড় ধর্মমণ্ডলী বা জাতি স্তম্ভ হইয়াছে, সেখানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তারার মূলে আছে ব্যক্তির সাধনা। মহর্ষি জৈন্য আদর্শে বড় বড় মার্টার্স যদি আত্মবলিদান না করিতেন, তাহলে খৃষ্টধর্ম একরূপ ভাবে প্রসারিত হইত না। যদি শ্রীবুদ্ধদেবের আণৌকিক ত্যাগ ও অসাধারণ মৈত্রীর স্পর্শে যুগযুগান্তর ধরিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সেবার আশীর্বাদে জগৎ পুষ্টি না হইত, তাহা হইলে আজ অর্ধ জগৎ জুড়িয়া বৌদ্ধ ধর্মের গোরব মহিমাম্বিত হইত না। ব্যক্তির জীবনের ধারাকে চির প্রবাহিত না রাখিলে, বাহিরের প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মণ্ডলীর জীবন রক্ষা করা অসম্ভব। ব্যক্তিই ছোট ছোট ধারা হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রস হইয়া, মণ্ডলীকে বা সমাজকে চির সরস করিয়া, চির সবুজ করিয়া রাখিবে। একত্র নির্জনে সাধনার বিশেষ প্রয়োজন। মানুষ যত কথা কম বুঝিবে, মৌনী হইবে, আপনার মধ্যে আপনি যত অধিক স্থিতি করিবে, ততই ভিতরে ভাব ঘনীভূত হইবে, সত্যের অমুভূতি আসিবে। তাহার প্রকাশ হইবে বাহিরে, মণ্ডলীতে, সমাজে বা জাতির মধ্যে। হে সাধক, নির্বাক সাধনার শক্তি উপলব্ধি কর। ইহা অজের ও ইহা প্রাণপ্রদ। ইহাই নূতন সৃষ্টির বীজ।

ঐক্যমাথ্যানাথ বন্যোপাধার।

## চয়ন।

(স্বর্গগত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের "Hearts Beats" হইতে গিরিধর শ্রীধর ডি, এন্, মুখার্জি কর্তৃক অনুবাদিত)

*Next Door*—না, আমি ঈশ্বরের সহিত এক গৃহে বসতি করি না; কিন্তু তিনি আমার অতি নিকট প্রতিবেশী। আমার গৃহের পাশেই তাঁহার গৃহ। যে মুহূর্তে আমি আপনাদের বাহিরে গমন করি, অমনি সেই পরম প্রতার জ্যোতির্ধর সত্তা দর্শন করি। আমি সেই সত্তার মধ্যে জন্মণ করি, তাহার সহিত যোগে মিলিত হই; কিন্তু নিজ গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই সত্তাকে পথ-প্রান্তে ছাড়িয়া আসি।

*Choice & Results*—বাচ্য হার ও সত্য, তাহাই কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে; বাহ্য কর্তব্য বলিয়া একবার গ্রহণ করিবে,

ভাষা দৃঢ়তার সহিত পালন করিবে, এবং ফলাফল জেথরকে সমর্পণ করিবে। কার্যের ফল ক্রটিং আমাদের আশা ও ইচ্ছা-রূপ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিণামে সকল ফল আমাদের অধীন হইয়া থাকে। তাহাতে তোমার সাংসারিক ক্ষতি হইল, তাহা ব'দ তোমাকে ধর্মরাজ্যে অগ্রসর করে, তবে তাহা মিতান্ত্র ক্ষতি নয়।

**Ambition**—হাঁ, দোনের দীন, একান্ত বজ্রবাক্যবচন, কথার বলা বার না এমন দরিদ্র; কিন্তু উৎসাহ, উদ্যম ও শক্তিতে পূর্ণ, আশা বিখ্যাসে উদ্ভীষ্ট এবং নিত্য শ্রমশীল—ইহাই আমার জীবনের আদর্শ। নীরবে গুরুভার বহন করিব, সকলের যুগিত, কিন্তু বিশ্বশ্রমে পূর্ণ,—অনন্তশক্তি পরমাত্মার সহিত সহকর্মী হইয়া নিজের ও আর সকলের পরিত্রাণের জন্য থাকিব। ইহাই আমার আদর্শ।

**Success**—যে ব্যক্তি নিজের আত্মাকে চিনিয়াছে, সেট জীবনে সফলতার গুঢ় মন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে। আপনাতত্ত্ব সফলতা কল্পনা কল্পনা দূর করিয়া দাও, তোমার বিদেশী শিক্ষা দীক্ষা ভুলিয়া যাও, তুমি সত্য হও। তোমার যে উচ্চতম অবস্থা, তাহাই তোমার নিত্য অবস্থা হোক; উপাসনা-কালে যখন ভগবানের বক্ষে বাস কর, তখনকার ভাব তোমার স্থায়ী ভাব হোক; তোমার জীবন সার্থক হইবে।

**Conquer**—আমি জয়লাভ করিবই করিব, আমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব, নির্ভীক বীরের মত এই সংগ্রামে আমি জীবন বিসর্জন দিব, এবং তাহার পরে বিশেষ হইতে গুরু-প্রত্যাগত সত্যানের ত্রায়, হে অনন্তস্নেহময়ী জননী, তোমার বক্ষে মাথা রাখিয়া কানিতে কানিতে বলিব—“তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।”

## নববিধানে মহারানী সুনীতি দেবীর নবজীবন।

যুগে যুগে যত ধর্মবিধান আসিয়াছে এবং যুগে যুগে সেই বিধানের ভিতর দিয়া যত নবীন বিধান আসিয়াছেন, সে সমুদায়ের ভূমিকায় পৃথিবীর অত্যাচার ও উৎপীড়ন বর্তমান কণ্টকবিন্দু তরু হইতেই সুললিত ও সুবাসিত গোলাপ গুলি বাহির হইয়াছে। খৃষ্টীয় বিধানের ভূমিকায় অত্যাচার ও ক্রম অন্তর্গামী হেরোদের আগমন অনিবার্য। শিষ্য পিটারও জিশাকে অধীকার করিলেন। জিশার ধর্মে প্রণোদিত সাধু পলকে বলিতে হইয়াছিল, “I am made fool for my master's sake.” উপনিষদী ম্যাডাম গায়ন উপহাসিত ও অত্যাচারিত হইয়া মৌনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ, জৈনচরিত্র এবং মহেশ্বরও মহা অত্যাচারের মহা তপস্যা লইয়া সত্যের অর্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিধাতার প্রেরিত বিধান এ সমুদায়কে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছেন। এই ভিত্তির উপর ধর্মবিধানশিল্প ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন প্রতিষ্ঠিত।

ইহার ভিতর হইতেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সুনীতিদেবী আসিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন নববিধানের নবীন প্রভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার সমুখে, “we walk not by sight but by faith”, “Many come but few are chosen” এই দুই মহা মন্ত্র বর্তমান। এই মন্ত্রে মন্থিত ও এই মন্ত্রে দীক্ষিতের সমুখে অত্যাচার ও বাধা বিধি চিরদিনই বর্তমান থাকিবে। গিরিসঙ্কট অতিক্রম না করিলে হিমালয়ের পথিক অগ্রসর হইতে অক্ষম।

হাঁহার এ পথের পথিক, বিধাতার আদেশ ও আজ্ঞা হাঁদের সহল। দশম আজ্ঞায় মুণী দীক্ষিত। যখন আদেশ আসে, তখন নাহিম আদেশের ভ্রতা। কুচবিহারবিবাহ-সম্বন্ধে বিধাতার প্রত্যক্ষ আদেশ আসিয়াছিল। যখন কুচবিহারের জীবী নৃপতি অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ এবং ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে মার্জিত জ্ঞান লাভ করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার সম্বন্ধে তত্ত্বাবধায়ক গভর্ণমেন্ট বিধাতার এক বিশেষ আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ইংলণ্ড পাঠাইয়া আরও উচ্চতর শিক্ষা বিধান করা গভর্ণমেন্টের একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল; কিন্তু তৎপূর্বে বৈবাহিক সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন উন্নতিশীল ও মার্জিতজ্ঞানসম্পন্ন পরিবারের সহিত আবদ্ধ করিয়া, সেই সুদূর প্রদেশে প্রেরণ করা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। বঙ্গের সেই কুসংস্কারের দিনে, সেই সুদূরবর্তী রেলব্যবস্থা-বিহীন কুচবিহার উন্নতিশীল পশ্চিম বঙ্গ হইতে সংস্কার-সম্বন্ধে আরো অনেক দূরে পড়িয়াছিল। সেই স্থানীন রাজ্য কুচবিহারকে সেই স্তর হইতে এক উন্নত স্তরে উত্তীর্ণ করাই, গভর্ণমেন্টের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

যখন বঙ্গদেশের কেন্দ্রভূমি হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র নব-ধর্মের নবোন্মেষ লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং ভারতের চির-প্রথাগত কুসংস্কার দূরীকরণ জন্ত নবধর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ্য-ভাবে ভারতবাসীকে আহ্বান করিতেছিলেন, তখন সে আহ্বানের ধ্বনি কেবল ভারতকে নহে, সুদূর পাশ্চাত্য ভূমিকেও জাগাইয়া তুলিতেছিল। দুইদশী তত্ত্বাবধায়ক গভর্ণমেন্ট কুচবিহার সম্পর্কে উচ্চ লক্ষ্য লইয়া কেশবচন্দ্রের নিকট তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। অকথ্য উদ্ভাপাতের মত যে প্রস্তাব তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িল এবং যাহার সম্বন্ধে তাঁহার ধর্ম ও সমাজসংস্কাররূপ মহাব্রতের ভিতর কোন দিন কোন চিন্তা আসে নাই, তাহার নিকট সে প্রস্তাবের সম্বন্ধে নীরবতা ভিন্ন আর কোন ভাব আসিবে? কুচবিহারের অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবক নৃপতি ও তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা উভয়েই তাঁহার সম্বন্ধে প্রধান অন্তরায়। এ অবস্থায় এ প্রস্তাব প্রেরিতবিহীন কেশবচন্দ্র নীরবে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। গভর্ণমেন্ট যে আলোক ও যে প্রত্যাশা লটাইয়া এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পক্ষে সে আলোক পরিহারও অসম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আবার সেই প্রস্তাব আসিল। সেবারেও তাঁহার নীরবতা। যখন তৃতীয়

বার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সে প্রস্তাব এক প্রত্যাশা মত তাঁহার নিকট আসিয়া পড়িল, তখন তাঁহাকে এক নূতন অবস্থার আসিয়া পড়িতে হইল।

গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, একটা নূতন জাতির ভিতর ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশ ও তাহাদিগকে চিরপ্রথাগত কুসংস্কারের ভিতর হইতে উদ্ধৃত করা কি আপনাদের মিশন (Mission) নহে? নব ভাবে ও নবসংস্কারব্রতে ব্রতী কেশবচন্দ্র ইহার উপর আর কোন উত্তর দিবেন? মহা নীরবতা আসিয়া পড়িল। একটা নূতন প্রত্যাশা তাঁহাকে কোথায় লইয়া গেল। তিনি নীরব গৃহে নীরব আসনে নীরবে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। প্রত্যাশা প্রত্যাশিষ্টকে মহা পরীক্ষার আনিয়া ফেলেন। কূচবিহার অপেক্ষা করিতেছিল উদ্ভিবার জন্ত। তাঁহার নীরব প্রার্থনার ভিতরে ভগবানের ইচ্ছিত ও আদেশ আসিল। ভগবানের আলোকে ও নির্দেশানুসারে উত্তর দিকের প্রত্যাশার অগ্রসরের পথ উন্মুক্ত হইল। বিধাতা স্মিত করিয়া দিলেন যে, বর্তমানে পাকিস্তানের মধ্যে ‘বাগদান’ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হউক। তাহার পর যখন যুবক রাজকুমার উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিবেন এবং উত্তরই প্রাপ্তবয়স্ক হইবেন, তখন ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে প্রকৃত বিবাহ অনুষ্ঠিত হইবে। এই নির্ধারণে ও এই আলোকেই এই প্রত্যাশার কাজ অগ্রসর হইল এবং সময়ের পূর্ণতার তাঁহার আদেশ পূর্ণ হইল। আদেশের কাজে পরীক্ষা অনিবার্য। ব্রাহ্মসমাজের সমক্ষে মহা পরীক্ষা। এই স্থানে তাঁহার নববিধানের অগ্নিপরীক্ষার মহা পরিচয়।

নববিধানের নূতন ইম্প্রোভেল ব্রাহ্মসমাজ এক হস্তে ভগবানের আদেশ ও অপর হস্তে কতাকে লইয়া কূচবিহারে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কূচবিহারের সম্মুখে এ দৃশ্য যে একটা নূতন ও বিসদৃশ, তাহার সন্দেহ নাই। চির প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রথার পন্থী কূচবিহার ধর্মবিধি সঙ্কে পুরাতন সংস্কার রক্ষা করিয়া আসিতে ছিলেন; আজ সে সংস্কারের বিরোধী ভাবকে কতটুকু স্থান দিতে পারিবেন? ঘোর পৌত্তলিকতাপূর্ণ কূচবিহারের পক্ষে নিরাকারবাদী মনের আগমন নীরবে বহন করা অসম্ভব। প্রকাশ্যে ও গোপনে বিদ্রোহ বাধা উপস্থিত হইয়া বিধাতার কার্যকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু ভিতরে তাঁহার বিধান চলিতেছিল। পনের কার্য অব্যাহত হয় নাট, কিন্তু বিধাতার বিধান বিদ্রোহের ভিতর পূর্ণ হইয়াছিল। বিধাতার আদেশ-পালনে প্রস্তুত আত্মাকে কে বাধা দিতে পারে? একদিকে যুবক রাজকুমার সঙ্কে গভর্ণমেণ্টের প্রত্যাশা, আর একদিকে প্রত্যাশিষ্ট ব্রাহ্মসমাজ ও আদেশপালনোন্মুখ কত্যা সুনীতি দেবী। সেই পৌত্তলিক কূচবিহারের মার্জিত-জ্ঞান-সম্পন্ন যুবক রাজকুমার নবভাবে নবালেকে প্রবেশিত। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নববিধানী প্রেরিতগণ ও সমবিধানীগণ এবং ‘গভর্ণমেন্ট’ হইতে প্রেরিত রাজসাহী বিভাগের কমিশনার সিং ড্যাগলট্

এবং তাঁহার সঙ্গে বঙ্গের খ্রীষ্টীয় মিশন হইতে সমাপতা অতি বৃদ্ধা চিরকোমারীত্রাণবলিনী তপস্বিনী পিগট্ এই বিদ্রোহপূর্ণ মিশন-কেন্দ্রে উপস্থিত। বিধাতার কার্য অব্যাহত থাকিতে পারে না। এই উত্তরভাবাপন্ন মণ্ডলীর মিশনকেন্দ্রভূমি হইতে বিধান-পতির সম্মুখে যে প্রার্থনা উদ্ভিত হইল, সে প্রার্থনা সত্য সত্য নববিধানের ইতিহাসকে চিরদিন পূর্ণ করিবে। নবীন প্রাণে প্রাণোদিত ও বিধাতার নবীন আদেশে উন্মোচিত ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজ, যুবক রাজকুমারের সেই সৌম্য ও শান্ত স্মৃতি, তাঁহার প্রেমাত্মক উজ্জল চক্ষু ও ব্রহ্মযুধীনতা এবং নববিধানের সহযোগী ও আদেশবিধানী আত্মাগণের সহযোগিতা চিরদিনই বিধাতার আদেশ-পালনের সাক্ষাদান ও তাঁহার নবসংবাদকে পূর্ণতা সাধন করিবে।

যখন নূতন বিধান আসে, মানবীয় দুর্বলতা ও অস্বাভাবিক হইতে অনেক বিরুদ্ধ কাহিনী ছড়াইয়া পড়ে। মানুষ স্বন্দর কমলকেও তাহার ইচ্ছামুগ্ধ রূপে রঞ্জিত করিতে পারে। বিধানবিধান হইতে দূরবর্তী ও উন্নত বঙ্গ হইতে বিভক্ত কূচবিহারের পক্ষে সেই যুগে এরূপ কাহিনী অসম্ভব হইতে পারে নাই। কাহিনী অনেক রূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

( ক্রমশঃ )

নামকুম, রাঁচি।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার

## কয়েকখানি চিঠি

[ মহারাণী সুনীতি দেবীর পত্রাবলী ]

February 20th.

অতি মেহের—

প্রাণের ভালবাসাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা লও। তোমার সুন্দর চিঠি খানিতে উৎসবের বিবরণ পড়িতে পড়িতে আশ্চর্য্য কি যে অপূর্ণ আনন্দ পাইলাম। “মেয়েদের নগরকীর্তন” চক্ষের সম্মুখে একটি ছবির মত আসিয়া পড়িল। কি উৎসব, কি ছবি, কি আনন্দ, স্বর্ণ ও কলিকাতা এক হইয়াছিল, তোমাদের সঙ্গে সকল যুগের দেবীগণ এক হইয়াছিলেন। তোমাদের আশীর্বাদ করিব। আমি উপযুক্ত নহি, তোমরা আশীর্বাদ কর, মাথা নত করিতেছি। কি উৎসবই দেখালে সকল নরনারীকে। আমার কথা জিজ্ঞাসা করিও না। পড়িয়া আছি রুগ্ন ও শ্রান্ত। মৃত্যুর ভয় যেন প্রস্তুত থাকি। \* \* \* \* \* তুমি আধ্যাত্মিকময় খুব আগাইয়া রাখিও। দেব পিতামাতার ইচ্ছা তোমার জীবনে পূর্ণ হউক।

মেহের চিঠি

February 19th, 1929.

মেহের—

তোমার চিঠিগুলি বড়ই মিষ্ট লাগে। সু—যে আর্থানারীসমাজের জন্মদিন বাহির করিয়াছেন, ইহার জন্ম তাঁহাকে আমার প্রাণের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আশীর্বাদ দিও। সেই যে প্রথম প্রথম এই সমাজের অধিবেশন হইত, তোমার চিঠি সেই দৃশ্যগুলি চক্ষুর সমক্ষে ধরিল। বৌকে বড় কাছে মনে হয়, সেই অধিবেশনগুলির কথা ভাবিলে। আর কি ভাই আমার লিখিবার ক্ষমতা আছে? কোথায় আমার সে পূর্বের জীবন, কোথায়ই বা ভাষা! তোমরা ভাই লিখিও। এ আর্থানারীসমাজ-প্রতিষ্ঠা যে ভারতবর্ষের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। বর্তমানে কত সমিতি, কত কি হইতেছে, কিন্তু ধর্মজীবন দেখাইবার শিক্ষা আর্থানারীসমাজ ভিন্ন আর কেহ পায়না। এ সমাজের উন্নতি যে বিশেষ রূপে করিতে হইবে। সু—যেন হাতে লইয়া এ সমাজের কল্যাণসবটি সম্পন্ন করেন।

এবারে উৎসবের আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারি নাই, কত ঘেন দূর পড়িয়াছিলাম। উৎসবের সময় কলিকাতার মিলনটি বড় সুখের। \* \* \* সংসারপথ কি দুর্গম! এ ভাষা জীবনটা এখনও পরীক্ষা দিতে দিতে চলিতেছে।

বাঁচিয়া থাক, দীর্ঘজীবী হও। মাতৃদেবীর বইগুলি আঁসিয়াছে। মার প্রার্থনা একটি একটি সে সুধাবিন্দু, প্রাণে কত আরাম দেয়। বইগুলি কেহ লইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পায়েন না? এইত প্রচারের কাজ। নি—হাতে লইলে ভাল হয়, কি বল? ছেলেদের আশীর্বাদ দিও এবং তুমি প্রাণের স্নেহপূর্ণ ভালবাসা লও।

মেহের দিদি

January 7th

মেহের—

আজ প্রাণটা কমলকুটারে যাইবার জন্ম বড় কেমন করিতেছে। কেবল সেই পূর্বের দিনগুলি, সেই দৃশ্যগুলি আসিয়া মনটাকে বিচলিত করিতেছে। আত্মায় আত্মায় যেন তোমাদের সঙ্গে কমল উপাসনার মিলিয়া অমৃতধামে যাইতে পারি। ভক্তের পদতল আমাদের চিরদিনের আশ্রয়। \* \* \* কেমন আছ?

মেহের দিদি

December 24th

অতি মেহের—

তোমার সুমিষ্ট চিঠিগুলি বখাসময়ে পাইয়াছি। স্নেহ ঢালিয়া দেয় তোমার পত্র। কত বহু, কত আদর করিলে, মার স্নেহ

তোমার ব্যবহারে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি। সু—র ভিতর যে এত কোমল স্নেহ লুক্কায়িত ছিল, এতদিন তাহা জানিতাম না। প্রাণটা তোমাদের স্নেহ ব্যবহারে কৃতজ্ঞ ও মুগ্ধ।

নানা কারণে ভাই চিঠি পত্র লিখিতে পারি নাই, কাজও অনেক। বড় কষ্ট হইতেছে, সুখনয় "২৬"এ তোমাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া উৎসবটি সম্ভোগ করিতে পারিব না, এখানে উপাসনায় তোমাদের সঙ্গে মিলিব। \* \* \* ছেলেদের love দিও। গিয়া অনেক কথা বলিব।

মেহের দিদি

August 15th, 1928

মেহের—

তোমার স্নেহমাখা সুন্দর চিঠিগুলি বখাসময়ে পাইয়াছি। পুণ্য তোমার জীবনে প্রকাশিত, সরস স্নেহজড়িত, ব্যবহার ও ভাষায় সে জীবনটী সদা সর্বদা সকলকে তৃপ্ত করিতেছে। আজ তোমারই পুণ্যবলে তোমার নবগৃহে, নব আনন্দের কল্লোল। আমি আর কি বলিব। এ প্রাণের আশীর্বাদে যদি মূল্য থাকে, তবে এই প্রার্থনা করি, নববিধানের নবভক্তের নবলক্ষ্মী তোমার সংসারে অচলা হইয়া থাকুন। জন্মদিনে যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছ, শুনিয়া বড় আশ্চর্য হইল। সবই নূতন করিয়া পাইলে! ঠিক সময় পৌঁছিয়াছে, সকলে নূতন আশা লইয়া ভবিষ্যৎ গড়িতেছে, এ বড় সুন্দর দৃশ্য, বড় সুখের কথা। দীর্ঘজীবী হও, সম্রাটী পুত্রদের লইয়া ব্রহ্মানন্দের আনন্দময়ীকে পূজা করিয়া চিরসুখী হও। সকল আনন্দ-উৎসবে স্নেহময়ী মার অভাবটি বোধ হয়। তোমার এ নূতন বাড়ী দেখিলে, মার সেই স্নেহকর-কমলস্পর্শের অভাবটা ও তাঁহার স্নেহভরা ভাষায় আশীর্বাদে অভাবটা বড় কষ্ট দেয়।

তোমাদের অর্থভাবের ভিতর কষ্টে স্নেহময়ী জননী প্রতিপালন করিয়াছিলেন, তোমাদের সংসারগুলির সুখ সুবিধা দেখিলে কত না মা আজ আনন্দ করিতেন। সুদীর্ঘ জীবন লইয়া সপরিবারে নবলক্ষ্মীর পূজা কর, আনন্দধামে দেব পিতামাতার হাসি দেখিবে। কলিকাতার সংবাদাদি পাই, তবে বেশী খবর রোগ শোকের। কত আত্মীয় স্বজন চলিয়া গিয়াছেন; এখন ইচ্ছা হয়, যাঁহারা আছেন, তাঁহারা "বাঁচিয়া আছেন" শুনিয়া যাই। \* \* \* এ জীবন যেন দয়াময়ের চরণে কৃতজ্ঞতাভরে লুটায়। তাঁর চরণ বিনা আমার সহায় আর কিছুই নাই। এ বৃদ্ধ বয়সে শক্তিহীন ও বুদ্ধিহীন হইয়াছি।

তুমি সু—র কাছে হইয়াছ, ইহা একটি বড় আনন্দের কথা। দুইজনে কেমন করিয়া উপাসনা, সংসার, পরসেবা ইত্যাদি করিতে হয়, দেখাইবে। \* \* \* উৎসবের সময় প্রাণে প্রাণে বাঁধাত আছি, দূর নিকট এক হইবো, একত্রে কাজ করিব। \* \* \* ভক্তের ভগবান তোমার জীবনে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

মেহের দিদি

Woodlands

Oct. 1st

সেইখানে গিয়ে হও আত্মহারী,

মিশে ঐ জীবন-ধারার !

অতি মেহের—

তোমাদের ঋণ ত কখনও শোধ দিতে পারিব না। এ ঋণের ভার আরও গুরু হইতেছে। বিশ্বাস করি, “ভাই বোনের মেহ আমাকে ভবিস্বপ্নপার” সহজ করিয়া দিবে। \* \* \*  
সু—এবার মেহ চালিয়া দিয়াছেন, আমার আশীর্বাদ যদি সাহায্য করে, বলিও, প্রাণের আশীর্বাদ করিতেছি। ছেলেদের মেহ দিও, সকলে ভাল থেক।

প্রাণের বি—র বিচ্ছেদ-যাতনা। হৃদয়টা নীরবেই সহ করে, কিন্তু শ্রাণটা ছুটিয়া কোথায় চলিয়া যাইতে চাহে। চক্ষুর দৃষ্টি কীণ, ভাল করিয়া লিখিতে পারিলাম না। প্রাণের ভালবাসা, মেহ এবং আশীর্বাদ লও।

মেহের দিদি

(ক্রমশঃ)

## নূতন গান।

(নান্দার মৃত্যু উপলক্ষে শ্রীদামোদর পাল কর্তৃক রচিত)

[কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে]—সুঃ।

“ভুলিলাম ভুলিলাম প্রাণারাম-সাগরে”

কে গাহিয়ে ঐ চলে যায়!

দেখিতে দেখিতে, কোন অদৃশ্যেতে,

ভুলিয়া গেলেন তার!

নখর এ দেহ গেহ পরিহারি,

অপূর্ব চিন্ময়, আত্মরূপ ধরি,

কোন সুগভীরে, প্রাণ-সিদ্ধ-নীরে,

মিশিল আজ কোথায়?

অলস্ত পুণ্যের হোমায়ি আলিয়া,

বৈরাগ্য প্রেমের আহুতি ঢালিয়া,

নিত্যোৎসব-পূর্ণ জীবন করিয়া,

ধরি রূপ জ্যোতির্ময়;

চারিদিক আজ মধুময় করি,

শত শতদল বক্সঃহলে ধরি,

পূজিতে গেলেন, বধায় শ্রীহরি,

সবে মিলে চল তথায়।

সে অমরধাম ঐ বে সমুখে,

কেন হেথা বসে থাক স্নানমুখে?

অধীর হইয়া তুচ্ছ সুখ দুঃখে,

রৌপে শোকে মৃতপ্রায়;

অমৃতপথের, ওগো বাহি! বারা,

বহিছে বধায়, নিত্য শান্তিপাঠা,

## সংবাদ।

জন্মদিন—গত ৩১শে বৈশাখ, আমাদের অগ্রজ নববিধান-প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাসের বড়শীতিতম জন্মদিন উপলক্ষে শান্তিপুরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। এই দীর্ঘ জীবনে বিধানজননীর অনির্বচনীয় কৃপা-স্বরণে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রাণের গভীর কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন। আমরা তাঁহার সহিত একা-অত্রা অবলম্বনে, মার চরণে কৃতজ্ঞতা-ভক্তিতরে লুপ্তি হই।

কলিকাতার স্বনামধন্য, অধ্যবসায়শীল, স্বাবলম্বী কন্ববীর, বাহুল্যের হৃদয়ান, প্রসিদ্ধ “মার্টিন কোম্পানির” প্রধানতন অধ্যক্ষ মাননীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, গত ২৩শে জুন, অশীতিতম বৎসরের পদার্পণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই শুভজন্মদিনে, আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও শুভাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অভিনন্দন তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছি। নববিধানের প্রেরিতদলের প্রতি তাঁহার অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল; কত বিষয়ে তিনি তাঁহাদের সেবা ও সাহায্য করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ জীবনে দেশের এবং দেশেরও কত উপকার করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত থাকিয়া, সহায়ত্বপূর্ণ জীয়ে মণ্ডলীর প্রতি কতই সদয় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ভগবান্ তাঁকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত রাখুন।

জাতকর্ম—গত ১৮ই জুন, ১০নং নারিকেল বাগান লেনে, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায়ের গৃহে, তাঁহার দৌহিত্রের (শ্রীমতী বীণা সরকারের নবজাত পুত্রের) জাতকর্ম অস্থান উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। ভগবান্ শিতকে ও তাঁহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

শুভবিবাহ—গত ২রা আষাঢ়, (১৬ই জুন), শুক্রবার, টাঙ্গাইল-নিবাসী বর্গীর শশিভূষণ তালুকদারের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীর শ্রীমান্ কালিদাস তালুকদারের সহিত, বালেশ্বর-নিবাসী বর্গীর প্রবনাথ করের বধামা কস্তা কল্যাণীরা শ্রীমতী কলাপ-কুমারীর শুভবিবাহস্থান নবসংহিতামতে, কলিকাতার ৭৩নং রাজা দীনেজ্জ ট্রাটে সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এই শুভস্থানে অচাধ্য ও পুরোহিতের কাজ করিয়াছেন। ভগবান্ নবদম্পতিকে স্বর্গের শুভানীষ দান করুন।

দীক্ষা—গত ১লা আষাঢ়, ৭৩নং রাজা দীনেজ্জ ট্রাটে, বালেশ্বরের বর্গীর প্রবনাথ করের বধামা কস্তা কল্যাণীরা শ্রীমতী কলাপকুমারী নবসংহিতামতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই অধিলচন্দ্র রায় দীক্ষার্থীকে উপস্থিত করেন এবং ভাই গোপাল-চন্দ্র গুহ উপাসনানন্তর দীক্ষা দান করেন। ভগবান্ নবদীক্ষিতাকে নববিধানের নবজীবন দান করুন।



**পরলোকগমন**—আমরা গভীর চুঃখের সহিত নিম্ন-  
লিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

আমাদের প্রিয়তম নন্দুদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল  
সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজনকুমার  
সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন ৫০ বৎসর বয়সে,  
গত ২১শে জুন, কল্যাণীয়াহ মিল বাটিতে (২৮নং রায়কমল  
সেম লেন), পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র, কন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন-  
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া, অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি  
রোগশয্যায় কিছুদিন পূর্বে হঠাৎই শান্তভাবে গভীর বিশ্বাসের  
সহিত পরলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। তিনি  
কলিকাতার মধ্যে দীর্ঘতম পুরুষ বলিয়া সকলের নিকট আদৃত  
ছিলেন।

গত ১৩ই জুন, কলিকাতায়, স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পালের পত্নী,  
বিপিনবাবুর পরলোকগমনের ঠিক একবৎসর পরে, পরলোকগমন  
করিয়াছেন; গত ১৫শে জুন, তাঁহার পবিত্র প্রাণাহুষ্ঠান কলি-  
কাতায় সম্পন্ন হইয়াছে।

মহাবিধানজননী তাঁহার প্রিয়তম সন্তানদিগকে তাঁর অনন্ত-  
শান্তিক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং পৃথিবীস্থ সকল শোকাক্তজনের  
প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সাহসনা বিধান করুন।

**আত্মশ্রদ্ধা**—গত ২৫শে জুন, রবিবার, কাশীপুরে, ২৯নং  
হয়েক শেঠ রোডে, স্বর্গীয় রায় বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখো-  
পাধ্যায়ের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া নিখরমোহিনী দেবীর পবিত্র আত্ম-  
প্রাণাহুষ্ঠান মনসংহিতানুসারে, গভীরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে।  
ভাই অক্ষয়কুমার লগ উদ্বোধন ও আরাধনা, ডাঃ সন্তানন্দ রায়  
শাস্ত্রপাঠ, ভাই শ্রিয়নাথ মল্লিক প্রার্থনা করিয়া শান্তিবাচন  
করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ভ্রাতৃগণের  
সহিত দণ্ডায়মান হইয়া প্রথম শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন।  
বিধানসুরলী শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত করেন।  
মাননীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি প্রভৃতি গণ্যমান্য আত্মীয় স্বজন  
ও বন্ধুবান্ধব অনেকে উক্ত অস্থানে যোগদান করিয়া পরলোকগত  
মাতৃ-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঙ্গণ করিয়াছেন। মহাবিধানজননী তাঁর  
সত্যীকৃত্যর আত্মাকে পতিপুত্রসমে চিরশান্তিময় অমরতবনে স্থান  
দান করুন এবং পৃথিবীস্থ সকল শোকাক্তজনের প্রাণে শান্তি  
বিধান করুন। এই অস্থানে নিম্নলিখিত দান বিজ্ঞাপিত  
হইয়াছে :—মহাবিধান প্রচারভাণ্ডার ৩০০, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির  
১৫০, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৫০, পুরী মহাবিধান ব্রাহ্মসমাজ ১০০,  
হিন্দু-অনাথাশ্রম ১০০, মুসলমান অনাথাশ্রম ১০০, ব্রাহ্ম প্রিন্সিপাল স্কুল  
১০০, রামকৃষ্ণ মিশন অনাথাশ্রম ১০০, অন্ধদের স্কুল ১০০,  
মুক ও বধিরদের স্কুল ১০০, Little Sisters of the Poor  
১০০, ভাবলার বিধবাদের ৩০০, পুঁড়ার বিধবাদের ২০০, ভবানী-  
পুর বিধবাদের ১০০, ভগ্নিসমিতি ১০০, কাংগে 'সত্যেন্দ্র' ছাত্র  
কণ্ড ২০০, প্রমথলাল শিক্কাতির্থ ১০০, আটোয়া তিনজন ও গারক

৩০০, গোবিন্দ কুমারী হোম ১০০, আত্মরাশ্রম ১০০, মোট ৩০০০।

অদ্য টাকায় জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী বনোরমা দেবীও মাতৃ-  
প্রাণাহুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

**আরোগ্যালভ**—স্বর্গীয় প্রেরিত ভাই কেশরনাথ দেব  
দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী অশোকলতা দাস দীর্ঘকাল কার্কাটক  
রোগে কষ্ট পাইয়া, কিছুদিন হটল আরোগ্যালভ করিয়াছেন।  
তাঁর আরোগ্য উপলক্ষে, গত ১লা জুন, রাত্রিকালে, ১৫বি  
রাঙ্গা দীনেজ্জ ষ্ট্রীট ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই অক্ষয়  
রায় উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে নববিধান প্রচারভাণ্ডারে ২০  
টাকা দান করিয়াছেন। যা বিধানজননী তাঁর কন্যাকে আত্মর  
সেবাব্রতসাধনে সক্ষম করুন।

**তীর্থবাস ও সেবা**—গত ৩ই জুন, সন্ধ্যা ৩ ঘটিকায়,  
ভাই শ্রিয়নাথ ভুবনেশ্বর ও বগুগিরি-প্রভৃতি তীর্থযাত্রা করিয়া,  
ধান প্রার্থনাদি করিয়া আসেন। ফিরিবার সময় মিঃ এস. সি,  
রায়ের বাড়ী সন্ধ্যায় উপাসনা করেন।

**সেবা**—ভাই অখিলচন্দ্র রায় বিগত ১৭ই জুন, শনিবার,  
অপরাহ্ন ৫টার সময়, চন্দননগর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া,  
তৎপরে চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টার সময় উপাসনা করেন,  
এবং ১৮ই জুন, রবিবার প্রাতে ৮টার সময় চুঁচুড়া বাণীমন্দির-  
বালিকা-বিভাগের প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী লাল্যাকণা বসুর  
আবাসে বিশেষ উপাসনা করেন। চুঁচুড়া মহাবিধান মন্দিরে প্রায়  
দেড় বৎসর কাল ১৫দিন অন্তর উপাসনা চলিতেছে। উভয়  
স্থলেই বিশ্বাসী ভাই ভগিনীগণ যোগদান করেন।

গত ২০শে জুন, পুরী বিশ্রামকুটীরে, মিসেস পি, সি, সেনের  
প্রবাস-ভবনে, ভাই শ্রিয়নাথ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সাক্ষা উপাসনা  
করেন। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী সঙ্গীত করেন।

**নবপর্ণকুটীর, পুরী**—গত গ্রাম্যাবকাশ উপলক্ষে, বর্ধমান  
রাজকগেজিটেট স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত কংকণকুমার চট্টো-  
পাধ্যায় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় এবং হাওড়ার বন্ধু শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ  
মৈত্র সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ও আরো দুইটি মহিলার সহিত পুরী  
নবপর্ণকুটীরে গিয়া, প্রায় একমাস কাল একত্রে নিত্য উপাসনা,  
সাধন ভজন ও এক পরিবারের ভ্রাতৃ সেবক সেবিকার সঙ্গে অব-  
স্থান করিয়া গিয়াছেন। কুটীরটী ক্ষুদ্র হইলেও, দুই তিনটি  
পরিবার প্রীতি ও সন্তোষে একত্রে কেমন করিয়া নববিধানের প্রেম-  
পরিবারের ভাব সাধন করা যায়, তাহার আভাস অল্পভব  
করিয়া সকলেই সুখী হইয়াছেন।

পুরী সর্বধর্মসমন্বয় মহাবিধান-প্রতিষ্ঠানের, রবিবারীয়  
সামাজিক উপাসনা, ভাই শ্রিয়নাথের অধুপস্থিতিকালে, এক সপ্তাহে  
অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সেন ও পর সপ্তাহে অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ  
হজুমদার সম্পাদন করেন।

**চন্দননগর ব্রহ্মমন্দির**—অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, প্রায়  
১৫ বৎসর পরে, গত ৩রা জুন, চন্দননগর ব্রহ্মমন্দিরে

আবার ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইয়াছে। ভ্রাতা ডাক্তার অমুকুণ-চন্দ্র মিত্র ভাই অখিলচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করিয়া, ঐ দিন অপরাহ্নে ষোড়শ উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন। তথাকার বহুগণ পুনরায় উৎসাহী হইয়াছেন।

খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির—খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের অল্পতম ট্রাষ্টী ভাই অখিলচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন :—গোবরডাক্ষা টেনের অনতিদূরে খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দির। ঐ মন্দিরটী স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন দত্ত মহাশয় নির্মাণ করাইয়া, শ্রীমদ্বাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ দেব দ্বারা প্রতিষ্ঠা করান। এই বহু পুরাতন ব্রহ্মমন্দির সম্বন্ধে আশিপুর জজ আদালতে মোকদ্দমা হওয়ার, আদালতের অভিপ্রায় মতে শ্রদ্ধেয় দত্ত মহাশয় ও অপর পক্ষ ১০জন ট্রাষ্টী নিয়োগ করেন। এই ট্রাষ্টীদের মধ্যে অনেকেই পদত্যাগ করায়, বর্তমানে নিম্নলিখিত নববিধানবিশ্বাসিগণ ট্রাষ্টীপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন :—মিঃ প্রশান্ত-কুমার সেন, ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার শচিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরস্বতী সেন, শ্রীমতী হেমলতা দত্ত, শ্রীমতী আশালতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার খাস্তগীর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন ও সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায়। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, প্রকৃত্যজনীয়া শ্রীমতী সরস্বতী সেন মহাশয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা ও ব্রহ্মমন্দিরের সংস্কারাদি কার্যের জন্ত যে ৮০০০ আটহাজার টাকার গভর্ণমেন্ট পেনশন দান করিয়াছিলেন, কিছুদিন পূর্বে একগাণি স্বতন্ত্র ট্রাষ্টীভীড় করিয়া ঐ টাকা অল্পতম ট্রাষ্টী ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ ও ডাক্তার শচিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছেন। এখন হইতে ডাক্তার ঘোষ ও ডাক্তার চট্টাঙ্গী অজ্ঞাত ট্রাষ্টীদের সহযোগে ঐ ব্রহ্মমন্দিরসম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যয়াদি উক্ত টাকার শ্রুদ হইতে সম্পন্ন করিবেন।

ভাই অখিলচন্দ্র ইহাও লিখিয়াছেন :—গোবরডাক্ষা খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। যদিও ১০জন ট্রাষ্টীর হস্তে এই ব্রহ্মমন্দির ও তৎসংলগ্ন সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়িয়াছে এবং তাঁহারা ভাই অখিলচন্দ্র রায়, ডাক্তার অমুকুণচন্দ্র মিত্র ও ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসুর হস্তে এই ব্রহ্মমন্দিরে নিয়মিত উপাসনার ভার দিয়াছেন, তথাপি ভারপ্রাপ্ত সেবকগণ কয়েকটী অসুবিধায় পড়িয়া সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। তবে আশা করা যায়, অচিরেই সমস্ত বাধা দূর হইবে। এক নাসের মধ্যে উৎসাহী তিন জন তিনবার খাঁটুরা যাইয়া সাময়িকভাবে ব্রহ্মোপাসনাদি করিয়াছেন। এ দিবসে ট্রাষ্টীগণেরও বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রার্থনীয়।

সাপ্তাহিক—গত ২৭শে মে, ভক্তিজ্ঞান প্রেরিতগণের প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বর্গারোহণদিন উপলক্ষে, শান্তিপুত্র বিশেষ উপাসনা, কংকীর্তন ও “আশীষ” পাঠ হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক

ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনার কাজ করিয়াছিলেন।

গত ২২শে জুন, ৮ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ভাই প্রিয়নাথের মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক পুরী নবপর্ণকূটীয়ে সম্বিষ্ট হইয়াছে। ভাই নিজেই উপাসনা করেন ও শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথ গঙ্গুলী ও কুমারী জ্যোৎস্না গুপ্তা সঙ্গীত করেন। ১৬ই উপলক্ষে কিছু দরিদ্র-সেবা হয়। প্রচারক মহাশয়দিগের সেবার জন্ত সেবিকা হেমন্তকুমারী মল্লিক ১২ টাকা অভিভাবক মহাশয়কে পাঠান।

বিগত ১৮ই জুন, সন্ধ্যায়, ১৫বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় মনোমতধন দেব সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন; মধ্যমা ভগিনী অশোকলতা দাস সঙ্গীতের প্রার্থনা ও কন্ঠাগণ সহ সঙ্গীত করেন। জামাতা হুমায়ুন কবির প্রভৃতি ভক্তির সহিত যোগদান করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২২ দান করিয়াছেন। ঐদিন, ঐ উপলক্ষে, গঙ্গামের অস্বর্গত সমুদ্র-তীরবর্তী গোপালপুরে ভ্রাতা মনোমতধন দেব প্রবাসভবনে এক রাঁচিতে জ্যোষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্রের প্রবাসগৃহেও উপাসনাদি হইয়াছে। এই উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্র প্রচারভাণ্ডারে ১২ ও রাঁচিতে গরিবদিগকে গরম বস্ত্র, চাল ও আম দান করিয়াছেন। সংসারের ঘোরতর কার্যাব্যস্ততার মধ্যেও মনোমতধন দেবের শাস্ত্র ভাবে ও ভক্তির সহিত ভগবানের নামগানে তন্ময় হইয়া যাইতেন; তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া সকলে বিমোহিত হইতেন। স্বর্গের পানী ঘের দিন কয়েকের জন্ত নন্দনের অমিয় সুখা বিতরণ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নববিধানের সুগারক এখন অমরধামে ভক্তবৃন্দকে মা নাম শুনাইতেছেন।

গত ১৬ই জুন, স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনের সাম্বৎসরিক দিনে, তাঁহার জ্যোষ্ঠা কন্যা মীরা দেবী ও জ্যোষ্ঠা জামাতা মিঃ অক্ষয়কুমার গুপ্তের ২৫১২ রোলাণ্ড রোডস্থ গৃহে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন।

কোচবিহারের সংবাদ—গত ১৭ই মে, ভ্রাতা কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম পুত্র শ্রীমান্ পুনীতিকুমারের এবং ১৭ই জুন, তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্রের জন্মদিন উপলক্ষে করুণাকূটীয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। গত ১৮ই জুন, প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দেব বাড়ীতে ভ্রাতার জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় মনোমতধন দেব সাম্বৎসরিক দিনে ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। মনোরথ বাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন। ভ্রাতা নবীনচন্দ্র আইচই এখনও স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনাদি পূর্ববৎ করিতেছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমনাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেস”, উপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

সুবিশালমিথং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ সুনির্মলজ্যোতিঃ সত্যং শাস্ত্রমনম্বরম্॥  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি শ্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যাং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

১৩শ সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

17th July, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা।

হে আমাদের রক্ষক, প্রতিপালক ও সর্বপ্রকার  
স্বাস্থ্য-বিধায়ক পরম দেবতা! নবযুগের নবধর্ম,  
নবধর্মের নূতন মণ্ডলী ও পরিবার তোমারই শ্রীহস্তের  
রচনা। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের  
মঙ্গলের জন্ত, সদগতিবিধানের জন্ত, নব নব ভাবে স্বাস্থ্য  
ও সামর্থ্যলাভের জন্ত, তোমার কি বিপুল আয়োজন!  
তবে কেন আমরা এত দুর্বল হইয়া পড়িতেছি? নিশ্চিন্ত  
হইয়া পড়িতেছি? অনেক সময় এই পৃথিবীতে দেখা  
যায়, বড় বড় ধনীর পুত্র কন্যাদিগের দেহ মনে বড় বড়  
রোগ। ধন সম্পদের অভাব নাই, আহার পরিচ্ছদের  
আয়োজনের ত্রুটি নাই, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে পরামর্শদাতা  
সুযোগ্য চিকিৎসকগণও উপস্থিত; অথচ তারই মধ্যে ধনীর  
গৃহের পুত্র কন্যাদিগের দৈহিক ও মানসিক জীবনে দুরারোগ্য  
গুঢ় রোগ। ধনীর পুত্রকন্যাদিগের বাহ্য লাবণ্যময় শরীর মনে  
ক্রমে দুর্বল, মলিন, প্রকাহীন। আমাদের অগ্রণী ও  
জ্যোতির্গণ তোমার প্রদত্ত ধনে ধনী হইলেন, কত স্বর্গের  
রূপলাবণ্যময় অমর জীবনের শ্রীসৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া আপ-  
নারা মোহিত হইলেন, স্বদেশ, বিদেশকে আকৃষ্ট করিলেন,  
কত ধন সঞ্চয় করিলেন, কত ধন বিলাইলেন; যথাসময়ে

জীবনের কর্তব্য এখানে শেষ করিয়া, আমাদেরই জন্ত সে  
শ্রীসৌন্দর্য্যপূর্ণ অমর জীবন রাখিয়া, তোমার বক্ষে  
অমরপুরে প্রবেশ করিলেন। আমরা সেই গৃহের,  
সেই পরিবারের তোমারই সন্তান। আমরা বুঝি,  
গৃহের প্রচুর ধন ঐশ্বর্য্য দেখিয়া অহঙ্কারী হইয়াছি, অভি-  
মানী হইয়াছি, অলস ও জড়ভাবাপন্ন হইতেছি? ধর্ম্মরাজ্যে  
অহঙ্কারের পুরোভাগে যে পতন। ধর্ম্মরাজ্যে অলসতা,  
জড়তার যে স্থান নাই। এ যে চির বিনয়ী, চির দীনাত্মা-  
দিগের রাজ্য। এ যে চির কর্ম্মঠ, তোমার চির অনুগত  
দাসদাসীদিগের রাজ্য। আমাদের বুঝি অনেক ভুল  
হইয়াছে, আমরা বুঝি তোমার নিত্য আদেশ উপদেশের  
তেমন করিয়া অনুগত হইতেছি না, তেমন করিয়া জোর  
প্রার্থনা করিতেছি না, তেমন করিয়া তোমা হইতে  
আলোক ও ধর্ম্মবল লাভ করিতেছি না। তাই  
আমাদের মধ্যে কত জীবনে কত রোগ প্রবেশ  
করিতেছে, আমাদের মধ্যে কত দুর্বলতা আসিতেছে।  
আমাদের নিজ চেফ্টা, নিজবলে রোগ দূর করিবার উপায়  
নাই, স্বাস্থ্য সামর্থ্য লাভ করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের  
গুঢ় রোগ দেখিয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি; তুমি  
মিজগুণে তোমার গৃহকে, তোমার মণ্ডলীকে রক্ষা কর।  
তুমি নিজগুণে আমাদের মধ্যে স্বর্গের স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য

বিধান করিয়া, আমাদের ও জগতের আশা বিশ্বাস বৃদ্ধি কর, তবে চরণে এই কাতর প্রার্থনা।

শান্তিঃ !

শান্তিঃ !!

শান্তিঃ !!!

—o—

## সত্যের সমাদর।

নবধর্মের বিশেষ মৌলিকতা স্বাধীন ভাবে সত্য-গ্রহণ। স্বাধীন ভাবে সত্য গ্রহণ, সত্য ধর্ম গ্রহণ করিয়া সত্যের অধীন হওয়া, ধর্মের হওয়া। সত্যই ধর্ম, সত্য-গ্রহণ ও ধর্ম-গ্রহণ একই কথা। সত্য কোন দেশকালে আবদ্ধ নহে, কোন বিশেষ মঙ্গলপুরুষেও আবদ্ধ নহে। সত্য অনন্ত, অসীম, আবার সত্য নানা বিচিত্রতায় পূর্ণ। ঈশ্বর সত্যের মূল প্রস্রবণ। তাঁহা হইতে নানা আকারে সত্য আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। সত্য-গ্রহণে বিমুখ না হই, এজ্ঞা আমাদের প্রাণে সত্য-গ্রহণের অনন্ত পিপাসা গুঢ় ভাবে নিহিত রহিয়াছে। প্রাণের অবস্থা, জীবনের অবস্থা সহজ স্বাভাবিক থাকিলে, আমাদের জীবন সত্য-গ্রহণ বিষয়ে অমুকূল হয়; আর আমাদের জীবন, আমাদের প্রাণ যদি চতুর্দিকের অসত্যমূলক বিষাক্ত বায়ুতে বিকৃত হইয়া যায়, যাহা অসত্য, অনাঙ্গ, অথবা কল্পনা-প্রসূত, সেই সকল বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া সেই সকলের রসাস্বাদনে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে অমাদের জীবনে সত্যগ্রহণের অধিকার বিস্তুত হইয়া যায়। চতুর্দিকে সত্য ছড়ান রহিয়াছে, অথচ এই জ্ঞা অনেকের সে দিকে দৃষ্টি পড়ে না, মন সে পথে ধাবিত হয় না, সত্যগ্রহণের পিপাসা তেমন করিয়া প্রাণে উদ্ভাসিত হয় না। তাহার সঙ্গে সত্যের মূলস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিও বিমুখতা উপস্থিত হয়।

জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা থাকিলে, সত্যগ্রহণে কি প্রকার আগ্রহ উপস্থিত হয়, সফলতা লাভ হয়, আমরা আমাদের অগ্রবর্তী ধর্ম্যাগ্রগণের জীবনের কথা উল্লেখ করিয়া সহজে প্রদর্শন করিব। প্রথমে আমাদের ধর্মপিতামহ রামমোহন রায়ের জীবনের কথা বলি। তিনি বাল্যে সে সময়ের প্রচলিত প্রথাযুগারে মুসলমান মৌলবীর নিকট পারস্যভাষা শিক্ষা করেন, সেই সঙ্গে কোরাণের একেশ্বরের ভাব তাঁহার প্রাণকে স্পর্শ করে। ঈশ্বর অথবা এবং এক অধিতীয়, এই দুই সত্য তাঁহার সরল বাল্য মনকে সহজেই অধিকার করে।

পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের মধ্যে একেশ্বরবাদ ও বহুদেববাদ যখন পাঠ করিলেন, তখন হিন্দুধর্মের একেশ্বরবাদ নানা বাদ প্রতিবাদ ও প্রতিকূলতার মধ্যেও সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে প্রধান কর্তব্য হইয়া পড়িল। ষোলবৎসর বয়সেই এ সত্যে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া, তিনি একেশ্বরবাদ সমর্থন করিয়া একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। দেশীয় ও বিদেশীয় সকল ধর্মশাস্ত্র মধ্যে এই সত্যের সমর্থন ও প্রচার তাঁহার বিরাট জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্ববিশ্রেষ্ঠ কার্য হইয়াছিল।

ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথ ধর্মীয় গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, গৃহ পরিবারে নানা অশুষ্ঠানে বাহ্যমূর্তিতে খণ্ড দেবদেবীর পূজা হইতেছে, দেখিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রথমে ধারণা ছিল, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বুঝি মূর্তিপূজার বিধি ব্যবস্থাতেই পূর্ণ, নিরাকারের কথা তাহাতে নাই। কিন্তু যখন তাঁহার হাতে উপনিষদের একখানা খণ্ড পাতা আসিয়া পড়িল, এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মুখে সেই পত্রে লিখিত শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিলেন, অমনই সত্যের অগ্নি দাউ দাউ করিয়া তাঁহার প্রাণকে অধিকার করিয়া বসিল; সত্য নিরাকার ত্র্যম্বকের বিশুদ্ধ জ্ঞান তিনি সত্য উপলব্ধি-যোগে লাভ করিলেন। সেই উপলব্ধিকে আরও গভীর, আরও উজ্জল, আরও জীবন্ত করিবার জন্মই তাঁহার জীবনবাণী পর পর সাধনা। সত্যের অগ্নি সরল ত্বিতি প্রাণে সহজেই জ্বলিয়া উঠে।

তাঁহার পর আমাদের ধর্ম্মনেতা, ধর্ম্যাগ্রজ ব্রহ্মানন্দের জীবন দেখি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার ভিতর দিয়া যুবক কেশবচন্দ্রের প্রাণ ধর্ম্মক্ষেত্রে সত্যের অনুসন্ধান হইয়া পড়িল। তিনি দেখিলেন, প্রাচীন সমাজের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থায় তাঁহার তৃপ্তিলাভ হইল না। ইংরেজি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া, বাইবেল শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ প্রবেশ ছিল; কিন্তু খৃষ্ট সম্প্রদায়ের প্রচলিত আচার আচরণও সত্যের পিপাসার তৃপ্তিলাভ হইল না। তিনি অকাম্পদ স্বর্গগত রাজনারায়ণ বসু-কৃত তৎকালের ব্রাহ্মসমাজের বিধিব্যবস্থা-সম্বলিত একখানা পুস্তিকা তাঁহাদের কলুটোলার গৃহে এই সময় প্রাপ্ত হইলেন। পুস্তিকা পাঠ করিয়া সহজে তাঁহার প্রতীতি হইল, তিনি যে সত্য ধর্ম্মের প্রয়াসী, তাহার মূল এখানে রহিয়াছে। সত্যের সন্ধান পাইলেন, সত্যের আশ্বাদন লাভ করিলেন, বিনা বিচারে ব্রাহ্ম-

সমাজে যোগদান করিলেম। ব্রহ্মানন্দ সত্যের মহিমা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—“সত্যের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে ব্যক্তির হৃদয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি এই মণ্ডা-লোকে থাকিয়াও দেবতাদিগের স্থায় গৌরবান্বিত হন। যে দেশে সত্যের রাজ্য সংস্থাপিত হয়, সে দেশ দেব-লোকের স্থায় স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি-নিকেতন হয়। সত্য কাহারও মিথ্য নহে, অথচ ইহাতে সকলেরই অধিকার। সত্য অর্থের দাস মহে, সত্যাটের অশ্রুগত মহে। \* \* \* ইহা দেশেও বদ্ধ নহে, কালেও বদ্ধ নহে, সকল দেশে সকল কালে ইহার আধিপত্য। সত্য মহৎ এবং উদার। ইহা আবার জীবন্ত বলীয়ান। ইহার আধার নির্জীব জ্ঞানও মহে, তরল ভাবও নহে, জীবনই ইহার আবাসভূমি; জীবনেতেই ইহার যথার্থ প্রকাশ। যখন সমুদয় জীবন স্বর্গীয় বলে সংসারকে পরাস্ত করিয়া, পাপ তাপ ও মৃত্যুকে পদানত করিয়া ঈশ্বরানুভিমে উন্নত হয়, তখনই সত্যের প্রকৃত মহিমা প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক সত্যই আমাদের জীবন এবং যে পরিমাণে আমরা সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হই, সে পরিমাণে আমরা জীবনবিহীন ও জড়ভাবাপন্ন হই। সত্যের একমাত্র জীবন্ত বল যে, ইহার কল্পামাত্র কিরণে অমানিশার অভেদ্য তমোজল ছিন্ন ভিন্ন হয়। ইহার সংস্পর্শমাত্রে সহস্রাধিকবর্ষসঞ্চিত বুদ্ধায়তন পাপরাশি চূর্ণ হইয়া যায়, নিরাশ মুমূর্ষু ব্যক্তি নবজীবন ও নব উদ্যম প্রাপ্ত হয়, অশি দুর্বল ভীরা ব্যক্তি মহাবীরের স্থায় বীর্য্যবান্ হয়, এবং অতি সামান্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিও সম্রাট-পরাজিত প্রভাপে, সহস্র সহস্র লোকের মনকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের দ্বারা স্বীয় মহান লক্ষ্য সংসাধন করিয়া লয়। সত্যের বলের নিকটে জ্ঞানবল, ধনবল, দেহবল সকলই পরাভূত হয়; কেবল পরাভূত এমন নহে, কিন্তু অশ্রুগত দাসের স্থায় ইহার কার্য্য করে। \* \* \* এই উদার ও জীবন্ত সত্যের উপরে আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম সংস্থাপিত। ফলতঃ সত্যই ব্রাহ্মধর্ম।”

নবযুগের নবধর্মক্ষেত্রের তিনটি প্রধান ব্যক্তির জীবনের কথা আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করিলাম। তাঁহাদের পর, প্রেরিত প্রচারক, সাধক, বিন্যাসী, বিন্যাসিনী ষড় লোকই এই পবিত্র ধর্মক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনের কথা বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, কেহ একটি ধর্মগ্রন্থপাঠের ভিতর দিয়া,

কেহ একটি পত্রিকাপাঠের ভিতর দিয়া, কেহ কোন সং-প্রসঙ্গের ভিতর দিয়া, কেহ একটি সাধু আচার, আচরণ ও ভাবের দর্শনের ভিতর দিয়া, কেহ কোন উপাসনার ভিতর দিয়া, কেহ একটি ব্রহ্মসঙ্গীতশ্রবণের ভিতর দিয়া, তন্নি-হিত সত্য আকৃষ্ট হইয়া, এই নবধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং নব ধর্মমণ্ডলী আলিঙ্গন করিয়া চির জীবনের জন্ত আপনাকে ও আপন পরিবার পরিজনকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া, আপনাদিগকে ধর্ম মনে করিয়াছেন।

সে দিন যেন বর্তমানে নাই; সে সত্যের সমাদর এখন যেন আমাদের মণ্ডলী ও পরিবারে তেমন নাই, বাহিরেও দেশের মধ্যে তেমন নাই। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনেও এখন সত্যের সমাদরের অভাব দেখিয়া আমরা স্তব্ধ হইতেছি। আমাদের মধ্যে এখন কি গ্রন্থের অভাব আছে? এখন কি পুস্তক, পুস্তিকা, ধর্ম-পত্রিকার অভাব আছে? দৃষ্টান্তের, আদর্শের কি অভাব আছে? অভাব নাই, অথচ অভাবজনিত প্রতিক্রিয়ার ফল আমরা ভোগ করিতেছি। ধর্মক্ষেত্রে আমাদের দেশ নানা কল্পনার সূত্র আশ্রয় করিয়া, সত্যের পথ হইতে আচার ও আচরণে কত দূরে সরিয়া পড়িতেছে, তাহা কি আমরা দেখিতেছি না? আমাদের নিজ মণ্ডলীতে, নিজেদের জীবনেও ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের স্থায় তেমন যেন সত্যের সমাদর নাই। তাই প্রচুর আয়োজন সত্ত্বেও আমাদের জীবন, আমাদের মণ্ডলী ও পরিবার ক্রমে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছে। সকল সত্যের মূল প্রস্রবণ জীবন্ত ঈশ্বরের আমরা উপাসক। এ বিষয়ে তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া তাঁহারই সহায়তা ভিক্ষা করি, তিনি সত্যসাধনে আনাদিগকে অগ্রিমস্ত্রে দীক্ষিত করুন। “সত্যমেব জয়তে নানৃতম্”। সত্যেরই জয় হইবে, মিথ্যা বিজয়ী হইবে না। সত্যোক্ত আমরা নব জাগরণ লাভ করি, দেশ নব জাগরণ লাভ করুক; সত্যের রাজ্য, সত্যযুগ ধরাধামে নবভাবে সমাগত হউক।

## ধর্মতত্ত্ব।

নববিধানের ঈশ্বর।

নববিধানাচার্য্য বলেন, “দেবতা দেবতা সকলে বলে। আমি সাক্ষাৎ দেবতা, জাগ্রৎ ঈশ্বর তাঁকে বলি, যে দেবতা কাজ করেন, বলেন ঠিক মাহুষের মত, অথচ মাহুষ নন।” “বাস্তবিক ইহাই



জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ। জীবন্ত মানুষ আর মরা মানুষে যেমন পার্থক্য, নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বর ও মানুষের মনঃকল্পিত বা হস্তরচিত মৃত ঈশ্বরের তেমন পার্থক্য। জীবন্ত মানুষ কাজ করে, কথা বলে, কিন্তু মৃত মানুষ তাহা কি পারে? তেমনি আর বত লোকে বত রকম ঈশ্বর করনা করিয়া, কিংবা আন্দাজে সিদ্ধান্ত করিয়া, বা নাম জপ করিয়া, বা শাস্ত্রের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া, অথবা মৃত্তিকার মৃত্তিতে গঠন করিয়া পূজা অর্চনা বন্দনা করিতেছে, সকলই অপ্রত্যক্ষ মৃত দেবতা। কেননা, যে দেবতা জীবন্ত ব্যক্তির জ্ঞান প্রত্যক্ষ বিশ্বাসচক্ষে স্বয়ং দর্শন না দেন, বা প্রার্থনার উত্তর বিবেকের বাণীতে না দেন, তিনি কখনই জীবন্ত ঈশ্বর নন। জীবন্ত ঈশ্বরের পূজার জীবন চালা হয়, জ্ঞানচক্ৰ উজ্জ্বল হয়, আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যায়, এবং সর্বকারণে তাঁহার কার্যশীলতা উপলব্ধ হয় ও পাপ প্রবৃত্তি ধ্বংস হয়। ভক্তগণ তাঁহাকে নানা নামে ডাকেন, বা নানা ভাবে দেখিয়া তাঁর বিভিন্ন নাম দেন; কিন্তু তিনি বলেন, “আমি যা, তাই আমি”। এই ঈশ্বর নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বর।

### প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা।

প্রার্থনার অবস্থা যথার্থ ভিত্তিার অবস্থা। চরিত্রশ্রীভিত্তিক, ক্ষুদ্র কাতর ভিত্তিার যেমন অনন্তগতি হইয়া অন্ন ভগ্নের জন্ত ভিক্ষা করে, তেমনি ভিক্ষার্থীর ভাবই প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা। নিরন্ন ব্যক্তির অন্ন না হইলে যেমন চলেনা বলিয়া সে ব্যাকুল অন্তরে আগের জন্ত ভিক্ষা করে, তেমনি নিরুপায় হইয়া, তাহা না হইলে চলে না বলিয়া, ব্যাকুল অন্তরে চাওয়াই প্রার্থনা। এমন অবস্থা মনের না হইলে প্রকৃত প্রার্থনা হয় না। সে অবস্থা আমাদের হয় না বলিয়াই প্রার্থনা সফল হয় না; প্রার্থনার উত্তর লাভ হয় না। তাহার কারণ, উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কখনও ভিক্ষা করিতে চায় না, কিংবা যাচার বাড়ীতে কিছু অন্নসংস্থান আছে, সে ব্যক্তিও তেমন ভিক্ষা করিতে পারেনা। আমাদের মনে, পুরুষকার দ্বারা বা সাধন দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, এই অহং আছে বলিয়াই, প্রকৃত প্রার্থনার অবস্থা আমাদের আসে না। পুরুষকার দ্বারা বা সাধন দ্বারা ধর্ম অর্জন করিয়া সিদ্ধ হইতে পারি, ইহা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে যে পারে, সেই প্রকৃত প্রার্থনা করিতে পারে এবং সেই ব্যক্তিই প্রার্থনা দ্বারা হাতে হাতে ফল লাভ করে। এই ভক্তই ঈশ্বর কেশবচন্দ্রকে বলিলেন, “প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, প্রার্থনা করিলে সব পাইবে। তোমার বইও নেই, কিছুই নেই, তুই কেবল প্রার্থনাই কর।” এবং কেশবও অনন্তগতি হইয়া কেবল প্রার্থনাই করিলেন, “সবেধন নীলমণি” যাকে বলে, প্রার্থনাকে তাই করিলেন এবং “প্রার্থনা মানি বলিয়াই জীবন যাহা তাহা” ইহাই স্মিকার করিলেন। ইহাই প্রার্থনার প্রকৃত অবস্থা।

### জগন্নাথের রথযাত্রা।

ঐক্য রাজা হইয়া রথযাত্রা করিয়া রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারই নিদর্শন জগন্নাথের রথযাত্রা। রথের উপর আরুঢ় হইয়া জগন্নাথ রাজ্য-বিস্তারে যাত্রা করেন ও শত সহস্র ভক্ত বহুতে দড়ি ধরিয়া রথ টানিয়া লইয়া যান। তাঁহাদের বিশ্বাস, রথে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া তাঁহার রথ টানিলে বৈকুণ্ঠে তাঁহাদের সঙ্গতি হইবে, জীবনান্তে আত্মা স্বর্গে চলিয়া যাইবে। আমরাও বিশ্বাস করি, এই মানবজীবনই গমনশীল রথস্বরূপ; এই জীবনের জীবন হইয়া প্রাণনাথ জগন্নাথ, যিনি নিত্য অবিরূঢ় হইয়া আছেন, তাঁহার অমুজ্জা মত যদি আমরা এই জীবনরথকে টানিতে পারি, নিশ্চয়ই আমাদের জীবনের অনন্ত গতি, অমর-লোকে সঙ্গতি হইবে এবং সমগ্র জীবনে তাঁর রাজ্য বিস্তার হইবে। ধর্মবিধানরূপ রথেও জগন্নাথ আরুঢ় হইয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তার জগতে করিতেছেন। সে বিধানরথ টানিলেও আমাদের সঙ্গতি হইবে।

—•—

## নববিধানে মহারানী সুনীতি দেবীর নবজীবন।

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

অসবর্ণ ও আন্তর্জাতিক মিলন কোন দিন হিন্দুসমাজ ও হিন্দু-শাস্ত্র সমর্থন করিতে পারে নাই। তাই হিন্দু কুচবিহার অসবর্ণ মিলনকে সেই রেলগাড়িবিহীন সুদূর ভূমি হইতে হিন্দু অমুষ্ঠানের বিসদৃশ রক্তে রঞ্জিত করিয়া চারি দিকে বিস্তৃত করিলেন। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজেও বাঁহারা বিধাতার আদেশ ও তাঁহার বিশেষ প্রকাশরূপ আলোক হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়েও সে বিষয়ে প্রকৃত আলোক উপস্থিত হইতে পারে নাই। অবশ্য, অমুষ্ঠানক্ষেত্রে তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে, সেই সময়-কেন্দ্র হইতে সমুখিত প্রার্থনা ও বিধাতার বিশেষ আদেশাভিগত ব্রহ্মানন্দ, ব্রহ্মানন্দকল্পা এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক সংস্কার হইতে বিনির্মূল যুবক রাজকুমারের বীরোচিত শাস্ত ও সমাহিত ভাব ও স্বর্গীয় চিত্রে এ অমুষ্ঠানের অভিধান অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেন। এই আদেশ-সম্মত অমুষ্ঠানে সহযোগিতা-ও-সহায়-ভূতিকাচক বিশ্বাসিবর্গের সেই আলোক-সম্মত মহাভাবের ভিতরেও সে অভিধান উজ্জ্বল হইয়াছিল। অধীতব্য বিষয় বাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা বিধাতার বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ এই Revelation-এর বিশদ অর্থ সংগ্রাম ও কোলাহলের ভিতরেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন। “Seven seals opened comes the truth out.” সাতটা সীল উন্মুক্ত না করিলে সত্য বাহির হয় না।

গীতার বাণী সরণ না হইলে কেহ গীতা বুঝিতে পারে না।

এক স্নেহ ও এক উপদেশের অনেক অর্থ হইয়া যায়। বিধাতা অরং প্রকাশিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ীয়া সত্যকে সরলভাবে ও সরল অভিধানে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় অস্থানে পাত্র ও গাজী বরংপ্রাপ্ত হইলে যখন তাঁহার বিধাতার বিধানে ব্রাহ্মগন্ধি অহুসারে প্রকৃত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তখন সেই বাগদান-বাসরে তাঁহার আলোকে ব্রহ্মানন্দের ভিতর হইতে কতক উপদেশক্ষেত্রে বিধাতার যে অভিধান প্রকটিত হইল, তাগতেই তাঁহার অভিপ্রায়ের গীতা সরল হইতে সরলতর হইয়া পড়িল। ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, “স্মৃতি, তুমি মনে করিও না যে, তুমি রাণী হইলে। আমি দেখিতেছি তুমি দাসী হইলে।” কতক একটা বিধাতার অহুজাত রাজ্যে, নবসংস্কার-বিহীন নরনারীদিগের ভিতরে দাসী রূপে জীবন উৎসর্গ করেন ও তাঁহাদের ভিতরে বিধাতার নবালোকের মস্ত দীক্ষিতরূপে ব্যবহৃত করেন, উভয়দিকের প্রত্যাদেশের ভিতর দিয়া ব্রহ্মানন্দের ভিতরে এই নবালোক আসিয়াছিল। এই আলোকে ব্রহ্মানন্দ কুচবিহারকে দর্শন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ এই আলোকে প্রোণিত হইয়া “রাজ্যধিকার” প্রার্থনায় বলিয়াছেন, “তোমার আদেশে কতক অন্ধকারের ভিতর ফেলিয়া দিলাম।” অন্ধকারের পর আলোক আসে। এই মহাবিশ্বাসে সুদূর দেশে, অজ্ঞাত ও নবালোক-বিহীন জাতির মধ্যে কতক এই ভাবে ফেলিয়া দিলেন। বিধাতার বিধানে তাঁহার নূতন বিধানকে সরল ও বিশদ করিবার জন্য তাঁহার পূর্বাযোজনরূপে (Pre-arrangements) তাঁহার কত গুপ্ত রহস্যের কার্য চলিতে থাকে। ফল প্রথমে তরুর কঠিন কাণ্ডের ভিতরে অদৃশ্য ভাবে নিহিত থাকে। তাহার পর তরুর সেই কঠিন কাণ্ড ভেদ করিয়া কেবলকি এবং তৎপরে বিকশিত সুরভিপূর্ণ কুসুমের পরিণত হয়। বিধাতা কুচবিহার-বিবাহে সেই সত্য বিকশিতভাবে প্রকাশ করিলেন; এবং দেখাইলেন, কত গুপ্ত পথ ভেদ করিয়া আলোকের গতি চলিয়া যায়। ব্রহ্মানন্দ কুচবিহার প্রদেশে প্রবেশের প্রত্যাদেশ যে কেবল যুবক রাজকুমারের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা নহে; ব্রহ্মানন্দের এই আলোক রাজগণসমূহ আর এক সুশিক্ষিত যুবকের জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। আদেশবাদী, সুশিক্ষিত ও মার্জিতজ্ঞান-সম্পন্ন যুবক কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ এই আলোক ও প্রত্যাদেশের স্পর্শ অনুভব করিলেন। ব্রহ্মসমাজের নবীন পরিবারের সহিত আধ্যাত্মিক যোগে যুক্ত হইয়া, তিনিও তাঁহার স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণের পথে আপনাকে নিয়োজিত করেন। প্রত্যাদেশের সঙ্গে প্রত্যাদেশের মিলন এইরূপই হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার দ্বিতীয় কতক বিধাতার আদেশে কুচবিহারে প্রেরণ করিলেন। কুচবিহারের স্বদেশে ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয়বার প্রবেশে এই ব্রহ্মগীতা আরও সহজ ও বোধগম্য হইয়া গেল। হুই-দিকের হুই হস্ত আবার মিলিল। এক দিকে নবালোকসম্পন্ন হুই যুবক রাজকুমার, অপর দিকে হুই ভগিনীর নবীন ক্ষেত্রে

মিলন; এই নবীন ক্ষেত্রে প্রত্যাদিষ্ট ব্রহ্মানন্দের প্রত্যাদেশ। এক হিমালয় হইতে পঞ্চশ্রোত এক প্রশস্ত শ্রোতে আসিয়া মিলিল। বিধাতার এক নূতন কাচকলকে আসিয়া সকল আলোক এক নবীন আলোকে মিলিয়া গেল।

এই স্থানে ইহাদের নূতন জন্ম। এই স্থানে নববিধানের নবীন মীরার নবীন জন্ম। বিধাতার আদেশ আসিয়া কুচবিহার প্রদেশে কোন্ সত্য প্রকাশ করিলেন, ইহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর দৃষ্টব্য ও অধীতব্য বিষয়। From the oldness of things to the newness of spirit, বোর পৌত্তলিক কুচবিহার হইতে অপৌত্তলিক নিরাকারবাদী রাজসম্মান ও রাজপরিবার বাহির হইলেন। এই মহাভাবের ভিতর হইতে ভক্তিমতী নবীন মীরা ভক্তির নবীন পথে ভগবান্ ও ভগবৎসম্মানদের সেবার আশ্রয় করিলেন। এই স্থানে মীরার সঙ্গে আবার দ্বিতীয় মীরা আসিয়া মিলিলেন। উৎসর্গীকৃত জীবনের ভিত্তির উপর, এই ভূমিতে নববিধানমন্দির বিধানমহাশ্রম ঘোষণার জন্ত উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মনোনীত ও প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও রাজপরিবার হইতে বিধানপতির গৌরব বোধিত হইল। নববিধানের কুচবিহার নবীন দৃশ্য ধারণ করিলেন। নববিধানের নবীন Testament ও সেই পুরাতন ক্যানা বিবাহের (Marriage of Cana) নবীন দৃশ্য দেখাইলেন। ক্যানা বিবাহে পানীয় জল বিশ্বাসীর চক্ষে আধ্যাত্মিক সুরার (wines of spirit) পরিবর্তিত হইল। বিশ্বাসীর চক্ষু দেখিতে পাইল না। “And I, Daniel alone, saw the vision; for the men that were with me saw not the vision.” এই মহান্ সত্য কুচবিহার ব্যাপারে প্রমাণিত হইল। কাঁটার গাছে বাঁহারা গোলাপ দেখিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, অনেক অবিশ্বাস, বিষ বাধা ও বিরোধীর বিরুদ্ধাচরণ অতিক্রম করিয়া, এই কুচবিহার দৃশ্য গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিধাতার সত্য চিরদিনই বিশ্ব-বাধা-সাপেক্ষ। এ বাধা চিরদিনই চলিবে। এই বিধাতার প্রেরিত নবীন সমাচারের সাক্ষ্য কে প্রদান করিবে? এই মহা কোলাহল ও সংগ্রামপূর্ণ ব্যাপার, সেই অটল পাছাড়ের মত দণ্ডায়মান ব্রহ্মানন্দ, সেই ব্রহ্মানন্দকত্যা, আর চিরপ্রথাভূগত প্রত্নসংস্কারপূর্ণ প্রদেশ ও পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন যুবক রাজকুমারের বীরোচিত উত্থান ও নবধর্মগ্রহণ ইহার সমীচীন সাক্ষ্যরূপে চিরদিন বিশ্বাসী জগতের সমক্ষে থাকিয়া যাইবে। ব্রহ্মানন্দের নীরবতা এবং তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে উথিত প্রাণপূর্ণ বাণী “Posterity would judge” এই ইতিহাসের লেখনীরূপে চিরদিন বর্তমান থাকিবে। “লুক” “মথি” সমাচার লিখিতে পারেন। কে বলিবে, কখন ইহাদের আগমন হইবে? নববিধানের প্রেরিত-বর্গ ও নববিধানের বিশ্বাসিবর্গ, বাঁহারা এই ব্যাপারে সহযোগী হইয়া সেই কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে

ডাক্তার প্রধান সহযোগী ডাক্তারী প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ ও ত্রৈলোক্যনাথ, ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের পর "Life and Teachings of Keshub Chunder Sen", "আচার্য্য কেশবচন্দ্র" এবং "কেশবচরিত" মহাসাহিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া তবিত্যন্তের হস্তে নিবেদন করিলেন। পাশ্চাত্য তপস্বিনী বুঠবাদিনী কুমারী "পিগট্‌ও", তাঁহার নবতিবর্ষে নিভৃত হিমালয়-কক্ষে বসিয়া, তাঁহার ক্ষীণচক্ষু ও ক্ষীণ শক্তি লইয়া, হস্তে লেখনী ধারণ করিলেন; এবং তিনি সেই প্রভু দেশাচার ও সংস্কারপূর্ণ কূটবিহার ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, সেই সংগ্রামপূর্ণ ব্যাপারে বিধাতার বিশেষ বিধান (Spiritual Dispensation) ও বিশেষ প্রকাশের (Special Revelation) যে সকল কার্য্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহারই সাক্ষ্যস্বরূপ "Keshub Chunder Sen" পুস্তিকা পৃথিবীর হস্তে দান করিলেন। নববিধান "মথি" ও "লুকস" অপেক্ষা করিতেছেন।

সুসমাচার-লেখকেরাই পৃথিবীর বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া সুসমাচার লিখিতে পারেন। অত্যাধিক কেবল উপরের আবরণ অধ্যয়ন করেন। "The evangelists only can write the evangelists as others study only the surface". So truly the writers of such things come long after. এ সত্য পৃথিবীতে চিরদিন থাকিরা ধাইবে। কূটবিহার ব্যাপারের সুসমাচার-লেখক পরে আরো আসিতেছেন।

নামকুব, রাঁচি।

ঐগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

## সন্তানবৎসলা সাধ্বী নিখরমোহিনী দেবী।

সে অনেক দিনের কথা, দুইটা বছর, কাকা তাইপো গৃহের বাহির হইয়া আসিলেন। সংকল্প, স্বাবলম্বনে জীবনের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন। একজন আজ অশীতিবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বাবলম্বনে ও ভগবানের আশীর্বাদে সোভাগ্যের কত উচ্চ শিখরেই উঠিয়াছেন। ধন্য, স্বনামধন্য স্যার রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি আরো দীর্ঘজীবী হউন, আরো সোভাগ্যশালী হইয়া, বঙ্গের ও ভারতের প্রকৃত নক্ষত্র হইয়া, জাতির ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন।

অপর বন্ধু রাধা বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়। পরসেবা সাধন দ্বারা জীবনের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষার চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত হইলেন, এবং তাহাতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া, গভর্ণমেণ্টের কার্য্য লইয়া, নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বহু লোকের সেবা-সাধনে যত্ন হইলেন।

ক্রমে ব্রহ্মানন্দ-ঐকেশবচন্দ্রের ও নববিধানের প্রেরিতগণের প্রভাবাধীনে আসিয়া, নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস স্বীকারপূর্বক,

ঐকনিষ্ঠ স্বামী পরিবার গঠনে নিরত হইলেন। এই মহাত্ম-সাধনের পূর্ণ সহায় ও সহযোগিনী পাইলেন সহধর্মিণী দেবী নিখরমোহিনীকে। গোড়া হিন্দু পিতার ও হিন্দু আত্মীয় আত্মীয়গণের ঘোর প্রতিবন্ধকতা ও নির্যাতন ভুগ্ন করিয়া, সত্যী সাধ্বী দেবী স্বামীর পূর্ণ অনুগামিনী হইলেন এবং কি দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত অক্লান্তভাবে নববিধান সাধন করিতে ও পরিবারে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে বহুপরিশ্রম হইয়াছিলেন।

"নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয়দমন, পর-উপকার, বৈরাগ্যসাধন" সত্যই সংসারধর্মপালনে তাঁহাদের সার মন্ত্র করিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া এবং সম্মান সম্মতিদিগকেও এ সঙ্গ লইয়া, উপাসনা সাধন করা তাঁহাদের যেমন নিত্য ব্রত করিয়াছিলেন, এমন অতি অল্প পরিবারেই দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান আমোদ করিয়া অনেক সময় বলেন, "আমাদের বাবা মা যে উপাসনা করিয়াছেন, আমাদের তিন পুরুষ আর উপাসনা না করিলেও চলিবে।" ইহা আমোদের কথা বটে, কিন্তু বাস্তবিকই পরিবারবর্গের জীবনে উপাসনা-ধন্য যেন চির সঞ্চার করিয়া দেওয়াই তাঁহাদের সংকল্প এবং নিষ্ঠা ছিল।

দেব স্বামীর তিরোধানের পরও সত্যী উপাসনা-সাধনই জীবনের অঙ্গপান হইয়াছিল। কি ব্যাকুল প্রাণেই প্রার্থনা করিতেন। এমন কি, শেষ নিশ্বাস বাহির হইবার পূর্বেও উপাসনা করিতে, ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিতে বিমুগ্ধ হন না।

যেমন স্বামীর ধর্মপালনে তিনি নিরত ছিলেন, তেমনি পরসেবা-পরায়ণা ও সন্তানবৎসলাও তিনি ছিলেন। চিকিৎসক স্বামী যেমন চিকিৎসা দ্বারা সকল শ্রেণীর রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরই সেবার নিরত ছিলেন, অর্থোপার্জন অপেক্ষা চিকিৎসা করিয়া রোগ আরোগ্য করাই তাঁহার যেন একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল, বিনা মূল্যে গরীব ছুখী ও ব্রাহ্মসমাজের সকল লোকের চিকিৎসা করাই যেন তাঁহার ব্রত ছিল; তেমনি সকলকার নানা প্রকারে, বিশেষতঃ গরীব ছুখীদিগকে অর্থ ও পথাদি দিয়া সেবা করা নিখরমোহিনী দেবীর জীবনের কার্য্য ছিল।

সকল মাই সন্তানবৎসলা হন, কিন্তু নিখরমোহিনী যেন সন্তান-স্নেহে কিছু অধিক বিভোর। অথচ সন্তান সম্মতিগণের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা ও উপাসনাশীলতা বাহাতে প্রতিষ্ঠিত হই, ইহাই তাঁহার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল।

সন্তানবৎসল্যের জন্য আত্মদানের দৃষ্টান্ত দেখাইতে যেন তিনি আসিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মধ্যমপুত্র, চিকিৎসাব্যবসারে দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় সর্বোচ্চপদাভিষিক্ত, বঙ্গের গৌরবহানীর, কৃতি সন্তান মেজর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু হইলেও সেই মহামোক্ষ নির্বাণ করিতে, পরলোকে গিয়া স্বামী-পুত্রের সহিত পুনর্মিলন জন্যই যেন ইচ্ছা-মুগ্ধা অবলম্বন করিয়া, অমরধামে যাত্রা করিলেন।

স্বর্গের অনন্ত সন্তানবৎসলা মা যেমন প্রিয় সন্তানের মৃত্যু সহ্য করিতে পারেন না এবং সন্তানের জন্ত আত্মদান করেন, মা নিখরমোহিনী দেবীও যেন সেই আদর্শে আত্মদান করিয়া চলিয়া গেলেন। ভক্তবৎসলা মা তাঁর সন্তানবৎসলা সতী কন্ডাকে তাঁহার প্রেমমুগ্ধ উজ্জলরূপে দর্শন দিয়া, পতিপুরসহ অমরদলে নিত্য শান্তি-ক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত সন্তান ললিতদিগকেও সেই মা হইয়া শান্তি ও সাধনা দান করুন।

— — —

## পুণ্যাশ্রমের বার্ষিক রিপোর্ট।

দয়াময় ঈশ্বরের অপার করুণার, তাঁর অনন্ত আশীর্বাদ মাধার লইয়া, আমাদের এই পুণ্যাশ্রমের চারি বৎসর পূর্ণ হইল। নানা-ধাধা বিস্তারিত করিয়া, অনেক বিপদ পরীক্ষা ও ঝড় তুফানের মধ্য দিয়া, ইহাকে আসিতে হইয়াছে। মঙ্গলময় ভগবানের অসীম করুণাই আমাদের জীবনপথের একমাত্র আলোক ও প্রাণের চির সঞ্চল। সেই অনন্ত করুণার বলেই ইহা চারি বৎসর সঞ্জীবিত রহিয়াছে। তবে এতদিনে ইহার আশারূপ কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া ইহার জন্মগ্রহণ, যে উচ্চ সেবাব্রত ইহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তাহা কতদূর সফল হইয়াছে, বলিতে পারি না। মনে হয়, ইহার এই কয় বৎসরে যতদূর আশা ছিল, তাহার কিছুই পূর্ণ হয় নাই। যে মহাশয়িষ্যতার মাধার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, সে কঠিন কর্তব্যপালনে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারা গেছে, তাহা বলা যায় না। ইহার প্রকৃত উন্নতি ও মঙ্গলের জন্ত যতদূর বাহ্য করা উচিত ছিল, তাহার কিছুই, বোধ হয়, করিতে পারা যায় নাই। এই সব নানাবিধ দোষ ত্রুটি অপরাধের জন্ত, যথার্থই অমৃতপ্ত-জ্বরে ও অকপটভাবে, ভগবানের চরণে আজ ক্ষমা তিকা করিতেছি। সেই করুণামিধান প্রেমময় বিশ্বদেবতা আমাদের সকল দোষ ত্রুটি অপরাধ নিজ গুণে দয়া করিয়া মার্জনা করুন। নূতন বৎসরে নূতন করে, এই সেবাব্রতপালনে, কঠিন কর্তব্য-সাধনে বল শক্তি বিধান করুন এবং ইহার যথার্থ উন্নতি ও মঙ্গল-সাধনকার্য্যে আলোক ও আশীর্বাদ দান করিয়া কৃতার্থ করুন, জ্বরের সহিত কার্য্যমনোবাক্যে তাঁহার চরণতলে এই প্রার্থনা করি।

যে অনন্ত করুণাময়ী বিশ্বজননীর অসীম রূপার, এই পুণ্যাশ্রম এতদিন সঞ্জীবিত থাকিয়া, তাঁহারই করুণার গুণকীর্তন করিতেছে, তাঁহার অসীম রূপার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সেই জগজ্জননীর মঙ্গলময় অন্তর চরণে প্রাণতর্য্য তত্ত্ব ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, অবনতমস্তকে লুপ্তিতজ্জ্বরে বারবার প্রণাম করিতেছি। আর বাঁহারা অমৃতগ্রহপূর্ব্বক জ্বরের সহায়ত্ব, সাহায্য ও আশী-র্বাদদানে এই পুণ্যাশ্রমকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, সেই লজ্জন ও ভাবাক্ষীদের চরণে বিনীত জ্বরের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত

পত ধন্যবাদ জানাইয়া প্রণাম করি।

ইহার আর বাহ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহাতে এখন মোট ১৫১৬ জন থাকে, স্থানান্তাবে ও অর্থাভাবে অনেককে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

এককালীন দান।

ডাক্তার পাল ২০০, শ্রীমতী ভক্তিমতি ২০, শ্রীমতী তরুণালা সেন ২০, শ্রীমতী মীরালা দাস গুপ্ত ১০, শ্রীমতী হেমন্তময় মল্লিক ১০, শ্রীমতী এ, সি, সেন ১০, শ্রীমতী এম, চানমিয়া ১০, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী গুপ্ত ১০, শ্রীমতী বীণা সেন ১০, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু ২০, শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (সংগৃহীত) ১ম বারে ১০০, ২য় বারে ১২০, ৩য় বারে ১৮০, শ্রীযুক্ত অনিল মৈত্রের মাতা ১০, ডাঃ গীরেন্দ্রনাথ সরকার (পুরী হইতে সংগৃহীত) ১০০, মিসেস মল্লিক ২০, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার ২০, শ্রীমতী আনন্দি দেবী ২০, শ্রীমতী নীলী ২০, মিসেস মুখার্জী চাটার্জি ৫০, শ্রীমতী প্রতিমা ব্যানার্জি ৫০, শ্রীমতী রমা দেবী (সংগৃহীত) ১৭০, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেনের মাতা ৫০, স্বর্গীয় মতিলাল মুখার্জির স্ত্রী ৫০ টাকা। মোট ১৩০০।

মাসিক চাঁদা।

মহারানী সুচারু দেবী মাসিক ১০০ হিঃ ৫০০, শ্রীমতী মলিকা মহলানবিশ ১০—৬০, শ্রীমতী সুখা ব্যানার্জি ১০—১০০, শ্রীমতী প্রফুল্ল হালদার ৫০—৮৫০, শ্রীমতী অমলা সেন ১০—৪০, শ্রীমতী সুখা সেন ১০—৮০, শ্রীমতী কমলা সেন ১০—১৪২০, শ্রীমতী সুশীলা মুখার্জি ১০—১২০০, শ্রীমতী পুণ্যপ্রভা বসু ১০—১২০০, শ্রীমতী সুখা দাস ৫০—৬০০, শ্রীমতী সরলা দাস ৫০—৬০০, শ্রীমতী কিরণ্ময়ী সেন ১০—৬০, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জি ১০—৬০, শ্রীমতী বাণী চাটার্জি ১০—৬০, শ্রীমতী মলিকা বীর ১০—৬০, তত্ত্বিমমতি ২০—২৪০, মিসেস মুখার্জি ১০—১২০, শ্রীমতী মেহলতা দাস ১০—৩০, শ্রীমতী শোভা বসু ২০—২৪০, শ্রীমতী দেবী ব্যানার্জি ১০—১২০, শ্রীমতী সুজাতা সেন ১০—২০, শ্রীমতী উষারানী দত্ত ২০—৬০, শ্রীমতী প্রভাবীণা সেন ১০—৫০, শ্রীমতী অনিলা রায় ২০—৬০, শ্রীমতী সোণামুখী চক্রবর্তী ৫০—১০০, শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সিংহ ১—২০, শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র বসু ১০—৩০, শ্রীযুক্ত সত্য-হরি দত্ত ২০—৬০ টাকা। মোট ৮০২০ টাকা।

মাসিক চাঁদা— ৮০২০

মেসেদের চাঁদা— ২১০০

এককালীন দান— ১৩০০

মোট অমল ১৩৪২০০

মোট খরচ ২৪৩০০

১১২০

পূর্বের ধার—২৩৭

শোধ—১৯৯

ধার বাকী— ০৮

পুণ্যাশ্রমের মোট মাসিক খরচ—

বাড়ীভাড়া ৪০, লাইট ৩, ঘোপা ৪, মেঘর ১,

খাওয়া খরচ মোট ৪৬ \*। মোট ৯৪ টাকা।

\* এখন মেয়ে বেনী হওয়াতে খাওয়া খরচ বেশী হইতেছে।

শ্রীসরলা দাস

সম্পাদিকা।

## কয়েকখানি চিঠি

[ মহারাণী সুনীতি দেবীর পত্রাবলী ]

অক্টোবর ১০ই

অতি মেহের—

তোমার চিঠিখানি ১৮ই সেপ্টেম্বরের। চুঃখিনী দিদির মনে করিয়া যে সেদিন লিখিয়াছি, ইহার জন্ত বিশেষ আশীর্বাদ লও। এই শোকজর্জরিত বক্ষে তোমাদের মেহ সাস্থ্যবাহি হইয়া শান্ত করে। কোথায় ছিলাম, কত উচ্ছে, কত অনিদ্রা, ১৮ই আসিয়া সব ভাঙ্গিয়া দিল! পূর্বের চিত্তগুলি ভয়! এত পরিবর্তন এত অল্প সময়ের ভিতর আর কাহারও জীবনে কি হইয়াছে? কিন্তু এত আঘাতে মনটা কেন এত নীরস ও শুষ্ক হইল! ভাল করিয়া যে গান গাইতে পারিনা, উপাসনা করিতে পারিনা; কেন, এত বিকৃত মন প্রাপ্ত হইল? আদি-যে শেষের দিনে হাসিতে হাসিতে যেতে চাই। অনেক চক্ষের জল ফেলিয়াছি, এখন তোমরা আশীর্বাদ কর, হাসিয়া যেন চক্ষু মুদি। কত অপরাধী, কত পাপই করিয়াছি; আজ শোকার্তের সঙ্গে অমৃতাপের হাহাকার যে প্রাণে। \* \* \* কেমন আছি? আগামী বৎসরে আমেরিকায় বাইবার জন্ত নিমন্ত্রণ আসিয়াছে, চল একবার সকলে বাই। Bristolএর সংবাদ-পত্রের ছবি পাঠাইতেছি। কি সুন্দর উৎসবটি হইল। অনেক লোক হইয়াছিল। বর্জমানের রাজা বেশ বলিলেন। \* \* \* বাই ভাই।

মেহের দিদি

October 7th

ভাই—

তোমাদের চিঠিগুলি স্বর্গের বাতাস হইয়া তাপিত এ দেহ মনে স্নিগ্ধতা দিয়া যায়। কত সময় যে কীৰ্তনের শব্দ কাণে বাজার করে, কতবার মিষ্ট মিষ্ট গানের সুর প্রাণটাকে স্মারাম দেয়, বলিতে পারিনা। কোথা হইতে এ শব্দ পাই, বলিতে পার? আমার দেহটা বড় প্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। \* \* \* দেশের

অপাতির কথা ভাবিলে প্রাণটা কেমন করে। এখানে সকলেই বাইতে নিষেধ করিতেছে। বলে, সেখানে কিছুই করিতে পারিব না। আমার প্রাণটা বাইবার জন্ত অস্থির হয়। মেহের নানুর অভাবে কি বে হইতেছে, জানিনা। কাহারও যেন প্রাণে শক্তি নাই। প্রাণের মেহ ও ভালবাসা লও।

মেহের দিদি

( প্রবাসের চিঠির সারাংশ )

আগামী মাঘেৎসবে তোমরা ভাই অনেকগুলি ভায় লইও। মেহের নানুর বড় ইচ্ছা ছিল, মেয়েরা বিশেষরূপে নববিধানের সেবা করেন। তুমি অনেক করিতে পারিবে।

শোকের আগুন ভিতর বাহির শুষ্ক করিয়াছে। এখন এই প্রার্থনা, যেখানে মৃত হই না কেন, যেন প্রস্তুত হইয়া মরিতে পারি। এই প্রার্থনা।

উৎসবের প্রসাদ পাঠাইতে ভুলিও না। “আমাদের নানুর” অভাবে উৎসব কি করিয়া হইবে, জানিনা। চারিদিকে যেমন শূন্যতা। বড় ভাড়াভাড়ি সব ভাঙ্গিয়া বাইতেছে। বাঁচিয়া ফিরিয়া যদি বাই, ভিক্টোরিয়া কলেজের সেবা করিতে ইচ্ছা রহিল। তুমি আধ্যাত্মিকতার জীবন কর। সু—সাধাতীত পরিশ্রম ও সেবা করিতেছেন, তোমাদের এ সেবার উৎসব জরবস্ত হইবেন।

উৎসবের Programmeখানি নি—পাঠাইয়াছেন, বড় উপকার হইল। প্রাণে প্রাণে সকলে এক সঙ্গে আছি, কিন্তু কোনদিন কি হইবে জানিয়া আরও কাছে কাছে থাকিব, এই প্রার্থনা করিতেছি। নববস্ত্রের বাবা, আধ্যাত্মিকতার স্বর্গীয় দৃশ্য, মন্দিরের গাভীরা এবং পূর্ণতা খুব ভাল করিয়া যেন সন্তোষ করিতে পারি, এই প্রার্থনা। রাজ্যে যখন অনিচ্ছায় সময় কাটাই, তখন কল্পনা যে কত দৌড়াদৌড়ি করে; তাবি মুসলমানপাড়ার ভিক্টোরিয়া কলেজের মেয়েরা বাগানের ভিতর বসিবে, খেলা করিবে। মঙ্গলপাড়া প্রতাপবাবুর বাড়ী আশ্রম হইবে, মন্দিরের পাশের জমিতে Hall & Library হইবে, মন্দিরের পশ্চাতের জমিতে রান্নাদির ব্যবস্থা থাকিবে। কিছুই কি পূর্ণ হইবে না? কল্পনা সব থাকিবে?

তোমার মিষ্ট চিঠিখানি পড়িতে কি ভাল লাগিল। মাতৃ-দেবীর জীবনটীতে যে যশোধরা দেবীর মূর্তি প্রকাশিত দেখিতেছি; জানিয়া আরও বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। যশোধরার জীবনটী প্রস্তুত পদ্ম, চোখে মুখে বুদ্ধি রাখিতে ইচ্ছা হয়। সু—বে বইয়ের সূচনাতি করিয়াছেন, ইহা আমার পুরস্কার। কয়দিন অস্থির পড়িয়া নানা অবস্থার ভাবসাগরের তরঙ্গে ডুবিয়া ভাসিয়া বাইতেছি। এক এক রাজ্যে মনে হয়, বুদ্ধি পৃথিবীর স্বর্ঘ্যোদয় আর দেখিব না। বুকটা শূন্য, শক্তি বুদ্ধি চলিয়া গিয়াছে। আর কি কাজ আছে বে এ জীবনে, জানিনা।

তোমরা ভাই উৎসবের আয়োজন করিতে চেষ্টা করিও।



এবার সব ভাঙ্গা লইয়া কাজ করিতে হইবে। বার্ককো যৌবন দেখাইতে হইবে। সব নতুন, নববিধানের জুবিলীর সব নতুন।

গত কল্যাণ হিতবাহার সহায় মুখখানি দেখিবার জন্য প্রাণটা কেমন করিতেছিল। তুমি তাহাকে কত স্নেহ করিতে, আর কতকাল সেই প্রাণের পুতুলগুলি ছাড়িয়া থাকিব।

তোমার স্মরণ চিঠিখানি পাইলাম, বাঁচিয়া থাক, সুখী হও, তোমার এ স্মৃষ্টি স্নেহটা যেন অনন্তকাল সন্তোষ করিতে পারি। ভগবান্ ভক্ত পুত্র কত স্নেহ তোমাকে সর্বদা রক্ষা করুন।

তোমার মিষ্ট চিঠিখানি পড়িতে বড় ভাল লাগিল। এত তোমাদের স্নেহ ভালবাসার যেন উপযুক্ত হই। পৃথিবীতে আমার মত সৌভাগ্যবতী কেহ ছিল না। অতীতের জন্মদিন গুল যেন স্মৃতির কূল-কিনারা-হার সাগরে জীবনতরী ভাসাইয়াছে, আজ তরী ভাঙা, সাগরের জল শুকাইয়া গিয়াছে, ভাঙা তরী আর ভাসে না। স্নেহমাখা ভালবাসা লও।

মরিবার আগে জয় জয় ধ্বনি কি শুনিব না? ধর্ম ও কর্মে জয় চাই। জুবিলীর জন্য তোমরা আশা ও উৎসাহের অগ্নি জ্বলাইয়া দাও। বড় ইচ্ছা করে, তোমাদের কাছে ছুটিয়া যাই, তোমাদের কাছে ভাল কথা শুনি, সেই অতীতের স্মৃতির গল্প করি। ভাল থাক সকলে, তোমাদের স্মৃতির হাসিই আমার স্নেহের পুরস্কার।

১৯৩০ খৃঃ

জ্ঞানালার অদূরে খেতপুণ্যস্মৃতিমন্দিরটি। শান্ত হিরভাবে কত দেখিতেছেন, আমার প্রাণের শ্রিয়। ১৮বৎসর হইল, তাঁহাকে এখানে বিদায় দিয়াছি। ভেবেছিলাম, আর বৃথা এখানে থাকিতে পারিব না; এবার দেখিতেছি, তিনি ত দূরে নাই, বড় যে কাছে। আরও জানাইতেছেন, আমিই দূরে গিয়াছি, কিন্তু তিনি যে স্থানের, ঠিক সেই থানেই অনন্তের কোণে আছেন। মহারাজা সেই স্মরণ, সবল দেহটি আজ খেতমুষ্টি ধরিয়া যেন পথ-প্রদর্শক ভাবে গভীর ভাবে, শাস্ত্রধামের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। আমার এ অস্থির জীবন যেন এবার শান্ত হয়, মহারাজার সেই সবল হস্ত এ দুর্বল জীব হাত ধরিয়া স্বধামে লইয়া যেন যায়, তোমরা এই আশীর্বাদ কর।

দিন দিন কতদিন, কত বৎসর চলিয়া গেল! বৎসর গুলিতে কি বলিয়া রহিলাম? মহারাজার স্বর্গারোহণের পর তোমরা যখন কুচবিহারে আসিয়াছিলেন, স্ন—সন্ধ্যার সময় আমার শ্রিয় উপাসনার ঘরটিতে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কথাগুলি মনে হইতেছে।

## শ্রীবুদ্ধদেবের মধ্য পথ।

মহাশ্রী গান্ধী একবিংশতি দিবস উপবাস করিলেন। ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি বিশ্বকর বিশেষ ঘটনা বলিয়া

উল্লিখিত হইবে। শারীরিক বিজ্ঞানের অধিকার অতিক্রম করিয়া, তিনি যে আত্মার শক্তিকে জয়যুক্ত করিলেন, ইহা ধর্মের ইতিহাসেও একটি অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। আত্মার শক্তি যে শরীরের বিধিকে জয় করিতে পারে, ইহা তিনি নিজ জীবনে সপ্রমাণ করিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ শক্তির নিকট বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অভিমান চূর্ণ হইল। বড় বড় রাজপুরুষদিগের মদমত্ত পার্শ্বিক শক্তির গৌরবও মহিমা ছীন বলিয়া বিবেচিত হইল। দেশ স্তম্ভিত হইল, পৃথিবী স্তম্ভিত হইল! দেশের নেতৃগণকে—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ সকলকে এই মহাশক্তি একসঙ্গে মিলিত করিল। এই শক্তির বিরুদ্ধে কেহ কি দণ্ডায়মান হইতে পারে? কেহ কি তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতে পারে?

পৃথিবীতে শক্তির পূজা চিরকালই প্রতিষ্ঠিত আছে, আর ভবিষ্যতেও থাকিবে। যাঁহারা শক্তির উপাসক, তাঁহাদের কি একথা মনে করা উচিত নয় যে, মানুষ শরীর, মন ও আত্মা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? শরীরের কতকগুলি বিধি আছে, এবং মন ও আত্মারও কতকগুলি বিধি আছে। এই ত্রিবিধ বিধির সমন্বয়ে মানবের জীবন প্রতিষ্ঠিত। শরীরের বিধিকে যদি মানুষ উল্লঙ্ঘন করে, তবে তাহাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়, শরীর পীড়াগ্রস্ত ও দুর্বল হয় এবং ক্রমে ক্রমে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে; এবং মন ও আত্মার বিধিকে যদি কেহ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, তবে মানব-স্বভাব-মূলত স্বাভাবিক সত্যের পথ তাঁহার নিকট রুদ্ধ হইয়া যায় এবং দুর্গতি ও পাপে সে লিপ্ত হয়। বিধাতা শরীর, মন ও আত্মার এমন একটা ভেদরেখা (Line of demarcation) টানিয়া রাখেন নাই যে, আমরা শরীরকে কতটা অবহেলা করিয়া, মন ও আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারি, অথবা কতটা মন ও আত্মার প্রতি উদাসীন হইয়া, শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে পারি। তবে আমাদের সহজজ্ঞানে ইহার বিচার ও মীমাংসা করা বহু পরিমাণে সম্ভব হয় যে, আমাদের ত্রিবিধ শরীর, মন ও আত্মার সত্তা রক্ষা করিতে হইলে, শরীর, মন ও আত্মার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়। শরীরের সহিত মন ও আত্মার এই সখ্য যে, একের ক্ষয়ে অন্নের বৃদ্ধি এবং অন্নের বৃদ্ধিতে অপরের ক্ষয় বহু পরিমাণে নির্ভর করে। তুমি পাঠ কর, চিন্তা কর, উপাসনা কর, বিহার কর, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও তাগ কর, সকল অবস্থায় তোমার শরীরের ক্ষয় অনিবার্য। এই অনিবার্য ক্ষয়কে পূরণ করিবার জন্য বিধাতা আহার পানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই শরীরেব ভার বিধাতা যখন আমাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তখন আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, কি পরিমাণে, কোন্ সাধু সংকল্প সাধনের জন্য, শরীরের বিধিগুলিকে অতিক্রম করিতে পারি?

শরীরের পক্ষে আহার যেমন বিধাতার বিধি, অনশনও সেই রূপ বিধাতার ব্যবহার ভিতর স্থান লাভ করিয়াছে।

রোগে অনশন করিতে হয়, মনের একাগ্রতা সাধনের জন্ত অনশনের ব্যবস্থা আছে, অথবা কোন ধর্মব্রত পালন করিবার জন্ত অনশন, অর্ধাশন বা স্বল্পাশনের বিধি প্রায় প্রত্যেক ধর্মমণ্ডলীর পক্ষে নির্দেশ বা ব্যবস্থা আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অনশন স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত। দেশের পাপের জন্ত বা জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে মহাত্মা গান্ধী নিজ জীবনে যাহা দেখাইলেন, তাহা ভারতবর্ষব্যতীত অন্তর্জ কোথায়ও দৃষ্টিগোচর হয় না। বৌদ্ধ সাধনার এরূপ অনেক কঠোর ব্রতধারণের কথা শুনা যায়। ক্ষুৎপিপাসার উপর জয় লাভ করিয়া ঐবুদ্ধদেব ও তাঁহার অনুবর্তী অনেক সাধক মন ও আত্মার অসীম বল লাভ করিয়াছেন, ইহা ইতিহাসের কথা। এখনও ভারতের কোন কোন স্থানে সাধকেরা মাসাধিকাল উপবাস করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করেন। সভ্য জগতে তাঁহাদের কথা ধর্মতত্ত্ব নয়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী সুপণ্ডিত, সুবিবেচক ও সুসংযুক্ত পুরুষ হইয়া, এত দীর্ঘকাল উপবাস করিয়া, শরীরকে ক্লিষ্ট ও অকর্মণ্য করিলেন কেন, ইহা অনেকের মনে প্রশ্ন উঠিতেছে। ইহা কি বিধাতার অনুমোদিত? বিধাতার আদেশ ও নির্ধারণ বলিয়া যদি কেহ কস্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা খিচাট করিবার অধিকার কাহারও নাই। ভবিষ্যৎ বংশ এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবে।

মহাত্মা গান্ধীর দীর্ঘজীবন কাশনা করিয়া সহস্র সহস্র কণ্ট হইতে প্রার্থনার ধ্বনি উথিত হইয়াছে। যাহার জীবনের সঙ্গে দেশের মঙ্গল জড়িত, তিনি শরীরকে এরূপ ক্লিষ্ট ও অকর্মণ্য করিলেন কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কি আমাদের নাই? মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত সাধারণ মরনারীর পথপ্রদর্শক। অনেকই তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক করিবেন। এ বিষয়ে আমাদের কি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়? আমরা কোন পথে চলিব? ঐবুদ্ধদেবের অসাধারণ কঠোর বৈরাগ্য শরীরকে যখন কঙ্কালসার করিল, অগ্ৰে সিদ্ধি হ্রদ্বরপরাহত, তখন তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিলেন; অর্থাৎ বস্তুটুকু আহাৰ গ্রহণ করিলে সাধনার ব্যাঘাত না হয়, ততটুকু গ্রহণীয়। ইহাই মধ্যপথ, সংযমের পথ বা সমন্বয়ের পথ। এই মধ্যপথ বা সমন্বয়ের পথই বিধাতার আশ্রয় বাণী। এই সমন্বয়ের পথ ধরিয়াই বিধাতা সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। দিবসের জাগরণের সহিত যদি রাত্রির নিদ্রার ব্যবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে জীবনরক্ষা হইত না; বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তাপের পর যদি শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারা না পড়িত, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রাণান্ত হইত। বিধাতা যখন শরীর ও আত্মাকে একত্রে স্থাপন করিয়াছেন এবং পরস্পরের সুখ দুঃখ পরস্পরকে বহন করিতে হয়, তখন আত্মা ও শরীরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই মানবের অবশ্যকর্তব্য। একদিকে বিলাস বাসনা বর্জন ও অত্যধিক ক্ষুৎপিপাসার অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার না করাই ঐবুদ্ধদেবের মধ্যপথ বাণী বিবেচিত হইয়াছে। সাধকেরা

শরীরকে আত্মার অঙ্গগামী করিতে সতত চেষ্টা করেন। আত্মার মধ্যে যে সাধুসংকল্প বা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, শরীরকে তাহার সহায় করিবার জন্ত শরীরের অনেক অধিকার যেচ্ছায় পরিত্যাগ করিতে হয়; কিন্তু যাহাতে একেবারে শরীর ভাঙ্গিয়া না পড়ে, সে বিষয়ে সাধকের দৃষ্টি রাখা উচিত। তবে যদি এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় যে, ধর্ম রক্ষা করিতে গিয়া শরীরের পতন অনিবার্য, সেখানে ধর্মরক্ষা করা সাধকের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

যেমন সত্য প্রচার করিতে দৈশকে ক্রশে প্রাণ দান করিতে হইল; এ সকল ঘটনার উপর সাধকের কোন হাত নাই, তখন মৃত্যুকে বরণ করাই একমাত্র পথ। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ সাধকদিগের পক্ষে শরীর ও আত্মার পারস্পরিক যোগ রক্ষা করিয়া চলাই মঙ্গলকর। সংযমের পথে বা মধ্যপথে থাকিয়া, আত্মার উচ্চ সংকল্পের সহিত শরীরের বৈরাগ্য রক্ষা করা নববিধানের আদর্শ। শরীরের সহিত আত্মার কোন সংঘর্ষ নাই, যাহারা একথা বলেন, অথবা অশুচিত বিলাসে গাঁ ঢালিয়া দিয়া আত্মার সাধুতা বা উচ্চতর তক্ষা করা যায়, যাহারা একথা বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মত আমরা সম্মত মনে করি না। আমরা বত দিন পৃথিবীতে বাস করিব, ততদিন শরীরের সহিত আত্মার সংগ্রাম অপরিহার্য। শরীরের ক্ষয়ে বা শরীরকে অকর্মণ্য করিয়া আত্মার জয় ঘোষণা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অস্ত্রাত্ত তত্ত্বের জ্ঞান আত্মার শক্তি কি পরিমাণে শরীরকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহা জ্ঞানের ক্রমবিকাশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শরীরকে কস্মে রাখিয়া, অগ্ৰে শরীরকে অতিক্রম করিয়া, মনের সাধু ইচ্ছা ও আত্মার সংকল্প যাহাতে জয়যুক্ত হয়, ইহাই যেন আমাদের সাধনার চরম লক্ষ্য হয়। ইহাই নির্বাণ-সাধনার আদি গুরু ঐবুদ্ধদেবের মধ্যপথ।

ঐকাম্যাত্মানাম বন্দ্যোপাধায়কঃ।

—০—

## আমাদিগের প্রমোদকুমার।

আমাদিগের ঐমদাচার্য্যের কলুটোলার ভবন হইতে একটা আশায় বস্ত্র ঢলিয়া গেলেন! ঐমদাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্র ঐবুদ্ধ বাবু অমৃতলাল সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমোদকুমার, বিগত ২১শে জুন তারিখে, তাঁহার ভক্তমান পিতা ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কনিষ্ঠা ভগিনী এবং পরিবারস্থ আর আর সকলকে কাঁদাইয়া এই পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন। প্রমোদকুমারের ভক্তিমতী নাতা ইতিপূর্বে পরলোকে অগ্রসর হইয়াছেন, আজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার অনুগমন করিলেন। আমরা কুচবিহার থাকিতে যুবক প্রমোদকুমারকে বিশেষভাবে চিনিতে পারিলাম না। ইহার পিতা যখন কুচবিহার ছেটে একাউট্যান্ট জেনারেলরূপে কার্য্যে ব্রতা ছিলেন, যুবক প্রমোদকুমার তখন ঐ

আফিসে কার্যা বিশেষে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার সরল প্রকৃতি, তাঁহার উদ্যম উৎসাহ ও তাঁহার স্মৃষ্টি ব্যবহার তাঁহার সহযোগিত্ববর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার ভক্তিমান্ন পিতার আগ্রহে তাঁহার বাটীতে সপ্তাহের মধ্যে একদিন ব্রহ্মোপাসনা হইত, আর যুবক প্রমোদ সে উপাসনার আগ্রহের সহিত যোগদান করিতেন। আমাদের শ্রদ্ধাঙ্গদা মহারানী স্মৃতি দেবী প্রতিষ্ঠিত “স্মৃতি কলেক্সের” বালিকাদিগকে পারিতোষিকবিতরণোপলক্ষে যে সমস্ত স্কন্দ স্কন্দ বস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজন হইত, উদ্যমশীল প্রমোদকুমার তাহা তাঁহার অক্লান্ত উদ্যমের সহিত কুচবিহার ও কলিকাতার বাজার হইতে সংগ্রহ করিতেন। প্রমোদকুমারের পিতা তখন “স্মৃতি কলেক্সের” সম্পাদক। ষ্টেটের কার্যা হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়া পিতা যখন কলিকাতার অবস্থান করিতে-ছিলেন, তখনও প্রমোদকুমার “স্মৃতি কলেক্স” সম্বন্ধীয় মহান্ন রত হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাট।

আজ আমরা এই সুবর্ণরেখার স্মৃদ বেলভূমি হইতে, প্রমোদের ভক্তিমান্ন পিতা, তাঁহার ভ্রাতা ও ভগিনী এবং পরিবারস্থ আর আর সকলের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ভক্তিমান্ন পিতা হৃদয়ের যে বল ও বিশ্বাস লইয়া এই অগ্নি-পরীক্ষা বচন করিয়াছেন, তাগ আমাদিগের নিকট এক মহা শিক্ষা। তিনি মহন্ত এই শোকাবহ সংবাদপূর্ণ পত্র লিখিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। আজ আমরা সেই শাস্তিদাতা বিধাতার শাস্তিপ্রদ চরণতলে অবনত হইয়া, সেই স্বর্গগত আত্মার জন্ত কল্যাণ প্রার্থনা করি। তিনি এই শোকসম্পন্ন পরিবারের হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন।

শোক-সম্পন্ন—শ্রীগৌরীপ্রসাদ মহুমদার।

—০—

## সংবাদ।

নামকরণ—গত ১২ই আষাঢ়, সোমবার, ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ন সুরেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কস্তার শুভনামকরণ শিশুর মাতামহ ভ্রাতা হরিশ্চন্দ্র দাসের কলিকাতার ৮০১১ মেছুরাবাজার ষ্ট্রীট বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর পিতামহ ভাই নগেন্দ্রনাথ উপাসনা করেন এবং কস্তাকে “নিখা” নাম প্রদান করেন। ভগবান শিশুকে ও তাঁহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

জন্মোৎসব—গত ২০শে জুন, পুরী, “বিচিট্টি” নামক প্রাসাদে, শ্রদ্ধাঙ্গদা, সর্বজনসন্মানিত, বঙ্গের সুসন্তান স্যার আর্ এন্ মুখার্জির অশীতিতম জন্মোৎসব তাঁহার কস্তা শ্রীমতী প্রেমলতা দেবীর উদ্যোগে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে পুরী-প্রবাসী অনেকগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা নিমন্ত্রিত হন। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ জীবন ও কৃতিত্বলাভের জন্য ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতা

করেন ও আরো দীর্ঘজীবন এবং সৌভাগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। সমবেত নরনারীগণ উপাসনায়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তার যোগে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বি, এন, আর, কোঃ ডি, সি, ও, মিঃ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী নিজে উপাসনার সঙ্গীত করেন।

আনন্দজ্ঞাপন—ময়ূরভঞ্জের মহারাজকুমার, ব্রহ্মানন্দের সেজকস্তা মাননীয়া মহারানী শ্রীমতী সূচাক দেবীর প্রিয়তম পুত্র শ্রীমান্ন ক্রবেন্দ্রচন্দ্র কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া, আমরা অতীব আনন্দ ও শুভাকাঙ্ক্ষার সহিত আমাদের প্রাণের অভিনন্দন তাঁহাকে জানাইতেছি এবং কৃতকার্যতার জন্ত ভগবচ্চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। নব-বিধানজননী তাঁহার প্রিয়তম সন্তানকে শুভাশীষ দান করুন এবং ব্রহ্মানন্দের ও স্বর্গগত পিতৃদেব মহারাজার শুভাশীর্বাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হোক।

পরলোকগমন—আমরা গভীর চোখের সহিত সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, গত ৬ই জুলাই (২২শে আষাঢ়), হাওড়া বাঁটার নিবাসী শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সহধর্মিণী শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী নম্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া, ৬৩ বৎসর বয়সে, স্বামী, তিনপুত্র, চারিকস্তা ও বহু নাতি নাতিনী ও আত্মীয়স্বজনদিগকে রাখিয়া, আনন্দময়ী জননীর চিরশান্তিময় কোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ৩২শে আষাঢ় (১৬ই জুলাই), রবিবার, প্রাতে ৫৩নং কালীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেনে, তাঁহার পবিত্র শ্রদ্ধাশ্রুতান পুত্রকল্যাণ কর্তৃক স্বর্গহে সম্পন্ন হইয়াছে। অমৃষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ আগামী-বারে প্রকাশিত হইবে। পরমজননী পরলোকগত আত্মাকে তাঁর অনন্ত শান্তিবক্ষে স্থান দান করুন এবং শোকার্ভ পরিবারে শরণের শান্তি ও সাহসনা বিধান করুন।

বিশেষ উপাসনা—গত ২রা জুলাই, রবিবার, ২৮নং রামকমল সেন লেনে, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় প্রমোদকুমার সেনের স্বর্গগত আত্মার স্মরণার্থে বিশেষ উপাসনা হয়। ময়ূরভঞ্জের মাননীয়া মহারানী শ্রীমতী সূচাক দেবী স্মৃষ্টি উপাসনা করেন। পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া এবং শোকার্ভ পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র, কস্তা ও আত্মীয় স্বজনগণের জন্ত স্বর্গের শান্তি ও সাহসনা ভিক্ষা করিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা করেন।

অন্ত্যজ্ঞাপন—গত ২৫শে জুন, রবিবার, ঢাকায়, রায় ললিতনোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুরের সহধর্মিণী, পিতামাতাব জ্যেষ্ঠসন্তান শ্রীমতী মনোরমা দেবী স্বীয় মাতা নিখরমোহিনী দেবীর অদ্যাপ্য কলিকাতায় ভাইবোনদের সঙ্গে যোগ রাখা করিয়া সম্পন্ন করেন। ভক্তিভাজন ভাই মহিমচন্দ্র সেন ও ভাই হর্গনাথ রায় পবিত্র অমৃষ্ঠানে রোগতর্য অকম দেহ লইয়া উপস্থিত হন এবং ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন। লগিতগাবু

শাস্ত্রপাঠ ও আচার্য্যের প্রার্থনা পাঠ করেন। পরমজননী স্বর্গস্থ আত্মাকে নিত্য শান্তিধামে রক্ষা করুন এবং শোকাক্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সাধনা বিধান করুন। এই পবিত্র অমুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গিত হইয়াছে :—

কলিকাতা :—নববিধান প্রচারভাণ্ডার—৫, নববিধানসমাজ—৪, মুক ও বধির বিদ্যালয়—৪, অন্ধবিদ্যালয়—৪, সাধু প্রমথলাল শিকাতীর্থ—৫, Campbell Poor Fund—৫, আতুর আশ্রম—৪, কুষ্ঠাশ্রম—৪, Little Sisters of the Poor—৪, Brahmo Relief Fund—৪ ।

ঢাকা :—নববিধানসমাজ—৫, অনাথাশ্রম—৪, মুক ও বধির বিদ্যালয়—৪, বিধবাশ্রম ৪ টাকা ।

এতদ্ব্যতীত ভোজা—হুই প্রস্থ, পরিধেয় বস্ত্র ও গৈরিক হুই প্রস্থ, ভূতাদিগের জন্ত আম ও মিষ্টান্ন, ভিখারীদের চাউল ও পরদা ।

সেবা—আমাদের ভ্রাতা ডাঃ অক্ষকুলচন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন :—গত ১লা জুলাই, শনিবার, ডাক্তার অক্ষকুলচন্দ্র মিত্র চন্দননগর ও চুঁচুঁড়া ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়াছেন এবং তথায় সমাগত উপাসকগণের নিকট শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গগত ভাই প্রমথলালের সাধুজীবনে ব্রহ্মের অবতরণ সম্বন্ধে কিছু বলেন। সে মধুমখা উচ্চ জীবনের মহাভাগবত তাঁরা আরোও শুনিতে উৎসুক। যদি মণ্ডলীর কেহ বাইতে ও সেবার ব্যবহৃত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বাইলে, তিনি সকল বন্দোবস্ত করিয়া দিতে সন্মত। গত ২রা জুলাই, ডাক্তার মিত্র খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরেও উপাসনা ও সঙ্গীত করিয়া আসিয়াছেন। নববিধানজননী তাঁহার সেবকগণের জীবনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকুন।

উপাধিলাভ—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, নববিধানের গৃহস্থবৈরাগী স্বর্গীয় রাজমোহন বসুর স্মরণীয় কৃতিমান পুত্র শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র বসু লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউট অফ ফিউয়েলস এর (Royal Institute of Fuels) Fellow বলিয়া সম্মানিত ও F.I.F. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কামসেদপুর Tata Iron & Steel Worksএ একটি বিভাগের প্রধান কর্মচারীর পদে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিতেছেন। সর্বসম্মানদাতা শ্রীভগবানের আশীর্বাদ তাঁহার মৃত্যুকে বর্ষিত হউক।

সাম্বৎসরিক—স্বর্গগত ভাই প্রমথলাল সেনের (নালুদার) স্বর্গারোহণসাম্বৎসরিক উপলক্ষে, গত ৩০শে জুন, প্রাতে শান্তিকুটীরে ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। সদ্ধার কীর্ত্তনাদি হয়, বিধানমুহূর্ত্তী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্ত্তনে নেতৃত্ব করেন। ১লা জুলাই, সন্ধ্যায়, শান্তিকুটীরে “আমাদের সজ্জ্বর” অধিবেশনে উৎসবের ভাবে, নববিধানজননীর আরতি ও উপাসনাদি হয়। ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন, শ্রীমতী

নির্ভরশ্রিয়া ঘোষ সঙ্গীতে নেতৃত্ব করেন; শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় “নালুদার” স্মরণ ও স্মরণীয় জীবনী পাঠ করেন। এই উপলক্ষে ৩০শে জুন, প্রাতে, হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দিরে, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন; তাই প্রমথলাল যে প্রকৃত নববিধানের পথ ধরিয়াছিলেন ইহা বলিয়া, সাধুসম্মাননা শুধু বাহ্যমুষ্ঠানে পরিণত না হইয়া, বাহ্যে সাধুদের জীবন নিজ জীবনে আত্মস্থ হয়, এ ভাবে আত্মনিবেদন করেন। শ্রীমতী নির্মলা বসু লিখিয়াছেন, রচিত্তেও, সকলের প্রদেয় ও শ্রিয় নালুদার পুণ্যস্মৃতিতে কয়েকজন মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন। পুরী, নবপর্ণকুটীরেও ঐ দিনে ভাই প্রমথলালের সাবৎসরিক সাধিত হইয়াছে। ২রা জুলাই, রবিবার, সন্ধ্যায় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সামাজিক উপাসনায়ও ডাঃ সত্যানন্দ রায় “নালুদার” সাধুজীবনের কথা বলেন।

গত ৩০শে জুন, ১২৮নং হারিশন রোডে, রায় সাহেব ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র রায়ের মাতৃদেবীর সাবৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। ঐ দিন প্রাতে অমরাগড়ী সমাধিমন্দিরে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন; অপরাহ্নে বালিকাবিদ্যালয়ে স্মৃতিসভা হয়, শ্রীমতী মৃণ্ময়ী রায় সভানেত্রী হন। স্বর্গীয় গোলাপসুন্দরী দেবীর জীবনের সৌরভ ও গৌরবের কথা আলোচনা করিয়া সকলে মুগ্ধ হন। রাত্রিতেও সমাধিমন্দিরে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়।

গত ১লা জুলাই, ১৪৫এ ল্যান্সডাউন রোডে, ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের মাতৃদেবীর সাবৎসরিকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ২ই জুলাই, খুরটরোডে, শ্রীযুক্ত অগস্ত্য পালের পিতৃদেবীর সাবৎসরিকে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে একটাকা দান করা হয়।

গত ১০ জুলাই, ৫৩নং কানীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার মাতৃদেবী ও কোষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় স্বর্গকুমার দাসের সাবৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১১ই জুলাই, ২৪৩নং বাহির মির্জাপুর রোডে, স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র দত্তের সাবৎসরিক দিনে, তাঁহার পুত্রগণের বাসভবনে, ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন।

গত ১৩ই জুলাই, ১৭নং বৈঠকখানা রোডে, স্বর্গীয় সুধাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর সাবৎসরিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন; সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী পুণ্যদায়িনী চক্রবর্ত্তী কাতর প্রার্থনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে হুই টাকা দান করা হয়।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha,

কলিকাতা—৩নং রবানাথ মজুমদার ট্রাট, “নববিধান প্রেসে”

ঐ পরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

অবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ সূনির্গলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনন্তরম্ ॥  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি ত্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ত্র্যক্টৈরেবং প্রকীৰ্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।  
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই আগ্রাণ, মঙ্গলবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

1st August, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা।

জীবন্ত ঈশ্বর, আমরা তোমারই পূজা করি। কেন না, তুমিই আমাদের পিতা-মাতা গুরুজনদিগের দেখাদেখি, মুন্সয় দেবদেবীকে তোমারই প্রতিমাবোধে পূজা করিতে শিখিয়াছিলাম এবং তাহাতে কত ভক্তি নিষ্ঠা অনুভব করিতাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৌশলে, কি অলৌকিক মন্ত্রবলে, তুমি আমাদের মনের চিন্তায় ও বিশ্বাসে যে পরিবর্তন আনিয়া দিলে, তাহা ভাবিলে আমরা অবাক হইয়া যাই। কোন গুরুর উপদেশে বা কোন শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠে যে আমাদের মন তোমার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ত বলিতে পারি না। তোমারই প্রত্যক্ষ প্রেরণা আমাদের পূজা করিতে শিখাইয়াছে, তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বররূপে দেখিতে ও বিশ্বাস করিতে শিখাইয়াছে। এক্ষণে তুমি যেমন আমাদের একমাত্র

তোমাকেই পূজা করিতে শিখাইয়াছে, এমনই আমাদের দেশবাসী, বিভিন্নজাতীয় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ভাই ভগ্নীদিগকেও, তেমনি তেমনি করিয়া তোমাকেই দেখিতে, বিশ্বাস করিতে ও পূজা অর্চনা করিতে আকৃষ্ট কর, শিক্ষিত কর। প্রকৃত ধর্মভীরু, ধর্মনিষ্ঠ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বহু নরনারীকে দেখিতে পাই, তাঁহারা ধর্মার্থে ধর্মের নামে কতই কষ্ট কল্পনা ও সাধ্য সাধনা করিতেছেন, কতই তীর্থপর্যটন, শাস্ত্রাধ্যয়ন, পূজা অর্চনা, প্রার্থনা, গান, কীর্তন, ত্রুতপালনাদি করিতেছেন; কিন্তু হায়! তোমায় না চিনিয়া, তোমায় না পাইয়া, যেন মেঘাচ্ছন্ন আলো আঁধারে তাঁহারা জীবন কাটাইতেছেন। প্রত্যক্ষ সূর্য্য-দর্শনে যেমন সূর্য্যোত্তাপে জীবন জলন্ত জীবন্ত হয়, তাহা কই হইতেছে? মৃত দেবতার পূজার্চনা ও সাধ্য সাধনায় জীবনলাভ কেমনে হইবে? সে সকলই মৃত সংস্কারমাত্রে পরিণত হইতেছে। জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা বিনা কি জীবনলাভ হয়? জীবনে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিব, ইহা যদি সাধন ভজন, পূজা প্রার্থনার উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলেই বা তাহা জীবনপ্রদ হইবে কেন? অতএব যদি নববিধানে প্রেমময়ী মা হইয়া, তোমার নিজ কৃপালোকে এবার সকলকে প্রত্যক্ষ দর্শন দান করিবে বলিয়া ইচ্ছা করিয়াছ, তবে “দাও মা আনন্দময়ী সর্ব্বজনে



দর্শন, তব প্রেমানন্দ প্রসঙ্গ বদন, যার দরশনে পাপজীবনে  
সঞ্চারে নবজীবন ।”

শান্তিঃ !

শান্তিঃ !!

শান্তিঃ !!!

—০—

## জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান ।

মহাসাগর সর্বদাই তরঙ্গায়িত । তরঙ্গের পর  
তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে ; কতই বিচিত্র বীচিমালা  
উচ্ছসিত হইতেছে । ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন,  
সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর  
বৎসর, নিত্যই নূতন তরঙ্গ, নিত্যই নূতন শোভা, নিত্যই  
নূতন দৃশ্য ; শেষ নাই, একই ভাব, অথচ পলে পলে  
নূতন । জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান এমনই নিত্য  
নূতন । ইহাই সজীবতার পরিচয়, ইহাই নববিধানের  
আদর্শ । এই জগৎই জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান, নব-  
বিধান—নব নব বিধান । ইহা কখনই কিছুতে নিবন্ধ  
হইতে পারে না । তবে সাগরের তরঙ্গ নিবন্ধ হয় কখন,  
যখন তাহা বালুকাস্তূপে প্রবিষ্ট হয় ।

আকাশের বাতাসও কত ভাবে কতরূপে, কখনও  
মৃদুমন্দ সমীরণে, কখনও প্রচণ্ড ঝটিকার বেগে বিশ্বময়  
ঘুরিতেছে । তাহা জড় জীবের প্রাণবায়ু সঞ্চার করি-  
করিতেছে, কিন্তু তাহা কি কিছুতে নিবন্ধ হয় ? নিবন্ধ  
হয় কেবল তখন, যখন তাহা বৃষ্টির আকার ধরিয়া মূলি-  
কায় পরিণত হয় ও আত্মত্যাগ করে ।

জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত প্রেমলীলার নামই বিধান ।  
ক্রিয়াশীল ঈশ্বর যখন তাঁহার প্রেমলীলা কার্যতঃ বিশ্ব-  
মানবজীবনে সম্পাদন করেন, তখনই তাহা তাঁহার বিধান  
নামে অভিহিত হয় ; যখন সেই বিধান নিত্য নব নব  
ভাবে চলিতেছে, কার্য্য করিতেছে, সর্বজীবনে নব নব  
জীবন সঞ্চার করিতেছে, সাগরের তরঙ্গের ন্যায়  
“উঠিছে পড়িছে করিছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধরি,”  
তখনই ইহা নববিধান বলিয়া সমাদৃত । নিত্য সজীবতা  
ও নূতনতাই নববিধানের স্বরূপ, ইহাই নববিধানের  
জীবন ।

নববিধান জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত ক্রিয়াশীলতার  
পরিচয় । জীবন্ত ঈশ্বর কখনও মৃত বা ক্রিয়াশূন্য অথবা  
লীলাশূন্য হইতে পারেন না ; তাঁহার নববিধানও নিত্য নব-  
নব-জীবনশূন্য হয় না । নববিধানে মৃত্যু নাই, ক্রিয়ার

শূন্যতা নাই ; ক্রিয়াশূন্যতা বা জীবনবিহীনতা যেখানে, নব-  
বিধান নাই সেখানে । অগ্নি যেমন উদ্ভাপবিহীন হয় না,  
সূর্য যেমন আলোকশূন্য হইতে পারে না, নববিধান তেমনি  
উন্নতিবিহীন বা জীবন্তজীবনশূন্য হইতেই পারে না ;  
কেন না, ইহা জীবন্ত ঈশ্বরের স্বরূপের প্রকাশ ।

একগে বত সাম্প্রদায়িক ধর্ম আছে, সকলই অভ্যাস-  
কালে বিধানরূপেই অবর্ত্তিত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহা  
প্রবর্ত্তক ও শাস্ত্রে নিবন্ধ হওয়াতেই তাহাদের জীবন-  
প্রবাহ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার উার প্রসার সং-  
কীর্ণতায় পরিণত হইয়াছে এবং ইহারই জগৎ বিশেষ  
ভাবে বিধাতা বর্ত্তমান যুগধর্মবিধান নববিধান প্রবর্ত্তন  
করিয়াছেন । নিত্য নূতনতা, নব নব উন্নতি এবং প্রসার  
তাহার প্রকৃতিগত স্বরূপ । নববিধান চির নববিধানই  
ধাকিবে । ইহা কিছুতে নিবন্ধ হইবে না ।

এই নববিধানের বীজ ব্রাহ্মসমাজের প্রারম্ভেই  
প্রোথিত । ব্রাহ্মসমাজ সাম্প্রদায়িক বিধি ব্যবস্থা  
এবং দলে আবদ্ধ করিয়া ইহাকে সাম্প্রদায়িক  
ধর্মের নিবন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু  
বিধাতা তাহা হইতে দেন নাই । বাঁহারা ইহাকে নিবন্ধ  
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারাই দলে, মতে বা বিধি  
ব্যবস্থার গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়াছেন । তাঁহাদের উন্নতির  
চেষ্টা, সত্যসন্ধানের অশুরাগ, মনের উদারতা, প্রেমের  
প্রগল্ভতা, এবং নিত্য নব নব জীবনলাভের সাধনশীলতা  
আর নাই । ইহারই নাম অকালমৃত্যু । এই মৃত্যু  
যে ব্রাহ্মসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ইহা কখনই আমরা  
অস্বীকার করিতে পারি না ।

ইহার কারণ, জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসের স্বল্পতা এবং  
জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত নববিধানগ্রহণে অনাস্থা ও অকুচি ।  
নববিধানে বিশ্বাসী হইয়া নববিধানের জীবন্ত ঈশ্বরের  
যিনি পূজা করিবেন, তাঁহার কখনই এ রকম অকাল-  
মৃত্যু হইবে না । কারণ, নববিধানের ঈশ্বর “এক দণ্ড  
দেয় না বসিতে, মাকে দড়ী দিয়ে টানে মারে পিঠেতে ;  
ঠাকুর আপনি মেতে মাতান যত সাঙ্গোপাঙ্গ সহচর ।”

নববিধানাচার্য্য তাই বলিলেন, “এ যে শতফর শ্রোত ;  
ইহা কি আটকান যায়, এখানে কি পেছিয়ে যাওয়া যায় ?”  
ইহাই নববিধানের লক্ষণ । “মার দিকে দৌড়ানই”  
নববিধানশিশুর স্বভাব । তাহা হইলেও বিধানে বিধি  
ধাকিবে । কিন্তু সে বিধি বন্ধন নয়, মুক্তির বিধি,

অনন্ত উন্নতির বিধি। ঈশ্বর যেমন জীবন্ত, তেমনি জ্ঞানময়; তাঁহার জীবন্ত বিধানও নীতি বিধির দ্বারা সং-রক্ষিত ও সফালিত। পূজা সাধন ভজন শাস্ত্র বিধি আদর্শ সকলই নববিধানে আছে, কিন্তু গণ্ডীতে বা সীমাতে আবদ্ধ করিবার জন্ত নয়। সকলই আধ্যাত্মিক স্ফূর্তি-বিধায়ক। সকলই নব নব জীবনপ্রদ। সমস্ত সত্য, সমস্ত প্রেম এবং সমস্ত পবিত্রতার আধার যে অদৃশ্য মণ্ডলী, তাহা হইবার মণ্ডলী।

জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক, জীবন্ত নববিধানে বিশ্বাসী মাত্রেই আত্মজ্ঞানে ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারেন যে, নিত্য নিত্য নব নব জীবন, নব নব আলোক জীবনে উদ্ভাসিত হইতেছে; নব নব উপাসনা, নব নব প্রার্থনা নব নব উন্নতির পথে জীবনকে অগ্রগামী করিতেছে। আজ জীবনের যে স্তরে রহিয়াছি, কাল আর তাহাতে থাকিতে মন তৃপ্তি অনুভব করিতেছে না। নব নব ভাব, নব নব ভক্তি, নব নব কর্তব্যজ্ঞান, নব নব যোগ-পিপাসা, নব নব কর্মোৎসাহ জীবনকে আন্দোলিত করিতেছে এবং এই জীবনই যে জীবনবেদ, স্বয়ং ঈশ্বর-হস্ত-রচিত, ইহাও উপলব্ধি হইবে। প্রত্যেক শাস্ত্র, প্রত্যেক সাধু, প্রত্যেক ধর্ম, প্রত্যেক সাধনের ভিতর নব নব জ্ঞানের স্ফূরণ হইবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে পারি, আমার হাতে আমার জীবন নয়, আমার হাতে আমার নববিধান-সাধনও নয়, আমি জীবন্ত ঈশ্বরের পাল্লায় পড়িয়া আছি। আমি এই পর্যাণ্ত যাইব, আর যাইব না, ইহা বলা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। যাহা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, ইহা কখনই বলিতে পারি না। সত্য যাহা শিখা হইয়াছে, ইহাই শেষ, কেমন করিয়া বলিব? ইহারই নাম নববিধান। এই লক্ষণ যাহার জীবনে প্রতিফলিত, তিনিই প্রকৃত নববিধানবিশ্বাসী। ত্রীকেশবচন্দ্র নিজজীবনে এই আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, বা বিধানপতি স্বয়ং তাঁহার জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়াছেন।

নববিধানের আর একটি বিশেষ লক্ষণ, কেবল মতে জানা বা শাস্ত্রে শেখা নয়, আচরণে হওয়া, চরিত্রে জীবনে দেখান। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণে যাহা শিক্ষা পাই, ঈশা, গোরাক্ষ, বুদ্ধ, মোহম্মদ ও অবিশিষ্টের জীবনে যাহা দর্শন করি, তাহা জীবনে আত্মস্থ করাই নববিধান; এবং তাহারও উপর ঈশ্বর স্বয়ং আদর্শ ছইয়া যেখানে লইয়া যাইবেন, সেই দিকে খাতি হইতে

আকাঙ্ক্ষাই নববিধানের সাধন। তাই নববিধানাচার্য্য বলিলেন, “কেবল ঈশা ঈশা বলিও না, ছোট ছোট ঈশা হও।” আরো বলিলেন, “মহামাণ্ড ঈশা মহীয়ান হউন। ত্রীগোরাঙ্গকে যথেষ্ট ভক্তি করি; কিন্তু তাঁহাদিগকেও জীবনের আদর্শ করি না। যেখানে ঈশার আলোক পৌঁছিতে পারে না, ঈশ্বর আদর্শ ছইয়া নিজ আলোকে সে স্থান প্রকাশ করেন।” “ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, তেমনি পূর্ণ হও” ইহাই নববিধানের আদর্শ। জীবন্ত ঈশ্বরই নববিধান-রথের জীবনদাতা সারথি। সে রথের গতি অনন্তের নিয়তি।

জীবন্ত ঈশ্বরের পূজায়, জীবন্ত নববিধানের সাধনায়, সব পুরাতন মত যাহা কিছু, সকলই নূতন ও জীবন্ত হয়। পুরাতন মৃত ধর্ম চান, আর সকল ধর্মের মৃত্যু হউক, এক আমার ধর্মই থাক। তাই হিন্দু বলেন, সকল ধর্মের উচ্ছেদ হইবে, কেবল হিন্দুধর্ম থাকিবে। খৃষ্টান চান, সব খ্রীষ্টানে পর্যাবসিত হইবে। মুসলমান চান, সব মুসলমান হইবে, আর কেহ থাকিবে না। কিন্তু নববিধান সকলকে নবজীবন দিতে আসিয়াছেন। তাই তিনি চান, সবাই সঞ্জীব হইয়া, সবার বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতার সমন্বয় হইবে; কাহারও উচ্ছেদে যে সমতা, তাহা হইবে না। স্বর্গরাজ্যে সবার মিলন, সবার স্থান। বাইবেলেও তাই আছে, “যখন ঈশা স্বর্গরাজ্যে রাজা হইবেন, তখন যাহার যাহা আছে, সবাই তাহা তাঁহাকে উপঢৌকন দেবেন।” ইহারই প্রতিধ্বনিস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “অপ্রেমিক চান, আমার ঘর ঐ, ও যাইতে পাইবে না। কিন্তু সকলের জন্য তুমি একটি একটি ছোট ঘর, বড় ঘর প্রস্তুত করেছ। ওখানে গেলে সকলেরই গান বাজনা করিতে হইবে। কেহ ছোট সুরে, কেহ বড় সুরে। জননি, কাহারও আছে ভাল সুর, কাহারও সুর ভাল নয়। এইটী হরি, এঁরা বোঝেন না। সকলে না গেলে, হয়ত মোটাসুর থাকিবে না, নয়তো সুরু সুর থাকিবে না, নয়ত যোগ থাকিবে না, নয়তো ভক্তি থাকিবে না।” এইটীই বিশেষ কথা। তাই তিনি প্রার্থনা করিলেন, “যাহার যেমন প্রয়োজন, তেমনি রেখেছ। হরি, ঐ নববিধান। সকলে বগড়া কলহ দূর করে, আনন্দের সহিত হাত ধরাধরি করে ঐ বাড়ীতে বাছ।” ইহাই জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত বিধান, ইহাই নববিধানে নূতন।

## ধর্মতত্ত্ব ।

### সুখ ও দুঃখ ।

শরীরের রোগনিবারণের জন্ত তিক্ত এবং মিষ্ট দুই প্রকার আহারই প্রয়োজন । আহার পুষ্টির জন্তও সুখ এবং দুঃখ দুইয়ের আবশ্যক । অনেক সময় মিষ্ট অপেক্ষা তিক্তই অধিক মিষ্ট বোধ হয় । তেমনি সুখ অপেক্ষা দুঃখের উপকারিতা অধিক । কেন না, দুঃখেই দুঃখহারী চরিত্রে অধিক মনে পড়ে এবং তাঁর কৃপা লাভ হয় । এই জন্ত ভক্তাঙ্গা বলেন, “দুঃখেতে পাই যদি হে তোমার, চাহি না সুখ সম্পদ ওহে হরি দয়াময় ।”

### বৃদ্ধ বয়সের দৃষ্টি ।

যত বয়স বাড়ে, তত দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হয় ; ক্রমে আর চক্ষে দূরের বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় না । খুব নিকটস্থ না হইলে কান্নাকেও চেনা যায় না । এমনই জীবনের দিন বত-বার, তত ঈশ্বর দূরে থাকিলে আর চলে না । তিনিও নিকট হইতে নিকটতর হইয়া দেখা দিতে চান এবং তিনি নিকট হইলে, তাঁহার সঙ্গে স্বর্গলোক এবং স্বর্গস্থ অমরাআগণও প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হন । তাঁরাও, সঙ্গের সাথী সহধাত্রী হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে একত্রে যাহাতে সবে মিলে বাস করি, ইহাই চান এবং তাহারই সহায়তা করেন ।

### দ্বৈতাদ্বৈত গোণ ।

ঈশ্বর বলিলেন, “আমিই তোর আমি, তুই আমার দেহবস্ত্র, আমার শক্তি তোর প্রাণের শক্তি, আমার মন তোর মনের মন । আমারই ইচ্ছা, আমার বস্তুরূপে ব্যবহার করবার জন্ত, তোকে এনেছি, রাখছি । মস্তক যেমন দেহকে চালায়, দেহের হাত পা নিজে মস্তকের চিন্তা ও প্রাণের বল বিনা যেমন কিছুই কর্তে পারে না, আমার সঙ্গে তোর তেমনই সম্বন্ধ ; আমা ছাড়া তোর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই । আমা হইতে তোমাকে স্বতন্ত্র মনে করা তোমার মস্তকের বিকার মাত্র । বিকারশূন্য হইলেই বুঝিতে পারিবে, তুমি আমার বস্তুমাত্র, আমিই তোমার বস্ত্রী ।”

### আত্ম-দর্শন ।

দেখিলাম, আমার আমি আমি নয়, জড় দেহ নয়, চিন্ময় বস্তু । জড়দেহ হইতে স্বতন্ত্র । জড়ে আবদ্ধ থাকিলেই ধড়ফড় করে, অশান্তি বোধ করে, প্রায়ই রোগ ভোগ করে । বদ্ধ হাওয়া তার অসহ্য । বাড়ীর বাইরে ফাঁকা হাওয়ার থাকে ভাল । সাগরের মুক্ত বাতাস সেবন করিতে, কি আকাশ অকাশখানে উড়িতে পাইলেই, অধিক সুস্থতা ও শান্তি, অসুস্থত্ব করে । সংসারের অলিগলির ভ্রূগন্ধে তার প্রাণ হাপু হাপু করে অপরিচিত লোকের সঙ্গে মিশিতে মুখে কথাই বাহির হয় না,

সর্বকণ আপনার লোক আত্মীর অন্তরঙ্গের সঙ্গে থাকিতেই ভাল লাগে । মনের মানুষ পাইলে ক্ষুণ্ণের সীমা থাকে না । নিত্য আমোদ আচ্ছাদ, উৎসব, খেলা খুলা, ভোজ পাইলেই খুশী । এ ব্যক্তি আমাকে দেখিলেই কিস্ত চটিয়া যায়, আমাকে দেখিলেই গভীর হয় । আর পাচজনের সঙ্গে বেশ থাকে, আমার সঙ্গে যেন অস্তর রকম হইয়া যায় । কি জানি, আমিতে আমিতে কেন এত বিবাদ ! কবে এ বিবাদ মিটবে, কবে সম্ভাব হইবে ? এই ব্যক্তিই আমি হব ?

### ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ।

( ৮ই জাম্বারী, ১৯৩৩, সাবৎসরিক মৃত্যুদিন উপলক্ষে, রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে শ্রীমতী মুক্তা কন্ড কর্তৃক পঠিত )

রজনীর শেষে উষার প্রথম জ্যোতিরুন্মেষের ন্যায় রাজা রামমোহন প্রথম ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছিলেন যে দেশে ; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঋষিও লাভ করিয়াছিলেন যে দেশে ; পাগলা নিমাই আপনি পাগল হইয়া দেশভুক্ত ফেপাইয়া তুলিয়া ছিলেন, আপনি চোখের জলে ভাসিয়া সকলকে কাঁদাইয়া আকুল করিয়াছিলেন যে দেশে ; রামকৃষ্ণ পরমহংসের সরল অনাড়ম্বর জীবন একটা পদ্মকূলের মত বৃকভরা মধু লইয়া, দেশ বিদেশ দূর দূরান্তর সৌরভে আমোদিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে দেশে—সেই দেশে, সেই আকাশের তলে, সেই জলে মটিতে গত শতাব্দীতে আর একটা স্নানর জীবন ফুটিয়াছিল, আর একটা বিশাল প্রাণ স্পন্দিত হইয়াছিল, আর একটা বিশ্বাসী ব্যাকুল আত্মা জাগিয়াছিল, আর একটা বাণী উথিত হইয়াছিল, যাহাতে সকল যুগের সকল দেশের সাধক ও ভক্তের কথার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়াছিল ।

প্রকৃতির নানা বিচিত্রতার মধ্যে আশ্চর্য্য অদৃশ্য এক শক্তির লীলা দেখিয়া মুগ্ধ বিম্বিত ভীত মানুষ প্রথমে প্রকৃতি পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । আমরা প্রকৃতিকে পূজা দিই না ; কিন্তু যে কোশলী বাহুর প্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে মায়ার পর মায়ার জাল বুনিতেছেন, তাঁহাকে আমরা প্রণাম করি । জড় শক্তির কারখানায় দৈবশক্তির বিকাশ দেখিয়া আমরা বিম্বিত হইয়া চাহিয়া থাকি । কিন্তু যেদিন মানবজীবনে সেই দৈবশক্তির বিকাশ দেখিতে আসি, সেদিনই আমাদের মহা উৎসবের দিন ।

অনেক দিন আগে এমন একটি দিনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দেহভোগ করিয়াছিলেন । আজ সেই ঘটনা স্মরণ করিয়া এখানে সকলে মিলিত হইয়াছি । এই মহাপুরুষকে পাওয়া যখন আমাদের দেশের দরকার ছিল, তখনি ভগবান্ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু যখন তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন, তখন কি দেশের পক্ষে তাঁহার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছিল ? বয়সের মধ্য পথে, জীবনের মধ্যক্ষেত্রে তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন না কি ? কিন্তু

সেই আধাখানা জীবনেই তিনি জীবনের পূজা সমাপ্ত করিয়া গিয়াছিলেন। জীবন-দেবতার প্রসাদ জীবন ভরিয়া পাইয়া ছিলেন; এবং সংসার হইতে বিদায় লইবার সময় শিষ্যদের হাতে সেই একমাত্র সম্পদ সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। বাহা বলিবার বলিয়া গিয়াছেন, বাহা করিবার করিয়া গিয়াছেন, বাহা দিবার দিয়া গিয়াছেন, বাহা দেখাইবার দেখাইয়া গিয়াছেন।

কেশবচন্দ্রের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত আমি আলোচনা করিব না, —পারিবও না। আমি মূর্থ মেয়ে, ইতিহাস আমার জানা নাই, জীবনচরিত্র সমালোচনা করিবার মত বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই। আমি দরিদ্র, আমি সঞ্চয় করিতে পারি নাই, আমি কি দান করিব? তবু আসিয়াছি, আমার সত্যার্থ ধর্মবন্ধুদের মেলায়, আমার প্রকৃষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধ সমাজপতিদের সভায়—আমি আমার শিক্ষার্থী জিজ্ঞাসু মন লইয়া সসঙ্কোচে সবিনয়ে সকলের মধ্যে একটু ঠাঁই করিয়া লইয়াছি, আমিও কিছু দিতে চাই বলিয়া। এই শ্রাদ্ধবাসরে আমার অতি সামান্য একমুঠি সঞ্চয় সেই মহান আত্মাকে অর্পণ করিয়া উৎসর্গ করিয়া দিব। এই ভারতের আকাশে একদিন যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক উদিত হইয়াছিল, এক ভক্ত পুরুষ নিজের জীবনকে বিশ্বের দেবালয়ে আরতির দীপ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য কয়েকটি শ্রদ্ধাশীল চিত্র যে দীপাবলী জালাইয়া আজ পূজার আয়োজন করিয়াছেন, আমিও তাহার মধ্যে আমার ক্ষুদ্র দীপশিখাটুকু আনিয়াছি। কালের সাগরের এ পারে দাঁড়াইয়া ওপারের উদ্দেশে আমার প্রদীপ ভাসাইয়া দিব।

আমাদের এ যুগের ধর্মজীবন, আমাদের এ যুগের সামাজিক জীবন, গত যুগের কেশবচন্দ্রের নিকট অপরিশোধিত খণ্ডে খণ্ডি। তিনি যে অধিকার, যে স্বাধীনতা, যে উদার বিশ্বজনীন ধর্ম দান করিয়া গিয়াছেন, যে অমৃতউৎসের সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন, এ দেশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাঁহারই সাধনা করিবে। যুগশুদ্ধ রাজা রামমোহন রায় যে আদর্শ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এই তেজস্বী বীরপুরুষ তাহাকে নিজের জীবনে অমুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহাকে সত্যবীর অথবা ধর্মবীর বলা যায়। উচিত বলিয়া, ধর্ম বলিয়া, বাহা বুঝিয়াছিলেন, বিরোধ বিদ্রোহ—গুরুজনের বিরাগ, শ্রিয়জনের অগন্তোষ—সব অগ্রাহ করিয়া তাহাকেই শিরোমার্থ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই চরিত্রই ভারতবর্ষীর ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার এই চরিত্রই আমাদের সমাজের শরীর হইতে জাতিবর্ণভেদ রূপ কুসংস্কারের আগাছা উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে, নারীগণের ধর্মচর্চার পথ সরল করিয়া দিয়াছে।

তাঁহার চরিত্রের আর একটা বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি আজীবন ছাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এমন কোন লোকের সংস্পর্শে তিনি আসেন নাই, বাহার নিকট হইতে তিনি কিছুই আকর্ষণ করিয়া লন নাই। অপরের সাধুতাব তিনি

সহজেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। বেদ বাইবেল কোরাণ পুরাণের সমস্তর তাঁহার জীবনে ষটিয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রাণপণে জৈনা, মুসা, বুদ্ধ, খ্রীষ্টেতত্ত্ব এক চম্পাতপতলে মিলিত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন সর্বধর্মসম্বন্ধের দৈববাণী ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন—কেশবচন্দ্রের জীবনে বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ধর্মমতসাধনার একত্র সমাবেশ প্রত্যক্ষ হইল। এই একটা আশ্চর্য্য জীবন—বাহাতে খৃষ্টের প্রার্থনাপরায়ণতা, পাণ-বোণ ও ক্ষমাবিন্যাসের ভাব, বুদ্ধের কঠোর তপস্যা ও বিবেক-মুগ্ধতা, এবং খ্রীষ্টেতত্ত্বের ভক্তি, প্রেম ও অশ্রুর বস্তা—এই সমস্ত ভাবগুলি পাশাপাশি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটা ভাবের আওতায় পড়িয়া আর একটা ভাব শুকাইয়া যায় নাই,—সবগুলিই সমান বিকাশ লাভ করিয়াছিল। অপূর্ণ! চমৎকার!!

কতকগুলি অমাহুবিধ শক্তি ও গুণ সঙ্গে লইয়াই তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি যেমন মনোহর ছিল, তাঁহার প্রকৃতিও তেমনি মুগ্ধকর ছিল। কি যেন যজ্ঞ-মন্ত্রের প্রভাবে তিনি মাহুয়ের হৃদয় বশ করিতেন। তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের মনোবৃত্তির গতি, চিন্তার ধারা, ধর্মসাধনার রূপ সবই তিনি সহসা বদলাইয়া দিলেন। কে ভাবিতে পারিয়াছিল, নব্যশিক্ষিত মার্ক্সভবুদ্ধি পাশ্চাত্য-সম্ভার ছাপ-মারা যুবকগণ ছোটলোকদের মত কেবল করতাল লইয়া রাস্তায় রাস্তায় দল বাঁধিয়া গান করিবেন? কে কল্পনা করিতে পারিত, দেশের ইংরাজীশিক্ষিত সংশয়ী অবিখ্যাতী নাস্তিক তত্ত্বলোকেরা আবার ঐ খোল করতালের সংকীর্ণনে মাতিয়া চোখের জল ফেলিবেন? কেশবচন্দ্র কি দেখাইলেন? কেশবচন্দ্র দেখাইলেন, অনেক দিন আগে গৌরান্বিত যে জাতিনির্কীর্ণশেষে প্রেমের বস্তা বহাইয়া দিয়াছিলেন, হরিনামের বীজমন্ত্র দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কেবল ইতিহাসের পাতায় বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নয়, তাহার প্রয়োজন ও তাহার কার্যকারিতা অতীত হয় নাই। কেশবচন্দ্র বুঝাইয়া দিলেন যে, বুদ্ধদেব বহুকাল পূর্বে গাছের তলায় বসিয়া যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অর্দ্ধ জগৎ নতমস্তকে বাহা স্বীকার করিয়াছে—আরও সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সমস্ত জগৎ তাহারই সাধনা করিবে, তবু তাহার প্রয়োজন কোন দিন ফুরাইবে না। তবু তাহার সত্য কোনদিন মরিবে না। মহুয্য ধর্মকে বাদ দিয়া কোন দেশে, কোন কালে, কোন ধর্ম পালন করা যায় না। কেশবচন্দ্র দেখাইলেন, দূর দূরান্তরে পৃথিবীর অপর প্রান্তে যে মহুয্য জাতি বাস করে, বাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, বাহাদের আহার বিহার, বাহাদের ভাবা ব্যবহার সকলই ভিন্ন, সকলই বিপরীত, সেইখানেও ধর্মপ্রচারকগণ যে উপদেশ দেন, সে দেশেরও ধর্মগ্রন্থগুলি বাহা বলে, আমাদের হিন্দু ধর্মকে তাঁর মাঝে না। ধর্ম তো ধর্মকে আঘাত করে না। সত্য তো সত্যের বিরুদ্ধা-চরণ করে না।

প্রত্যেক লোকের জীবনে এমন একটা ক্ষণ আসে, যখন সে অনুভব করে যে, ইহ জীবনই তাহার সর্বস্ব নয়, এই সংসার তাহার গৃহ নয়, পথ মাত্র। চূর্ণম গিরি কান্তার মরু হৃদয়ের পারাবার লভন করিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়, অহরের প্রদীপে বিশ্বাসের অগ্নিকণা সংযোগ করিয়া। কে পথ বলিয়া দেয়? কে ভরসা দেয়? কে হাত ধরে? তাই তো মানুষ শাস্ত্র লেখে, তাইতো মানুষ শাস্ত্র অবেষণ করে, তাইতো মানুষ (ধর্ম) সনাজ স্থাপন করে, তাইতো মানুষ মণ্ডলী গঠন করে। যেন একজন পড়িয়া গেলে আর একজন সাবধান করিতে পারে, যেন ডাকিলে পরস্পরের নিকট হইতে সাড়া পাওয়া যায়, যেন একজনের সংস্পর্শে আর একজন বলশাল্য করিতে পারে, যেন একজনের প্রভাবে আর একজন সজীবিত হইতে পারে। কিন্তু সেই প্রভাব যে কতদূর বিস্তৃত হইতে পারে, একটা হৃদয়ের মাহাত্ম্য কত সাগর বন প্রান্তর পার হইয়া আর একটা সমবিশ্বাসী হৃদয়ের চুরারে আঘাত করিতে পারে, একটা প্রাণ-স্পন্দন যে শত যোজন দূরস্থিত আর একটা প্রাণ-তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হইতে পারে, ইহার সম্ভাবনা কে কল্পনা করিতে পারিত? ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্মজীবনে এমন একটা কল্প পাঠিয়াছিলেন, যেখান হইতে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে তাঁহার বার্তা প্রেরণ করিতেন, ডাকিলেই সাগর পার হইতেও সাড়া পাইতেন। অতীতে ভবিষ্যতে দূর দূরান্তে মানুষ যে হৃদয়ে হৃদয়ে পরস্পরে গাঁথা হইয়া আছে, ইহাই তিনি প্রমাণ করিলেন। তিনি সূর্যের মত বিপুল বলে আপন পার্শ্বচরগণকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন; তিনি সূর্যের মত আপনার সহজ উত্তাপে চতুর্দিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিতে পারিতেন।

তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের আর একটা দিক ছিল প্রার্থনা। কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, তাঁহার জীবনের প্রথম ও প্রধান কথা প্রার্থনা। প্রার্থনাই তাঁহার গুরু, প্রার্থনাই পথপদর্শক, প্রার্থনাই তাঁহার বন্ধু, প্রার্থনাই সত্য, প্রার্থনাই একমাত্র সম্বল ছিল। কি আশা, কি বিশ্বাসই তিনি পাইয়াছিলেন! তিনি বলিতেন, আমার বিশ্বাসের তিমালয় আছে, আমার ভক্তির সরোবর আছে, আমার ভয় নাই। যন্ত্র তিনি, যিনি পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, পরিপূর্ণ ভক্তিতে, পরিপূর্ণ প্রেমে, একান্ত দীনতার, একান্ত আত্ম-গতো, ইষ্টদেবতার পায়ের তলে আপনার সমস্ত জীবনটা সমর্পণ করিয়া দিতে পারেন। যন্ত্র তিনি, একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া জীবন-দেবতার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া যিনি সংসার তুলিয়া বাইতে পারেন। যন্ত্র তাঁহার, যাঁহার বিধাতাকে পিতা রূপে স্বীকার করেন, বিশ্বকর্মাণকে বন্ধু বলিয়া ডাক দিতে পারেন। তাঁহার কি ধন পাইয়া পৃথিবীর ধন সম্পত্তিকে অবহেলা করেন, কি তালবাস্তুর সংবাদ পাইয়া পৃথিবীর বন্ধুত্ব, সমাজের বন্ধুত্ব উপেক্ষা করেন, কিণের লোভে পাখির খ্যাতি প্রতিপত্তির প্রতি ক্রন্দনের দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন; কোন্ প্রেরণার তাঁহার

অসাধারণ কাজ করেন, অসম্ভব কথা বলেন, কাহার নির্দেশে তাঁহার যুক্তি তর্ক উড়াইয়া দিয়া স্রষ্টা ছাড়া পথে চলেন, সাধারণ লোকের সহজ বুদ্ধিতে তাহা কিছুতেই বোধগম্য হয় না। রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া লোকে তাঁহাদের গালি দেয়, সমালোচনা করে, অবজ্ঞা করে, উপহাস করে। কিন্তু এ সমস্তকে উপেক্ষা করিবার মত শক্তিও তাঁহাদের থাকে। সাধারণ দশজনের মতামতের তুল্যদণ্ডে তাঁহাদের বাক্য ও কার্য ওজন করা চলে না। ব্যতিক্রম লইয়াই তাঁহার সংসারে আসেন। লোকে যখন বিরুদ্ধতা করে, তাঁহার দৈর্ঘ্য সহকারে অপেক্ষা করেন,—যাহারা পাগল বলিয়া বিক্রম করিতে থাকে, তাহাদের প্রসন্নচিত্তে অশীর্বাদ করিয়া যান।

এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অটল বিশ্বাস, এই অটুট শক্তি, এই অপরিণীত দৈর্ঘ্য, এই উজ্জলিত প্রেম, এই অগাধ আনন্দ, এই অনন্ত বেদনা, আমরা ধারণা করিতে পারি না। আমাদের ভাঙারে এত কুলায় না, আমাদের অন্তর সংকীর্ণ, আমাদের হৃদয় অগ্রশত। কিন্তু এই মূর্তি কি আমরা চিনি না? এই রূপই কি তপস্বী ভারতবর্ষের, সাধক ভারতবর্ষের সনাতন রূপ নয়? চিরকাল ধরিয়া এই শক্তিই কি আমাদের আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না? চিরকাল এই মূর্তির সম্মুখেই কি আমরা দেব দেশ মাথা নত করে নাই? আজও কি তাহাই করিব না? আজও তো শক্তি সংগ্রহ করিতে আসিয়াছি। আমাদের কর্মব্যস্ত মুখের চঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিনগুলির মধ্যে বাহ্যরুদ্ধে দেখা পাই না, আমাদের প্রতিদিনকার সুখ সুবিচার হরেক রকম আরোজন প্রয়োজনের স্তূপের মধ্যে বাহ্যকে ঠাঁই দিতে পারি না, আজ একটা বিশেষ তিথি, বিশেষ লগ্নে, সেই শক্তি-সম্মানীয় অন্তর্ভেদী মহিমাকে, সেই নিরাট মনুষ্যকে একটা প্রণাম নিবেদন করিয়া দিতে আসিয়াছি। একটা মুহূর্তের জন্য সব মুখরতা নিস্তব্ধ হইয়াছে, সব চঞ্চলতা স্থির হইয়াছে, সব তর্ক নীরব হইয়াছে, সব অবিশ্বাস লজ্জিত হইয়াছে, সব বিজ্ঞতা বিনীত হইয়াছে। গৃহে ফিরিবার সময় এখান হইতে আজ এক কণা ভক্তি ভিক্ষা লইয়া যাইব, যাহা আমাদের জীবনের সকল ক্ষতি, সব ঙ্খ শোক সার্থক করিয়া তুলিবে;—বিশ্বাসের একটা স্মৃতিসংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইব, হৃৎ-হৃদনের সংগ্রামে যে রক্ষা করিবে;—এক অজলি শান্তিবারি মাগিয়া লইব, যাহা অঙ্গনে ছিটাইয়া দিলে আমাদের সংসারের দাহ জুড়াইবে।

(১) আমাদের তব্বকৌমুদী হইতে গৃহীত।

## যৌবনের স্বপ্ন ।

এখনও মনে আছে, যখন আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসর তখন কঠিন উদ্যমের মধ্যে আক্রান্ত হই। ১৬ বৎসর ক্রমগত



শযাগত, লেখাপড়া ও দূরের কথা, বাড়ীর সকলেই আমার জীবনের বিষয়ে নিঃশব্দ হইলেন; বিশেষতঃ আমি যে কখন জীবনে কর্মক্ষম হইব, এ কথা কেহ মনে করিতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে ভগবানের কৃপার কিছু স্মৃতি হইল; পিতা ও খুল্লতাত মহাশয় হির করিলেন যে, ইহার দ্বারা আর পড়াশুনা হইবে না, কোন কর্মে নিযুক্ত করা হউক। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রদ্ধাশ্রম উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ পরিবারের জ্ঞাতিসম্পর্ক ছিল এবং খুল্লতাত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও ছিল। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার আফিসে আমাকে নিযুক্ত করা হইবে। এ কথাটা আমার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি বিছানার পড়িয়া ক্রমাগত স্বপ্ন দেখিতেছি—কখন সহস্র লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি বক্তৃতা করিতেছি, কখন ব্রাহ্মণ-কল্লাদিগের উপর কোলীনোর নির্ধ্যাতন-নিবারণকল্পে ব্রাহ্মণ-দ্বিষের সহিত সংগ্রাম করিতেছি, কখন লোকাচারের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-বাচ্য সংগ্রহ করিয়া সমাজসংস্কার করিতেছি, কখন জাতিবৈষম্য দূর করিবার জন্য দেশে দেশে প্রচার করিতেছি। আমার জীবন একটা অবিশ্রান্ত যত্নের লহরী হইল—যত্নের বিচ্ছেদ নাই—বিরাম নাই। যত্নের রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া এক অদ্ভুত অচেনা অগন্তে জীবনের গতি নির্দেশ করা, আর মরণের পথে অগ্রসর হওয়া একই কথা। স্বপ্ন আমাকে পরিভ্রমণ করিল না—আমিও যত্নের কূহকে পড়িয়া খুল্লতাতের কথা অস্বীকার করিলাম।

পিতার অসুস্থতি লইয়া কলিকাতা আসিলাম। কলিকাতার প্রথম অভিজ্ঞতা অভিশয় ভীষণ—ঘরে বাহিরে যে সকল লজ্জা পাইলাম, তাহাদের হাবভাব, কথাবার্তা, আলাপ পরিচয়, চাল চলন আমার আগে মরকের একটা কলুষিত মূর্ত্তি অঙ্কিত করিল। কিসকর্তব্যবিমূঢ় হইলাম। আমার বালাবন্ধু নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের সহিত দেখা করিলাম, তিনি আমাকে পাইয়া খুব আশ্চর্য হইলেন, আনন্দিত হইলেন। আমিও পুরাতন বন্ধু পাইয়া ব্যস্ত হইলাম। সন্ধ্যার পূর্বে প্রায় প্রতিদিনই দুজনে মিলিতাম। তিনি কলেজস্কোয়ারে, হেডমাস্টার বা বিডন পার্কে এবং কোন কোন দিন গঙ্গার ধারে ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতেন আমাকেও সঙ্গে লইয়া বাইতেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস, সাধনপ্রণালী ও সাধুচরিত্র বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, বেশ বক্তৃতা হইত। ইহার পূর্বে অল্পবয়স্ক যুবকের মুখে এমন সুন্দর বক্তৃতা আমি আর পূর্বে শুনি নাই। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে, তিনি আমাকে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিতেন। আমি কখনও বক্তৃতা করি নাই, তাহার পর আমি ব্রাহ্মসমাজের কথা কিছুই জানি না এবং ইহার সাধন-প্রণালীও অবগত নহি; আমি কি বলিব? একটু বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতাম, আমার স্বপ্ন আমার সহায় হইত। আমি ৫০ বৎসর যোগশয্যার পড়িয়া যে সকল স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাই স্মরণ করিতাম। স্বপ্নে ধর্মসংস্কারের যে সকল চিত্র দেখিয়াছি, স্বপ্ন আমাকে সমাজের হিতকরে যে সকল

নব নব প্রতিষ্ঠানের সূচনা করিয়া, বক্তৃতা সম্পাদনের জন্য আমাকে প্রতিকের পদে বরণ করিত, দেখিয়াছি, স্বপ্ন আমাকে কৌলীনের অভিশাপ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল বাণী দান করিত আমি তাহারই কথা বলিতাম। নগেন্দ্রবাবু বক্তৃতা ধর্মবিষয়ক—আমার বক্তৃতা সমাজবিষয়ক। তাঁর বক্তৃতা ভক্তিতে সরস, আবার বক্তৃতায় ভক্তির কথা থাকিত না; তবে আমি আমার স্বপ্নের এক একটা চিত্র, যতদূর সম্ভব, ভাষার সাহায্যে উজ্জ্বল করিয়া শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে ধরিতাম। তাঁহার অকুণ্ঠ হইতেন। আমার বক্তৃতা তাহাতে মুগ্ধ হইতেন। একজ্ঞ তিনি আমাকে তাঁহার সহকর্মীরূপে গ্রহণ করিলেন, উভয়ের মধ্যে মণিকাকনের যোগ উপস্থিত হইল।

তিনি আমাকে শ্রীকেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত “আশার দলে” (*Band of Hope*) লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে লইয়া গেলেন। শ্রীকেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্রের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। ব্রাহ্ম-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন পরীক্ষার্থীরূপে ভাই নগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত একদিন উপস্থিত হইলাম। আমার উপর—“আদেশ কাহাকে বলে?”—এই প্রশ্নের উত্তর দান করিবার ভার অর্পিত হইল। আমি বিভ্রান্তের ছাত্র নহি, এ সকল বিষয় কখন চর্চাও করি নাই, কি লিখিব? স্বপ্ন আমার সহায় হইল—যত্নের ঘোরে দুই এক কথা লিখিয়া দিলাম। আচাধ্যাদেব দেখিয়া সন্দেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইলেন। সেই দৃষ্টি আমাকে চিরদিনের জন্য বাঁধিয়া রাখিল। আচাধ্যাদেব যখন নববিধান ঘোষণা করিলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজে জলুহুল পড়িয়া গেল। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোবিন্দী এলবাটহলে (পুরাতন) প্রতিবাদসভা করিয়া বক্তৃতা দান করিতেন। নগেন্দ্রবাবু তাহা শুনি খণ্ডন করিতেন। নগেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা স্মৃতিপূর্ণ, প্রাজ্ঞ ও সুমিষ্ট হইত। এরূপ তিন চারিটা বক্তৃতা হয়। বক্তৃতাগুলি তখনকার ধর্মতত্ত্বে ছাপা হইয়াছিল কিনা, মনে নাই; তবে দুই একখানি ছোট পুস্তিকায় তাহা বাহির হইয়াছিল বলিয়া আমার স্মরণ হয়। সেগুলি পাওয়া গেলে, ভবিষ্যৎ বংশ যখন নববিধানের প্রাচীন ইতিহাস লিখিবে, তখন কাজে আসিবে।

“আশার দলে” (*Band of Hope*) যোগদান করিয়া এবং ঋষি প্রতাপচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিয়া, আমাদের মনে অসাধারণ উৎসাহ হইল। ভাই নগেন্দ্রচন্দ্র ও আমি উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, মদ্যপাননিবারণকল্পে এমন কিছু করা চাই, বাহাতে অতিরে এই ভীষণ পাপ দেশ হইতে দূরীভূত হয়। আমাদের শক্তি, সময় ও চিন্তা মিলিত হইয়া এই শিষ্টাঙ্গ উপনীত হইল যে, সহরের মদের দোকানগুলিকে আক্রমণ করিতে হইবে। প্রাথমিক যৌবনের অদম্য উৎসাহ, কোন বাধা না মানিয়া, অভিযানের মধ্যে বত কঠোর শব্দ ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া, মদ্যপানোদ্বেগ বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য মদের দোকানে সম্মুখে গিয়া বক্তৃতার মেশিনগন (*Machine Gun*) ছাড়িলাম। শত্রুরা অস্ত্রে শত্রে সজ্জিত

হইয়া “যুদ্ধং দেহি” বলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমরা বক্তৃতার গোলাগুলি ছাড়িতে লাগিলাম, তাহারা ছোট ছোট ইট ও প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া আমাদের উপযুক্ত উত্তর দান করিল। প্রহার খাইয়া আমাদের উৎসাহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইল। আমরা সহরের যে সকল দোকানে যাইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলাম, সেখানেই কোথার লোকের নিক্ষেপ, কোথার কর্মমাক্ত জল সর্কাদে সেচন, কোথায় অশ্লীল গালিবর্ষণ, কোথায় নানাবিধ অপমান ও লাঞ্ছনা ঘারা পুঙ্খভূত হইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে সংগ্রামের গতি ফিরিয়া গেল, লোকদের মনে দরার সঞ্চার হইল। এক্ষণে একদল লোক যখন আমাদের মারিতে আসিত, তখন তাহাদেরই মধ্যে আর একদল তাহাদের বিরোধী হইত, তাহাদের বাধা দিত। উত্তর দলে মারপিট চলিত, আমরা দুঃখের সহিত স্থান পরিভ্রমণ করিতাম। এখনকার দিন হইলে আমরা Ordinance এ গ্রেপ্তার হইতাম, অথবা জেলখানায় বাস করিতে হইত। আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে একেবারে নিফল হইল, একথা বলিতে পারি না। কোন কোন স্থলে কিছু কিছু উপকার দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

প্রাতঃকালে একদিন গঙ্গার ঘাটে বহুলোক স্নান করিতেছে, আমরা উভয়ে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঘাটে সকলেই প্রায় হিন্দুস্থানী, আমরা হিন্দি ভাষিনী; তথাপি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে গঙ্গাস্নানের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলাম। বক্তৃতার চাই এক কথা এখনও মনে পড়ে, কেন না, তাহা চিরদিন মনে থাকিবারই কথা। আমি যাই বলিলাম যে, “ভক্তিগঙ্গামে স্নান করনেনে পরিভ্রমণ গোতা হ্যার, ইহ গঙ্গামে কিছু নাই গোতা হ্যার”, অমনি ৫১৭জন হিন্দুস্থানী আমাদের নিকট দৌড়াইয়া আসিল, আর আমাদের জলে ডুবাইয়া মারিবে বলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। নগেন্দ্রবাবু তাহাদের হাত চিনাইয়া চলিয়া গেলেন, আমাকে একবুক জলে লটাইয়া গিয়া বলিল যে, “মার ডালে গা” “আগর এসা কাম আউর নেহি করোগে তো ছোড় দেগা।” আমি বলিলাম যে, “কতি নেহি বোলেগা”। আমাকে ডুবাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কতকগুলি লোক আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিল। বিধাতার সাক্ষাৎ রূপার হস্ত যেন স্বর্ণ হইতে অবতীর্ণ হইয়া জীবন রক্ষা করিল, আমি দিব্য চক্ষে দর্শন করিলাম। ইহাতে আমাদের বিশ্বাস শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আমরা অধর ও সুযোগ পাইলেই বড়বাজারের গঙ্গার ঘাটে একপ বক্তৃতা করিতাম। ক্রমে ক্রমে বহুলোক আমাদের বক্তৃতা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। কলেজ হোয়ার প্রভৃতি স্থানেও একদল ছেলে আমাদের অপমান করিত এবং মধ্যে মধ্যে মারিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিত; আর একদল আমাদের বন্ধু হইয়া রক্ষা করিত। এইরূপ অপমান ও নির্ধ্যাতনের মধ্য দিয়া আমরা মদ্যপান-নিবারণ-কঠোর ও ছাত্রশুলীক নৈতিক জীবন উন্নত করিবার জন্ত বহু বৎসর

ধরিয়া এইরূপ কার্যে আত্মোৎসর্গ করিয়া ছিলাম। অবশেষে কতকগুলি ছাত্রের সহিত আমাদের বন্ধুতা হইল, তাহারা আমাদের সহায়রূপে অনেক কার্যে যোগদান করিতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া বিধাতা আমাদের জীবনকে অগ্রসর করিতে লাগিলেন। আমার জীবনের যত কিছু কিছু বাস্তব জীবনে আকার গ্রহণ করিতে লাগিল দেখিয়া, আমার আনন্দ রাখিবার স্থান রহিল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## চয়ন।

(বর্গগত ভাই প্রভাপচন্দ্র মজুমদারের “Heart-Beat's” হইতে গিরিধির শ্রীযুক্ত ডি, এন, মুখার্জি কর্তৃক অম্ববাদিত)

Christ—হে দেবনন্দন, তুমি সিংহশাবকের মত মহা-তেজস্বী ছিলে। তোমার কাজ করিবার শক্তি যেমন অদ্ভুত ছিল, তোমার হৃৎ কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি তেমন অদ্ভুত ছিল। তোমার কথার বল যেমন আশ্চর্য্য ছিল, নীরবে লাঞ্ছনা অত্যাচার বহন করিবার বলও তোমার তেমন আশ্চর্য্য ছিল। মেঘপালক যেমন দুর্ব্বল মেঘশিশুকে ফোড়ে করিয়া লইয়া বার, তুমি আমাকে সেইরূপে বহন করিবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তুমি আমাকে তোমার প্রকৃতি দান করিয়া রূপান্তরিত কর।

Christ Unique—যীশুর সহিত কি অল্প কাহারও তুলনা হয়? তাঁহার চরিত্রের সাধুতা এবং তাঁহার ধর্মবিশ্বাস তাঁহাকে মানবজাতির সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আবার যখন অরণ্য করা যায় যে, তাঁহাকে জীবনে কত লাঞ্ছনা ও নির্ধ্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এবং যে লাঞ্ছনা ও নির্ধ্যাতনে অপরের ছন্দ তরিত ও কঠোর হইয়া যাইত, তাহা তিনি নীরবে সহ্য করিয়া অত্যাচারীদের গতি অসীম স্নেহ প্লেম প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তখন তাঁহার সহিত তুলনা করিবার আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। অবশেষে মহা গৌরবময় মৃত্যুতে তাঁহার হৃৎ কঠোর অবমান হইল। যদি এইরূপেই তাঁহার জীবনলীলা কুরাইত, তাহা হইলেও তিনি মানবৈতিহ্যের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু তিনি মৃত্যু হইতে উদ্ধৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার আত্মা যে এখনও পৃথিবীতে বর্তমান, চারিদিকেই তাহার প্রমাণ দেখা যায়। মৃতেরা তাঁহার নাম লইয়া নবজীবন লাভ করিতেছে এবং জীবিতেরা তাঁহাকে ভক্তি করিয়া দিন দিন নব শক্তি প্রাপ্ত হইতেছে। সংসারে বহু জানী ব্যক্তি আছেন, বহু শিষ্টপ্রকৃতির লোক আছেন, বহু সাধু সজ্জন আছেন—যীশুর দীনতা ও বিনয় তাঁহাদের সকলের মাথার মুকুট। সকল প্রকার পাপ, তাপ, শোক ও বেদনা

তাঁহার ভাবে দেখিলে পবিত্র হইয়া যায়। পৃথিবীতে তাঁহার সহিত আর কাহার তুলনা করিব?

Jesus—সমগ্র মানববংশের মধ্যে তুমিই যজ্ঞ, হে যীশু, তোমার কথা চিন্তা করিতে কি আনন্দ! দিনের পর দিন আমার মস্তক লক্ষ্য করিয়া যে লাজুনা ও অপমান বর্ষিত হইতেছে, সেই লাজুনা ও অপমানের আলা নিভির যায়, যখন ক্রুদ্ধে চূর্ণন করি, তুমি তোমার জয়গান করি। সংসারে যে মোহ ও মিথ্যার আবেষ্টন, তাঁহার মধ্যে তুমি সত্যরূপে বিরাজিত বলিয়া যখন স্বীকার করি এবং তোমার ঈশ্বরপুত্র নির্যাতন হইয়াছিল, আমি তাঁহারই একটু অংশ পাইবোই প্রিয়নাথ মন্ডিন মন, তুমি এখন আমি অপূর্ণ শান্তিলাভ করি, তুমি আরাধনাদি ক্রিয়া, তুমি মানবজাতির শিরোভূষণ, আমি তোমাকে অনুসরণ লাভ করিতে কামনা করি। তোমার প্রাণে যে শান্তি ছিল, তাঁহার কিস্কিন্দ্রাজ ও যদি আমি পাই, আমি সকল নির্যাতন আনন্দের সহিত বহন করিব। তুমি মৃত্যু হইতে উদ্ধৃত হইয়া এখন ভগবানের বক্ষে বাস করিতেছ। বাহারা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের হইয়া তুমি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিও। আমরাও একদিন সেই পূণ্যধামে উপনীত হইয়া তোমাকে ভগবানের দক্ষিণ পাশে দর্শন করিব।

“আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।

নিষ্ঠা ব্রতস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥”

আজ বাঁচার পবিত্র স্মৃতিতীর্থে উপস্থিত, তাঁহারই হৃদয়পটে এই লক্ষণের চিত্র অঙ্কিত। নববিধানে আসিয়া তাঁহার কোলীনা আরও ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার উপাসনা-প্রিয়তা পরিবারের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। উপাসনা তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক অঙ্গুষ্ঠান ছিল। উপাসনালয়ে যখন তিনি ও তাঁহার ভক্ত স্বামী হরপার্কটীর ন্যায় বসিতেন, তখন তাঁহাদের সৌন্দর্য আরও ফুটিয়া উঠিত। উপাসনা তাঁহার জীবনে অঙ্গ-পানে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সেই জীর্ণ দেহ তাঁহার সে পথের অন্তরায় হইতে পারে নাই। বিগত ১৯৩১ সালে বড় দিনের সময়ে তাঁহার নূতন ভবনে আমরা সদলে অবস্থান করিতে ছিলাম। তিনি সেই জীর্ণ দেহ লইয়া বাতির দ্বিতল প্রদেশে উঠিয়া, উপাসনা-প্রকোষ্ঠে আমাদের উপাসনার যোগদান করিতেন। এই সময়ে এই দেহ লইয়া তিনি কলিকাতার মাণ্ডোংসবের উপাসনার যোগদান করিয়াছেন। মহাত্মার লেখা আছে, “যে নারী পতির প্রতি অমুরক্তা ও মঙ্গলাকাজিণী হইয়া, আপনাকে সংযত করিয়া, নিত্য হৃদয় ত্রুটি আচরণ করেন, তিনিই পতির ব্রতভাগিনী হয়েন।” আমাদের তপস্বিনী ভগিনী তাঁহার জীবনে তাহা সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

## স্বর্গীয়া ভগিনী তারাসুন্দরী।

(শ্রদ্ধাসংসারে পাঠের জন্য প্রেরিত)

যে স্ত্রী লইয়া এই পরলোক-প্রস্থিতা ভগিনীর পরিবারের সঙ্গে আমাদের আত্মিক ও পারিবারিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আজ সেই সম্বন্ধের ভিত্তিস্তরে বাঁচার নাম অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহাকে প্রথমে প্রণাম করি। এই প্রস্তরে ভক্ত “কাহ্নিচন্দ্রের” নাম উজ্জল অক্ষরে লিখিত। কল্পা “শান্তিদায়িনী” এই পরিবারে প্রবেশ করিবার পূর্বে, ভক্ত কাহ্নিচন্দ্র তাঁহার সুদীর্ঘ পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন, “এই পরিবার নববিধানভক্ত এক বিশিষ্ট পরিবার। ইহাদের আচার, ব্যবহার ও নিষ্ঠা ব্রাহ্মণপরিবারের মত।” এই পত্র এই রীতি প্রবাসে অবস্থানকালে তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছিল। “সুবর্ণরেখার” বেলাভূমিতে বসিয়া ভক্ত কাহ্নিচন্দ্রের প্রত্যাদেশের ভিত্তি বিধাতার আলোক প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া, বিধাতার বিশেষ ইচ্ছায় কল্পাকে এই পরিবারে তাঁহারই নামে নিবেদন করিলাম। তাঁহার পর যতই এই পরিবারের সঙ্গে প্রেম, ভালবাসা ও বিশ্বাসের যোগে যুক্ত হইতে লাগিলাম, ততই দেখিলাম যে, ভক্ত কাহ্নিচন্দ্রের ভিত্তি দিয়া বিধাতার যে ইচ্ছা প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইতেছে। যুবক-জীবনে পুস্তকে যে কোলীজের লক্ষণ পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা এই পরিবারকে দেখিয়া সর্বদা মনে হইত।

## শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(৬ই জুলাই, স্বর্গীয় প্রমোদকুমার সেনের শ্রদ্ধাসংসারে লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি)

আজ শ্রীমান্ প্রমোদকুমারের শ্রাদ্ধের দিনে, মা, তোমার পরলোকবাসী সন্তানের অপেক্ষায় শ্রদ্ধাঞ্জলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। তুমি একবার তাঁকে বুকে করে’ আমাদের শোকাক্ত হৃদয়ে উদয় হইয়া আমাদের এই শোকাক্ত আনন্দাশ্রুতে পরিণত কর। তোমার সেই সন্তানের অসাধারণ সহিষ্ণুতা, দৃঢ় বিশ্বাস, পূর্ণ নির্ভর এবং প্রকৃত বদন অন্তিমকালে তোমারই মহিমা প্রচার করিয়াছে। তুমি যে অকিঞ্চননাথ, আত্মারান, প্রেমপ্রসবণ ও শান্তিনিকেতন, তা তিনি শেষ জীবনে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নির্ভয় নিশ্চিন্তচিত্তে আশাপূর্ণহৃদয়ে এ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তার কোন সংশয় নাই।

শ্রীমান্ প্রমোদের পরলোকবাত্রার দশদিন পূর্বে, ১১ই জুন রবিবার বৈকালে এটোর সময়, আমি তাঁহার নিকটে বাই। তখন তিনি তাঁর ঘরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় লোহার খাটে বিছানার উপর পা বুলায়ে বসিয়াছিলেন। তাঁর কল্পা ভিজে গামছা দিয়ে তাঁর পা মুছাইয়া, অভিকলনের জল নাথায় দিয়া চুল আঁচড়াইয়া দিতেছিল। আমাকে দেখিয়া তিনি সাদরে তাঁর বিছানায় বসাইয়া বলিলেন:—“এই রোগে পড়িয়া আমি

সকলকে বড় কষ্ট দিতেছি। মা আমাকে ধোণার পাটে ফেলে  
আছড়াচ্ছেন। সাদা ধপ্পে করে' আমাকে নিয়ে যাবেন।  
অনেক মরলা ধরেছিল কি না, তাই পরিষ্কার করিতে দেবী হচ্ছে।  
কেচেকুচে সাদা ধপ্পে হলেই তিনি তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে  
দেবেন, আমি সেই গাড়ী চড়ে' মার কাছে বা'ব। সেই প্রতীক্ষার  
রসে' আছি।" এই বলে' তিনি "মা, মা, মা, মা বল, মা বল" মুহু  
মুহুর সুরে মা নাম গান করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁর কণ্ঠে  
কণ্ঠ মিলিয়ে প্রাণ ঢেলে যোগ দিলাম। তাঁহার কল্যাণে,  
ইহপরকালের সন্ধিস্থলে বলিয়া, এক সঙ্গে মায়ের নাম করিয়া,  
নামাস্তুতের কিঞ্চিদ্বারা আবাদনে কৃতার্থ হইলাম। পরে গান  
বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আমি প্রায় সমস্ত রাত্রি বলিশ বৃকে  
করিয়া মা মা করি, আর ভাবি, মা কবে আমার জন্তে গাড়ী  
পাঠাবেন।"

এই সাংঘাতিক পীড়াতে যদি কোন প্রকারে তাঁহাকে সাধনা  
দিতে পারি তাবিগ। তাঁর কাছে গিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁর এই  
সকল কথা শুনিয়া আমার সকল অভিমান অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া  
গেল। দর্পহারী শ্রীহরি আমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন।  
সেই দিন হইতে যোজাই ভাবি, কবে আমি এইরূপ বিশ্বাস তত্ত্ব  
নির্ভরের সহিত এই দেহ-ভাগ্যপূরক মায়ের সঙ্গে মায়ের গাড়ীতে  
চড়ে' হাসতে হাসতে ডাং ডাং করে চলে' বা'ব। আমার ভাগ্যে  
কি এমন দিন হ'বে? এ অভিমাত্রীর প্রতি দীননাথের দয়া কি  
হবে?

শুনিলাম, উহার দুই চারি দিন পরে, তিনি ঐ ভাবের  
কথা আরও কয়েকজনকে বলেছিলেন। আরও শুনিলাম,  
একদিন অভ্যাগত মহিলারা অস্ত্র বাইবার অস্ত্র অপেক্ষা  
করিতেছিলেন, এমন সময় গাড়ী আসিলে যখন তাঁহারা উঠিলেন,  
তখন তিনি বলিলেন, "এইরূপে আমার গাড়ী কবে আসিবে।"  
২১শে জুন, যে দিন তিনি দেহত্যাগ করিবেন, সেইদিন সকালে  
শৌচান্তে ছোট ভাই শ্রীমান বিজয়কুমারকে বলিলেন, "আজ  
আমি খুব ভাল আছি, কোন কষ্ট নেই, ডাক্তার আনিতে হবে  
না।" ইহার ২৪মিনিট পরেই মাটির দেহ মাটিতে রেখে,  
সকলকে কাঁদিয়ে, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে চলে' গেলেন।

অনেক দিন হ'তে এই সাংঘাতিক রোগযাতনা ভোগ  
করিয়া খুব কাহিল হ'লেও, কখন বিছানা মরলা করেন নাই।  
নির্দিষ্ট স্থানে শৌচাদি সম্পন্ন করিয়া কাপড় ছাড়িয়া শুদ্ধভাবে  
থাকিতে ভালবাসিতেন। ডাক্তারদের নিবেদন সত্ত্বেও, যে যখন  
তাঁহাকে দেখিতে আসিত, জানিতে পারিলে তখনই তাঁহাকে  
কাছে বসাইয়া আলাপ করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে কোন  
কোন লোককে কাজ কন্মের ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। মানা  
করিলে বলিতেন, "যে কয়দিন বেঁচে আছি, সে কয়দিন যদি  
আমার কথার উহাদের কোন উপকার হয়, তো করে' বাই  
বালাকাল হইতে তাঁর প্রাণ উদার ছিল, পরশ্রী দেখিয়া সুখী

হইতেন, সংসারের প্রতি কখনই একটা টান ছিল না। যেজ্ঞা-  
চারী হইলেও ঐ সকল গুণে তিনি সকলের শ্রিয় ছিলেন।

যুগে যুগে কত ছুটে ছেলে শিশু হ'য়েছে। তাঁহাদের জীবনের  
পরিবর্তনে দেখি যে, সেই সেই যুগধর্ম্মবিধান প্রবর্তকদিগের প্রভাব  
উহাদের জীবনে প্রতিকলিত। বর্তমান যুগধর্ম্মবিধানে, দুষ্টির  
পরিবর্তনে দেখিলাম, কেবল মায়েরই মহিমা জাজ্ঞান্যমান স্বর্ণা-  
ক্ষরে তাহার হৃদয়ফলকে অঙ্কিত। আমার জ্ঞান দুষ্ট ছেলেদের  
কত আশা, ভরসা, সাহস ও বিশ্বাসের প্রবর্তক।

প্রাতঃস্মরণীয় পরম ভাগ্যবান রামকমল সেনের বংশধর,  
তুষ্টি পুষ্টি শেখ হা দেবাইয়া গেলে, তাতা  
— ভাগ্যে বটে না। কণায়াত্র অভিমান  
থাকিতে কেউ। তে সর্ব্ব স্বর্গিয়া নিশ্চিত হইতে পারে  
না। তুমি তোমার মাকে সকল ভার দিয়াছিলে বলিয়াই, তোমাকে  
তিনি সাদা ধপ্পে করে' এই মর্ত্যধাম হইতে অমরধামে লইয়া  
গেলেন।

প্রমোদ! তোমার অস্ত্র প্রার্থনা করিবার কিছু খুঁজে পাই  
না। তুমি এই মাটির দেহ ফেলে এখান হ'তে চলে' গেছ বলে',  
আমাদের সঙ্গে সঙ্কল্প বার নাই। তুমি যেখানেই থাক না কেন,  
মায়ের কোলে আছি, সেখানে দেশকালের ব্যবধান নাই। মায়ের  
অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড প্রেমসূত্রে আমরা সকলেই গাঁথা। তাই  
আকুলপ্রাণে তোমাকে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, তুমি তোমার  
মাকে বলে' ক'রে, তাঁর সঙ্গে একবার চিদাকারে চিদাত্মাশে  
উদয় হ'রে, আমাদের তাপিত শ্রাণকে শীতল কর।

মাগো, তুমি অন্তরে থাকিয়া সব জানিতেছ। আমাদের মোহ  
আবরণ উন্মোচনপূরক, অহুমান-অধার হইতে বর্তমান-সত্য-  
লোকে পরলোকবাসী শ্রিয়জনদের সঙ্গে প্রকাশিত হও। ব্যাকুল  
হৃদয়ের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। নিঃসংশয়চিত্তে আগন্তরে বলি,  
ও শান্তি! শান্তি! শান্তি!

প্রত্যক্ষদর্শী।

## সংবাদ।

স্মৃতিমন্দির-প্রতিষ্ঠা—আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন  
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ভক্তিমতী সাধ্বী মাতৃদেবী  
(বর্গীয় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কালীনাথ বসু মহাশয়ের স্বর্গীয়  
পত্নী) স্বর্গীয় কুমুদিনী বসুর স্মৃতিরক্ষার্থ পুরী বসন্তকুমারী বিধবা-  
শ্রমে এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়া, একটা পাঠাগার নির্মাণ করিয়া  
দিয়াছেন। আশ্রমের অধিনেত্রী শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবীর উদ্যোগে  
এবং আহ্বানে, গত ১লা জুলাই, শনিবার, বিশেষ উপাসনা ও নব-  
সংহিতার প্রার্থনা অবলম্বনে এই স্মৃতিমন্দিরের দ্বার উদঘাটন ও  
প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাঁই গিরিনাথ উপাসনা করেন  
এবং লেডী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট শ্রীমতী স্ত্রীযুক্তা বালা সেনের নেতৃত্বে

আশ্রমের ভগ্নীগণ মধুর স্তোত্র পাঠ ও সঙ্গীত করেন। দাতাকে দ্বিধার অজস্র আশীর্বাদ দান করুন।

**আদ্যাশ্রাদ্ধ**—গত ১৬ই জুলাই, হাওড়া ব্যাটার, ৫৩নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া তারাসুন্দরী দেবীর আদ্যাশ্রাদ্ধ পূত্রকঙ্টাগণ কর্তৃক নবসংহিতামতে গভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। কীর্তন করিতে করিতে পবিত্র ভাস্মাধার সহ সমাবিহনে উপস্থিত হইলে, তাই গোপালচন্দ্র গুহ প্রার্থনা করিয়া পবিত্র শ্রুতিচিহ্নরূপ উক্ত ভাস্মাধার সমাধিস্থে স্থাপন করেন। তৎপর কীর্তনান্তে উপাসনা আরম্ভ হয়। তাই প্রিয়নাথ মল্লিক উদ্বোধন ও শাস্তি বাচন করেন, তাই অক্ষয়কুমার লখা আরাধনাদি করেন, তিন জনে সমন্বয়ে স্নোক পাঠ করিলে ডাঃ সত্যানন্দ রায় স্নোকবাখ্যা করেন। তাই প্রিয়নাথ উদ্বোধন ও প্রার্থনার পরলোকগতা মাতৃদেবীর সঙ্গুণ উল্লেখ করিয়া, তাঁহার স্মরণ জীবনের প্রতি সকলের প্রভাবভক্তি আকর্ষণ করেন। পুত্রগণের নিষিদ্ধ মাতৃদেবীর স্মরণ সংক্ষিপ্ত জীবনীটা কোঠা জামাতা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দাস কর্তৃক পঠিত হয়। পুত্র, কন্যা ও পুত্রবধূগণ সকলে দণ্ডায়মান হইলে, কোঠপুত্র শ্রীমান বিনয়কুমার দাস লম্বান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। বিধানমুরলী শ্রীমান লত্যানন্দনাথ দত্ত মধুরকণ্ঠে সঙ্গীত করেন। উপাসনার প্রথমে ও শেষে শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে স্মরণ কীর্তন করেন। অস্থানটি পরিবারবর্গের এবং উপস্থিত সকলের প্রজ্ঞাপূত ভাবে স্থলম্পন্ন হয়। অবিরাম বৃষ্টি ও তরানক হুর্যোগ সত্ত্বেও মণ্ডলীর ও বন্ধ বান্ধব অনেকেই উপস্থিত হইয়া, পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে হৃদয়ের প্রজ্ঞাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। উপাসনান্তে মাতৃদেবীর ইচ্ছানুসারে ভূরিভোজনে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। এই পবিত্র অমুষ্ঠানে নিম্নলিখিত যে সকল দান উৎসর্গিত হইয়াছে, তন্মধ্যে উপাসনাশীলা, উৎসবানুরাগিণী মাতৃদেবীর ইচ্ছামত, নিজ গৃহে প্রতিবৎসর অমুষ্ঠিত ব্যাটার উৎসবটিকে স্থায়ী করিবার জন্ত যে দান উৎসর্গিত হইয়াছে, তাহাতে স্বর্গীয় মাতৃ-আত্মা কত না তৃপ্ত হইয়াছেন এবং সন্তানদিগকে কত না আশীর্বাদ করিতেছেন। নব-বিধানের জীবন, নববিধানের গৃহ যে উৎসবময়, তাহারই প্রমাণ তিনি নিজ জীবনে দিগে গেলেন। নিত্যোৎসবলোকে উৎসবময়জীবন অমর সাধু সতীদের সঙ্গে এখন সে আত্মা নিত্যানন্দে থাকুন। নব-বিধানজনমীর আশীর্বাদে, সে অমর আত্মার অমর প্রভাব পরিবারে চির অক্ষুর থাকিয়া, সকলের জীবনকে উৎসবময় ও শান্তিময় করুক।

**হাওড়া**—ব্যাটারা অনাথবন্ধু-সমিতি ২০৯, ব্যাটারা কেরো-মেশন বালিকাবিদ্যালয় ২০৯, হাওড়া উচ্চ বালিকাবিদ্যালয় ও বালীনিকেতন (২য় চৌপা পদক) ১০৯, ব্যাটারা দাধারণ পুস্তকাগার ১০৯, ব্যাটারা মহিলা-সমিতি ৫৯; কলিকাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ২০৯, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২০৯, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ১৫৯, নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২০৯,

ভগ্নীসমিতি (কাপড়) ১০৯, বালকদিগের রবিবাসরীর নীতি-বিদ্যালয় ১০৯, বালিগঞ্জ পুণ্যাশ্রম ১০৯, নারীরক্ষণ-সমিতি ১০৯, নববিধান ট্রাষ্ট ১০৯, ভবানীপুর সঙ্গিনীসমাজ ৫৯; পুরী—নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ও হাওড়া ব্রহ্মানন্দাশ্রম ২০৯; রাঁচি—দাতব্য সমিতি ৫৯, রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ ৫৯; বাকিপুর—ব্রাহ্মসমাজ ১০৯; কাঁপা—ব্রাহ্মসমাজ ৫৯; সিংখি—বালিকা-বিদ্যালয় ৫৯; বালেশ্বর—ব্রাহ্মসমাজ ৫৯; স্থানীয় অভাবগ্রস্ত পরিবারবর্গের জন্ত বস্ত্র ৫৫৯, দরিদ্রের জন্ত মিষ্টান্ন ৪০৯ টাকা। মোট ৩৪৫ টাকা মধ্যে ভগ্নীগণ ৫০৯ টাকা দান করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত পুত্রগণ স্বর্গীয়া মাতৃঠাকুরানীর ইচ্ছানুযায়ী ব্যাটারা ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবটি স্থায়ী করিবার জন্ত বার্ষিক ৩০০ টাকা আয়ের কোম্পানীর কাগজ ৫০০০ টাকার, এবং প্রতিবৎসর মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণ উপলক্ষে অভাবগ্রস্ত পরিবারবর্গের জন্ত কাপড় ইত্যাদি ২৫ ও প্রতিবৎসর একটা বালিকার শিক্ষার জন্ত বৃত্তি ২৫, এই ৫০৯ টাকা আয়ের কোম্পানির কাগজ ১০০০ টাকার। মোট ৬০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ স্থায়ী ফওরুপে দান করা হইয়াছে।

**পারলৌকিক**—গত ৪ঠা জুলাই, কল্টোলায়, ৯নং মুরলীধর সেম লেনে, শ্রীযুক্ত গিরীন সেনের পত্নী দেবী অমরলোকে প্রস্থান করেন। তৎপক্ষে গত ১৯শে জুলাই, ঐ গৃহে পরলোকগত আত্মার স্মরণার্থ ও কল্যাণার্থ শ্রীযুক্ত দীয়েন্দ্রনাথ সেম উপাসনা করেন। অনন্ত করুণাময়ী জননী তাঁহার কন্যার আত্মাকে নিত্য শান্তিবক্ষে রক্ষা করুন এবং শোকাক্ত পরিবারে শান্তি ও সাহসনা বিধান করুন।

গত ১৬ই জুলাই, রাঁচিতে, শ্রীযুক্ত গোবীন্দ্রপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার বৈবাহিক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর হুর্শেচন্দ্র সরকারের দায়বৎসরিক প্রাদ্ধ ও বৈবাহিকী স্বর্গীয়া তারাসুন্দরী দেবীর (হাওড়ার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের সহধর্মিণী) আদ্যাশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, উভয় পরিবারের সঙ্গে আত্মিক ভাবে যুক্ত হইয়া নৌরীবাবু বিশেষ উপাসনা করেন।

**পরলোকগমন**—আমরা গভীর হৃৎখণ্ড ও সমবেদনার সহিত নিম্নলিখিত পরলোকগমনসংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

গত ১৮ই জুলাই, মঙ্গলবার, প্রাহাষে ৬টার সময়, গিরিধিতে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের আশ্রমকুটীরে, শাস্ত্রসাধক ধর্মি স্বর্গগত তাই কেদারনাথ দেব তৃতীয়া কন্যা, স্বর্গীয় রাধানাথ দেবের সহধর্মিণী শ্রীমতী গেমলতা দেবী, ৪৪তম হৃদয়ের ক্রিয়া বদ্ধ হইয়া যাওয়াতে, ভ্রাতা, ভগ্নী ও বহু আত্মীয় স্বজনদিগকে গরিভ্যাগ করিয়া, অমরধামে অমরজনীর ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন। তাঁর উপাসনাশীল পবিত্র স্মরণ প্রেমগূর্ণ জীবনের প্রভাব, উচ্চ ও সুমিষ্ট কণ্ঠে প্রার্থনা ও সঙ্গীতের সুরলহরী প্রাপ্তে প্রাপ্তে অমৃতভব করিতেছি। ৪৪তম চলিয়া যাওয়াতে তাই বোন কেহই কাছে থাকিবার সুযোগ পান নাই। শেষ সময়ে নাকি কেবল “মেহরাণা”



“মেজদা” করেছিলেন। পৃথিবীর শৃঙ্খল পরিচালনা করিয়া এখন সে আত্মা অনন্তের পূর্ণ ঘরে শান্ত ও তৃপ্ত হইয়াছেন। ১৪ই আগষ্ট, শান্তিকুটীরে, ভ্রাতৃত্বমীমাংসা তীহার আদ্যাশ্রদ্ধাযজ্ঞান সম্পন্ন করিয়াছেন।

গত ৬ই আশ্বিন, ২২শে জুলাই, শনিবার, রাত্রি ১—৩৫মিঃ সময়, রাঁচি প্রবাসে, অস্থায়ী অবস্থায়, আকস্মিক সন্ধ্যাসরোজে, চট্টগ্রামের স্বনামধন্য উকীল, ব্রাহ্মসমাজের ও দেশের পরমোপকারী বন্ধু স্বর্গীয় যাত্রামোহন সেনের গুণধর মধ্যম পুত্র, কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র, চট্টগ্রামের কৃতিসন্তান, নির্ভীক কর্মবীর ও সুবক্তা, বাঙ্গালীর বড় আদরের ও বড় গৌরবের দেশপ্রিয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন, আকাশের মধ্যস্থ ভাষকের জায়, ৪৮ বৎসর বয়সে অন্তিমিত হইলেন। তাঁহার পরলোকগমনে দেশের ও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তাঁহার অভাবে দেশব্যাপী গভীর শোকাচ্ছাদিত হইয়াছে। তাঁহার আত্মত্যাগ, দেশপ্রিয়তা, নিরলস কর্মপ্রবণতা, চরিত্রের পবিত্রতা ও মধুরতা, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করিবার ক্ষমতা বর্তমান যুব-জীবনের আদর্শ হয়ে থাকুক। ২৪শে জুলাই সোমবার মহা সমারোহের সহিত কলিকাতার কেওড়াভাণ্ডার রাঁচী হইতে আনীত শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। সেদিনকার জনতা ও দৃশ্য অবর্ণনীয়। কলিকাতার নরনারী দেশপ্রিয় সন্তানের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়া ধৃত হইয়াছেন। প্রেরিত কৃষ্ণকুমার মিত্র আশানে কীর্তনা ও বাড়ীতে একদিন উপাসনা করিয়াছেন। ৩০শে জুলাই, যথোচিত সম্মানের সহিত, চট্টগ্রামে “যাত্রামোহন হলের” প্রাঙ্গণে স্মৃতিচিহ্নরূপ পবিত্র দেহভস্ম সমাহিত হইয়াছে।

ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদিগকে যথোচিত উন্নতলোকে স্থান দান করুন এবং শোকাস্ত্রজনের প্রাণে শান্তি ও সাধুনা বিধান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ১০ই জুলাই, স্বর্গীয় গৃহস্থ বৈরাগী রাজমোহন বহুর পুত্র শ্রীনির্মলচন্দ্রের স্বর্গদিন-স্মরণার্থ কটক মধুভবনে ভাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন। আত্মীয় ও পরিবারস্থ সকলে যোগদান করেন।

গত ১১ই জুলাই প্রাতে, ভাই শ্রিয়নাথের একমাত্র ক্রবোপম পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথের স্বর্গারোহণদিনস্মরণে, কটকস্থ ভ্রাতা রামকৃষ্ণ রাওর ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর, রায় বাহাদুর ডাঃ জয়ন্ত রাও প্রভৃতি অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব উপাসনায় যোগদান করেন। ভাই শ্রিয়নাথই উপাসনা করেন, বিশ্বনাথবাবু বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং স্বর্গীয় প্রশান্তকুমার রাওর পত্নী দেবী সজীত করেন। উপাসনান্তে মহানাদীতীরস্থ সমাধিভূমিতে প্রমোদ-বটতলে ধ্যান ও প্রার্থনাদি হয়। সন্ধ্যায় পুরী নবপূর্ণকুটীরেও বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২৪শে জুলাই ১২১১ বলরাম ঘোষের স্ট্রীটে, অনাথ-

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া কান্তমণি দেবীর সাধ্বৎসরিকে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন।

কোচবিহারের সংবাদ—গত ২৮শে জুন, করুণাকুটীরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান্ অক্ষয়কুমারের শুভজন্মদিন উপলক্ষে উপাসনা হয়। কেদারবাবু উপাসনা করেন। গত ২২শে জুলাই, “গ্যান্‌স্‌ডাউন হল”, রেভিনিউ অফিসার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীর সভাপতিত্বে, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী “নবভারতের জাতীয় ধর্ম” বিষয়ে স্তম্ভর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। রেভিনিউ অফিসার এবং জজ সাহেবও কিছু কিছু বলেন। একজন শিক্ষয়িত্রী স্তম্ভর হইয়া গান করেন। পরদিন ২৩শে রবিবার, প্রাতে, মহারাজকুমারী প্রতিভা স্তম্ভরীর স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে মহেশবাবুই উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় তিনিই ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন। ঐ শিক্ষয়িত্রীই উভয়স্থলে গান করেন। সন্ধ্যায় উপাসনার পর জমাট কীর্তন হয়। বক্তৃতা ও উপাসনার প্রায় সমুদায় রাজকর্মচারী, অধ্যাপক বহু ভদ্রলোক, ছাত্রবৃন্দ ও মহিলাগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভাদ্রোৎসব—নিম্ন প্রণালীমতে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইবে—

১৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, স্বর্গগত ভাই পিরিশচন্দ্র সেনের স্বর্গারোহণ সাধ্বৎসরিকে প্রাতে ৭টা নবদেবালয়ে উপাসনা, সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ। ১৬ই বুধবার, ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টার বক্তৃতা। ১৭ই বৃহস্পতিবার, পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সাধ্বৎসরিক দিন প্রাতে ৭টা নবদেবালয়ে উপাসনা ও সন্ধ্যায় ৭টার ব্রহ্মমন্দির স্মৃতিসভা। ১৮ই শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের ভক্ত বিশেষ উপাসনা। ১৯শে, শনিবার, জেনারেল বুথের সাধ্বৎসরিকে প্রাতে ৭টা নবদেবালয়ে উপাসনা ও সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মমন্দিরে মুক্তিফৌজদলের বক্তৃতা। ২০শে (৪ঠা ভাদ্র), রবিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে ৮টার কীর্তন, ৮টা উপাসনা, মধ্যাহ্ন ৩টা উপাসনা, তৎপরে পাঠ ও প্রসঙ্গ, ৬টা কীর্তন, সন্ধ্যা ৭টা উপাসনা। ২১শে, সোমবার, স্বর্গগত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র ও বলদেবনারায়ণের সাধ্বৎসরিকে প্রাতে ৭টা নবদেবালয়ে উপাসনা, সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ। ২২শে, (৬ই ভাদ্র), মঙ্গলবার, রামমোহন কর্তৃক উপাসনা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে, সন্ধ্যা ৭টা উপাসনা। ২৩শে (৭ই ভাদ্র), বুধবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাধ্বৎসরিক উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টা ও সন্ধ্যা ৭টা উপাসনা। ২৪শে, বৃহস্পতিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টা বক্তৃতা। ২৫শে শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টা শান্তিকুটীরে কীর্তনাদি। ২৬শে, শনিবার, সন্ধ্যা ৭টা শান্তিকুটীরে “আমাদের সত্ত্ববৎ” উৎসব। ২৭শে, রবিবার, স্বর্গগত ব্রহ্মগোপাল নিরোগীর সাধ্বৎসরিকে প্রাতে ৭টা নবদেবালয়ে ও সন্ধ্যা ৭টা ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।

Edited on behalf of the Apostolic Durban New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ বজ্রদার স্ট্রীট, “নববিধান প্রেসে”  
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

অবিশালমদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ স্তনির্গলস্তীর্ণং সত্যং শাস্ত্রমনধরম্॥  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ত্র্যম্বকৈর্যেবং প্রকীৰ্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

১৫শ সংখ্যা।

১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

17th August, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## প্রার্থনা :

হে জগতের পরিত্রাতা লীলাময় শ্রীহরি। তুমি যুগে যুগে তোমার নিজ কৃপাগুণে জীবের পরিত্রাণের জন্য, উচ্চগতি-বিধানের জন্য সময়োপযোগী যুগধর্ম-বিধান পাঠাইয়া থাক। পূর্ব পূর্ব যুগে যত ধর্মবিধান পাঠাইয়াছ, সকলই স্বর্গের মহিমা গৌরবে পূর্ণ, তাহার প্রত্যেকটাই অসীম। কিন্তু বর্তমান যুগে যে ধর্মবিধান পাঠাইয়াছ, ইহার বিস্তৃতি, ইহার বিচিত্রতা, ইহার বিরাট ভাব, সর্বগ্রাসী শিক্ষা, সাধনা ও গ্রহণের বিধি ব্যবস্থা যতই আমরা চর্চা করিতেছি, যতই সে সকলের গুরুত্ব আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে, আমাদের অযোগ্যতা ও অপরাধ ততই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া ভ্রিয়মাণ হইতেছি। শিক্ষা, সাধনা ও গ্রহণের কি বিরাট আয়োজন ও ব্যবস্থা এই নববিধানে; তাই তুমি এবার শিক্ষা দিবার ভার নিজে গ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু আমরা তো কেশবের মত শ্রমিষ্ঠ হইয়া তেমন করিয়া তোমার কাছে শিখিতেছি না। শিখিবার সে ব্যাকুলতা কোথায়, গ্রহণ করিবার সে আগ্রহ ও অনুরাগ কোথায়? আবার শুধু তোমার কাছে শিখিলে হইবে না, শিষ্যানুশিষ্য হইয়া তোমার সাধুভক্তদিগের কাছেও শুধু শিখিলে

হইবে না; ছোট, বড় যিনি আমাদের সম্মুখীন হইবেন, নিতান্ত সামান্য ব্যক্তিও যদি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন, তাঁহার নিকটও শিখিতে হইবে। আমাদের স্বভাব চর্চা করিলে দেখি, অত্যন্ত শিখাইবারই আমাদের আগ্রহ বেশী; কিন্তু শিখিবার বা জানিবার তেমন আগ্রহ ও ব্যাকুলতা নাই। স্বয়ং তোমার নিকট, তোমার প্রেরিত সাধু ভক্ত মহাজনদিগের নিকট এবং ছোট বড় যে কোন ব্যক্তির নিকটই আমরা শিখিয়া জানিয়া, আমাদের শিক্ষার পূর্ণতা, জ্ঞানের পূর্ণতা, গ্রহণের পূর্ণতা সাধন করিব, ইহা ভিন্ন বিধানের পূর্ণতা আমাদের জীবনে সাধন হইবে না, এ চেতনাও আমাদের মধ্য তেমন করিয়া উপস্থিত হইতেছে না। আমাদের গণনার দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু আমাদের জীবনে শিক্ষা ও সাধনার ক্রটি ও অভাবের অন্ত নাই; তাই জীবনের ক্রটি ও অভাব স্মরণ করিয়া, প্রাণের ব্যথা লইয়া, ভীতচিত্তে তোমার চরণতলে উপস্থিত হইতেছি এবং কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছি, তুমি নিজগুণে আমাদের কঠোর হৃদয়কে কোমল করিয়া লও, গর্বিত চিত্তকে বিনীত করিয়া লও, ভাল করিয়া আমাদের দৈন্য বুঝিতে দিয়া আমাদের কাছে থাটি দীনাঙ্গা করিয়া লও। আমরা বিনীত ও দীন শিষ্য হইয়া ব্যাকুলচিত্তে তোমার নিকটে

শিখি, তোমার প্রেরণায় ও আলোকে তোমার চিহ্নিত প্রেরিত সাধুভক্তদিগের নিকট হইতে শিখি, এবং তোমারই নির্দেশে দীন অকিঞ্চন ভাবে অতি সামান্ত ব্যক্তির নিকটেও যাঁহা শিখিবার শিখিয়া ও সকলকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, তোমার নববিধানের বিরাট শিক্ষার পূর্ণতা সাধন করি। তুমি কৃপা করিয়া সহায় হও।

শান্তিঃ !

শান্তিঃ !!

শান্তিঃ !!!

## ভাদ্রোৎসবের বান ।

“ভাদ্রোৎসবের বান ডেকেছে আয়রে ভাই দি গা ভাসান,  
অনার্যাসে গিয়ে ভেসে পাব সুরপুরে স্থান।”

ভাদ্রমাসে গঙ্গায় বান ডাকে। নৌকার মাঝি মাল্লারা বহু পরিশ্রম করিয়া যে নৌকাকে একপাও অগ্রসর করিতে পারিতেছিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে বান আসিয়া নৌকাকে তর তর বেগে লইয়া চলিল; মাঝি মাল্লাদের আর দাঁড় টানিতে হইল না, হাল দাঁড় তুলিয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিল। অবিলম্বে নৌকা ঘাটে পৌঁছাইয়া গেল।

নববিধানের ভাদ্রোৎসবও সেই রকম বান। উৎসব মাত্রেরই স্বর্গের বান। সাধ্য সাধনা, পুরুষকার ও চেষ্টায় যখন আমাদের জীবনতরী বলশক্তিবিশীন হয়, ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও মণ্ডলীগত জীবনে ভাটা পড়িয়া আসে, তখনই আমাদের নববিধানবিধায়িনী আনন্দময়ী জননী উৎসবের বান আনিয়া, আমাদের জীবনতরীকে স্বর্গীয় বলে আপনি নব নব জীবনের উন্নতির স্রোতে ভাসাইয়া ঠাইয়া যান। সকল উৎসবেই ইহা আমরা উপলব্ধি করি। বিশেষ ভাবে ভাদ্রোৎসব ভাদ্রমাসের গঙ্গার বানের স্থায় আসিয়া, আমাদের জীবনকে স্বর্গের দিকে প্রবলবেগে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্ত প্রেরিত হয়।

নববিধানের প্রথম বীজ এই ভাদ্রমাসেই বিধাতার অনির্বচনীয় কৌশলে ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন দ্বারাই উৎপন্ন হয়। আবার এই মাসেই বিধাতা নব-বিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দিয়া ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করাইয়া, তাহাতে নব ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করান। জীবন্ত ঈশ্বরের জীবন্ত উপাসনাই ‘স্বর্গের

মহাবান। নিরাকার ব্রহ্মের মন্দির ধরায় স্থাপনের স্থায় নূতন বাপার আর কি হইতে পারে? রাজর্ষি যে আদি “ব্রহ্মসমাজগৃহ” স্থাপন করেন, তাহাও তিনি “ব্রহ্মমন্দির” নামে অভিহিত করেন নাই। ব্রহ্মানন্দ অধ্যাত্ম প্রেরণায় প্রেরিত হইয়াই প্রথম ব্রহ্মের নামেই এই মন্দির উৎসর্গ করিলেন, এবং নবদর্শন-প্রাণ-সাধন-সমুদ্রত ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করিলেন, ইহা সাধারণ ঘটনা নয়। ইহার গভীর স্বর্গীয় ভাব উপলব্ধি করিয়া যেন এবার আমরা ভাদ্রোৎসব-সাধনে প্রবৃত্ত হই এবং সত্যি এই মহোৎসবে গা ভাসান দিয়া পরলোকগত অমরাত্মাগণের সঙ্গে সশরীরে, সপরিবারে, সদলে মিলিয়া উৎসবানন্দ-সন্তোষে ধন্য হই, মা আমাদেরই এমন শুভাশীর্ব্বাদ দান করুন।

— — —

## সাধন-সাম্রাজ্য ।

ধর্মশাস্ত্রের সাম্রাজ্য পর্বাটন করিয়া, শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া আমাদের ধর্মপিতামহ মহাত্মা রামমোহন রায় সকল শাস্ত্রের উপপাত্ত একেশ্বরবাদ ও একেশ্বরের পূজা বন্দনাক্রম মহারত্ন ভবিষ্যৎ বংশের জন্ত উদ্ধার করিয়া গেলেন। ধর্মপিতা মহর্ষি দে প্রনাথ উপনিষদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্রের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পর্বাটন করিয়া, তাহা হইতে ঈশ্বরের সপ্ত স্বরূপ, সপ্ত অমৃতভাণ্ডার, সেই একেশ্বরের পূজা-সাধনের মহা আয়োজন রূপে আমাদের জন্ত সঞ্চয় করিলেন। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার স্বতাবস্থূলভ প্রার্থনা-যোগে সেই সপ্ত স্বরূপকে তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনের আয়োজনরূপে গ্রহণ করিলেন। এই সপ্তস্বরূপ-যোগেই কেশবজীবনে কত কত সরল সুন্দর বিচিত্র ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হইল, এই সপ্তস্বরূপ-যোগেই তিনি কত ভাবে জীবনে ব্রহ্মপ্রেরণা লাভ করিলেন, অতীতের সকল ধর্ম-বিধানগুলির পরস্পর সামঞ্জস্য এই সপ্ত স্বরূপের যোগেই দর্শন করিলেন এবং এই নব যুগে অতীতের সকল ধর্মবিধানগুলির নব ভাবে পুনরুদ্ধার করিয়া সকলের মধ্যে মহা মিলন সাধন করিলেন। অতীত ও বর্ত্তমানের সাধু ভক্ত মহাজন, গুণী ও জ্ঞানিগণের জীবন এই সপ্ত স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া পাঠ করিলেন, গ্রহণ করিলেন এবং আত্মস্থ করিলেন। এই স্বরূপের সহায়তায়,

স্বদেশের বিদেশের ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রকৃত মর্ম অবগত হইলেম ও নামাভাবে বাখ্যা করিলেন। এই স্বরূপের আলোকে তিনি অতীত ও বর্তমানের ধর্মরাজ্যের কত প্রকার জটিল প্রেশ্নের সহজ মীমাংসা করিলেন। এই সপ্ত স্বরূপের যোগে উজ্জ্বল ও গভীর ত্র্যক্ষানুভূতি-যোগে যে জীবন্ত স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইল, সেই স্বর্গরাজ্যের শোভা সৌন্দর্য্যে ও মহিমা গৌরবে ত্র্যক্ষানন্দ কেশবচন্দ্র স্বয়ং কতই মোহিত হইলেন, তাহার বিশদ ও রসাল বাখ্যায় সকলকে মোহিত করিলেন এবং প্রার্থনা ও উপদেশের আকারে কত অমৃতভাণ্ডার ভবিষ্যৎ যংশের জন্য রাখিয়া গেলেন। এই সপ্ত স্বরূপের সাধনেই তাঁহার জীবনে ধর্মসময়ের মহাধর্ম নববিধান উদ্ভাসিত হইল।

খণ্ড খণ্ড রাজ্যের সমষ্টিতে একটা মহা সাম্রাজ্য বাহুজগতে গঠিত হয়। ধর্মরাজ্য, আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বরের এক একটা স্বরূপ এক একটা খণ্ড রাজ্য। পৃথিবীর খণ্ডরাজ্যগুলিতে নিত্যন্ত সীমাবদ্ধ; আবার খণ্ডরাজ্যগুলির সংখ্যা যতই কেন অধিক হউক না, সেই খণ্ডরাজ্যগুলির সম্মিলনে যে পৃথিবীর সাম্রাজ্য, তাহা খুব প্রকাণ্ড হইলেও সসীম, নানাভাবে সীমাবদ্ধ এবং বিশেষ তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু ঈশ্বরের যে খণ্ড খণ্ড এই সাতটা স্বরূপ, ইহার প্রত্যেক স্বরূপ অনন্ত, কোন স্বরূপেরই সীমা নাই। প্রত্যেক স্বরূপের বিস্তৃতি কত, গভীরতা কত, উচ্চতা কত, কে নির্দ্ধারণ করিবে? ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া যে মানবজীবন, সেই সমগ্র জীবনে প্রত্যেক স্বরূপ সাধন কর, এক এক স্বরূপের বিচিত্রতা ক্রমাগত দর্শন কর, এক এক স্বরূপের গভীরতায় ক্রমাগত ডুবিয়া যাও, এক এক স্বরূপের বিস্তারের মধ্যে ক্রমাগত বিচরণ কর, এক এক স্বরূপামৃতভাণ্ডার হইতে ক্রমাগত পান কর ও দান কর, তাহা হইলে এক এক স্বরূপসাম্রাজ্য হইতে কত ধন রত্ন সঞ্চয় করিবে, কত বিলাইবে, ফুরাইবে না, শেষ হইবে না। এই সপ্ত স্বরূপের অক্ষর উপাদানেই আমাদের পূর্বাঙ্গ অক্ষর জীবনও ক্রমাগত লাভ হয়। এই সপ্ত স্বরূপের সমষ্টিগত মিলনেই আমাদের সাধনসাম্রাজ্য।

মানবপ্রকৃতিতে ধন সম্পদ বৃদ্ধি করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রক্ষিয়াছে। যাহার পার্থিব বিষয় আছে, সে তাহা বৃদ্ধি করিতে ব্যস্ত; যাহারা ধর্মক্ষেত্রে স্বর্গের ধনৈশ্বর্য্য

সঞ্চয় করিতে রত হন, তাহারাও যত ধন সঞ্চয় করেন, আরও সঞ্চয় করিতে ব্যাকুল হন। পার্থিব ধন, সম্পদ, রাজ্য, সাম্রাজ্য যতই কেন আমরা বৃদ্ধি করি না, পার্থিব রাজ্য ও সাম্রাজ্যকে যতই কেন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি না, অন্ততঃ ব্যক্তিগত জীবন-সম্পর্কে তাহাদের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের অতি অল্প সময়ের জন্য। অনেক সময়ে এই আজ আছে, কাল নাই; আজ যে রাজ্য বা সাম্রাজ্য, কাল হয়ত সে ফকির বা পথের ভিখারী। পার্থিব ধন সম্পদ, রাজ্য সাম্রাজ্য বেশী স্থায়ী হইলে তত্তৎক্ষণ, এই পৃথিবীর জীবন যতক্ষণ। পৃথিবীর জীবনের শেষ হইলে, পৃথিবীর সম্পদ কাহারও সম্পদ বা সম্বল বলিয়া গণ্য হয় না। কথিত আছে, কোন এক বাদসাহ ইহলোক হইতে চলিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁহার অনুচরদিগকে এই আদেশ করিয়াছিলেন, তিনি দেহ-মুক্ত হইলে তাঁহার সর্বস্ব যেন ঢাকিয়া দেওয়া হয়, কেবল হস্ত দুইখানা যেন বাহির করিয়া রাখা হয়। শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগের পূর্বে তিনি হাত দুইখানি খুলিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় যখন তিনি দেহ-মুক্ত হইলেন, তাঁহার হাত দুইখানি বাহিরে রাখিয়া আর সকল অঙ্গ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অনুচরদর্শ বাদসাহের এ আদেশের মর্ম বুঝিতে না পারিয়া, একজন সাধুর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্য হইল। সাধু বলিলেন, বাদসাহ ইহা দ্বারা জগৎকে এই কথা বলিয়া গেলেন, “আমি শূণ্যহস্তে এই জগতে আসিয়াছিলাম, শূণ্যহস্তে চলিয়া গেলাম; পৃথিবীর রাজ্য, ধন, কিছুই আমার সঙ্গে সম্বল হইল না।”

সত্যই পৃথিবীর উপার্জিত মা সঞ্চিত ধনৈশ্বর্য্য, রাজ্য, সাম্রাজ্য কিছুই আমাদের চিরদিনের সম্বল হই না; মৃত্যুকালে পার্থিব যাহা কিছু, সবই আমাদের গরিভাগ করে। কিন্তু ঈশ্বরের সপ্ত স্বরূপ লইয়া যে সাম্রাজ্যের কথা বলা হইতেছে, সে সাম্রাজ্যের যোগে আমরা ইহকাল পরকালের পরম সম্বল ঈশ্বরকে বিচিত্র ভাবে লাভ করি। ঈশ্বর ও ধর্ম সাধারণ লোকে পরকালের জন্যই সঞ্চয় করিতে প্রয়াসী হয়; কিন্তু ঈশ্বর যেমন পরকালের অক্ষয় সম্বল, নিত্য সম্বল, তেমনই ঈশ্বর আমাদের ইহকালে, বালো, যৌবনে, প্রৌঢ়ে, বৃদ্ধিকো, জন্মে মরণে পরম সম্বল, পরম সহায়। এই নব যুগে সপ্ত স্বরূপ লইয়া যে সাধনমার্গ অবতীর্ণ হইয়াছে, সে সাধন আমাদের গরিভাগ করে।

শিক্ষা দান করে, তিনি আমাদের সংসারে গৃহধর্ম-প্রতিপালনে, শিক্ষা-ক্ষেত্রে, কর্ম-ক্ষেত্রে, বিষয় বাণিজ্যে, ইহকালের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্তব্যে আমাদের শিক্ষা-দাতা, বলবৃদ্ধিদাতা, সহায় ও সম্বল। এইরূপে নানা স্বরূপের ভিতর দিয়া তিনি প্রতিজীবন অবতীর্ণ ও ক্রিয়াশীল। এই সপ্ত স্বরূপের সাধনে আমরা ইহকালে ধর্মের অর্থও সাম্রাজ্য স্থিতি করিয়া, অর্থও সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিয়া ধন্য হই এবং পরলোকেও সেই অর্থও সাম্রাজ্য বাস করিয়া, অর্থও সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিয়া ধন্য হইব, তাহার পূর্বাভাস এখানেই পাইয়া, অটল বিশ্বাসে ও আশা উৎসাহে পূর্ণ হই।

ইতিপূর্বে ঐশ্বরকে কেহ নির্বিশেষ সত্তারূপে সাধন করিয়া এবং আপনার সত্তা তাঁহাতে নিমগ্ন করিয়া, বিভূতি-যোগে ধর্মের পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছেন। আবার কেহ বা তাঁহাকে পিতৃভাবে, কেহ বা মাতৃভাবে, কেহ বা হৃদয়-বিহারী শ্রীহরিরূপে, কেহ বা পরম প্রভুরূপে, বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ভাবে, বিশেষ বিশেষ বাক্তিরূপে সবিশেষে সাধন করিয়া, জীবনে উচ্চ তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাতে সাধনের প্রকৃতি বিভিন্ন হইল, পথ ও প্রণালী বিভিন্ন হইল, আয়োজনও বহু পরিমাণে বিভিন্ন হইল। ফলে হইল যত মত, তত পথ। পৃথিবীতে বহুধর্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। একে অণ্ডের ভাব গ্রহণ করিতে না পারায়, ধর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায় মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, অমিলন, ধর্মের নামে যুদ্ধ বিগ্রহ পর্য্যন্ত সংঘটিত হইল। ধর্মের চরম লক্ষ্য, ইহলোকে পরলোকে, সকলের মধ্যে শান্তি ও আনন্দের সম্মিলন-স্থাপন। ইহলোকে পরলোকে শান্তি-সংস্থাপন এবং দেশকাল, জাতিবর্ণ ও ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের মধ্যে স্বর্গের আনন্দসম্মিলনপ্রাপ্তিটার জন্মই, নব যুগে ঐশ্বরের স্বরূপ-বিশ্লেষণে সপ্ত স্বরূপের সমষ্টিতে ধর্ম-সাধনার প্রাবস্থা। এই সপ্ত স্বরূপের সাধনে, স্বয়ং পবিত্রাত্মার প্রেরণায় ও আলোকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, অতীতে ও বর্তমানে, স্বদেশে ও বিদেশে যতগুলি যুগধর্ম জগতে সমাগত হইয়াছে, সকলই এই সপ্ত স্বরূপেরই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। যত সাধু মহাজন যুগে যুগে পৃথিবীতে ঐশ্বরকর্ডক প্রেরিত হইয়াছেন, সকলেই এই সপ্ত স্বরূপেরই বিশেষ বিশেষ বর্ণনামূলকবিধানপ্রচারক। তারপ্রাপ্ত কাম্যবীর।

তাই অতীতের যত যুগধন্যবিধান, সকলই আমাদের

সপ্ত বরূপের সাধনে সাক্ষাৎ সাধনক্ষেত্র; যত সাধু  
মহাজন স্বদেশের এবং বিদেশের, সকলেই আমাদের  
সাধনক্ষেত্রে সঙ্গী ও সহায়। ইহকালের পরকালের  
সকলকে লইয়া, সকলের সহিত সম্মিলনে আমাদের এই  
সপ্ত বরূপের সাধনা। ইহ পরকালের সব লইয়া  
আমাদের অখণ্ড ধর্ম-পরিবার। ইহ পরলোকের  
সকলের সহিত সম্মিলনে আমাদের অখণ্ড সাধনসাত্ত্বাজ্য।

ସମ୍ପ୍ରତିତତ୍ତ୍ୱ ।

### ঈশ্বর নিরাকার কেন ?

এই বিশ্বের ঈশ্বর আপন শোভা নোদুৰ্গা এবং ঐশ্বর্য্য সকলই দান করিয়া এই বিশ্বপ্রকৃতিকে মণ্ডিত করিলেন। আবার মানব-সন্তানকে শেষে, আপনার বে বাহ্য আকারটি, তাহা পর্যা্যন্ত দান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মশূন্ত হইলেন। তাই বুঝি, তিনি শূন্তাকার নিরাকার হইয়াছেন। এমনই তাঁর আত্মভাগ বে, বহিঃগতে কিছু করিতে হইলে তাহা বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া বা মামুঘের হাত দিয়া করেন, তন্ত্ৰিগ করেন না। এমন কি গরীবকে দুইটা পরস। দিতে হইলেও, সন্তান সন্ততির হাত দিয়া দান করেন। এমন সৰ্ব্বভাগ্যী আনিদ্বশূন্ত নিরাকার আর কে ?

### नवविधान कि ?

নববিধান বিধাতার নবযুগধর্ম। হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, এসলাম ধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম, সকলই ইহার অন্তর্ভুক্ত। আদি ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মসমাজ সকলই নববিধানের অন্তর্গত। নববিধান কোন সমাজ বা সম্প্রদায় নয়। লবণ যেমন সকল তরকারীকে লবণাক্ত করিয়া গুহাহ করে, তেমনি সকল সমাজে, সকল ধর্মে নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্যই নববিধান অবতীর্ণ। ইহা পমিজ্জাখ্যার অবতারণা, ইহা অধ্যাত্ম শক্তি এবং নিত্য নব নব জীবন। কেবল যিনি ইহাতে অবিশ্বাস করেন, তিনিই নববিধান-বিরোধী।

দীক্ষার নতুন অর্থ ।

না। সন্তানকে বলিলেন, “মা বলিয়া কেন ডাক না। আমি তোমার মা, তুমি আমার সন্তান।” ইহাই বার্থ দীক্ষা। দীক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিভূত। পৃথিবীর জননীর গর্ভে আমরা পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছি, কিন্তু যখন বিশ্বজননী আমাদিগকে সন্তান বলিয়া দীকার করেন এবং তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে বলেন, তখনই আমাদের দ্বিভূত লাভ হয়। ইহারই নাম প্রকৃত দীক্ষা। যখনকে মা বলিয়া আমরা ডাকিতে পারি, কিন্তু বতক



না তিনি বলেন, “তুমি আমার পিয় পুত্র, আমি তোমাকে তুই”, ততক্ষণ আমরা প্রকৃত বিলম্ব লাভ করি না বা দীক্ষিত হই না। মারে পোয়ে চেনা পরিচয় হইয়া আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনই লীক্ষা।

### আমিই আমরা।

শ্রীনববিধানাচার্য্য বলিলেন, “এই দৃশ্যমান ‘আমি’ পশ্চাতে অদৃশ্যমান ‘আমরা’। আমি আমার ভাই এক। আমরা এক শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। যে যেখানে যায়, সেই এক পুরুষ যায়। এখানে আমি ও আমার হইতে পারে না, সব মিলে একজন।” ইহাই নববিধানের সাধন। একা একা সাধন বা স্বার্থপর সাধন নববিধানে নাই। এই শরীরের কোন একটা অঙ্গ যেমন অপর অঙ্গচ্যুত হইয়া বাঁচিতে বা তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি স্বভাব হইয়া একা একা কেহ নববিধান সাধন করিতে পারে না। সংকীর্ণন যেমন একা হয় না, ব্যাপ্ত যেমন একটা বস্ত্রে বাজে না, তেমনি নববিধানের সাধন পরিবার, দল ও সর্ব মানবকে না লইয়া হয় না। সংবাদ-পত্রের সম্পাদক যেমন আপনার ভিতর মানবমণ্ডলী অন্তর্ভব করিয়া “আমরা” বলিয়া লেখেন, তেমনি নববিধানবিশ্বাসীও, কখনই একা নন, জনগণ সঙ্গে এক অঙ্গে গাঁথা, ইহাই অন্তর্ভব করেন। তিনি “সদল অখণ্ড”। যিনি বিচ্ছিন্ন হন বা আপনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করেন, তিনি নববিধানে অবিশ্বাসী।

### শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী।

( ১৪ই শ্রাবণ, শান্তিকুটীরে, শ্রীকবাসরে, কনিষ্ঠা ভগ্নী  
শ্রীমতী বনলতা দে কর্তৃক পঠিত )

আজ চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছে সেই গিরিধি নববিধান মন্দির। সমুখে বৃক্ষাদি-পরিশোভিত স্থলর পুষ্পোদ্যান, মধ্যা বৃক্ষতলে শুভ্র মন্দিরবেদিকা সাধু সাধ্বীগণের জীবনের শত শত পুণ্যস্মৃতি বসে লইয়া দণ্ডায়মান। তাহারই মধ্যস্থ ক্ষুদ্র কুটীরে শান্তিপ্রিয় ঋষিকল্পা অনন্ত যোগে মগ্ন হইলেন। আসক্তি মোহ বন্ধন ছিন্ন করিয়া, মুক্ত আত্মা-পক্ষী অনন্ত আকাশে আনন্দে গান করিতে করিতে উড়িয়া গেল। “কেহ নাই হেথা তুমি আ- আমি, অনন্ত জীবনে হে অনন্ত আমি”। আত্মীয় কাহাকেও আশ্রয় আর সুরোগ দিলেন না, নিকটস্থ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ভাই বোনরাও কেহ জানিতে পারিলেন না; চিন্ময় আত্মা একাকী পরমাত্মার কোড়ে আশ্রয় লাভ করিল। অল্প দিন আগেই দেখা হইলে বলিলেন, “আমি এখানে বড় শান্তিতে আছি, কেহ কাছে নাই বলিয়া আমার কোন ভয় বা কষ্ট হয় না। রিবা- নিশি পরাময় নাম সাধন করি, প্রাণে বড় আনন্দ পাই। কি

আশার ও আনন্দের সংবাদ আমাদের জন্ত রাখিয়া গেলেন। আজ আমরা হুঃখ করিব কেন? পিতৃদেব যে শান্তির প্রায়সী ছিলেন, যে ব্রহ্মে একাত্মতা নির্জনে সম্মোগ করিতেন, যে ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন থাকিতেন এবং সন্তানসন্ততিগণের জীবনে যাহা দেখিবার আশা করিতেন, মাতৃদেবী যে ব্রহ্মমুখে আমাদের সুখী হইবার জন্ত সর্বদাই আশীর্বাদ করিতেন, তাঁদের ইচ্ছা, তাঁদের আশীর্বাদ যে কস্তার জীবনে পূর্ণ হইল, ইহা অপেক্ষা আশার কথা আমাদের জন্ত আর কি হইতে পারে? তাহা মনে করিয়া আজ আমাদের শোকদগ্ধ অশান্ত চিত্তকে শান্ত করি, সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের গভীর প্রদীপ অর্পণ করি এবং আজিকার এই পবিত্র দিনে, এই পবিত্র গৃহে তাঁহার স্মরণ স্মৃতি জীবনের হুঁ চারিটা কথা স্মরণ করি।

শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী শাস্ত্রসাধক ঋষি কেদারনাথ দেবর পঞ্চম সন্তান ও তৃতীয়া কস্তা। ভক্ত পিতামাতার কোড়ে পালিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনে ভক্তিভাব, কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও কষ্টনিষ্ঠা প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্গুণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে। বাল্য জীবনে ভিত্তোরিয়া স্কুলে বিদ্যাশিক্ষাকালে শিক্ষারীতিগণ ও ছাত্রীগণ সকলেই তাঁহার মধুর স্বভাবে আকৃষ্ট হইতেন। আমাদের পূজনীয় কাকাবাবু বড় কাকাবাবু ও সৌদামিনী মাসীমা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

পিতৃদেবের স্বর্গগমনের পর, ১৭ বৎসর বয়সে, বাকুইপুর-নিবাসী ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম রাধানাথ দেবের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। রাধানাথবাবু বিপন্ন ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব পত্নীর গর্ভজাত একটা অষ্টমবর্ষীয়া কস্তা ছিল; সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা সপত্নীজাত অষ্টমবর্ষীয়া কন্যাকে প্রতিপালন করার ভার সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং আশ্চর্য্য স্নেহ দান করিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই কস্তার চিত্তকে এমনই আকৃষ্ট করিয়া লইলেন যে, সকলেই মুগ্ধ ও চমৎ- কৃত হইয়া গিয়াছিলেন। রাধানাথবাবু বড় উদার স্বভাবের লোক ছিলেন, মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন এবং আশ্রয়প্রার্থী আত্মীয়, অনাত্মীয় সকলকেই আশ্রয় দান করিয়া, মুক্ত, আদর করিতে ভাগবাসিতেন। আর্থানারোগ্যের বে আশ্চর্য্য পতিভক্তি ও পতির জন্য স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়াছি, বিধানকন্যা প্রেমলতা দেবীর জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। পতির ইচ্ছাপালনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। স্বামীর গৃহে গিয়া পর্য্যন্ত কিরূপে তাঁহাকে সুখী করিবেন, তাঁহার আত্মীয়গণের সেবা করিবেন, তাঁহার কন্যাকে নিজ কল্যাণ করিয়া লইবেন, স্বার্থ ভুলিয়া প্রাণপণ যত্নে প্রফুল্লচিত্তে তাহাই করিতেন এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছিলেন। রাধানাথবাবু বেশ বড় উকীল ছিলেন ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতেন এবং দেখিয়াছি, উপার্জিত সমস্ত অর্থ আনিয়া প্রত্যাহ পত্নীর হস্তে প্রদান করিতেন। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহা হইতে নিজের জন্য অনেক অর্থ সংগ্রহ করিতে

পারিতেন; কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, সে অর্থে তিনি পরসেবা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন। তাঁহার গৃহ সর্বদাই আত্মীয় স্বজনে এবং অতিথি অভ্যাগতে পূর্ণ থাকিত; এবং তিনি সকলকে স্বহস্তে পরিবেশনপূর্বক তৃপ্ত করিয়া খাওয়াইয়া প্রথম তৃপ্তি লাভ করিতেন। সেই ভ্রমঃ আটনী বাগান লেনস্থ তাঁহার নিজ বাড়ীর কথা বখনই স্মরণ করি, তাঁর সেই প্রেমময়ী গৃহলক্ষ্মী মূর্তি চক্ষুর সমক্ষে দেখিতে পাই। তাঁহার নিজের সন্তান হয় নাই, কিন্তু রাণীকে ও ভাস্করপো ভাস্করখিণ্ডণিকে সন্তানের মতই ভালবাসিতেন এবং নীতি, জ্ঞান, ধর্মশিক্ষার বিতৃষিত করিবার জন্য সর্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা তাঁহার কাছেই আরম্ভ হইয়াছিল।

উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্র ৮বরদাপ্রসাদ ঘোষের পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রপ্রসাদের সহিত প্রথম সমারোহে আদরের কন্যা রাণীর বিবাহ দেন এবং চিরদিনই তাঁহাদের প্রাণের সহিত যত্ন আদর করিয়াছেন এবং শেষের দিন পর্যন্ত নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেও তাঁহার সে স্নেহের ভ্রাস হয় নাই।

৩২।৩০ বৎসর বয়সে প্রেমলতা দেবীর পতিবিরোগ হয়। স্বাধীনাথবাবু পত্নীর জন্য কিছুই রাখিয়া বাইতে পারেন নাই। এই দুর্দিনে তিনি একেবারে আশ্রয়হীন হইয়া পড়েন। আশ্রয়-হীনা কন্যার কষ্ট দেখিতে না পারিয়া, মাতৃদেবী তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া আসেন। তখন হইতে মার শেষ দিন পর্যন্ত মাতৃ-সেবা করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন। মনে হয়, এই সংসারস্থখে বঞ্চিত করিয়া ভগবান্ তাঁহাকে সামাজিক কার্যের জন্য প্রস্তুত করিলেন। এই সময় সাক্ষী কণ্ঠযোগিনী দেবী কৃষ্ণভাবিনীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার জীবন কণ্ঠের পথে অগ্রসর হয় এবং জীজ্ঞাসিত উন্নতিকল্পে খাটিবার জন্য মাতৃদেবীর পরামর্শ লইয়া ভারতব্রীমহামণ্ডলের কাণ্ডো যোগদান করেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি ছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট ছিল এবং সঙ্গীত অতিশয় তাবগ্রাহী হইত। তাই এই সঙ্গীত-বিদ্যারই অধিকতর উৎকর্ষ সাধন করিয়া, তিনি বালিকাদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দান করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্যে তিনি অনেক পরিবারে পরিচিত হন এবং হিন্দু ব্রাহ্ম সকলের শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সম্মান লাভ করেন। কিছুদিন দার্জিলিং মহারানী স্কুলেও বালিকাদিগকে সঙ্গীতশিক্ষা দান করেন এবং মধুর প্রেমপূর্ণ ব্যবহারে ছাত্রীগণের বিশেষ প্রিয় হন। গান করিতে ও শিখাইতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। শেষ জীবনেও পাটনা বালিকাবিদ্যালয়ের বোডিংএর বালিকাদিগকে সুবিধা পাইলেই নূতন নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত শিখাইতেন। আজও তাঁহার প্রায়ই প্রত্যতে স্মরণবন্দনার সময় সেগুলি গান করে।

পিতামাতা নাম দিয়াছিলেন তাঁহার প্রেমলতা; সে নামের সার্থকতা সুপ্রাথমিক তাঁহার জীবনে হইয়াছিল। এমন ভালবাসার ভরা বল অল্পই দেখা যায়। শুধু স্বামী, কন্যা, ভাইবোন,

আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নয়, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কীয় লোকও যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, সকলকেই তিনি আত্মীয় করিয়া লইতে পারিতেন। এই শাস্ত্রিকূটীরের মাসীমাকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন এবং মাসীমাও ঠিক নিজ কন্যার মতই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। একখানি চিঠিতে দেখিতেছিলাম, তিনি গিরিদি গেলে মাসীমা লিখিয়াছেন—“আমার প্রেম, তুমি পাখীর মত উড়ে উড়ে গান গেয়ে বেড়াচ্ছ। হঠাৎ তখনলাম তুমি এখানে নাও, যদিও সব সময় তোমাকে কাছে পাই না, তবু মনটা খালি হয়ে পেল; কেমন আছ? তৃপ্তিকূটীরে তৃপ্তিতে আছ।” মাসীমার কাছে সুবিধা পেলেই আসিয়া কয়েকদিন তাঁর কাছে থাকিতে ও তাঁর সেবা করিতে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার কত যে বন্ধু ছিল, গণনা করা যায় না। Lady Sinha, Lady Mittra, Lady Mukherjee প্রভৃতি সম্রাট মহিলাগণও তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বাবে মিশিতেন। আবার সকল সম্প্রদায়ের ধনী নির্ধনী, ইতর ভদ্র, গরীব দুঃখী, শোকার্তা বাথিতা, যে কেহ তাঁহার সহিত পরিচিত হইত, সকলেই তাঁহার বন্ধু হইয়া বাইত।

তাঁহার স্বভাবে ও কথার এমন একটা মিষ্টতা ছিল যে, পথে টেপে বিদেশে যখন বাহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে, অক্ষণেই তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তা হইয়া বাইত। পাটনার, রাঁচিতে, হারভান্দারও মজফেরপুরে অবস্থান কালে, তাঁহার সঙ্গীতে ও মধুর স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার অনেক নূতন বন্ধু হয়। কয়েকজন ইংরাজ মহিলার সঙ্গেও তাঁহার আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা এখনও দেখা হইলেই সেজদার কথা প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন। একজন সেজদার একখানি পত্র পাইয়া লিখিয়াছিলেন, “তোমার চিঠি পাইয়া বত আনন্দ হইয়াছে, এক খলি মোহর পাইলেও তাহা হয় না।” রাজ্যে অবস্থিতকালেও তাঁহার এই-রূপ একজন বন্ধু হয়। বিমান লিখিয়াছেন, এখনও তিনি সেজদার বিষয় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই তাঁহার ভালবাসার মুগ্ধ হইতেন। একজন সম্রাট বিহারী হিন্দুস্থানী মহিলা সেদিন বলিতেছিলেন, তাঁহার মত প্রেমপূর্ণ ছদ্ম আর দেখি নাই।

সরলতা, প্রকৃষ্টতা, সহাস্যভাব ও সকল সংকার্যে উৎসাহ এই কয়টিও তাঁহার জীবনের বিশেষ গুণ। শত দুঃখ বৈদ্য নিরাশাও তাঁহার মুখে হাসি মলিন করিতে পারে নাই। “রোগের বেদনা, শোকের বাতনা, তার সঙ্গে ভবপারের ভাবনা” কিছুই তাঁহার মনের স্বাভাবিক আনন্দকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। এই সেদিন শেষ যখন গিরিডিতে তাঁহাকে দেখিলাম, রোগে দেহ একেবারে শীর্ণ, একাকিনী, অসহায় অবস্থায় রিয়াছেন, কিন্তু মুখে তবু সেই পবিত্র স্বর্গীয় হাসি।

ছোট বড় সকলের সঙ্গে তিনি প্রাণ খুলিয়া সরল ভাবে মিশিতে পারিতেন। জ্ঞাতা ভগ্নীদের কাছে যখন থাকিতেন, পুত্র কন্যাদের লইয়া গান বাজনা দেখান, গল্প বলা, তাঁদের

খেলার সঙ্গী হওয়া, তাদের ক্ষুদ্র নূতন নির্দোষ আনন্দের আয়োজন নিতাই চলিত। ছেলে মেয়েদের লইয়া একবার একটি ক্লাব খুলিয়াছিলেন, তাহার নাম দিয়াছিলেন “নববিধান ক্লাব”। তাহাতে আনন্দের ভিত্তর দিয়া শিশুদের কোমল হৃদয়ে নীতি ও ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। সুশীল, সুধীরা, কুইন প্রভৃতি আমাদের বাড়ীর সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গীতশিক্ষার আরম্ভ তাঁহার কাছেই হয়।

সমাজের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল। সমাজের কোন কাজ করিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। আর্থানারীসমাজে, ভগ্নীসমিতিতে, বাঁকিপুর অধোরনারী-সমিতিতে, “আমাদের সত্ত্ব” সুবিধা পাইলেই যোগ দিতেন। আদ্যোৎসবে প্রতিবৎসর পরম উৎসাহে যোগ দিতেন। আর্থানারীসমাজের উৎসবে, ব্রাহ্মিকা-উৎসবে ভাবের সহিত গান করিতেন। পাটনার মন্দিরে প্রতি রবিবারেই, শরীর সুস্থ থাকিলে, সঙ্গীত করিয়া সকলের উপাসনার সহায়তা করিতেন। কোন কোন স্থানে মন্দিরে তিনি উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনা, উপাসনা অত্যন্ত সরল ও আন্তরিক।

মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মেজদিদির ছুটি মেয়েই উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া তিনি বড়ই গর্ব্ব অনুভব করিতেন, এবং তাহাদের সঙ্গে গল্প করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইতেন। যে সব মেয়েরা শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি বিশেষ ভালবাসিতেন, সম্মান করিতেন ও উৎসাহ দিতেন।

দাসদাসীগণকে ভালবাসা তাঁর জীবনের বোধ হয় সর্ব্বোচ্চ গুণ। এটা তিনি মাতৃদেবীর কাছেই পেয়েছিলেন। যেখানে যখন থাকিতেন, সকল দাসদাসী তাঁহার বিশেষ বশীভূত হইত। সেজদি যখন যেখানে থাকিতেন, কখনও সেখানে ভৃত্যেরা ছাড়িয়া থাকিত না। কেবল মিষ্ট কথা ও ব্যবহারে তাহাদের বশ করিতেন। শেষ পর্য্যন্ত অন্নবরুণ ভৃত্য রামচন্দ্র জিজ্ঞেস মা আপকে ছেড়ে পাটনা থেকে গিরিডিতে এসে, রোগশয্যায় ৮ মাস যাবৎ, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যথার্থ প্রাণের সহিত তাঁহার অক্লান্ত সেবা করিয়াছিল। তাহার ঋণ আমরা শোধ দিতে পারিক না। পাটনার আমাদের বাড়ীর সমস্ত ভৃত্যগণ বলিতেছে, তাঁহার জ্ঞান প্রভু তাহারা কখনও পার নাই। তিনি দেখতাই ছিলেন, তাই স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন।

অনেক বৎসর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছিল। দার্কলিং থাকিতেই একবার কঠিন Influenza হয়, তাহার পর কলিকাতায় করিয়া আসিয়াও মধ্যে মধ্যে এই অসুখে ভুগিয়া, পরে তাহা হাঁপানীর আকার ধারণ করে। কখনও ভাল থাকিতেন, আবার কখনও বাড়িত। শেষে গত ডিসেম্বর মাসে গিরিডিতে উপকার হইবে ভাবিয়া, তাঁহার এক ভাগুরপো জীবুক নারানচন্দ্র দেবের বাড়ী যান। এঁকে তিনি ছোট থেকে

নিজের কাছে রেখে সন্তানের মতই পালন করেছিলেন। তিনিও কাকীমায় এই অবস্থার প্রাণের সচিৎ সেবা করিয়া দত্ত হইয়াছেন। গিরিডিতে প্রিয় শ্রদ্ধের যোগাধাও ঠিক নিজের বোনের মতন যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন। সেখানে তিনি অনেকটা উপকার পেয়েছিলেন। ২রা জুলাইও আবার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময়, এখন অনেক ভাল আছেন বলিয়া আমার মনকে নিশ্চিন্ত করেন। কিন্তু ভগবান্ তাঁহার কণ্ঠকে আর পৃথিবীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিবেন না স্থির করিয়াছেন, তাই ১৮ই জুলাই প্রচণ্ডে সহসা heart fail করিয়া তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

সেজদি, আজ যে তুমি আর গিরিডিতে নাই, সে কথা তো ভাবতে পারি না। শেষ সময়ে তোমার কাছে থাকতে পেলাম না, সে হুঃখ তো আমাদের কারো কখন যাবে না। তাই বোনদের যে বড় ভালবাসতে। আজ যে সকলে সম্ভব, তোমার প্রাণের তাই বেজদা, মনোরথ, বিমান সকলেই শোকে কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পরলোকে কোথায় তুমি রয়েছ, কেমন মিষ্ট স্বরে কি গান করছ, কেমন করে পত্রির সঙ্গে মিলিত হয়ে, মা, বাবা, দাদা, নন্দাদা, মাসীমা ও তোমার শ্রিয়জনদের সঙ্গে আশ্রমে ব্রহ্মনাম করছ, বড় যে দেখতে ইচ্ছা করে। এ পৃথিবী যে অনিত্য, মায়ামরীচিকাময়, ঐ পরলোকেই আমাদের ঘর, ঐখানেই আমাদের দল বাড়ছে, ঐদিকেই আকর্ষণ বাড়ছে। ওখান থেকে, মনে হয়, ডাকছ, অমনি বরে বিশ্বাসের সহিত প্রস্তুত থাকতে বলছ। আশীর্বাদ কর, অমনি পবিত্র জীবন ধারণ করে, আমরাও বেন অমনি সরল বিশ্বাসী হতে পারি।

দয়াময়ী, মঙ্গলময়ী জননী, তুমি যে তোমার সিংহাসনের আসন থেকে নেমে এসে, একলা বিজন ঘরে বসে তোমার যে কতটা তোমার গান করছিলেন, তাঁকে বরণডালা হাতে নিয়ে আদর করে নিয়ে গিয়েছ তোমার নিজের কাছে, এতে কি সংশয় আছে? তুমি তাঁকে সুখী কর, মা, আর আমাদের তা দেখতে দিবে সাক্ষ্য দাও, শাস্তি দাও। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

—o—

## ব্রাহ্মের লক্ষ্য কি ?

(ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার নিবেদিত)

যাঁরা আচার্য্যদেবের “ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান” নামক পুস্তিকাখানি পড়েছেন, তাঁরাই জানেন, জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে, ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া, তাঁকে লাভ করা; ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান-পান, ছুদিপদে ব্রহ্মপাদপদ্ম ধারণ করা। কিন্তু কল্পজন ব্রাহ্ম জীবনের এই লক্ষ্য, জীবনের এই উদ্দেশ্য অনুসারে চলেন? কল্প-জনের এই লক্ষ্য স্থির আছে? কল্পজন এই লক্ষ্য ভেদ করতে

পেরেছেন? সত্য বটে, আচার্য্যাদেবের সময় অনেক সাধক ব্রহ্ম-দর্শনের আনন্দে মগ্ন থাকতেন এবং জীবনে তার পরিচয়ও দিয়ে গেছেন; কিন্তু আজকাল ব্রাহ্মসমাজে সে হাওয়া বদলে গেছে, ব্রহ্মোপাসনার আর মন বসে না, ব্রহ্মোপাসনা আর ভাল লাগে না। ঋনিকক্ষণ চুপ করে বসে ধ্যান করা যেন সম্ভব নয় বলে মনে হয়। এ যুগ কেবল কর্মকাণ্ডের যুগ। কেবল কাজ, কাজ, কাজ। কাজ যে ঈশ্বরাদেশে সেবার ভাবে করতে হয়, অনেক সময় তা আমরা ভুলে যাই। ঈশ্বরকে জীবনের মধ্যবিন্দু করে, তাঁরই আলোকে কণ্টকময় সংসারপথে চলতে হয়। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর অধীন মানুষের জীবন, সুখ দুঃখের চক্রবৎ পরিবর্তনে আন্দোলিত এই জীবন-পথ, পদ্মপত্রের বারিষ মত চঞ্চল, তরলা তড়িৎ সম ক্ষণস্থায়ী এই দেহ ধারণ করে, যদি আমরা জীবনের দ্রবতাকে হারিয়ে ফেলি, দুর্গতির আর সীমা থাকে না। যাঁরা জীবনের প্রভাত হ'তে, বিধাতার আলোকে, বিধাতার পথে, বিধাতার আদেশে চলতে শিখেছেন, তাঁরাই রক্ষা পান, বেঁচে যান।

“চলতি চাকী সব কোই দেখে, কীল না দেখে কোই,  
যো কীল পাকড়কে রহে, সাবেং রহে সোই।”

পুরাকালে কি নিয়ম ছিল? তাঁরা কি রকম ভাবে চলতেন? তাঁরা কি রকম করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন?

“শৈশবেহভাস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিবর্ধৈবিগাম্।

বার্দ্ধক্যে মূনিবৃত্তীনাং যৌগেনাস্তে তদুভ্যাজাম্॥”

তাঁদের শৈশবকালেই সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস হ'ত, তাঁরা যৌবনে ভোগসুখ অমুভব করতেন এবং বৃদ্ধ বয়সে মূনিবৃত্তি অবলম্বন ও চরমে যোগবলে তদুভ্যাগ করতেন। এখন কি সে নিয়ম আছে? সেদিন এখন চলে গেছে। বিধাতা মানুষকে আপনার ছাঁচে গড়েছেন; জীবাত্মা পরমাত্মার পুত্র, তাঁর হাতে অমুরূপ। মানুষ তার দেহ মন আত্মার কত উন্নতি করতে পারে, কত উৎকর্ষ সাধন করতে পারে, মানুষ কত বড় হতে পারে—যা অজ্ঞ কোন সৃষ্ট জীব হতে পারে না, তা আমরা দেখেছি। এই মানব-দেহ এমন দৃঢ় ও ভারসহ করা যায় যে, তার বুকের উপর দিয়ে, পেটের উপর দিয়ে চলন্ত মোটর গাড়ী, একশত মণ ভারি লোহার রেলার অনারাসে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের দেহের উন্নতি অসীম বস্তুও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। মন সম্বন্ধেও তাই। বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, তন্ত্রসবই মানুষের তৈয়ারী। এসব মানুষের অসীম জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে। প্রতিভাবলে মানুষ অলৌকিক কাজ করতে পারে, অসম্ভব সম্ভব করতে পারে। স্মরণশক্তির প্রথরতার ক্ষতিধর হতে পারে। জ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানের অভিনব তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করতে পারে। আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ উপগ্রহের সঠিক খবর দিতে পারে। এমন কি, উদ্ভিদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত করতে পারে। নিমেষ মধ্যে ভূমণ্ডলের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে, খবর পাঠাতে পারে। বিদ্যাবলে, জ্ঞানের কৌশলে কি না হয়?

অক্ষর, অব্যয়, অজর, অমর, মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল, অমৃতের পুত্র। দেবত্ব তার সোণার নিধি, বিধিসম্মত ধন। মানুষ দেবতা হতে পারে, যদি ভগবানের পথে চলে। সকল বিষয়ে বড় হতে পারে। ঈশ্বরের অবতার বলে পূজিত হতে পারে এবং তাই এককাল হয়ে আগছে। ঈশ্বর, বুদ্ধ, ঈশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতিকে লোকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। তাঁদের মধ্যে এমন সব অসাধারণ গুণের সমাবেশ দেখতে পার, যে তাঁদের পারে লুটিয়ে পড়ে এবং তাঁদের উদ্ধারকর্তা বলে পূজা করে। ঈশ্বর বলে জানে। এমন কি, মানুষের দশ দশকে ভগবানের দশ অবতারগ্রহণ বলে কল্পনা করে। জননী-জঠরে ক্রণ অবস্থার মানুষের মনের আকার। ভূমিষ্ঠ হ'বার পর কৃষ্ণের মত সে হামাগুড়ি দিয়ে চলে। শৈশব অবস্থার বরাহের মত বিষ্ঠা চন্দনে সমজ্ঞান। তারপর তার অর্দ্ধেক মানুষ, অর্দ্ধেক জন্তুর আকার। বাল্যে বামনাকার। যৌবনে পরশুরামের মত কুঠার হস্তে সে অধিতীর বীর। প্রৌঢ়াবস্থার শ্রীরামচন্দ্রের মত আদর্শ মানুষ, অবিচলিতচিত্ত দৃঢ়ব্রত পুরুষ। বার্ক্ক্যে বলরামের মত নানাভীষপর্থাটনকারী মুনি। তারপর সে নির্ঝগপ্রাপ্ত বোগী, বুদ্ধ। এক্ষণে কলিতে সে কক্ষী অবতার। যাঁরা বিবর্তন মানেন, তাঁরাও সেই রকম কল্পনা করেন। প্রথমে ধরা জলময় ছিল। জলে মৎস্য, কুর্শ প্রভৃতি বিচরণ করত। তারপর ডাক্ষার জন্তুর উদয় হলো; ক্রমশঃ-খানিকটা জন্তু, খানিকটা মানুষের আকার পেল। তারপর বামনাকার ছোট ছোট মানুষ হলো। ক্রমে জীব পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষের আকারে পরিণত হলো। প্রথমে মানুষ অসভ্য ছিল; জ্ঞান, সভ্যতা কিছুই ছিল না। ক্রমশঃ জ্ঞান, বুদ্ধি, সভ্যতার বলে সে বড় হলো, বিশ্বস্ততার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করলো। যাঁরা পূজা, অর্চনা, বাগ, বজ্র, হোম, ব্রতপালন, বেদ অধ্যয়ন, বেদগান, ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মধ্যান প্রভৃতি করতেন, তাঁরা ব্রাহ্মণ হলেন; যাঁরা যুদ্ধ করে' দুষ্টির দমন, শত্রুর নিধন, রাজাভ্যাপন করতে লাগলেন, তাঁরা ক্ষত্রিয় হলেন; যাঁরা কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত রইলেন, তাঁরা বৈশ্য হলেন। পরাজিত, অসভ্য, বর্বর জাতির শূদ্র থেকে গেল।

আর্য্য ঋষিরা উচ্চকণ্ঠে গাহিলেন:—

“তরবোহপি হি জীবন্তি জীবন্তি যুগপক্ষিণঃ।

স জীবন্তি মনো যস্য মনেন হি জীবতি ॥”

যার মন ব্রহ্মমনন করে না, তার জীবন ধারণ করা বৃথা, সে মৃত। আরও বলেন, “নাশে স্তবমন্তি, ভূমৈব স্তবম্।” অনন্তের পূজা, অনন্ত আয়োজন, অনন্ত অধেষণ; গভী, সীমা, অন্তরেখা নাই। জীবাত্মা পাণ্ডুরক্ত, অনন্ত পথের যাত্রী; কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। অল্পে তার তুষ্টি হয় না। অকূল সমুদ্রে সাঁতার দিতে চায়। বিপুল উৎসের সন্ধানে ছুটে যেতে সে চায়। প্রাণ-সখাকে বুকে ধরতে চায়। “এত যদি যিশে

সখা, আরো দিতে হবে যে, তোমাং নো পেনে আমি ফিরিব না ফিরিব না।” এই তার প্রার্থনা। আচার্যদেবও বলেছেন, যে জন্ম-সংসারকে সধা হৃদয়ে বিরাজিত রাখেনা, সে আবার কিসের ব্রাহ্ম?

দিন যায়, ক্ষণ যায়, সময় বেগে ধায়; সুযোগ, সুবিধা, সুবাস বহে যায়। বিধাতার প্রসাদ-তরণী অবিরামগতিতে চলেছে। যুগযুগান্তের উপসার ফলে অমূল্য মানবজন্ম লাভ করে, আমরা কি করলুম? সোণাফলা জমিতে কি আবাদ করলুম? ব্রাহ্মমাজে এসে, ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে, জীবনের কি সম্ভাবনার করলুম? কলিতে নিরাকার ভগবানকে দেখা যায়, তাঁর কথা শুনা যায়, তাঁর স্পর্শ পাওয়া যায়, তাঁর সহবাসানন্দ ভোগ করা যায়, এই নতুন সংবাদ পেয়েও আমরা মিছে কাজে দিন কাটালুম। আমাদের দায়িত্বের গুরুত্ব বুঝতে পারলুম না। গোণা দিনের আয়ু নিঃশেষ হয়ে এল। অপরিমিত, অভূতপূর্ব, গচ্ছিত মানব-জীবনের এই পরিণাম, এই নিয়তি, এইখানেই কি সমাপ্তি? এ শোন, মহাসিদ্ধুর ওপায় থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসছে। ভূমানন্দের মহা আত্মবিশ্বাস কি দুর্জয়, তীব্র ধ্বনি করছে? “শুশ্রূষা বিধে অমৃতস্য পুত্রাঃ” এই শব্দ দিবানিশি স্তব্ধতা মথিত করে অনাহত বাজছে। এ জীবন ছেলেপেলা নয়, বৃথা ক্ষয় করবার নয়। Life is real, life is earnest, grave is not its goal. জলের বিষ জলে উদয় হয়ে, চঠাৎ জল হয়ে জলে মিশিয়ে যাবার মত নয়। অনন্ত উন্নতির রাজটাকা কপালে লেখা। শাস্ত, অক্ষয় মুক্তির হিরণ্যর মুকুট অদূরে অলক্ষ্যে বিরাজমান। বিদ্যা, বুদ্ধি, টাকাকড়ি, মান, মর্যাদা, সুখ সৌভাগ্য আমাদের কাম্য নয়, প্রের নয়। ছ’দিনের পাছনিবাস, আমাদের চিরবাসস্থান নয়। যাত্রা এই সবে শুরু হয়েছে, দীর্ঘপথের অনেক বাকী। অনন্ত বিশালবক্ষ চিদানন্দসাগর সামনে ধু ধু করছে। খেলনা-প্রত্যাশী শিশুর মত আত্মা অবোধ নয়। কলুর চোখটাকা বলনের মত ঘুরতে সে এখানে আসে নি। “নলিনীদলগত-জলমতি তরলম্, ভবজীবনমতিশরচপলম্” বলে উড়িয়ে দেয় না। এ জীবন নিশার স্বপন, সে কথা সে বলে না; সসাগর ধরার আধিপত্য তার চরম লক্ষ্য নয়। তার বাণী, “যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্ধ্যাম্।” “কমর হব, এমনি হব, ময়াল হরির চরণ ধরে”, এই তার বাসনা, কামনা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

## শ্রীকেশবচন্দ্র ও বঙ্গের মুসলমান সমাজ।

ভারতের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক শ্রীযুক্ত এন, জি, চণ্ড-ভারকার, চই জাহ্নুয়ারী, এক স্থতিসভার বলিরাছিণেন যে, “ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শুধু বঙ্গদেশেই কি ভারতের লোক নহেন, কিন্তু সর্বদেশের ব্যাপ্ত, সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত একটা মহামানব; মাহুয মাত্রেরই তাঁহার উপর স্বভাবতঃ পূর্ণ অধিকার।” এই বিশ্বশ্রমিকের মহাপ্রবানের পরে একটা একটা করিয়া প্রায় ৫০ বৎসর আসিল এবং চলিয়া গেল। শ্রীযুক্ত চণ্ডভারকারের বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তাহার অদ্রাষ্ট্য প্রমাণ এই অর্ধ শতাব্দীর ভিতরেই চতুর্দিকে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া নানা আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালা প্রদেশ সাম্প্রদায়িক বিবাদের একটা প্রধান কেন্দ্রস্থল বলিয়া চিহ্নিত হইলেও, এখানকার মুসলমানসমাজ ব্রহ্মানন্দদেবকে ঈশ্বরপ্রত্যা-দিত্ত মহাপুরুষ বলিয়া সরলপ্রাণে স্বীকার করিতেছেন।

বাস্তবিকই বঙ্গের উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে এমন অনেকে দল বাঁধিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন, যাঁহারা সভ্যতার খাতিরে সাম্প্রদায়িকতা পরিহারপূর্বক, নববিধান-মণ্ডলীর সঙ্গে উদার ধর্মতাবের আদান প্রদান করিতে থুবই ইচ্ছুক, এবং সুযোগ পাইলেই এইরূপ ভাব-বিনিময় করিয়াও থাকেন। ইহার একটা কারণ এই বলিয়া মনে হয় যে, তাঁহারা হজরত মহম্মদের বিশ্বজনীন ধর্মতাব নববিধানের ভিতরে পরিষ্কৃত আকারে দেখিতে পাইতেছেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা অগ্রগামী, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, মুসলমান সমাজ ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মিলন যদি কোন দিন সম্ভবপর হয়, তবে তাহা কেশবপ্রচারিত মহাসম্মতবাদকে মধ্যবিন্দু করিয়াই হইবে। এই সত্যনিষ্ঠ স্বাধীনচিন্তাপথের পথিক ইসলামবাদিগণ শ্রীকেশবচন্দ্রকে কি যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দর্শন করেন, তাহা ক্ষুদ্র বৃত্ত নানা ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। এখানে ছই একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

১। বাঙ্গালা ভাষার বিশ্বস্ত সেবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাজী মোতাহার হোসেন এম্.এস্.সি, সাহেব মৎপ্রণীত “কেশব-সমাগম” গ্রন্থের সমালোচনা করিতে দিয়া লিখিয়াছেন,—

“যে সমস্ত মহাপুরুষের চেষ্টা ও যত্নে বাঙ্গালী সমাজ অধঃ-পাতের মুখ হইতে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নীত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার যুগ বাঙ্গালীর এক মহাগৌরবময় স্রষ্টাযুগ।

“শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয় ‘শ্রীকেশব-সমাগম’ নামক একখানা পুস্তিকায় মহাপুরুষ কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিক জীবনের



পরিচয় দিয়া বাঙ্গালী পাঠকবর্গের ধর্মতত্ত্বভাজন হইয়াছেন। আত্মিক জীবনের আলোচনায়ই মানুষের কর্মজীবনের মূল সূত্রগুলি খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মতিলাল বাবু তন্ত্রের চক্ষে ত্রিকেশবকে দর্শন করিয়া, উক্ত মহাপুরুষের চরিত্র ও সাধনার বিকাশ ক্রমে হইল, তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। যুক্তি তর্কের চেয়ে তন্ত্রই সহজভাবে প্রাণ স্পর্শ করে। তাই পুস্তকখানা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে। মতিলালবাবু নিজেও একজন সাধক। প্রথম অধ্যায়ে, ক্রমে তিনি ত্রিকেশবের সহিত আধ্যাত্মিক যোগ অনুভব করিতেন, তাহার অতি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। একটি আলোক-পিপাসী আত্মার আলোক-প্রাপ্তির ইতিহাস মনোরম হইবারই কথা। তারপর নববিধানের সমন্বয়বাদ ও অন্তঃপ্রধান আদর্শগুলি প্রকটিত করিয়া, বিশেষ ভাবে ত্রিকেশবের বিশ্বাসতত্ত্ব, তন্ত্র-যোগ এবং প্রেম ও পবিত্রতা সাধন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। সর্বশেষে কেশবচন্দ্রের নিজের লেখা হইতে অসংখ্য উৎকৃষ্ট বাণী উদ্ধৃত করিয়া ত্রিতীর্থ-পান্য বিষয়ের প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাতে পুস্তকখানা অধিকতর সরস ও মূল্যবান হইয়াছে।

“কেশবচন্দ্রের অদ্ভুত পাপ-বোধ, উদার সমন্বয়বাদ, সরল প্রেম, নিরহঙ্কার সেবা-বৃত্তি, মুক্তি বিষয়ে আশাবাদ, সহজ স্বাভাবিক বোগতত্ত্ব এবং ভগবানে নিভরশীলতার কথা চমৎকার ভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।”

২। আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত, বাঙ্গলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, “স্বতির ফুল”, “অরুণ আলো” প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা মৌলানা মুর আহাম্মদ এম. এ. সাহেব লিখিয়াছেন,—

“শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল দাশ মহাশয়ের লেখা ‘ত্রিকেশব-সমাগম’ পুস্তকখানি পরম আগ্রহের সহিত পড়লুম। তিনি তন্ত্র ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের যে জীবন-লোচনা করিয়াছেন, তা ভাবে ভাষায় চরিত্র-সৃষ্টিতে সার্বক হয়েছে। কেশবচন্দ্র বহু গুণের অধিকারী ও বিরাট মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সে ব্যক্তিত্ব ও মনীষা পরম জনপ্রিয় এবং শিক্ষাপ্রদ ভাবে আর কারো লেখায় এমন ভাবে ফুটে উঠেছে বলে আমার মনে পড়ে না। বস্তুতঃ যাঁরা স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের অনন্তসাধারণ জীবনের সাথে পরিচিত হতে চান, এ পুস্তক তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করবে।

“সর্কার সামাজিকতার উর্ধ্বে যে সমস্ত মহাপুরুষ বিশ্বপ্রেমের ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দীপপীথা জালিয়েছেন, তাঁরা যুগে যুগে জাতি-ধর্মনির্কীর্ণভাবে মানুষের নমস্যা। শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্রও সে নমস্যা-দেয় একজন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ‘রোজ নামাজ’, তাঁর জীবনবেদের অনেকখানি খবর আমরা এই পুস্তকে পাই, আর পাই তাঁর অমৃতবাণীর আবাদ, তাঁর জীবন খাতার বোগ বিরোগের হিসাব নিকাশ। যাঁরা নূতন পথের বাজী, তাঁদের ভাগ্যে চিরজীবন অভিলাষের জয়টিকা অঙ্কন হয়ে থাকে।

আরবের অন্ধকার মরুবুকে যখন হজরত মোহাম্মদ নূতন জীবনের দিকে, ভবিষ্যৎ কল্যাণহৃদয় পথের দিকে মানুষকে চালিত করতে চেয়েছিলেন, তখন পেলেন তিনি মানুষের অভিলাষ, খেতাব পেলেন পাগল বাড়কর। কেশবচন্দ্রের ভাগ্যও ছিল তাই, কিন্তু তিনি দেখছিলেন এই অসম্মান অভিলাষের পেছনে সৃষ্টিহৃদয়ের অভিনব স্বপন। মানুষের দেওয়া গালিকে তাই তিনি দলিত করে গেছেন নির্ভীকারচিত্তে বাসী ফুলের মতো।

“শ্রীযুক্ত মতিলাল বাবুর বইখানিতে একটি জাগ্রৎ জীবনের স্রষ্টা হৃদয় ইতিহাস পাই, এজ্ঞত তাঁর নিকট আমরা খণী।”

বলা বাহুল্য যে, কেশবচন্দ্রের বাহুশক্তিপ্রভাবে হিন্দু-সমাজের সুখী ও সাধকগণের মধ্যেও অনেকে “ত্রিকেশব-সমাগম” গ্রন্থ আগ্রহ ও নিষ্ঠার সহিত পাঠ করিয়া পুঁই আনন্দিত হইয়াছেন।

চারিদিক হইতে এই ভাবের উৎসাহ ও সহায়ত্ব লাভ করিয়া, আমি কেশবজীবনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড “ত্রিকেশব-কাহিনী” প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আগামী ভাদ্রোৎসব উপলক্ষেই আমার সাধনার এই দ্বিতীয় ফলটি শ্রীর নববিধানমণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

মঙ্গলকুটীর, বিধানপল্লী;  
ঢাকা।

শ্রীমতিলাল দাশ।

## সংবাদ ।

জন্মদিন—কলুটোলার, ককতবনে, গত ১৩ই জুলাই, পূর্বাঙ্কে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ প্রদ্যোৎকুমারের জন্মদিনে, ১লা আগষ্ট, পূর্বাঙ্কে, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের জন্মদিনে, ৪ঠা আগষ্ট, সন্ধ্যায়, শ্রীযুক্ত কুমদবিহারী সেনের স্বর্গীয় পুত্র বিধানকুমারের ও শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সজিতকুমারের জন্মদিনে তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাঙ্গনা করেন।

তাই প্রিয়নাথের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিনস্মরণে, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে, গত ১৬ই জুলাই, ৩২শে আষাঢ়, সন্ধ্যায়, বিশেষ উপাঙ্গনা হয়। স্থানীয় বঙ্গগণ কেহ কেহ যোগদান করেন। ভ্রাতা রসিকলাল বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২২শে জুলাই, স্বর্গীয় কিশোরীমোহন দাস বড়ুয়ার পুত্র শ্রীমান্ বিহারের জন্মদিনে তাই প্রিয়নাথ নবদেহালয়ে বিশেষ উপাঙ্গনা করেন।

গত ১১ই আগষ্ট, ৬৩৮৮ হাদিশন রোডে, বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ ক্রবের জন্মদিনে তাই অনঙ্গকুমার লুৎ উপাঙ্গনা করেন। পিতা সত্যেনের কল্যাণ

ভিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রচারভাণ্ডারে ১৮ দান করা হয়।

**জাতকর্ষ**—গত ৭ই আগষ্ট, ১৫বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে, শ্রীমতী অশোকমতী দাসের গৃহে, তাঁহার দোহিত্র ও অঙ্গুবিধ-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীমান্ হুমায়ুন কবীরের নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ষ উপলক্ষে তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। মাতা শ্রীমতী শাস্তি নবসংহিতা চাইতে জাতকর্ষের প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫ টাকা দান করা হইয়াছে। শিশুটি গত ৩০শে জুন, কলিকাতায়, উক্ত গৃহে জন্মগ্রহণ করে।

গত ১০ই শ্রাবণ, ১এ মন্থণ ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীটে, শ্রীমান্ বিজয়-মোহন সেনের নবজাত শিশুপুত্রের জাতকর্ষ অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কুমুদিনী দাস উপাসনা করেন। শিশুটি গত ২৮শে আষাঢ়, জন্মগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১৮ দান করা হইয়াছে।

ভগবান্ নবজাত শিশুদ্বিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

**নামকরণ**—গত ১২ই আগষ্ট, ১৪৫এ, ল্যান্ডাউন রোডে, ডাঃ সত্যানন্দ রায়ের শিশুপুত্রের শুভনামকরণানুষ্ঠানে, শ্রদ্ধের কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন, এবং শিশুকে “সুনন্দন” নাম প্রদান করেন। জন্মমাত্র মাতৃহীন হইলেও, পরমজননীর বিশেষ মেহ ও আশীর্বাদে, পিতার অক্লান্ত স্নেহ যত্নে, একাধারে পিতৃমাতৃকর্তব্যসাধনে ও লালনপালনে এবং সকলের শুভাকাঙ্ক্ষার শিশু বে দিন দিন আপদ বিপদ হইতে রক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া আসিতেছে, এতদ্ব্যতীত সকলের মনেই কত আনন্দ। এখন সকলেরই প্রাণের প্রার্থনা, “সুনীতির” নন্দন প্রকৃত “সুনন্দন” হইবে, পিতার প্রাণের নিত্য সাধনা ও মণ্ডলীর গৌরব হউক। নববিধানজননী শিশুকে ও শিশুর পিতাকে আশীর্বাদ করুন।

**শুভবিবাহ**—গত ৯ই আগষ্ট, বুধবার, শ্রীহট্ট-নিবাসী স্বর্গ-গত রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেবের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীর শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রচন্দ্রের সহিত, ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী উমা দেবীর শুভবিবাহ, কলিকাতায়, ৯৩।সি গড়পার রোডস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র বোষ আচার্য্য ও সুরোহিতের কার্য্য করেন। ভগবান্ নব-দম্পতিকে স্বর্গের শুভানীষ দান করুন।

**উৎসব**—গত ১লা আগষ্ট, ব্রহ্মানন্দাশ্রমের ষাট্টিশতম সাপ্তাহিক উৎসব উপলক্ষে, দুই বেলা উপাসনা, শ্রীতিভোজন, শিশুসম্মেলন, বন্ধুসমাগম, পাঠ ও আলোচনা ইত্যাদি ধারাবিহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

**পারলৌকিক**—আমরা গভীর হৃৎখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে গত ১লা আগষ্ট, মজঃকরপুরে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাসের দ্বিতীয় ভ্রাতৃতা, ঢাকার শ্রীযুক্ত অধীনীকুমার বসুর

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ অনিলকুমার বসু, ৩০বৎসর বয়সে, টাইফয়েডে, পিতামাতা, অন্নবয়স্ক স্ত্রী, একমাত্র পিতৃকন্যা ও বহু আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অমরণ্যে চলিয়া গিয়াছেন। যোগেশ বাবু শোকাক্তা কন্যাকে লইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। গত ১১ই আগষ্ট, ঢাকার শ্রীকাকুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতায়, যোগেশ বাবুর গৃহ, ১০নং নারকেলবাগান লেনে, গত ১৩ই আগষ্ট, তাই গোপালচন্দ্র গুহ পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ বিশেষ উপাসনা করেন; ১৪ই সন্ধ্যায় বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে পরলোক-সম্বন্ধীর স্মরণ কীর্ত্তন হয়, তাই অক্ষয়-কুমার লখ প্রার্থনা করেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন এবং সকল শোকাক্ত প্রাণে শান্তি ও সাধনা দিন।

**সেবা**—গত ২৩শে জুলাই, প্রাতে, দেউলটানিবাসী ভ্রাতা লত্যাচরণ সিংহের বাড়ীতে, তাঁর বিশেষ আহ্বানে, পরিবারস্থ সকলকে লইয়া তাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং সন্ধ্যায় বাগনান ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন।

**আত্মশ্রদ্ধা**—গত ৩০শে জুলাই, কলিকাতায় শাস্তি-কুটীরে, স্বর্গগত শান্ত সাধক তাই কেদারনাথ দেব তৃতীয় কন্যা ও স্বর্গীয় রাধানাথ দেবের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া প্রেমলতা দেবের আত্মশ্রদ্ধা পবিত্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে ভ্রাতৃত্বগোপকর্ষক সম্পন্ন হইয়াছে। ডাঃ বিমলচন্দ্র বোষ উদ্বোধন ও আরোপনা, তাই অক্ষয়কুমার লখ পাঠ ও তাই গোপালচন্দ্র গুহ পুষ প্রার্থনা করিয়া শান্তিবাচন করেন। তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে প্রধান শোককারী রূপে প্রার্থনা করেন। কনিষ্ঠা তথ্যী শ্রীমতী বনলতা দে তথ্যীর স্মরণ জীবনী পাঠ করেন; তাহা অতদ্ব্যতীত দেওয়া গেল। অত্ম কুচবিহারেও, কুচবিহার কলেজের শ্রীমসিপাল শ্রীযুক্ত মনোরথধন দে গৃহে শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ উপাসনা করেন। মাদ্রাজে, কনিষ্ঠভ্রাতা, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডাঃ বিমানবিহারী দেও তথ্যীর শ্রীকাকুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রদ্ধের এস্, সি, বানার্জি উপাসনা করেন। ডাঃ দে তথ্যীর জীবনী পাঠ করেন এবং ১০ টাকা তত্ত্ব কালাবোবা স্কুলে এবং ৪০ টাকা স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন ফণ্ডে দান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় ভ্রাতা তথ্যীগণ নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন—

কলিকাতা—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০০, ব্রহ্মমন্দিরের অর্গ্যান মেরামতের জন্য ১০০, নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২০০, আমাদের সম্বৎ ৫০, তত্ত্বসমিতি ৫০, দীপালি শিক্ষামন্দির ১০০, সাধু প্রমথলাল শিক্ষাতীর্থ ১০০, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১০০, ম্যাগলেসন আমি ৫০, বাণীতবন ৫০, পুণ্ড্রাশ্রম ৫০; বাঁকিপুর—ব্রহ্মমন্দির ১০০, অধোমনারীসমিতি ৫০; গিরিধি—ব্রহ্মমন্দির ১০০, ঢাকা—নববিধানসমাজ ১০০, মুন্সের—প্রমথলাল ষাট্টিশবিধ ১০০; মজঃকরপুর—ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন ১০০, দার্জিলিং মহারাণী স্কুল ১০০, পাটনা বাণিকবিদ্যালয় ১০০, সতীতসম্মিলনী ১০০; প্রচারকগণের জন্য বস্ত্রাদি ৩০০, চিকিৎসকগণকে

রত্নপাণ্ডের স্বতি-উপহার ৮০, দরিদ্রদিগকে চাউল, পরসী ও বস্ত্রাদি ( গিরিডি, কলিকাতা এবং পাটনা ) ৫০, শ্রিয় ভূতা রামচন্দ্রকে কাপড় ও জামা ১০, ভোজ্য ১টি শান্তিকুটার প্রচারপ্রসঙ্গের জন্য ১০, মোট ৩৬০ টাকা ।

কৃতিত্ব—আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, ডাঃ বিনয়চন্দ্র ঘোষের ভাইঝি, ইন্দোরের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত প্রমোদ কুমার ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা ডাক্তার কুমারী সুবর্ণা কৃতিত্বের সহিত এম.বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে কন্যার মাতৃদেবী শ্রীমতী সুচাসিনী ঘোষ প্রচারভাণ্ডারে ৫ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁর প্রিয়তমা কন্যাকে শুভাশীষ দান করুন।

সাম্বৎসরিক—গত ২০শে জুলাই, শ্রীব্রজানন্দাশ্রমে, স্বর্গীয় গৃহস্থ বৈরাগী সাধক রাজমোহন বসুর পত্নী সাধ্বী ক্ষেম-করী দেবীর সাবৎসরিকদিন-অরণে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা ও ভ্রাতা রসিকলাল রায় প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে আশ্রমের সেবিকা প্রচার ভাণ্ডারে একটাকা দান করিয়াছেন। কটকেও মধুভবনে বিশেষ উপাসনা হয়।

গত ২৪শে জুলাই, বারিগদায় বিনয়কুটারে, ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাবৎসরিকে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন; ভাই নগেন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃদেবের রচিত সঙ্গীত ও পিতৃ-চরিত্রের দেবভাবগুলি লাভের জন্য প্রার্থনা করেন।

বিগত ৩১শে জুলাই, ১৫ই শ্রাবণ, অমরাগড়ীতে সমাধি-মন্দিরে, প্রাতে স্বর্গীয় ভাই ফকির দাসের ত্রিচত্বারিংশ সাবৎসরিক উপলক্ষে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কাণ্ড করেন। রাত্রিতে জমার্ট সংকীর্তন এবং পাঠ ও প্রার্থনা হয়। অদ্য হাওড়ার জ্যোষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী হেমপ্রভা গৃহে, ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে ওরা আগষ্ট অপরাহ্নে, জয়পুর ফকিরদাস হাইস্কুলে, শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে, স্বতিসভায় প্রায় দেড়শত ছাত্র ও শিক্ষক যোগদান করেন। সভাপতি, সভাকারী প্রধান শিক্ষক, পণ্ডিত বুদ্ধ রামগদ মণ্ডল এবং সেবক ভাই অখিলচন্দ্র রায় ভক্তের ভক্তিময় জীবনের বিবরণ বলেন।

গত ২৯শে জুলাই, কুচবিহারে, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখো-পাধ্যায়ের গৃহে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র করুণাকুমারের সাবৎসরিক দিনে, কেদারবাবু উপাসনা করেন।

গত ৭ই আগষ্ট, বাগনানে ভ্রাতা রসিকলাল রায়ের পত্নী স্বর্গীয়া ভুবনেশ্বরীর স্বর্গারোহণদিনে ভাই প্রিয়নাথ বিশেষ উপাসনা করেন।

গত ৮ই আগষ্ট, ২৮১, চক্রবেড়ে লেনে, কুমার কমলেন্দ্র নারায়ণের শিশু পুত্রের সাবৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন।

দানপ্রাপ্তি—শ্রদ্ধা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সহিত, দাতা-দিগকে প্রণাম করিয়া, নিয়মিত দান-প্রাপ্তি স্বীকার করি-তেছি। ভগবান্ দাতাদিগকে অশীর্ষাদ করুন।

মার্চ—১৯৩৩,—শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানী মাসিক দান ২৫, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জি মাসিক দান ১, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জি মাসিকদান ১, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১, শ্রীমতী স্মৃতি মজুমদার মাসিকদান ১, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিক দান ২, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১, শ্রীমান্ সুকুমার চৌধুরী পিতৃশ্রাদ্ধে ২, শ্রীমতী ইন্দু সিংহ স্বশ্রমাতার সাবৎসরিকে ২, শ্রীযুক্ত মনোমোহন দে পিতৃসাবৎসরিকে ২, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জি মাসিকদান দুইমাসের ৪ ও পিতৃসাবৎসরিকে ১০, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ মাসিকদান ২, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ পিতৃসাবৎসরিকে ২, শ্রীমতী বনলতা দে পিতৃসাবৎসরিকে ১০, শ্রীমতী বিন্দুসিনী সেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সাবৎসরিকে ১, স্বর্গীয় রায় রাহাহর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী স্বামীর সাবৎসরিকে ১৫ টাকা।

এপ্রেল, ১৯৩৩—শ্রীযুক্ত মতিরাম সখীরাম আদভানী মাসিক দান ২৫, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন মাসিকদান ২, শ্রীমতী সরলা সেন মাসিকদান ২, শ্রীমতী হেমন্তবালা চাটার্জি মাসিকদান ১, শ্রীমতী মাধবীলতা চাটার্জি মাসিকদান ১, শ্রীমতী স্মৃতি মজুমদার মাসিকদান ১, শ্রীমতী সরলা দাস মাসিকদান ১, শ্রীমতী কমলা সেন মাসিকদান ১, স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের পুণ্যস্মৃতিতে মাসিকদান ২, শ্রীযুক্ত গগনবিহারী সেন মাসিকদান ১, শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাসিকদান দুইমাসের ৪, শ্রীযুক্ত যোগানন্দ কামাধিক প্রথম পোতীর নামকরণে ২, রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টো-পাধ্যায় মাসিকদান দুইমাসের ৪, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার গুপ্ত পত্নীর সাবৎসরিকে ১০, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার পিতৃ-সাবৎসরিকে ৫, ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ মাসিকদান দুই মাসের ৪, শ্রীমতী মনোরমা মুখার্জি মাসিকদান ২, শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস পুত্র “ক্রবের” সাবৎসরিকে ২, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মাসিকদান ৫, লেপ্টেন্যান্ট কর্ণেল জ্যোতিলাল সেন (I.M.S.) মাসিকদান পাঁচমাসের ১০, শ্রীমতী সরোজিনী সরকার ২, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র স্বত্তরের আদ্যশ্রাদ্ধে ২, শ্রীমতী সুশীলা পাল স্বর্গীয় স্বামী দ্বিজেন্দ্রনাথ পালের আদ্যশ্রাদ্ধে ১০, শ্রীমতী স্মৃতি সেহানবিশ স্বামীর সাবৎসরিকে ২, ডাঃ শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত পিতৃসাবৎসরিকে ৪, শ্রীযুক্ত মিলরানন্দ রায় ভ্রাতার গুজ বিবাহে ২, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্ত মাতৃসাবৎসরিকে ২ টাকা।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেঙ্গণী” উপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক ২রা ভাদ্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্ম্যতত্ত্ব

অবিশালমিতং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।

চেতঃ স্তনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনম্বরম্ ॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।

স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীৰ্ত্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

১৬শ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

1st. September, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## প্রার্থনা।

মা, ধন্য তুমি, যে আবার একটি ভাদ্রোৎসব আনিলে ও আমাদের ভাগ্যে তাহা সম্ভোগ করিতে দিলে। উৎসব মাত্রেই স্বর্গীয়, উৎসব মাত্রেই তোমার স্বহস্তের দান, মানুষের চেষ্টায় উৎসব আসে না, মানুষের আয়োজন উছোঁগে উৎসব হয় না। সাধারণ উপাসনা সাধনসাধনার হইতে পারে, কিন্তু উৎসব স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয়। জীবন্ত ঈশ্বর, তোমার প্রত্যক্ষ রূপ-রূপেই উৎসব সম্ভোগ হয়। তাই ঋতুর সঙ্গে, বানের সঙ্গে উৎসবের উপমা দেওয়া হয়। বাতাস সাধারণতঃ দৈনন্দিন বয়, নদীর স্রোত দৈনন্দিন প্রবাহিত হয়। কিন্তু যেন আকস্মিক ভাবে আকাশে ঝড় উঠে, কিম্বা নদীতে বান ডাকে; তাহা সাধারণ নিয়মে হয় না, বিশেষ বিধানে হয়। এই জগৎ স্বভাবতঃই বিশ্বাসী মাত্রেই উপলব্ধি করেন, উৎসব ভগবানের বিশেষ রূপ, বিশেষ বিধান। উৎসবের সময় উপাসনা, প্রার্থনা, গান, সংকীর্্তন, ধ্যান, ধারণা, আলোচনা, পাঠ, প্রসঙ্গ, প্রীতিভোজন, বন্ধু-সম্মিলন, পরস্পরের ভাবের বিনিময় সকলই যেন ঐশ্বরিক, সকলই যেন নূতন, সকলই যেন বিশেষ ভাবে মনকে স্বর্গের দিকে সমুদ্রত করে; সকলই

যেন অমানুষিক ভাবে কোথা হইতে আসে, কোথায় লইয়া যায়। সকল উৎসবেই ইহা অনুভব হয়, সম্ভোগ হয়। বিশেষ ভাবে এই যে, মা, তুমি ভাদ্রোৎসব আনিয়া দিলে, নববিধানে ইহা যে স্বার্থই অলৌকিক, ইহা কি কেহ আমরা অস্বীকার করিতে পারি? রাজর্ষি শ্রীরামমোহন এই ভাদ্রমাসে তোমারই প্রেরণায় “ব্রাহ্মীয় সভা” স্থাপন করেন। ইহা হইতেই ত নবযুগধর্ম্মের বীজ উগ্ৰ হইল। আবার নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ যে তোমারই আদেশে ও আলোকে এই মাসেই নববিধানের নব উপাসনা-প্রণালী, প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করিলেন, ইহা কি সামান্য? বাম্পীয় কল যে দিন আবিস্কৃত হইল, সেই দিন যেমন বিজ্ঞানরাজ্যে এক নূতন যুগ আগিল, তাঁহার চেয়েও বিশেষ দিন সেই দিন, যে দিন আকাশখানে মানুষ আকাশে উড়িল। নববিধানের উপাসনা-রূপ রথের আবিস্কার কি তাহা অপেক্ষাও অলৌকিক এবং অদ্ভুত নয়? ইহাতে যে সত্য সত্যই, কেবল সশরীরে নয়, সপরিবারে সদলে স্বর্গে গিয়া, স্বর্গের নিত্য আনন্দোৎসবের সম্ভোগ লাভ হইল। অতএব ইহা কি সামান্য অশ্রদ্ধাদায়ক, সামান্য উৎসবপ্রদ? মা, আশীর্ব্বাদ কর, যদি ঐমনি নিত্যোৎসব-সম্ভোগের সৌভাগ্য আমাদের দিলে, যেন এই উৎসব আমরা চিরদিনের জগৎ বৃকে

গাঁথিয়া রাখিতে পারি। আবার, মা, এই সমসাময়িক সময়ে পরলোকসাধন ও তদ্বারা আমিষের যে মুক্তা-সংসাধন করাইলে এবং পরলোকগত অমরাত্মাদের সঙ্গে স্বর্গের উৎসব সহজে সম্ভোগের যে বাবস্থা করিয়া দিলে, তাহারও জন্ত তোমার চরণে কৃতজ্ঞতাভরে লুপ্তিত হই। ধন্য ধন্য, মা, তুমি।

শান্তিঃ !

শান্তিঃ !!

শান্তিঃ !!!

— — —

## ভাদ্রোৎসব কেন ?

ভাদ্রোৎসব আসিল, ভাদ্রোৎসব চলিয়া গেল। নদীতে বান ডাকিল, আবার ভাটাইয়া গেল। আকাশে ঝড় উঠিল, আবার প্রশমিত হইল। প্রকৃতিতে যেমন বান বা ঝড় আসে ও ধামে, অধ্যাত্মরাজ্যেও তেমনি উৎসব আসে, আবার চলিয়া যায়। ঝড় বা বান যাঁহার প্রেরিত, উৎসবও যে তাঁহারই প্রেরিত।

প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন, অধ্যাত্মরাজ্যের নিয়মও প্রায় তেমন। বিধাতার বিধান সর্বত্রই সমান। তবে মানুষ বিজ্ঞানবলে যেমন প্রাকৃতিক বিকার কিছু কিছু বিনাশ করিতে পারে, তেমনি অজ্ঞানতার বশে নিজ জীবনে অধ্যাত্ম কিছু কিছু বিকার উৎপাদনও করিতে পারে। বিধাতা মানুষকে তাঁর অনুগামী সন্তান ও সহকারী সেবক রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। যদি আমরা সেই আত্মজ্ঞান লাভ করি, এবং তাঁহার নির্দেশ মত কার্য্য করি, তবে আমরা সফলকাম হই এবং তাঁহার ইচ্ছাপালনে জীবনে ধন্য হই। যদি তাহা না করি, মনুষ্য হারাই এবং নরকের পথে যাই।

আকাশে ঝড় যে উঠে, নদীতে বান যে ডাকে, কিন্না নৈসর্গিক আলোড়ন বিলোড়ন যাহা হয়, তাহা কিছুই বৃথা হয় না, তাহার ফল কিছু না কিছু অবশ্যই হয়; তেমনি কি আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, এই যে ভাদ্রোৎসবের বান ডাকিল, ইহা আমাদের জীবনে বিফল হইল না, ইহা আমাদের অধ্যাত্ম জীবনে কিছু না কিছু স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গেল। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইবে, আমরা এই উৎসবের প্রভাবাধীনে পড়ি নাই, আমরা যথার্থ উৎসব করি নাই। বিধাতার যাহা করিবার, তাহা করিলেন; কিন্তু আমাদের যাহা করিবার, তাহা করা হয় নাই।

ঝড় এবং বন্যা যেমন ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া জড় প্রকৃতিতে তাহার চিহ্ন, তাহার ফল রাখিয়া যাইবেই যাইবে; ঈশ্বর-প্রেরিত উৎসবও তেমনি সাধক সাধিকা-দিগকে নিশ্চয়ই স্বর্গীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া, স্বর্গীয় জীবনে কতক পরিমাণেও সমুন্নত করিয়া যাইবেই। উৎসব কখনও বৃথা যাইতে পারে না, বৃথা যাইবেন।

ভাদ্রোৎসব পূর্বের মাত্র একদিন সাধিত হইত। ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখানে যে দিন নব ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তিত হইল, তাহারই সান্নিধ্যসিক দিন স্মরণে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই জন্তই ইহা সাধনোৎসব বলিয়া বরাবর সাধিত হইত। প্রতিবর্ষে কি নব নব সাধন অবলম্বনে অধ্যাত্ম জীবন সমুন্নত হইবে, তাহারই নিমিত্ত এই ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠান।

এই উপলক্ষে আমাদের স্মরণ করা উচিত, কেন রাজা রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত “আদিব্রাহ্মসমাজগৃহ” হইতে নববিধানাচার্য্য বাহির হইলেন এবং কেনই বা ভারত-বর্ষীয় “ব্রহ্মমন্দিরের” প্রতিষ্ঠা করিলেন; আবার কেনই বা আদিব্রাহ্মসমাজের বিধিবদ্ধ নির্দিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি পরিবর্তন করিয়া নব ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করিলেন।

সাধারণ বিচারবুদ্ধি-পরতন্ত্র সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ এই অমুযোগ করেন যে, ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দকে কতই স্নেহ করিলেন, কতই সম্মান করিলেন, কতই সন্মান করিলেন, ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বর-প্রেরিত আচার্য্য বলিয়া বরণ করিলেন; ব্রহ্মানন্দ যেমন অনায়াসে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া এক নূতন সমাজ গঠন করিলেন এবং পূর্ব উপাসনা-পদ্ধতি পর্যাখ্যে বদলাইয়া দিয়া আপনার মত জাহির করিতে নূতন ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করিলেন। ইহা আপাততঃ স্থূল দৃষ্টিতে হয় ত তাঁর দান্তিকতা বা ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হইতে পারে। বস্তুতঃ তাঁর তখনকার বিরোধিগণ এই বলিয়াই দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে দণ্ডিত করেন।

কিন্তু প্রকৃত সত্য কথা কি? শ্রীকেশব ঈশ্বর-নিয়োজিত বিধানবাহকরূপে সত্য দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আলোকে যখন দেখিলেন, বিধাতৃবিহিত নবযুগধর্ম্মবিধানবীজ কেবল চিন্দু বৈদান্তিক গণ্ডিতে নিবদ্ধ হইয়া এক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত হইতেছে এবং রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত সমাজগৃহও জীবন্ত ব্রহ্মের মন্দির না হইয়া কেবল ব্রাহ্মসাধারণের



“সমাজগৃহ” গাত্র হইয়া রহিয়াছে ; যাঁহারা তাহার অধিকাংশী, তাঁহাদের সহিত সত্য রক্ষা পূর্বক মিলিত থাকিবার জন্য কেশবচন্দ্র প্রাণগত ভাবে চেষ্টা করিয়াও যখন তাহাতে কৃতকার্য হইলেন না, বরং সেখান হইতে তাড়িত হইলেন, তখনই ঈশ্বরাদেশে একান্ত বাধ্য হইয়াই, এই “ব্রহ্মমন্দির” প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সার্বজনীন ধর্মশাস্ত্র হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া যেমন উদার নববিধানের শাস্ত্র রচনা করিলেন, তেমনি সর্বধর্মসমন্বয়-সাধনোপযোগী নবব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীও প্রবর্তন করিলেন।

ধর্মপিতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি অনুরাগ অক্ষুর রাখিয়া, অথচ তাঁহার পবিত্র স্মেহের মায়ায় আবদ্ধ না হইয়া, এবং ধর্মস্বাধীনতার উদ্দীপ্ত হইয়া একমাত্র বিধাতার জীবন্ত পরিচালনাতেই বাধ্য হইয়া তিনি ইহা করিতে সক্ষম হইলেন ; ইহাতে কেশবচন্দ্রের মানবীয়তা কিছুই ছিল না, বরং ইহা তাঁহার আমিহীনতারই পরিচয়। ইহা যে জীবন্ত বিধাতার জীবন্ত বিধান। তিনি কেমন করিয়া তাঁহার বিশ্বজনীন বিধানকে কেবল বৈদান্তিক ভাবে নিবন্ধ থাকিতে দেবেন ?

তাই এই জীবন্ত বিধাতার যন্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াই ত্রিকোণ এই সুবিশাল বিশ্বরূপ পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরের অনুরূপ এই “ব্রহ্মমন্দির” প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সর্বধর্মসমন্বয়সাধনের উপযোগী ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী প্রবর্তন করিলেন।

ভক্তিমাসের ষারিধারা-বর্ষণে যেমন ক্ষেত্র-নিহিত বীজ বৃষ্টির ও বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, স্বাতি ক্ষুদ্রকোণে পড়িলে যেমন মাণিক গজায় বলে, তেমনি সর্বধর্মসমন্বয় বিধান নববিধানের গর্ভাধান যেম এই ভারত-বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির গঠনে ও এই নবব্রহ্মোপাসনা-প্রণালী প্রবর্তনে হইল। মহানদীর স্রোত যে বাঁধে আবদ্ধ হইতেছিল সে বাঁধ কাটিয়া গিয়া তাহা অবাধে এখন প্রবহমান হইল।

আমাদের ইহাও স্মরণীয় যে, “ব্রহ্মমন্দির” নামে কোন মন্দির ইতিপূর্বে আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হিন্দু দেবদেবীর “মন্দির” হইয়াছে। নিরাকার ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দেবতার আয় পূজা ও দর্শনের জন্যই এই ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত। আমার সর্বধর্মসম্প্রদায়ের যত ধর্মমন্দির, মসজিদ, গির্জা, স্তুপ, সবাঁকার সমন্বয়াকারে ইহা গঠিত। এবং ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীর ভিতরও, উষো-

ধন, আরাধনা, ধ্যান, যোগ, নামপাঠ, শাস্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সংকীর্ণনাদি সর্বধর্মের সকল সাধনপ্রণালী সমন্বিত ও একীভূত হইয়া, সর্বব্রহ্মপূর্ণ সাধনপ্রণালী রূপে ইহা প্রবর্তিত।

এই উপাসনাই নববিধান-মুর্তিমান জীবন লাভের উপাদান এবং ইহাই নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রাণ। ধর্মবিধান মুর্তিধারণ না করিলে তাহা মানবের নিরুট দৃশ্যমান হয় না। তাই বিধাতা তাঁর বিধান দৃশ্যমান করিবার জন্যই ব্রহ্মানন্দকে যন্তরূপে ব্যবহার করিয়া, তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মমন্দির রূপ মহাসমন্বয়তীর্থ স্থাপন করিলেন এবং সর্বধর্মের সর্বসাধনসমন্বয়ে ব্রহ্মোপাসনারূপ সর্বব্রহ্ম-সুন্দর সাধনপ্রণালী প্রবর্তন করিলেন। ধরায় স্বর্গদ্বা-প্রতিষ্ঠার জন্য এই ব্রহ্মমন্দির এবং পাপী মানবকে মুর্তিমান ব্রহ্মানন্দ করিবার জন্য এই ব্রহ্মোপাসনা। হিন্দু বিধানের ব্রহ্মদর্শন এবং পাশ্চাত্য ইহুদি ও এসলাম বিধানের ব্রহ্মবাণীশ্রবণ ইহাতে সমন্বিত।

আবার এই ব্রহ্মোপাসনার বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবল একা একা সাধনীয় নয়, সদলে সপরিবারে মিলিত হইয়া অথবা জীবন লাভের উপাদান এই ব্রহ্মোপাসনা। তাই “অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাও,” “আমাদিগকে সর্বদা রক্ষা কর” ইত্যাদি সমবেত প্রার্থনা ইহার সাধন। তাই ত ইহা সম্পূর্ণ নূতন। তাই বর্তমান নবযুগধর্মবিধানে ইহাই বিধাতার প্রত্যক্ষ স্বর্গের দান, এই সৌভাগ্যলাভের জন্য বিশেষ আনন্দ উল্লাস করিতেই এই ভাদ্রোৎসব।

আমরা পাপী মানুষ হইয়াও সকলে মিলিয়া এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া নিরাকার পরব্রহ্মকে দেবদেবীর আয় প্রত্যক্ষ ব্যক্তিরূপে দর্শন করিব এবং তাহার সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ বাণীশ্রবণে বা শ্রবণায় তাঁহার উপাসনা করিব অর্থাৎ তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার পূজা করিব ও তদ্বারা নববিধান জীবনে মুর্তিমানরূপে গঠিত হইবে বা তাঁহার স্বরূপসাধনে তাঁহার স্বরূপে স্বরূপবান্ স্বরূপবতী হইবে। ইহা কি সামান্য সৌভাগ্য ? এই সৌভাগ্য স্মরণ করিলেই কি আমাদের হৃদয় আনন্দোৎসবে উত্তপ্ত হয় না ?

বাস্তবিক যদি আমাদের ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার স্বর্গের অমরদল এবং আমাদের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ ও পেরিতদলের সঙ্গে আমাদিগকে মিলাইয়া উৎসবানন্দ সন্তোগ করাইবার জন্য এত ভাদ্রোৎসব আনিলেন, “সুবিশালমিৎস-

বিশ্বং”রূপ তাঁহার পবিত্র মন্দিররূপ তীর্থে আনিয়া তাঁহার জীবন্ত ব্রহ্মোপাসনা-যোগে আমাদের দ্বারা এই যে স্বর্গের মহোৎসব করাইলেন, ইহার প্রভাব তবে কি বার্থ হইবে? এই ব্রহ্মমন্দিররূপ মহাতীর্থের সম্বন্ধে আমরা কতই অপরাধী, ইহার মর্যাদা যেন আর আমাদের নিকট খর্ব না হয়। আর বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতায়, সদলে সপরিবারে, এই ব্রহ্মোপাসনারূপ নবজীবনপ্রদ মহাসাধন-সোপান যাহা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা হঠাৎ কখনও যেন আমরা বিচ্যুত না হই। বাস্তবিক সশরীরে, সদলে, সপরিবারে, সমগ্রমানবপরিবারকে লইয়া স্বর্গসম্প্রদায়ের উপায় এই ব্রহ্মোপাসনা, ইহা যে আমাদের নিত্য অন্ন পান। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই উপাসনা-সাধনে কেহই যেন আমরা আর অবহেলা না করি।

জীবন্ত ব্রহ্মের সহিত যোগসমাধানে, স্বর্গস্থ ভক্ত-বৃন্দের সহিত যোগে, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে নববিধানাচার্যের সহিত একাত্মতায় পরম্পরের সহিত ও বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতাসম্পাদনে, ধরায় স্বর্গরাজ্যস্থাপনের উপাদান এই ব্রহ্মোপাসনা। ইহার শ্রায় সহজ সাধনপ্রণালী এ পর্যন্ত কোথাও আবিষ্কার হয় নাই। এত ভাজোৎসবের বানে আমাদের প্রাণে ইহাই যেন থাকিয়া যায়।

## ধর্মতত্ত্ব।

### বারিবর্ষণ।

আকাশের বারিবর্ষণ স্বর্গের ক্রন্দন। বারিবর্ষণ বিনা শস্যোৎপাদন হয় না। সাধনের অশ্রু এবং ভগবানের কৃপাবারিবর্ষণ বিনাও জীবন-ক্ষেত্রে ভক্তি প্রেমের ফসল ফলে না।

### উৎসবের প্রসাদ জীবনে রক্ষা।

ঐন বিধানাচার্য বলিলেন, “উৎসবের পরের সময় এই যে সময়, বিশেষ বিপদের সময়, পরীক্ষার সময়। যাহা পাইলাম, তাহা যদি রাখিতে পারি, তবে আর বিপদ নাই। যাহা পাইলাম, যদি অবহেলাতে ত্যজাই, মহাবিপদ। এই জন্ত মিনতি করি, যাহা পাইলাম, অবহেলাতে যেন না পলায়ন করে।” ইহাই আমাদের এখন সবার প্রার্থনা হওয়া উচিত। যখন ন্যাকাত হইতে বারিবর্ষণ হয়, কৃষক আলি বাঁধিয়া সে বারি যদি আটকাইয়া না রাখে, ক্ষেত্র শুক হইয়া যায়, আর তাহাতে ফসল ফলে না; তেমনি যে স্বর্গের কৃপাবারি উৎসবে বর্ষণ হইল, তাহা

আমরা জীবনের সম্বল করিয়া যদি না রাখি, আমরা নিতান্ত কৃপাপাত্র, আমরা নিশ্চয়ই মনের শুকতা-দগে দগিত হইব। আর যদি আমরা সম্বল করিয়া রাখিতে পারি, আমাদের জীবন সরস ও সমুন্নত হইবে।

### পরম্পরকে চেনা।

আয়নাতে মুখ দেখিলে আপনাকে আমরা দেখিতে পাই, চিনিতে পারি। এক আয়নাতে পরম্পরের মুখ দেখিলেও পরম্পরকে চিনিতে পারি। সে চেনা পরিচয় বাহিরের। কিন্তু অন্তরের চেনা পরিচয় করিতে হইলে, চিহ্ন ব্রহ্মরূপ আয়নার ভিতর দিয়া পরম্পরকে দেখিতে ও চিনিতে হইবে। তাঁহার ভিতর দিয়া না দেখিলে পরম্পরের প্রকৃত চেনা পরিচয় কখনও হয় না। অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ বহু বিনা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম বস্তু বা দূরস্থ বস্তু দেখা বা চেনা যায় না। ব্রহ্মের আলোক অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ উভয় বস্তুর কাচ অপেক্ষাও বৃহৎ ও উজ্জ্বল; কেন না, তাতে নিরাকার মন ও আত্মা উজ্জলরূপে দৃষ্ট হয়।

### জন্মার্চমী ও খৃষ্টমাস।

ঐক্যের জন্মবৃত্তান্ত ও ঐখ্যের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যথেষ্টই সৌন্দর্য দেখা যায়। ঐক্য জন্মিলেন কারাগারে, ঐখ্যও জন্মিলেন অখাগারে। ঐক্য কংস দ্বারা হত হইবার ভয়ে পিতা বৃহদেব কর্তৃক বশোদার নিকট লুক্কায়িত হইলেন, ঐখ্যও হিরোদের ভয়ে পিতা জহদেব কর্তৃক দূর দেশে পলায়িত ও রক্ষিত হন। ঐক্য কালীদমন ও তারকা বধ করিলেন, ঐখ্যও সয়তানকে জয় করিলেন। ঐক্য মথুরার রাজ হইলেন, ঐখ্যও স্বর্গরাজ্যে পরম পিতার সিংহাসনের পার্শ্বে বসিলেন। উভয়ের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সত্যতা নির্ধারণ না হউক, আধ্যাত্মিক ভাষা নিরূপণ করা কঠিন নয়। ইতিহাসে ঐখ্যের দিন নিরূপিত নাই, কিন্তু জন্মার্চমী নিরূপিত আছে। ইহা হউক, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে ভক্তগণ জন্মগ্রহণ করিতে, বিধাতার অনির্বচনীয় কৌশলে তাঁহাদের মধ্যে যথেষ্টই সৌন্দর্য দেখা যায়। তাঁহারা যে একই ব্রহ্মজাত সহোদর নববিধানের অধ্যাত্ম বিজ্ঞান ইহাই আবিষ্কার করিয়াছেন।

### অনুকরণ নয়,—অনুসরণ।

অনুকরণ করা মৃতকল্পের ধর্ম। একের অনুকরণে আমরা বাধীন ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে হয়। কিন্তু অনুসরণ করিলে আমার বিশেষত্ব রক্ষা করিয়াও অপরের উচ্চাঙ্গ ও ধর্মাদর্শ গ্রহণ করা যায়। নববিধানের ইহাই বিশেষ সাধন। বিধাতা আমাদেরও এক বিশেষত্ব দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, সে স্বাধীন বিশেষত্ব আমি বিলোপ করি, তিনি তাহা চান না। নববিধানাচার্যকেও

গ্রহণ করিতে হইলে আমার আশ্রয় বলিদান দিব; কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তিত্ব ও বিশেষত্ব বিলোপ করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ যেন না করি, ইহাই তিনি প্রত্যেকের নিকট চাহিয়াছেন।

## ব্রাহ্মের লক্ষ্য কি ?

(ব্রহ্মমন্দিরে সামাজিক উপাসনার নিবেদিত)

### পূর্বসমুদ্র

মানুষ রোগের ঔষধ খোঁজে। অকালমৃত্যু নিবারণ করতে চায়। কিন্তু শরীরের রোগ, শরীরের মৃত্যুই একমাত্র নয়। কেউ রোগে মরে, কেউ শোকে মরে, কেউ হুঃখ, দরিদ্রতার মরে, কেউ অজ্ঞানতার মরে। ইহা অপেক্ষা শতগুণে ভয়ানক মৃত্যু, পাপে মরা। যে নরাধম পাপে মরে, সে নিজেও মরে এবং অপরকেও সেই পথে নিয়ে যায়। এ বড় সংক্রামক। তাই মঙ্গলময় “অমৃতের” সৃষ্টি করেছেন। মাঝে মাঝে জগতে পাঠান। এবারেও জীব তরাতে সোণার কলসি ক’রে পাঠিয়েছেন। এই দেবভোগ্য অমৃত পান করার জন্যে আচাধ্যাদেব যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তবুও আমাদের সাধের ঘুমঘোর তাজলো না, দীন-দশা ঘুচলো না। আমরা অমৃতের পরিচয় হ’লাম না। ব্রহ্মসংসারাকাঙ্ক্ষী হ’লাম না। আত্মা বেথানেই থাক—উচ্চে নীচে, দেশদেশান্তে, জলগর্ভে কি আকাশে—ব্রহ্ম-সংসার ছাড়া, ব্রহ্মপ্রকাশের মধ্যে বাস করা ছাড়া “নাত্তঃ পন্থা বিদ্যাং যস্য নার।” পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার যোগ হলে, জ্ঞান, বাধ্য, মৃত্যু, শোক, হুঃখ, অত্যা, কিছুই থাকে না। আত্মার হিরণ্য কোষে “সত্যং জ্ঞানমনস্তত্ত্বম্ আনন্দরূপমমৃতম্” ব্রহ্মের জ্যোতি পড়লে; রোগ, শোক, অত্যা, দরিদ্রতার স্থান কোথা? অনন্ত করুণাময় পরমেশ্বর জীবকে কখনও কষ্ট দেবে না, সে শুধু আমাদের মোহ, অজ্ঞানতা। আমরা মনে করি, জ্ঞান হুঃখ, তাই হুঃখ; জ্ঞান হ’লে সে বোধ থাকে না। অজ্ঞানতায় আমাদের সকল কষ্টের মূল, যত হুঃখের নিদান। আচাধ্যাদেব বলেছেন, “আমরা আছি, কিসে আছি? হুঃখে নয়, সুখে আছি।” তাই বিধাতা এ যুগে মরাকে বাঁচাবার জন্যে মৃতসজীবন সুখা নববিধান পাঠিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীজীর জীবনেও এই বিধানের আশার তরুণ মধুর আলো, স্বর্গের অপূর্ণ জ্যোতি, সমুদ্রের নবীন বার্তা, করুণাক্ষণের ভক্তি-যোগের নূতন শিক্ষা, জীবজন্তির নিঃসংশয় সুসমাচারের প্রকাশ দেখা যায়। আমরা আশা-নয়নে জগতের সব দেশে, সব জাতির মধ্যে এই নবালোক প্রবেশের প্রতীক্ষা করছি। আমরা বিশ্বাস করি, নববিধানের মঙ্গলালোকে সব আঁধার চূর্ণ হবে, সব মৃত্যু অমৃত্তে পূর্ণ হবে, সব স্বার্থ, দৈহিক, জড়তা লয় পাবে, সব মারা, মোহ, মিথ্যা, অপ্রজ্ঞা ভেঙে যাবে, সব ভয় ভাবনা, অত্যাচার, অবিচার, অর্জন্য, হাংকায় থেমে যাবে। পুণ্যপ্রভাবে অরুণোদয়ে

বিশ্বের হৃদয়-শতদল খুলে যাবে, “সুগভীর তরঙ্গিত নীরনিধি, হিমরঞ্জিত শোভনভূগগরি” ভরা এই রমণীয় ধরা বিমল প্রেম-নন্দে ভরে যাবে, অরুণার অক্ষয় ভাণ্ডারপূর্ণ স্বর্গের অমৃতবার একেবারে খুলে যাবে। “তখনহে নূতন বিধি আনন্দের সমাচার, পাপী তরাইতে স্বর্গ হতে এসেছে ভবে এবার।”

দয়ার ঠাকুর দয়া করে এমন বিধান আমাদের দিলেন, আমরা তার যোগ্য হ’লাম কৈ? জীবনে তার পরিচয় দিলাম কৈ? কি প্রমাণ দিতে পারি? “নহে এতো ছেলেখেলা, অন্ধকারে ঢিল ফেলা”। জীবনে তার নিদর্শন দেখাতে হবে। বলা অনেক হয়েছে; লেখাও যথেষ্ট হয়েছে; উপদেশ প্রসঙ্গেরও অভাব নেই। কিন্তু লোকে নববিধান নিলে কৈ? ইতিমধ্যে দশহাজার লোককে যে এই ধর্মে দীক্ষিত করবার কথা ছিল। দশহাজার কেন? সারা বঙ্গদেশকে এই বিধানের নিশানতলে দাঁড় করাবার কথা। জীবনে প্রমাণ না দিলে, কেউ এ ধর্ম নেবে না। যার দর্শনমাত্রই হরি-ভক্তির উদয় হয়, এই যদি বৈষ্ণবের লক্ষণ হয়, তবে নববিধান-বাদীর জীবনস্পর্শেও ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মে স্থিতি ও ব্রহ্মবাণী-শ্রবণের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।

এ যুগধর্মে আমরা ত তাঁকে চাই নি, তিনি আমাদের চেয়েছেন; তাঁর করুণা ঘরে ঘরে ফিরছে। “আমি পবিত্রাত্মা হরি এলেছি ঘরে। হৃদয়ের সমগ্র প্রেম লাগে হে আমারে। না দিলে প্রেম বোল আনা, কিছুতে মোর মন উঠে না, সংসারের—উচ্চিষ্ট প্রেম দিস্নে আমারে।” তিনি আমাদের সর্ব্ব হরণ করতে চান। তাঁর প্রেম সর্ব্বগ্রাসী। জলে, স্থলে, নীলাকাশে, শশী তারাদলে, তরুলতাকলফুলে, নানাদিকে, নানামতে, নানা সুরে, নানা তালে তিনি আমাদের মন হরণ করতে চান। একাকী প্রাণসিংহাসনে রাজা হয়ে বসতে চান। সেখানে কারু আর অধিকার নেই—একমাত্র পতির প্রতিমা যেমন সতীর প্রাণমন্দির আলো করে থাকে। পতি সতীর আঁখির জ্যোতি, শ্রবণের স্রুতি, কণ্ঠ মাঝে বাণী; তিনিই তার দেহের শক্তি, হৃদয়ের বল, প্রাণের শাস্তি, মন মাঝে চিন্তামণি। আমাদের কাছে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তাই বলি—

“তমেব মাতা চ পিতা তমেব

তমেব বন্ধু চ সখা তমেব।

তমেব বিদ্যা দ্রবিশং তমেব

তমেব সর্ব্বং মম দেবদেব ॥”

দয়াময়, প্রেমসিদ্ধ হে, আশীর্বাদ কর, আমরা যেন জীবন দিয়ে নববিধান প্রচার করতে পারি। ভারতে যে আলো জ্বলেছে, তা কি নিভে যাবে? তোমার এ মহাদান কি ব্যর্থ হবে? কতকাল পরে ভারতের হৃৎস্পন্দন পাবে, বিপ্লবশির অবসানে, নবীন প্রভাবে, “স্বর্গ হতে এসেছে মধুর আশার বারতা”; তা কি আমাদের দোষে মিছে হয়ে যাবে? ভাবতেও প্রাণে ব্যথা লাগে। প্রভু, দয়া কর, দয়া কর। বাঁচাও, বাঁচাও।

যা মেয়ে এই মরাদের বাঁচাও। সামনে তোমার দীপ্ত দীপ  
তুলে বর। প্রাণে আগুনের পরশমণি ছোঁরাও। আজ দেশের  
জুড়িনে, সড়কের সন্ধিক্ষণে, আমরা যেন আবার নব উদ্যমে, নব  
উৎসাহে নববিধান প্রচার করতে পারি! তোমার করুণার সব  
হতে পারে। "পর্তুসম বাধা বিশ্ব বার দূরে।" এই বর দাও,  
তোমার দেখে, তোমার কথা শুনে, আমাদের জীবন যেন সার্থক  
হয়; যেন বলতে পারি, "চক্ষু কর্ণের হয়েছে বিবানভঙ্গন।" মা,  
অনুগ্রহ করে, আমাদের মাথার হাত দিয়ে এই আশীর্বাদ কর,  
আজকের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তি: শান্তি: শান্তি!

ঐদেবেশ্বনাথ বসু।

—•—

## যৌবনের স্বপ্ন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এ সকল আমাদের ছাত্রজীবনের কথা। নগেন্দ্রবাবু  
কলিকাতার এ সকল কার্য বাতীত মধ্যে মধ্যে কলিকাতার  
বাহিরে বাইতেন। হাওড়া, হুগলি, ঈরানপুর, চুঁচুড়া, বর্ধমান,  
প্রভৃতি স্থান হইতে উৎসবে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিত। আমিও  
তাঁহার সহকল্পরূপে মধ্যে মধ্যে গমন করিতাম। উপাসনা ও  
বক্তৃতা করিবার তার আমার উপর অনেক সময় আমার অনিচ্ছা  
সত্ত্বেও অর্পিত হইত। তিনি আমাকে সহোদরের ভায় ভাল-  
বাসিতেন। তাঁহার সদ্য বাতীত আমি একাকী বাহাতে কার্য  
করিতে অভ্যস্ত হই, এজন্য সকল কার্যেই আমার কিছু না কিছু  
ভার অর্পণ করিতেন। একবার বর্ধমানে উৎসব হইবে, তাঁহার  
নিমন্ত্রণ আসিল, আমিও বাইব স্থির হইল; কিন্তু তাঁহার বাহা  
পাথের পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে একজনকে বাহা যাতায়াত  
হয়। আমার বাওরা না হওয়াতে উভয়ের মনই দুঃস্থ হইল।  
আমি রাগিতে শয়ন করিতে গেলাম, নিদ্রা আসিল না—  
স্বপ্নাবেশ হইল—স্বপ্নের ঘোরে কোথা হইতে শব্দ আসিল—কে  
যেন কাণে কাণে কথা বলিয়া গেল, "সাধু যার উদ্দেশ্য, ঈশ্বর তার  
সহায়"। হঠাৎ সর্বশরীর অগ্নিময় হইয়া উঠিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা  
হৃদ হইল যে, অর্থের অভাবে বর্ধমানে যাওয়া বন্ধ হইবে কেন?  
অতি প্রত্নাবে উঠিয়াই বর্ধমানের দিকে রওনা হইলাম। পথ  
খাট চিনি না। হাওড়া ট্রেন পার হইয়া প্রান্তিক রোড  
খরিয়া চলিতে লাগিলাম। দ্বায়ে মাঠ, জঙ্গল, মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও  
জনপদ দেখা বাইতেছে। গ্রীষ্মকাল—প্রখর রৌদ্র মাথায়—ভাতা  
নাই, স্বপ্নের ঘোরে চলিরাছি; হাতে একটিও পরস্যা নাই, ক্ষুধা-  
নিবৃত্তির উপায় নাই—যখন পিপাসার কণ্ঠ শুক হইতেছে, তখন  
গৃহস্থের বাড়ীতে গিয়া একটু জল ভিক্ষা করিয়া পান করিতেছি।  
প্রায় ১টার সময় হুগলিতে গিয়া পৌঁছিলাম। দ্বায়ে জঙ্গল,

হঠাৎ বানবের আশ্রিতাদ প্রতিগোচর হইল। কোন সংকেত  
পড়িয়া অথবা কঠিন পীড়ার দরুণ বাক্যরোধ হইলে, অথচ কথা  
বলিবার চেষ্টা করিলে, একটি অম্পট গেঁ গেঁ এক যেমন বাহির  
হয়, ইহাও সেইরূপ। ঠিক মাঝবের স্বর কিনা, তাহা ঠিক করিতে  
পারিতেছি না—কি জানি, যদি কোন জন্তু জানোয়ারই হয়, তবে  
তবে সেই শব্দটা লক্ষ্য করিয়া জন্তুদের দিকে অগ্রসর হইলাম;  
যত শব্দের নিকটবর্তী হইতেছি, ততই মাঝবের স্বর বলিয়া উপলব্ধি  
হইতেছে। ক্রমে ক্রমে নিকটে গিয়া দেখি যে, একটি অসহায়  
লোক কঠিন উদরাময় অথবা বিষটিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া  
একটু জলের জন্য আশ্রিতাদ করিতেছে। তাহার নিকট একটি লোক  
কটাহ মাত্র আছে। নিকটেই পুকুর, প্রায় ত্রিশ কুট নীচে, খাট  
নাই, নামিবার উপায় নাই; অতি কষ্টে সেই কড়াটা করিয়া এক  
কড়া জল তাহার নিকট রাখিয়া দিলাম—যুখে একটু জল দিলাম।  
জল খাইয়া আমাকে আশীর্বাদ করিল। অনুসন্ধান জানিলাম যে,  
তাঁহার বাড়ী আজমগড়, আসামে কুলি হইয়া গিয়াছিল; অতিরিক্ত  
প্রমে ও কদব্যাহারে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া বাওরাতে, সাহেবেরা  
তাহাকে পরিত্যাপ করিয়াছে। সে এখন দেশে ফিরিতে চায়।  
যতক্ষণ হাঁটিবার শক্তি ছিল, ততক্ষণ হাঁটিয়া আসান হইতে  
হুগলি পক্ষান্ত আসিয়াছে। পীড়িত হইয়া পুকুরের ধারে জল  
খাইতে আসিয়াছিল, আর উঠিতে পারে নাই। এখন সে  
আজমগড় বাইতে চায়, রেলের ভাড়া চায়। সে কখন কখন  
তিনি আমায় প্রাণ গলিয়া গেল। হাতে একটিও পরস্যা নাই!  
কি করি! ভিক্ষা করিয়া কিছু পরস্যা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার  
পাথের যোগাড় করিবার জন্য প্রাণে প্রবল ইচ্ছার জন্ম হইল।  
হুই এক মাইল দূরে হুগলি সহর। ভিখারীর ভায় গৃহে  
বাইয়া ছ একটি করিয়া পরস্যা সংগ্রহ করিয়া বাহা পাইলাম,  
তাঁহার হাতে দিয়া চলিয়া গেলাম। বেলা অপরাহ্ন হইয়াছে,  
বর্ধমানে গিয়া উৎসব সভোগ করা অসম্ভব দেখিয়া,  
কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা হইল,  
কে আমাকে এখানে লইয়া আসিল—কে এই অসহায় লোকটার  
সেবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করিল—কে তাঁর আশ্রিতাদ  
বাতাসের মধ্য দিয়া "সাধু যার উদ্দেশ্য, ঈশ্বর তার সহায়" এই  
ব্রহ্মবানীরূপে পূর্ব রাজ্যে কর্ণে প্রবেশ করিল—হে ভগবান,  
তোমার জগতে কোন কার্য আকস্মিক নহে! তুমি এইরূপেই  
একজনের দুঃখ রোগ শোকের বোঝা অস্তের হৃদ চাপাইয়া  
মানবের কল্যাণ কর। স্বপ্নের প্রতি আমার অধিকতর বিশ্বাস  
হইল—স্বপ্নের ঘোরে যে বানী আসে, তাহা আমার নিকট সত্য  
বলিয়া মনে হইতে লাগিল। উৎসবের পরিবর্তে আমি মহোৎসব  
সব লাভ করিয়া, কোন দেশ অর করিয়া সৈনিকপুরুষেরা  
যেমন আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, আমিও সেইরূপ অগ্নির  
উৎসাহ লইয়া আবার পদব্রজে কলিকাতার দিকে চলিলাম।  
দ্বিগুণে আশ্রিতাদ নাই, সমস্ত দিন বুঁরা বুঁরিয়া পায়ের মাংসপেশি-

কলি কঠিন হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা ৮টার সময় শ্রীরামপুরে আসিয়া পৌঁছাইলাম। সে দিন তাঁহাদের সামাজিক উপাসনার দিন। আমাকে দেখিয়া বহুগণ উপাসনার জন্ত অক্লান্ত করিলেন। উপাসনার বেদীতে বসিয়া মনে হইল, যেন অতি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে—মাংসপেশিগুলি কঠিন—সমস্ত শরীর বেদনাময়—মুখে কথা সরিতেছে না। কেমন করিয়া উপাসনা করিব! কি জানি, যেন কোথা হইতে এক আশ্চর্য্য শক্তি প্রাণে অবতীর্ণ হইল, সম প্রাণ অগ্নিময় হইল, ভাবা অগ্নিময় হইল, রসনা হইতে যেন ঝড় বহিতে লাগিল। দৈবশক্তির একটা আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা সে দিন জন্মকে অভিজ্ঞত করিয়া ফেলিল। সমস্ত দিন অনাহার, রোজ্রে প্রায় ৪০/৪৫ মাইল ঘুরিয়া শরীর যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন শক্তি কোথা হইতে আসিল? সে শক্তি যে দৈবশক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার অসম্ভব সংশয় রহিল না। মানুষ যখন নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে, তখন তাহার শক্তি সীমাবদ্ধ; আর যখন ভগবানের উপর নির্ভর করে, তখন তাহার শক্তি অপরিমেয়, অজয়ের। প্রাণে এই অভিজ্ঞতা দান করিবার জন্যই যেন ভগবান একটা অশক্ত ক্রান্ত দেহকে লইয়া তাঁহার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিলেন। দেখাইলেন, ভগবানের শক্তির নিকট মানুষের শক্তি কত অতিকিৎকর! উপাসনা শেষ হইলে বহুদূর কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। জলযোগ করিয়া সমাগমগৃহেই নিদ্রা গেলাম। প্রাতে উঠিয়া সমস্ত শরীরে বেদনা অনুভব করিতেছি। শ্রীরামপুর হইতে হাটখোলা কলিকাতা আসিবার লক্ষ্য নাই। এ দিকে কপর্দকবিহীন। দেখি যে, তাঁহার (বসন্ত) একখানি টিকিট কিনিয়া আমার হাতে অর্পণ করিলেন। বিধাতাকে ধন্যবাদ দিলাম। বুঝিলাম যে, মানুষ যতই সহ্য করিতে পারে, ভগবান তাহার অধিক কষ্ট মানুষকে দেন না। তার পরদিন নগেন্দ্রবাবুর সহিত দেখা হইলে সকল কথা বলিলাম, তিনি শুনিয়া অবাক হইলেন। জীবনের প্রত্যেক ঘটনা বিধাতা পূর্ক হইতে যে ব্যবস্থা করিয়া রাখেন, তাহার পরিচয় পাইলাম। বর্দ্ধমানে একজনে না গিয়া ভালই হইয়াছে, এই বর্দ্ধমান উভয়েই ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

নগেন্দ্রবাবু সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে যুক্ত্য পর্য্যন্ত কাটাইয়াছি, কখন কোন উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে রাগ করিতে দেখি নাই। ইহা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ ভাব। একদিন আমরা কলেজ স্কয়ারে প্রচার করিয়া গৃহে ফিরিতেছি, একটা ছাত্র যুবা আমাদের প্রহার করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম খগড়া করিয়া মাঝামাঝি করিবার ইচ্ছা ছিল, অনেক অশ্লীল গালাগালি করিতে লাগিল, আমরা কথা না কহিয়া চলিয়া গেলাম। নগেন্দ্রবাবু তাহার বাড়ী জানিতেন, পরদিন এক গ্রাম মিছিলের সময় বৎস হইয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে ডাকিয়া

বলিলেন যে, তাই, কাল তোমার মুখটা তিক্ত হইয়াছিল, একটু মিষ্ট সরবৎ খাইয়া মুখটা মিষ্ট কর। এই ব্যক্তি মিষ্ট ব্যবহার পাইয়া আমাদের সহিত আর শত্রুতা করিত না, অথবা আমাদের বক্তৃতার বাধা দিত না।

বাল্যকাল হইতে নগেন্দ্রবাবুর আশ্চর্য্য ধর্মভাব, প্রচারকার্য্যে অলস উৎসাহ, কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর নৈতিক জীবনের উন্নতিকল্পে ঐকান্তিক চেষ্টা, শান্তিপূর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর কার্য্যভার গ্রহণ, মফঃস্বলের মানাধানে প্রচারকার্য্যে শক্তি, সময় ও চিন্তা নিয়োগ, নববিধানের সত্য ঘোষণা করিবার জন্ত বক্তৃতা ও পুস্তকাদি প্রণয়ন দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে ছোট কেশব বসিয়া ভাবিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা বায়ু পূর্ক হইতে পশ্চিমে অথবা উত্তরে হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় না; তাঁহার ইচ্ছা বিনা একবিন্দু বারি আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয় না, একটা তৃণও পৃথিবীতে জন্মলাভ করে না। বিধাতা জানিতেন, কাহার সহিত কাহার মিলন সংঘটিত হইলে, তাঁহার ইচ্ছা পৃথিবীতে পূর্ণ হইবে। আমাদের এই আবাণ্য যোগের ভিতর বিধাতার প্রত্যক্ষ হস্ত দেখিতে পাই। যৌবনের স্বপ্নগুলি যে অল্পে অল্পে জীবনে আকার গ্রহণ করিতেছে, ইহার মূলে কি আমাদের বন্ধুতার অবিক্রিয় যোগ ও অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্বপ্রেমের কোন স্থান নাই! ভগবান পূর্ক হইতেই সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখেন এবং যথাসময়ে তাহার প্রকাশ হয়।

(ক্রমশঃ)

ঐকামাধ্যান্য বন্দোপাধ্যায়।

—

## মহারানী সুনীতি দেবী।

যাঁহার জীবন আধ্যাত্মসমাজের গৌরব ছিল, সেই পূজনীয় মেহমতী ভগ্নী সুনীতি দেবীর পুণ্যস্থিতি বক্ষে ধারণ করিয়া কাতর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তাঁহার স্মরণ জীবনের সঙ্গুগরানি সম্যক বর্ণনা করিবার আমার শক্তি নাই। তাঁহার জীবন প্রকৃত আধ্যাত্মসমাজের জীবন ছিল। তাঁহার উচ্চ জীবনের সংস্পর্শে যাহা দেখিয়াছি, তাহা কিংকং প্রকাশ করিতে ইচ্ছা আছে। সেই সত্য কথা আধ্যাত্মসমাজের উদ্দেশ্য চিত্র জীবন সাধন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন পাশ্চাত্য দেশের ও স্বদেশের সত্য রমণীগণের সঙ্গুগরানি সামঞ্জস্যস্থল ছিল। পতিপ্রাণা সত্য, তপ্তিপরাগণা কস্তা, সন্তানবৎসলা জননী, মেহমতী ভগ্নী, প্রজাবৎসলা রাজ্ঞী, সহদর সঙ্গিনী, দয়াবতী রমণী, ধর্মপ্রাণা আধ্যাত্মসমাজ, নববিধানের বিশ্বাসী দাসী—বর্তমান যুগে দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত। উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি ও দরিদ্র সকলেই সম্মানিত হইয়া তাঁহার নিকটে লাভ করিত। বিধাতা তাঁহাকে রাজরাজেশ্বরী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় দুঃখী ধনী সকল



নরনারীকে সমজ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার দৈনিক জীবন হিন্দু রমণীর ভাষে শুদ্ধ ছিল। প্রতিদিন তিনি স্নানান্তে গট-বস্ত্র পরিধান করিয়া, উপাসনা-গৃহে পুষ্প দ্বারা সজ্জিত করিয়া, সেখানে ব্রাহ্মারোহণ করিতেন। গৃহে পরিবার মধ্যে সামান্য বেশভূষা করিতেন। রন্ধনকার্যে তিনি অক্ষম ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সংসারের নানারকম কার্যে অসুপুষ্ট ছিলেন। নিজহস্তে প্রতিদিন ভরকারী কুটীতেন। বড়, আচার, মিষ্টান্ন, সুপারি কাটা সবই স্বন্দররূপে করিতেন। শিল্প কাজ ও চিত্রাঙ্কনে অক্ষম ছিলেন। সুচারুরূপে নানাপ্রকারে কবরী বন্ধন করিয়া দিতে পারিতেন।

সামিত্যিক তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল। প্রতিদিন তত্ত্বি ভরে পতিপদযুগল পুষ্প দিয়া বন্দনা করিতেন। স্বামী যখন যুদ্ধে বাজা করেন, তখন তিনি ভূমিতে শয়ন ও সামান্য আহার করিয়া দিন কাটাইয়াছিলেন। স্বামীর বিচ্ছেদে তপস্বিনী বৈরাগিনীর বেশে জীবন যাপন করিয়াছেন। স্বামীর প্রতিকৃতি সর্বদা কণ্ঠে পরিয়া থাকিতেন। পিতামাতার উপর তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। চিরজীবন পিতৃদেবের বচন শিরোধার্য করিয়া সংসারে বিচরণ করিয়াছেন। অববিধানে তাঁর অটল নিষ্ঠা ছিল, পরিবারে প্রতি অঙ্কুষ্ঠান নবসংহিতামতে করিয়া-ছেন। তাঁহার এক পুত্রের কোন রাজকন্ডার সহিত বিবাহের সব ঠিক হইয়াও, পূর্ণ সংহিতামতে কন্ডার পিতা কার্য করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে, বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। কুচবিহার হিন্দুরাজ্যে তাঁহার প্রভাবে নববিধানের মন্দির স্থাপিত হয়। সকল অঙ্কুষ্ঠান ব্রাহ্মমতে হয়। প্রতি বৎসর সে রাজ্যে উৎসবাদি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। তাঁহার ধর্মজীবন আশ্চর্য। শৈশবাবধি যে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ধর্ম অটল নিষ্ঠায় সহিত পালন করিয়াছেন। ধর্মপ্রচারে অদম্য উৎসাহ ছিল। দেশ বিদেশে উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়া প্রোত্ব-বর্গকে মোহিত করিতেন। মণ্ডলীর হিতসাধন, প্রচারকদিগের সেবা, সমাজের উন্নতিসাধন, উপাসনা, সঙ্গীত, রচনা, কথকতা, বক্তৃতা তাঁহার নিত্য কার্য ছিল। প্রচারকদিগকে ভক্তি করিতেন, তাঁদের পরিবারকে সকলকে আশ্রয় দিতেন। সাম্রাজ্যী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে কন্ডাবৎ স্নেহ করিতেন। রাজ-অটালিকার (Buckingham Palace) তাঁহাকে অতিথিরূপে রাখিয়াছিলেন। আহায়ে বসিয়া সাম্রাজ্যের স্বাস্থ্যরক্ষা-প্রার্থনায় মনোপান করিতে বলার, তিনি অসম্মত প্রকাশ করেন। অথু কেহ একরূপ ব্যবহার করিলে সাম্রাজ্যী অপমানিত মনে করিতেন; কিন্তু মহারানী সুনীতি দেবীকে ইহা পান করা নীতিবিরুদ্ধ, শ্রবণ করিয়া সাম্রাজ্যী বিস্মিত প্রকাশ করা দূরে থাকুক, বিশেষ দ্রুত হইয়াছিলেন। সাম্রাজ্যী আলেকজান্ডার ও সাম্রাজ্যী মেরী উইলসন তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। রবিবারে গির্জাগৃহে নিরাশ্রয় আহার ও উপাসনা কীর্তনাদিতে অতিবাহিত হইত। তিনি সে

নিয়ম চিরদিন পালন করিয়াছেন। রবিবারে বাহিরে কোন নিমন্ত্রণাদি গ্রহণ করিতেন না। সে দিবস গৃহে পরিবারের সকলে মিলিয়া উপাসনা ও নিজের রন্ধনাদি করিয়া একত্রে আহার করিতেন। কন্ডাদিগকে রন্ধনাদি শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, রবিবারে তাহারা প্রত্যেকে কিছু কিছু রন্ধন করিয়া সকলকে আহার করাইত।

দেশীয় বিদেশীয় উচ্চপদধারী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সম্মানে কত আদর বহু করিয়াছেন। সামাজিক শত শত কর্তব্যরাশির মধ্যেও নিম্নমিত উপাসনা ও গৃহের কর্তব্যরাশি ভুলিতেন না। একদিন রাত্রিকালে লাটগৃহে আহায়ে নিমন্ত্রণে বাইবার লজ্জ প্রস্তুত হইয়াছিলেন; হীরক মুকুট ও বহু অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, রাজ-পরিচ্ছদ-পরিহিতা রাজমহিষী যখন পূজাগৃহে করযোড়ে সেই বিশ্বরাজের পূজার প্রবৃত্ত হইলেন, সে স্বর্গীয় দৃশ্য হৃদয়পটে চির অঙ্কিত হইয়া আছে।

সুব্রাহ্মণ্যজ (বর্তমান সম্রাট) পত্নীসহ মহারানীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছিলেন। সম্রাট, সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহাদের বিশেষ বহু জ্ঞান করিতেন। বড়লাট পত্নীসহ সর্বদা তাঁহাদের বাড়ী আসিতেন। লাটপত্নীকে মহারানী নিজের অলঙ্কার ও সাড়ী পরাইয়া, ভূমিতে বসাইয়া, বাজলা আহার করাইতেন। ভারতবর্ষীয় রাজা মহারাজাগণ সম্মানে তাঁহাকে সমাদর করিতেন। মহারাজাগণ কেহ মাতা, কেহ ভগ্নী, কেহ মাতৃশ্রমা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন। পাতিলার বর্তমান মহারাজা তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, তাঁহার পায়ের কাছে ভূমিতে বসিয়া থাকিতেন; নিবেদন করিলে বসিতেন, “আপনার ছোট ছেলে হিতি যেমন, তেমন আমিও আপনার ছেলে।” বরোদার মহারাজা তাঁহাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারানী সুনীতি দেবী তাঁহাকে ডাই কোর্ট দিয়া ছিলেন। পরে ইংরাজ কন্ডার সহিত মধ্যম রাজকুমার জিতেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয়।

অদূর প্রবাসে, লণ্ডনে প্রতিরবিবারে সামাজিক উপাসনা করিতেন। সেই দিনে তাঁহার গৃহে সকলকে বাসিয়া রাজা করাইয়া আহার করাইতেন। লণ্ডনে এসিয়াবাসি মহিলা-দিগের লজ্জা একটি সমিতি গঠন করেন। বিভিন্ন দেশের মহিলাদিগের পরস্পরের মধ্যে সম্ভাববুদ্ধি এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল। প্রবাসে পাঠোদ্দেশ্যে যে সকল ছাত্র, ছাত্রীগণ গমন করিত, তাহাদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেন। অদূর প্রবাসেই তাঁহার প্রিয়তম স্বামী ও গোপের পুত্রদ্বয়কে হারাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর স্মরণার্থ একটি স্মৃতিস্তম্ভ সেখানে স্থাপিত হইয়াছে।

তিনি সন্তানবৎসলা জননী ছিলেন। সন্তানদের রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে ভালবাসিতেন। রুগ্ন সন্তানের সেবা-নিজ হস্তে করিতেন। সুন্দর শিল্পকার্য করিয়া সন্তানদের পরিচ্ছদ প্রস্তুত

করিতেন। শিক্ষার্থে পুত্রসন্তানদের দূর দেশে পাঠাইতে জননীর অকোমল অন্তর কাতর হইত। প্রাণাধিক তিনটি পুত্র ও একটি কস্তার মৃত্যুতে তিনি শোকে পাগলিনী প্রায় হইরাছিলেন। পরম পিতার উপর তাঁর অটল বিশ্বাসই এই বোর পরীক্ষার মধ্যে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

ভাই ভগ্নীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ ভাঙ্গামায়া ছিল। স্নেহে হৃৎস্পর্শে শোকে তাঁদের শ্রাণ দিয়া সেবা করিয়াছেন। মাতৃসমা ভগ্নীকে হারাইয়া ভাই ভগ্নীগণ আজ শোকে ভগ্ন। আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলের তৎসাহসুস্থান করিয়া কত প্রকারের সেবা ও সাহায্য করিয়াছেন, তাঁরা বর্ণনাভীত। দাতব্য তাঁহার জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। প্রতিমাসে তিনি সহস্র টাকা দাতব্যে দান করিয়াছেন। নিয়মিত দান ও চাঁদা, সং-কর্ণে বিশেষ দান তাঁর নিত্য ক্রিয়া ছিল। রাজপথে বত দরিদ্র দেখিতেন, গাড়ী থামাইয়া তাঁহাদের হস্তে রোপা মুদ্রা দান করিতেন। প্রতিবৎসর হাসপাতালে ফল, মিষ্টান্ন ও পাখা প্রত্যেক রুগ্ন ব্যক্তিকে বিতরণ করিতেন। ব্রতাদি গ্রহণ করিয়া পরের সেবা করিতেন। বৈশাখমাসে নিয়মিত জলচ্ছত্র করিতেন। সেবিকা-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি পরের সেবা করিতেন।

তিনি স্নেহবিকা ছিলেন। ইংরাজিতে কয়েকখানি স্মৃদর বই লিখিয়াছেন। নিজ জীবনীও তাঁহার সহজ ও সুমধুর ভাষায় লিখিয়াছেন। বাঙ্গলাতে কত গান রচনা করিয়া পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করাইয়াছেন। তিনি বিভিন্ন দেশে গমন করিয়া উৎসব করিয়াছেন। দার্জিলিংএ “মহারানীকুল” তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। “ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন” তিনিই রক্ষা করিয়াছিলেন, অবশেষে কমলকুটার ক্রয় করিয়া স্কুলের জন্ম দান করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কত সংকর্ষণ ঘে হইরাছে, তাহা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সর্বোপরি তাঁহার ভগবৎপ্রীতি তাঁহাকে নারীকুলভূষণ, সমাজের শীর্ষস্থানীয়া, সত্যী সাধনী আখ্যায়িকা নামে চির উজ্জল করিয়াছে। তিনি চিরদিন বাঙ্গলা বুক বাঙ্গালী রমণীর আদর্শরূপে চির প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

শ্রীমতিকা মহলানবিশ।

## উৎসব।

( ১ )

বালেশ্বর উৎকল নববিধানসমাজের চতুঃষষ্টিতম

সাংস্কৃতিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

মা বিধানজননীর কৃপায়, বালেশ্বরে, ৮ই জুলাই হইতে ১৫ই পর্যন্ত ৮দিনব্যাপী উৎসব হইরাছে। প্রথমতঃ বারিগদা হইতে ভাই নগেন্দ্রনাথ ও কলিকাতা হইতে ভাই অখিলচন্দ্র আসিয়া

উৎসবে বৃত্ত হন ; পরে ভাই প্রিয়নাথ সঙ্গীক আসিয়া যোগদান করেন। ৮ই ব্রহ্মমন্দিরে উদ্বোধন, ত্রিযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা উৎকল ভাষায় সংক্ষেপে উপাসনা করেন। ৯ই সাংকালে ব্রহ্ম-মন্দিরে ত্রিযুক্ত বরদাপ্রসাদ বর্দ্ধন উপাসনা করেন, পরে সংপ্রসঙ্গ হয়। ১০ই সিদ্ধিয়ার ত্রিযুক্ত ভাগবত বিশালের মঠে আলোচনা দি হয়। ১১ই পুরাণ বালেশ্বরের চুনপাড়া মঠে, সংকীর্তন, উপাসনা ও হিন্দুধর্মের সারভূষ বিষয়ে আলোচনা এবং প্রীতিভোজন হয়। ১২ই ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদের উৎসব, ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন ও মহিলারাই সঙ্গীত করেন ; প্রীতিভোজনাগ্নে পল্লিবাসিনীগণ ভাই নগেন্দ্রনাথের সহিত ধর্মের তত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। সাং সংকীর্তনের উপাসনার ত্রিযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা নেতৃত্ব করেন, শেষাংশে ভাই অখিলচন্দ্র রায় মহোৎসবের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। ১৩ই সমস্তদিনব্যাপী উৎসব, ১০টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়, ভ্রাতা গোবিন্দ পাণ্ডা ও ভাই নগেন্দ্রনাথ সংগীত করেন এবং ভাই অখিলচন্দ্র রায় বেদীর কার্য করেন। আচার্যের দৈনিক প্রার্থনা হইতে “নবসন্ন্যাসধর্ম” প্রার্থনা পাঠ করেন ও আত্মত্যাগ বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। অল্প অপরাহ্নে ভাই প্রিয়নাথ, ভাই অখিলচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ প্রার্থনাসঙ্গে ত্রিপুরবারের মিলন সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করেন। সাংকালে ভাই প্রিয়নাথ সঙ্গীক উপাসনা করেন এবং নববিধানের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আত্ম-নিবেদন করেন। নববিধানের নূতনত্বের গভীর বিষয়গুলিকে সহজ ভাষায় বর্ণনা করেন। ১৪ই প্রাতে ১০টার সময় উপা-সনার প্রথমার্ধ ভাই প্রিয়নাথ সম্পন্ন করিলে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় সিদ্ধিয়ারিবাসী ত্রিযুক্ত ভাগবত বিশালকে নবসংহিতাহুসারে যথাবিধি দীক্ষা দান করেন। শেষাংশে ভাই প্রিয়নাথ দীক্ষার্থীকে নববিধানের আদর্শচরিত্রসাধনই দীক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া শাস্তি-বাচন করেন। সাংকালে ব্রহ্মমন্দির হইতে প্রার্থনা করিয়া নগরকীর্তন বাহির হয় এবং যতিগঞ্জবাজারে বাইলে, ত্রিযুক্ত বরদা-প্রসাদ বর্দ্ধন উড়িয়া ভাষায় সহজ ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ভাই অখিলচন্দ্র বক্তৃতা আরম্ভ করিলেই প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। তৎপরে বারবাটা প্রভৃতি স্থানে উচ্চকণ্ঠে কীর্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রায় ১২টার ব্রহ্মমন্দিরে প্রত্যাগমন করিলে, ভাই অখিলচন্দ্র রায় কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করেন। কীর্তনান্তে প্রীতিভোজন হয়। ১৫ই প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরেই ভাই প্রিয়নাথ, ভাই নগেন্দ্রনাথ ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় সমযোগে উপাসনা করেন। ভাই প্রিয়নাথ শেষাংশে প্রার্থনাপাঠাদি ও শাস্তিবাচন করেন। অদ্যই সাংকালে ভাই প্রিয়নাথ সঙ্গীক হাওড়ায় গমন করেন, এবং অদ্য সাংকালে ব্রহ্মমন্দিরেই উৎকল নববিধান সমাজের বার্ষিক অধিবেশনে ভাই অখিলচন্দ্র রায় সভাপতির কার্য করেন, সহকারী সম্পাদক কর্তৃক গত বৎসরের রিপোর্ট ও হিসাবাদি পঠিত হইলে, সর্ব-

সম্মতিতে বর্তমান বর্ষের জন্ম পুনরায় কার্যনির্বাহক সভা গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর বিশাল সম্পাদক, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। গতবর্ষে অধ্যক্ষ-সভার কোন অধিবেশন হয় নাই, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকই সমাজের কার্যাদি নিজেদের দারিত্রে সম্পন্ন করিয়াছেন; একজন অধ্যক্ষসভার কোন কোন সভা দ্ব্যং প্রকাশ করিয়াছেন, এবং অদ্যকার সভাপতিও তাহাতে যোগদান করেন। তৎপর শাস্তিবাচন হয়। এবার এই উৎসবে সভাই মার অজস্র আশীর্বাদ ও অর্গের প্রসাদলাভে সবাঞ্ছা ও সপরিবারে আশ্রয় কৃতার্থ হইয়াছি। শান্তি: শান্তি: শান্তি:!

বিনীত সেবক—শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

( ২ )

বারিপদা ( ময়ূরভঞ্জ ) নববিধান ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম

সাংস্করিক উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

নববিধানজননীর কুপায়, বিগত ২৫শে জুলাই হইতে ২৮শে পর্যন্ত চারিদিনব্যাপী বারিপদা নববিধানমন্দিরের অষ্টম সাংস্করিক উৎসব হইয়াছে। এই উপলক্ষে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সপরিবারে ও ভাই অখিলচন্দ্র বার বারিপদার গমন করেন।

২৫শে জুলাই, সায়ংকালে উৎসবের আরতির মধুর সংকীর্তনটী ভাই নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গীত হয় এবং ভাই প্রিয়নাথ ভাবযোগে আচার্য্যদেবের আরতি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। অনেকগুলি স্থানীয় বন্ধু ও ভক্তমহিলা যোগদান করেন।

২৬শে জুলাই, বারিপদা ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠার সাংস্করিক উপলক্ষে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে ৯টার ভাই নগেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সংগীত হটলে, ভাই অখিলচন্দ্র বেদীর কার্য করেন, এবং “সর্বস্বজনান ভ্রাতৃয়ে ও ভগিনীত্বের মধ্যে স্বর্গদর্শন এবং প্রেমময়ী মার বক্ষে পাপী সাধু সকলের মিলন”, এই বিষয়ে নিবেদন করেন। ভাই প্রিয়নাথ ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন। এই উপাসনার শেষাংশে বালেশ্বর হইতে ভক্ত গায়ক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডা সদলে আসিয়া যোগ দেন। মধ্যাহ্নে বিনয়কুটীরে প্রীতিভোজন হয়। অপরাহ্নে ঠাট্টা হইতে ঠাট্টা পর্যন্ত গভীর আলোচনা ও পাঠাদি হয়। সন্ধ্যার জমাট সংকীর্তনান্তে ভাই প্রিয়নাথ বেদীর কার্য করেন। ইনিও পূর্ব ভক্তিভাবে মাতৃপূজার সাধক সাধিকাদিগকে স্মরণ করেন। তিনি আত্মনিবেদনে, ৮বৎসর মনে পূর্বে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা ও এই রাজ্যের স্বর্গীয় মহারাজ শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদেও বাহাদুরের ধর্মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, অকিঞ্চনতা, প্রজাবাৎসল্য এবং বর্তমান রাজসীতা মহারাণী শ্রীমতী সুচাক্র দেবীর নববিধানসাধন ও প্রচার এবং এই রাজ্যে নব-বিধানের জন্ম তাহার উৎসাহ ও ত্যাগের বিষয় প্রকাশ করেন। বর্তমান নববিধান মহাপ্রেমের বিধান, এই বিধান প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শনের কথাও ব্যক্ত করেন। পূর্ব জমাট ভাবের সহিত রাজ্য প্রায় ১০টার উপাসনা শেষ হয়।

২৭শে জুলাই, প্রাতে যাত্রিনিবাসেই উৎসব ও বেলা ১০টার সময় পূর্ণচন্দ্রপুর পাঠশালায় উৎসব হয়। খোন্দা মাঠের মধ্যে পাঠশালার পূর্ণকুটীরে উৎসব হয়। প্রকৃতিমাতার কোমল ক্রোড়ে পুত্রকৃত্যগণ তাঁর গুণগানে যোহিত হন। এই পাঠশালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিনোহন দাস উড়িয়া ভাষায় উপাসনা করেন, উড়িয়া ভাষায় কয়েকটি মধুর সঙ্গীত হয়; ভাই প্রিয়নাথ আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে “দীনসেবা” বিষয়টি ভক্তি-ভাবে আবৃত্তি করিয়া, বিগণিতপ্রাণে শাস্তিবাচন করেন। ভাই নগেন্দ্রনাথও উচ্ছ্বসিতপ্রাণে, এখানে মারের অপূর্ণ প্রেমের লীলার জন্ম কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়া কাতর প্রার্থনা করেন। এই উৎসবে উৎসবের যাত্রী, স্থানীয় বিশ্বাসিগণ এবং দরিদ্র হরিজন ছাত্র ছাত্রী প্রায় শতাধিক যোগদান করেন। সায়ং ৭টার সময় বারিপদা ব্রহ্মমন্দির হইতে নগরসংকীর্তন আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ আচার্য্যের প্রার্থনা হইতে সমধোপযোগী প্রার্থনা আবৃত্তি করিলে, মহা উৎসাহে কীর্তনকারী ভক্তদল ব্রহ্ম-মন্দির হইতে বাহির হন, এবং সঙ্গীতাচার্য্যের রচিত “নববিধান-মিলনতানে, অনন্তরজরগানে” কীর্তনটী গাহিতে গাহিতে বারিপদা মিউনিসিপ্যাল বাজারের সম্মুখে আসিলে, সেবক ভাই অখিলচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে বিশ্বনাথের দর্শন বে সহজ, তিনি পাপী তাপী সকল সন্তানকে দেখা দিবার জন্ম ব্যক্ত, তাঁর মহাপ্রসন্ন এবং স্বর্গ মর্ত এক হয়েছে, মহানন্দ সাজবন্ধকে প্রেমালিঙ্গন দিচ্ছেন, আমরা আর কাহাকেও ছাড়িতে পারিবনা ইত্যাদি, স্বর্গীয় প্রেমের মূর্তি মহা উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন। তৎপরে “কি সুখে মিলনভার, বহিবে বল আর” এই সংকীর্তনটী করিতে করিতে বারিপদা হইয়া, সেখানে রাজবাড়ীর ২য় ও ৩য় প্রকোষ্ঠে প্রায় একঘণ্টা কাল সংকীর্তন হয়। মহারাজের খুশুতাত তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ও রাজান্তঃপুরের মহিলাগণ ভক্তিসহকারে ব্রহ্মগুণকীর্তন প্রবণ করিয়াছিলেন। এখানে আসিলেই সেই গুণ্যক ব্রহ্ম-ভক্ত স্বর্গীয় মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদেওর অমর্য্য দিব্যমুখিত অন্তরে জাগিয়া উঠে। তৎপরে নগর ভ্রমণ করিয়া কীর্তনের দল ভাই নগেন্দ্রনাথের সংসারপ্রম বিনয়কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া, মহামত্ততার সহিত সংকীর্তন করিয়াছিলেন। পরিশেষে ভাই অখিলচন্দ্র মত্ততার আবেগে প্রার্থনা করিলেন, কীর্তনান্তে প্রীতিভোজন হয়। এই প্রীতিভোজন ও সেবা আরোজনে ভাই নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা বধু শ্রীমতী আত্মময়ী ও কস্তা শ্রীমতী বনলতা মাতৃবেশে আবুল হয়ে, শ্রান্ত ক্লান্ত সন্তানদের সেবাভ্রমণ তাহাদিগকে পরম আশ্বাসিত করেন।

২৮শে জুলাই, প্রাতে ৯টার ব্রহ্মমন্দিরে, শাস্তিবাচনের উপা-সনা ভাই প্রিয়নাথ করেন। ভাই নগেন্দ্রনাথ প্রার্থনা করেন। তৎপর শাস্তিবাচনের প্রার্থনা পঠিত হইয়া, কাতর প্রার্থনার সহিত উৎসবের কার্য শেষ হয়। শান্তি: শান্তি: শান্তি:!

শ্রীঅখিলচন্দ্র রায়।

## চতুঃষষ্ঠিতম ভাদ্রোৎসবের কার্য্যবিবরণ।

অমরা উৎসবানন্দদায়িনী পরমজ্ঞানী শ্রীপদে প্রণাম করিয়া, অধারকার ভাদ্রোৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৩, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪০, মঙ্গলবার, ভক্তি-ভাজন ভাই গিরিশচন্দ্র সেমের স্বর্গারোহণের সাধ্বৎসরিক। প্রাতে ৭টা, নবদেবালয়ে এই উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তাঁহার আত্মজীবনী হইতে তাঁহার জীবনের স্বর্গীয় নিয়োগ বিষয়ে পাঠ হয়। তাঁহার ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠ জীবন গ্রহণ সম্পর্কে প্রার্থনা হয়। সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মন্দীরে প্রসঙ্গ হয়। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আচার্য্যদেবকৃত একটি প্রার্থনা-পাঠান্তে, লিখে প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপর স্বর্গগত ভাই গিরিশচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ হয়।

১৬ই আগষ্ট, বুধবার, সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মন্দীরে পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়। শ্রীযুক্ত দেবেশনাথ বসু ও ভাই অখিলচন্দ্র রায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ হইতে পাঠ করেন। তৎপর ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাধ্যায়কৃত শ্রীকৃষ্ণের জীবনী অবলম্বনে প্রসঙ্গ করেন।

১৭ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, শ্রীমৎ পরমহংসদেবের স্বর্গারোহণ-সাধ্বৎসরিক। প্রাতে ৭টা নবদেবালয়ে এই উপলক্ষে উপাসনা ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক সম্পন্ন করেন। সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মন্দীরে প্রসঙ্গ হয়। প্রথমে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক আচার্য্যদেবের একটি প্রার্থনা পাঠ করিয়া, উপস্থিত সকলকে প্রসঙ্গ করিবার জন্ত আহ্বান করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত পরমহংসদেবের জীবনী অবলম্বনে দীর্ঘ প্রসঙ্গ করেন। ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক পরমহংসদেবের সদসহায়তা যোগে প্রাপ্ত আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া প্রার্থনা করিলে, অধ্যকার কার্য্য শেষ হয়। স্রোতারূপে পরমহংসদেবের দলের কেহ যে প্রসঙ্গে বোগদান করিয়া ছিলেন।

১৮ই আগষ্ট, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মন্দীরে মহিলাদিগের অঙ্গ উপাসনা। মাননীয় মহারানী শ্রীমতী স্রোতা দেবী স্মৃতি ভাদ্রোৎসবের উপাসনার কার্য্য করেন। এবার অনেকই উপাসনার বোগদান করিয়াছিলেন।

১৯শে আগষ্ট, শনিবার, প্রাতে ৭টা নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। ২০শে আগষ্ট, জেনারেল যুধের স্বর্গারোহণের সাধ্বৎসরিক দিন, রবিবার হওরায়, অন্য সন্ধ্যা ৭টার ব্রহ্মন্দীরে মুক্তিফৌজদের প্রার্থনা ও বক্তৃতা হয়। ব্রহ্মন্দীরে সকলে সমবেত হইলে, শ্রীযুক্ত দেবেশনাথ বসু ইংরেজিতে মুক্তিফৌজদের সাদর অভ্যর্থনা করেন। তৎপর মুক্তিফৌজদের লোকেরা পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্মার প্রার্থনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতা করেন।

২০শে আগষ্ট, রবিবার, সমস্তদিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে

৮টার বিধানমুরলী শ্রীমানসতোজ্ঞনাথ দত্তের নেতৃত্বে কীর্ত্তন হয়। তৎপর ৮টার উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উদ্বোধন, আরাধনা, পাঠ প্রসঙ্গাদির কার্য্য করেন। “নমো দেব নমো দেব” শেষ কীর্ত্তনটা হইয়া প্রায় ১১টার এ বেলায় কার্য্য শেষ হয়। এ বেলায় পাঠ ও আত্মনিবেদনে বিশেষ এই কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ হয়। পুরাতন কিছু লইয়া লোকের ত্রাণে বার্থ আনন্দ লাভ হয় না। ভাই উৎসবের বিশেষ লক্ষণ এই, সেখানে সকলই নূতন। বাহিরে মন্দিরের সাজ সজ্জা যেমন নূতন, তেমনই উৎসবে ঈশ্বরের দর্শন নূতন, তাঁহা হইতে প্রেরণা নূতন, শিক্ষা নূতন, তাঁহার বাণী-শ্রবণ নূতন, তাঁহা হইতে প্রসাদগ্রহণ নূতন, সবই নূতন ভাবে নূতন বাপার। ভাদ্রোৎসব বাপার ব্রহ্মন্দীর প্রতিষ্ঠা ও নবযুগে নব উপাসনা-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ করিয়া। “সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মন্দীরম্”—আমাদের স্বার্থ উপাসনামন্দির কোম সীমাতে আবদ্ধ নয়; অনন্তের উপাসনা—জাতিবর্ণনির্ধিষেয় সকল ধর্মসম্প্রদায় ও বিশ্বমানবকে লইয়া উপাসনা সীমাবদ্ধ কোন কিছুতে সম্ভব হয় না। তবে আমাদের এই ইট ফাঠের ব্রহ্মন্দীর সেই সীমাহীন ব্রহ্মন্দীরের প্রতিকৃতিরূপেই বিদ্যমান। এই ব্রহ্মন্দীরকে সেই সীমাহীন ব্রহ্মন্দীরের প্রতিকৃতি রূপে স্বীকার করিতে হইবে। সব যুগে নববিধানের নবব্রহ্মের উপাসনার পূর্ণ পশ্চিমের সর্ব্ব ধর্মের বিশেষ সংযোগ আমরা দেখিতে পাই। ভারতের ব্রহ্মদর্শন-যোগ এবং এতাহিম হইতে যুগ, ঈশা ও মহম্মদের জীবনের ব্রহ্ম-বাণী শ্রবণ-যোগ মিলিত হইয়া বর্তমান বিধানের মহা উপাসনা। এই উপাসনা-মন্দির পান করিয়া প্রমত্ত হইবার জন্ত বেদী হইতে বিশেষ অহুতোধ জ্ঞাপন করা হয়।

অপরাহ্ন ৩টার মাধ্যমিক উপাসনা ভাই অখিলচন্দ্র রায় নির্বাহ করেন। তৎপর পাঠ ও প্রসঙ্গ হয়। প্রথমে শ্রীযুক্ত যতীজ্ঞনাথ মিত্র “ঈশ্বর আবৃত, না অনাবৃত” এ উপদেশটি পাঠ করেন। “ঈশ্বর আবৃত, না অনাবৃত” বিষয়ে বলিবার জন্ত ভাই গোপালচন্দ্র গুহকে অনুরোধ করা হয়। তিনি বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বদাই স্বপ্রকাশ, তিনি শুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব হইয়া সর্ব্বদা সত্য প্রকাশিত হইয়াই আছেন; তাই তিনি অনাবৃত। তবে তিনি সাংসারিক বিষয়াসক্ত লোকের নিকট আবৃত। আমরা সাধারণতঃ এবং স্বভাবতঃ ভূমিষ্ট হওয়ার পর পৃথিবীর পিতামাতাকে চিনিয়া লই, তৎপর দূর নিকট অজ্ঞাত আত্মীয় বান্ধবগণকে চিনিয়া লই, পৃথিবীর খাওয়া পরার বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করি, তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হই। বাহ্যে দ্রিয়-যোগে বাহ্য বস্তু দর্শন করি ও গ্রহণ করি। এ অবস্থায় ঈশ্বরকে চিনিতেও পারি না, দর্শনও করিতে পারি না। তাই এ অবস্থায় ঈশ্বর আমাদের নিকট সম্পূর্ণ আবৃত। ঈশ্বরকে চিনিবার জন্ত অন্তরেত্বের বিকাশ প্রয়োজন। তাই ভারতের

কবিয়ুগে বালক এবং যুবক শিবাগণকে বাহিরের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে, পরাবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মের পরিচয় শিক্ষা দেওয়া হইত। অন্তরের চক্ষুর বিকাশের জন্য, ব্রহ্মক্ষুরণ অন্তরে প্রাপ্তির জন্য, সংস্কার বাস, সংগ্রহ পাঠ, সাংখ্যিক ভাবে খাওয়া পরা, ক্রমে স্মরণ, মনন ইত্যাদি প্রয়োজন। যতই আমাদের আত্মার চক্ষু বিকাশ লাভ করিবে, ততই ঈশ্বরের প্রকাশ ক্রমে অধিকতর-রূপে আমাদের মধ্যে সম্ভব হইবে। ততই আমাদের নিকট ঈশ্বর অনাবৃত হইবেন। তপস্যা ও সাধনের ফলে সাধকের নিকট ঈশ্বর বিরূপ অনাবৃত, বিরূপ তাঁহার সর্বগ্রাসী প্রকাশ সার্বক উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা করেকটী ঋষি-জীবনের ব্রহ্মদর্শনমূলক স্লোক উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন করেন। ঈশ্বর যত আমাদের নিকট অনাবৃত করেন, তাঁহার প্রকাশে আমরাও প্রকাশিত হই, অন্তর্গত আমরাও আমাদের নিকট আবৃত। “তমেব ভাস্কর্যম্ অহুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।” ঈশ্বরের জ্যোতিতে সকলই জ্যোতিমান্ তাঁহার প্রকাশে সকলই প্রকাশিত। অতএব ঈশ্বর আবৃত ও অনাবৃত, একথা কেবল জীবের উপলব্ধির তারতম্যেই কথিত হইয়া থাকে। অন্তর্গত ঈশ্বর সর্বদাই স্বপ্রকাশ, সর্বদাই অনাবৃত। তৎপর পূর্বাঙ্কুর উপাসনা ও বেদী হইতে প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বনে প্রসঙ্গ হয়। ত্রিযুক্ত বিনোদবিহারী মিত্র, ত্রিযুক্ত প্রেমেন্দ্র রায়, ত্রিযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র মিত্র ক্রমে সে বিষয়ে প্রসঙ্গ করেন। সকাল বেলায় উপদেশের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবানীশ্রবণ, এই বিষয়ে বিশেষ কথাবার্তা হওয়ার পর, এই বিষয়ের বিশদ-ব্যাখ্যা-মূলক “ব্রহ্মধর্মের অর্থ” শীর্ষক আচার্য্যদেবের উপদেশটী ত্রিযুক্ত অম্বকুলচন্দ্র মিত্র পাঠ করেন। তৎপর ধ্যানের উদ্বোধনান্তে ধ্যান ও প্রার্থনা হয়। তাই গোপালচন্দ্র গুহ ধ্যানের উদ্বোধন করিলে ধ্যান হয়। ধ্যানান্তে প্রার্থনা করেন। তৎপর ৬টার পর কীর্তন আরম্ভ হইয়া ৭টা পর্যন্ত কীর্তন হয়। বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কীর্তনে নেতৃত্ব করেন। কীর্তনান্তে ডাক্তার প্রেমেন্দ্রের বহু বেদী গ্রহণ করিয়া এ বেলায় উপাসনার কার্য্য করেন, এবং বেদী হইতে সারগর্ভ কদম্বগ্রাহী উপদেশ দান করেন। “ব্রহ্মোক্তি পরমাশ্রুতি ভগবান্ভি শব্দতে” এই স্লোকটী অবলম্বনে, বেদে ব্রহ্ম, উপনিষদে পরমাশ্রুতি, পুরাণে ভগবান্ একেরই ক্রমিক ত্রিবিধ প্রকাশ বর্ণন করিয়া, ধর্মপিতামহ রামমোহনের জীবনে ব্রহ্মভাব, ধর্মপিতা দেবেন্দ্রনাথের জীবনে পরমাশ্রুতির ভাব, এবং আমাদের ধর্মনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে গীতার ভাব, ভগবদ্ভাব বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়া, কিরূপে নববিধানের সমন্বয়ধর্ম সংস্থাপিত হইল, তাহা তিনি এই তিন জীবনের সাধন-সম্পদ উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করেন।

(ক্রমশঃ) ।

## সংবাদ ।

পারলৌকিক—আমরা গতীয় দুঃখের সহিত নিম্ন-লিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—

চুঁচুঁড়ার আটানা লেডী ডাক্তার শ্রীমতী হৈমবতী সেন, বিগত ৫ই আগষ্ট, নব্বয় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর পুত্রকৃত-দিগের আগ্রহে, গত ১২শে আগষ্ট, শনিবার অপরাহ্ন ৫টার সময়, তাঁর বাড়ীতে শ্রদ্ধের তাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা ও স্বর্গীয়া মাতৃ-আত্মার প্রতি প্রদীপ্তি করেন। স্বর্গীয়া হৈমবতী সেন অতি দয়াবতী ও পরহঃখকাতরা ছিলেন।

স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্তের সহধর্মিণী, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের স্বকুমারী ত্রিযুক্তা শরৎকুমারী গুপ্ত ৬৮ বৎসর বয়সে, আগষ্টের মধ্যভাগে, কলিকাতার স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

বিধানজনননী তাঁর কন্যাদয়কে পরলোকে তাঁর শান্তিময় শ্রীচরণে স্থান দান করুন এবং শোকাক্ত জনগণের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সাধনা বিধান করুন।

ব্রহ্মমন্দিরপ্রতিষ্ঠার সাংসংসরিক—বিগত ২৪শে আগষ্ট, চুঁচুঁড়া ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার সাংসংসরিক উপলক্ষে, ঐ মন্দিরে অপরাহ্নে ৫টা হইতে সংকীর্তন, পাঠ ও বিশেষ উপাসনা হয়। তাই অখিলচন্দ্র রায় বেদীর কার্য্য করেন। এখানকার সমাজ-মন্দির-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শ্রীমদাচার্য্যদেব ৫৮ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৮৭৫খৃঃ “ধর্মসাধন—তীর্থযাত্রা” বিষয়ে যে স্মরণ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করা হয়। চন্দ্রনগর হইতে দুই ভক্তিপিপাসু বন্ধু ও স্থানীয় ৮৯টা ব্রাহ্মসাম্প্রদায়িক বোম্বা দিয়া সংগীত ও সংকীর্তন করিয়া উৎসবকে বেশ জমাত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ভক্ত ডাঃ নকুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাতর প্রার্থনায় তাঁর আত্মত্যাগের নিদর্শন-স্বরূপ স্মরণ মন্দিরটী আজও বিখ্যাসীদিগের সাধনার স্থান হইয়া আছে।

সাংসংসরিক—গত ২১শে আগষ্ট, বাকিপুরে, সাংসংসরিক উপাধার মহাশয়ের পৌত্রী, স্বর্গীয় অমৃতানন্দ রায়ের কন্যা শ্রীমতী চিত্ততোষিণী ও জামাতা শ্রীমান্ পূর্ণানন্দ মিত্রের গৃহে, ভক্তিভাজন তাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের (চিত্ততোষিণীদেব বড় আদরের বড়দাদা) সাংসংসরিক দিনে বিহার আশুভাগে ব্রহ্মোক্তির শ্রীমদ্বিগ্ণাশ্রী ত্রিযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন উপাসনা করেন।

গত ২৪শে আগষ্ট, বিধানবিখ্যাসী ধর্মনিষ্ঠ স্বর্গীয় রমণীকান্ত চন্দ্রের সাংসংসরিক দিনে, কলিকাতার ১৫বি, রাজা-বাজার স্ট্রীটে শ্রীমতী অশোকলতা দাসের গৃহে তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। রাঁচিতে সহধর্মিণী শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্রের গৃহে এবং পাটনার শ্রীমতী বনলতা দেব গৃহেও বিশেষ উপাসনাদি হয়। এই উপলক্ষে শ্রীমতী অশোকলতা দাস ভাস্কোৎসবে ২২ টাকা দান করিয়াছেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, “নববিধান প্রেসে”  
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।





# ধর্মতত্ত্ব

অবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ সুনিস্কলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনধরম্॥  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ।

১শ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন, রবিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

17th. September, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## প্রার্থনা :

হে জীবের ভাগ্যবিধাতা পরম দেবতা, হে জগৎ-পালিনী পরমা জননী! তোমার বিচিত্র জগতের বিচিত্র নীল ভনয় দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাই। কোন ঘরে সম্ভানের শুভ জন্মোৎসবে শঙ্খধ্বনি, কোন ঘরে সম্ভানের অকাল মৃত্যুতে বিলাপ ও ক্রন্দন, কোন ঘরে ধনৈশ্বর্য্যর বিপুল প্রাচুর্য্য, কোন ঘরে দুঃখ দৈন্তের অসহ্য কশাঘাত। কোন সাধু উপদেশ-বাক্য বলিয়া গেলে “বাহারা আনন্দ করে, তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হও; বাহারা ক্রন্দন করে, তাহাদের সহিত ক্রন্দন কর।” তোমার নববিধানের নবভক্তেরও বাণী ঐরূপ, একই সময়ে বিবাহোৎসবের বাড়ীতে বিবাহোৎসবের আনন্দের অমুষ্ঠান আনন্দের সহিত সম্পন্ন কর, আবার সেই সময়ে মরণের শোক বিলাপের বাড়ীতে শোকের অমুষ্ঠান শোকাকর্ষুহৃদয়ে সম্পন্ন কর; ইহা যদি তুমি না পার, তবে তুমি নববিধানের সেবকের উপযুক্ত নও।” যত এই সকল উপদেশের বাণী প্রাণকে স্পর্শ করে, যত সেরূপ ঘটনার সঙ্গে জীবন সাক্ষাৎ ভাবে বিজড়িত হয়, নিজের অযোগ্যতা, অপ্রস্তুতি স্মরণ করিয়া সময়ে সময়ে মন খুবই ভীত হয়। প্রাণ বলে, দেশের সঙ্গে

তেমন একপ্রাণতা সাধন হইয়াছে কৈ? তেমন সকলের সঙ্গে জীবন্ত সহানুভূতি কৈ? তেমন উদারতা ও প্রীতির সরলতা কৈ? তেমন পরদুঃখ-কাতরতা কৈ? কিন্তু বুঝিয়াছি, হৃদয় মনের অভাব, অপ্রস্তুতি দেখিয়া তোমার শরণাপন্ন হইলে, তুমি অভাব ও অপ্রস্তুতি রাখ না; তুমি হৃদয় মনের সকল প্রস্তুতি বিধান করিয়া, যাহা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয় মনে করি, তাহা সম্ভব করিয়া তুমি অনায়াসে আমাদের দ্বারা করাইয়া লও। তাই তোমার কৃপাই আমাদের জীবনপথে, জীবনের গুরুতর কর্তব্য-পথে একমাত্র ভরসা। এই যে বঙ্গে দুর্গোৎসবের সময় উপস্থিত হইতেছে, এ সময় অনেক পরিবারে, অনেকের ঘরে, যে ভাবেই হউক, যে প্রাণালীতেই হউক, মা, তোমার নামে আনন্দের উৎসব হইবে। আবার দুঃখে, দৈন্তে, রোগে, শোকে, নানা গুরুতর পরীক্ষার আঘাতে, বিশেষভাবে বন্ধা-প্রপীড়িত ক্ষেত্রে বন্ধার পীড়নে উৎপীড়িত বহু পরিবারের এ সময় যেন দুঃখের রাত্রি অবসান হইতে চাহে না। মা দুঃখ-বিপন্নশিশু, উৎসবানন্দদায়িনী জননি! আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এ সময় ভয়-দুঃখ-দুর্গতিনাশিনী চিন্ময়ী শ্রীদুর্গারূপে তোমার পূজা দেশের সঙ্গে দেশের সঙ্গে একপ্রাণ হইয়া করিয়া, তোমার সত্য পূজার বিমলানন্দে

মত্ত হই। বাঁহারা আনন্দের উৎসব করিবেন, তাঁহাদের সহিত আনন্দের উৎসব করি; আর বাঁহারা নানা অবস্থার পীড়নে নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনটন ও দুঃসহ দুর্গতি সহ্য করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত পূর্ণ সহানুভূতিতে একপ্রাণ, একহৃদয় হইয়া, তাঁহাদের দুঃখে দুঃখ, তাঁহাদের অভাব অনটনে অভাব অনটন অনুভব করি এবং তোমার চরণে তাঁহাদের দুঃখ দুর্গতি নিবেদন করিয়া, হে দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গা, সকল প্রকার দুর্গতি দূর করিবার জ্ঞা যেন প্রাণের সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনা করিয়া ধন্য হইতে পারি। তুমি নিজ রূপাণ্ডে সময়োপযোগী করিয়া আমাদের হৃদয় মনকে প্রস্তুত কর।

শান্তি: !

শান্তি: !!

শান্তি: !!!

— ০ —

### বঙ্গে দুর্গাপূজা।

কোন সুদূর অতীত হইতে এই আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের আনন্দোৎসব বঙ্গের ঘরে ঘরে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা সহজ নহে। কিন্তু আমাদের দীর্ঘ জীবনে আমরা বাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ও দেখিতেছি, তাহা হইতে এই বলিতে পারি, বঙ্গদেশ লারা বৎসর সুখ, দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা, জন্ম, মরণ, আশা ও আনন্দের সকল অবস্থার ভিতর দিয়া জীবন যাপন করিয়া, এই আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসবের সময় একটা ঘনীভূত জমাট বিমল সুখ, আরাম, আনন্দ লাভ ও সন্তোষ করিবার জ্ঞা, প্রাণে আশা ও উৎসাহ লইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। পরীক্ষা, বিপদ, জন্ম মরণ, শোক তাপ কাহার ঘরে না আছে? রাজার ঘরে আছে, প্রজার ঘরে আছে, ধনীর ঘরে আছে, দরিদ্রের ঘরে আছে, পণ্ডিত-মুখ-নির্বিশেষে সকলের ঘরে আছে। সারা বৎসর ঘরে ঘরে অধিকাংশ লোক কত দুঃখ দারিদ্র্য রোগ শোকের আঘাতের ভিতরে জীবন যাপন করে। অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে ও পরিবারে, বিভিন্ন ভাবে অশুভ ঘটনার নিরানন্দ যেমন আছে, শুভ অনুষ্ঠানের আনন্দও অপ্রাধিক পরিমাণে বৎসরের সকল সময় ভোগ হইয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির মধ্যে, প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় মধ্যে, মানুষের জীবনে একটা সমবেত বা দলগত জাতীয় উৎসবের সন্তোষ করিবার স্পৃহা আছে। এ স্বাভাবিক

স্পৃহা, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পৃথিবীর সকল প্রধান প্রধান জাতি বা ধর্মসম্প্রদায়, বৎসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ জাতীয় সম্মিলিত উৎসবানন্দের অনুষ্ঠান দ্বারা চরিতার্থ করিয়া থাকেন। সমস্ত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতির জাতীয় জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবানন্দের ব্যাপার এই আশ্বিনের দুর্গাপূজা। যে বাড়ীতে দেবীপূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, সে বাড়ীতে উৎসব; যে বাড়ীতে বাহিরে পূজার অনুষ্ঠান নাই, সে বাড়ীতেও উৎসব। অবস্থানুসারে প্রতি পরিবারে বালকবালিকা হইতে আরম্ভ করিয়া, সম্ভব হইলে প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সকলের জ্ঞা, নূতন বস্ত্র আসিতেছে। চাকর চাকরাণীগণও নূতন কাপড় হইতে বাদ পড়িতেছে না। বিবাহিতা কন্যাগণ, ভগ্নীগণ সমাদরে এ সময় পিতৃমাতৃগৃহে ভ্রাতৃগৃহে, আনীত হইতেছে। কত আদান প্রদানের ভিতর দিয়া শ্রীতি, স্নেহ ও আদরে পরস্পর পরস্পরকে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে কাপড়ের দোকান, খেলনার দোকান, জামা জুতার দোকান প্রভৃতিতে সর্বাপেক্ষা বিক্রয়ের উৎসব। গৃহে, পরিবারে, রাস্তায়, হাটে, বাজারে উৎসব যেন জীবন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীদুর্গার মহাপূজা ঘোষণা করিতেছে। এ সময় শোকাতুর পিতা মাতা পুত্র-শোক ভুলিয়া, স্বামিহীন পত্নী স্বামি-শোকের তীব্র আঘাত ভুলিয়া, ক্ষতিগ্রস্ত বিষয়ী গুরুতর ক্ষতির আঘাত চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, অন্ততঃ কিছু সময়ের জ্ঞা সকলের সঙ্গে এই উৎসবানন্দের ভাগীদার না হইয়াই পারিতেছে না। হিন্দুর গৃহের এই উৎসবে প্রতিবাসী মুসলমানগণও উৎসবের নূতন পোষাক পরিধান করিয়া, নূতন পোহার পানের ব্যবস্থা করিয়া, উৎসবের ভাগীদার হইয়া প্রাণে গুঢ় উৎসবানন্দ সন্তোষ করেন। বঙ্গে এ উৎসব, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়নির্বিশেষে, কোন না কোন আকারে সার্বভৌমিক উৎসব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জো হইল প্রতিবৎসরের দুর্গোৎসব সময়ের সাধারণ চিত্র। কিন্তু বর্তমান বৎসরে বঙ্গ ভারতের জীবন পূর্ব হইতেই নানা দুঃখ দৈন্যে, অভাব অনটনে, গুরুতর পরীক্ষার পীড়নে প্রপীড়িত; তাহার উপর জানিনা, বিধাতার কি শাসন বা কি শিক্ষা উপলক্ষে, এ বৎসর যতই বঙ্গে দুর্গাপূজার দিন সমাগত হইতেছে, বঙ্গের নানা স্থানে প্রবল বন্যা উপস্থিত হইয়া লোকের হৃদশা, দুঃখ

স্বয়ংক্রিয় বুদ্ধি করিতেছে। বঙ্গদেশ এই মহোৎসবের প্রাকালে মহাশোকের ও দুঃখের পরিচ্ছন্ন পরিয়া হাহা-কার করিতেছে। অতএব এ বৎসরই যথার্থ প্রাণ ভরিয়া দুর্গতিনাশিনী মহাদেবীকে ডাকিবার দিন। এ বৎসর যথার্থ দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গার পূজা বন্দনা করিয়া, তাঁহা হইতে বল, শক্তি, উপায়, আশা ও আনন্দ লাভ করিবার দিন। কিন্তু বঙ্গের অধিকাংশ নরনারী তো বহুকাল হইতে মায়ের যথার্থ পূজা ভুলিয়া গিয়াছে।

এই দুর্গোৎসবের সময় মা চিন্ময়ী দুর্গাকে সম্মুখে রাখিয়া, মা দুর্গার চরণতলে বসিয়া, করজ্ঞন নরনারী নিজ জীবনের অথবা গৃহ পরিবারের যথার্থ দুর্গতির জন্ম জননীর চরণে প্রাণের ক্রন্দন জ্ঞাপন করে? করজ্ঞন ব্যাকুলান্তরে যথার্থ দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্ম প্রাণের ক্রন্দন জানায়? দুর্গোৎসবের সময় বঙ্গের ঘরে ঘরে কেবল আহার পানের আমোদ, পয়ণ পরিচ্ছদের আমোদ, নৃত্য গীতের আমোদ। সাধারণতঃ এই ভাবেই বহু দিন হইতে বঙ্গের দুর্গোৎসবের আমোদ সন্তোষ হইয়া আসিতেছে। কোন কোন গৃহে নির্দোষ ছাগ, মেঘ, মহিষাদির বলিদানেরও ব্যবস্থা আছে। যথার্থ চিন্ময়ী দেবীর পূজা বঙ্গদেশে হইতেছে না এবং যথার্থ চিন্ময়ী দুর্গাপূজার ফললাভও হইতেছে না। তাই কবি গাইলেন—“শক্তি-পূজা স্থার কথা মা; যদি কথার কথা হতো, তবে এ ভারত শক্তি পূজে শক্তিহীন হতো না।”

আমরা নববিধানের লোক; যথার্থ চিন্ময়ী দুর্গা-পূজার সন্ধান আমরা পাইয়াছি। দুর্গতিনাশিনী চিন্ময়ী দুর্গার পূজা আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রধানতঃ চিন্ময়ী দুর্গাপূজা এখনও কেবল ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও আপন মণ্ডলীগত সাধন ও সন্তোষের ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে। শক্তি-জায়িনী, জ্ঞানদায়িনী, শুভবুদ্ধিদায়িনী ও সকল সঙ্কট হইতে মুক্তিদায়িনী জননী তিনি; তাঁহার নিকট আমাদের ব্যক্তিগত ক্রন্দন জানাইতে আমরা একটু শিথিয়াছি, একটু অভ্যস্ত হইয়াছি। দেশের জন্ম, দেশের জন্ম তেমন ব্যাকুল প্রার্থনা লইয়া তাঁহার চরণতলে উপস্থিত হই কই? আত্মন, আমরা মণ্ডলীর ভাই ভগ্নীগণ সকলে মিলিত হইয়া, এসময় আপনাকে ভুলিয়া, দেশের জন্ম, দেশের জন্ম, চিন্ময়ী দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গার পূজা করি; দেশের এবং দেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্ম তাঁহার চরণে

প্রাণের প্রার্থনা জানাই। আমাদের সকল আশা ও ভরসা কেবল তাঁহারই চরণে। তাঁহার পূজা করিয়া, সত্য ভাবে তাঁহাকে ডাকিয়া, সত্য প্রার্থনা তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া, সদা ফল লাভ করি; আশা, বিশ্বাসে ও বিক্রমে আমরা পূর্ণ হই, এবং দেশের নিকট চিন্ময়ী দুর্গাপূজার সুসংবাদ ঘোষণা করিয়া, প্রচার করিয়া, আমরা ধন্য হই।

## ধর্মতত্ত্ব।

ধর্মের বিধি, সংসারের রীতি।

ধর্ম বলেন, “ঈশ্বরকে ও চাও, যাঁহা পাইবার সকলই পাইবে।” “সর্ব প্রথমে স্বর্গরাজ্য অনুসন্ধান কর, পরে সংসারের বাবতীর অভাব পূরণ হইবে।” কিন্তু সংসার বলেন, “আগে পেটের চিন্তা, তারপর ধর্মকর্ম।” জীবনের পরীক্ষার ধর্মের বিশিষ্ট সর্বথা জয়যুক্ত হইতে দেখিরাছি। যাঁহারা সংসারের রীতি অনুসরণ করেন, তাঁহাদের পেটের চিন্তা কখনই বুড়ে মা, ধর্ম কর্ম করিবারও সময় হয় না।

নববিধানের “আমি”।

নববিধানের “আমি” দৃশ্যমান একজন “আমি” হইলেও, তাঁহার সঙ্গে বহুজন “আমরা” সংযুক্ত। অর্থাৎ নববিধানে স্বার্থপরতা বা ‘আমি আমি’ নাই। সর্বজনকে একই দেহের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রত্যেক নববিধানবিশ্বাসী সর্বদা বিচরণ করেন। নববিধানাচার্য্য তাই বলেন, “আমি সদল অর্থও”।

সংসার কখন ধর্মের সহায়?

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা যেমন সমুদ্র পদার্থ হইতে সার নির্ঘাস বাহির করা যায়, তেমনি নববিধানের নব উপাসনার প্রক্রিয়ার প্রভাবে সমুদ্র জাগতিক পদার্থের মধ্য হইতে ব্রহ্ম বস্তু, সার বস্তু উদ্ভাবন করা যায়। এই ভাবে প্রত্যেক মানবের ভিতর হইতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাবিত করিয়া দেখিলে, আর মানুষের অসার দিক, খোলাব দিক দেখা যায় না। তাহা হইলে মানুষের ভিতর ব্রহ্মপুত্রকথাই দেখা যায়, আর অস্ত্র কিছু দৃষ্ট হয় না। এমনই আচার পান বা সংসারের সকল কার্যের ভিতর ধর্ম কর্মই উপলব্ধ হয়, এবং তাহা হইলেই স্নান, আহার পান, কাজ কর্ম সকলই পরিপ্রাণের সহায় হইয়া থাকে।

প্রকৃত হিন্দুত্ব।

“ধিক বলং কত্রিয়বলং, ব্রাহ্মণস্য বলং বলং” ইত্যাদি বাক্যে সর্বোচ্চ নীতি। গায়েব জোরে জয়লাভ হইবে, হিন্দুত্ব

কখনও ইহা নির্দেশ করেন না। শরীরকে পণ্ডর মধ্যেই হিন্দু গণ্য করিয়া থাকেন। তাই পাশবিক বল প্রয়োগ করা হিন্দু নাহেই যুগ্ম মনে করেন। হিন্দুরানীর নাম লইয়া যাহারা অন্তের উপর পাশবিক বল প্রয়োগ করে, তাহারা হিন্দু নামের উপযুক্ত নয়।

—o—

## ভাই বলদেব নারায়ণ।

ভাই বলদেবের স্মৃতি ও জীবনী নববিধানে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। যে নবীন যুবক তাঁহার জীবনের নবোদগমে, ত্রিভুবানন্দের বিহার প্রদেশে নববিধানপ্রচারের যুগে, জন্মভূমি গয়ানগরে নবীন শিশুর মত নববিধানে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, বিনি নববিধানের জন্ত সেই সুদূর প্রদেশে বাগদাদ নগরে বহু বাক্যবিশেষের অগোচরে পার্থিব চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং ইসলামবাদের সমাধি-ক্ষেত্রে নীরবে শয়ন করিলেন, তাঁহার জীবনী সত্য সত্য নববিধানে এক নূতন অধ্যায় যোগ করিয়াছে। ব্রাহ্মানন্দের তিরোধানের পর স্বর্গগত উপাধ্যায় পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের নিকট প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া, নববিধানের সেবকচূড়ামণি ভক্ত কান্তিচন্দ্রের নিকট হইতে চারি আনা মাত্র পরস্যা গ্রহণ করিয়া, তাঁহার বদেহ বিহারভূমে প্রচারার্থ আগমন করিলেন। মজঃফরপুরে তাঁহার প্রথম প্রচার-ক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। এই সময়ে বিহারভূমির নবীন ব্রাহ্ম ভ্রাতা ব্রহ্মদেব নারায়ণ তত্ত্বাভিভূতী মাজিষ্ট্রেটের কার্যে ব্রতী। তিনিও বিহারে নববিধান-প্রচারক্ষেত্রে বলদেবের কার্যে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বিস্তার করিলেন। ভাই বলদেবের কাণ্ড কেবল মজঃফরপুরে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। তাঁহার প্রচার সমষ্টি-পুর ও বিহারের অন্যান্য স্থানেও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তিনি এ দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে কুটীরবাসী কৃষক, এমন কি গোচারণ-ক্ষেত্রে গোরক্ষক বালকদিগের সঙ্গেও মিশিয়া হিন্দিতে হরিনাম গান করিতেন। তাঁহার এমন দিন গিয়াছে যে, সমস্তপুরের অনতিদূরে দলশিংসরাই রেলওয়ে স্টেশনের নিকট-বর্তী গ্রামে, মুসলমান কৃষকদিগের ক্ষুদ্রকুটীরে আতিথা গ্রহণ করিয়া, তাহাদের প্রদত্ত পাস্তাভাত খাইয়াও দিনযাপন করিতে হইয়াছে। আমরা তখন সমষ্টিপুরে। আমাদের গৃহ তাঁহার নিজ গৃহ হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি আমার সহধর্ম্মিনী স্মৃতি দেবীকে “মা” বলিয়া ডাকিতেন। মজঃফরপুর নগরে তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের নিকট অভূতপূর্ব ভাবে পূরিত হইয়াছিলেন। কোন সময়ে তিনি এই নগরবাসী-দিগের ভিতরে “হোণি” উৎসবে নামসংকীর্ণনের জন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বলদেব যখন উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত, তখন

বলদেব সেই জুতার মালা পরিয়া, উৎসব-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া, এক-তারা লইয়া গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন।

মজঃফরপুর হইতে বাঁকিপুরেও তাঁহার এক প্রচারক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিহারের বিধানে এই সময়ে মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমাদের পরম প্রতাপস্বদ ভ্রাতা গণেশপ্রসাদও এখানে “বিধান আশ্রমের” ভার লইয়া আসিয়া পড়িলেন। এই বাঁকিপুরে আশ্রম-প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভাই বলদেব নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের ভ্রাতা ও জীর্ণ গৃহে এক পরসার ছাতু খাইয়া দিন কাটাইয়াছেন। বাঁকিপুরে অবস্থানকালে বোম্বাই, করাচি ও মাদ্রাসার প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচারের আহ্বান আসিয়াছিল। সেই আহ্বানানুসারে তিনি সেই সেই স্থানে প্রচার করিতে যাত্রা করেন। এদেশের কোন পল্লীতেও তিনি উপরোক্ত ভাবে জুতার মালা সম্মানিত হইয়াছিলেন। মাদ্রাসার তাঁহার বিশিষ্ট প্রচারক্ষেত্রে হইয়াছিল। এখানে প্রাচীন বহু “উলাল রঘুনাথ” “কোরঙ্গাও” প্রভৃতির বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। করাচিতে আমাদের ভক্ত বহু ভ্রাতা নন্দলাল সেন মহাশয়ের বিশেষ সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন।

ভগবানের লীলা কে বুঝিতে পারে? ভক্তদের লইয়া তিনি কত লীলা করেন! ভগবানের নিকট হইতে তিনি ইসলাম ভূমিতে নববিধান-প্রচারার্থ বিশেষ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। কপর্দকবিহীন নিম্ন বলদেবের নিকট এ আদেশ আসিল। বোম্বাই-নিবাসী নববিধানবিশ্বাসী ধনী ব্যবসায়ী রায় গোবর্দ্ধন দাস বাহাদুর স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার হস্তে এই উদ্দেশ্যে সাত শত টাকা দান করিলেন। বলদেব মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। যে বিশ্বাসী প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া প্রচারপ্রসঙ্গ হইতে চারি আনা পরস্যা লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে প্রচারকার্যে এত টাকা সঞ্চয় করিয়া যাওয়া অসম্ভব। তিনি তাঁহার জলপথে যাত্রার ব্যয় স্বরূপ দুইশত টাকা মাত্র রাখিয়া, অবশিষ্ট পাচশত টাকা এক রেজিষ্টারী খামে মাদ্রাসার মিসনে পাঠাইয়া দেন এবং এক খানা কাকী তাঁহার দিগকে লেখেন যে, এই খাম যেন এখন খোলা না হয়। বৎসর তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আসিলে, তখন যেন খোলা হয়। মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষগণ সেইরূপই করিয়াছিলেন। তিনি এ অবশিষ্ট টাকা গোবর্দ্ধন দাস বাহাদুরকে ফিরাইয়া দিতে পারেন নাই, কারণ তিনি মিসন কার্যে তাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

করাচির বহুগণ তাঁহার পারস্য দেশে যাত্রার সংবাদে ভ্রম পাইয়াছিলেন এবং সেরূপ মতও দিতে পারেন নাই। ভাই বলদেব তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, “উপরছে হকুম আয়া, হাম কেয়া করোগা”। হকুম প্রাপ্ত বলদেব পারস্য যাত্রা করিলেন। তথায় প্রথমে “বুসদর” নগরে উঠিলেন। স্থান নাই, কোথায় থাকেন। তথায় ভগবানের ব্যবহার, ঐ নগরে British Political Agent-এর আফিসে কামিনীকুমার যুগোপাধ্যায়

নামক জনৈক খৃষ্টবাদী বাঙ্গালী কথ্যচারীকে পাইলেন। পারস্য দেশে আর বাঙ্গালী ছিলেন না। এই সদাশয় ব্যক্তিই তাঁহাকে স্থান দিলেন। কোথায় আর প্রচার করিবে? তাঁহাকে সে দেশবাসীরা “কাফের” ও বৃটীশ দূত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। তিনি সন্ধ্যায় তত্ত্ব Cooffee House এ গিয়া তথায় উপস্থিত লোকদিগের ভিতরে কোরাণের ভিতর দিয়া নববিধান প্রচার করিতে লাগিলেন। কোরাণবিশ্বাসী ইসলাম-বাদীগণ তাঁহাদের বহুমূল বিশ্বাসের বাহিরে নবালোকে প্রচারিত ইসলামকে কতটুকু গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন? পারস্য দেশে অবস্থানকালে তথায় হিন্দুচিকা রোগের ভীষণ প্রাদুর্ভাব একটা দেশবাসী আতঙ্ক চলিতেছিল, সুতরাং তাঁহার প্রচারের পথে অনেক বিঘ্ন বাধা আসিয়া পড়িল। তাই বলদেব সে সময়ে তুরস্ক যাত্রা সমীচীন বলিয়া মনে করিলেন। সেই সুদূর তুরস্কের পথে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর সমন্বয় “বসোরা” নগরে তিনি জনৈক মুসলমান জমীদারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই উন্নতমনা ও উদারচেতা ইসলামবাদী তাঁহাকে অপর ধর্মাবলম্বী জানিয়াও, ধর্ম-প্রচারের সচায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে সন্ধ্যায় অনেক স্থানীয় মুসলমান সমবেত হইতেন। একদিন অপরাহ্নে সমবেত মুসলমানদিগের ভিতরে তাই বলদেব পারস্যকবি হাফেজের “গজোল” যখন আবৃত্তি ও ইসলাম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে বাতীর বাহিরে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাঠিলেন। পরক্ষণেই শুনিলেন যে, তাঁহার অতিথি সংস্কারক জমিদার বন্দুকের গুলীর আঘাতে হত হইয়াছেন। তখনই জানা গেল যে, তিনি বিশ্বস্ত কাফেরকে স্থান দেওয়াতে, তাঁহার স্বর্গ্যা লোকের হাতে নিহত হইলেন। বলদেব বুঝিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিপদ উপস্থিত। তাঁহার সেই অতিথিগৃহের গৃহে আর তাঁহার স্থান নাই। তিনি তথা হইতে বাগদাদ যাত্রা করিলেন। কে তাঁহাকে স্থান দিবে? তিনি একটা মসজিদের পাশে একটা ক্ষুদ্র লোকশূণ্য পর্ণকূট উপস্থিত হইলেন। সেই পর্ণকূটেরে মুসলমানের চিহ্নবিশিষ্ট বিদেশী লোককে দেখিয়া, কোন কোন মুসলমান কোতূহল প্রকাশ হইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। সেই ক্ষুদ্র তাঁহার তিন রাত্রি চলিয়া গেল। চতুর্থদিনের রাত্রে তিন সময় বুঝিয়া সববেত লোকদের মধ্যে নববিধানের আলোকে কোরাণ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহার সে ব্যাখ্যা তাঁহাদের বহুমূল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যাইতেছিল, সুতরাং তাঁহাদের ভিতর একটা উত্তেজিত ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত তাঁহার সে ব্যাখ্যা চলিয়াছিল। ঐদিন রাত্রি শেষে তিনি সাংঘাতিক হিন্দুচিকা রোগে আক্রান্ত হইলেন। তিনি এই চারিদিন বাজার হইতে ছইচারি পরসার জিনিষ আনিয়া তাহাই খাইয়া দিন কাটাইতেন। কে জানে, ইহার ভিতর কোন রহস্য ঘটিয়াছিল? স্থানীয় বৃটীশ কনসল জেনারেল

ভারতবাসী বৃটিশ প্রকার এই রোগাক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে স্থানীয় Turkish Hospital এ আনাইয়া লইলেন। সেই হস্পিটালে বার ঘণ্টা পরে তাঁহার শেষ নিশ্বাস পড়িয়া গেল। তিনি কি রাখিয়া গেলেন? কয়েকখানি ছিন্নবস্ত্র-পূর্ণ ক্ষুদ্র পোঁটলা ও তাহার ভিতরে চারি আনা পরস। আর কি রাখিয়া গেলেন, তাহা সেখানে কয়জন দেখিতে পাইলেন? তিনি নববিধানে পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভগবান ও ভগবানের আদেশে অক্ষুণ্ণ ও অটল বিশ্বাস জগতের সমক্ষে রাখিয়া গেলেন। যে চারি আনা পরস লইয়া তিনি প্রচারক্ষেত্রে বাহির হইয়াছিলেন, তাহাই আবার রাখিয়া গেলেন। বিধাতার রহস্য কে বুঝিবে? সম্মুখে তাঁহার কোন সমবিশ্বাসী নাই, কোন ভারতবাসী নাই যে, তাঁহার সেই সমাহিত ও নীরব মূর্তির সম্মুখে এক বিন্দু অশ্রু নিবেদন করেন। যে বলদেব বুদ্ধভূমিতে গয়ানগরে নববিধানে ধৃত হইয়া, ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে “হাম না পাক কুস্তা হায়” (আমি অপবিত্র কুসুর) বলিয়া করযোড়ে ঝাঁড়াইয়া ছিলেন, আজ তিনি সেই সুদূর ইসলামভূমিতে ইসলামবাদীর সমাধিক্ষেত্রে শান্তিত !! জয় নববিধানের জয়!

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

— — —

## সর্বধর্ম-সমন্বয় বা সার্বভৌমিক ধর্মের ভিত্তি।

(ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলনসমাজে বিবৃত)

পৃথিবীতে যখনই কোন নূতন ধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখনই দেখিতে পাই, সেই ধর্ম উদার ভাবে পরিপূর্ণ। প্রথম প্রথম কয়েক শত বৎসর ধর্মের সেই উদার ভাব অক্ষুণ্ণ থাকে; ধর্ম-সমাজ যত পুরাতন হইতে আরম্ভ করে, ততই ধর্ম মলিনতা দেখা দেয় এবং উদার ভাব নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে এমন অবস্থা ঘটে, মূলের সঙ্গে পরবর্তী সময়ের ধর্মের আর মিল থাকে না। উদার ধর্ম পরবর্তী কালে আচার অহুষ্ঠান ইত্যাদির গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া কুপমত্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই জন্ত ধর্মকে সংস্কার করিবার জন্ত যুগে যুগে ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। তাঁহারা সকল প্রকার গণ্ডী হইতে ধর্মকে মুক্ত করিয়া মানুষের সঙ্গে ভগবানের সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেক ধর্মের উদার ভাব নষ্ট হইয়া যাওয়াতে, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মনে কষ্ট্রন, তাঁদের স্ব স্ব ধর্মের লোক ভিন্ন আর সকলেই অনন্ত নরকে বাস করিবে, একমাত্র তাঁরাই অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হইবেন। ইহা অপেক্ষা ধর্মসমাজ ও ধর্মমতের সংকীর্ণতা আর কি হইতে পারে?

বর্তমান সময়ে সকলোই আপনাদের হ্রস্বতা ও হৃৎ হৃদিশার অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, নিজেদের দোষ ও সংকীর্ণতা



করিয়া, অস্ত্রের সঙ্গে মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এই সার্বভৌমিক মিলনভূমি কোথায়? সকল জাতি ও সকল ধর্মের লোকদের মিলন না হইলে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না এবং ধরাতেল স্বর্গরাজ্য বা ধর্মরাজ্যের অবতরণ সম্ভবপর হইতে পারে না।

সকল ধর্মসম্প্রদায়ই নিরাকার এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে মানে; এ বিষয়ে কাহারও সঙ্গে কাহারও বিবাদ নাই। আমরা যদি সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব সমাজের ক্ষুদ্রতা ও অসত্যের বেড়া ভাঙিয়া, অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান নিরাকার ঈশ্বরকে পূজা করিতে তাঁর চরণতলে মিলিত হইতে পারি, তবে সকল জাতির, সকল ধর্মের লোকের মিলন সম্ভব হইতে পারে। এই মিলন-ভূমিতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের উপযোগী ভাবে, এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা, পৃথিবীতে এক জাতি, এক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের সত্যপ্রতিষ্ঠা ঐশ্বরিক বিশ্বাসী মহাজনদের দ্বারা প্রচারিত নূতন নূতন শাস্ত্র, আচার অমুষ্ঠান আমরা প্রচার সহিত গ্রহণ করিব। অতীতের আচার অমুষ্ঠানও বর্তমান সময়ের উপযোগী রূপে নূতন করিয়া লইতে হইবে। কোন সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ বা শাস্ত্রের নিন্দা করিতে পারিব না। সকল সাধু ও মহাপুরুষকে এবং সকল শাস্ত্রের সত্যকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। শাস্ত্র এবং মহাপুরুষকে ঈশ্বরের আলোকে আমরা যতদূর বৃদ্ধিতে পারিব, ততদূর গ্রহণ করিতে ও আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিব। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে বাহা সত্য ও ভাল জিনিষ আছে, তাহাই অন্ধকে প্রেমের সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত প্রদান করিতে হইবে এবং অস্ত্রের মধ্যে বাহা ভাল আছে, তাহাও প্রেমের সঙ্গে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। একরূপ সত্যের আদান প্রদান চলিবে।

আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র ও মহাপুরুষের জীবনী অধ্যয়ন করি না; বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে বাহা সত্য সত্য সত্য জিনিষ আছে, তাহা আমরা জানি না ও তাহার আশ্রয় পাই না; এ জন্য আমাদের মন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম-মতের প্রতি উদার ও শ্রদ্ধাভাবাপন্ন নয়। বরং নিজ নিজ সংকীর্ণ মতের জন্য বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন।

হিন্দুর কোরণ, বাইবেল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে; মুসলমান ও খৃষ্টানের উচিত, নিজ ধর্ম ভিন্ন অন্যান্য ধর্মের শাস্ত্র ও মহাপুরুষের বা সাধুদের জীবনী অধ্যয়ন করা। আমরা যদি পরস্পর পরস্পরের শাস্ত্র ও সাধু ভক্তের জীবনী শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করি ও পরস্পরকে বৃদ্ধিতে চেষ্টা করি, তবে নিশ্চয় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীর ভাব কমিয়া যাইবে, মন উদার হইবে, সকলের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিবে। আমরা যদি একরূপ হইতে পারি, তবে সকলেই মিলিয়া সার্বভৌমিক ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে ও মিলিত ভাবে এক

অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিতে সক্ষম হইব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই সার্বভৌমিক ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সত্য গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করেন এবং নিজের অনুগামীদের দ্বারা বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রের ইংরেজী ও বাঙ্গলা অমু-বাদ করিয়া সর্বসাধারণে প্রচার করেন। যেমন উপাধায় গৌর-গোবিন্দ রায়ের ত্রীকৃষ্ণের জীবনী ও ধর্ম, গীতা ও বেদান্তের সমন্বয়-ভাবা, মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেনের মুসলমান ধর্মশাস্ত্র, ভাই প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদারের খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্র, সাধু অবদারনাথের বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র, সঙ্গীতাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্নাালের ভক্তিশাস্ত্র ইত্যাদি। সর্বপ্রথম ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সকল শাস্ত্র ও সকল সাধুর প্রতি সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন, তিনিই সর্বধর্ম-সমন্বয়ের আভাস পৃথিবীতে সর্বপ্রথমে প্রদান করেন। এই সার্বভৌমিক ধর্মের ভিত্তি স্থাপন বঙ্গদেশে বাঙ্গালী জাতির মহাপুরুষ দ্বয়ই করিয়াছেন। ইহাদের অনুবর্তীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিমলার ব্রহ্মসঙ্ঘেরই হিন্দু মুসলমানের মিলন বৈঠক বসিয়াছিল। তাহা হিন্দুর দেবালয়ে বা মুসলমানদের মসজিদে বসিতে পারে নাই। কারণ এক সম্প্রদায় নিজেদের সংকীর্ণতার জন্য অগ্র সম্প্রদায়কে নিজেদের ভজনালয়ে প্রবেশ করিতে দিতে পারে নাই।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই নবযুগের প্রবর্তক। রামমোহনের এই উদার ভাব তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র লাভ করিয়াছিলেন; তাই তিনি সকল শাস্ত্র ও সকল সাধু ভক্তদের প্রতি জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মসমাজের সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বা নববিধানের এই উদার ভাব মহাত্মা গান্ধীও প্রাপ্ত হইয়াছেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের কার্যে তিনিও বাবজুত হইতেছেন। সকল ধর্মের প্রতি, সকল সাধু ভক্তদের প্রতি, সকল সত্যপন্থের বাজীর প্রতি এবং মানবমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার ভিত্তিতে তাঁহার চিন্তা, বাক্য ও কার্য দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে।

আমরা যদি গীতাও, রামমোহনের, কেশবচন্দ্রের উদার সার্বভৌমিক মত গ্রহণ করিতে পারি, তবে হিন্দু-মুসলিমকে মেলিয়া বলিয়া, মুসলমান অমুসলমানকে কাকের বাগিয়া, খৃষ্টান অখৃষ্টানকে হিঁদেন বলিয়া ঘৃণা করিবে না। ধর্মরাজ্য চক্র-ব্রাহ্ম ব্রহ্মবাদী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মানন্দ কেশব-চন্দ্র সেন আসিয়া, ধর্মশাস্ত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক অনন্ত, অদ্বিতীয়, নিরাকার, সত্যরূপ ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছেন। মহাত্মা গান্ধীও ইহাদের অনুবর্তী হইয়া কাজ করিতেছেন। অন্ধ আমরা যদি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ চকুর সাহায্যে সকল জাতি, সকল ধর্ম, সকল সাধু ভক্তের মধ্যে ভগবানের বিভিন্ন রূপের প্রকাশ দেখিতে চেষ্টা করি এবং সকলকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, তবে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বত্র দেখিতে পাইব এবং সংকীর্ণতা

ও আত্মবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া, সবাই প্রেমভেদে মিলিত হইয়া, সার্বভৌমিক ধর্মের বা সর্বধর্মসম্মতের, বাহ্যিক ব্রহ্মানন্দ লবধিধাম বলিয়াছেন, তাহার অন্তর্গত হইতে পারিব।

একমাত্র নিরাকার একেশ্বরবাদের পতাকা-তলেই পৃথিবীর সকল ধর্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল জাতির লোকের মিলন সম্ভব, অম্লজ কোথাও নয়। ব্রাহ্মসমাজ এই মিলনভূমি বা সর্ব ধর্মসম্মতের ভূমি প্রস্তুত করিয়া সবাইকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। আহন, আমরা সবাই এখানে নিজের সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া মিলিত হই ও সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক অবিভীত নিরাকার ঈশ্বরের পূজা করিয়া ধৃত্য চই। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, এ শুভ দিন আমাদের মধ্যে শীঘ্র আগমন করুক। বিশ্বের সকলজাতীয় লোকের ইহাই মিলনভূমি, বিশ্ব-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের ইহাই একমাত্র পথ।

"মাত্র: পস্থা বিমুখতে অনন্য।"

"সত্যমেব জয়তে নান্দম্॥"

শ্রী প্রসন্নকুমার মজুমদার।

## স্বর্গীয়া ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী।

(৫ই সেপ্টেম্বর, প্রথম সাপ্তাহিক শ্রাদ্ধবাসরে স্বামীর নিবেদন)

দেবি! তুমি ত চলে গেলে! আজ দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল! কত ঝড় ঝাপটা যে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। কত দুশ্চিন্তা, কত মনস্তাপ, কত উদ্বেগ আমাদের শরীর মনকে নিদারুণ আঘাত করে, পরি-মানে সুখ-শান্তি অকালে শ্মশানের আগুনে ছাই করে যে চলে গেল। তোমার বিদেহী আত্মা কি তা জানতে পারছে? তোমার দেহের চির বিচ্ছেদ, সবকৌশলের বিদেশ-যাত্রা, বধু, কন্যা ও ছোটদের প্রায় প্রত্যেকেরই হারারোগ্য ব্যাধির প্রকোপ, জীবন যাত্রার সঙ্কটলে এসে আমাদের বুকের পাঁজরা বধন খুঁড় করে দিয়ে গেল, তখন তোমার কাতর প্রার্থনা কি আমাদের প্রার্থনা সঙ্গে মিলে বিধাতার চরণকে স্পর্শ করছিল? নিশ্চয়ই। কদিন আগে গায়ত্রীর রোগশয্যার পাশে বসে যাই প্রার্থনা করলে, "ভগবান্ ওর, ব্যারাম আমাকে দাও, ও ভাল হ'ক, আর আমি মরে যাই", অমনি দেবতা স্বকর্ণে শুনে তোমাকে এমন রোগ দিলেন—তোমার বাবার এমন জড়াছড়ি পড়ে গেল যে, আমাদের আর চখে, কাণে দেখতে শুনে দিলে না। তোমার সেই জীবন্ত প্রার্থনা এখন আমাদের সঙ্গে কি আর নেই? অদেহী হলে বলে তোমার সেই সজাগ মন, তোমার সেই সচেতন আত্মা, তোমার সেই অকুরন্ত ভালবাসা কি আমাদের ছেড়ে গেল? একথা বিখণ্ড করতে পারছি না। তুমি আছ, নিশ্চয়ই আছ—আমাদের মনের মন হয়ে, আত্মার আত্মা হয়ে, স্বপ্নের

শোণিত হয়ে, শরীরের বল হয়ে, চক্ষের জল হয়ে, কর্ণের শ্রুতি হয়ে। যখন শরীরে ছিলে, তখন ত ছিলে আমার ধর্ম সহধর্মিণী, আমার কর্ম সহকর্মিণী। তুমি ত ছিলে আমার ভয়েতে অভয়া, সংকটে সাহস, আমার সকল অভাবের পূর্ণতা, আমার পূর্ণকূটরে স্বর্ণ প্রতিমা। আজ শরীরে সেই বলে কি, তোমার সকল সদ্গুণ, সদ্ভাব, সাহস, মেহ, দয়া, বাৎসল্য, মন, ও আত্মা দশমীর প্রতিমার মত গঙ্গাজলে ভেসে গেল? একথা মনে ঠাঁই পাচ্ছে না। আছ বই কি! তোমার সেই মন, সেই আত্মা এখন প্রতি মুহূর্তে আমাদের নিরীক্ষণ করছে, আমার মস্তকের ভিতর তোমার জীবন্ত বাণী চন্দ্রিত শব্দের মত মধো মধো ঝঙ্কার করে উঠে—পৃথিবীতে কোন বস্তুই ক্ষয় নাই—বিনাশ নাই—তুমিও আছ—তোমার সেই অকুরন্ত ভালবাসাও সাথে সাথে রয়েছে।

দেবি! তোমার বাবার দিন ছেলেমেয়েরা কত করে সাজিয়ে দিলে—তোমার রক্তাভ গৌরবর্ণ কাস্তুরি লাবণ্য বিচিত্র পুষ্পরাশির শোভা সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে এমন এক দিবা শ্রী ধারণ করেছিল যে, সে কথা বলবার আমার ভাষা নেই। আমার লোভ হচ্ছিল যে, এমন করে সঙ্গে আমিও তোমার সঙ্গে চলে যাই। এই প্রবল লোভ থেকেই, বোধ হয়, সতীর সহমরণ এদেশে প্রথম আরম্ভ হয়। কই সতীর সঙ্গে সম্পতির সহমরণের কথা ত শোনা যায় না? স্বামীর সহমরণের কথা না থাকলেও, স্বামীর প্রগল্ভা উন্মাদনার কথা পাওয়া যায়। সতী যখন পতিনিদ্দা শুমে দেহভ্যাগ করলেন, তখন মহাদেব সতীর প্রাণহীন দেহটি ধ্বংস করে পাগলের মত বেড়াতে লাগলেন; শবদেহ পচে গিয়ে এক একটা অঙ্গ বেথানে পড়ল, সেখানে এক একটা তীর্থ হল। দেহী অদেহী না হলে আত্মার রূপ ফুটে বেরোয় না। সতীর আত্মার জ্যোতি থেকেই ত এক একটা তীর্থ, এক একটা মহাকীর্তি জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমিও তোমার প্রাণহীন দেহের রূপটি এখনও কত রেহের চক্ষে দেখি, তোমার দেহের সুন্দর প্রতিমাগনিকে আমি এখন বুকে করে সর্বদা ঘূরে বেড়াই। আমার ও সাধও হয় যে, তোমার পুত্র কন্যাগণ, আত্মীয় স্বজনগণ, যিনি যেখানে আছেন, তোমার নির্মল সন্তানের এক একটা কথা তাঁদের অন্তরে পড়ে যেন এক একটা তীর্থ রচনা করে। শাস্ত্রের কথা আমাদের গৃহে পরিবারে যেন সার্থক হয়।

তোমার বাবার প্রথম আয়োজন বেশ কলরবপূর্ণ হলেও, শোকের উচ্ছ্বাস গৃহের বায়ুকে কম্পিত করে তুলেও, অশান্তির তীব্রতা ছোট বড় সকল প্রাণকে অতিষ্ঠ করে ফেলেও, তোমার সুন্দর গুণাবলীর ভিতর থেকে যাই তিনবার "শান্তি শান্তি শান্তি" উচ্চারিত হল, অমনি যেন কোথা হতে স্বর্গের পবিত্র প্রশান্ত নিশ্চলতা গৃহকে, গৃহস্থিত সকল প্রাণকে, গৃহের ভিতর খাট সকল বস্তুগুলিকে পর্যন্ত শান্তির নিশ্চলতা পূর্ণ করে তুলল,

জড় অজড় সকল প্রাণ থেকে বেন শক্তির নিখাস বীরে বীরে পড়তে লাগল, শোকের উচ্ছ্বাস, আবেগ, হাহুতাশ বেন মুহূর্তে উবে গেল। ঠিক এই সময়ে আমি তোমার দিব্য ঐশ্বর্য্যখানি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম—তোমার নুতন ভাগবতী তুমি ঐশ্বর্য্যে মহিমান্বিত হয়ে আমার নিকট কুটে উঠল। সেটা কল্পনা নয়, সেটা Direct Vision, যে প্রত্যক্ষ দর্শন থেকে সাধক ঈশ্বর ও পরলোক প্রত্যক্ষ করেন, আমিও সেই দর্শন থেকে তোমার ভাগবতী দিব্য দেহখানি প্রত্যক্ষ করলাম। সে দর্শন আমার আত্মা থেকে : কখনও মুছে যাবে না—সে দর্শনের সৌন্দর্য্যটুকু আমার প্রাণ থেকে কখনও মলিন হবে না—সে দর্শনের রূপমাধুরী, তার অপার্থিব জ্যোতিঃ, তার জীবন্ত দীপ্তি ভাবার প্রকাশ করবার নয়—সে অব্যয় ও অরূপের রূপ কেবল দিব্য চক্ষে দেখিবার বস্তু।

তোমার এই অপার্থিব মনোহর রূপ দেখিয়ে, এখন তোমার আমার যোগের সূত্র কোথায়, তারই একটু আভাস দিয়ে গেলে। তোমার সেই সৌন্দর্য্য-বিজড়িত পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র-জ্যোৎস্না-বিনিমিত আলোকময়ী প্রতিমাখানি আমি বুকে করে রেখেছি, আমি রোজই সেই স্বর্ণপ্রতিমাটী পলকবিন্দীন নেত্রে অবাত-কম্পিত দীপশিখার ছায় ছির চিতে দেখি। আমি রোজই শুক্লির পঞ্চ প্রদীপ জালিয়ে, তোমার সেই শুভ্র সব নির্মল ভাগবতী মূর্তীকে আরাতি করি। শরীরে বাস করে তোমার অশরীরী দিব্য দেহের সহিত কিরূপে একাকার হতে পারি, তাই আমার বর্তমান জীবনের সাধনা। তোমার ভাগবতী তুমুর জ্যোতিষ্মত স্পর্শ আমার পার্থিব রূপের অবসান হয়ে, শরীরী হয়েও অশরীরী দিব্য দেহ ধারণ করে, উভয়ে একাকার হয়ে, প্রাণেশ্বরের চরণে কিরূপে প্রেমের পবিত্র অঞ্জলি প্রতিদিন প্রতিক্রমে প্রদান করব, ঠাহারই প্রতীক্ষা করছি।

তোমার কণিক স্পর্শ, তোমার কণিক দর্শন, অমরলোক হতে কখন কখন তোমার বাণীপ্রবণ করে আর মনের তৃপ্তি হয় না—এখন সংসারের অতীত হয়ে তুমিও যে লোকে, আমিও সেই লোকে প্রবেশ করতে চাই। বাবার সময় কিছু বলবার চেষ্টা করেছিলে, কিন্তু সে কথা কাণে শোনা গেল না—হাত নাড়া, ঠোঁট উঠার উত্থান পতন, চক্ষুর পলক ও স্থির দৃষ্টির ভিতর দিয়ে তোমার অস্পষ্ট অশঙ্ক কথা বুকবার চেষ্টা করলাম। তোমার অশঙ্ক বাণী আমার মস্তকে স্পর্শ করল। এই তোমার প্রথম অশঙ্ক বাণী আমি শুনলাম। এবার শব্দের অতীত হবে বলে, শরীর থাকতেই অশঙ্ক বাণী শুনবার ইচ্ছিত দিয়ে গেলে। সে বাণীর ভিতর তোমার বার্তা ছিল এই যে, আমিও বেন শীত তোমার সাহিত মিলিত হই। আমিও নির্জাকু কথায় তার উত্তর দিলাম, নিঃশব্দে উভয়ের কথাবার্তা চলল। সে কথা ~~তোমার মস্তকে স্পর্শ করল~~; তোমার মুখের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল যে, তুমিও আমার কথায় সায় দিয়েছ।

তোমার স্মৃতিকে ধরে রাখবার জন্য কয়েকটা তোমার প্রিয় বস্তুকে আমরা :সজাগ করে রেখেছি—যদি চুকলেই তারা তোমার কথা আমার মনে জাগিয়ে দেয়। আমি ঘর থেকে বাইরে বাই, অনেকক্ষণ বাইরে থাকলে মনে হয়, বেন তোমার বিদেহী আত্মা আমাদের বিরোধের বিচ্ছেদ-বেদনা অশ্রুতব করছে—তাড়াতাড়ি ঘরে এসে তোমার অশঙ্ক বাণী শোনবার প্রতীক্ষায় বসে থাকি—প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিতর ভাবের আদান প্রদান বেশ ঘন ও মিষ্ট হয়ে উঠে। দেহে বাস করে অদেহী আত্মার সঙ্গে যোগ রক্ষা করা যে কি দুঃস্বপ্ন, আমি তা পদে পদে বুঝতে পারছি। সর্বদা সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়—কিসে শরীর মনের শুদ্ধতা রক্ষা হয়—কিসে নিষ্ঠা বজায় থাকে—কিসে ঐকান্তিকতার ত্রুটি না হয়—কিসে মনের বিকল্প না আসে। কিরূপে সংসারের বাস করে, সংসারের অতীত হয়ে থাকা যায়—এ কঠোর সাধনার সিদ্ধি লাভ করতে হলে, সর্বদা প্রাণপণ করে নিঃখাস ফেলতে হয়, এবং কঠোর কাজ করতে হয়, আমি তার আভাস কিছু পাচ্ছি।

এই এক বৎসরের ভিতর তোমার অদেহী আত্মার প্রভাব আমার উপর কতকটা পড়েছে, তা বেশ বুঝতে পারছি। এতদিন তুমি আমার কথার অমূল্যরূপ করে চলতে, আমার ধর্ম কৰ্ম তোমার ধর্ম কৰ্মকে আকার দেবার চেষ্টা করেছে; কিন্তু এখন দেখছি যে, তুমি আমাকে ভেঙ্গে চূরে নুতন করে গড়ছ—আমি তোমাতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছি—তোমার আত্মার জিহ্ম আমার ভিতরে নিঃশব্দে যেমন চলেছে এবং এতো শীঘ্র শীঘ্র অবস্থা রূপান্তরিত হচ্ছে যে, আমি নিজেই নিজেকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বাই। এখন কেমন অজ্ঞাতসারে তোমার ভাব-গুলি আমার মধ্যে কুটে উঠছে, তোমার ভাব আমার ~~মস্তকে~~ আকার দিচ্ছে, তোমার চিন্তা বাণ্য কৰ্ম সব আমার ভিতর নুতন রূপ দান করছে।

ভাব, ভাবের সাধী অন্বেষণ করে, প্রেমিক প্রেম পদের খোঁজে ঘুরে বেড়ায়, চৈতন্য আধারকে আশ্রয় করে, স্মৃতি হয়; তাই তোমার আত্মা অজ্ঞাতসারে আমার মধ্যে ~~ধারণ~~ করছে। একাকার হওয়াই যোগ; পরীরের ব্যবস্থা ~~হানের~~ ব্যবধান, সময়ের ব্যবধান, চিন্তা ও কৰ্মের ব্যবধান আর আমাদের পৃথক রাখতে পারবে না। পরলোক ~~এ~~ অনেক দূরে, পরলোকের কথা যে শুনেতে পাওয়া যায় না, একথা আমি আর বিশ্বাস করি না। তোমার পরিকার কথা আমি যখন কাণ পেতে শুনি, তখন মনে হয়, বেন তুমি ইহলোকে এই ঘরটির ভিতরে বসেই কথা কইছ। ব্রহ্মবাণী যেমন অজ্ঞাত সত্য, অমরাঙ্গাদের বাণীও সেইরূপ নিঃসন্দেহ সত্য।

দেবি! তুমি যে চিন্তানলে উঠে তোমার রূপ রস পঞ্চ স্পর্শ সব বিসর্জন দিলে, সোণার মানুষটিকে আগুনে আহুতি দিয়ে চলে গেলে, আজ সেই চিন্তানলের স্বপ্নিখাটী আমার

মিকট কত প্রিয় হয়ে এসেছে! যে চিতানল তোমার বাহিরের শরীরখানিকে, তোমার সৌন্দর্যের স্বর্ণপ্রতিমাখানিকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে, আজ সেই চিতানল কত মিষ্ট হয়ে আমার ভিতর প্রবেশ করেছে—ভিতরের যত মরলা মাটা, জঞ্জাল আবর্জনা সব পুড়িয়ে ছাই করেছে। তোমার প্রাণহীন দেহটিকে চিতানলের বেদনা বহন করতে হয় মি, কিন্তু আমার ছোটখাট সব জিনিষ-গুলিকে হতাশনে আহুতি দিবার সময় মধ্যাহ্নিক বাধা বহন করতে হচ্ছে। প্রতিপদে আঘাতের দ্বারে খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছি, মাঝে মাঝে অশরীরী অবস্থার অহুত্ব আমাকে যেন গ্রাস করে ফেলে। তোমার শ্মশানভূমি আমার নিকট মহাতীর্থ! আমি প্রতিদিন অশরীরী হয়ে সেখানে বাস করি—সেখানে বসে তোমার সঙ্গে হৃদয় হৃদে কথো কথোর সুরোগ ঘটে—তোমার ভাগবতী জ্যোতিষ্মতী প্রতিমার নিকট আমার স্তব হৃৎ, আমার দেহ মনকে অর্ধাক্রমে উৎসর্গ করবার সুরোগ তথায় যেমন পাই, অন্তত তেমন হয় না।

তুমি যদি আগে পরলোকে মা যেতে, তোমার সঙ্গে সধক এতো মিষ্ট হত না—তোমার সঙ্গে দেখা শুনার নূতন স্বাদ এমন করে গ্রহণ করতে পারতাম না। চক্ষুকে বা দেখছি, সেটা বয়ঃ ভ্রান্তিমিশ্রিত; কিন্তু বা দিবা চক্ষে দেখছি, সেটা অশ্রুত, সুনিশ্চিত সত্য। সাকার একবার নিরাকার হচ্ছে, আবার নিরাকার সাকার হচ্ছে, *Form* এবং *Spirit* এর ক্রমাগত সংঘর্ষ চলেছে। তাই আত্মা একবার রূপ ধারণ করছে, আবার রূপ অরূপে মিলিয়ে যাচ্ছে। হৃয়ের মাঝখানে বা বস্তু আছে তা সন্দাহীন হবে কেন? আছে, সব আছে। দেবি! ছুনিও আছে, আমিও আছি। তোমার আত্মা আমাকে আধার করে, ধারিত্ব করে, নূতনরূপে ফুটে উঠছে।

তোমার স্মৃতিটুকুকে এখন সকলে জাগিয়ে রেখেছে, কিন্তু কালের আঘাতে সেটুকু আতে আতে যুছে যাবে; আজ যারা প্রবর্তার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে, কাল তাগা আলো আঁধার মিশ্রিত হতে থাকবে, ক্রমে সবই আঁধারে ডুবে যাবে। মানুষের মনের গতি সবই ভোলবার দিকে। এখন বাহিরের দিক দিয়ে যারা তোমাকে ধরতে যাবে, তারা তোমাকে ধরতে পারবে না; আমি তুমি তাদের হতে বহু দূরে—এখন দেহে বাস করে অদেহী না হলে কেউ তোমার পাবে না। দেহ ধারণ করে অদেহী হয়ে, অমরাআত্মার সঙ্গে বাস করা সম্ভব, একথা যদি জীবনে প্রমাণিত হয়, তাহলে মানুষ বুঝবে যে, পরলোক সত্য—মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায়।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## চতুঃষষ্টিতম ভাদ্রোৎসবের কার্যবিবরণ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২১শে আগষ্ট, ৫ই ভাদ্র, সোমবার, শ্রদ্ধের তাই কাঙ্ক্ষিত মিত্র ও শ্রদ্ধের তাই বলদেবনারায়ণের স্বর্গারোহণ-সাম্বৎসরিক। প্রাতে নবদেবালয়ে এই উপলক্ষে তাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। তাই গোপালচন্দ্র গুহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যা ৭টার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রসঙ্গ হয়। প্রথমে তাই শ্রিরামাথ মল্লিক “দাস্যমুক্তি” আচার্য্যদেবের প্রার্থনা পাঠ করিয়া, “ভূতোর আত্মপরিচয়” হইতে অংশ বিশেষ পাঠ করেন। তৎপর ডাক্তার বিমলচন্দ্র বোষ বলদেবনারায়ণের ইংরেজি ভাষায় লিখিত জীবনচরিত হইতে কিছু পাঠ করেন। পরে প্রসঙ্গ হয়। মামনীয়া মহারানী শ্রীমতী সূচাকদেবী ও ভক্তকন্ডা শ্রীমতী মণিকা মহলানবিস অত্রান্ত সকলের সঙ্গে মিলিয়া প্রসঙ্গের কার্য করেন।

২২শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, মহাআ রান্না রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মোপাসনা-প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সন্ধ্যা ৭টার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য করেন।

২৩শে আগষ্ট, ৭ই ভাদ্র, বুধবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠার সাম্বৎসরিক। ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতে ৭টার তাই অধিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। নববিধানের সাধনা স্বাভাবিক পথে এই বিষয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের উপদেশ পাঠ করিয়া তিনি প্রার্থনাদি করেন। এবেলার উপাসনা বেশ সরল ও মধুর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে।

সন্ধ্যায় তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। তিনি আচার্য্যের উপদেশ “ব্রহ্মধর্মের সংযোগ” ও “কলিকাতার নববিধান” হইতে অংশ বিশেষ এবং আচার্য্যের প্রার্থনা “অদ্বুত নববিধানসাধন” পাঠ করিয়া, নব উপাসনাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব বিষয়ে আত্মনিবেদন করেন। তাঁহার আত্মনিবেদনে বিশেষ কথা এই—যে উপাসনাপ্রণালী অধ্যকার পুণ্যদিনে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ একটা নূতন প্রণালী। অতীতকালে স্বদেশে বিদেশে বিভিন্ন ধর্মবিধানে যতগুলি বিভিন্ন সাধনপ্রণালী প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহার সকল হইতে এ প্রণালী ভিন্ন। নবযুগে এই নববিধানে ইহা সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী। আমাদের ব্রহ্মপারাদানার মধ্যে উপনিষদের উক্ত বাধ্যগুণ ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ পরিশ্রমের ফল। মহর্ষিদেবের সময়ে আমাদের উপাসনাপ্রণালী বর্তমান পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে নাই। ভক্ত কেশবচন্দ্র উদ্যোদন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ও শাস্তিবাচন এই পাঁচটা প্রধান অঙ্গে

উপাসনাপ্রণালীকে বিতর্ক করিয়া, পরে তাহার সঙ্গে শাস্ত্রবাক্য ও স্তোত্রপাঠ ইত্যাদি সংযোগ করিয়া বর্তমান উপাসনাপ্রণালীর পূর্ণাঙ্গ দান করেন। এই উপাসনাপ্রণালীর মধ্যে বেদ, বেদান্ত, কোরাণ, পুরাণ, তন্ত্র, ভাগবত ইত্যাদির ভাব ও সাধনা যেমন সরিষিষ্ট, তেমনই এই প্রণালীর মধ্যে বুদ্ধ, যুগ, দ্বৈশা, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির ভাব ও সাধনা সরিষিষ্ট। তাই আমরা এই বর্তমান উপাসনাপ্রণালীকে অবলম্বন করিয়া, অতীতের স্বদেশের বিদেশের সকল সাধনার স্বাদ আবাদন করি ও সকল সাধনাকে আপনার সাধনা বলিয়া গ্রহণ করি। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং প্রভৃতি ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপ অবলম্বনে বিশ্লেষণে ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপের স্বাদ গ্রহণ করিয়া, সমষ্টিতে তাঁহাকে ধারণা করার প্রণালীটা যেমন নূতন ব্যাপার, তেমনই ইহা বিশেষ ব্যাপার। এই স্বরূপবিশ্লেষণের সাধনা-যোগে ঈশ্বরের বিভিন্ন স্বরূপের ক্ষুরে তাঁহাকে পূর্ণভাবে ধারণা ও গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের অখণ্ড সত্তার ধারণা ও ধ্যান ব্রহ্মসাধনার প্রাথমিক প্রণালী। পরবর্তী কালে একই ঈশ্বরকে, তাঁহার নানা নামে, খণ্ডখণ্ডভাবে সাধনা ও ধারণার ফলে ভারতে বহু ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। কাহারও সাধনার সঙ্গে কাহারও মিল ছিল না। এখন ঈশ্বরের স্বরূপ-বিশ্লেষণে সাধনার ফলে প্রত্যেক সাধকের ভীতনে ঈশ্বরের বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশকে সাধরে গ্রহণ করিয়া, সকল ভাবের, সকল নামের সাধনার সমষ্টিকে একেতে পরিণত করিয়া, অখণ্ডে গ্রহণের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক সাধনার বৈশিষ্ট্য রহিয়া গেল, অখণ্ড সাম্প্রদায়িকতা চলিয়া গেল। সকল শ্রেণীর সাধকের এক অখণ্ড পরিবারে পরিণত হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। অপর দিকে পূর্বে যেমন কাহারও জ্ঞানপ্রদান জীবন, কাহারও ভক্তিপ্রদান, কাহারও যোগ-প্রদান জীবন ছিল, এখন এই বিশ্লেষণে সাধনার ফলে সকল ভাবের অঙ্গাঙ্গী ক্ষুরের দ্বারা, আত্মার সকল বিভাগের পূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইল।

২৪শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, ব্রহ্মমন্দিরে সন্ধ্যা ৭টার, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী “নব ভারতের ধর্ম” বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পূর্বের সকল ছাঁচ বদলাইয়া এক নূতন ছাঁচে নবযুগে নবযুগধর্ম বিবর্তিত কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। এই নবযুগধর্মের নামই সম্বয়-প্রধান নববিধান। তিনি বিশেষ ভাবে ধর্মপিতামহ রামমোহনের জীবনের বহুদিক্‌খীন কর্ম ও ভক্ত ব্রহ্মানন্দ-জীবনের লীলাপ্রধান সম্বয়ধর্মের অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করিয়া, “নববিধানের জয় নিঃসংশয়” ধ্বনিতে বক্তৃতা শেষ করেন।

২৫শে আগষ্ট, শুক্রবার, সন্ধ্যা ৭টার, শান্তিকুটীরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস ভক্তিতাবে কীর্তন করেন।

২৬শে আগষ্ট, শনিবার, সন্ধ্যা ৭টার, শান্তিকুটীরে “আমাদের লক্ষ্য” উৎসব হয়। ডাক্তার দত্তানন্দ রায় উপাসনা করেন।

ছেলেমেয়েরা মিলিত হইয়া সঙ্গীত করেন। আরাধনার শেষে শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ বেদীর পাশে দণ্ডায়মান হইয়া, নববিধান যে সকল প্রেরিতবর্ণ-যোগে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, তাঁহাদের পরিবারের মধ্যে স্বর্গগত ভাই কালীশঙ্কর কবিরাজের সহধর্মিণী একমাত্র এখন জীবিত আছেন উল্লেখ করেন, এবং তাঁহার হস্তে নববিধানের চিহ্নিত একটি মালা দিয়া তাঁহারই হস্ত দ্বারা ঐ মালাটা নববিধানমণ্ডলীর সুগারক বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র শ্রীমান্ ক্রবেশ্বর গলদেশে ঝুলাইয়া দিয়া আদর ও উৎসাহিত করা হয়। শ্রীমান্ ক্রবেশ্বর এই অল্প বয়সেই পিতার সঙ্গে স্নেহে সঙ্গীত করিয়া মণ্ডলীর বেক্স সেবা করিতেছে, ভবিষ্যতে বাহাতে বিধানমুরলী পিতার উপযুক্ত সন্তান হইয়া বিধানসঙ্গীত দ্বারা মণ্ডলীর সেবা করিয়া ধৃত হইতে পারে, তজ্জন্ত সকলের আশীর্বাদ ভিক্ষা করা হয়। তৎপর প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া জলযোগান্তে অদ্যকার উৎসব সম্পন্ন হয়।

২৭শে আগষ্ট, রবিবার, শ্রদ্ধের ভাই ব্রজগোপাল নিরোগীর স্বর্গারোহণের সাধুসঙ্গিক। প্রাতে ৭টার নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য্য করেন। সন্ধ্যা ৭টার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনার কার্য্য করেন। তিনি উপাসনার প্রথমার্ধ শেষ করিয়া নিবেদনে ভাই ব্রজগোপাল নিরোগীর জীবনের সেবার দিক্‌ বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রণের বিপরীত ছেলেমেয়েদিগের সেবার কাহিনী, হৃত্তিকপ্রদীপিতের সেবা, আপনার বচনোপাধি দেখিয়াছেন, ভাবের সহিত বর্ণনা করিয়া শেষ প্রার্থনা করেন। এক্ষণে উৎসবজননীর কৃপার এবারকার ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন।

## সংবাদ।

জন্মদিন—২৮শে আগষ্ট, সোমবার, সন্ধ্যা ৭টার, ডাক্তার কৃষ্ণভবনে, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী সেনের আস্থানে তাঁহার মাতৃ-দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। গত ১লা সেপ্টেম্বর, ৬৫১ হারিশন রোডে, বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয় কস্তা কল্যাণীয়া রমায় জন্ম-দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। পিতা কস্তার সকল ভিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। পিতা এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ১ টাকা দান করিয়াছেন।

উৎসব—ডাক্তার নববিধানবিশ্বাসিমণ্ডলী ব্রহ্মমন্দির-প্রতিষ্ঠার সাধুসঙ্গিক ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে আহুত হইয়া, কলিকাতা হইতে ভাই শিবনাথ মল্লিক সঙ্গীত, ভাই অখিলচন্দ্র রায় এবং বিধানমুরলী শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।



**বিদেশ-যাত্রা**—গত ৫ই সেপ্টেম্বর, চট্টগ্রামের স্বর্গীয় রাজেশ্বর ঊন্থের কনিষ্ঠ সন্তান, আমাদের সকলের প্রিয় শ্রীমান বিজয়শ্রী গুপ্ত সঙ্গীক শিশুপুত্র সহ পুনরায় জাশ্বিনী যাত্রা করিয়াছেন। ছই বৎসর পূর্বে তিনি সঙ্গীক জাশ্বিনী হইতে দেশে আসিয়াছিলেন। মঙ্গলবার মঙ্গল ইচ্ছা তাঁহাদের জীবনে পূর্ণ হোক।

**সেবা**—গত ১৭ই জুলাই, ভাই অখিলচন্দ্র রায় বালেখরের সুগায়ক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া, কাঁথিতে নববিধানপ্রচারার্থে গমন করিয়া, তথায় ৬দিন স্থিতি করেন। প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে ব্রাহ্ম কমিটার বাবু বিপিনবিহারী শাসমলের বাড়ীতে উপাসনা, আচার্যের উপদেশ-পাঠ, সংগীত ও সংকীর্তনযোগে বিশ্বাস প্রচার করিয়াছেন। কেবল ২০শে জুলাই, সায়ংকালে কাঁথি ব্রাহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়; ঐ দিন কাঁথির ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা প্রায় ৬০ জন উপাসনার যোগ দেন। ভাই অখিলচন্দ্র রায় বেদীর কার্য করেন, আচার্যের উপদেশ হইতে “স্বর্গীয় প্রেম” বিষয়ক উপদেশটা পাঠ করিয়া, এট প্রেমই যে সমস্ত মানবপরিবারকে একতার সূত্রে বন্ধ করিয়া ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবে, তাহাট বিবৃত করেন। কাঁথি ব্রাহ্মসনাতনের সভাপতির ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনার সপরিবারে যোগদান ও উপাসনার অন্তরাগ দেখিয়া আমরা অত্যন্ত খ্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রিয়বন্ধু বিপিনবাবুর পরিবারের আদর বহু ও অতিথিসংকার বাস্তবিকই অত্যন্ত খ্রীতিপ্রদ। কাঁথি উপ-বিভাগে, মফঃস্বলে ও সহরে অনেকগুলি বিশ্বাসী পরিবার আছেন। এটা নববিধানপ্রচারের একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র। মঙ্গলময় তাঁর বিধান রক্ষা বিস্তার করুন।

**জন্মদিন ও স্বর্গদিন**—গত ১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, পূর্বাহ্নে, ১৪৫১এ, ল্যান্ডডাউন রোডস্থ ভবনে, ডাক্তার সত্যানন্দ রায়ের শিশু পুত্র শ্রীমান সুন্দরেন্দ্র জন্মদিন ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী সত্যিত রায়ের স্বর্গারোহণের প্রথম সাধুসঙ্গিক উপলক্ষে, শ্রীযুক্ত বেণুধর দাস উপাসনার কার্য করেন। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ ও মনোয়ারা মহারানী শ্রীমতী সূচাক দেবী বিশেষ প্রার্থনা করেন। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসনার ভাই অক্ষর কুমার লখ তাঁহার জীবন নববিধানের ধর্ম ও কর্ম কেমন সমন্বিতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা উল্লেখ করেন।

**বিশেষ কৃতিত্ব**—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, এলাহাবাদ-প্রবাসী, আমাদের পরম প্রিয় বন্ধু অবসরশ্রান্ত ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেগনজর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী কুমারী রমা বোস এবার দর্শনশাস্ত্রের এম.এ. পরীক্ষার বিশেষ কৃতিত্ব ও প্রশংসার সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। কল্যাণী আই.এ. পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থান এবং বি.এ. পরীক্ষারও দর্শনশাস্ত্রের অনাগে প্রথমবিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান তাঁহার কল্যাণে আশীর্বাদ করুন।

**সাম্বৎসরিক**—গত ২৫শে আগষ্ট, স্বর্গীয় লক্ষণচন্দ্র সিংহের সহধর্মিণী শ্রীমতী বসন্তকুমারীর এবং ২৬শে আগষ্ট স্বর্গীয় লক্ষণচন্দ্র সিংহের সাধুসঙ্গিক স্বরণে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ২৭শে আগষ্ট, তত্ত্বিজ্ঞান প্রেরিত ভাই অমৃতলালের স্বর্গারোহণ দিন উপলক্ষে ১৩১১ রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ভবনে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং শ্রীমতী ভক্তিমতী দেবী ও শ্রীমতী চিত্তবিনোদিনী দেবী উভয়েই বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৭শে আগষ্ট, স্বর্গগত ভাই ব্রহ্মগোপাল নিরোগীর সাধুসঙ্গিক দিনে, ভাই অক্ষর কুমার লখ প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়া শ্রীমান জ্ঞানাজন নিরোগীর সঙ্গে বিশেষ উপাসনা করেন। শ্রীমান জ্ঞানাজন সুন্দর প্রার্থনা করেন। ভগবান তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। ঐদিন প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং সদ্ধার ব্রাহ্মমন্দিরে ডাক্তার কান্যধান্য বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। কান্যধান্য নিরোগী মহাশয়ের সুন্দর প্রেমপূর্ণ সেবার জীবনের বিষয়ে ব্যক্তিগত সাক্ষা দান করেন।

গত ২৭শে আগষ্ট, বাহির মির্জাপুর রোডে, শ্রীমান সন্তোষ কুমার দত্তের মাতৃদেবীর সাধুসঙ্গিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১৭ই ভাদ্র, প্রাতে, তাওড়া, বাঁটিরা নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার শরৎকুমার দাসের সাধুসঙ্গিক উপলক্ষে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য করেন। এই উপলক্ষে অমরাগড়ী প্রচারক ১ ও নববিধান প্রচারক ১ টা কা দান করিয়াছেন।

গত ১লা সেপ্টেম্বর, স্বর্গীয় মহারানী রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ ভূপাঠাচর্যের স্বর্গারোহণ-সাধুসঙ্গিক উপলক্ষে, কোচবিহারে কেশবপ্রসন্ন সমাধিমণ্ডপে বিশেষ উপাসনা হয়। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী উপাসনা করেন। রাজকর্মচারিগণ প্রায় সকলেই উপস্থিত থাকিয়া শ্রদ্ধাদান করেন। এই উপলক্ষে শ্রীমদাচার্যদেবের পরিবারবর্গের উদ্যোগে কমলকুতীরে নবদেবালয়েও উপাসনা হয়। ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। মাননোয়া মহারানী শ্রীমতী সূচাক দেবী প্রমুখ পরিবারস্থ কেহ কেহ যোগদান করেন। মহারানী শ্রীমতী সূচাক দেবী প্রার্থনা করেন। পুরী নবপূর্ণকুতীরেও ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর, ৪৪নং নিউ থিয়েটার রোডে, অক্সেস কান্যধান্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী স্বর্গীয়া ক্ষীরোদাচন্দ্রদেবীর প্রথম সাধুসঙ্গিকে ভাই অক্ষর কুমার লখ উপাসনা করেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত দেবকীবন বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃ-মহাদেবীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। কান্যধান্য বাবু সুধর্মিণীর উদ্দেশে বেনিবেদন করেন, তাহা স্থানান্তরে দেওয়া গেল।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলপাড়ার বাড়ীতে, স্বর্গগত ভাই রামচন্দ্র সিংহের স্বর্গারোহণের সাধুসঙ্গিক দিন উপলক্ষে, ভাই

শ্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে পুত্রবধু শ্রীমতী ইন্দুরেখা সিংহ প্রচারভাণ্ডারে ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১০ই সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যার সময়, শ্রীমতী নির্মলা বসু রীতি তৃপ্তিকুটরে, স্বর্গীরা ভগিনী সূর্য প্রথম সাংসারিক উপলক্ষে শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্র উপাসনার কার্য করেন। নির্মলা বসু প্রার্থনা ও সঙ্গীত করেন। এই উপলক্ষে, সূর্য প্রথমখণ্ড যাত্রিনিবাস-নির্মাণার্থ ২০ টাকা দান স্বীকার করা হইয়াছে।

রাজর্ষির শতবার্ষিকী—পুণীতে ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক উৎসব সম্পাদনের জন্য একটা কার্য-নির্বাহক সভা গঠিত হইয়াছে। এই সভার সভাপতি কালেক্টর মিঃ এন, পি, খড্গনি, সম্পাদক পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ জে, এন, দে এবং প্রভেদ তাই শ্রিয়নাথ মল্লিক, স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। নববিধানের নবশ্রীক্ষেত্র-ভূমিতে মণ্ডপ করিয়া উৎসব সম্পন্ন করা হইয়াছে।

ব্রহ্মমন্দির—গত ১৩ই আগষ্ট, ভাদ্রোৎসবের পূর্বে রবিবার, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনাকালে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ যে আত্মনিবেদন করেন, তাহার মর্ম সংক্ষেপে এই ভাবে গৃহীত হইতে পারে। সমুখে সাধন-প্রধান ভাদ্রোৎসব। এ সময়ে আমরা এই নবযুগে নববিধানে কত বড় সাধনসম্পদ স্বর্গ হইতে লাভ করিলাম, তাহার কিরূপ ব্যবহার আমরা জীবনে করিলাম, তাহার হিসাব লইয়া এ সময় আমাদের উৎসবদায়িনী জননীর চরণসমীপে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা প্রকাণ্ড সাধনসম্পদ পরম পিতামাতা হইতে পাইরাছি। অতীতের স্বদেশের বিদেশের বিচিত্র বিধান, স্বদেশের বিদেশের সাধু ভক্ত মহাজন-দিগের পবিত্র চরিত্র, বর্তমান বিধানে অভিব্যক্ত কত দর্শন, শ্রবণ ও জ্ঞানের বাণীর অমূল্যমূলক কত সাধন-সম্পদের অধিকারী হইরাছি; কিন্তু আমাদের জীবনে এই সাধনসম্পদের ব্যবহার কিরূপ হইল, তাহা নিজ নিজ জীবনে চর্চা করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের অধিকাংশ জীবনে সাধনসম্পদের কতই অপব্যবহার হইয়াছে। বাইবেলে কথিত অমিতাচারী পুত্রের মত নিজকে অপরাধী জানিয়া, যদি পরম পিতাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারি, তবে তিনি আমাদের অধিকারকে তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পিত কতিপয় অমূল্য সন্তানরূপে পাইরা, আপনাদের আল্লাদে আমাদের লইয়া স্বর্গের তাঁহার সাধু ভক্ত সন্তানগণ সহ এমন উৎসব করিবেন যে, সে উৎসবের আর তুলনা হয় না।

দানপ্রাপ্তি—চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দিরের সম্পাদক ডাক্তার অমৃতকুলচন্দ্র মিত্র কৃতজ্ঞতার সত্তিতে, চুঁচুড়া ব্রহ্মমন্দিরের সাময়িক আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত, নিরলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন—

(১) ব্রহ্মানন্দমন্দিরী শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর আদ্যপ্রাচ্যে তদীয় পুত্র কুমার বিকাশেন্দ্রনারায়ণ ৫০; (২) স্বর্গগত ডাক্তার

নরুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংসারিক প্রাচ্যে তদীয় পুত্র ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০; (৩) একমাত্র সন্তান শ্রীমান প্রেমেন্দ্রনাথের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে তদীয় জননী শ্রীমতী সুখাংকিকাশিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

## কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ।

শ্রীমতী প্রাপ্তি: বঙ্গমুখ্য সহ প্রকাশ করিতে বহু টাকা খণ্ড হয়। পরম মঙ্গলময়ের কৃপাতে সেই খণ্ড পরিশোধ হইয়াছে। একত্র মঙ্গলময়ের চরণে কৃতজ্ঞ অন্তরে বার বার প্রণাম করি এবং যে সকল দয়াজ্ঞ বহু বিবিধ উপায়ে অর্থাৎ কৃপা, সাহায্য এবং সত্যভূতি করিয়াছেন, সন্তোষ হৃদয়ে তাঁহা-দিগকে স্বরণ ও নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি।

১। প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মনোমোহন দাস বি.এল, নিবাস পোড়া মহল্লা, ঢাকা, হাতিরাতে (নোরাখালী) উকিল, এ কার্যে ২০০ টাইল্ড টাকা দান করিয়াছেন।

২। এলাহাবাদনিবাসী প্রভেদ জ্ঞানেন্দ্রেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে ২০০ টাকা হাওলাত গ্রহণ করি। গ্রন্থবিক্রয় দ্বারা তাঁহার ২০০ টাকা পরিশোধ হয়। বাকি দশ টাকার গ্রন্থ তিনি গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত করিয়াছেন।

৩। স্বর্গগত প্রভেদ তাই বিহারীলাল সেন এককালীন ১০০ টাকা দান এবং কয়েকখণ্ড গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

৪। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীপ্রতাপচন্দ্র তত্ত্বদেব নগদ মূল্য দিয়া গ্রন্থের দশ খণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন।

৫। কলিকাতা গিরিশবিহারী ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীমান জিতেন্দ্রমোহন সেন পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে এই গ্রন্থের মুদ্রণ কর্তৃক ১০০ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

৬। অধ্যাপক শ্রীমান নিরঞ্জন নিয়োগী সাহায্য সহিত গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া সাহায্য করিয়াছেন। পরিশোধ হওয়াতে গ্রন্থের মূল্য কম করা গেল।

কাপড়ে বাঁধা গ্রন্থ ৫০ হলে আ.০ টাকা; কাগজে বাঁধা ৪০০ হলে ৫০ টাকা।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

৩৫ বিধানপল্লী, পোঃ রমণা, ঢাকা ৪

Edited on behalf of the Apostolic Durbes New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ বঙ্গমন্দির ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেদ্যে" উপরিতোষ ঘোষ কর্তৃক ২রা আশ্বিন, বুদ্ধি ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

স্ববিশালমিহং বিশ্বং পরিভ্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।

চেতঃ স্তনির্গলস্তীর্ণং সত্যং শাস্ত্রমনবরম্॥

বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি শ্রীতিঃ পরমসাধনম্।

স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈবেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৩৮ ভাগ।

১৮১১২৩ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন ও ১লা কার্তিক, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

2nd & 18th. October, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা।

মা, তোমার নববিধান সত্যই উৎসবের বিধান। এই বিধান পাল্লায় যে পড়ে, তাহাকে উৎসবের পর উৎসব আসিয়া চির উন্মত্ত করে। যাহাদিগকে তুমি তোমার নব-বিধানের ঘোরতর ধর্মের ভিতর ফেলেছ, তাহাদিগকে সত্যই তুমি নাকে দড়ি দিয়ে টান এবং পিঠে মারিতে মারিতে উৎসবের পর উৎসব করাইয়া নেহাল করিয়া তোলে। আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া সংসারের পথে যখন চলি এবং একটা আশুট নিয়ম রক্ষা মত উপাসনা করিয়া দিন কাটাই, তখন পাপ চিন্তা, সংসার-চিন্তা, নীচ কামনা বাসনা আসিয়া আমাদের কাছে আসে। তাই তুমি উৎসবের পর উৎসব দিয়া এমনই মত্ত করিয়া রাখিতে চাও যে, যাহাতে আমাদের পাপ করিবার, বিষয়বাসনায় মজিয়া থাকিবার অবসরই না থাকে। দিন রাত্রি তোমারই পূজায়, তোমারই সেবায়, তোমারই নামগানে, তোমারই উৎসব-সাধনে দিন কাটাইতে বাস্তব যে, তাহার ছুটি কোথায় পাপ করিতে। পৌরাণিক হিন্দু সাধকগণও বুঝি, তাই উপযুক্ত পুণি উৎসব সাধন করিয়া, ধর্মোন্মত্ততায় উন্মত্ত হইয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন; আজ দুর্গোৎসব,

কাল লক্ষ্মীপূজা, পরে শ্যামাপূজা, ভ্রাতৃত্বভীয়া, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্তিকপূজা ইত্যাদির অনুষ্ঠান। নববিধানে এ সমুদয় উৎসবই আধ্যাত্মিক ভাবে সম্পন্ন করিতে তুমি শিখাইয়াছ। তা ছাড়া সর্বধর্মের সকল উৎসবেই আমাদের প্রণোদিত কর এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সাময়িক উৎসবসাধনেও যোগ সমাধান করাইয়া কতই আমাদের ধন্য করিয়া থাক। আবার এবার এই জাতীয় উৎসব-সময়ে, আমাদের ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী সাধনও এক মহা উৎসব রূপে আনিয়া দিয়াছ। এই উৎসবে যেন আমরা আমাদের ধর্মপিতামহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাদানে তাঁহার স্মৃতি চির রক্ষা করিয়া ধন্য হইতে পারি। তিনি আমাদের জাতির ও দেশের ঘোর অন্ধকার ও জঙ্গলময় অবস্থায়, জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেরণায়, মহাবীরত্ব ও ধর্মসাধনায় উদ্দীপ্ত হইয়া নববিধানের বীজ বপন করিলেন, যাহা হইতে আমরা নিত্য নিত্য নব নব উৎসব-সন্তোগের অধিকার পাইলাম। আশীর্বাদ কর, যেন এই নব-বিধানে বিশ্বাসী হইয়া, আমাদের দেশ, আমাদের জাতি এবং সমগ্র জগৎ নিত্য উৎসবে নিত্য ব্রহ্মানন্দসন্তোগে ধন্য হয়। দেশের ও জাতির যত কিছু দুর্গতি, বাস্তবিক দুর্দিন, সকলই যাহাতে দূর হয়, এবং সর্বধর্মের সমন্বয়ে,

সর্বজাতির সম্মিলনে, সকল প্রকার জড়বাদ, অপ্রেম  
অশান্তি নির্বাহণ হয়, মা দয়া করে এমন আশীর্বাদ কর।

শান্তিঃ !

শান্তিঃ !!

শান্তিঃ !!!

—o—

## ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শত- বার্ষিকী।

“নমি ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন,  
করিলেন যিনি নবযুগধর্মবীজ বপন,  
স্তব স্তুতি বিদ্যা বুদ্ধিবলে করি উদ্ভাবন,  
সর্বধর্মশাস্ত্রমণ্ডল এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন।”

আমাদের ভক্তিভাজন ধর্মপিতামহ রাজর্ষি শ্রীরাম-  
মোহন ১৮৩৩সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, বৃন্দল নগরে,  
এই নম্বর দেহ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করেন। সেই  
দিনের শতবার্ষিক সাংসারিক দিন, সেই ২৭শে সেপ্টেম্বর  
দিন, ধর্মজগতে এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই পবিত্র  
শ্রাদ্ধবাসরে আমরা আমাদের ধর্মপিতামহের দিবা  
আত্মার প্রতি প্রাণগত ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়া ধন্য  
হইলাম।

রাজা রামমোহন রায় যে বহুগুণসম্পন্ন মহাপুরুষ  
ছিলেন, ইহা সর্বজন স্বীকৃত। তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি,  
বিদ্যাবত্তা, ধর্মস্বাধীনতা এবং স্বদেশপ্রিয়তা স্মরণ করিলে,  
স্বতঃই অন্তরে কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়।  
তাঁহার প্রতি সম্মান দান করা মানব মাত্রেরই স্বাভাবিক  
কর্তব্য। বিশেষ ভাবে আমরা যখন নববিধানে বিশ্বাস  
লাভ করিয়াছি, তখন আমাদের কাছে তাঁহার সঙ্গে বিশেষ  
ব্যক্তিগত সম্বন্ধে বিধাতা সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; তাই নব-  
বিধানাচার্য্য এক কথায় সেই সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়া, তাঁহাকে  
আমাদের ধর্মপিতামহ বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন।  
বাস্তবিক তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ অতি নিগূঢ়।  
নববিধানের আদি বীজ ভগবান্ তাঁহাকে দিয়াই বপন  
করিয়াছেন।

নববিধান সর্বধর্মসম্ময়জীবনের বিধান। জ্ঞান  
এই ধর্মবিধানের আদি মত রামমোহনের  
প্রাণে উদ্ভাবিত হয়। আশ্চর্য্য অলৌকিক মেধাবলে

তিনি সকল ধর্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া, একেশ্বরবাদ বেরুপে  
প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে বিধাতারই প্রেরণা ভিন্ন আর  
কি পরিলক্ষিত হয়? তাই ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “শত  
সহস্র টাকার ঋণে আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী। তিনি  
আমাদের ভক্তিভাজন, কৃতজ্ঞতাভাজন। সাধুভক্তি  
যদি আমাদের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ হয়, তবে আমরা  
কি রামমোহনকে বিদায় করিয়া দিতে পারি? কোথায়  
থাকিত এ ব্রাহ্মসমাজ? যদি ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন না  
আসিতেন। তিনি বড় লোক, কি রাজা ছিলেন, তাহার  
বিচার আমরা করিব না। আমরা তাঁহার নিকট একটা  
বিস্তীর্ণ জমিদারী পাইয়াছি। সেই তালুকের প্রজা  
আমরা। ভূয়ানক পৌত্তলিকতার বন কাটিয়া তিনি  
একখণ্ড ভূমি আবাদ করিলেন। সেখানে কতকগুলি  
প্রজার বসতি করিয়া দিলেন। জরবিকারে কণ্টকবনে  
লোকে মরিতেছিল, এই যে সামান্য ভূমিখণ্ড, ইহা হইতে  
ব্রহ্ম-আরাধনা এই দেশে আবার প্রবল হইল।  
আবার কয়েকটা লোক এক ব্রহ্মকে পূজা করিতে  
লাগিল। ভগবান্ই তাঁহার পূজা রামমোহনকে পাঠাই-  
লেন। তাঁহার জন্ম ভারতে ব্রাহ্মসমাজ আপনার মস্তক  
উত্তোলন করিয়াছে। তাঁহার স্তব স্তুতিতে, বিদ্যাবুদ্ধিতে  
পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল। এই জন্ম-  
নাম কৃতজ্ঞতা ফুলে গলায় জড়াইয়া রাখি। সেই ধর্ম-  
পিতামহ এত উপকার করিয়া গেলেন, তিনি হাতে হাতে  
ধর্মধন দিয়া গেলেন। যখন ব্রাহ্মসমাজে বসিয়া, প্রজা  
হইয়া শস্য সংগ্রহ করিতেছি, তখন তাঁহার নিকট এই  
তালুক লাভ করিলাম, যিনি ঘোর অন্ধকারের মধ্যে  
বসিয়া সহস্র লোকের তীব্র নির্ঘাতনে ব্যথিত হইয়া, জয়  
জগদীশ! জয় জগদীশ! বলিয়া কেবল ঈশ্বরের  
মুখের পানে তাকাইলেন, ব্রহ্মের ঘর প্রতিষ্ঠিত করিলেন,  
তিনি জয়ী হইলেন। ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্বাদ  
করিলেন, বলিলেন, ‘প্রিয় সম্ভ্রান, ঘরে এসো’। তিনি  
তবে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।  
তাঁহার জন্ম প্রার্থনা করিব। পরাৎপর পরব্রহ্ম  
তাঁহার ঈশ্বর। তাঁহার ও আমাদের ঈশ্বরের নিকট  
তাঁহার জন্ম শুভ ইচ্ছা উৎখিত হউক।”

নববিধানাচার্য্য যদিও অমৃত বলিলেন, “মত হইতে  
জীবন বড়, ব্রাহ্মসমাজ হইতে নববিধান বহু দূরে”, কিন্তু  
বীজপত্তন না হইলেত ব্রহ্মের উদগম হয় না, ভিত্তি-

স্থাপন না হইলেত অট্টালিকা-নির্মাণ বা অট্টালিকায় বাস সম্ভবপর হয় না। তাই আমাদের ধর্মপিতামহ ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া, স্রীয়া স্বাধীন ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা জ্ঞান নিজ পিতৃদেব কর্তৃক বর্জিত হইয়া, দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া সত্য শিক্ষা ও সঞ্চয় করিলেন; সেই সময়ে অগম্য তিব্বতে পর্য্যন্ত গমন করিলেন, প্রাণসংশয়াপন্ন হইয়া দেশে ফিরিলেন, এবং আরবী, পারস্য, সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক ইত্যাদি ভাষা অধ্যয়ন করিয়া, এসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ইত্যাদি হইতে একেশ্বরবাদ সংগ্রহ-পূর্বক বিভিন্ন ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত তর্ক বিতর্ক এবং আলোচনা করিয়া আপন মত প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সর্ব-ধর্মাবলম্বীদিগের একত্র মিলিত হইয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবার জ্ঞান ব্রাহ্মীয় সভা স্থাপন ও সমাজগৃহ নির্মাণ পূর্বক অভিনব সমন্বয়বিধির মূল পত্তন করিলেন। ইহা কি সামান্য? ইহা কি সাধারণ লোকে পারে?

এতদ্ব্যতীত বাংলা ভাষায় গদ্য রচনা আবিষ্কার ও তাহার ব্যাকরণ রচনা, রাজসহায়তায় ভীষণ সহমরণ-প্রথা মিবারণ এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন ও নানা প্রকার সংস্কারের সূত্রপাত করিয়া সর্ব প্রথম সমুদ্র-যাত্রা করিয়া বিলাত গমন ও ভারতের প্রতি ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধিদিগের করুণ দৃষ্টি আকর্ষণ, এই সকল কি অলৌকিক নয়?

বঙ্গদেশের হুগলী জেলার সামান্য ক্ষুদ্রপল্লী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিলাতের বুটলনগরে দেহত্যাগ, ইহাও কখনকার সময়ের পক্ষে এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত ব্যাপার ভিন্ন আর কি বলিব? বিধাতার নিদানে বিশ্বাসী হইয়া এই অসাধারণ মহাপুরুষের জীবনলালা-কাহিনী যদি আমরা অধ্যয়ন করি, ইহার প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে বিধাতারই হস্তলিপি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হই।

কি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ সঙ্গীত সকল রচনা করিয়া তিনি ভারতকে নবজাগরণে জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন। নববিধানে পরে যে একান্ততার সাধনা ব্রহ্মানন্দ-জীবনে পরিস্ফুট ও প্রত্যক্ষীভূত হইল, সমগ্র মানবসমাজ যে এক এবং সর্ববিশ্ব, সর্ব-জাতি, সর্বদেশ, সর্ব মানব এক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে গাঁথা হইয়া একত্বলাভ করিবে, ইহা যে তিনি নিজ জীবনে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহারও আভাস

কি সুন্দররূপে আমাদের ধর্মপিতামহ তাঁহার রচিত এই গানে দিয়া গিয়াছেন :—

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি,

তোমার রচনা মধ্যে গোমাকে দেখিয়া ডাকি।

দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা, প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য

দেয় তোমার মহিমা; তোমার প্রভাবে দেখি না

থাকি একাকী॥

ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে তাই একান্ততা অবলম্বন করে, আমরাও তাঁহাকে আমাদের ধর্মপিতামহ জানিয়া, অন্তরের শ্রদ্ধা অর্পণ করি এবং আচার্য্যের সহিত প্রার্থনা করি, “যদিও আমরা বাহ্যভাবে এখন তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু আধ্যাত্মিক যোগে যেন নিত্যকাল একই ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতে পারি।” তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম অনুসরণ করিয়া ভারতে এবং জগতে যে নববিধানের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাও আশা ও বিশ্বাসনয়নে দর্শন করি।

## ধর্মতত্ত্ব।

ঈশ্বর ও পরলোকবাসী অমরাত্মাগণ।

ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও যেমন নিত্য আছেন, পরলোকগত আত্মাগণ দেহমুক্ত হইয়াও আকারশূন্য অবস্থাতেই রহিয়াছেন। ঈশ্বরকে দেখিতে হইলে যেমন বিশ্বাসচক্ষে দেখা যায়, তেমনি পরলোকস্থ আত্মাদিগকে দেখিতে চাহিলেও বিশ্বাস-চক্ষুই খুলিতে হয়। মা যিনি, তিনি সম্মান ছাড়া থাকেন না; তাই মা দেখানে, সম্মানগণও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করেন। উপাসনা-কালে যেমন আমরা মার কাছে যাই বা মাকে কাছে পাই, তেমনি মার ভিতর দিয়া পরলোকগত আত্মাদিগকেও কাছে পাইতে পারি। ঈশ্বর ও পরলোক একই। ঈশ্বরেতে অবস্থানই পরলোকে অবস্থান। বাহ্যভাব পরিভাগ করিয়া এক ঈশ্বরে বাস করাই পরলোকে একত্র বাস করা। পরস্পরের সহিত যথার্থ কাছাকাছি হইবারও উপায়, একই ঈশ্বরের উপাসনা বা ঈশ্বরের কাছে বসা।

## মূর্তিপূজা।

মূর্তিপূজা কল্পনার পূজা, আসল পূজা নয়; ইহা মূর্তির উপাসকও স্বীকার করেন। কেন না, মূর্ত্যু দেবী গঠন করিয়া, যতক্ষণ না “ইহাগচ্ছ, ইহ ভিষ্ঠ” এখানে এস, ইহার নিকটে অবস্থান কর” এই মন্ত্র-যোগে সে মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা না করা



হয়, ততক্ষণ সে মূর্তির পূজা হয় না। তবে কেমন করিয়া বলিব, মূর্ত্তর দেবদেবীর উপাসনা হইতে পারে, কিংবা মূর্ত্তের পূজা কেত করেন। মূর্ত্তর কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। হির ভাবে চিত্তা করিয়া দেখিলে, সমুখস্থ স্থান শূন্য মনে করিয়া, “দয়াল এস হে, এস হে” বলিয়া, ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া উপাসনা করাও বা, “ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ” বলাও তাই। তবে মূর্ত্তর মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করা কেবল একটা কল্পিত অভ্যাস বা সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নয়; ইহার প্রয়োজনীয়তা কিছুই নাই। এই ভক্তই পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত ধর্ম্মবন্ধুতা হইলে, মাঝে মাঝে ভাবাবেশে মূর্ত্তরী কালীকে গালাগালি দিয়া বলিতেন, “তুই আমাকে এদিন আসল মাকে দেখকে দিগ্গনি”; এবং ত্রীকেশবকেও বলিতেন “তোমার কাছে এলে আমার চৌদ্দপোয়া মা গলে যায়।” অর্থাৎ নিরাকারা চিন্ময়ী হয়ে যায়।

### নিরাকারকে দেখা।

অজ্ঞানতাই অন্ধতা। চক্ষু অন্ধ হইলে সমুখে কিছুই দেখিতে পার না, কেবল অন্ধকার বা শূন্য দেখে বা করনা করে। বাহ্য-চক্ষু বার আছে, সে বাহিরের বস্তু দেখে; কিন্তু জ্ঞানচক্ষু না থাকিলে কোন্ বস্তু কি, তাহা চিনিতে পারে না। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা দেখিয়াও দেখি না; কেন না, সেই ব্যক্তি যে বিশেষ ব্যক্তি, তাঁহাকে চিনিতে পারি না। এই জ্ঞান জ্ঞানট বস্তু চক্ষুর জ্যোতি, জ্ঞানই চক্ষু। এই চক্ষু থাকিলে অন্ধ-কারেও আলো দেখা যায়। বিজ্ঞানচক্ষু দ্বারা দেখা যায়, মাধ্য-বর্ধনী শক্তি সমুদ্রকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তেমনি অধ্যাত্ম জ্ঞান-চক্ষু দেখিতে পায় প্রত্যক্ষ নিরাকারকে—তিনিই এত এখানে উজ্জলরূপে আছেন, সমুদ্র শূন্য পূর্ণ করিয়া আছেন এবং তাঁর নিরাকার প্রেমের বাঁধনে জগৎকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, পর-স্পরকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী পরস্পর যেমন নিরাকার আকর্ষণী শক্তির বাঁধনে বাঁধা, সমুদ্র মানব-সমাজ ও পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা।

### মূর্ত্তয়ে চিন্ময়।

বহিঃকর্তার বাহ্য কিছু, তাহা মূর্ত্তর হইলেও, তাহার ভিতরে চিন্ময় নিহিত। মূর্ত্তয়ে চিন্ময়ে সংমিশ্রিত হইয়া এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। বিজ্ঞান যেমন বিশ্লেষণ করিয়া পদার্থের অভ্যন্তরস্থ সার বাহ্য কিছু তাহা বাহির করিতে পারে, তেমনি বিশ্বাস-বিজ্ঞানে মূর্ত্তর দেব দেবী বা বাহ্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সংস্কার আচরণ, সাধনপ্রক্রিয়া আদি সকলকার ভিতর হইতেই সার ব্রহ্ম-স্বরূপ নির্গত করা যায়। এই জন্য নববিধান সকল ধর্ম্মের সকল সাধন অনুষ্ঠান হইতেই সত্য উদ্ধাবন করিয়া আপনার

আত্মার পুষ্টি সম্পাদন করেন। কিছুকেই সম্পূর্ণ পরিত্যক্তা বলিয়া চিরবর্জন করেন না।

### দুর্গোৎসবের বিশেষ শিক্ষা।

সকল ধর্ম্মের সকল উৎসবে প্রায় ঈশ্বরের এক এক ভাব বা এক এক স্বরূপকে দেবতারূপে বা উপাস্য রূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। বাঁহারা একেশ্বরবাদী, তাঁহারা ত একই ঈশ্বরকে নিজ নিজ ভাবে পূজা করেন; বাঁহারা বহুদেবতার উপাসক, তাঁহারাও এক এক সময় বা এক এক স্থানে এক এক দেবতারই পূজা বা উৎসব করেন। শিব, কালী, কৃষ্ণ, রাম, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক এতরূপ এক একটি দেবতারই পূজা বা উৎসব হইয়া থাকে; কিন্তু দুর্গোৎসবের বিশেষত্ব একাধারে সকল দেবতার পূজার উৎসব। দেবীকে যখন মাতৃ-ভাবে উদ্ভাবিত করিয়া পূজা করা হইয়াছে, তখন মা তাঁর সন্তান সন্ততিগণ সহ, মা কখন সন্তান ছাড়া হইতে পারেন না, গৃহস্থের পূজা গ্রহণ করিয়া, গৃহস্থকে সপরিবারে আনন্দ উৎসব দান করেন। মা যেমন সপরিবারে সদস্যনে স্বর্গের উৎসব দান করেন, তেমনি উপাসকও সপরিবারে, সদস্যনে, সপরিভনে তাঁহার প্রসাদ সন্তোষ করিয়া ধৃত হইবেন। ইহাই দুর্গোৎসবের বিশেষ শিক্ষা। নববিধানেও এই জ্ঞান একা একা সাধন হয় না, সপরিবারে সদলে মাতৃ পূজা করিতে হয়।

### শারদীয় উৎসব।

ব্রহ্মানন্দ বলেন, “উৎসবের অর্থ নৃতন।” নৃতন কিছু দেখিলেই স্বতঃই মন আনন্দ উৎসবে উন্মত্ত হয়। আকাশের পূর্ণচন্দ্র, নদীর ভরা জল, স্নিগ্ধ সমীরণ, পক্ষীর মধুর সঙ্গীত, ফুলের সৌরভ ও সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির বিচিত্র শোভা, সাগরের আনন্দ-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস দেখিয়া মাত্র কাহার না মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়? আবার তাহা প্রথম নৃতন দেখিলে কাহার মন না উৎসবানন্দে পূর্ণ হয়? তাই এক এক বছর পরিবর্তনে, নববিধানাচার্য্য বিশেষ-ভাবে এক একটি উৎসব-সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শরৎকাল তাই উৎসবের একটা বিশেষ সময় বলিয়া নির্দিষ্ট। বর্ষার জলে শুক ক্ষেত্র ভরাট ও প্রাবিত হইল, খাতক্ষেত্রে শস্যরোপণ হইল, আকাশ মেঘযুক্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, এক দিকে বর্ষা শেষ হইল, আর এক দিকে শীতের আরম্ভ হইল, এমন সময়ে পৃথি-বীতে লক্ষীর দৃষ্টি পড়িল, ইহা অনুভব করিয়া শারদীয় উৎসব করা যে বিশেষ আনন্দ যম, ইহা কি আমরা অস্বীকার করিতে পারি? নদীকে বা সাগরোপকূলে এই উৎসব-সাধন বর্ষারই আত্মার পক্ষে বিশেষ কল্যাণপ্রদ। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে আমাদের মলিন আত্মা প্রকৃতিস্থ ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়, ইহাই এই উৎসবের সাধন ও শিক্ষা।

## রাজশ্রী নৃপেন্দ্র-সমাগম।

(কোচবিহারে ১৮ই সেপ্টেম্বর, সাধারণ শ্রাদ্ধসভায় তাই  
প্রিয়নাথের অভিজ্ঞাষণ)

“অহমস্মি”—আমি আছি। “আমি জীবিতদিগের ঈশ্বর।  
মৃতদিগের নই।” “Faith beholdeth God and behol-  
deth immortality.”

আর্য্য ঋষিগণ পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে  
এই ঋগ্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন:—

“যন্তে যমং বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্।  
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥  
যন্তে বিশ্বমিদং জগন্মনো জগাম দূরকম্।  
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে  
যন্তে ভূতং চ ভব্যং চ মনো জগাম দূরকম্।  
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ॥”

“তোমার যে আত্মা দূরে পরলোকের দেবতার নিকট  
গিয়াছে, আমরা তাকে পুনরাহ্বান করিতেছি; তাহা  
আমাদের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক। তোমার যে  
আত্মা আজ এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা  
তাকে পুনরাহ্বান করিতেছি; তাহা আমাদের মধ্যে বাস  
করুক ও জীবিত থাকুক। তোমার যে আত্মা সুদূর  
অতীতে বা সুদূর ভবিষ্যতের পথে গিয়াছে, আমরা তাকে  
পুনরাহ্বান করিতেছি; তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক ও  
জীবিত থাকুক।”

আমরাও আজ এই কুচবিহারাদিপতি রাজশ্রী নৃপেন্দ্র-  
নারায়ণের পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে, ঋষিদিগের সেই মন্ত্রই পুনরাবৃত্তি  
করিলাম। এই রাজ্যের কোন্ অধিবাসী, প্রজা বা অমাত্য  
কিবা সমগ্র ভারতবাসী কে না আমাদের এই মন্ত্রোচ্চারণে  
মুমতানে যোগদান করিবেন? কোন্ প্রাণ আজ না চায়, তাঁর  
সেই দিব্য আত্মা আবার আমাদের মধ্যে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়া  
ভোগমন করেন, এখানে জীবিত থাকিয়া অধিবাস করেন?  
বিশেষ ভাবে এই রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার আত্মার  
পুনরাগমন কাহার না একান্ত প্রার্থনীয়?

বাস্তবিক ঋষিগণের সহিত আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মা  
অবিনশ্বর এবং চিরজীবিত। যদিও নৃপেন্দ্রনারায়ণের দিব্যদেহ  
তস্মাবশিষ্ট হইয়া ঐ সমাধির অভ্যন্তরে রক্ষিত, কিন্তু তাঁহার  
মুক্ত দিব্যাত্মা জীবন্ত ঈশ্বরের বক্ষে জীবন্তরূপে সমাধিত; এবং  
এখানে কেবল তাঁহার মণ্ডরমুর্ত্তি নয়, তাঁহার দিব্য আত্মাও এই  
সভারিষ্ট।

আমরা কখনই বিশ্বাস করি না, অনরাধ্যায়গণ দেহমুক্ত হইলেই  
তাঁহাদিগের আত্মজন ও প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া  
হাইতে পারেন। তাঁহারা যে জীবের পরিজ্ঞানের জন্ত, সংসারের

ভুক্তি দূর করিবার জন্ত এবং নব নব ধর্ম-সংস্থাপনের জন্ত, এক  
এক দেশে, এক এক যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

আমরা তাই বিশ্বাস করি, সেই ভাবে ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়াই,  
মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ এই কুচবিহার রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন এবং যথার্থই বর্ত্তমান যুগদ্বন্দ্ববিধান এই রাজ্যে প্রবর্ত্তন  
করিয়া আজ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যথার্থই তিনি সাধারণ মানুষ নন। তাঁহার জীবনের  
ইতিহাস যাঁহারা লিখিবেন, তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে  
হইবে যে, তিনি এক অসামান্য ত্রিশীশক্তি-সম্পন্ন হইয়া জন্ম  
গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কুচবিহারের সাধারণ বিধি  
অনুসারে তখন তাঁহার পিতৃসিংহাসন পাইবারই আশা ছিল না;  
কিন্তু ঈশ্বররাজকর্মচারী নৃপেন্দ্রনারায়ণের শিশুশ্রুত রাজ-  
লক্ষণ দর্শন করিয়া, যেন ঈশ্বর-প্রেরণায় তাঁহাকে শূন্য গদিতে  
বসাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ অসামান্য মাতৃভক্তি এবং শিক্ষা-প্রভাবে,  
বালাকালেই তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্বের পরিচয় দিয়া, ইংরাজরাজ-  
পুরুষদিগের বিশেষ শ্রদ্ধা এবং বাৎসল্য আকর্ষণ করিলেন।  
ইংরাজরাজের শিক্ষাধীনে কতইত রাজপুত্রগণ শিক্ষিত হইয়া  
নিজ নিজ রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইতেছেন; কই, ইংরাজ-  
রাজত তাঁহাদের পারিবারিক ধর্মসংস্কারাদি বিষয়ে হস্তক্ষেপ  
করিতে সাহসী হন না? নৃপেন্দ্রনারায়ণের প্রতি তাঁহারা এমন  
আকৃষ্ট হইলেন যে, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা সমাধান করিবার জন্ত,  
তাঁহার বৈবাহিক সপক্ষ করিতেও যয়ং লাট সাহেব প্রস্তুত  
হইলেন। ইহা বিধাতার আশ্চর্য্য কোণল ব্যতীত আর কি  
বলিব?

কোচবিহারের রাজবংশ ইতিপূর্বে বহুবাহক্যকারী এবং  
নানাপ্রকার জাতীয় সংস্কারের অধীন ছিলেন। বিংশতাব্দীর  
কিনা এই প্রাচীন হিন্দুজাতীয় রাজপরিবারকে পূর্ণ অবস্থা হইতে  
উদ্ধার করিয়া নব ইম্পেরিয়াল বংশে পরিণত করিবেন; তাই  
শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণকে নববিধান-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মানন্দ, কেশবচন্দ্রের  
স্বকণ্ঠা ইমতি সুনীতি দেবীর সহিত উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ হইবার জন্ত  
স্বয়ং বঙ্গেশ্বর পর্য্যন্ত ঘটকালী করিলেন। এই কাহিনী যখন  
বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইবে, তখন ইহা বিধাতার বিশেষ নীলারূপে  
নিশ্চয়ই বর্ণিত হইবে।

কোথায় প্রাচীন কোচবিহারের শিব বংশ, আর কোথায়  
বঙ্গেশ্বর বঙ্গাল সেনের অংশ বংশ। আপাততঃ দেখিলে এবং  
হিন্দু সংস্কার গণনা করিলে, এই দুই বংশের কি কখনও মিলন  
হইবার সম্ভাবনা হইত? কিন্তু ভগবানের নিকট কিছুই অসম্ভব  
নাই; তাই তিনি স্বয়ং প্রজাপতি হইয়া, সকল বাধা বিঘ্ন, ধর্ম-  
ভেদ, মতভেদ, জাতিভেদ অনাগ্রাসে উজ্জ্বল করিয়া, শ্রীনৃপেন্দ্র-  
নারায়ণ ও শ্রীমতী সুনীতি দেবীকে উদ্বাহবন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ টেরাই গমরে সৈনিকপদ-গ্রহণে যে



সমুদ্র করিতে আসিয়াছিলেন, ইহা সকলকেই মুক্ত-কর্ত্তে, স্বীকার করিতে হইবে।

যাঁহার সহযোগিতায় এবং সহধর্মসামান্য এই মহৎ ব্রত-সম্পাদনে শ্রীমূপেন্দ্রনারায়ণ কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন, তাঁহার সেট সহধর্মিণী সতী স্মৃতি দেবীও আজ দেহমুক্ত হইয়া অমর-ধামে তাঁহারই সহিত মিলিত হইয়াছেন। যুগব্রত চাতকিনীর ক্ষার এতাবৎ কাল যিনি নানা প্রকার শোক, তাপ, বিরহ, মনো-বেদনা সহ্য করিয়া, তা নাথ! হা নাথ! করিয়া ক্রন্দন করিতেছিলেন, আজ তিনিও সকল শোক, তাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বামী, পুত্রগণ ও কল্যাণে পুনর্মিলিত হইয়াছেন।

কোচবিহারের যাত্রা কিছু নবজাগরণ, তাহা মূপেন্দ্রনারায়ণ ও স্মৃতির যুগলমিলনেরই ফল, ইহা কি আমরা আজ বিস্মৃত হইব? তাঁহাদের দেহাবস্থান কালে এত রাজ্যে যে নবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল এবং যাত্রা আমাদের হৃদয় নিজ অপরাধে আপাততঃ নিতান্ত চীনপত্ন অতীব করিতেছি, তাঁহাদের দিবা আশ্রয় পুনরাগমন বিনা কেমন করিয়া সে অগ্নি চির প্রজ্জ্বলিত থাকিবে? তাই, তাই আমরা তাঁহাদের আশ্রয় পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছি। জীবন্ত জীববক্ষে তাঁহারা অমর-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া কি তাঁহারা একোচবিহার পরিহার করিয়াছেন? কখনই না।

বর্তমান মহারাজা শ্রীজগদীশেন্দ্রনারায়ণের মস্তকে বিধাতার অজস্র আশীর্বাদ বর্ষিত হউক। তিনি পিতা, পিতামহের পদাশ্রয় করিয়া এবং তাঁহাদিগের দিবা আশ্রয় স্বর্গীয় প্রভাবে প্রণোদিত হইয়া, এই রাজ্যে বিধাতার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হউন, ইহাই সর্বাঙ্গতঃ করণে প্রার্থনা করি। শ্রীমূপেন্দ্র-নারায়ণ ও দেবী স্মৃতির আত্মা তাঁহাকে আশীর্বাদ করুন। মহারাজমাতা ও রাজপরিবার এবং অমাত্যবৃন্দ ও প্রজাবর্গের মস্তকেও স্বর্গের শান্তি বর্ষিত হউক।

—o—

## যৌবনের স্বপ্ন।

(পূর্বোক্ত)

সুদূরালীতে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণবিহারী দেবের আশ্রম। তিনি এখানে একটি ব্রাহ্মসমাজগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রমত্ত কীৰ্ত্তনে বহুলোক আকৃষ্ট হইত। প্রেরিত অনুভূতাল বহু, তাই ফকিরদাস রায় এখানে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। প্রজ্ঞেয় ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইহাদিগের সহসাদক ছিলেন। ভাই অমৃতলালের অসাধারণ উৎসাহ, ভাই নন্দলালের ভাব-ভোলা নৃত্য, সাধক কুঞ্জবিহারীর কীৰ্ত্তনের প্রমত্ততা, যখন একত্রে মিলিত হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপিনীগণ যেমন পাগল হইয়া ছুটিয়া যাইত, সেইরূপ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ইহাদের কীৰ্ত্তনে আকৃষ্ট হইতেন। একবার কুঞ্জবাবুর প্রমত্ত

কীৰ্ত্তনের অগ্নিময় আবরণায়ার ভিতর কমলকূটরে শ্রীআচার্য্য-দেব নাচিতে নাচিতে অঙ্গান হইয়া পড়িলেন। উৎসবের সময় লোকে লোকারণ্য। সকলে বলিতে লাগিলেন, “কীৰ্ত্তন থামাও থামাও”, আচার্য্য অঙ্গান হইয়া গিয়াছেন। তখন কুঞ্জবাবুও কীৰ্ত্তন উন্নত চৈতন্যরচিত। তিনি বলিলেন, “নামে বাঁচলেও ভাল, মলেও ভাল”; এই বলে দ্বিগুণ উৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। আচার্য্যদেব উঠিয়া কুঞ্জবাবুর গলা ধরিয়া নৃত্য কবিত্ত আরম্ভ করিলেন। সে স্বর্গের দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাও বলিয়াছেন যে, বঙ্গ আবার গৌরান্দের পুনরাবিভাব!

ছাত্রদের নৈতিক উন্নতির জন্ত কুঞ্জবাবু একটি “স্মৃতি-সংকারিণী সভা” প্রতিষ্ঠা করেন। সভাপ্রতিষ্ঠার দিন তাই নগেন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া বক্তৃতা করেন। ২০২৫ জন ছাত্র ইহাতে যোগ দিয়াছিল; কিন্তু অকালে ইহার আয়ু শেষ হইল। কয়েকটি ছাত্র লইয়া একটি প্রার্থনা-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রার্থনা-সভার ভার আমার উপর অর্পিত হয়। প্রতি সন্ধ্যার সময় আমাদের প্রার্থনা আরম্ভ হইত, রাতি ১২টা। ১টা পর্যন্ত আলোচনা চলিত। আমরা যেন পাগল হইয়া গেলাম। পড়া শুনা সব ঘুচিয়া গেল। কোন দিন নির্জন গঙ্গার ধারে, কোন দিন নির্জন গ্রাম্যে, কোন দিন পত্রপুষ্প-শোভিত উদ্যানে উপাসনার পর বক্তৃতা হইত। সে বক্তৃতায় কি ভাবের উচ্ছ্বাস, কি প্রগল্ভা উদ্গাদনা, কি অনর্গল ভাষার প্রবাহ! এখনও স্মরণ করিলে সত্য সত্যই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এ সময় তাই নগেন্দ্রচন্দ্রের সহিত আমার যে সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়, তাহা গভীর ধন্যভাবপূর্ণ। চিঠিগুলি বহু যত্নে রক্ষা করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তাহা আর পাওয়া যাইতেছে না। আমাদের বাল্যের খেলাঘর কেমন সত্যিকার সৌখিন অট্টালিকায় পরিণত হইল, এখন ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই। ধূলায় খেলাঘর নিষ্কাশন করিতে গিয়া, তাহার ভিতর অত্যাশ্চর্য্য কুড়াইয়া পাইলাম।

আমি মস্তক্ষে ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল চিত্র মনে দাঁড় দেখিতে পাইলাম—একটি স্নেহের বোর আমরচিহ্ন, বাফা, কাম, উপাসনা, লোককলনের সহিত বৈবচিন অঙ্গের বাণচাক্রে পরস্পর নিয়ন্ত্রিত করিত। আমার ভাবজীবনে স্নেহের স্মৃতি বাস্তব জীবনের অমৃতলয়ে যাত্রা অর স্বন দাগু রাখিয়া গিয়াছে, তাহারই এই একটি কথা বলিতে আজ আনন্দ অশ্রুধব করিতেছি। কলিকাতায় আসিয়া আরো কয়েকটি বিশেষ ধর্ম্মবন্ধ প্রাপ্ত হইলাম; তাঁহাদের মধ্যে ভবানীবাবু (পরে ব্রহ্মসংঘ উপাধ্যায়), গিরীন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শশীভূষণ বহুর (পরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক) নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ধর্ম্মপ্রবর্তন উৎসাহ ও সূচরিত আমার ধর্ম্মপথের অগ্রকূল হইয়াছে।

যখন সঙ্গীতপ্রচারক স্বর্গীয় ভাই ব্রহ্মলোকনাথ সান্যাল মহাশয়

“জয় দেশা, মুখা, মহম্মদ, শাকা, গৌর স্তম্বর” গানটি প্রথম রচনা করেন, তখন আমরা এতটা বন্ধু মিলিয়া কলিকাতার পাড়ার পাড়ার গানটি গাহিয়া বেড়াইতাম। ভ্রম্মমহিলাগণ আমাদের গৃহ-শাস্ত্রে ডাকিয়া লইয়া এই গানটি শ্রবণ করিতেন। সকল সাধু মহাপুরুষের নাম ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে শুনিয়া, ভক্তিতরে তাঁহারা প্রণাম করিতেন এবং আমাদের অল্পস্র আশীর্বাদ করিতেন। আমরা মদ্যো মদ্যো রামকৃষ্ণপুর, সালকিয়া, শিবপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করিতাম। এক একদিন এই গানটি শুনিবার জন্য চারপাঁচশত লোকের সমাগম হইত। গানের পর প্রার্থনা করিতাম, এই চারপাঁচশত লোক আমাদের প্রার্থনার ভক্তির সহিত যোগদান করিত এবং প্রার্থনার শেষে যখন আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতাম, তখন সবলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত। সে স্বর্গের দৃশ্য দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া যাইতাম। ছোট ছোট বালক ও অল্পবয়স্ক যুবকদের লইয়া তিনি কি অসম্ভব সম্ভব করিতে পারেন, আমরা হাতে হাতে তাহার পরিচয় পাইতাম। কলিকাতার পাড়ার পাড়ার এবং স্কুল কলেজের ছাত্রদের ভিতর এই গানটির গচার এতো অধিক হইয়াছিল যে, আমরা যখন সন্ধ্যাকালে গোলদৌঘিতে বেড়াইতে যাইতাম, তাহার কথাবার্তা কহিত যে, “ভাই আর একদল ধর্ম্মসম্প্রদায় বাহির হইয়াছে যে, তাহার সকলের দেবতাদের ভক্তি করে, সকল মহাপুরুষদের সম্পর্কে গান করে।” আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টা যে কার্যে পরিণত হইতেছে, স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, দেখিয়া আমরা আনন্দে পূর্ণ হইতাম।

একদিন আমহাষ্ট্রী স্ট্রীটে, যেখানে রাজবি রাজা রামমোহন রায়ের পোত্র হরিমোহন রায়ের দোকান ছিল, সেই স্থানে আমরা প্রাতঃকালে প্রমত্তভাবে গান করিতেছি, আর ভক্তিবাক্তন প্রতাপবাবু মহাশয় পাতদ্রুমণ করিয়া গৃহে কিরিত্তেছেন, আমাদের গান শুনিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আমাদের চিন্তিতে পারিলেন না। সে দিন ছিল রবিবার, উপাসনার পরে নগেন্দ্রবাবুকে বলিতেছিলেন যে, “দেখ, কয়েকটা ছেলে গৈরিক পরিধান করে আমাদেরই গান করিতেছে, আমার খুব ভাল লাগিল।” নগেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, “তাঁহারা আমাদেরই, কান্দাপানাতই সকল ছেলের লইয়া প্রতি প্রভাতে গান করিয়া বেড়ায়”। তিনি শুনিয়া আমার প্রতি প্রশংসা করিলেন। এই ঘটনা হইতে ঋষি প্রতাপচন্দ্রের সহিত আমার বন্ধিতা বর্দ্ধিত হইল। পর জীবনে আমি তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া চলিয়াছি। উপাসনার জন্য আমি তাঁহার নিকট অশেষ শ্রমী। তাঁহার ভাবপূর্ণ উপাসনা, ভাবের অবিচ্ছিন্ন আবেগ ও উদ্ভাসনা, ভাবের ঐশ্বর্য্যময় অলঙ্কার—সকলকে কোন্ অজানিত লোকে লইয়া বহিত! তাঁহারই উপাসনার আদর্শে আমার উপাসনা গঠিত, মার্জিত, পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এখনও সেই জীবন্ততাবের স্পর্শ

আমাকে উপাসনার পথে পরিচালিত করে।

আমি একটা বিশেষ ঘটনা আমার স্মরণ হইতেছে। প্রথম যখন চাণ্ডার পুল নির্মিত হয়, তখন বাজীদেব নিকট হইতে একটা করিয়া পরস পাবানি লওয়া হইত। একদিন ইচ্ছা হইল, কলিকাতার বাহিরে প্রচার করিতে যাই। ছটা পরস মাত্র আমার সম্বল ছিল, একটা পরস দিয়া পুল পার হইয়া, বোধ হয়, ১০-১২ মাইল দূরে মাকডনচ নামক একগ্রামে গেলাম। পূর্ণিমার রাত্রি—শুভ্র চাঁদের আলো গ্রামের নিবিড় গাছপালা ভেদ করিয়া সংকীর্ণ পথকে আগোক্ষিত করিয়াছে, সেই পথ দিয়া গ্রামে পৌঁছলাম। রাত্রিতে করতাল যোগে দ্বারে দ্বারে হরিনাম গান করিতে লাগিলাম। সুর নাই, তাল নাই গানের; ভাবের উচ্ছ্বাস—প্রাণের উৎসাহ—হৃদয়ের ঐকান্তিকতা বহুদূর বেতালা গানের সঙ্গে মিলিয়া একটা নুতন প্রাণ মাতান সুর সৃষ্টি করিল। নিজে প্রমত্ত হইলাম। আমার বেতালা প্রমত্ততা অনেকের আকর্ষণের বস্তু হইল। অনেক আশ্রয়দাতা বেশ একাগ্রতার সহিত গান শুনিতে লাগিল। ইহাই আমার নিকট খুব আশ্চর্য্যের বিষয় হইল। এখনও সে কথা মনে করিলে, আমি অবাক হইয়া যাই। এইরূপ প্রমত্ততার সহিত রাত্রি দশটাকি এগারটা পর্য্যন্ত গান গাহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। একটা দোকানে গিয়া এক পরসার গজা খাওয়া এক ঘটা জল খাইলাম। এই পরসটিই আমার শেষ সম্বল। দোকানদারকে বলিলাম যে, বাপু, তোমার দোকানে কি আমাকে একটু শোবার জায়গা দিবে? সে যে, গ্রামের ভিতর যান, কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে স্থান পাইবেন।” আমি বলিলাম যে, দেখ, এখানকার জমীদার হুসেজ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জাতি ও বিশেষ পরিচিত; তবে আমি সেখানে যাইব না। তুমি যদি স্থান না দাও, তবে তোমার সম্মুখে বৃক্ষতলে রাত্রি কাটাইব, এই বলিয়া আমি বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কি জানি, তাঁহার মনে কেমন দয়ার সঞ্চার হইল; অবশেষে তাঁহার বিধানা পত্র যাত্রা ছিল, তাহা দিয়া আমাকে যাত্রার সহিত শোয়াইল, আর নিজে বিনা বিধানায় নিদ্রা গেল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এক মুহূর্ত্ত পূর্বে যে ব্যক্তি একটু স্থান দিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল, পরমুহূর্ত্তে সেই ব্যক্তি আত্মীয়ের ভায় আদর ও যত্নে আমাকে আপ্যায়িত করিল। যে অসহায় ও কঙ্গাল, ভগবান্ তাহার বন্ধু, এই সত্যটি আমার মর্মে মর্মে স্পর্শ করিল।

পরদিন প্রাত্যে শয্যা হইতে উঠিয়া, দোকানদারকে ধন্যবাদ দিয়া, ঐ গ্রামের হেডমাষ্টারের বাড়ীতে গেলাম। তাঁহার সহিত আমার পূর্বে পরিচয় ছিল না। আমি বলিলাম যে, আপনাদের গ্রামে ধর্ম্ম-বিষয়ে একটা বক্তৃতা করিতে চাই; আপনাদের স্কুল গৃহীতি যদি ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে উপকৃত হইব। হেড মাষ্টার বলিলেন, আপনি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত? আমি বলিলাম,



আমি কেশবচন্দ্রের লোক। কেশবচন্দ্রের লোক শুনিয়া বেশ শ্রদ্ধা করিলেন। আমাকে বলিলেন, অনেক কেশবচন্দ্রের উপাসনা শুনিয়া টাটা বিজ্ঞপ করিত, আমিও একদিন বিজ্ঞপ করিবার চলে মন্দিরে গেলাম। মতামত, সে যে কি শুনিলাম, তাহা আর কি বলিব! যেন মুখে সরস্বতী অবতীর্ণ হইয়াছে—মুখ হইতে বেদ বেদান্ত সব বাহির হইতেছে; আমি বুঝিয়াছি যে, তিনি নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ। তাঁহার স্কুলে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সে দিন শনিবার, ১১টার সময় ছুটির পর বক্তৃতা হইবে। অজ্ঞাত গ্রামে নিমন্ত্রণপত্র দিয়া, প্রায় ৪৫শত লোকের বসিবার স্থান করিয়া দেন। পূর্বদিন রাত্রিতে কেবল এক পরসার গজা খাইয়া ছিলাম, সুতরাং বেলা দ্বিপ্রহরের সময় খুব ক্ষুধার উদ্বেগ হইল। ১-১৫মিঃ সময় স্কুলে আসিলাম, হেডপণ্ডিত মতামত আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভাত খাইয়াছেন? আমি বলিলাম, না। তিনি বলিলেন, আপনার জন্ত গরম ভাত রাখা হইয়াছে, আমার বাড়ীতে চলুন, এখনও পনের মিনিট সময় আছে। আমি ত অবাক! তাঁহার সঙ্গে আমার পূর্বে কখন পরিচয়ও ছিল না। কে আমার ক্ষুধা-নিবারণের জন্ত এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে আহারের ব্যবস্থা করিল! ভগবান, একি তোমার সাক্ষাৎ পরিচয় নয়? তুমি এইরূপেই আমাদের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া চিরদিনের জন্ত বাঁধিয়া রাখ। সভার তিন চারিটা গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত লোকের সমাবেশ হইয়াছে। ইহার পূর্বে আমি আর কখন এরূপ বক্তৃতা করার ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করি নাই।

শ্রীকেশবচন্দ্রের প্রতি হেড মাস্টার মহাশয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় পাঠিয়া, আমি “শ্রীকেশবের ধর্ম ও সাধন” বিষয়ে বক্তৃতা দিলাম। বক্তৃতা খুব জয়গ্রাহী হইয়াছিল; যখন তাঁহার ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মপ্রবণের কথা বলিতেছিলাম, তখন শ্রোতৃবর্গের মুখ-মণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল—অনেকের চক্ষু দিয়া অশ্রুজল প্রবাহিত হইল—অনেকে মুহুমুহু ‘হরিবোল হরিবোল’ করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—সভা যেন অগ্নিময় হইয়া গেল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতার পর শরীর অবসর—পূর্বদিনের অতিরিক্ত শ্রমে দেহ চলচ্ছক্তি-রহিত; সেই দিন রাত্রিতেই কলিকাতার ফিরিবাড়ী কথা। হাতে পয়সা নাই, চলিবারও শক্তি নাই, কি করিয়া আসিব এই চিন্তা করিতেছি; এমন সময় দেখি যে, সেখানকার তত্ত্বমহোদয়গণ আমার জন্ত একখানি গাড়ী আনিয়া উপস্থিত। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। বাহার ক্ষুধার অন্ন নাই, তুমি তাহার মুখে অন্ন দাও—বাহার চলিবার শক্তি নাই, তাহার জন্ত তুমি যান বাচনের ব্যবস্থা কর। ইহা অপেক্ষা তোমার লীলার সাক্ষাৎ নিদর্শন আর কি পাইব! একটা কাগজি লইয়া তোমার নামে যে ঘরের বাহির হয়, তুমি তাহাকে লক্ষটাকার মালিক কর, তাহার কোন অভাব তুমি রাখ না। এই

ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া তুমি এই মহা সত্য আমাকে শিক্ষা দান করিলে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## উপাসনাশিক্ষা।

(২০শে আগষ্ট, ১৯৩৩, ৪ঠা ভাদ্র, ভবানীপুর ব্রাহ্মসম্মিলন-সমাজে ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে নিবেদনের সার মর্ম্ম)

বঙ্গগণ! আমি যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি, সে পরিবারের ধর্ম্মভাব, নিষ্ঠা আমার ধর্ম্মভাবকে বালাকালেই জাগ্রত করিল। পূজা, পাঠ, ব্রতপালন, উপবাস পরিবারের প্রত্যেকেই সাধন করিতেন; বিশেষতঃ মাতৃদেবীর একনিষ্ঠ সাধনা—প্রত্যবে উঠিয়া নিয়মিতরূপে এক প্রহর কাল পূজাত্মিক বিষয়ের সহিত দর্শন করিতাম। ঠাকুর ঘরে বসিয়া ত্রিসন্ধ্যা ও প্রণব মন্ত্র জপ করা পরিবারের প্রচলিত প্রথা। এই সময় যুগধর্ম্মের প্রবল ঝটিকা আকাশে বহিতে লাগিল, সেই আঘাতে আমার প্রাচীন বিশ্বাস চকল হইয়া উঠিল। ধর্ম্ম বুঝি আর না বুঝি, নির্জনে বসিয়া সঙ্ঘাতিক ও গারিডী জপ করিয়া মনে শান্তি পাইতাম; মন শান্ত ও সংবত হইত। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলাম; উপাসনার যোগ দিলাম। উপাসনার বহু কথা শুনিলাম, সকল কথা মনে রাখিতে পারিতাম না—বহু ভাবের বিকাশ অসম্ভব করিতাম, ভাব ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না। এসকল উপাসনার অন্তরায় হইল। তারপর আমি নির্জনে বসিয়া একাকী পূজা করিয়াছি, বহুলোকের সহিত বসিয়া মন বির হইত না। আমিও দেখা দেখি চক্ষু মুদ্রিত করিতাম, কিন্তু আমার মন চক্ষুর আবরণ ভেদ করিয়া আকাশ পাতালে বিচরণ করিত। ইহাও আমার উপাসনার বিশেষ অন্তরায় হইল।

উপাসনা শুষ্ক বোধ হইত—রসবোধ হইত না—উপাসনা মর্ম্মকে স্পর্শ করিত না। উপাসনা পরিত্যাগ করিলাম। যদি মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের অমুরোধ অথবা ইচ্ছায় প্রকাশ্য উপাসনার যোগ দিতাম, তাহা আমার পক্ষে ভীষের শরশয্যা বলিয়া মনে হইত। উপাসনা পরিত্যাগ করিলাম। প্রাচীন স্মৃতিস্মরণ উপরও আস্থা-শূন্য—এখন কি করি। আমার প্রাচীন বন্ধু নির্জনতার শরণাগত হইলাম। বলিলাম, হে নির্জনতা, তুমি একবার কাছে এস—তোমার শাস্তিময় সঙ্গ দান কর। একটা নির্জন স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। কাশ্মিরের শ্মশান ঘাটের উত্তরদিকে গঙ্গার ধারে একটি নির্জন স্থান পাইলাম, সন্ধ্যার পর বেখানে কোন গোলযোগ থাকিত না। সেখানে গিয়া বসিতাম। কোন কথা বলিতাম না, কোন মন্ত্র জপ করিতাম না—উপাসনাও করিতাম না, সাধ্য মত কোন

চিন্তাকে মনে ঠাঁই দিইতাম না। কেবল লক্ষ্যহীন শূন্য মন লইয়া বসিয়া থাকিতাম—শূন্য মন লইয়া গৃহে ফিরিতাম। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। সর্বদাই মনের ভিতর যেন সহস্র বৃষ্টিক ধ্বংসন করিত।

মাহুষ কতদিন শূন্য মন লইয়া বাস করিতে পারে? প্রকৃতির বিধান শূন্যকে পূর্ণ করা। প্রকৃতি আমার সহায় হইল; কখন শাস্তসলিলা ভাগীরথীর কলকলধ্বনি আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিত—কখন অনন্ত আকাশের অসীম ব্যাপ্তি আমাকে মুগ্ধ করিত—কখন হীরকখচিত নভোমণ্ডলের শোভা ও সৌন্দর্য আমার চিত্তকে হরণ করিত—কখন জ্যোৎস্নানিবিত শরতের চন্দ্র-স্থধা বিষয়-বিহ্বল-নেত্রে পান করিতাম—কখন কোলাহলশূন্য নিস্তরু নিখর রাত্রির গাভীর্ষ্য আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইরূপ কাটিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক ব্যাপ্তিময়ী সত্তার অমুভূতি মনে জাগিয়া উঠিল। আকাশ, পৃথিবী, চন্দ্র তারকা, জীব জন্ত, লতা পল্লব সকলেই যেন সেই সত্তার মধ্যে ডুবিয়াছে—সেই সত্তাই যেন সকলকে সত্তাবান্ করিয়াছে। সেই বিরাট বিশাল সত্তার স্পর্শমুভূতিই আমার ধর্ম-জীবনের প্রথম পরিচয়।

প্রকৃতির সহিত আমার সম্বন্ধ নিগূঢ়তর ও বনিষ্ঠতর হইতে লাগিল—অলের মধ্যে অলের আত্মাকে দর্শন করিলাম—আকাশের মধ্যে আকাশের আত্মাকে দর্শন করিলাম—তারকানিগুত নভোমণ্ডলে তাহার আত্মার স্পর্শ পাইলাম—নিস্তরু নিখোঁতে তাহার গাভীর্ষ্যের আত্মার অমুভূতি লাভ করিলাম। আমি ভাব-যোগে তাহাদের সহিত একাকার হইয়া যাইতাম। যতই যোগ বনিষ্ঠ হইতে লাগিল, ততই ভাবের আদান প্রদান চলিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে তাহাদের বাণী ক্রটিগোচর হইতে লাগিল। পবিত্র ভাগীরথীর নির্ঝাঁক ধ্বনি কাণে পাতিয়া তনিতার। নক্ষত্রলোক হইতে সংবাদ আসিত—চন্দ্রলোক হইতে লাড়া পাওয়া যাইত। প্রকৃতি আমার বন্ধু হইল—স্বয়ং দুঃখের কথা—অতাব অভিযোগের কথা—জীবন মরণের প্রশ্ন প্রশ্ন খুলিয়া তাহাদেরই বলিতার। ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়া ভাব ক্রমে ঘনতর ও মিষ্টতর হইতে লাগিল। ভাব ভাবকে জন্ম দেয়, ভাবের পূর্ণতা হইতে আমার মুখে কথা ফুটিল। যে অনাহত ও অখণ্ড সত্তার সহিত আমার প্রথম পরিচয়, সেই অনাহত সত্তাই আহত হইয়া রূপরস-গন্ধময়, শোভা-সৌন্দর্যময়, গভীর ও মহিমাময় প্রকৃতিকে জন্মদান করিয়াছে—সেই অনাহত সত্তাই আহত হইয়া জীবনের এক এক অবস্থার এক এক রূপে নৃত হইয়া উঠিল।

কিন্তু সেই শব্দই আহত হইয়া সৃষ্টিকে পালন করিল। পৃথিবীতে এমন কোন পদার্থ আছে, বাহার শব্দ নাই, বাহার ভাব নাই? অণু পরমাণুর ভাব আছে—কণ্টক

ফুলের ভাব আছে—আকাশ সাহাড়ে'র ভাব আছে—লতা পল্লবের ভাব আছে—জীব জন্তর ভাব আছে—মাহুষের ভাব আছে। যিনি সকলকে ভাবা দিলেন, তিনি কি নির্ভাবী? আমরা প্রকৃতির ভাবা বুঝি না—বুঝিবার চেষ্টাও করি না—পশু পক্ষীর ভাবা বুঝি না, বুঝিবার চেষ্টাও করি না এবং মাহুষেরও ভাবা বুঝি না। যে প্রাণের উদ্বোধন হইলে একজনের মর্ম্মকথা অন্তে বুদ্ধিতে পারেন, সেই প্রাণের প্রেরণায় মাহুষ প্রকৃতির নির্ঝাঁক ভাবা ও পশু পক্ষীর শব্দময় ও সচিৎকার ভাবা বুঝিতে পারে এবং সেই প্রাণের আগরণেই মাহুষ ব্রহ্মবাণী শুনিতে পারে। সত্তার জীবন্ত অমুভূতি, সত্তার বাণীময় প্রকাশ, সত্তার অনন্ত ব্যাপ্তির পরিচয় হৃদয়ে 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং' এই তিনটি বীজমন্ত্র দান করিল; এই অমুভূতিই আমার আরাধনাকে রূপ দান করিল। নিজের উপার্জিত একটা কাণা কড়ি অন্তের উপার্জিত লক্ষ টাকা অপেক্ষা মূল্যবান।

এই সময়ে আমি ঋষি প্রতাপচন্দ্রের উপাসনার মধ্যে মধ্যে যোগ দিতাম। সত্যের অমুভূতি বা ভাবের স্পর্শ আমার নিকট বাহ্য অস্পষ্ট বা আলো ছায়া মিশ্রিত হইয়া আসিত, উপাসনার যোগ দিয়া তাহা পরিষ্করণ হইত, ভাবের প্রকাশ হইত ও সত্যের স্পষ্ট উপলব্ধি হইত। কিন্তু যে সকল সত্যের অমুভূতি বা ভাবের স্পর্শ নিজের অন্তরে বিন্দুমাত্র বিকাশ হইত না, সে সকল সত্য ধরিতে পারিতাম না। অল্পরসজ্ঞ সঙ্গীতকার সুগারকের গান শুনিয়া তাহার ভিতর তান গরের স্পষ্ট উপলব্ধি যেমন জাগিয়া উঠে, কিন্তু রসহীন অধুরে তান দাগ পড়ে না, সেইরূপ অস্পষ্ট অমুভূতি ও ক্ষীণ ভাবের স্পর্শ হইলে, সাধকের সত্যের স্পষ্ট উপলব্ধি ও পূর্ণভাবের স্পর্শ পাইয়া অমুভূতি স্পষ্ট হয় ও বিকশিত হয়। যেখানে অমুভূতি ও ভাবের কোন চিহ্ন দেখা যায় না, সেখানে উচ্চ স্তরের সাধনায় যোগ দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কর্ম্মহুত্রে বাকিপুরে যাত্রা করিলাম। বাকিপুর (এক্ষণে পাটনা) নিকাগ-ধর্ম্মের আনিগুরু ঐবুদ্ধদেবের বিহারভূমি। পাটলিপুত্রের অজস্র ধূলিকণা এখনও সর্গের স্বর্ণরেণু হইয়া সাধকের নূতন ভাগবতী তহু সৃষ্টি করিতেছে, সিদ্ধার্থের অমর জীবন এখনও মৈত্রীর অমৃতময় স্পর্শ দিয়া কত নব নব গেম-পরিবার গঠন করিতেছে। এখানে সাধু প্রকাশচন্দ্রের তপোভূমি। নূতন শ্রমপরিবার গঠনই তাহার তপস্যার মহাসিদ্ধি। আমি এই পরিবারে স্থান লাভ করিলাম। প্রতিদিন ব্রাহ্মসঙ্ঘে এই মহাতীর্থের মন্ডাকনীপ্রবাহে অবগাহন করিয়া পূজার অর্ঘ্য লইয়া আশ্রমবাসীরা সমবেত হইতেন—বে অর্ঘ্য পুষ্প চন্দন অপেক্ষা পবিত্র। মহাসংকল্পের পঞ্চপ্রদীপ জালিয়া তাহাতে কামকে তপ্তীভূত করা হইত; পবিত্র ভাগবতী তহু ধারণ করিয়া মৈত্রীর সাক্ষাৎ প্রেরণা ও "জীবৈদ্যা" সাধনার সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য সাধু প্রতিদিন বর ডিকা করিতেন। এই আশ্রম 'অবোদ-

পরিবার নামে প্রসিদ্ধ। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে স্বস্তির সম্পর্ক অপেক্ষা ধর্মের সন্ধি যে ঘনিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আশ্রমবাসীদের প্রতিদিন তাহার পরীক্ষা করা হইত; পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলে পরিবারে স্থান পাওয়া যাইত।

এখানে আসিয়া জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। সন্তোর অমৃত্যু ও তাবের উচ্ছ্বাস যে কেবল একমাত্র সাধনা নয়, সাধুর জীবনের স্পর্শ পাইয়া তাহা বুলিলাম। রোগে শোকে আর্ন্ত নর-নারীর জন্ত আপনাকে যে তিলেতিলে বলিদান করিতে হয়, তাহার পরিচয় পাইলাম। মানব-প্রেমের অগ্নি-পরীক্ষার শরীর মনকে দগ্ধ করিয়া নূতন জন্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে—নূতন আত্মিক দেহের সৌরভে প্রাণকে পূর্ণ করিতে না পারিলে, ভগবৎ-প্রেমের অমৃত্যু প্রাণকে স্পর্শ করে না, প্রেমধরুণ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ-কার লাভ হয় না। সাধু প্রকাশচন্দ্রের “পরিবার-সাধনার” ভিতর দিয়া আমার মধ্যে প্রেমরূপের আরাধনার অগ্নিময় মন্ত্র ফুটিয়া উঠিল—প্রেমের আরাধনা খাঁস প্রেমের ছায় সর্বল ও সহজ হইল! গঙ্গাজলে দান করিয়া শরীর যেমন শীতল হয়, উপাসনার অঙ্গুলে দান করিয়া প্রতিদিন মন স্নিগ্ধ হইতে লাগিল—নূতন শ্রীসম্পদে আত্মা রূপান্তরিত হইল।

গাজীপুর গোলাপের জন্ত প্রসিদ্ধ। গোলাপের নয়নতুলিকর স্নানবর্ণ ও মিষ্ট সৌরভে গাজীপুরের আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ। গাজীপুরে সিদ্ধপুত্র শ্রীনিভাগোপালের আশ্রম। তাঁহার বর্ণ যেমন গোলাপের ছায় স্নান ও মনোরম, তাঁহার চরিত্র তদ্রূপ গোলাপের সৌরভ অপেক্ষা মিষ্ট ও পবিত্র। তাঁহার উপাসনার ইষ্টমন্ত্র “ওঙ্কম্ অপাপবিদ্ধং”; তাঁহার উপাসনার শুদ্ধতার সৌরভ ঠিক আতর গোলাপের মত উপাসকদিগের শরীর মনকে স্নিগ্ধ ও পবিত্র করিত, তাঁহার বাক্য সাধকের মনে শুদ্ধতার একখানি মনোরম পট অঙ্কিত করিয়া দিত—তাঁহার আচার ব্যবহার চিন্তা বাক্য ও কর্ম মনঃপন্থার মত গুণের চারিদিকে পবিত্রতার শুদ্ধ আবহাওয়া সঞ্চারিত করিত। বিনাভা যথাসময়ে আমাকে এই আশ্রমে আশ্রয় দান করিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্রের মধুর ধারা আমার শরীর মনকে স্নিগ্ধ করিল। শুদ্ধরূপ শ্রীভগবান্ অন্তর্যামীর সূত্র হইয়া উঠিলেন। সাধুতার আবির্ভাবে তাঁহার পূজার বেদীতে মন সচজেই নত হইয়া পড়িত। “ওঙ্কম্ অপাপ বিদ্ধং” মন্ত্র আমার বীজমন্ত্র হইল। ক্রমাগত হুই বৎসর কাল “ওঙ্কম্ অপাপবিদ্ধং” এই মন্ত্রের উপাসক হইলাম। হুই বৎসর ক্রমাগত এই মন্ত্রই জপ করিতাম। “ওঙ্কম্ অপাপবিদ্ধং” এর সোণালি রংএ আমার প্রতিদিনের উপাসনা রঞ্জিত হইয়া উঠিত, আমার নাগরিক, দিয়া শুদ্ধতার তপ্ত বায়ু প্রতিকূলে নিঃসৃত হইত। সাধুর সাধুতাকে আত্মস্থ করিয়া, অনন্ত সাধুতার আকর শ্রীভগবানের পুণ্যরূপ অন্তরে রূপ গ্রহণ করিল।

গাজীপুরে পুণ্যস্রোত পাণ্ডুরী বাবার পুণ্যাশ্রম। তাঁহার সাধনতত্ত্ব জীবন এক অপারিখ্য পদার্থ। এক একটি সাধু

স্বর্গের এক একটি অপূর্ণ রত্ন হইয়া পৃথিবীকে ঐশ্বর্যশালী করেন। তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণাকে মগ্নবলে জয় করিয়াছিলেন। প্রথমে প্রতিদিন এক পোয়া করিয়া দুগ্ধ পান করিতেন, তারপর মধ্যে মধ্যে কিছু পান করিতেন, পরে তিনটি বিবপত্র আহার করিতেন, অবশেষে কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া যোগ সমাধিতে জীবন কাটাইতেন। তাঁহার আশ্রমে সাধু নিভাগোপালের সহিত গমন করিতাম। তিনি সচ্চিদানন্দের উপাসক। রোগে আনন্দ—শোকে আনন্দ—দুঃখে আনন্দ—সংকটে আনন্দ! নিঃসঙ্গ হইয়া সচ্চিদানন্দের সঙ্গে সুখে কাল কাটাইতেন। স্বহস্ত-নির্মিত একটি গছের বা গুটা ছিল তাঁহার যোগভূমি—যে যোগের বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, বিরাম নাই—যোগের পব মহাযোগ, সমাধির পর মহাসমাধিতে সাধু নিমগ্ন! মধ্যে মধ্যে দর্শনার্থী হইয়া কেহ গমন করিলে গুহার মধ্যে বসিয়া কথা কহিতেন—সে কথা যেন কোন জ্যোতির্ময় লোক হইতে স্রষ্টা রূপে ঝরিয়া পড়িত। অন্তিমকালে পীড়াবশতঃ সাধনার ব্যাঘাত হইত, যোগানন্দের বিচ্ছেদ ঘটত, বেদনা সাধুর অঙ্গ হইত; সেজন্ত একদিন হোমায়ি প্রজ্জলিত করিয়া কৃষ্ণ শরীরকে হোমে উৎসর্গ করিলেন, স্মৃত ও সিন্ধু সর্পিগণে লেপন করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে বসিলেন, সুখে “আনন্দম্ আনন্দম্” বলিতে বলিতে তিলাক্ষি রূপে দেহ ভস্মে পরিণত হইল! মহানন্দে আত্মা স্বর্গধামে চলিয়া গেল। এই মহাজীবনে মহানন্দের স্পর্শ পাইলাম। আনন্দধরুণের উপাসনা করিতে শিখিলাম। প্রথম জীবনে যেমন প্রকৃতি সহায় হইল, মধ্য জীবনে সাধুদিগের সূচরিত্রের স্পর্শ অন্তরে আরাধনার মন্ত্র প্রেম, পুণ্য ও আনন্দের জ্যোতির্ময় রূপ ফুটিয়া উঠিল। যে নাহা চার, শ্রীভগবান্ তাহাকেই তাহা দান করেন। “ডাকের মত ডাকলে পরে আর কি হরি থাকতে পারে, দয়াময় নামে তিনি পরিচিত এ সংসারে।” এই বাক্য ভগবান্ সাধকের জীবনে সার্থক করেন। উপাসনা শিক্ষণীয় বস্তু, জ্ঞানোপার্জননের ছায় উপাসনা অর্জন করিতে হয়। উপাসনা সন্তোর অমৃত্যু, উপাসনা কথা নয়, এই সত্য জীবনে লাভ করিলাম। সবাক উপাসনা অপেক্ষা নির্দাক উপাসনাই শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## নববিধানের দুর্গোৎসব।

আমাদিগের নববিধান কি দুর্গোৎসববিহীন? যতই দিন চলিয়া যাইতেছে, ততই দেখিতেছি, নববিধানের ভিতর মহা দুর্গোৎসব। নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই দুর্গোৎসবের মধ্যে মহাভাবে আদিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সমক্ষে প্রতি দিনের জীবনে মহা দুর্গোৎসব। এই দুর্গা-ভাবের মধ্যে তিনি মহা পার্বত্যৌমিক নিরাকারা চিন্ময়ী দুর্গাকে প্রত্যক্ষ করিলেন।

এ দুর্গা-ভাব মহা সার্বজনিক ভাব। ব্রহ্মানন্দের শারদীয় উৎসব নববিধানের মহা দুর্গোৎসব। এখন দেখিতেছি, এই মহা দুর্গাভাব অস্থি মজ্জার ভিতর প্রবেশ না করিলে, নববিধান পূর্ণ হয় না। পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করিলে বেশই বুঝা যায় যে, ইউরোপ প্রদেশেও এই দুর্গাভাব আসিয়াছিল। জর্জ লর্দনও এই দুর্গাভাবের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। জর্জ লর্দন ভাষায় যে “*Dourga*” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই শব্দের মহা-ভাব ভারত খবির ভিতরও আসিয়াছিল! জর্জ ভাষায় “*Dourga*” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে ভাব প্রকাশ পায়, ভারতীয় “দুর্গা” শব্দের ভাবেও সেই অর্থ। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উভয়েরই অর্থ “*Difficult to enter in*” অর্থাৎ দুশ্রবশা। ভারতীয় দুর্গা-ভাবের ভিতর যেমন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতির মহাভাব আসিয়াছে, প্রাচীন গ্রীস ভূমিতেও সেইভাব আসিয়াছিল। ভারতীয় যে ভাবে “লক্ষ্মী” শব্দ আসিয়াছে, সেইভাবে ইউরোপে “*Ceres*” শব্দ আসিয়াছিল। সেইরূপ “সরস্বতীর” ভাবে “*Minerva*”, “গণেশের” ভাবে “*Jupiter*” এবং “কার্তিকের” ভাবে “*Mars*” আসিয়াছে। সাধনশীল ভারত এবং সাধনশীল ইউরোপ এই মহাসাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই মহা দুর্গাভাব কোন আকার কিবা সীমায় আবদ্ধ নয়। আকাশ যেমন সীমাহীন, নিরাকার দুর্গাও সেইরূপ সীমাহীন। এ ভাবের ভিতর আকার নাই এবং পরিমাণও নাই। ইহার ভিতরে চিস্তার আকাশের ভাব। সাধক আর কোথায় যাইবেন? এই মহাদুর্গাভাব ভিন্ন তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হয় না। তাঁহার সান্নিধ্য আর আকার নাই, মূর্তি নাই। হিন্দু উপাসক মূর্তি অর্থাৎ প্রতিমার সমক্ষে আসিয়া, “ইহাগচ্ছ” “ইহ তিষ্ঠ” এই বলিয়া তাঁহার মহাপূজা আরম্ভ করিলেন। এখন তাঁহার সে মূর্তি ও সে প্রতিমা কোথায় চলিয়া গেল! তাঁহার সম্মুখে চিস্তার আকাশ, তাঁহার সম্মুখে নিরাকার দেবী ও তাঁহার সম্মুখে সার্ব-ভৌমিক ও সার্বজনিক চিন্তার দুর্গা বর্তমান। তিন দিন পরে তাঁহার মহাবিজয়া ও মহাসিদ্ধিলাভ। তিনি এখন আকার ও সীমা হইতে অদিক দূরে। তাঁহার বিজয়া আর কিছুই নয়, কেবল নিরাকার চিন্তার দুর্গা। শিশু আর “*Kindergarten*” এ আবদ্ধ নহে। যতই তাহার জ্ঞানপথ খুলিয়া যায়, তাহার আর “*Kindergarten*” এর প্রয়োজন হয় না। তাহার ভিতরে সাধনারূপ নিরাকার “*Kindergarten*”। শিশু ভূগোলবিদ্যার জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত, পঠদশার সম্মুখে মান-চিত্র দর্শন করে। তাহার দর্শন-জ্ঞান শেষ হইলে, সে আর মানচিত্রে আবদ্ধ থাকে না। ভিতরে তাহার মহাত্মমণ্ডলের চিত্র স্ফুটিয়া উঠে। তাহার ভিতরে ভূবিদ্যা সম্বন্ধে মহাপরাজ্ঞান আসিয়া পড়ে। এক্ষণে আমরা বলিতেছি যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুর্গাভাব মহাসাধনের মধ্যে আসিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে। দুর্গার ভিতরে মহা নববিধান। বিশ্বাসী পাঠক ও

পাঠিকা এই মহা নববিধান অধ্যয়ন করুন। ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার সাধনশীল জীবনে এই নববিধান প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভিতরে মহাশারদীয় উৎসব আসিয়া বাহা পড়িল, তাহা তাঁহার ভিতরে সার্বসাময়িক উৎসবে পরিণত হইয়াছিল। বিশ্বাসী ভাই, ভগিনীগণ, এই উৎসব ভুলিও না। ভক্ত প্রমথলাল এই মহাভাবের ভিতর এই উৎসবকে দুর্গোৎসব বলিয়া গিয়াছেন। দুর্গাদাস ভিন্ন কে দুর্গোৎসব বুঝিতে পারে? আজ অশীতিবর্ষে আসিয়া, দুর্গাভক্ত হিন্দুপ্রধান ভারতভূমি ও দুর্গাভক্ত ইউরোপ, তোমাদিগকে নমস্কার করি। দুর্গাভক্ত ব্রহ্মানন্দ তাঁহার দুর্গোৎসবের ভিতর আসিয়া তোমাদিগকে নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। আজ আমি ব্রহ্মানন্দদাস হইয়া, তোমাদিগকে দুর্গোৎসবের দিনের নমস্কার করিতেছি। আমার অশীতিবর্ষের নববিধানকে আজ প্রাণ ভরিয়া নমস্কার করিতেছি।  
শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—

## মহাপুরুষ।

( ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের সামাজিক উপাসনায়, ৮ই অক্টোবর, ১৯৩৩, তারিখে নিবেদিত )

বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব-সৃষ্টি। এইখানেই তাঁর কৃতিত্বের পরাকাষ্ঠা। মানুষের ভেতরেই তাঁর আশ্চর্য বিশেষ প্রকাশ। মানুষের ভেতরেই তিনি হাতে কলমে ধরা পড়েছেন। তাঁর আশ্চর্য থেকেই মানুষের আত্মা হয়েছে। তিনি আপনাকে হাতে মানুষকে তৈরির করেছেন। আপনাতঃ আদর্শ তাকে দিয়েছেন। তাই ভক্ত কবি বলেন, “আদর্শ তোমারে দেখিব বত, তোমার স্বভাব পেয়ে হ’ব তোমার মত।” প্রথমে, বিশ্বমাঝে, প্রকৃতির ভেতর, তাঁর প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। চন্দ্র, সূর্য্যো, ঐহ তারকার, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, ফুলে, ফলে, সর্বত্র তাঁর অসীম মতিমার দিবা প্রকাশ দেখতে পাই। হিমরঞ্জিত শোভন তুষার গিরিশিখরে, সিদ্ধুর উত্তাল তরঙ্গতটে, তটিনীহ মুহু মধুর কলতানে, বিহঙ্গের কাকলিতে, কুহুমের হাসিতে, ভাব্য চরাচরে তাঁর অপরূপ, অমূল্য সৌন্দর্য্য ও অমোঘ শক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ আমরা দেখতে পাই। জলচর, স্থলচর, উভচর, খেচর, অসংখ্য জীব জন্ত, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ প্রভৃতি সৃজন করে বিশ্বশ্রষ্টা মহিমাযুক্ত হয়েছেন। কত কোটি কোটি রকম তরু, লতা, গুল্ম, কুল, ফল বিধাতা সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইয়ত্তা নেই। কিন্তু, মানুষ সৃষ্টি করেই তিনি আপনাকে ধরা দিয়েছেন, আপনাকে দান করেছেন, আপনাকে জন্ম দিয়েছেন। “তুমি তাই এসেছ নীচে, আমার নইলে তোমার প্রেম হ’ত যে মিছে।”

জীবাত্মা পরমাশ্রয় পূত্র। পুত্রের ধর্ম পিতার অনুরূপ হওয়া, পিতার আজ্ঞাশ্রবণী হয়ে চলা। কিন্তু, লবল পুত্রই

কি পিতার মত হয়, পিতার কথা শুনে? আদর্শ পুত্র যারা, ভাল ছেলে যারা, তাঁদেরই সার্থক জন্ম, তাঁদের কথাই ইতিহাসে লেখা থাকে। তাঁদের জীবনী নিয়েই ইতিহাস রচিত হয়। তাঁদের জীবনে বিধাতার আশ্রয়প্রকাশের কথাই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। ইতিহাস আর কিছু নয়, কেবল মহাপুরুষদের জীবন-চরিত। মহাপুরুষ, আদর্শপুরুষ, অজিহানব, মহামানব, পরগন্থ, যুগাবতার কাকে বলি? তাঁরা কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বলে ধরায় আসেন? তাঁরা বিধিন্ত অসাধারণ শক্তি নিয়ে এখানে আসেন। ভগবানের দূত হয়ে, জীবের মুক্তির সংবাদ নিয়ে, বিশেষশক্তিসম্পন্ন হয়ে, জন্মসিদ্ধ হয়ে, বিধাতার আদেশে তাঁরা পৃথিবীতে আসেন। জীবের হৃৎকাতর হয়ে, জুড়াতে না পেরে, জরা-বাধি-মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্তে, নিবিড়-ঘন-ঘোর গাঢ়মোহনিত্রা ভাঙ্গাবার জন্তে, যুগযুগান্তের ভ্রম, কুসংস্কারের শৃঙ্খল মুক্ত করবার জন্তে, স্বর্গের দীপ্ত দীপ জ্বলে জীব তরিতে তাঁরা আসেন। ধর্মের মানি, অধর্মের অভ্যুত্থান হলেই তাঁদের উদয় হয়। বিধাতা বিশেষ জ্ঞান, প্রাণভরা প্রেম, অমাহুষিক বল, পুণ্যের মুকুট দিয়ে তাঁদের সাজিয়ে পাঠান। যারা অসাধ্য সাধন করেন, অসম্ভব সম্ভব করেন, সাধারণ শক্তির অতীত কাজ করেন, অমানিশার চক্রোদয় করান, তাঁরাই মহাপুরুষ। যারা ধরার বিষম ভার মাথায় করে নেন, বিশ্বের তীব্র বেদনায় ছটফট করেন, অশেষ দুঃখ অতাবকে স্বেচ্ছায় বরণ করেন, পরের জন্তে অকাত্ত প্রাণ দেন, তাঁরাই অবতার। তাই বলে তাঁহাদিগকে আমরা ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি না, অনন্ত ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানুষ হয়ে জন্মেছেন, বিশ্বাস করি না। সে যা হ'ক, ধূম-কেতুর জ্ঞান, জগতে তাঁদের হঠাৎ উদয়, হঠাৎ অন্তর্ধান। ধূম-কেতুর অদ্বুত নিরমাত্মসারেরই তাঁদের গতিবিধি, চলা করা। শূন্যের অতাবে প্রকৃতি যেমন বাঁচেনা, মহাপুরুষদের স্তভাগমন না হ'লে মনুষ্য-সমাজও তেমনি চলে না। তাঁদের বিহনে সংসারের আধাখানা আঁধারে লুকিয়ে থাকে।

মুক্তির পথ প্রদর্শক যারা, তাঁদের কথাই আমরা আলোচনা করবো। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐক্যেই একমাত্র আদর্শ পুরুষ। জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে অদ্বিতীয়। একমাত্র গীতার উপদেষ্টা বেশেই তিনি আদর্শ-চরিত্র। সকল শাস্ত্রের সার, সকল ধর্মের সমন্বয়, সকল মতের মিলন, সকল বিরোধের মীমাংসা, সকল পণের শেষ এই গীতার ঘরাই সম্পন্ন হয়েছে। সমন্বয়চারণা ঐক্যের জীবনেও প্রমাণিত হয়েছে। সব ছেড়ে একমাত্র ভগবানেতে আত্মসমর্পণ করলেই মুক্তি লাভ হয়।

“বহুশাপ্যাগমৈ তিজ্ঞাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।

জ্ঞেয়ং নিপতন্ত্যোথাঃ জাহ্নবীরা ইবার্ণবে ॥”

বেদগণ গঙ্গার প্রবাহ সফল বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়া

অবশেষে সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায় সকল শাস্ত্রভেদে ভিন্নরূপ হইলেও তোমাতেই (তাঁহাতেই) পর্য্যবসিত হয়।

তারপরে ব্রহ্মদেব। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোম, ক্রিয়া, পদ্ধতি, ব্রত, উপবাস, স্তব স্তুতি, প্রার্থনা, বন্দনা, কৃপা, দেবানুগ্রহ সব উড়িয়ে দিয়ে, একমাত্র পুরুষকার, আত্মচেষ্টার উপর ধর্মকে দাঁড় করালেন। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, উচ্চনীচভেদ, অবরোধ-প্রথা, অস্পৃশ্যতাবিচার, বেদাননিকায়শাসন সব উঠিয়ে দিলেন, মানলেন না। কোনও অহুশাসনের বশবর্তী হলেন না। তাঁর হুকামে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গোমহর্ষণ হলো, চতুর্দশ ভূবন কম্পিত হলো। ভারত, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান, অর্ধভূবন তাঁর অহুসরণ করলো। আরও ভারতভূমি “নির্ধাণ-ক্ষেত্র” নামে ঘোষিত হচ্ছে।

প্রেমাবতার মহামতি ঈশা, যার জ্যোতিতে ধরা ভাসমান, যার নয়নে দীপ্তি, অন্তরে শান্তি, কার্ধ্যো প্রীতি, যার প্রাণ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দরূপানে নিমগ্ন, যার হাত ঈশ্বরের প্রিয়কার্যসাধনে রত, কি তাঁর কণ্ঠের বাণী ছিল? ব্রহ্মকৃপা জীবের হৃৎকাতর হয়ে, জীব তরিতে স্বর্গ হতে ভবে এসেছে এবার। ব্রহ্মকৃপা প্রান্ত, ক্লাস্ত, যুগন্ত, পরিত্যক্ত, পলায়িত মেবের ঘারে ঘারে অবেষণ করছে, ফির্ছে এবার। উপেক্ষিত, লাজিত, দলিত, বঞ্চিত, পতিতের, হরিজনদের ডাকছে এবার। “আমিতো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অত্যাগারে চেয়েছ” এই তাঁর কথা ছিল, এই সতাই তিনি প্রচার করে গেছেন। প্রায় হ'হাজার বছর কেটে গেল, আজও জগৎ তার রহস্য বুঝতে পারলো না।

ধর্মবীর অগ্নি-অবতার মহেশ্বর। যখন তিনি ঈশ্বরের আদেশ পেলেন, তাঁর বাণী শুন্লেন, কেউ তাঁকে বিশ্বাস করলোনা। একটা ১৮ বছরের যুবক, একজন নিরক্ষর ভৃত্য ও তাঁর সহধর্মিণী ছাড়া কেউ তাঁর অহুগামী হলো না। ঐকান্ত আরবেয় হস্তর মল-প্রাস্তরে, উচ্চ গিরিকন্দরে সে বজ্রবাণী ধ্বনিত হতে লাগলো। অচিরে “একমেবাদ্বিতীয়মের” সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হলো।

যখন সময় হ'ল, ভগবান্ মন্ত-মাতঙ্গ প্রমত্ত ত্রীগোপাশকে পাঠিয়ে ভক্তির প্রবাহে, প্রেমের বজ্রায় দেশকে ভাসিয়ে দিলেন। তাতে জাতিভেদ, অচলায়তনদেশাচার সব ভেঙ্গে গেল। আচণ্ডাল হরিভক্তিরসে ডুবে, মজ্জা, মেতে গেল। বঙ্গরঙ্গভূমিতে ভক্তির জয় হলো। বিশ্বপতি, বিশ্বের নিয়ন্তা, বিশ্বের কল্যাণ-কর, সময়ে সময়ে, এই রকম আরও কত মহাপুরুষকে পাঠিয়ে জীবের উদ্ধারের পথ হুগম করেছেন, তা বলা যায় না। এবারে বিধাতা সব মিলিয়ে নববিধানের লীলা জগতে বিশেষভাবে প্রচার করেছেন। নববিধানই বর্তমান যুগধর্ম, সাম্যের মঙ্গলশাস্ত্র, পরি-প্রাণের পথ, মুক্তির সোপান।



প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, যুগাবতার মাঝেই এসিয়াবাসী। একমাত্র জার্মান সন্ন্যাসী মার্টিন লুথার ইউরোপের লোক, যিনি অকুতোভয়ে পোপের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। অনাচার, অত্যাচার, দুর্ভাচার, ব্যভিচার দূর করবার জন্তে বহুপরিকর হয়েছিলেন। যাঁর প্রতিবাদে সমগ্র ইউরোপের ধ্বংস হয়েছিল। অবশেষে Protestantism দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়েছিল।

আলোকস্তুম্বররূপ এই সকল স্বার্থশূন্য, দৃঢ়বিশ্বাসী, বহুদেহী, অমিততেজা, ভূভারহারী মহাপুরুষদের অন্তরের শ্রদ্ধাজ্বলি না দিয়ে কি আমরা বিদায় করে দেব? তাঁরা ত কিছু চাননা। না চাহিতে সব দিয়ে জগতের জন্তে তাঁরা ফকির হয়ে ছিলেন। তাঁদের প্রতি আমাদের কি কর্তব্য, আমাদের কি ধর্ম? বিশ্ব-মাঝে, বিশ্বরূপের বিরাট প্রকাশ দেখে যদি আমরা স্তম্ভিত, অভিভূত হই, তাঁর অপার রচনা-কৌশল, ধন-ধাতু-ভরা বিচিত্র রমণীয় ধরার সৌন্দর্য্য দেখে বিমোহিত হই, তবে যাঁদের করুণা-স্পর্শে নির্বিকার আত্মা মধ্যে অথও মণ্ডলাকার পূর্ণব্রহ্মের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হয়, বৈরাগ্যের ছিন্নকস্থা মধ্যে অমূল্য চিন্তা-মণিধন লাভ হয়, তাঁদের অন্তরের অন্তঃপুরে স্থান না দিয়ে বাহিরের দেউড়িতে বসিয়ে রাখবো, তাত হতে পারে না, নববিধানবাদী তা করতে পারেন না। সাধুভক্তি, মহাজনসেবা তাঁর অন্তরে গাঁথা, রক্তে লেখা, গলার হার, ধর্মের অঙ্গ। এধার মা তননী ভক্তকোলে ভগবতীরূপে এসেছেন। ভক্তকে বাদ দিলে চলবে না। বিধাতা ভক্তকে সৃষ্টি করেন, ভক্ত জগৎকে নতুন করে সৃষ্টি করেন। তাঁরা ভাঙ্গা যোড়া দেন। তাঁদের ভক্তি করা, সন্মান করা ত স্বাভাবিক। তাঁদের সেবা করলে, শ্রদ্ধা করলে, তাঁরা বড় হবেন না; আমরাই ধন্য হব, কৃতার্থ হব, জীবন পার্থক্য হব।

সাধু, ভক্ত, মহাজনেরা কোনও দেশ, কালে বদ্ধ মন। অতীতের বস্ত্র নন। মৃত নন। যুগ, যুগান্তর ধরে তাঁদের বাণী মিত্যকাল প্রস্রবিত হচ্ছে, অনাহত বাজছে। তাঁরাও ভগবানের মত, স্থানেতে এখানে, কালেতে এখন। হরিশীলার নিত্য-নিকেতন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের নিত্য সখ্য। তাঁদের পূজা আজন্মের অধিকার। এই সাধুভক্তি নিয়ে পৃথিবীতে কত সান্না-বারি, কাটাকাটি, রক্তপাত হয়ে গেছে। ছোট, বড় বিচার নিয়েই ঘত বিরোধ, বিবাদ, বিসম্বাদ। “ভগবান্ বলিলেন, ভক্তকে বিচার করিব আমি, ভক্তি করিবে তুমি। তুমি যদি সাধুর বিচার কর, অনধিকারচর্চা-দোষে দণ্ডনীয় হইবে। \* \* ভক্ত পরীক্ষা করিবার তার কেবল নববিধানের লোকের উপরে নাই।” নববিধানে সাধুদিগকে ভাল করে আহ্বান করে, তাঁদের রক্ত, মাংস অন্তরে নিষ্পিত করে, সাধুচরিত্র লাভ করবার কথা সাধু হয়ে যাবার কথা।

অতীতের কোন্ নিভৃত, নিরাশ্রয় মায়াবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

ধরার কোন্ সঠিক জনপদে তার বাস ছিল, কালের ভরসে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় এসে পড়েছে, আদিম বন্য অবস্থা থেকে উন্নতির যে উন্নত শিখরে আজ এসে পড়েছে, বিজ্ঞানের নবালোকে তার জ্ঞানের স্বরূপ হ্রদার যতটা আজ খুলে গেছে, জীবনের উচ্চ লক্ষ্য যতটা উপলব্ধি করতে পেরেছে, তাতে “মহাজনো যেন গতঃ স পৃথ্বাঃ” অবলম্বন করা ছাড়া, তাঁদের পদচিহ্ন অহুসরণ করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। মানবদেহ-ধারণের সার্থকতা নেই। এমন দুর্লভ মানবজন্ম পেয়ে, জীবনে জীবনদাতার চিহ্ন না হয়ে, তাঁর অমর সুপুরুষের পদধূলি মাথায় না নিয়ে, কি করলুম, সব বৃথা, পণ্ড্রম হগো। “এই কি ভালবাসা তাঁর প্রতি ওরে মন, জীবনে কৈ দেখাইলে তার নিদর্শন।” অতএব, এগ ভাই, বোন, ভগবান্কে ভালবেসে, ভগবানের প্রেরিত প্রত্যাশিট মহাপুরুষদের ভালবেসে, বিনা আয়াসে, :আমরা তবদিক্ষু পার হয়ে যাই। মা, দয়া করে এই আশীর্বাদ কর।

“নমামি নারায়ণপাদপঙ্কজম্

করোমি নারায়ণপূজনং সদা।

বদামি নারায়ণনাম নিশ্চলম্

স্মরামি নারায়ণতত্ত্বমব্যয়ম্” ॥

ঐদেবেন্দ্রনাথ বসু।

## রাজা রামমোহন রায়।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, ভারতের সর্গদ্বার রাজা রাম-মোহন রায়ের স্মৃতিবার্ষিকী দিবস অশ্রুপ্তিত হইয়াছে। এক শতাব্দী পূর্বে এই দিনে রাজা রামমোহন ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরে দেহত্যাগ করেন। এই এক শতাব্দীতে ভারতে যুগ পরিবর্তন হইয়াছে; ধর্ম, সমাজ, সাহিত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে, সকল দিক দিয়াই এক নবীন জাতি এই প্রাচীন আধ্যাত্মিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই নবযুগের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এই মহাপুরুষ বিরাট হিমালয়ের মতই ভারতের বুকে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অশূল-সঙ্কেতে জাতিকে পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞান সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এবং অসাধারণ বাঁকুসম্পন্ন পুরুষ বর্তমান যুগে কেবল ভারতে কেন,—সমগ্র পৃথিবীতে জয়গ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। পৃথিবীর যে কোন দেশে জয়গ্রহণ করিলে উন্নতশীর্ষ মহীরুহের মতই সকলে অনায়াসে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিত। পরাবীন ভারতে তাহার অধঃপতনের যুগে তিনি যে জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বিধাতারই বিশেষ বিধান বলিয়া আমরা মনে করি। পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এক একজন মহাপুরুষ আসেন, যাঁহাদের বিরাট শক্তি ও প্রতিভা মানবসমাজকে তাদে, গড়ে, জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, তাহার সন্মুখে

নূতন আদর্শ স্থাপন করে। রাজা রামমোহন সেই শ্রেণীর লোক। মোগল রাজত্বের অবসানে এবং ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে—ভারতের তখন সকল দিক দিয়া অধঃপতনের যুগ—জাতি অবসর, ষাণ্ঠীন; মুন্সুংবৎ এই অবসর জাতির সম্মুখে একটা শক্তিশালী জাতি তাতার নূতন সভ্যতা লইয়া সমুপস্থিত। এই প্রাচ্য-প্রতীচ্য-সম্মুখ ভারতের জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষেপে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব—তিনি যদি সে সময়ে না আসিতেন, তবে আমাদের জাতীয় জীবনের গতি কোন্ দিকে পরিবর্তিত হইত, কে বলিতে পারে?

রামমোহনই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও দূরদৃষ্টিবলে, নব্য ভারতের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্যে রাজনীতিতে, শিক্ষা-বাবস্থার সর্বত্র তাঁহার প্রতিভার ছাপ পরিষ্কৃত হইল। তিনি ভিলেন, ‘একাই একশত’,—শতচক্ষে শতদিকে তিনি কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন; একজন মানুষের পক্ষে, এক জীবনে যে এত কাজ করা সম্ভব, ইহা ভাবিয়া অনেক সময় বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু, তিনি ভগবানের বিশেষ আদেশ শিরে ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই মুন্সুং জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করিবার জন্ত। তাঁহার সেই মহান ত্রুত তিনি উদ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। শতাব্দী পূর্বে তিনি যে আলোক প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, সেই আলোকে এখনও আমরা দুর্গম পথে অন্ধ-কারে যাত্রা করিতেছি। আজ তাঁহার এই শতবার্ষিক মৃত্যুতিথিতে তাঁহার অমর কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমরা ধন্য হই—পবিত্র হই।

### রাজা রামমোহন রায়ের শতবার্ষিকী উপলক্ষে—

মহাত্মা গান্ধীর বাণী :—

“আমি আধুনিক কালের হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কারকদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়কে অত্যন্ত মনে করি।”

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বাণী :—

“রাজা রামমোহন রায় বর্ত্তমানে ভারতের অত্যন্তম শ্রষ্টা, অতিমানব, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারক, সার্বজনীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বসম্প্রদায়ের মিলনকর্ত্তা ছিলেন।”

বীনবন্ধু এগুজের বাণী :—

“উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ মনীষী, বাঙ্গালার বিখ্যাত লম্বাক-সংস্কারক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনপ্রয়াসী মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের জীবনব্যাপী সাধনার পেছনে একমাত্র ধ্যান ছিল, ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া মানবের বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রচেষ্টার ভিতর ঐক্য ও সামঞ্জস্যের অধিকারপূর্ব্বক সাম্য ও মৈত্রীর পুনঃস্থাপন।”

(“মানন্দবাণীর পত্রিকা” হইতে উদ্ধৃত)

## ডাঃ আনি বেনাভু।

মহাব্যক্তিবিশালিনী, অসামান্যমনীষাসম্পন্ন, তেজস্বিনী, বিশ্ব-বিশ্ৰুতা, ভারতের শ্রেষ্ঠ জননায়িকা, বিশ্বময় ভারতীয় কৃষ্টি ও থিয়োসোফীর প্রচারিকা, থিওসোফিক্যাল সোসাইটির সভানেত্রী, ভারতমাতার আত্মিক স্ফূর্ত্তা—বাঁচার ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আদর্শে ভারতের নবজাগরণ ও আত্মবোধ সঞ্চার হইয়াছে, এতাদৃশী মণীয়সী নারীলগ্নামতূতা শ্রীযুক্তা ডাঃ আনি বেনাভু, গত ২০শে সেপ্টেম্বর, মাদ্রাজে আদিয়াবে, প্রায় ৮৬ বৎসর বয়সে, শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পরলোকে মরণপ্রস্থান করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে যথাযোগ্য উন্নত স্বর্গলোকে স্থান দান করুন। বিশ্বময় তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির বাণী উদ্ভিত হইতেছে। কলিকাতার পৌরজন-প্রতিনিধি-সভায় যে শ্রদ্ধাঞ্জলির বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমরাও সকলের সহিত নিম্নোক্ত সেই বাণীতে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি—

“সমগ্র জগৎ ও মানবতার সেবার অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ডাঃ আনি বেনাভুর \* \* \* চত্বারিংশৎ বর্ষাধিককালের সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবন ভারতের সেবার নিয়োজিত ছিল এবং তিনি ভারতের সার্বজনীন জাতীয়তার সহিত অঙ্গান্বীভাবে জড়িত থাকিয়া এতদেশের শিক্ষা, সংস্কার, ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতিক প্রগতির জন্ত যাত্রা করিয়াছেন, তাহার পরিমাপ হয় না। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অসামান্য সংগঠন-শক্তি, বিপুল উৎসাহ ও কঠোর আদর্শ-নিষ্ঠা বর্ত্তমান ভারতের নব-জাগরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ে তাঁহার অনন্তসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তারিত রহিয়াছে। মাতৃভূমি বলিয়া গৃহীত ভারতভূমির সেবাকল্পে তাঁহার বহু কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা ইতিহাস চিরকাল সক্রিয় অস্তরে স্মরণ রাখিবে।”

—০—

## বাঙ্গলার সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা কবি

পরলোকে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়।

(সাহিত্য, সমাজ ও নারীর কল্যাণ-কর্ম্মীর তিরোধান)

বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধা কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, রাত্রি ৩টাকার সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে (৪২এ, হাজরা রোড) নিমোনিয়া রোগে পরলোক-গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। কেউভাঙা আশান বাটে নহাসমারোহে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই অমুঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, শনিবার দিবস শ্রীযুক্ত কামিনী রায় রামমোহন শতবাধিকী কমিটির এক অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়া একটু অসুস্থতা বোধ করেন। রবিবার দিন তিনি অরাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সোমবার চিকিৎসকগণ মত প্রকাশ করেন যে, তিনি নিমোনিয়াগ্রস্ত হইয়াছেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাষ্টমী তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করেন। শতবর্ষ পূর্বে বাঙ্গলার অগ্র-তম শ্রেষ্ঠ সন্তান রামমোহন রায়ও উক্ত দিবসে মানবলীলা সং-বরণ করেন। বঙ্গজননীর এই দুইটা কৃতী সন্তানের একই দিবসে তিরোধান নিত্যসুই রহস্যজনক।

শ্রীযুক্ত কামিনী রায়ের জীবনের তিনটা দিক লক্ষ্য করিবার বিষয়। উহা হইল তাঁহার সাহিত্যিক কার্যকলাপ, সমাজসেবা এবং নারীজাতির প্রতি ঐকান্তিক দরদ।

বঙ্গ-সাহিত্য যখন রবীন্দ্রনাথের রম্যিপাতে সমুজ্জল হয় নাই, তখন শ্রীযুক্ত কামিনী রায়ের কাব্য-প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের সুখোজ্জল করিয়াছিল। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার “আলো ও ছায়া” এক অভিনব অবদান। তাঁহার গীতি-কবিতা ও জাতীয় সঙ্গীতগুলির এক একটা জাতীয় সম্পদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সামাজিক কার্যকলাপ বহুবিধ। বাল্যে ধর্ম-ভাবের কঠোর বন্ধনে প্রতিপালিতা হইলেও, আধুনিক সমাজের অন্যায় অবিচার এবং উৎপীড়নের প্রতি তাঁহার সূতীক দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। “সেবামর্ম” “এরা যদি জানে” “সত্যগ্রহী” প্রভৃতি কবিতার বাঙ্গলার অস্পৃশ্যদের প্রতি তিনি যে দরদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার সমাজে পতিতদের প্রতি আন্তরিক শ্রীতিরই সূচনা দিতেছে।

তাঁহার ‘নারীনিগ্রহ’ ‘নারীর দাবী’ এবং ‘নারীর জাগরণ’ প্রভৃতি কবিতা বাঙ্গলার নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ ও দুঃখের কাহিনী অতুলনীর ভাষায় মূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯২৩ সালে কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে, নারীর ভোটাধিকারের জন্ত একটা ডেপুটেশন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। নারীর দুঃখ দৈন্য মোচনের দাবী উপস্থিত করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত কামিনী রায় এই ডেপুটেশনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯৩০ সালে লেবার কমিশন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্ত আসিলে পর, বাঙ্গলা সরকার শ্রীযুক্ত রায়কে শ্রমিক স্ট্রীলোকদিগের অভাব অভিযোগ অবগত হইয়া কমিশনের নিকট জানাইবার জন্ত এসেসর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত কার্যগুলি, শ্রীযুক্ত রায়ের বাঙ্গলার নারীজাতির প্রতি কিরূপ দরদ ছিল, তাহারই পরিচায়ক।

তারপর ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার আত্মজীবন কাব্যাবলী সমাজ-সেবার অপূর্ণ প্রতীকস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীযুক্ত রায়ের তিরোদানে বাঙ্গলা যে শুধু একটা সাহিত্য-মরুই হারাইল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার নারীজাতির আশা,

আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শেরও একটা দীপশিখা নির্বাপিত হইল। শ্রীযুক্ত রায় ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার একটা নিখুঁত মূর্তি।

শ্রীযুক্ত কামিনী রায়ের মৃত্যুতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—

“১৮৮৮ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি পর-লোকগত কবি কামিনী রায়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের সহিতও আমার পরিচয় ছিল। তিনি একজন ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ সভ্য ছিলেন এবং আমিও বালাকাল হইতে সেই সমাজভুক্ত। “আলো ও ছায়া” কবিতাগুলি কবি অল্প বয়স হইতেই রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রচয়িতার সেগুলি লোকসমক্ষে প্রচার করিবার মত সাহস ছিল না। আমার স্মরণ আছে, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস তাঁহার বন্ধু কবিবর ৮হেমচন্দ্র বান্দ্যোপাধ্যায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া ‘আলো ও ছায়া’ পাণ্ডুলিপি সমর্পণ করিয়াছিলেন। কবিবর এগুলির রচনাপ্রণালীতে মুগ্ধ হন এবং স্বয়ং পুস্তকটির ভূমিকা লিখিয়া রচয়িতাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ‘আলো ও ছায়া’ প্রকাশিত হইবামাত্রই আমি উহা আগাগোড়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া-ছিলাম। কখনও কখনও প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার রসায়ন-শাস্ত্রে লেকচার দিবার সময়েও ঐ সকল কবিতা আবৃত্তি করিতাম।

“আলোর উৎপত্তি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আলোচনা করিবার সময় আমি স্ততঃই আবৃত্তি করিতাম :—

“গেছে, যাক্ ভেঙ্গে স্বপ্নের স্বপন—

স্বপন এমন ভেঙ্গেই থাকে ;

গেছে, যাক্ নিবে আলোর আলো—

গৃহে এস ফিরে ঘুর না পাকে।”

“বলিতে গেলে ‘আলো ও ছায়া’ বঙ্গ-সাহিত্যের এক অপূর্ণ দান। সে সময় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ততটা প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই, অতরাং ইহা রবিজ্ঞার আওতার পতিত হয় নাই এবং ইহার মৌলিকতাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। অবশ্য ‘আলো ও ছায়া’ রচনার পরে তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা পুস্তিকা-কারে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, ‘আলো ও ছায়া’ কবির শ্রেষ্ঠতম রচনা, সেরূপ রচনা আর তাঁহার লেখনী-প্রসূত হয় নাই।

“‘আলো ও ছায়া’ প্রকাশিত হইবা মাত্রই সাহিত্য-জগতে, শ্রীযুক্ত কামিনী রায়ের স্থান অতুল বলিয়া সূর্যবাদিসম্মত হইল। কবিতাগুলির আত্মোপাত্ত উচ্চভাবময়।

“কবি তাঁহার বিবাহের পর শেষ জীবনে পারিবারিক অনেক শোক তাপ পাইয়াছেন এবং ইদানীং তাহাকে দেখিলেই মনে হইত, যেন একটা বিয়াদ-ছায়া তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরাজ করিতেছে।

“আর অধিক বলিব না, এই বৃদ্ধ বয়সেও ‘আলো’ ও ‘ছায়ার’ কবিতাগুলি আমার হৃদয়গটে অঙ্কিত রহিয়াছে।

“বঙ্গ-সাহিত্য তাঁহার তিরোধানে অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।”

(“আনন্দবাজার পত্রিকা” হইতে উদ্ধৃত)

## শারদীয় উৎসবের বিবরণ।

ভক্ত ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—“যদি পূজা করিতে হয়, মাতৃ-পূজার তুল্য আর পূজা নাই”। নববিধানে ঈশ্বরের মাতৃভাবের প্রকাশের ন্যায়, এমন মধুময়, এমন শোভাময়, এমন ঐশ্বর্যময়, এমন আশা ও আনন্দের ঘনীভূত প্রকাশ আর কি হঠতে পারে? আমরা পৃথিবীর দীন ভূখণ্ডে গরিব কাল; এই মাতৃপূজা করিয়া, মাতৃদর্শনের ও তাঁহার অন্তর ও আশাশ্রয় বানীশ্রবণের এবং তাঁহার বিমল স্নেহ করুণা লাভের সত্যই অধিকারী হই, এবং তাঁহার পূজানন্দের ভিতরে প্রকৃত শান্তি আরাম সম্ভোগ করি। এই মহাশক্তির আরাধনার মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং দেশের ও সমস্ত বিশ্বের অমর জীবন, আশার ভবিষ্যৎ এবং সকল প্রকার মঙ্গল বতই প্রত্যক্ষ করি, ততই আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের, দেশের জীবনের সকল প্রকার রোগ, শোক, তপ, দারিদ্র্য ও পরীকার ভিতরেও সে সকল অবস্থার অতীত হইয়া, স্বর্গের অঞ্চল অমর পরিবর্তে, অমর জীবনের বিমলানন্দ ও শান্তি আরাম সম্ভোগ করিয়া ধন্ত হই। যদিও এমন মাতৃপূজার, এমন জাতীয় মহোৎসবে এখনও আমরা দলে বলে তেমন জমাটভাবে পূজাক্ষেত্রে মিলিতে পারিতেছি না, যদিও এবার শারদীয় উৎসবে মায়ের পূজার বাহ্য তেমন কোনই আয়োজন ছিল না বলিলেই হয় তথাপি, যে কয়েকটা তাঁহার কান্দাল গরিব পুত্রকন্যা পূজাক্ষেত্রে তাঁহার নামে মিলিত হইয়াছিল, আমরা আশাতীতরূপে মায়ের ঐহিকের প্রসাদ সম্ভোগ করিয়া ধন্ত হইয়াছি। নিম্নে এবারের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী চারিদিনের উৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, সপ্তমী দিনে পূর্বাঙ্কে, নবদেবালয়ে, ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায়ও ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য করেন। আচার্য্যদেবকৃত একটি সময়োপযোগী প্রার্থনা পাঠ করেন। সন্ধ্যায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্রনাথ রায় ভাবের সহিত মাতৃসঙ্গীত গান করিয়া সকলকে তৃপ্তিদান করেন। অথও চন্দ্রদ্বন্দ্ব মাতৃ-প্রকাশের মধ্যে ইহলোক, পরলোক মিলিত। এখানে সম্প্রদায়ভেদের, জাতিভেদের, দেশকালভেদের কোন গতি নাই। অথও অনন্ত মাতৃপ্রকাশের মধ্যে তাঁহার সকল পুত্র কন্যা লইয়া অথও পরিবারের অথও উৎসব, ইহাই আমরা

এ দিনে মাতৃপ্রকাশের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্ত হই।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১১ই আশ্বিন বুধবার, অষ্টমীর দিন—এ দিন রাজর্ষি রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক দিন। প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন, সন্ধ্যায় ব্রহ্ম-মন্দিরে ডাঃ প্রেমেন্দ্রনাথ রায় উপাসনার কার্য করেন। শ্রীমান শশিকুমার চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীতের কার্য করেন। প্রেমেন্দ্রনাথ ভাবের সহিত উদ্বোধন ও আরাধনা করিয়া সমস্ত প্রার্থনাদির পর, বিশেষ বিশেষ স্থান হইতে সময়োপযোগী অংশ পাঠ করেন। তাঁহার পাঠ ও আত্মনিবেদনে অষ্টমী পূজার বিশেষ ভাবের সঙ্গে ধর্মপিতামহ রামমোহনের সার্বভৌমিক একেশ্বরবাদপ্রতিষ্ঠার মিলন প্রদর্শিত হইয়াছিল। তিনি এদিনের অস্ত্রান্ত পাঠের মধ্যে উর্দু ভাষায় বর্ণিত একেশ্বরভাবপ্রধান উক্তি পাঠ করিয়া পাঠ ও প্রসঙ্গকে জমাট করিয়া তুলিয়াছিলেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১২ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—নবমীর দিন পূর্বাঙ্কে নবদেবালয়ে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ডাক্তার সত্যানন্দ রায় উপাসনার প্রথমাংশ এবং ডাক্তার অম্বকুলচন্দ্র মিত্র পাঠ ও প্রার্থনাদি করেন। এ দিনের উদ্বোধন, আরাধনা এবং পাঠ ও প্রার্থনাদি বেশ সরল ও সুন্দর হইয়াছিল।

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৩ই আশ্বিন, শুক্রবার—দশমীর দিন পূর্বাঙ্কে নবদেবালয়ে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনার কার্য করেন। সন্ধ্যায় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য করেন। ভাই অক্ষয়কুমার লখ মাতৃস্তোত্রপাঠের নেতৃত্ব করেন ও শ্রীমদাচার্য্য দেবের প্রার্থনা “সত্যসাধনা” পাঠ করেন। শ্রীমতী নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ সঙ্গীতের কার্য করেন।

## সংবাদ।

নামকরণ—গত ১লা আশ্বিন, রবিবার, অপরাহ্নে, গোবরা রজের কারখানার, শ্রীমান অনিলকুমার ঘোষের ছই বৎসরবয়স্ক শিশুপুত্রের জন্মদিনে, শিশুর শুভনামকরণ অহুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন এবং শিশুকে “অলোককুমার” নাম প্রদান করেন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচারভাণ্ডারে ২০ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৮ই আশ্বিন, কাশীপুরে, স্বর্গীয় রায়বাহাদুর ডাঃ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বিনয়েন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের শিশুপুত্রের শুভনামকরণ অহুষ্ঠানে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন এবং শিশুকে “রঞ্জিত” নাম দান করেন। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা প্রচারভাণ্ডারে ৫০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দান করেন।

গত ৯ই আশ্বিন, হাওড়ায়, ১৯নং কুচিলসরকার লেনে, শ্রীমান সন্তোষকুমার দাসের গৃহে, তাঁহার ভাগিনের ও লক্ষ্মীপ্রবাসী

শ্রীমান শর্করীকান্ত ধরের শিশুপুত্রের শুভ নামকরণে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন, এবং শিশুকে “প্রহ্লানকুমার” নাম প্রদান করেন। শ্রীমান শর্করীকান্ত শিশুপুত্রের নামকরণে প্রচারভাণ্ডারে ১ টাকা দান করিয়াছেন।

ভগবান্ শিশুদিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে শুভাশীষ দান করুন।

**শুভবিবাহ**—গত ১০ই আশ্বিন, কলিকাতায়, ৫৫নং হারিসন রোডে ভবনে, লক্ষ্মীপ্রবাসী স্বর্গীয় নীলমণিকান্ত ধরের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয়া শ্রীমান্ প্রভাতকান্তের সহিত, কলিকাতা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত মনোনাথ সরকারের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিমার শুভবিবাহস্থান সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই অক্ষয়কুমার লখ এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ শর্করীকান্ত ভ্রাতার শুভবিবাহে প্রচারভাণ্ডারে ২ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৭ই আশ্বিন, কুচবিহারে, রাণীগঞ্জ-নিবাসী স্বর্গীয় আশুতোষ চক্রবর্তী কাব্যবিশারদের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীয়া শ্রীমান্ গিরিশ চক্রবর্তীর সহিত, কুচবিহার-প্রবাসী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ইন্দুলেখার শুভবিবাহস্থান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ এই অনুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

গত ১৮ই আশ্বিন, ঢাকায়, ময়মনসিংহ-প্রবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দত্তের দ্বিতীয় পুত্র কল্যাণীয়া শ্রীমান্ সুধীরকুমারের সহিত, ঢাকা-প্রবাসী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রথম কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বনজোৎস্নার শুভবিবাহস্থান সম্পন্ন হইয়াছে।

ভগবান্ সংসারযাত্রী নবদম্পতিদ্বয়কে শুভাশীষ দান করুন।

**পরলোকগমন**—অতীব দুঃখের সহিত, শোকসহ্যাতৃপ্তিপূর্ণ হৃদয়ে, নিম্নলিখিত পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি:—  
আমাদের স্বর্গীয় বন্ধু বিনোদবিহারী বহুর চতুর্থ জামাতা ডাক্তার অখিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এম.বি.) তাঁর দমদমার প্রবাস-ভবনে, গত ৬ই সেপ্টেম্বর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ৮ই নম্বর দেহ ত্যাগ করিয়া, পরিবার ও ২টা শিশুকে অনাথ করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। এই শোকান্ত পরিবারের শোকে সাহসনা দিব্যরাজ্য ভাই অখিলচন্দ্র প্রায় তিন দিন বিশেষভাবে উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়াছেন। শোকস্বাপ্নহারিণী মা পরলোকগত আত্মাকে তাঁর শান্তিস্বর ফ্রোড়ে স্থান দান করুন এবং পতিহীন বিধবা চুঃখিনী শ্রীমতী স্নেহকণাকে ও দুটা অনাথ শিশুকে রক্ষা করুন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, প্রত্যুষে, রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকীর পূর্ণ্যদিনে, কলিকাতায় ৪২এ হাকরা রোডে, ডিষ্ট্রিক্ট এবং সেসন্স জজ স্বর্গীয় কেদারনাথ ধরের সহধর্মিণী, স্বনামধন্য লেখক স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা,

বিধাত “আলো ও ছায়া” গ্রন্থের রচয়িত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক “জগদারিণী” পদকভূষিতা, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি শ্রীমতী কামিনী রায় ৬৯ বৎসর বয়সে, সাহিত্যে, সমাজে, দেশে ও নারীকল্যাণে অমর কীর্তি রাখিয়া, নিউমোনিয়া রোগে তিনচারি দিনের মধ্যে, শোকতাপতপ্ত জীর্ণ শরীর রাখিয়া, অমরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে পবিত্র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তথায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী শুভ প্রার্থনা করেন। সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং আমাদের মণ্ডলীর শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস ও ডাঃ সত্যানন্দ রায় শ্মশানে উপস্থিত হইয়া স্বর্গীয় আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। শ্রীযুক্তা রায় স্বামীর স্বর্গারোহণের পর নববিধান প্রচারভাণ্ডারে, স্বামীর পূণ্যস্থিতিতে এক সহস্র টাকার কোম্পানী কাগজ স্থায়ীকরণে দান করিয়া আমাদের পরম কৃতজ্ঞতাভাজনীরা হইয়াছেন। পরম জননী তাঁহার কন্যাকে অনন্ত শান্তিক্রোড়ে স্থান দান করুন এবং শোকান্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সাহসনা বিধান করুন।

নববিধানসাধক, ছালুজা ব্যাণ্ডের উদ্যোগী সেবক, আমাদিগের সমবিধাসী প্রকল্পদ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অমুকুলচন্দ্র রায় অনেক দিন যাবৎ কঠিন হুরারোগ্য বহুমুত্র-রোগে ভুগিয়া, অন্তে মা আনন্দময়ীর শান্তি-ক্রোড়ে, গত ২৩শে আশ্বিন, সেমিবার বিগ্রহহে, কুলটীতে (নীতরামপুর) বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। তিনি হরিপাল গ্রামে বহু প্রাচীন সম্রাট রায় বংশে, ৩১শে ভাদ্র ১২৭৫ সালে জন্মিত হন। নববিধানে সৌভাগ্য ভবিষ্যৎ আদর্শ প্রেরিত ভাই অমৃতলালের নিকট ভাদ্রোৎসবের দিন তিনি দীক্ষিত হন ও আমাদিগের মণ্ডলীর প্রিয়তম প্রকল্পদ ভাই প্রমথলালের নিকট তিনি মাঘোৎসবে সাধকব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার আত্ম প্রাক্ক্রিয়া আগামী ২রা কার্তিক কুলটীতে সম্পন্ন হইবে। মা বিধানজননী তাঁহার প্রিয় সন্তানকে ব্রহ্মানন্দলে চিরশান্তি ও তাঁহার সন্তানদিগকে এবং পরমাত্মীয়গণকে সাহসনা প্রদান করুন।

**ভস্ম-প্রতিষ্ঠা**—গত ২১শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়-প্রাক্ষণে, আচার্য্যদেবের মধ্যমা কন্যা স্বর্গীয়া শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর পবিত্র ভস্ম স্থাপন করা হয়। ভাই প্রিয়নাথ নবসংহিতার প্রাণনাথোৎসবে ভস্ম স্থাপন করিয়া পরে প্রার্থনা করেন।

**রাজর্ষির শতবার্ষিকী**—পুরী নবপর্ণকুটীরে তত্ত্বতা কধেকটা বিখ্যাতা বিখ্যাসিনী সহ, গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, গভীরভাবে রাজর্ষি রামমোহনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী সন্মিত করেন। সন্ধ্যা উপাসনাও এখানে হয়। তৎপূর্বে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ আই, এন্. দে মহাশয়ের বাড়ীতে কমিটির অধিবেশন হয় এবং হির হয়, ৭ই অক্টোবর সর্বসাধারণকে লইয়া শতবার্ষিকী স্মৃতিসভা হইবে।



গত ৭ই অক্টোবর পুরী রেল স্টেশনে সর্বসাধারণের সম্মেলনে শতবার্ষিকী স্মৃতিসভা হয়। কালেক্টর মিঃ এন্. পি. খডানি, আই. সি. এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সন্তান-সন্ততিগণ সহ তাঁর সঙ্গিনী, অনেক গণ্যমান্য ভদ্রমহিলা ও পদস্থ ব্যক্তি এবং জনসাধারণ যোগদান করেন। হল ও বারান্দা লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। বেদগান ও বালিকাগণের মঙ্গলাচরণ হইলে, ভাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা করিয়া কার্য আরম্ভ করেন এবং কুমারী রেণুকা দেবী সঙ্গীত করিলে, প্রক্টর ভাই মল্লিক মহাশয়ই ধর্ম্মপিতামহের মহাজীবনের বিবরণ বিবৃত করিয়া, তিনি যে বর্তমান যুগযশের এবং বর্তমান নবজাগরণের বীজ বপন করিতে ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়া আসিয়াছিলেন, এই বলিয়া সভার উদ্বোধন করেন। তাহার পর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ চুই তিন জন বালিকা রচনা, ধর্ম্মপিতামহের বাণী ইত্যাদি আবৃত্তি করিলে, একটি কুমারী মহিলা শ্রীমতী আনন্দিতা দেবীর স্মৃতিস্তম্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং মিঃ বি. কে. সেন ইংরাজীতে পাশ্চাত্য জগতে রাজর্ষির সম্মাননা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতও হয়। শেষে সভাপতি মিঃ খডানি ইংরাজীতে অভিভাষণ করিলে, হাইকোর্টের একজন উকীল ধৃতবাদ দেন। মল্লিক মহাশয় সমর্থন করিলে, শেষ সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাত্ৰি বামমোহন রায়ের জগন্মমের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান, কলিকাতার বামমোহন রায় লাইব্রেরী হলে, আইব্রেরীর 'কর্তৃপক্ষ' ও ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখা সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাতে ৯ ঘটিকায় ব্রাহ্মোপাসনা হয়; আদি সমাজের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যাতীর্থ উদ্বোধন, নববিধান-সমাজের শ্রীযুক্ত বেনীমাধব দাস আরম্ভনা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র উপদেশ দান করিয়া প্রার্থনা করেন। উপদেশে মিত্র মহাশয় বিশেষভাবে বামমোহনের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং নারীজাতির কল্যাণার্থ কার্যাবলী উল্লেখ করেন। সন্ধ্যা ৬টার সর্বধর্ম্মাবলম্বীর সম্মিলিত প্রার্থনা ডাঃ শ্রীযুক্ত আচার্য্য পাঠ করেন। ৬০০টার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে স্মৃতিসভা হয়। শিঙ্গিগাল জে. আর. বানার্জি, শ্রীযুক্ত ক্রিতিমোহন সেন, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি রাজর্ষির গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

শুভাশীর্বাদ—গত ২০শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলীতে মেডার হোটেলে, লাহোরের অবসরপ্রাপ্ত সেন্স জজ রায় বাহাদুর গঙ্গারাম সোনির চতুর্থ পুত্র কল্যাণী মিস্ট্রী হীরালাল সোনির (Bar-at Law) সহিত, কলিকাতার শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দদেবের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন সেনের ও শ্রীমতী মৃণালিনী দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী অঞ্জলির শুভবিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া উপাসনান্তে আশীর্বাদানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ তাহার পুত্র ও কন্যাকে শুভাশীর্বাদদানে পবিত্র ব্রতের জন্ত প্রস্তুত

করিয়া লউন।

সাম্বৎসরিক—ভক্ত ব্রহ্মানন্দের দ্বিতীয়া কন্যা, কুচবিহারের স্বর্গীয় কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গদর্শিনী স্বর্গীয়া সাবিত্রী দেবীর স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে, গত ২২শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে ২৮১ চক্রবেড়ে গেনে পুত্রদের গৃহে ভাই অক্ষয়কুমার লখ, সন্ধ্যায় ৭৬ নিউগিগেটার রোডে জোষ্ঠা কন্যার গৃহে ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন। প্রাতে শ্রীমতী মণিকা দেবী ও সন্ধ্যায় ভাই অখিলচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। প্রাতে নবদেবালয়ে ভাই প্রিয়নাথ মল্লিকও এই উপলক্ষে বিশেষভাবে উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে জোষ্ঠ পুত্র প্রচারভাণ্ডারে ৫, মধ্যম পুত্র চুঁচুঁড়া ব্রহ্মমন্দিরে ৪, জোষ্ঠা কন্যা পুরী নববিধানপ্রতিষ্ঠানে ৫ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৭ই অক্টোবর, কলুটোলার কৃষ্ণভবনে, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের স্বর্গীয়া কন্যা সুরমা সেনের স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনার কার্য করেন। শ্রীমতী বেলা সেন সঙ্গীত করেন এবং নবসংহিতার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন।

গত ৮ই অক্টোবর, ১১৬ সীতারান বোম্বের ষ্ট্রীটে ডাঃ উপেন্দ্রনাথ সরকারের গৃহে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ সরকারের স্বর্গারোহণের প্রথম সাম্বৎসরিক উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন। জোষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দিননাথ সরকার স্বরচিত সম্মোপযোগী সংগীত করেন। এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ২ টাকা দান করা হইয়াছে।

কোচবিহারসংবাদ—মহারাজা শ্রীমূপেন্দ্রনারায়ণের স্বর্গারোহণদিনের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতে ভাই প্রিয়নাথ গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, কোচবিহারে আগমন করেন। সহকারী সম্পাদক ভ্রাতা কেদারনাথের "করণাকুণ্ডল" গৃহে কয়দিন অবস্থান করেন। প্রাতে উপাসনান্তে ১৬ই প্রধানকার প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের সতিত দেখাত্তনা করিয়া সদালাপ করেন। ভ্রাতা মনোমথধন দেব পরিবার সঙ্গেও প্রার্থিনাদি করেন। পরদিন ১৭ই প্রাতে, কেশবপ্রসন্ন কয়েকটা বন্ধুসহ উপাসনা করেন ও সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা করেন। পরলোকসাপন বিষয়ে আত্মনিবেদন ও প্রার্থনাদি হয়। মন্দিরে কুমারী কোচিহুর মধুর সঙ্গীত করেন। ১৮ই শ্রীমূপেন্দ্রনারায়ণের সমাধিসমুপে প্রাতে ৮০০টার সময় সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান দ্ব্যস্তীতভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষেও কুমারী কোচিহুর সঙ্গীত করেন। গায়কও হুৎকাটি গান করেন। অপরাত্ন ৫টার সময়, মহারাজার মন্দির-মুন্দির পশ্চাতে, কাউন্সিল হলের বারান্দায় স্মৃতিসভা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত উমচরণ দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভাই প্রিয়নাথ উদ্বোধনহুতক প্রার্থনা করিলে, একটি বুবা স্বরচিত শ্রীমূপেন্দ্র-স্মৃতি আবৃত্তি করেন। ভাই প্রিয়নাথ শ্রীমূপেন্দ্রসমাগম সম্বন্ধে অভিভাষণ পাঠ করেন। খানডাবাড়ীর

রাজপুরোহিতবংশীয় একজন উকীল মহারাজার মনঃগুণাবলীর গুণানুভূতি বিশদরূপে বিবৃত করিলে, সভাপতি মহাশয় হৃন্দরভাবে মহারাজার মহাবীর বিষয় বলিয়া, পূর্ববর্তী বক্তাদিগকে ধন্যবাদ দেন। পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কাজীলাল মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভা ভঙ্গ হয়। ডাঃ লাটু বাবু প্রমুখ কীর্তনকারিদল সমাধিমণ্ডপে সমবেত হইয়া অনেকক্ষণ ভক্তি-উন্নতভাবে সংকীর্ণন করেন। কীর্তনের পর ভাই শ্রিয়নাথ প্রার্থনা করেন। শেষে হরির লুট হয়। ১২শে প্রাতে করুণাকুটীরে সকলকে লইয়া ভাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও একটি রাজগণপরিবারে প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে মণ্ডলীর উপাসকদিগের সভা হয়। মিঃ চন্দ মহাশয় সভাপতির কার্য করেন। এখানে কাণ্ডিনীক্সাহক সভা থাকার আবশ্যকতা ও মন্দিরের উপাসনার ব্যবস্থাদি বিষয়ে আলোচনাদি হয়। এই দিনই সন্ধ্যার গাড়ীতে ভাই শ্রিয়নাথ কলিকাতা পুনর্গাতা করেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে কেশবপ্রমহুকুটীরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ সুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

১লা অক্টোবর, ব্রহ্মমন্দিরে, শ্রীমতী কুমুদিনী দাস উপাসনা করেন, মহিলায়া সভাও করেন। ৩রা অক্টোবর, সন্ধ্যায়, কেশবপ্রমহুকুটীরে শায়দীর উৎসব উপলক্ষে কেদারবাবুই উপাসনাদি করেন।

## প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

ত্রীকেশবকাহিনী—শ্রীমতিলাল দাশ প্রণীত। ৩২৩ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। মূল্য ১১০ টাকা। মঙ্গলকুটীর, বিধানপল্লী, রমণা, ঢাকা—গ্রন্থকারের নিকট এবং ৮৯, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—নব-বিধান পাবলিকেশন কমিটির সেক্রেটারীর নিকট প্রাপ্য।

ভাস্করগণ মূর্য, দাক্ষয় অথবা ধাতুময় পাত্রে এবং মূর্তিতে মনোহর বিচিত্র রঙ্গ কলাইয়া, সেই পাত্র বা মূর্তিকে অতি হৃন্দর বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, লোকের মন আকর্ষণ করেন। কবিগণ আপনাদের মনের আদর্শকে নানা কল্পনার সাহায্যে সজ্জিত করিয়া, হৃন্দর কবিত্বময় মৌল্যে ও মাধুর্য্যে পাঠকের চিত্তকে আকর্ষণ করেন। যাঁহারা ভক্ত, বিশ্বাসী, সাধু, মহাজনদিগের জীবন চিত্রিত করিয়া লোক-সমাজের নিকট ধরিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের কার্য যেমন উচ্চ ও স্বর্গীয়, তেমনই কঠিন। তাঁহারা তো সাধু ভক্ত মহাজনদিগের জীবন পৃথিবীর ভাস্করোচিত কোন বাহুর দ্বারা কবিকনোচিত কোন কল্পনার তুলিতে চিত্রিত করিতে পারেন না। ভক্তি শ্রদ্ধার তুলিতে, নিখুঁত সত্যের রঙ্গ, তাঁহাদিগকে ভক্ত বিশ্বাসীদিগের জীবন চিত্রিত করিতে হয়; একটু কল্পনা অপত্যের ছিটা ফোটা তাঁহাদের উপর পড়িলে, সকলই তদাকার হইয়া যায়। কেননা, ভক্ত মহাজনদিগের জীবন নিখুঁত বর্ণের উপাদানে গঠিত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন, “আমি যার হাতে গঠিত।” “Every inch

of my life is tremendously real.” তিনি বিশ্বাসী সাধকের জীবন-সম্পর্কে বলিলেন, বেদ বেদান্ত অপেক্ষা সাধকের জীবন বড়। সাধকের জীবনই শ্রেষ্ঠ বেদ। এই নবযুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেমন সাধকের জীবন ও নিজের জীবনের মূল্য বুঝিয়াছেন, এমন আর কেহ বুঝিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ জীবনকে সেই জীবনের নানা কাহিনী দ্বারা চিত্রিত করিয়া, সত্যের রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া, সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করা যেমন সোভাগ্যের ব্যাপার, তেমনই বড় কঠিন কর্তব্য। আমাদের শ্রদ্ধের বহু শ্রীযুক্ত মতিলাল দাশ মহাশয় সেই কঠিন কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবন পঞ্চাবংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া, তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী দ্বারা সেই জীবনবেদ হৃন্দররূপে ব্যাখ্যা ও বর্ণনা করিয়া, “ত্রীকেশবকাহিনী” গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যুগশ্রেষ্ঠিত সাধু মহাজনদিগের জীবন চিরদিনই লোকের নিকট বড় রহস্যময়, প্রেহেলিকাময়। বিশেষ ভাবে ভক্ত ব্রহ্মানন্দের জীবন—সংসারের বাহ্যসাজে সজ্জিত, অথচ উচ্চ বৈরাগ্যের জীবন—কর্ম-কোলাহলে, কর্ম-বাস্তবতার পূর্ণ, অথচ সমাধিমগ্ন—যোগ, ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞানের সমন্বয়ে বিচিত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ জীবন। স্বপ্নের ও বিপ্লবের বাণী এই, কেশবচন্দ্রের ধর্ম ও জীবন ধরিতে ও বুঝিতে বহু যুগ কাটিয়া যাইবে। তাঁহার ধর্ম ও জীবন ভবিষ্যতের সামগ্রী। এই বিরাট অদ্ভুত নিকলঙ্ক জীবনের উপর, বুঝিয়া না বুঝিয়া, অনেকেই ধূলী কাঁদা নিক্ষেপ করিয়াছেন। কথিত আছে, সোণার গোয়ালের হৃন্দর সঙ্গে বাহিরের ধূলী কাঁদা নিক্ষেপ হইছিল; ত্রীকেশবের নিকলঙ্ক সোণার জীবনের উপর নিন্দা অপমানের ধূলী কাঁদা নিক্ষেপ হইবে, ইহা অসম্ভব নয়। সেই নিক্ষেপ ধূলী কাঁদা প্রকাশন করিয়া, ত্রীকেশবজীবনের বিবিধ সাধনসম্পদকে সহজ কথায়, সহজ কাহিনী-যোগে উজ্জলরূপে সকলের মানস চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্যই “ত্রীকেশবকাহিনী”-প্রণয়নে বিশেষ পাচেষ্টা। মতিবাবু সে বিষয়ে যে বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রণীত “ত্রীকেশবকাহিনী” তাঁহার প্রশংসা দিবে। কেশবচন্দ্র শুধু বঙ্গভারতের সম্পদ নয়, কেশবচন্দ্র পৃথিবীর সম্পদ। কেশবচন্দ্রের অগাধ অমূল্য আধ্যাত্মিক জীবন, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি পৃথিবীর সকল ধর্ম-বলদ্বীরই অতি আদরের সামগ্রী। তাই আশা করি, সর্ব-শ্রেণীর ধর্মার্থী সাধকদিগের নিকট, বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের ও নববিধানমণ্ডলীর পরিবারে পরিবারে, ধর্মপিপাসু ব্যাকুলাজ্ঞা সাধক সাধিকার নিকট, এ গ্রন্থ সাধনপথে বিশেষ সহায় বলিয়া আদৃত হইবে এবং ইহা পাঠে ধর্মের অতি গভীর ও অমূল্য অনেক গুঢ়ত্ব সহজে সকলের প্রাণে প্রতিভাত হইবে।

ত্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

Edited on behalf of the Apostolic Durbes New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyapath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, “নববিধান প্রেসে”  
ত্রিপুরিতোষ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

অবিশালমিতং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ সূনির্মলস্তোত্রং সত্যং শাস্ত্রমনন্তরম্॥  
যিখাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
বার্ধনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে॥

৬৮ ভাগ।

২০শ সংখ্যা।

১৬ই কার্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

2nd. November, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা।

স্বর্গরাজ, পরম দেবতা! পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমে মানুষের রাজ্য দেখিলাম, পশু পক্ষীর রাজ্য দেখিলাম, তৎপর পৃথিবীর রাজার রাজ্যও দেখিলাম। এখন তোমার নবযুগধর্মের প্রভাবে এবং তোমার কৃপার বিশেষ আলোকে, এই ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের শোভা-সৌন্দর্য্যাময় এক অপূর্ব দৃশ্য আমাদের অন্তরে প্রতিভাত হইতেছে। উর্দ্ধে অদেহী লোকেও তোমার স্বর্গরাজ্যে, নিম্নে দেহধারী সাধু সজ্জনদের জীবনেও তোমার স্বর্গরাজ্য। উর্দ্ধ লোকেই বা স্বর্গরাজ্যের সীমা কোথায়? ইহলোকেই বা স্বর্গরাজ্যের সীমা কোথায়? উভয় লোকের সকলই তো! আমাদের সম্বল ও সম্পদ। ইহলোকে, দূরে নিকটে, স্বদেশে বিদেশে, যে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মজীবনে ধর্মের যে কোন সম্পদ রহিয়াছে—যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম, বিশ্বাস, বাধ্যতা, শ্রদ্ধা, প্রীতি, নিষ্ঠা—সে সকলই আমাদের সম্বল ও সম্পদ। আমাদের জানিত সাধু ভক্ত আর করুজন? স্বদেশের, বিদেশের অজানিত সাধু, ভক্ত,

সজ্জন যে কত রহিয়াছেন। আকাশের নক্ষত্ররাজি যেমন কেহ গণনা করিয়া শেষ করিতে পারে না, অজানিত সাধু, ভক্ত, সজ্জনদিগের জীবনও তেমনি গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। জানিত সাধু সজ্জনদিগের সঙ্গে যেমন অকাটা ভাবে জীবনের সম্বন্ধ, অজানিত সাধু সজ্জনদিগের সঙ্গে তেমনই অকাটা অচ্ছেদ্য ভাবে জীবনের সম্বন্ধ, ইহাতো পূর্বে ভাবিতেও পারি নাই। এখন অনিবার্য ভাবে, জীবন্ত স্বর্গীয় সম্বন্ধের আকারে, মানস চক্ষে, জানিত অজানিত ছোট বড় সকলের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক ও অখণ্ড যোগ প্রতিভাত হইতেছে। আমরা তো ভাবিয়া চিন্তিয়া, জানিত অজানিত সকল সাধু সজ্জনের জীবনকে, অখণ্ড ভাবে প্রত্যক্ষ গ্রহণ করিতে, সম্ভোগের বিষয় করিতে পারি নাই। সবই হইতেছে তোমার কৃপাতে, তোমার শিক্ষাতে। তুমি যদি নিজ কৃপাগুণে, তোমার নববিধানের বিশেষ আলোকে, আমাদের অন্তরে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, এই ধরাধামে জানিত অজানিত সকল সাধু সজ্জনের আত্মিক জীবন লইয়া এক অখণ্ড স্বর্গরাজ্যের দৃশ্য দেখাইলে এবং সম্ভোগ করিতে দিলে, তবে আশীর্বাদ কী! এ ধারণা, এ সাধনা, এ সম্ভোগ ক্রমে যেন আমাদের মধ্যে আরও উজ্জ্বল হয়, জীবন্ত হয়। তোমার কৃপার

দান অনেক পাই, অনেক হারাইয়া ফেলি। এ দান, এ সম্পদ যেন না হারাই।

শান্তি: !

শান্তি: !!

শান্তি: !!!

— — —

## সার্বভৌমিক ধর্মের সাম্রাজ্য ।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজকে জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকলের জ্ঞান, জগতের একমাত্র স্রষ্টা, পাতা, গতিমুক্তিদাতা ঈশ্বরের পূজার স্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সার্বভৌমিক, মহা সম্মিলনের ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যথাসময়ে নব ধর্ম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মোপাসনাকে জীবনের সমগ্র শক্তি ও সাধনা দ্বারা জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। এই ব্রহ্মোপাসনা সম্পর্কে তিনি কত আশার কথা শুনাইলেন, এবং এই ধর্মের সার্বভৌমিক ভাব সম্পর্কে তাঁহার ভাবে বিশেষ ব্যাখ্যা রাখিয়া গেলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আসিলেন। তিনি ধর্মের সার্বভৌমিকতাকে বিশেষ রূপেই বাড়াইলেন এবং তাঁহার কত বৈশিষ্ট্য দান করিয়া বিশেষ রূপেই তাহা দেশ বিদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ক্রমে স্বদেশ ও বিদেশের সমগ্র মানবসমাজ এই সার্বভৌমিক ধর্মকে গ্রহণের জ্ঞান ধীরে ধীরে অগ্রসর হইবে, সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত ভাবে, জীবনে জীবনে গ্রহণ করিয়া ধর্মের সার্বভৌমিকতার সাক্ষ্যদান করিবে, ইহাই তো এই প্রেরিত মহাপুরুষদিগের জীবনের প্রাণগত চেষ্ঠা ও ভবিষ্যতের জ্ঞান আশার বাণী।

ধর্ম যদি ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্তি গ্রহণ করিতে অগ্রসর না হইল, ধর্ম যদি ক্রমে সকল মানুষের জীবনভূমিকে অধিকার করিয়া আপনার সার্বভৌমিকতার লক্ষণ মানুষের আচার ও আচরণে না দেখাইতে পারিল, তাহা হইলে জগতেরই বা আশা কোথায়, আর সাধু ভক্ত মহাজনদিগেরই বা জীবনের সাফল্য কোথায়? প্রত্যেক মহাপুরুষ জীবনের রক্ত দিয়া, ছোট বড় সকলের জীবনে স্বর্গের ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণ-পাত করিলেন। মহাপুরুষ শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, যে পর্যন্ত পৃথিবীর একটি লোকও নির্বাণের ধর্ম হইতে বঞ্চিত থাকে, সে পর্যন্ত আমি স্বর্গপ্রাপ্তি ইচ্ছা করি না। মহা-

পুরুষদিগের জীবনের বাণীতে ঈশ্বরেরই বাণী। সে বাণী তো কখন বার্থ হইবার নয়। সময়ে সে বাণী জয়-যুক্ত হইবেই হইবে। ইহকাল ও পরকাল ঈশ্বরের নিকট একই কাল। ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া মানব-জ্ঞান ক্রমোন্নতির ফলে এ বাণীর সাফল্য হইবেই হইবে।

পৃথিবীতে ছোট বড় সকলের জীবনে যাতে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যের সমাগম হয়, তজ্জন্মই প্রেরিত সাধু মহাজনদিগের পৃথিবীতে আগমন। ধর্মের পরিপন্থী যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা দূর করিয়া দিয়া ধর্মের পথকে সুগম করিয়া দেওয়াই সাধু সজ্জনদিগের কার্য্যের বিশেষ লক্ষ্য। নবযুগে যেমন সার্বভৌমিক ধর্মের বিকাশ, প্রতিষ্ঠা ও প্রচার বিশেষ ভাবে হইয়াছে ও হইতেছে, তেমনি ধর্মপথের পরিপন্থিরূপে কত কিছু নূতন নূতন আকারে প্রবলবেগে লোকের মনকে আক্রমণ ও অধিকার করিতেছে। স্কুল কলেজের ধর্মহীন শিক্ষা এই পরিপন্থী মধ্যে প্রধান একটা। বর্তমান শিক্ষার ভিতরে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, জড়বাদ, অভ্যুত্থানবাদ, দুঃখের বাদ, নাস্তিকবাদ শিক্ষারত স্কুল কলেজের যুবক যুবতীদিগের মনকে বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। ইহার উপর বর্তমান বাহ্য চাকচাক্যপূর্ণ সভ্যতার প্রভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চ শিক্ষিত এবং গভর্নমেন্টের কার্য্যক্ষেত্রে কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যুগত বয়সে ধর্মের বিশেষ আশ্বাদন প্রাপ্ত হইয়া এবং মূল্য বুঝিয়া আপনার প্রাণের কথা সহজ ভাবে, কোন বন্ধুকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপে বলিয়াছিলেন, “বর্তমান সময়ে কলিকাতার মত বড় বড় সহরে যাহারা পড়াশুনা উপলক্ষে স্কুল কলেজে গমনাগমন করে, তাহারা রাস্তায় দেখিতে পায়, বড় বড় জুড়িগাড়ী হাকাইয়া বাবুরা কোর্টে যাইতেছেন; তাঁহারা কেহ হাইকোর্টের জজ, কেহ ব্যারিস্টার, কেহ উকীল, এটর্নী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। পণের ধারে অনেক বড় বড় বাড়ী সেই শ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তিরই। এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহারাও সময়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কিসে বড় বাড়ী, বড় গাড়ীর অধিকারী হইতে পারে।” শিক্ষার্থীদের এইরূপ মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, বর্তমানের শিক্ষিত শ্রেণী যেন বড় বাড়ী, বড় গাড়ী এবং পৃথিবীর অজ্ঞান ধন সম্পদের অধিকারী হইলেন; কিন্তু তাহাতে তাহাদের

হইল কি? অর্থাৎ এত ‘হৃদনের খেলা, হৃদনের মেলা, হৃদনে কুরায়ে যায়।’ তাঁহাদের স্থায়ী সম্পদ লাভ কি হইল? ধর্ম-সম্পদ ভিন্ন কি ইহকালে পরকালে জীবনের স্থায়ী সম্বল, স্থায়ী সুখ শান্তির সামগ্রী কিছু আছে? পৃথিবীর ধন সম্পদের পশ্চাতে যে কেবল উৎকর্ষ, কেবল ভাবনা অশান্তি ও দুঃখ কষ্ট।” এই বিশিষ্ট ব্যক্তির নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনার মধ্যে আমরা বর্তমান সময়ের অধিকাংশ শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক অবস্থার একটা চিত্র প্রতিকলিত দেখিতে পাই। ধর্মের পথে বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার মধ্যে কত প্রতিকূল অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, গভীর ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিবার বিষয়। এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ বাণী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

“যে ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা বিষয়রস ভোগ, বাক্য দ্বারা সেই রস চর্বিবতচর্বিণ এবং মনেতেও বিষয়রস চিন্তন ব্যতীত ক্ষণকালের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কোন বিষয়ের অনুশীলন করে না, যে ব্যক্তি দিবানিশির মধ্যে একবার ভ্রমেও ঈশ্বরের তত্ত্বরসের আলাপ করে না, তাঁহার মহিমা চিন্তনপূর্বক তাঁহাতে একবার মনোনিবেশ করেনা এবং বাক্যেতে একবার তাঁহার গুণকীর্তন করে না, সে ব্যক্তি কি প্রকারে অনুপম ঈশ্বরতত্ত্বের পরিচয় পাইবে এবং কি রূপেই তাঁহার প্রেমামৃত পানে প্রবৃত্ত হইবে। মনুষ্যের এইরূপ প্রকৃতি যে, যে বিষয় সর্বদা অনুশীলন করা যায়, তাহাই অধিক আয়ত্ত হয় এবং যাহা নিত্য নিত্য অভ্যাস করা হয়, তাহাতেই বিশেষ অধিকার জন্মে। আমরা বালক কাল হইতে যে রূপ বিষয়-জ্ঞানের উপদেশ পাই, বিষয় লইয়া অনুশীলন করি এবং বিষয়-রসের চিন্তা করি, যদি তদনুসারে জগদীশ্বরের অপূর্ব তত্ত্বের জ্ঞান প্রাপ্ত হই এবং তাঁহার তত্ত্বানুশীলন করা অভ্যাস করি, তাহা হইলে বিলক্ষণ দেখিতে পাই যে, তাঁহার সেই সুখাতুলা অসামান্য প্রীতি-রসের নিকট সামান্য বিষয় সম্পদ কিছু মাত্র বোধ হয় না। তাঁহার প্রেমামৃতপান-জনিত অপূর্ব সুখের নিকট বিষয়-ভোগ-জনিত সুখ সুখ বলিয়াই গণ্য হয় না এবং তাঁহার সেই পূর্ণ স্বরূপের নিকট এ জগৎ পদার্থ বলিয়াই অনুভূত হয় না। এই বিষয়ে যদি কাহারও সংশয় থাকে, তবে তিনি

পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এখনই প্রমাণ পাইবেন। তিনি প্রতিদিন যথানিয়মে জগদীশ্বরের তত্ত্বরস আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত পরিচয় লাভ করুন, প্রতাহ নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি দয়া প্রীতি প্রভৃতি অনির্বচনীয় মহিমা সকল চিন্তা করিয়া তাঁহাতে চিন্তা সম্মি-বিস্ট করুন এবং প্রতিক্রমে হৃদয়ধামে সেই সর্বসাক্ষী সনাতন পুরুষকে বর্তমান রূপে প্রত্যক্ষ করুন; তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়স্থিত প্রেমধারা আপনা হইতে উথিত হইয়া সেই অনন্ত গীতির সাগর জগদীশ্বরে প্রবাহিত হইবে এবং তাঁহার মন সেই অনুপম প্রেমরসের আশ্বাদ পাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহাই ভোগ করিতে ব্যস্ত হইবে, সংসারের সকল সুখই তাঁহার নিকট সামান্যবৎ প্রতীয়মান হইবে এবং পার্থিব সকল সম্পদ তাঁহার নিকট অগ্রাহ্য হইয়া উঠিবে।”

শ্রীমদ্ব্যহি দেবের উপরি উক্তি পাঠের সঙ্গে আমরা প্রাচীন ঋষিযুগের শিক্ষা-প্রণালী স্মরণ করি; এবং প্রতি পরিবারের পুত্রকন্যাদিগকে শিক্ষাকালে তাহাদের স্বাধীনতার নামে অবস্থা-স্রোতে ভাসাইয়া না দিয়া, বাহিরের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কিসে তাহাদের মধ্যে ধর্মশিক্ষা বিস্তার হয়, কিসে তাহাদের হৃদয় মন ধর্মালোকে আলোকিত হইতে পারে, প্রাণগত যত্নে তাহার উপায় করি। তাহা হইলে সার্বভৌমিক ধর্মের সাম্রাজ্য ভবিষ্যৎ বংশের মধ্যে সহজে এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিদ্যালয়ের যথার্থ শিক্ষা তো ধর্ম-পথের অনুকূল ভিন্ন শতিকূল নয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আশার বাণী রাখিয়া গেলেন, “দেশে যত শিক্ষা বিস্তার হইবে, দেশের লোক যত শিক্ষিত হইবে, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম তাহাদিগকেই গৃহীত হইবে।”

## ধর্মতত্ত্ব।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার।

আত্মশক্তির অধীনতা স্বাধীনতা। আত্মশক্তির যথোচ্চ ব্যবহার স্বেচ্ছাচার। আত্মশক্তি ব্রহ্মশক্তি, আমার আমি যিনি তাঁর ক্ষেত্র, সেই ব্রহ্মশক্তির অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। আপন ইচ্ছামত তাহার অপব্যবহার করা স্বাধীনতা নয়, তাহা



স্বৈচ্ছাচার। স্বাধীনতার মানুষ সমুদ্রত চর, স্বৈচ্ছাচারে মানুষের অধঃপতন হয়। অতএব স্বাধীন হও, স্বৈচ্ছাচারী হইও না।

### আত্মহত্যা ও নরহত্যা।

জীবনদাতাই জীবনের অধীনেতা। যিনিই জীবন দিতে পারেন, তিনিই জীবন নিতেও পারেন। মানুষ জীবন দিতেও পারে না, জীবন লইতেও পারে না। তাই আত্মহত্যা, জীবনহত্যা সর্ব-ধর্মশাস্ত্রেই মতাপাপ বলিয়া নির্দিষ্ট। এ মতাপাপের প্রারম্ভিত পর্যন্ত নাই। হিন্দুশাস্ত্র তাই বলেন, নরবাতকের মুক্তি নাই। নববিধানের শিক্ষা আরো উচ্চ। যে ব্যক্তি ভাইকে না ভালবাসে বা কোন মানুষকে ঘেঁষ করে বা ঘৃণা করে, সেই নরহত্যা করে।

### রাজর্ষি রামমোহন, ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মানন্দ।

বিদ্যা বুদ্ধি, কৃত্ত্ব জ্ঞতিবলে সর্বধর্মশাস্ত্রসিদ্ধি মছন করিয়া রাজর্ষি রামমোহন সিদ্ধান্ত করিলেন, সর্বধর্মশাস্ত্র-বর্ণ্য এক ব্রহ্ম নিরঞ্জন, একমেবাবিতৌরম্। ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মানন্দ আত্মজ্ঞানে আত্মজীবনে ব্রহ্মপ্রেরণার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও দর্শন করিলেন, সর্বধর্মই সেই একেরই বিধান, একই সত্য সনাতনের ধর্ম। সকল ভক্তের, ঈশা, দৌরাস, বৃদ্ধ, মচ্ছদেরও একই ঈশ্বর। সেই একমেবাবিতৌরমের ধর্মও একমেবাবিতৌরম্। সকল সন্তানও একমেবাবিতৌরম্। তাই হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান একই পরিবার। ঈশ্বর কেবল এক নন, ঈশ্বর একই, ইহাই নববিধানের দর্শন।

### রাজর্ষি রামমোহনের বাণী।

“ওঁ তৎসং বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত-শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সকল বেদের প্রতিপাদ্য সঙ্গুল পরব্রহ্ম হইয়াছেন।... অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনো-নিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে, যদি রূপ-গুণবিশিষ্ট কোন দেবতা কিংবা মনুষ্য বেদান্তশাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন, তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচশত স্তোত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিংবা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিংবা রূপের বর্ণনা অবশ্য হইত; কিন্তু ঐ সকল স্তোত্রে ব্রহ্মবাচক শব্দ বিনা দেবতা কিংবা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চার লেশ নাই।”

“ব্রহ্মের স্বরূপ ক্ষেয় নহে, কিন্তু তাঁহার উপাসনা কালে তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা, পাতা, সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয়; তাঁহার কল্পনা কোন নখর নাম রূপে কিরূপ করা হইতে পারে—ঈশ্বর ইচ্ছার অগোচর, তাঁহার স্বরূপ চিত্তরূপে জানা যায়; জগতের নানাবিধ রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাঁহার কর্তৃত্ব নিরন্তর নিশ্চয় হইলে কৃতকার্য হইবার সম্ভব হয়।”

“আমাদিগের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে কৃতার্থ হই।”

“সর্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ আছে, অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন।”

“যেখানে চিত্ত স্থির হয়, সেই স্থানে আত্ম-পাসনা করিলে, তীর্থাদি স্থানের বিশেষ নাই।”

“ও সর্বব্যাপী পরমেশ্বর, তুমি আমাদিগকে ঘেঁষ মাংসখাদি মিথ্যাপবাদে প্রবৃত্ত করাইবেন।”

“ব্রাহ্মণ কে?—করতলস্থিত আমলকী ফলে যেমন নিশ্চয় হয়, তাঁহার ছায় পরমাত্মার সত্যতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া, শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাংসখাদি, দম্ব, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্ন-বান্বে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়; যেহেতু শাস্ত্রে কহে, ‘জন্মাপ্ত হইলে সর্বসাধারণ শূদ্র হয়। উপনয়নাদি সংস্কার হইলে বিজ্ঞ শব্দবাচ্য হন, বেদান্ত্যসদ্ব্যারি বিপ্র, আর ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন।’ অতএব ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই কেবল ব্রাহ্মণ, অস্ত্র নহে, ইহা নিশ্চয় হউল।”

“বাঁচা হতে এই সকল ভূতের জন্ম হয়, জন্মিয়া বাঁচার অধি-ষ্ঠানে স্থিতি করে এবং ত্রিধমাণ হইয়া বাঁচাতে পুনর্জন্ম করে, তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর।” “ব্রহ্ম একমাত্র বিতী-রহিত হন।” “নাম রূপ হইতে বিনি ভিন্ন হন, তিনি ব্রহ্ম, ইত্যাদি স্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম, বাঁচাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের নূনাদিকা দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, অর্থাৎ তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র হয়, এই সিদ্ধান্ত।”

### রাজর্ষি রামমোহনের আলেখ্য সম্বোধনে।

(নরবিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উক্তি অনুদিত)

কি মোহামূর্খি! কি জ্যোতিশ্চক্ষু! বর্তমান নববংশের সর্বজন-সমাদৃত জন্মদাতা, ভারতের গৌরব। তোমার পবিত্র স্থিতি দেশের সন্তুষ্টি হৃদয়ে হিরতরে খোদিত হউক। শতাব্দী হইল, তোমার ঈশ্বর-প্রেরিত উজ্জল মহত্ব-লভাবে নূতন চিন্তাধারা প্রবাহিত হইয়াছে। অজ্ঞান দেশবাসীর অস্ত্র এক নব ধর্ম উদ্ভাসিত হইয়াছে। হায়! তুমি কি অতুল সম্পদ তাঁহাদের অস্ত্র দিয়াছ, তাহা তাঁহারা এখনও জানিতে পারেন নাই। তোমার উপযুক্ত সম্মান তাই তাঁহারা দিতে পারেন নাই। কতই তোমার উচ্চ ভাব, কতই তোমার আত্মার মহানুভবতা, সমগ্র জগতের ছায় বিশাল এবং আকাশের ছায় উচ্চ মহৎ ভাব তুমি সকার করিয়াছ। কে সে ভাবের উচ্চতা এবং গভীরতার পরিমাণ করিতে পারে? জড়পূজা এবং কুসংসারে যে অগণ্য লোক

আজ্ঞার হইয়াছিল, মহাবলে তুমি তাহাদিগের নিকট এক ঈশ্বর-তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছ; এবং শুধু তাহাই নয়, মহানু প্রতীবাদ সম্বন্ধে তুমি তাহাদিগের জন্য এক ঈশ্বরপূজার মন্দির স্থাপন করিয়াছ। ইহা হইতে কি ফল ফলিতেছে ও ফলিবে, হে মহাপুরুষ, তাহা তুমি দেখিয়া যাও নাই। তুমি কেবল বীজ বপন করিয়াছ, আমরা এখন তাহার ফল ভোগ করিতেছি। তুমি কোনও মহান পরিবর্তন সম্পাদন যদিও কর নাই, কিন্তু তুমি অঙ্গল পরিষ্কার করিয়া প্রাচীন বেদান্তের পুনঃপ্রবর্তনা করিয়াছ; এবং কেবল তাহাতেই তৃপ্ত না হইয়া সংসারতন্ত্রের সহিত বিজ্ঞাতীয় ধর্মগ্রন্থ হইতেও সত্য সংগ্রহ করিয়া দেশবাসীদিগকে তাহার শিক্ষা অর্পণ করিয়াছ। অত্রান্ত নীতিবিধি শিক্ষা দিবার জন্য, ঈশ্বর নীতি শাস্তি প্রথের পথ প্রদর্শক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছ। হিন্দু জাতিকে ঋষ্টকে অর্পণ করা কি সামান্য বীরত্ব? কিন্তু তোমার অন্তর তাহাতে কম্পিত হয় নাই। ভারত-সংস্কারের সেই উষাকালে প্রাচীন আধ্যাত্ম্যের একেশ্বরবাদের সহিত খৃষ্টীয় ধর্মের উচ্চ জীবন এবং পবিত্রতার সমন্বয় সাধন তোমারই পূজার চিন্তার প্রবর্তনা। বিশ্বাস এবং চরিত্র, মত এবং ধর্মজীবন, উপাসনা এবং বিবেকের সমশ্রোত তোমার সময় হইতেই ভারতের শিক্ষিতসমাজে প্রবাহিত হইয়াছে। ধন্য ধন্য হও, হে ভারতের পরম উপকারী বন্ধু। ঈশ্বর-প্রেরিত শিক্ষা-গুরু, তোমারই পদপ্রান্তে বসিয়া আমরা সমন্বয়তত্ত্ব এবং সাধন শিক্ষা করি। এখনও তোমার রসনা হইতে অগভীর ভাবে যে জড়বাদের প্রতিবাদ সমুচিত হইতেছে, তাহা সমগ্রদেশে ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হউক। তোমার স্বদেশ-প্রেম এবং দেশ-হিতৈষণী ভারতের সহস্র সহস্র যুবকদিগকে সজীবিত করুক। নব্য ভারত তোমার উদার ধর্মসন্থার গ্রহণ করিয়া, জড়বাদ এবং কুসংস্কার পরিহার করুক এবং ঋষ্টকে সম্মান করিয়া তাঁহার উচ্চ নীতি অবলম্বনে সক্ষম হউক। তোমার মহৎ জীবনের জ্ঞান-পিপাসা, নির্ভীকতা এবং ধর্মোৎসাহ আমাদের চরিত্রে যেন সঞ্চারিত হয়। হে স্বদেশ-প্রেমিক, জাতির উপকারী বন্ধু, ভারতের উজ্জল জ্যোতিঃ, তোমার একেশ্বরের নব তত্ত্ব আমাদিগকে শিক্ষা দাও। আমাদের শিক্ষা-গুরু ও ধর্মনেতা, তোমার জ্যোতির্ময় আত্মা স্বর্গের আনন্দলোকে, জ্যোতির্ময় লোকে নিত্য নীরবাবস্থিত হউক, ইহাই সন্তোষ ভারতের প্রাণের প্রার্থনা।

—০—

## ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন রায়।

(স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক উৎসব-সভায় পুরী “ক্লার্ক হল” তাই

প্রিয়নাথ মল্লিকের প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন।)

হে অধিতীয় পরমেশ্বর, আমাদের আত্মা ঋষিদিগের নিকট তুমি এক অধিতীয় পরমাত্মারূপে প্রকট হইয়াছিলে; কিন্তু তাঁদের পরবর্তীরা তোমাকে এক ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেও,

হায়, তোমাকে কতরূপে, কত সূর্তিতে কল্পনা করিয়া, কত মতে, কত পথে, কত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। অল্পকৈ ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াও, কেন “বার রাজপুত্রের ভের হাঁড়ি” হইল? এইরূপে কতই পরস্পরকে পর পর দূর দূর মনে করিয়া, ধর্মের নামেও বিবাদ বিসম্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাই দেখিয়া তুমি তোমার সন্তান রামমোহনকে প্রেরণ করিয়া, সেই প্রাচীন বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য এক অধিতীয় ঈশ্বর যে তুমি, তোমার উপাসনা করিতে শিখাইলে। তোমার অতিপ্রায় এই যে, আমরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া এক ধর্ম লাভ করিব। এক ধর্ম বিনা কেমনে আমরা এক পরিবার, এক অভিন্ন জাতি হইব? এক জগৎপ্রাণের মহাপ্রসাদ জানিয়া এক অন্ন আহার না করিলে, কেমন করিয়া একান্তবর্তী পরিবার হইব? আশীর্বাদ কর, সেই রাজর্ষি ধর্মপিতামহের অনুসরণে, এক ঈশ্বর বলিয়া কেবল নয়, তোমাকে একই পিতামাতা জানিয়া, একেই পূজা করিয়া, আবার এক অখণ্ড জাতি হই এবং তোমার যুগধর্মবিধান নববিধান পূর্ণ করি। তাহা হইলেই তোমার প্রেরিত ধর্মপিতামহ রাজর্ষির প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাবান হইয়া আমরা ভারতবাসী সকলে ধন্ত হইব।

“যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানং অধর্মস্য তদাভ্যুত্থানং সৃজামাহং ॥

পরিজাগার সাধুনাং বিনাশার চ চক্ৰতাং।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সন্তুভামি যুগে যুগে ॥”

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎগীতায় যাহা বলিয়াছিলেন, সেই ভাবেই বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি সংশোধনপূর্বক নব যুগধর্মের বীজবপনার্থেই আমাদের ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন ঈশ্বর-প্রেরিত।

আজ শতবর্ষ পূর্ণ হইল, তিনি সুদূর সাগরপারস্থ ব্রিষ্টল নগরে তিরোধান করেন। তাহারই শতবার্ষিকী উপলক্ষে, সেই দিবা আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজলি দিবার জন্তই আমরা এখানে সমবেত। তাঁহার জীবনকাহিনী যদিও অনেকেরই জানা আছে, সংক্ষেপে তাহা আজ স্মরণ করাইয়া দিলাম, বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমারও জন্মস্থান হুগলি জেলায়। এই জিলার থানাকুল কৃকনগরের নিকট রাধানগর গ্রামে, ২২শে মে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, মহাত্মা রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায়। দেশীয় প্রথা অনুসারে গ্রাম্য পাঠশালার রামমোহন অতি অল্প বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। তাঁর পিতা পারস্য ভাষা শিখিবার জন্ত শৈশবেই তাঁহাকে পাটনায় পাঠাইয়া দেন। তাঁর বয়স যখন ১৮বৎসর, তাঁর মধ্যে তিন বার বিবাহ হয়। তিনি অল্পমাসেই পাটনায় গিয়া পরশী ও আরবী ভাষায় এমনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, আরবী ভাষার ইউক্লিড ও আরিষ্টটলের গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে সক্ষম হন। ইহা হইতেই তাঁহার প্রচলিত

হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা চলিয়া যায় এবং ১৬ বৎসর বয়সে পৌরাসিক হিন্দু ধর্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তিনি প্রতিপাদন করেন যে, বৈদিক আশ্রয় ধর্মই যথার্থ হিন্দু ধর্ম। বাস্তবিক হিন্দুনাশ ও সিদ্ধান্তের এশারস্থ ব্যক্তি-দিগের প্রতি মুসলমানধর্মাবলম্বীদিগের বিজ্ঞপাতক আখ্যা মাত্র।

বাহা হউক, তাঁহার পিতা তাঁহার উপর উতাক্ত হওয়াতে, রামমোহন গৃহভাগ করিয়া চলিয়া যান। কি অদম্য তাঁহার ধর্মোৎসাহ! সেই ১৬ বৎসর বয়সেই তিনি পদব্রজে তিব্বত দেশে গমন করিলেন এবং প্রায় ৩ বৎসর কাল তথায় থাকিয়া তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। সেখানেও লামাদিগের পৌত্তলিক আচরণ দেখিয়া তাহারও প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তাহাতে তাঁহার জীবন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে এবং কোনও প্রকারে তথাকার মহিলাগণের সাহায্যে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। কাশীতে আসিয়া বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত হন। যখন তাঁর বয়স প্রায় ২০ বৎসর, তাঁর পিতা তাঁহার প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া ঘরে আসিতে দেন। এই বয়সে জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য, তিনি প্রথম ইংরাজী ভাষা শিখিতে অনুরাগী হন। তাঁহার ধর্মমত তখনও যেমন তেমনিই থাকতে, তিনি পুনরায় পিতার বিরাগভাজন হন। তিনি এই সময় ইষ্টহাওয়া কোম্পানীর অধীনে কাজ লন ও পরে রঙ্গপুরে গিয়া কলেজের আপিসে দেওয়ানী কার্য গ্রহণ করেন। শেষে রংপুরের অন্তর্গত এক জমীদারের নাবালকদিগের রক্ষকরূপেও কাজ করেন।

১৮০৩খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর প্রায় ৪১বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় গিয়া, নানা শাস্ত্রগ্রন্থ অনুশীলন করিয়া, পণ্ডিতগণের সহিত ধর্মবিষয়ে বিচারে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই সময়ে পাঁচখানি উপনিষদ মূল ভাষার সহিত মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন এবং পরে বেদান্তসূত্রেরও বাঙ্গালা অর্থ প্রকাশিত করেন। ইহাতে হিন্দুসমাজে বহু আন্দোলন উপস্থিত হয়। পণ্ডিতগণ কেহ কেহ তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া, তাঁহার মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী নামে এক ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে তাঁহার মত বিচারে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু রামমোহনের গভীর গবেষণাপূর্ণ এবং বিচারসঙ্গত সূক্তির নিকট তিনি পরাস্ত হন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দি ও ইংরাজিতে রামমোহন সেই পণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। শঙ্কর শাস্ত্রী নামক জৈনক মাল্লাজী পণ্ডিতকেও এমনি ভাবে পরাস্ত করেন। কয়েকখানি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াও তিনি প্রকাশ করেন। খৃষ্টানমিশনারিগণের সহিতও তাঁহার যথেষ্ট বাদানুবাদ হয়। হিব্রু ও গ্রীকভাষায় তিনি বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, খৃষ্টীয় ত্রিনীতিবাদের যথাযথ প্রতিবাদ করেন এবং এডাম নামক একজন ত্রিনীতিবাদীকে জাপন মতে আনিতে সক্ষম হন। এই সময়ে তিনি খৃষ্টের নীতি

শাস্তি এবং সুখ লাভের সহায় বলিয়া খৃষ্টের উক্তি সকল সংগ্রহ-পূর্বক একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন।

মুসলমান ধর্মেরও কুসংস্কারের ও মুসলমানধর্মাবলম্বীগণের জোর করিয়া মুসলমান করার ভয়ানক প্রতিবাদ করেন এবং তাঁর সংশোধনের জন্য পারস্য ভাষায় “তহতোল মহকীন” নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। তাণ্ডাতে লিখিয়াছেন, “আমি হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানাদি নানা সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও ধর্ম-শাস্ত্রের গুঢ় আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় এবং তিনিই উপাস্য। এই মূল মতে সকলেরই ঐক্য আছে, কেবল অবান্তর বিষয় লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ।”

আমাদের ধর্মপিভামহ এই ভাবে সর্বধর্মসম্প্রদায়ের অবান্তর বিষয়ে যে বিবাদ, ইহা নিষ্পন্ন করিয়া, সর্বশাস্ত্রের সার মর্ম যে এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তাহাই শিক্ষাদান করিতে বিশেষ ভাবে আসিয়াছিলেন। তাই তিনি বহু বাক্যবাদের উৎসাহে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য প্রথমে “আত্মীয় সভা” নামে একটি সভা গঠন করেন। “হরকরা” নামক সংবাদপত্রের সংগ্রহ একটি গৃহে এডাম সাহেব ধর্মবিষয়ে উপদেশ দান করিতেন, বহু-গণের সহিত রামমোহন সেই উপদেশ শুনিতে বাইতেন। তাঁহার বহুগণ এক দিন দুঃখ করিয়া বলিলেন, “ধর্মোপদেশলাভের জন্য বিদেশীয়ে পরণাপন্ন হওয়া কি নীচতা নয়?” ইহা শুনিয়া মণিকতলাহ কমল বসুর বাটিতে রামমোহন একটি উপাসনা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এক বৎসর মাত্র উপাসনার পর, ১৮৩০খৃঃ জ্যৈষ্ঠমাসে বা ১৭৫১শকের ১১ই মাঘ, চিৎপুর রোডহু আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেখানে বেদ-নিহিত উপাসনা প্রবর্তন করেন।

এই গৃহের Trust Deedএ, তাঁহার উচ্চ উদ্যম মত অতি বিশদরূপে তিনি বিবৃত করেন। ইহার মর্ম এই, “সকল শ্রেণীর এবং সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, যার ধর্মমত যাহা হউক না কেন, এখানে সকলেই জাতিধর্মনির্ভিনেবে, সেই অনন্ত অন্তের অসীম পরব্রহ্ম, যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা এবং পাতা, তাঁহার উপাসনা করিবেন। এখানে কোন মূর্তি বা ছাঁচ বা অঙ্কিত কোনও পদার্থের পূজা অর্চনা হইবে না। এখানে কোনও প্রকার জীবহত্যা হইবে না এবং এখানে জীবন-রক্ষার প্রয়োজন বাস্তব কোনও প্রকার পান ভোজন করিতে কেহ পারিবেন না। এখানে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন উপদেশাদি কেহ দিবেন না। কিংবা কোনও মূর্তি বা ব্যক্তির পূজা অর্চনা যদি কোনও সম্প্রদায়ের কেহ করেন বা করিবেন, তাঁহাদেরও বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ এখানে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এখানে যেমন সেই সর্বভূতেন্দ্রের ধ্যান, চিন্তা, উপাসনা হইবে, তেমনি পুণ্য প্রেম দয়া দাক্ষিণ্যাদিরও সকল প্রকার অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইবে এবং সর্ববিষয়ে সকল সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব যাহাতে সংস্থাপিত হয়, তাহারই জন্য সর্বাঙ্গতঃ করণে চেষ্টা করা হইবে।

এই সার্কজনীন এক আদিতীয় পরমেশ্বরের পূজার বিধি ইতিপূর্বে কখনও এভাবে প্রবর্তিত হয় নাই। মহাত্মা রামমোহনের মহাপ্রাণে স্বয়ং বিধাতাই এই নবালোক সঞ্চার করিয়া, তাঁহাকে বর্তমান যুগধর্মবিধানের প্রথম বীজরূপে উদ্ভূত করিয়াছিলেন। এই উদার উচ্চ সার্কজনীন ধর্মবিধানের ভিত্তিতে উপাসনা তখনও কার্য্যতঃ সাধনের সময় হয় নাই বলিয়াই হোক, কিংবা যে কারণেই হোক, রাজা রামমোহন এখানে যে উপাসনার ব্যবস্থা করেন, তাহা বেদোক্ত গায়ত্রীর মন্ত্রসাধন। একটা প্রকোষ্ঠে যদিও বেদপাঠের ব্যবস্থা হয়, কিন্তু সেখানে কেবল ব্রাহ্মণেরা প্রবেশ করিতে পারিতেন; অপর সাধারণের জন্ত অন্য প্রকোষ্ঠে ধর্মসঙ্গীত এবং ধর্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইত। তিনি যদিও নিয়ম করেন, হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান সকলই সম্প্রদায়ের লোকেই এখানে একত্রে এক স্রষ্টার উপাসনা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ই ব্যক্তিগণ বাহ্যতে বেদ-প্রতিপাদ্য একেশ্বরের উপাসনা সাধন ও শিক্ষা করিতে সমর্থ হন, তাহারই ব্যবস্থা তিনি করিলেন। বীজ কখনও একেবারে বৃক্ষে পরিণত হয় না। তাই বিধাতা তাঁহাকে দিয়া যাচা করাইবার করাইলেন; পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্বারাই সেট বীজে জলসিক্ত এবং পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দিয়া তাহা ফল ফুলে শোভিত উদ্যানে পরিণত করাইলেন।

রামমোহন যেমন এই বর্তমান যুগধর্মের স্থপাত করিলেন, তেমনি সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার, বাঙ্গলা ভাষার গল্পরচনা ইত্যাদি তাহারই মহা ঐশীশক্তির কার্য্য।

সত্যদাহ প্রথার ভীষণ দৃশ্য তিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় এতই ব্যথিত হইল যে, তিনি সে প্রথা-নিবারণের জন্ত মহাবীরের ছায়া খুঁজা উত্তোলন করিলেন। হিন্দু শাস্ত্র হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রথার অধোক্তিকতা দেখাইয়া শুধু পুস্তক রচনা করিলেন তাহা নয়, তখনকার মহা-সুভব গভর্ণর স্যার উইলিয়ম বেটিক্লেকে প্রোৎসাহিত করিয়া তাঁহা দ্বারা আইনামুল্যে এই কুপ্রথা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইংরাজীশিক্ষা-বিস্তারের জন্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের সাহায্যে বিদ্যালয় স্থাপন করাইলেন এবং আপনিও নিজ তত্ত্বাবধানে একটা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তখনকার ইংরাজ মিশনারীদেরও সংস্কার ছিল, ইংরাজী লেখাপড়া শিখিলে দেশীয় সরলমতি ব্যক্তিরা ইংরাজনাট্যিকদের মত মদ খাওয়াইয়া এবং ঠকাইয়া কেবল পরসী রোজকার করিবে এবং ক্রমে পাশ্চাত্য শঠতা শিক্ষা করিবে। ইহা নিতান্ত অগৌরব হইলেও, মহাত্মা রামমোহনের জ্ঞান-গরিমা-প্রভাবেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে এবং তাহা হইতেই যে বর্তমান নবজাগরণের অভ্যুদয়, কে না তাহা স্বীকার করিবেন?

বাঙ্গলা ভাষার গদ্য-রচনার প্রবর্তনাও রামমোহনের দ্বারাই

হয়। তিনি একজন্ম স্বয়ং একখানি বাকরণ লিখিয়া বাঙ্গলার গদ্য লেখার প্রণালী শিক্ষাদান করেন। ইতিপূর্বে পদ্য-রচনারই চণন অধিক ছিল।

এদেশের রাজাশাসন-বিষয়ক উন্নতি বিধান-সম্বন্ধেও তৎকালীন রাজকর্মচারিগণ শ্রীরামমোহনেরই সূচিপ্তিত পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বিলাতস্থ রাজপুরুষগণকেও রাজাশাসনবিষয়ে সংপরামর্শ দিবার জন্ত এবং দিল্লীর বাদসাহের মাসহারা বৃদ্ধির জন্ত চেষ্টা করিতে তিনি বিলাতযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হন।

দিল্লীর বাদসাহই তাঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া তাঁহার প্রতি-নিধিরূপে রাজদরবারে পাঠাইতে চান। কিন্তু ইংরাজ প্রতি-নিধিগণ তাহাতে সম্মত হন নাই। তাই তিনি নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগত ভাবে ১৮৩১খৃঃ “এলবিরম” নামক সমুদ্রপথে তিনজন সহচর সহ ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ইহাই প্রথম বঙ্গদেশের সমুদ্রযাত্রা। সেখানে গিয়া তিনি ধনী মানী বিদ্যান ধার্মিক সকল শ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা সমাদৃত হন। রাজপুরুষগণও তাঁহার উদার সঙ্গাবহার ও মহত্ব মুগ্ধ হন। রাজপুরুষগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করেন ও তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন। কয়েক মাস ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি ফরাসী দেশে গমন করেন, সেখানেও যথেষ্ট সম্মানিত হন। ফ্রান্সে কয়েকমাস থাকিয়া তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে গিয়া ডেভিড হেয়ার সাহেবের ভ্রাতার আতিথ্য লইয়া ব্রিষ্টল নগরে গমন করেন। এখানে আসিয়া ২দিন পরেই জ্বর হয় এবং ১৮৩৩খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, দেহপূরবাস ত্যাগ করিয়া তিনি অমরধামে যাত্রা করেন। শেষ নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় নাকি রাজর্ষি ও শব্দ উচ্চারণ করিয়াছেন। এই ব্রিষ্টল নগরেই তাঁহার দেহাবশিষ্ট প্রোথিত হয়। এখানে আমাদের ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতৃদেব প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ও সাহায্যে এক মর্ম্মরসমাধি সার্কজনীন ভাষ্কর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বগাদেব যেনন পূর্ব্বাকাশে উদ্ভিত হইয়া, আপন প্রথর-কিরণ নর্ষদেশে বিতরণ করিয়া, পশ্চিমাকাশে অন্ত্যমত হন, আমাদের ধর্ম্মপিতামহও তিক যেন তেমনি এই পূর্ব্বদেশের ক্ষুদ্র পল্লীতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, সমগ্র দেশ এবং সমগ্র জগৎকে নবমতালোকে আলোকিত করিয়া, পূর্ব পশ্চিমকে যেন একই উদার প্রেমে আলিঙ্গন দান করতঃ, সেই পশ্চিম দেশে অন্ত্যমিত হইলেন।

আজ সেই দিন, বেদিন রামমোহনের দিব্য আত্মা তিরোধান করিয়াছেন। একশত বৎসর হইল তাঁহার দিব্য দেহ তিরোহিত; কিন্তু তাঁহার দিব্য আত্মা, অমর আত্মা অমৃতলোকে চিরজীবিত। পতিত ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্ত, অজ্ঞান অন্ধকাবাক্ষর আমাদের দেশবাসীদিগের মধ্যে প্রাচীন বেদ বেদান্তের ধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্তনের জন্ত, তিনি যথার্থই ব্রহ্মপ্রেরিত। ভারতে যুগ-যুগান্তে কতই ধর্ম্মাবতার মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বর্তমান কলিযুগে যে পরিতাজ্ঞা নর, তাহারই প্রমাণ—মহাত্মা রামমোহনের

আবির্ভাব ও তিরোভাব। এসলাম ধর্মাবলম্বীদিগের সহিত তর্ক-যুদ্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, “মহম্মদ কেবল শেষ পরগণার নন, আরও দেশ দেশান্ত্রে, যুগ যুগান্তে অনেক পরগণার আসিবেন।” শ্রীরাম-মোহনও যে সেই শ্রেণীরই একজন, আমরা যুক্তকণ্ঠে আজ দাবী করি। খৃষ্টিয় যুগে যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা করিতেন, “যত্নে বিশ্ব-মিৎস্র ভগবানো ভগবান দূরতঃ। তত্ত্ব আবর্তনামসৌচ ক্রমায় জীবসে।” আমরাও তেমনি আজ শ্রীরামমোহনের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি, “তোমার যে আত্মা এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাবস্থান করিতেছি, তাহা আমাদের মধ্যে বাস করুক এবং জীবিত থাকুক।” মানবজাতির ঐক্যবন্ধনের প্রকৃত উপায়—একাত্মের উপাসনার একধর্মসাধনে একাত্মবর্তী পরিবাররূপে নিবদ্ধ হওয়া। শ্রীরামমোহন তাহারই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহারই অনুসরণে যেন আমরা কৃত সংকল্প হই।

( ২ )

( চট্টগ্রামে, ২৭শে সেপ্টেম্বর, স্মৃতি-সভায়, শ্রীমান্ স্মৃত্ত চৌধুরী কর্তৃক নিবেদিত )

বিগত ১৮৩৩খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন ব্রিটেন সফরে দেহরক্ষা করেন। আজ ১৯৩৩ সনের ২৭শে সেপ্টেম্বর। এই একশত বৎসর ব্যবৎ স্মরণার্থী পুস্তকে, ঐতিহাসে, জীবনচরিতে এবং অন্যান্য সদৃশ্যে তাঁহার স্মৃতি যে সমস্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, আমার পূর্ববর্ত্তিগণের অনুকরণে তাহার পুনরাবৃত্তির পুনরুত্থান করিয়া আমি আপনাদের বৈধা-চ্যুতি করিব না। আমি নূতন কথা কহিব। রামমোহন রায়কে আমি একজন intellectual superman এবং father of Indian Renaissance (ভারতীয় নবযুগের জন্মদাতা) জানে প্রজ্ঞা করি। দীর্ঘকালব্যাপী তত্ত্বসাধন রথায়ুগের পর, জ্ঞানের নবরশ্মি ভারতে তিনিই প্রথম প্রজ্জ্বলিত করেন; চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইতালিতে pagan renaissance-এর প্রতিষ্ঠাতাদের ভায়, প্রোচা ও পলীচোর বাগা একান্ত উত্তম, তাহা সন্মিলিত করিয়া ভারতের সর্বত্র তিনি নব ভাবধারার প্রবাহ প্রেরণ করেন। এবং তাঁহারই প্রোচক কার্য পূণতর রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, এ যুগের তিনজন প্রতিভাবান্ কবীর, আমি বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং কবি রবীন্দ্রনাথ।

আর্য্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শঙ্করাচার্য্য, ভাস্কর প্রভৃতি মনযৌদের দেহাবসানের পর, সুদীর্ঘ পঞ্চশতাব্দিক বর্ষব্যাপী পতীর তমিস্রা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কবীর, দাদু, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ অশ্রুজ্বলিত দিক দিয়া (emotionalism) অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন বটে, কিন্তু অমূল্য-মার্গে (intellectualism) তাহাদের সাধনার কোনও পরিচয় আমরা পাই না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্বকথিত

পণ্ডিতাগ্রগণাদের মানসিক উত্তরাধিকারী রামমোহন প্রতিভার বৈকল্পিকরূপে দেখা দিলেন। তাঁহাকে মস্তদ্রষ্টা ঋষি, সাধু বা religious fanatic মনে করিবার কোনই কারণ নাই, তিনি কর্মবীর এবং মতামানব। ধর্মপ্রবর্ত্তক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাহার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিতেছি, আজ মহাষ্টমীর সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সহরস্থ বাহার হাজার অধিবাসীর মধ্যে নানাবিধ বারো ভাজার নরনারী দেবী প্রতিমাকে প্রণাম করিতে বাহির হইয়াছে; কিন্তু বাহার জন ব্যক্তিও রাজা রামমোহনের স্মৃতি-তর্পণ-সভায় উপস্থিত নাই।

রামমোহনের চরিত্রের আর যে দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা তাঁহার iconoclasm। Iconoclast অর্থ আমি, destroyer of all idols of social, moral and religious fictions (সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভ্রান্ত মতের সংহারক) বলিতে চাহি। বিচারবুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাটলেন, মানুষ দেবতা নহে, শাস্ত্র অশ্রুত নহে এবং শুদ্ধ দেব-মন্দির স্বর্গ নহে। এত বড় iconoclastকে দেবতা জানে অর্জুন করিলে নিতান্তই অস্তর করা হইবে। তাঁহার স্মৃতি প্রচারিত জীবনচরিতগত উপকথা (biographical fictions) সমূহ খণ্ডন করার সময় আসিয়াছে। আখিন মাসের “বঙ্গজীতে” প্রকাশিত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেননাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের “রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন” শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার চরিত্রগত অনেক তর্কালতার কথাই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইতে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, রাজা রামমোহন তপস্বী ছিলেন না, ছিলেন দোষে গুণে মানুষ; বরঞ্চ এই সমস্ত ব্যাপারেও তাঁহার বহুমুখী প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মপ্রচারকাণ্ডে তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্যও ছিল না এবং প্রথম লক্ষ্যও ছিল না।

অপরদিকে, গত সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় ইতিহাসে তাঁহার জ্ঞান মনযৌ, উদ্যমপরায়ণ কর্মবীরের পরিচয় অতি কমই পাওয়া যায়। তাঁহার জ্ঞানের প্রাচুর্য্য ও বুদ্ধির প্রখরতার সম্মুখে ভারতীয়গণ সন্মিলিত ভাবে চিরকাল শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে। তাঁহার ব্যক্তিকে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে, এমন মনুষ্য বিরল। তিনি সম্প্রদায়-বিশেষের সংকীর্ণ গভীতে আবদ্ধ religious reformer নহেন, তিনি সমগ্র ভারতের গৌরব intellectual giant। তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি, তাঁহার ধার্মিকতার জ্ঞান নহে, জ্ঞানাত্মীলনের ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভার জ্ঞান।



## পূর্ববাক্সলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ।

( ত্রিপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব )

পূর্ববাক্সলা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এ বৎসর একটি জমাট সাম্বৎসরিক মহোৎসব সম্ভোগ করিয়াছেন। কলিকাতা এবং ময়মনসিংহ হইতে সমবিখ্যাতী শ্রদ্ধাঙ্গীকৃত বহুগণ আসিয়া উৎসবানন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ৩১শে আগষ্ট, বৃহস্পতিবার, সাংকালে আরম্ভাণীটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে আরতি ও উদ্বোধন-মুচক উপাসনা হয়। তাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসনা করেন এবং “উৎসবানন্দ-ভোগের অধিকারী কে ?” এই বিষয়ে একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশটি অতি সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, নববিধানের ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর এবং জীবিতদিগের ঈশ্বর ; কেন না, তাঁহাতে বারা জীবিত, তাহারাই উৎসবের অধিকারী। অমৃততাপের গুরু মহাত্মা বোহন বলিলেন, “অমৃততাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটে”। মহর্ষি ঈশা বলেন, “বাহাদিগের অমৃততাপের কোন প্রয়োজন নাই, তাদৃশ নবনবভিজন পুণ্যাত্মা অপেক্ষা একজন পাপী অমৃততাপ করিলে স্বর্গে সেইরূপ আনন্দ হইবে।” অতএব বাঁহারা উৎসবানন্দ ভোগ করিবেন, তাঁহারা আপন আপন পাপ ক্ষরণ করিয়া উৎসবের জন্ত অমৃতপু-জদ্বয়ে প্রস্তুত হউন। যদি কেহ বলে, আমাতে পাপ নাই, নিশ্চয় তাহাতে সত্য নাই। নববিধানের ঈশ্বর বলেন, “আমি সহজে মিলিত হই পাপীর সনে, যদি ডাকে সে একবার আমার কাতর-প্রার্থনায় অহঙ্কারী পাপী বারা, আমার দেখা পায় না তারা, দীনজনের বন্ধ আমি সকলে জানে ( ভগ্নহৃদয়বাসী আমি সকলে জানে )।” নববিধান পবিত্র আত্মার বিধান, স্তুত্যাং পাপবোধ এখানে প্রবল। আমরা প্রবল পাপবোধ লইয়া, অমৃতপুজদ্বয়ে উৎসবের জন্ত প্রস্তুত হই।

১লা সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সাংকালে মালাকার টোলার উপা-সনা হয়। উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধের ভাই হুর্গানাথ রায় সম্পন্ন করেন। উপদেশে “রিপুসংহার বিনা ভক্তিলভের সম্ভাবনা নাই” এইরূপ ভাবে আলোচনা হয়।

২রা সেপ্টেম্বর, শনিবার, সাংকালে মগবাজারে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য শ্রদ্ধের ভাই চন্দ্রমোহন দাস সম্পন্ন করেন।

৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার, সাংকালে আরম্ভাণীটোলাস্থ ব্রহ্ম-মন্দিরে সাপ্তাহিক সামাজিক উপাসনা শ্রদ্ধের ভাই চন্দ্রমোহন দাস সম্পন্ন করেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, সোমবার, সাংকালে দিগ্বাজারে স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা শ্রদ্ধের ভাই চন্দ্রমোহন দাস করেন।

৫ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, সাংকালে, নিমতলী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার দাস এম,এ, মহাশয়ের গৃহে উপাসনা তাই মহিমচন্দ্র

সেন করেন এবং উপদেশে ঈশ্বরের পরিচয় সঘণ্টে একটি সুন্দর কথা বলেন। মনুসংহিতাতে আছে—“হে ভদ্র, আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, এরূপ মনে করিবে না ; কেন না, পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নিত্যকাল তোমার হৃদয়ে স্থিতি করিতেছেন”। এই যে পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ নিত্যকাল হৃদয়ে আছেন এবং অন্তর্য্যামীরূপে সকল জানিতেছেন, ইহার সঙ্গে যে পরিচয়, ইহাই অন্তরে ব্রহ্মপরিচয়।

৬ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, বিশেষ কারণে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনে সাংকালে উপাসনা হওয়ার ব্যাঘাত হওয়াতে দেবালয়ে উপাসনা হয় ; উপাসনার কার্য্য রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পন্ন করেন।

৭ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সাংকালে, ফরাসগঞ্জে স্বর্গীয় আনন্দমোহন দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস সম্পন্ন করেন।

৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সাংকালে আরম্ভাণীটোলা ব্রহ্ম-মন্দিরে বক্তৃতা হয়, বক্তৃতার বিষয় ছিল, “পূর্ববাক্সলা দাস-মণ্ডলী।” এবং বক্তা ছিলেন—শ্রদ্ধের ভাই হুর্গানাথ রায়, শ্রদ্ধের ভাই চন্দ্রমোহন দাস এবং বাবু রাজকুমার দাস।

৯ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, আরম্ভাণীটোলা ব্রহ্মমন্দিরে সং-কীর্তনে উপাসনা। ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জমাট কীর্তন দ্বারা ব্রহ্মবরূপ সকল শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়া উৎসবানন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ভক্তি-পিপাসু নরনারীর দ্বারা মন্দির এবং তাহার পার্শ্বস্থ প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ হইয়াছিল।

১০ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, মন্দিরে পূর্বাঙ্কে ৭০০টার কীর্তন আরম্ভ হইয়া ৯টাতে উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধের ভাই হুর্গানাথ রায় উপাসনা করেন। সাধারণ প্রার্থনার পর সঙ্গীতান্তে রায় বাহাদুর ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপদেশ পাঠ করেন। এবং বেদী হইতে প্রার্থনার পর সঙ্গীতান্তে উপাসনা শেষ হয়। ১২টার সময় সাধুসেবা হয়। তৎপর ৩টার কার্য্য আরম্ভ হইলে, শ্রদ্ধের ভ্রাতা বৈদ্যানাথ রায় মধ্যাহ্নিক উপাসনা সম্পন্ন করেন। অতঃপর পাঠ ও আলোচনা এবং প্রার্থনাদির পর জমাট কীর্তন হইয়া সাং-কালের উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাসনা শ্রদ্ধের ভাই শ্রিয়নাথ মল্লিক সম্পন্ন করেন এবং ঈশ্বরের সহিত ও ভাইভগ্নীর সহিত প্রেমের মিলনেই যে স্বর্গরাজ্যের ব্যাপার সম্পন্ন হয়, তৎসম্বন্ধে প্রাতঃকালীন পঠিত উপদেশের সহিত যোগ রাখিয়া, আমাদের শ্রদ্ধের ভাই অতি উপদেশ একটি উপদেশ প্রদান করেন।

১১ই সেপ্টেম্বর, সোমবার সাংকালে মন্দিরে সংকীর্তন হয়।

১২ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, সাংকালে আরম্ভাণীটোলাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা হয়। শ্রদ্ধের ভাই শ্রিয়নাথ মল্লিক “নব-বিধানের বিকাশ” বিষয়ে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিষয়টি বিবৃত

করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বক্তৃতা-প্রবণে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বক্তৃতার সারাংশ শ্রদ্ধেয় শ্রিয়বাবু লিখিয়া ধর্মতত্ত্বে প্রকাশ করিলে, পাঠকগণ দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর, বুধবার, সমাজ ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন। পূর্বাঙ্কে ব্রহ্মমন্দিরে শ্রদ্ধেয় ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। সায়ংকালে শ্রদ্ধেয় ভাই চন্দ্রমোহন দাস উপাসনা করেন। বেদী হইতে কোন উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। ভাই মহিমচন্দ্র সেন উপাসকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে একটি প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার সার ছিল, “সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধন।” এই সরল প্রার্থনাই বাহ্যে সকলে গ্রহণ করেন, ইহাই তিনি ভক্তিবিগলিতচিত্তে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সায়ংকালে উপাসকমণ্ডলীর সাধারণ সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত সারদাপ্রসন্ন সেন সম্পাদক কর্তৃক প্রেরিত সমাজের বার্ষিক কার্যবিবরণ পাঠ করেন এবং আর বারের হিসাব উপস্থিত করেন। কিঞ্চিৎ আলোচনার পর উহা সভা কর্তৃক গৃহীত হইলে, নববর্ষের জন্ত সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং কার্যানির্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হন। যথা :—

বাবু অমিনাশচন্দ্র সেন সম্পাদক, বাবু রমেশচন্দ্র সমাদার সহকারী সম্পাদক। এবং সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক লইয়া বাবু রাজকুমার দাস, বাবু পুণ্ড্রনাথ মজুমদার, বাবু নির্মলচন্দ্র নন্দী, ডাঃ বাবু উমাপ্রসন্ন ঘোষ এবং শ্রীযুক্তা কুমুদকুমারী রায় কার্যানির্বাহক সভার সভ্য মনোনীত হয়।

১৫ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, সায়ংকালে সমাজের সাধারণ সভার উৎসব হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করেন এবং একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর, শনিবার, সায়ংকালে মন্দিরে যুবকদিগের সম্মিলন হয়। ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসন্ন ঘোষ উপাসনা করেন এবং সহজ ভাষায় একটি সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, রবিবার, পূর্বাঙ্কে ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাদিগের উৎসব। শ্রীযুক্তা ইন্দুমতি দাস উপাসনা করেন। অপরাহ্ন ৪টা বালকবালিকা-সম্মিলন হয়। সায়ংকালে কীর্তনান্তে শান্তিবাচনের উপাসনা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজকুমার দাস সম্পন্ন করেন। উপাসনার শেষভাগে একটি অমুঠান সম্পন্ন হয়। সাধারণ প্রার্থনার পর ভাই মহিমচন্দ্র সেন বেদীতে বসিয়া কার্য করেন। অমুঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এষ্ট, আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ডাঃ উমাপ্রসন্ন ঘোষ ভগবানের সন্তোষসাধনের জন্ত, বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপাসক উপাসিকাগণের এবং জগতের পবিত্র সন্ধিধানে, পবিত্র সেবাব্রত গ্রহণ করেন। তিনি প্রার্থনা করিয়া এই পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিলে পর, বেদী হইতে ব্রতপালনের উপযোগী

একটি উপদেশ প্রদত্ত হয়। উপদেশের সার নিম্নলিখিত সংগীতে সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। যথা :—

আলোরা—একতাল।

তুমি সেবক প্রধান। (ওহে) ছালোকে ভুলোকে, ইহ-পরলোকে, কে আছে তব সমান। (সেবক)

করেছ মায়েরে সেবিকা সংসারে, বয়ঃ অবতীর্ণ বাঁহার ভিতরে; কত যত্ন তাঁর সন্তানের তরে, অকাতরে দিয়ে প্রাণ।

অপরূপ তব সংসার-পালন, সেবাব্রত সবে করে উদ্‌ঘাপন; তব প্রেম ডোরে বাঁধা পরম্পরে, বিচিত্রতা বিধান। (কিবা)

তোমার প্রেরিত সাধু ভক্তজন, সেবাব্রত সবে পালে অম্লক্ষণ, তব সহবাসে তোমারি মতন, ত্যজি স্বার্থ অভিমান।

কবে হবে মম সেই শুভক্ষণ, সার্থক দেখিব মলিন জীবন, তোমারি অধীন তব দত্ত ধন, নাহি ভেদ বাবধান।

উৎসবের সময় বিধানপত্রীস্থ দেবালয়ে প্রতিদিন প্রাতঃকালে নামকীর্তন, সাধুদিগকে স্মরণ এবং প্রার্থনা হইয়াছে। মন্দির ব্যতীত অন্যান্য দিন দেবালয়ে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হইয়াছে।

শ্রীঅমিনাশচন্দ্র সেন, সম্পাদক.

## সংবাদ।

জন্মদিন—গত ১২ই সেপ্টেম্বর, পূর্বাঙ্কে বাঁচি নামকুন্ডে, শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ মজুমদারের গৃহে, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রী কল্যাণীয়া কুমারী আটলীন মীরার এবং ১২ই অক্টোবর, মৌরাবাদী পাহাড়ের সমুখবর্তী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাসের “উৎপল-ভবনে” প্রথমা পৌত্রী কল্যাণীয়া কুমারী চিত্রার শুভজন্মদিনে, পিতামহ উপাসনা করেন এবং পিতামহী বিশেষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যায়, ৬৫।১নং হারিশন রোডে, নগরীর অন্ততম কোঠা শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের বড়শাতিতম জন্মদিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। শ্রীনাথবাবু ব্যাকুলপ্রাণে পরিবারের সকলের জন্ত, বন্ধুবান্ধবদের জন্ত, বিশেষ ভাবে বিধানমুরলী পুত্রের জন্ত প্রার্থনা করেন।

শুশ্রীর্ষাদ—গত ২১শে অক্টোবর, ৬২ একডালিয়া রোডে, শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ গুপ্তের কোঠা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভার সহিত, স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্তীর পুত্র কল্যাণীর শ্রীমান্ প্রেমকুমার চক্রবর্তীর শুভবিবাহ-সংকল্প স্থির হইয়া আশীর্বাদমুঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁর পুত্রকন্যাকে আশীর্বাদ করুন এবং পবিত্র ব্রতের জন্ত প্রস্তুত করিয়া লউন।

সফলতা—আমরা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের দৌহিত্রী শ্রীমতী সুহাসি ঘোষ দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার কন্যাকে আশীর্বাদ করুন।

**পারলৌকিক**—বিগত ২২২ কাৰ্ত্তিক, ( ১৯শে অক্টোবৰ )  
বৃহস্পতিবার, কুল্‌টীতে পরলোকগত সাধক স্বর্গীয় অম্বকুলচন্দ্র  
রায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া নবসংহিতামতে সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত  
শ্রিয়নাথ মল্লিক আচাৰ্য্যের কাৰ্ধ্য করেন, শ্রীযুক্ত গেমসুন্দর  
বসু পাঠ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত ভাট  
অখিলচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত স্বপ্রকাশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত  
প্রভৃতি আগমন করেন, এবং শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সঙ্গীত  
করেন। ভাগলপুর হইতে মিসেস গেমসুন্দর বসুও আগমন  
করেন। আসানসোল হইতে সঙ্গীত ডাক্তার ললিতমোহন সেন  
এবং আত্মীয় স্বজন ও স্থানীয় বহু বান্ধব সকলেই উপস্থিত  
ছিলেন। নববিধানজননীর আনন্দোৎসবে শ্রদ্ধাক্রিয়া অতি সুচারু-  
রূপে এবং নিৰ্দ্ধিষ্টে সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধাবাসরে সাংক শ্রীযুক্ত অম্বকুল-  
চন্দ্র রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠিত হয়। তাহা বারান্তরে প্রকা-  
শিত হইবে। বিদেশস্থ বহু আত্মীয় স্বজন ও বহু বান্ধবগণ  
সহায়ভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্র দিয়াছিলেন। তদ্বাধ্যো রাঁচি হইতে  
শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার, ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত ভাট চন্দ্র-  
মোহন দাস, জলন্ধর হইতে ক্যাপ্টেন কৃপাসুন্দর বসু, ভাগলপুর  
হইতে শ্রীযুক্ত গেমসুন্দর বসু, কলিকাতা হইতে শ্রীমতী  
নির্ভরশ্রীয়া ঘোষ, রায়সাহেব বলরাম সেন, রায় বাহাদুর বিজয়-  
কৃষ্ণ বসু, শ্রীযুক্ত আগুতোষ মজুমদার, উকিল মোতিচন্দ্র  
ব্যানার্জি ও প্রফেসর দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখ-  
যোগ্য। এই উপলক্ষে যে সকল দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে,  
তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কলিকাতা নববিধান ব্রহ্মমন্দির ২০০, প্রচার আশ্রম ২০০,  
নববিধান পাবলিকেশন কমিটি ১০০, পুণ্যাশ্রম ৫০, ভগ্নিসমিতি  
৫০, আধ্যাত্মীসমাজ ৫০, নববিধান ট্রাষ্ট ৫০, কেশব একা-  
ডেমীর বাড়ী ২০০, উলটাডিলি কাণ্ডিচন্দ্র নিবাস ৫০, হরিপাল  
অনাথ আশ্রম ১০০, জীর্ণস্থিতিসংস্কার ফণ্ড ৪০, প্রমথলাল বিদ্যালয়  
৪০, ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয় ৪০, মুন্সের নববিধান মন্দির ৪০,  
মুন্সের প্রমথলাল আশ্রম ১০০, জামালপুর মন্দির ২০, ভাগলপুর  
মন্দির ১০০, কলিকাতা বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ১০০,  
গিধনী বিদ্যালয় ১০০, গাজীপুর ব্রহ্মমন্দির ২০, পাটনা ব্রহ্মমন্দির  
২০, হাজারিবাগ ব্রহ্মমন্দির ২০, সিমলা ব্রহ্মমন্দির ২০, লাহোর  
ব্রহ্মমন্দির ২০, গিরিধি ব্রহ্মমন্দির ২০, ঢাকা ব্রহ্মমন্দির ৫০, শিলং  
ব্রহ্মমন্দির ২০, অগ্রাশ্রম প্রতিষ্ঠানে ৩৬ টাকা। মোট ২২০০  
টাকা। এতদ্ব্যতীত ভূজিয়া ৩টা, কাঁপার গ্রাম ৩টা, আসন ৩খানি,  
গৈরিক ৬খানি, নতুন খান ৩খানি, নতুন ধূতি ১২জোড়া,  
বিনামা ৩জোড়া ও ৩টা ছাতা দান করা হইয়াছে।

**শতবার্ষিকী**—স্বর্গীয় ভাই দীননাথ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ  
পৌত্র, বি, এন, ডব্লিউ রেলওয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার  
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ মজুমদারের মো-জংসনস্থিত আবাসগৃহে  
শারদীয় পূজার ছুটিতে অনেক আত্মীয় স্বজন একত্রিত হইয়া-

ছিলেন। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, রাজা রানমোহন রায়ের শত-  
বার্ষিকী উপলক্ষে সকলে মিলিত হইয়া বিশেষ উপাসনার আয়ো-  
জন করেন। অধ্যাপক পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার উপাসনা ও  
রাজার জীবনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

**সেবা**—বাগনানের শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসু কটকে শ্রীযুক্ত  
রায়কৃষ্ণ রাওর গৃহে অবস্থান করিয়া, ওরা ভাদ্র হইতে ওরা  
আশ্বিন পর্য্যন্ত, প্রতিদিন দ্বাবে দ্বারে উষাকীর্ত্তন ও প্রার্থনা,  
তিন রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, ছয়টা পরিবারে উপাসনা ও  
প্রার্থনাদি দ্বারা ব্রহ্মনাম প্রচার করেন।

**সাবু প্রমথলাল লেকচার**—কলিকাতার ছাত্রবৃন্দের  
হিতার্থে, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে, গত  
১৬ই সেপ্টেম্বর, ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “সিদ্ধার্থের  
পরিচয়” বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন।

**শারদীয় উৎসব**—গত ৩রা অক্টোবর, শারদীয়া পূর্ণিমা  
দিন সন্ধ্যায়, পুরীর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ আই, এন,  
দে মহাশয়ের আবাসে শারদীয় উৎসব হয়। স্থানীয় অনেক  
গণ্যমান্য ভক্ত্যাক্তি এবং ভক্ত মহিলা যোগদান করেন। ভাই  
শ্রিয়নাথ উপাসনা ও পাঠাদি করেন। স্যার আর, এন, মুখো-  
পাধ্যায় মহাশয়ের স্কন্ধা শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী সঙ্গীত করেন।  
মুন্সেফ শ্রীযুক্ত ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বিশ্বাসও একটি সংগীত  
করেন। গত ২৬শে, ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর, পুরী  
নবপর্ণকুটীরে নবহুর্গোৎসবও সম্পন্ন হইয়াছে।

রাচিত, মোরাবাদী পাঠাডের পাদদেশে, হাওড়ার শ্রীযুক্ত  
বসন্তকুমার দাসের নতুন ভবনে, হুর্গোৎসবের ভাবে শারদীয়  
উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। বসন্তবাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সপরি-  
বারে তথায় গিয়াছিলেন। তদ্রূপে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার  
সপরিবারে তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন। গৌরীবাবুই উপাসনা  
করেন, মেয়েরা সংগীত ও আচাৰ্য্যদেবের শারদীয় উৎসবের  
প্রতিদিনের প্রার্থনা পাঠ করেন।

**ভ্রাতৃত্বিতীয়া**—ভ্রাতৃত্বিতীয়া উপলক্ষে, গত ২০শে অক্টো-  
বর কুল্‌টীতে রায় বাহাদুর ডাঃ অনুলচন্দ্র রায়ের ভবনে এবং  
২১শে বাকিপুরে ডাঃ পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভবনে ভাই  
শ্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। ২০শে প্রাতে ও সন্ধ্যায়  
রাঁচিতে মোরাবাদী পাঠাডের পাদদেশে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার  
দাসের গৃহেও এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার  
উপাসনা ও প্রার্থনাদি করেন।

**সাম্বৎসরিক**—দেবাদুন হইতে ডাঃ বিমলচন্দ্র ঘোষের  
ভগ্নী শ্রীমতী অমোদিনী ঘোষ লিখিয়াছেন—গত ১৬ই সেপ্টেম্বর  
পিতৃজন্মবার ও ভগ্নী পুণ্যপ্রভার এবং ১০ই সেপ্টেম্বর আদরের  
বোন সুহৃদ সাহসৎসরিক উপলক্ষে এখানে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত  
হেমন্তকুমারী চৌধুরী উপাসনা করেন। উভয় দিবসে পরম  
প্রিয়জনের স্মৃতিকল্পে কলিকাতা নববিধান প্রচার ভাণ্ডারে ২০০

লক্ষ্যে নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ১০ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর, প্রাতে কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ের, কুচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের সাধ্ব-সরিক উপলক্ষে, ডাঃ সত্যানন্দ রায় উপাসনা করেন; মাননীয় মহারাজা শ্রীমতী স্মৃতি দেবী প্রার্থনা করেন। র্যচিত্তে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও, মহারাজার পুণ্যস্থিতি স্মরণ করিয়া উপাসনাদি হইয়াছে।

গত ২৭শে ভাদ্র, মধ্যাহ্নে, ঢাকার হোসনীদালান রোডে, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায়ের গৃহে, তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী স্মৃতি বালার আস্থানে, অমরাগড়ীর ভ্রাতা হরলাল রায়ের ও তাই অখিলচন্দ্র রায়ের মাতৃদেবীর সাধ্বসরিকে, তাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন। তাই অখিলচন্দ্র উত্তর মাতার প্রতি প্রদীপন করিয়া প্রার্থনা করেন।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর, প্রাতে, ৬৫১১ হারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের শ্বশুরের সাধ্বসরিকে তাই অক্ষয়কুমার লখ উপা-লনা করেন। কস্তা শ্রীমতী বিরাজমোহিনী দত্ত প্রার্থনা করেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর, ৫৬বি বিডন স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত নিতোজ-প্রসাদ ঘোষের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় বরদাপ্রসাদ ঘোষের স্বর্গারোহণের সাধ্বসরিক দিনে তাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

গত ১৩ই আশ্বিন, প্রাতে, ৪২১২ হরিঘোষ স্ট্রীটে, স্বর্গীয় বিনোদবিহারী বসুর এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় অমরাগড়ী আশানভূমিতে স্বর্গীয় তাই ককির ঘাসের পিতৃদেব পুণ্যলোক সূর্য্যকুমার রায়ের সাধ্বসরিকে তাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

২রা অক্টোবর, ২৮নং রামকমল লেন লেনে, শ্রীযুক্ত অমৃত-লাল সেনের গৃহে, তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় নন্দলাল সেনের সাধ্ব-সরিকে শ্রীযুক্ত ঘামিনীকান্ত কোয়ার উপাসনা করেন।

গত ৪ঠা অক্টোবর, ১০১২ পটুয়াটোলা লেনে, শ্রীযুক্ত বিভূ-রঞ্জন দাসের গৃহে, তাঁহাদের কোষ্ঠভ্রাতা চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত মনো-রঞ্জন দাসের সহধর্মিণীর সাধ্বসরিক দিনে, কলিকাতার পুত্রগণের আগ্রহে তাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন।

গত ১৭ই অক্টোবর, দেউলটি গ্রামে ভ্রাতা সত্যচরণ সিংহের গৃহে, তাঁহার কামাতা গিরিধির স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের বিত্তীয় পুত্র স্বর্গীয় ভ্রাতৃলালের স্বর্গারোহণ দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা তাই শ্রিয়নাথ করেন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে একটাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১১ই অক্টোবর, বি. এন. রেলের দেউলটি গ্রামে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহের গৃহে, তাঁহার কস্তা ও স্বর্গীয় ভ্রাতৃলাল ঘোষের সহধর্মিণী শ্রীমতী প্রতিভা দেবীর

Edited on behalf of the Apostolic Duxber New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priy-nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, "নববিধান প্রেসে" প্রিন্টিং প্রেসে প্রস্তুত ও প্রকাশিত।

প্রথম সাধ্বসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। তাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন। সত্যচরণ বাবু, শ্রীমতী মাখনবালা বসু ও শ্রীযুক্ত পাণ্ডবচরণ সিংহ বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ করা হয় :—নববিধান প্রচার ভাণ্ডার ২০, নববিধান-শ্রীমন্দির ১০, প্রেমখলাল-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ২০, পুরী নববিধান-প্রতিষ্ঠান ১০, শ্রীজ্ঞানানন্দাশ্রম ১০।

গত ১২ই অক্টোবর, মঙ্গলবাড়ীতে, স্বর্গগত শ্রদ্ধের তাই রামচন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র, স্বর্গীয় জনকচন্দ্র সিংহের প্রথম সাধ্বসরিক দিন স্মরণে বিশেষ উপাসনা হয়। তাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন, তাই অক্ষয় কুমার লখ ও তাই গোপালচন্দ্র গুহ পাঠাদিতে সাহায্য করেন এবং তাই অখিলচন্দ্র ও তাই গোপালচন্দ্র বিশেষ প্রার্থনা করেন। সহধর্মিণী শ্রীমতী ইন্দুরেখা সিংহ এই উপলক্ষে প্রচার ভাণ্ডারে ৫ টাকা দান করেন।

গত ১১ই ও ১৬ই অক্টোবর, নববিধানসাধক স্বর্গীয় নৃত্য-গোপাল মিত্র ও তদীয় সহধর্মিণী স্বর্গীয় অন্নদামণি দেবীর সাধ্ব-সরিক দিবসোপলক্ষে কলিকাতার ২৮নং জুগীপাড়া লেনস্থ ডাক্তার অম্বকুলচন্দ্র মিত্রের বাসভবনে বিশেষ উপাসনা বধাক্রমে তাই অখিলচন্দ্র রায় ও তাই শ্রিয়নাথ মল্লিক সম্পন্ন করিয়াছেন। পিসিমাতা স্বর্গীয় কীরোদমোহিনী বসুর সাধ্বসরিক দিনে, গত ২৩শে অক্টোবর, ডাক্তার অম্বলাচন্দ্র মিত্রের বাসভবনে আর্য্য নগরীতে তাই শ্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন। তাই অখিলচন্দ্র রায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং উক্ত দিবসের প্রেমাপদ ভ্রাতা ডাক্তার অম্বকুলচন্দ্র মিত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং আর্য্যর সপরিবারে যোগ দিয়াছিলেন। এই সকল পার-লৌকিক অমুঠানে ৬ টাকা দান করা হইয়াছে।

ভাস্মা-স্থাপন—গত ২১শে সেপ্টেম্বর, প্রথম সাধ্বসরিকের পূর্বদিনে, সন্ধ্যায়, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রাচ্য-দেবের মধ্যমা কস্তা স্বর্গীয় সাবিত্রী দেবীর পবিত্র চিতাত্ম তাই শ্রিয়নাথ মল্লিক নবসংহিতার প্রার্থনা যোগে স্থাপন করিয়া, পরে বিশেষ প্রার্থনা করেন।

তীর্থভ্রমণ ও সেবা—কলিকাতার ভাদ্রোৎসবসাধনের পর, তাই শ্রিয়নাথ ৩০শে আগষ্ট, পুরী যাত্রা করিয়া কয়দিন তথায় অবস্থান করিয়া উপাসনা ও সেবা করেন; স্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত দেখান্তান করিয়া রাজর্ষি রামমোহনের স্বর্গ-ারোহণের শতবার্ষিকী সম্পাদনের আয়োজন করেন। এই সেপ্টেম্বর কলিকাতার প্রত্যাবর্তন করিয়া, নবদেবালয়ে দৈনিক উপাসনা করেন। ৭ই তাই অখিলচন্দ্রের সহযোগে সঙ্গীক ঢাকাভীর্থে যাত্রা করিয়া, তত্রত্য অগ্রজ ও কোষ্ঠদিগের সঙ্গে উৎসবানন্দ সন্তোষ করেন। একদিন শ্রীমতী হরিপ্রভা তাকেহার আশ্রয়ে তাঁহাদের সঙ্গে উপাসনাদি করেন। ভ্রাতা ডাঃ উমাপ্রসন্ন বাবু গৃহেও সংক্ষিপ্ত উপাসনা করেন, আরও দুই একটা বাড়ীতে গিয়া প্রার্থনাদি করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর ঢাকা হইতে ময়মনসিংহে ভক্তভ্রাতা স্বর্গীয় তাই দীননাথ কর্মকার ও তাই চন্দ্রমোহন দাস মহাপ্রসাদের সাধনভীর্থে গমন করিয়া, পরদিন তত্রত্য দেবালয়ে ভ্রাতা বৈদ্যনাথের পরিবারবর্গসহ উপাসনাদি করিয়া কৃতার্থ হন। সেখান হইতে কোচবিহার যাত্রা করেন।



# ধর্মতত্ত্ব

অবিশালবিন্দং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ সুনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনুশ্রয়ম্ ॥  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
স্বার্থনাশকং বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

২১শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

17th. November, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩

## প্রার্থনা।

হে জীবন্ত ঈশ্বর, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তুমিই নবযুগধর্ম-  
নববিধানে নবশিশু প্রসবিনী জননী। আমাদের আধ্যাত্ম-  
গণ উদ্বোধনে প্রতিপন্ন করিলেন, তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্।  
তাঁহাদের পরে বাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা “একো বহুধা”  
উপলব্ধি করিয়া, তোমার বিচিত্র প্রেমলীলাদর্শনে ভক্তি-  
প্রমত্ততায় প্রমত্ত হইলেন। কিন্তু পরে মানবীয় ভ্রম  
কুসংস্কার তাহাতে আরোপিত হইয়া, তোমাকে এক ঈশ্বর  
মানিয়াও বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইল। অল্প ব্রহ্ম বলিয়া  
স্বীকার করিয়াও, ধর্মভেদে কর্মভেদ, কর্মভেদে জাতি-  
ভেদ সৃষ্টি করিয়া, “বারো রাজপুত্রের তের হাড়ী” হইল।  
কেহ কাহারও অন্ন ছুঁইলেও জাতিচ্যুত হইতে হয়, এই  
ব্রাহ্ম সংস্কারের আবর্তে পড়িল। তাই আমাদের ধর্ম-  
পিতামহ রাজর্ষি রামমোহনকে তুমি পাঠাইলে। তিনি  
তোমারই প্রেরণায় বর্তমান যুগে ধর্মের এই ঘানি  
নিরাকরণার্থ বিদ্যা-শুদ্ধি-বলে সর্বধর্মশাস্ত্র মন্থন করিয়া  
প্রতিষ্ঠিত করিলেন, “সর্বধর্মশাস্ত্রই স্বীকার করেন, ঈশ্বর  
এক, এই মতে সবারই ঐক্য আছে, কেবল অবাস্তব  
বিষয়ে মতভেদ ও বিবাদ বিসম্বাদ।” এই বিবাদ-  
সীমাংসার জন্য তিনি “ব্রাহ্মসমাজ” প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং

আদিসমাজ গৃহ নির্মাণ করিয়া সার্বজনীন যুগধর্ম-  
বিধানের বীজ বপন করিলেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান,  
বার বাহা ধর্ম হউক, সকলকে জাতিনির্বিশেষে মিলিত  
হইয়া, এখানে এক ঈশ্বরের ভজনা করিতে অনুরোধ  
করিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তখন ইহা সাধনের সময় হয়  
নাই বলিয়া, ব্রাহ্মগণদের জন্য বেদপাঠ ও সাধারণের জন্য  
সঙ্গীত ও উপদেশের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার দ্বারা  
যাহা করাইবার তুমি তাহা করাইয়া, তাঁহাকে কোলে  
তুলিয়া লইলে। তাহার পর ধর্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্র-  
নাথকে দিয়া, ব্রাহ্মসমাজ গঠন ও ব্রাহ্মোপাসনা-পদ্ধতি  
প্রবর্তন করাইলে। ইঁহারা উভয়েই প্রাচীন হিন্দুর  
জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠন করি-  
লেন। পণ্ডে তুমিই পাঠাইলে ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবচন্দ্রকে  
এবং তোমারই প্রেরণায় মহর্ষিকে দিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্ম-  
সমাজের আচার্য্যপদে অভিষিক্ত করিলে; কিন্তু এই ব্রাহ্ম-  
সমাজ হিন্দুর সাম্প্রদায়িক গণ্ডিতে নিবদ্ধ হইতেছে দেখিয়া,  
তোমারই পবিত্র প্রেরণায় তিনি, ইহাই যে সর্বধর্মসম্মত  
নব যুগধর্মবিধান, ইহা উপলব্ধি করিয়া “নববিধান” বলিয়া  
ঘোষণা করিলেন। ধর্মপিতামহ যে বীজ বপন করেন এবং  
ধর্মপিতা মহর্ষি যাহাতে জলসিঞ্চন করেন, তাহাকে তিনি  
ফলফুলশোভিত পরিণত বৃক্ষরূপে, সর্বধর্মহিন্দুর সার্বজনীন



বিধান বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। ধর্মপিতামহ রাজর্ষি রামমোহন যাহা জ্ঞানমতে সিদ্ধান্ত করেন, জগজ্জন ভাই ব্রহ্মানন্দ তাহাই জীবনের সাধনে সপ্রমাণ করিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তুমি কেবল এক ঈশ্বর নও, সকলেরই তুমি একই পিতা, একই মাতা এবং তোমার মানবসন্তান সমুত্তি সকলেই ভাই ভগ্নী, এক পরিবার। তাই নববিধানের প্রধান উপাদান সার্বজনীন ভ্রাতৃ-প্রেম। এই উপাদানে তুমি নববিধানজীবন রচনা করিলে। তাই জগজ্জন-ভাই ব্রহ্মানন্দের শুভজন্মদিনে, আমরাও মার কোলে নবজন্মলাভে তাঁর সহিত ভ্রাতৃপ্রেমে সংবন্ধ হইয়া, তোমাকে সবারই একই পিতামাতা জানিয়া, পরস্পরকে ভাই বলে ভগ্নী বলে গ্রহণ করি, ভালবাসি ও জগতে এক অখণ্ড প্রেমপরিবার রচনা করিয়া নববিধানকে গৌরব-দ্রিত করি, তুমি এমন আশীর্বাদ কর।

শান্তিঃ !

শান্তিঃ !

শান্তিঃ !

## নব জন্মোৎসব।

নববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভ জন্মোৎসব সমাগত। ইং ১৮৩৮খৃষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর তিনি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হন। স্মৃতরাং আগামী ১৯শে নবেম্বর তাঁর পঞ্চনবতিতম জন্মদিন। এই দিন জগতে এক বিশেষ দিন। এইদিন নববিধানবিশ্বাসী ও নববিধান-বিশ্বাসিনীদিগেরও নবজন্মদিন।

কেন না, আমরা বিশ্বাস করি, যার জীবনে নববিধান মূর্তিমান হইয়াছে, আমরা তাঁহার সহিত একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তিনিও বলিলেন, “আমি ও আমার ভাই এক।” তাঁর শেষ জন্মদিনের প্রার্থনাতেও বলিলেন, “আজ ইহাদের জীবনের পরিবর্তনের দিন।”

এবারকার জন্মোৎসবে, তাঁর এই প্রার্থনার গভীর মর্ম্ম কি আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে ও সাধনযোগে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব না ?

জগজ্জন যে এক অখণ্ড মানব, ইহা প্রতিপন্ন করিতেই নববিধান অবতীর্ণ। স্মৃতরাং নববিধানমতে মানবের ভিন্নতা, স্বতন্ত্রতা “আমি” “আমি”, ভ্রান্তি-জনিত সংস্কার মাত্র। এ নববিধানে বিশ্বাসী হইয়াও যদি আমরা “আমি” “আমি” করিয়া অহংকৃত ও ব্যক্তিত্ব-পরি-তন্ত্র হই, আমরা এ বিধানের উপযুক্ত কেমনে হইব ?

অতএব এখনও আমাদের মধ্যে অহংকৃত ব্যক্তিত্ব-বশতঃ যে ভিন্নতা স্বতন্ত্রতা আছে, তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে পারিলেই আমাদের এই নবজন্মোৎসবসাধন সার্থক হয়।

আমরা অবশ্যই এক একজন এক এক অবস্থায় পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়াছি ; কিন্তু এখন যখন আমাদিগকে মা নব জন্ম দান করিবার জগৎ নববিধানে আনিয়াছেন এবং নববিধানের নবশিশুর সঙ্গে তাঁরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গরূপে মিলাইয়াছেন, তখন আমরা তাঁহার শুভ জন্মদিনে সকল ভাই ভগ্নী যেন একই বিধানজনীর আত্মা হইয়া একাত্মতা লাভ করি এবং তদ্বারা নববিধানের নবজন্ম লাভ করি।

এই জন্মোৎসবের পরেই ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহণের পঞ্চাশতম সাত্বৎসরিক দিন আসিতেছে। তাঁহার জন্মদিনে আমরা তাঁহার অনুসরণে যদি মার কোলে নববিধানের এক অখণ্ড মানবদেহ নবজন্ম লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার সহিত “সমযোগী সমভক্ত সম-বিশ্বাসী” সহোদর ভাই হইয়া সহ স্বর্গারোহণেও সক্ষম হইব।

এজন্য এই জন্মোৎসব হইতেই যেন আমরা বিশেষ সাধনে প্রবৃত্ত হই। পরিবারগত ও মণ্ডলীগত দৈনিক উপাসনা ও পাঠ প্রসঙ্গ এবং ভাবের আদান প্রদান দ্বারা তপস্যায় নিরত হই। নববিধানে “একাকী যাঁহলে পথে নাহি পরিত্রাণ” ; সেইজন্য এ সম্বন্ধে পারিবারিক ও মণ্ডলীগত ভাবে ব্রতগ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রত্যেক পরিবারে পরিবারেই যেমন নিজ নিজ গৃহে আমরা উপাসনা করিব, তেমনি মণ্ডলীস্থ সকলে যে যেখানে থাকি, একই সময়ে যদি উপাসনা করিবার নিয়ম করি এবং একই পাঠ প্রার্থনা অবলম্বনে যদি পাঠ প্রার্থনা করি, উপাসনা-সাধনে একাত্মতা লাভের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে।

আচার্য্যদেবের যে দিনের যে প্রার্থনা আছে, দৈনন্দিন উপাসনা কালে যে যেখানে থাকি, যদি সকলে এই সময়ে উপাসনা-যোগে একই দিনের একই প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া প্রার্থনা করি এবং একই পাঠ সকলে পড়ি, তাহা হইলে আত্মিক ঐক্য ও যোগ অনেক পরিমাণে সমাধান হইবার সম্ভাবনা।

“প্রকৃত-বিশ্বাস” “জীবনবেদ” এবং ব্রহ্মানন্দের

আত্মপরিচয়-লক্ষণীয় উক্তি সকল সকলে এই উপলক্ষে প্রতিদিন পাঠ করিলে, এ সময়ে সাধনের বিশেষ সহায়তা হইবে। শ্রীদরবার ও মণ্ডলীস্থ ভাই ভগ্নীগণ এ বিষয়ে সম্মিলিতভাবে নির্ধারণ করিয়া সাধনে নিরত হন, ইহাই প্রার্থনা।

—০—

## ভ্রাতৃত্ব-মিলন।

ধর্মশাস্ত্রের সার কথা দুইটি, একটি পিতা, একটি ভ্রাতা; ঈশ্বর পিতা, নরনারী ভ্রাতা ভগ্নী। এইটি সত্য করিয়া মনে ধারণা করা, কার্যে আচরণ করাই সার ধর্ম। লবধর্মের সার মর্ম এই। বর্তমান যুগধর্মবিধান নব-বিধানও কার্যতঃ ইহাই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত অবতীর্ণ।

ঈশ্বরের পিতৃত্ব বিশেষ ভাবে পূর্ব পূর্ব বিধানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন না, তাঁহারা ভক্ত মহাপুরুষ-দ্বিগেতে ঈশ্বরকে আরোপ করিয়াছেন; তাহা ঈশ্বরেরই ঈশ্বর বা পিতৃত্ব স্বীকার করা ভিন্ন আর কি?

তাই বর্তমান যুগধর্মবিধান মহাপুরুষগণকে ব্রহ্মপুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া, মানুষের ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঈশ্বরই ঈশ্বর—পিতা, মানুষ তাঁর সন্তান—ভ্রাতা, ইহাই নববিধান সাব্যস্ত করিয়াছেন। যে কোন মানুষ, তিনি ঈশ্বরেরই সন্তান, শ্রীগোবিন্দই হউন, কেহই ঈশ্বর-স্থানীয় রূপে পূজ্য নন। তাঁহারা ঈশ্বরের প্রেরিত সন্তান আ তাঁহার স্বরূপজাত হইয়া মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণ। তাঁহারা কখনই স্বয়ং ঈশ্বর নন। তাঁহারা ঈশ্বরের আত্মজ, ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের কোষ্ঠ ভ্রাতা।

তাই ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া স্বীকার করা এবং তাঁর সকল সন্তান সন্তুতিকে আমাদের ভাই বোন বলিয়া পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করা ও কার্যতঃ ভালবাসা, ইহাই নববিধান।

পৃথিবীর সম্পর্কে দেখি, একটি পরিবারে যারা একই পিতামাতার সন্তান সন্তুতি, তাঁরাই পরস্পরকে ভাই বোন বলিয়াই স্বীকার করেন, গ্রহণ করেন, ভালবাসেন ও বিশ্বাস করেন। এক একটি পরিবারে এক একটি পিতা-মাতার সন্তান সন্তুতি যেমন ভাই বোন, তেমনি এক বিশ্ব পিতামাতাকে পিতামাতা বলিয়া বিশ্বাস করিলে, সকল জ্ঞানবে মানবে পরস্পর ভাই ভগ্নী বলিয়া স্বীকার ও বিশ্বাস না করিব কেন? কিন্তু বাস্তবিক ইহা মতে বা মুক্তিতে সিদ্ধান্ত হইলেও, কই আমরা কার্যতঃ তাহা করিতেছি?

মতে সকলেই বলেন, ঈশ্বর এক, কিন্তু ঈশ্বরকে এক বলিয়া স্বীকার করিয়াও বস্তুতঃ যেন এক এক জনের এক এক ঈশ্বর হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সকলেই বলিতেছেন ঈশ্বর এক; কিন্তু মতে বা মুখে তাহা স্বীকার করিয়াও, মনে মনে প্রত্যেকেই মনঃকল্পিত বা বুদ্ধি সংস্কৃত এক এক ঈশ্বর খাড়া করিয়া, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সম্প্রদায়বিভাগে বিভক্ত হইয়া, আপনাপন মনের মতানুসারে চলিতেছেন এবং পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছেন। এমন কি, অল্পকি এক বলিয়া মতে স্বীকার করিয়াও, কেহ কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না এবং তাহা করিলে জাতিচ্যুত হইল মনে করিতেছেন।

এ সকলই যে প্রকৃত বিশ্বাসের অভাবে হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? যদি প্রকৃত বিশ্বাস হয়, ঈশ্বর এক, তবে কেমন করিয়া হিন্দুর ঈশ্বর একজন, মুসলমানের ঈশ্বর আর এক জন হইবেন? আবার এক হিন্দুর ভিতরেও শাস্ত্রের এক ঈশ্বর, বৈষ্ণবের এক ঈশ্বর এবং ত্যাগী লইয়াও এত বিবাদ বিসম্বাদ।

বাস্তবিক ঈশ্বর যিনি, তিনি ত এক ভিন্ন দুই নন, ইহা জীবন্তরূপে বিশ্বাস করিলে, কখনই এরূপ ধর্মসম্প্রদায়িক ভেদাভেদ হইতে পারিত না। এক সূর্যের আলোক যেমন স্থান-কাল-ভেদে পার্থক্য বোধ হইলেও সর্বত্রই একই সূর্যের আলোক, তেমনি ধর্মের ভিতরেও একই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলে, দর্শনের তারতম্য বা ভেদাভেদে সম্প্রদায়-ভেদ কখনই আসিতে পারে না। অস্তুতঃ ঈশ্বর যিনি, তাঁহাকে জীবন্ত ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলে, কখনই কি এ ভিন্নতা হইতে পারে?

তেমনি যদি বাস্তবিকই আমরা একই ঈশ্বরকে পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি করি, আমরা কি কখনও ভাই ভাই ঠাই ঠাই হইতে পারি? পরস্পরকে কি পর ভাবিতে পারি? এক পরিবারে ভাই ভাই ঠাই ঠাই হয় কখন, পরিবারের পিতামাতা না থাকেন যখন; ঠিক তেমনি ঈশ্বর পিতা জীবন্তরূপে আছেন, এই বিশ্বাস উজ্জ্বল থাকিলে আমরা কখনই পরস্পরকে পর ভাবিয়া, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে বা পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে পারি না।

সুতরাং পরস্পরকে ভাই ভগ্নী বলিয়া স্বীকার যখন না করি, তখনই দেখাই, আমাদের পিতামাতা নাই বা মৃত, কিম্বা আমাদের পিতামাতা কে নন। তাই ভাই

ভগিনীকে অস্বীকার করা বা ভাই ভগিনীর সহিত বিবাদ করা ঈশ্বরকে অস্বীকার করা। আবার যেমন একই পিতামাতার সন্তান সন্ততি পরস্পর ভাই ভগিনী হন, তেমনি সবারই ঈশ্বর যে একই ঈশ্বর, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন এবং উপলব্ধি করিয়া পরস্পর ভাই ভগিনী হইতে হইবে।

সাধারণতঃ পরিবারে দেখা যায়, বাড়ীর বড় ছেলের নামে ছেলেদের মাকে পাড়ার লোকে ডাকিয়া থাকে। যদিও সেই একই মা সবারই মা, কিন্তু জ্যেষ্ঠের নামেই মা অভিহিত হন। তেমনি আমাদের জ্যেষ্ঠগণ যাহাকে মা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাকেই তাঁহাদের অনুসরণে যদি মা বলি, তাহা হইলে মাতৃ-পিতৃ-বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের অভিন্নতা হয়।

তাই ভ্রাতৃত্ব-মিলনের অভিন্নতা সম্পাদন করিতে হইলে, আমাদের অগ্রজ যে মাকে মা বলিয়াছেন, তাঁহাকেই মা বলিলে, তবে তাঁহার সহিত অভিন্ন ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধে সম্বন্ধ হইতে পারি এবং পরস্পরকেও একই মার সন্তান জানিয়া ভাই বলিয়া ভগিনী বলিয়া ভালবাসিতে, শ্রদ্ধা করিতে, আদর করিতে পারিব। তাহারই জন্য যেন বিশেষ ভাবে কৃতসংকল্প হই।

আমাদের দেশে ভ্রাতৃত্বসাধনের সুন্দর একটি অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে প্রবর্তিত রহিয়াছে। তাহা বিশেষ স্মরণীয়। এই ভাইফোঁটা উপলক্ষে ভগিনীগণ ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া মিষ্টান্ন খাওয়া আদর করেন। ইহার মর্ম্ম ও অতি গভীর ভগিনীগণ বিবাহিত হইলে পিতা-মাতার গোত্র হইতে গোত্রান্তর হইয়া যান; তাহা হইলেও যে তাঁহারা পরস্পরে একই পিতামাতার সন্তান সন্ততি, একই রক্ত মাংসে গঠিত, একই স্তম্ভপানে পরিপুষ্ট, ইহা চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্যই এই পবিত্র অনুষ্ঠান সাধন করেন।

কি চমৎকার প্রথাই আমাদের নবযুগধর্ম্মবিধানের জন্য এই অনুষ্ঠানে নিহিত রহিয়াছে। ইহা অনুসরণ করিয়া আমরা সকল নরনারীকে—ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বা পর গোত্র হইলেও, একই মা বাপের সন্তান সন্ততি, অতএব আমাদের ভাই ভগিনী, এই বলিয়া—যদি পবিত্র ঐতিহ্য চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া প্রগাঢ় অমুরাগ ও গগনে আবদ্ধ করিতে পারি, যথার্থই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতা, অপ্রেম ও ঘৃণা-স্বরূপ পাপ-যমের দ্বারে কাঁটা পড়িয়া যায়। পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদ আশীর্বাদ ? পাপই যম,—কাম, ক্রোধ, ঘৃণা, হিংসা সাম্প্রদায়িকতা ইহারাই ভীষণ যম—যে যম মানুষকে গ্রাস করিয়া

জীবনের জীবন যিনি, সেই ঈশ্বরের হাত হইতে বিনাশ করিতেছে। যমই আমাদের পাপের পথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপন রাজ্য বিস্তার করিতেছে। পৃথিবী কোথায় ঈশ্বরের রাজ্য, স্বর্গ-রাজ্য হইবে, না, যমের রাজ্য—পাপ, সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ঘৃণা হিংসার রাজ্য হইল। ইহা নিরাকরণ করিয়া পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্যস্থাপনের জন্যই নববিধান আসিয়াছেন।

তাই ভ্রাতৃত্ব মিলন সংসাধন করাই নববিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান সময়ে কি সমাজবন্ধনে, কি রাষ্ট্রপন্থীর ব্যাপারে সর্বত্রই ভ্রাতৃত্বমিলন বা সংঘবন্ধনের আবশ্যিকতা ও আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে উদ্দীপিত হইয়াছে। ইহা বিধাতারই রূপবিধান।

এক্ষণে এই ভ্রাতৃত্ব ঐক্যবন্ধনের একমাত্র উপায়—একই ঈশ্বরকে একই পিতামাতা বলিয়া বিশ্বাস ও স্বীকার করা, সর্ব ধর্ম্মের সমন্বয়ে যে এক ধর্ম্ম তাহার অনুসরণ করা এবং সর্বমানবের মিলনে একাত্মবৃত্তি পরিবাররূপে সংবদ্ধ হওয়া। ইহাই বিধান করিতে বর্তমান যুগধর্ম্মবিধান সমাগত। এই বিধান জীবন্ত ঈশ্বরের বিধান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, এস আমরা একই পিতা মাতার সন্তান সন্ততিজন্মের পরস্পরকে ভাই সোন বলিয়া চিহ্নিত করি, সংবন্ধন করি, আদর অভিনন্দন করি, পরস্পরের বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের সন্ধান রক্ষা করিয়া পরস্পরকে স্বীকার করি, গ্রহণ করি, একই ভক্ত-জীবনায় আহার পানে একাত্মবৃত্তি পরিবার হই; তাহা হইলে নিশ্চয়ই পাপ-যমের দ্বারে কণ্টক চিরতরে রোপিত হইবে এবং আমরা সখ্যরূপে সপরিবারে স্বর্গরাজ্য সন্ধান করিয়া যত্ন হইব। মা আশীর্বাদ করুন, যেন তাহাই হয়।

## ধর্ম্মতত্ত্ব।

নববিধানের রথে স্বর্গের পথে।

বিষাচলের রেলপথ যেমন ক্রমোচ্চ, তেমনি কতই বক্রগতি। রেলগাড়ীকে সামনে একটা এঞ্জিন উর্দ্ধ হইতে টানিতেছে, একটা এঞ্জিন পশ্চাৎ হইতে টেলিতেছে। এই দুইটা এঞ্জিনের নোরে রেলগাড়ী উর্দ্ধপথে বক্রপথে অবাধে অনায়াসে চলিতেছে। পতনের কতই সম্ভাবনা সত্ত্বেও, পতিত বা নিরগামী হইতেছে না। নব-বিধানের রথও উর্দ্ধগামী বক্রপথগামী হইলেও, একদিকে টানিতেছেন বিধাতা স্বয়ং, আর এক দিকে টেলিতেছেন ভক্ত। সুতরাং এই রথের যাত্রী হইলে আমরা নির্ভয়ে নিরাপদে স্বর্গের পথে অনায়াসে যাইব। ভগবানের আকর্ষণ ও ভক্তের সহযোগ আমাদের সহায়। রেলগাড়ী যেমন একখানি মাত্র গাড়ী নয়, অনেকগুলি গাড়ী সমযোগে গাথা, নববিধানরথও তেমনি পরিবার মেলের মিলনে প্রথিত।

## বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্রতায় প্রেমের একতা।

বিশ্ববিমানের কতই উচ্চতম স্তরে দিনমণি সূর্য অবস্থিত রহিয়াছে বা নিজ গম্য পথে বিচরণ করিতেছে; আবার চন্দ্রও অস্ত্র এক নিয়ন্তর স্তরে অবস্থিত থাকিয়া নিজ নির্দিষ্ট পথেই ভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু বিধাতার অনির্বচনীয় সৃষ্টিকৌশলে উভয়ে উভয়ের নিয়োজিত কার্য সম্পাদন করিয়াও কেহ কাহারও প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না; বরং প্রেমযোগে দিন রাত্রি সন্তোষে পরস্পর পরস্পরের সচেযোগিক্রমে নিজ প্রভুর ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্মান সমৃতি এবং জীবগণের কতই সেবা করিতেছে। নিরাকার প্রেমশক্তির একটা বাঁধন যেন উভয়কে এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর আর সৌর জগতের গ্রহনক্ষত্রদিগকে চালাইতেছে। বিধাতার নববিধানের মানবজগৎ এমনই নিরাকার এক প্রেম-স্রোতে বাঁধা রহিয়াছে। স্বর্গস্থ অমর ভক্তগণের এক এক জন এক এক স্তরে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইলেও, চন্দ্র সূর্যের দ্বারা, যেন এক প্রেমস্তরে ভ্রাম্যমাণ হইয়া নিজ আলোক ও জ্যোৎস্না দিয়া জীব-সেবা করিতেছেন। আমাদেরও সাধন-শিক্ষার ভিত্তি থাকিলেও, ইহাদের অমূল্যরূপে যেন এক প্রেমযোগে মিলিত থাকিয়া বিধানের সেবা করিতে পারি। নববিধানাচার্য যেমন বলিলেন, “সহস্র মন্তভেদ সত্ত্বেও যেন আমরা পরস্পরকে পরস্পরের ভূত্যের দ্বারা ইহঁরা সেবা করিতে পারি।”

## আচার্য্য কেশবচন্দ্র।\*

( ১২শে নবেম্বর, ১৯৩৩ )

যে শুভদিনে, যে শুভক্ষণে, কলিকাতার প্রান্তভাগে, ধর্মীর গৃহে, এক ক্ষুদ্র নিভৃত স্থানে কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল—সে দিনের কথা স্মরণেও প্রাণে এক অপূর্ণ অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। সেইদিন বঙ্গদেশের, ভারতের, জগতের ভাগ্যে কোন্ সৌভাগ্যবির উদয় হইয়াছিল, কি উজ্জ্বল স্বর্গীয় জ্যোতিঃপাতের সূচনা হয়েছিল, কে বলবে? ইতিহাস নিশ্চয়ই তার সাক্ষ্য দেবে। “যুগ যুগান্তের ছই একজন, জনমে এমন মানবরতন, বিলার জগতে হরি-প্রেমধন, ভক্তগণ সঙ্গে মিলি।”

যে আলোকের ঝরনাধারার ধর্মীকে পরে ধুইয়ে নিয়ে যাবে, তার কথা কি কেউ আগে ভাবতে পারে? যে শক্তি উত্তর কালে ভারতকে একশো বছর অগ্রসর করে দিয়েছিল, তার বিষয় তখন কি কেউ জানতে পেরেছিল? মনোযী যার আগমনকে শাক্য-সমাগমতুল্য জ্ঞান করেন, ভক্ত যাকে “আমি রাখা, তুমি শ্যাম” বলে জড়িয়ে ধরেন, কে তখন তাঁর পরিচয়

পেরেছিল, কে তাঁকে চিন্তে পেরেছিল? যিনি শেষে নিজে বলে গেলেন, “বিপদ অন্ধকারে কেশবচন্দ্র (আশার) চন্দ্র হবে,” তাঁর জীবনভাগবতের মহিমাময় রহস্য কি বুঝা এতই সহজ? বাহ'ক, তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার, অশেষ গুণরশ্মির, অদম্য উৎসাহ ও কর্মশক্তির সমুচ্চানের আলোচনা বা পুনরুজ্জ্বল করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ, কবিত্বশক্তি, অভিনব বাংলা ভাষাসৃষ্টির কথাই বলবো; যা, বোধ হয়, ইতিপূর্বে সবিশেষ আলোচিত হয়নি।

কবি কে? যিনি কবিতা লেখেন, তিনিই কি কেবল কবি? কবিতা না লিখে কি কবি হওয়া যায় না? যার সৌন্দর্য্যবোধ আছে, বর্ণজ্ঞান আছে, কবিত্বশক্তি আছে, সুন্দরকে ভালবাসবার হৃদয় আছে, তাঁকেই কবি বলা যায়। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের তাই ছিল। যথা, “শরৎকালে পৃথিবী যে... আশ্চর্য্য স্রী ধারণ করে, লক্ষ্মীর আবির্ভাবই তাহার কারণ। \* \* \* যে মাঠ দেখিলে কিছুকাল পূর্বে বিবাদ হইত, আজ তাহা প্রচুর ধান প্রসব করিয়া আপনাই হাসিতেছে। গৃহস্থকে হাসাইতেছে এবং দর্শকের নয়নরঞ্জন করিতেছে। \* \* \* মাঠ যেমন সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, স্রীতে পরিপূর্ণ হইয়া হাসিল, আমাদেরই প্রাণও তেমনি হাসিল। \* \* \* শরৎকালের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে কেবল বুদ্ধি, আনন্দবুদ্ধি, সম্পদবুদ্ধি, ধাত্তবুদ্ধি, ধনবুদ্ধি, আজ সকল গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর ভাতার পূর্ণা..... আজ সকল ঘরে শঙ্খধ্বনি, আনন্দধ্বনি, মঙ্গলধ্বনি, সম্পদের ধ্বনি হোক। আজ দেখছি গঙ্গা পরিপূর্ণ, আমাদের বাড়ীর কমল-সরোবর জলে পূর্ণ, চারিদিকে কমল ফুটিয়াছে বুঝিতেছি। বুদ্ধির দিন আজ, আনন্দের দিন আজ। আজ সকলের মুখে হাসি।..... শরৎকালে গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে।... শরৎকালে গঙ্গা পূর্ণাকৃতি লাভ করেন।..... দেখ, আজ গঙ্গার কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। বায়ুর হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গার হিল্লোল খেলা করিতেছে। তাহার উপরে পূর্ণিমার শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতেছে। একে ত গঙ্গা আপনি মনোহর, তাহার উপরে আবার শরচ্চন্দ্রের সুধারস। কি আশ্চর্য্য শোভাই হইয়াছে। চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, সুন্দর সমীরণের শীতলতা, জলের স্নিগ্ধ গাভীর্ষ্য এ সমুদায় একত্র হইয়া আজ প্রকৃতির প্রিয় মুখকে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সুন্দর করিয়াছে।..... আমাদের জননী ঐ চন্দ্র আজ কেমন সুখময় জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন; গঙ্গার বক্ষ কেমন সুন্দর হইয়াছে, আবার শরৎকালের গঙ্গাতে স্নান করিয়া চন্দ্র আরও সুন্দর এবং মনোহর হইয়াছেন। যার মুখে পদ্ম নাই, হৃদয়ে ভাব নাই, যে লক্ষ্মীবিহীন, সে নিতান্ত দঃখী, পাপী।” অতঃপর, “শরৎকালের এই প্রকার সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, এখন বসন্তকালে আর এক প্রকার শোভা পৃথিবীকে শোভিত করিয়াছে। এই কালের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে অস্ত্র কোন ঋতুর তুলনা হইতে পারে না।.....

\* ‘কেশবের কাছে যাই’ বলে, গত ৪ঠা নভেম্বর, দেবেলানাথ বহু চলে গেলেন সেই পরম লোকে, সেখানে আচার্য্যদেবের জ্যোৎস্না করত। আচার্য্যের জ্যোৎস্না সব্বদে এই প্রবন্ধটি রচনার কয়েকদিন পূর্বে তাঁর লেখা।

এই বসন্তের ফুলের কাছে শরৎকালের ধাত্রী হারিয়া গেল। কসন্তকালে চারিদিকে ফুলের সৌন্দর্য্য এবং ফুলের মৌরভ জগৎ আন্দোলিত করিতেছে। বসন্তের পূর্ণিমা চন্দ্র, বসন্তের মধুর সমীরণ, বসন্তের পুষ্প এই ত্রিম পদার্থই অতি সুন্দর। সমীরণ একদিকে যেমন গগন হইতে সুধাময় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না বহন করিয়া আনিতেছে, তেমনি অক্লদিকে আবার পুষ্পোদ্যানের মৌরভ বহন করিয়া আমাদের নিকট লইয়া আসিতেছে। যে সমীরণ এমন সুন্দর জ্যোৎস্না এবং স্বর্গের সুগন্ধ বিস্তার করিল, সেই সমীরণের দ্বারা এমন উপকারী বজ্র আর কে কোথায় দেখিয়াছে? পৃথিবীতে একখানি স্বর্গের ছবি প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বর বসন্তকাল পেরণ করেন। বাহ্য বাহ্য সুন্দর জিনিষগুলি সঙ্গে লইয়া পৃথিবীতে বসন্তকাল আসেন। বসন্তোৎসবের তুলনা হইতে পারে না। শারদীর উৎসবে বিধাতার কোণে গৃহস্থের ঘরে কেমন প্রচুর পরিমাণে ধন, ধাত্রী, অন্ন, লক্ষী, শ্রী সঞ্চিত হয়, এ সকল চিত্তের বিষয় ছিল; কিন্তু বসন্তোৎসবে কেবল সৌন্দর্য্যের কথা শুনিতেছি। আজ হিতবাদীর কথা নহে, আজ সুখবাদীর আন্দোলন। আজ সুখবাদী সুখবরের পূজা করিতে আসিয়াছেন। সেই দিন ছিল সংসারের সুখ, আজ হ'ল জীবনের আনন্দ।.....বসন্তকাল আমাদের নিকট স্বর্গে লইয়া যাইতে আসিয়াছে, বসন্তকালের অক্লদ অর্থ দেখি না।.....ফুল, চন্দ্র, বায়ু সকলই পাইলাম। এখন কেবল একটা কথা চাই, জন্ম-নিরুজ্জ্বল সেই সখাকে লইয়া সুখী হইব।.....ভক্ত বসন্তের ফুলগুলির দিকে তাকাইয়া তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ফুল, তোমরা হাসিতেছ কেন? হে সুন্দর গোলাপ, হে চমৎকার বেল ফুল, তোমরা কখনও কঁাদ না কেন? তোমাদের সহায় বদন দেখিয়া আমার প্রাণ-সখার আগর মুখ স্মরণ হইতেছে।.....প্রিয় গন্ধরাজ, ভাই গন্ধরাজ, মিত্র গন্ধরাজ, তোমাকে হাতে লইলাম, তোমাকে ভাই বলিলাম, মিত্র বলিলাম। বল দেখি, ভাই, তোমাকে ঈশ্বর সৃজন করিলেন কেন?.....আমার হৃদয় বাহাতে তোমার মত কোমল এবং লাবণ্যবৃত্তি হয়, তুমি এই শিক্ষা দাও।'.....পর্যন্ত তোমার গাভীর্য্য, হে বিশ্বপতি, পুষ্পেতে তোমার সৌন্দর্য্য, হে বিশ্বনাথ।.....হে সুকোমল পুষ্প, তোমার বাড়ী কোথায়? দেখিতে ভাল, শুকিতে ভাল, বুকে রাখিতে ভাল। এমন ফুল পেয়ে আমি রাখিব কোথায়? মাথার উপরে রাখি, বুকের ভিতরে রাখি। বায়ু ফুল, আকাশ ফুল, বৈকুণ্ঠ ফুল, ফুলে, ফুলে একাকার।.....ফুল কাঁধে রাখি, বুকে ধরি, হস্তে করি। প্রাণ কুহুম হউক।.....যেন ফুলের মতন সাধু এবং কোমল হই।"

উপরোক্ত অংশ থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেশবচন্দ্র একজন প্রকৃতি কবি ছিলেন। ভক্তই যথার্থ কবি। ভগুবদ্ভক্তিই কবির প্রেরণাদাতা। রামপ্রসাদ ভক্তির প্রাবল্যেই গান রচনা করেছিলেন। আগে ভক্তি, তবে কবিতা। কবি হরত

ভগবদ্ভক্ত না হ'তে পারেন, কিন্তু ভক্ত কখনই কবিত্বহীন, রসহীন, শুষ্ক, কঠোরহৃদয় হতে পারেন না। সৌন্দর্য্যবোধ, প্রাকৃতিক শোভা দর্শন, ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি, তাঁর রক্তে গেথা। তিনিই বলতে পারেন, "পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা, রেখা নয় তোমার দয়াল নামটি গেথা।"

দ্বিতীয় কথা, তাঁর বাংলা ভাষাসৃষ্টি। আমার একজন পরম শ্রদ্ধের প্রিয় সুহৃদের কাছে শুনেছি, কেশবচন্দ্রের বাংলা বসন্ত, উপদেশ, প্রার্থনাদির ভাষাই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্থান অধিকার করবে এবং ভবিষ্যতে চলবে, এই মত স্বর্গীয় মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্ত করেছিলেন। এটি ভাষা শিপ্তেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তখন ব্রহ্মমন্দিরে আসতেন। এমন সরল, সোজা, সুললিত, প্রাণস্পর্শী, বিত্তজ্ঞ, মাজিত, অনাবিল শুভ্র জলপ্রপাতের মত বাংলা আর কোথাও দেখা যায় না। নিরাকার বাগ্‌দেবীর সাকার মন্ত কেশবরসনার দ্বারা উচ্চারিত হতো, মধু বর্ষণ করতো।

প্রায়ই দেখা যায়, কলাবিদ্যার সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার গুঢ় যোগ স্বীকৃত হয় না। কলাবিদ্যার চর্চা, সাধনা, সাধককে ব্রহ্ম-সন্ধানে উপস্থিত করে, একথাও সংশয়ান্বিত, সন্দেহাধীন। সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, কবিত্ব, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য এই পাঁচটি কলাবিদ্যা, স্নান-শিল্পের অন্তর্গত। বাস্তবিক একটা গান শুনে, একখানি ভাল ছবি দেখলে, প্রস্তরখোদিত দেবমূর্ত্তির কাছে গেলে, সুন্দর সৌখিন হ'লে, "ভাগ্যমহলে" উঠলে অথবা কাব্যমুহুরসাবাদন করলে, অন্তর কুহুমের মত কোমল ও বিকশিত হয়, চিত্ত অপূর্ণ, উদ্ভাসিত-সৌন্দর্য্যের অলকাপুরীতে সমুপস্থিত হয়ে "রসোৎসব" বলে পূজা করে। সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যেমন দেখিয়ে গেছেন, অজ্ঞাত তাহা বিরল। Nature is the manifestation of God. নিয়ে অগ্রাংশ উদ্ধৃত করছি :—

"সাধনকানন—সেখানে প্রকৃতি হাসে, পাখী গান করে, সেখানকার গাছগুলি নারদমুনি। তাহার বীণা হাতে করিয়া সনাতন ব্রহ্মনাম গান করে।...গাছ বল, পাখী বল, ফুল বল, জল বল, বায়ু বল, প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে পাও, সকলই সেই রাজ্যের ব্যাপার। তাহার সকলই সাধকদ্বিগকে স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য সেখানে বসিতে আসিয়াছে।.....সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ ঈশ্বর সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া জগৎকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করেন। সৌন্দর্য্য স্বর্গের চুলভ সামগ্রী। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য কুৎসিত ও কঠোর মনকেও পবিত্র এবং সরস করে।.....বাহিরের ফুল, বাহিরের চন্দ্র, বাহিরের সমীরণ চিরকাল থাকে না; কিন্তু হৃদয়ের ভক্তিকুল, হৃদয়ের প্রেমচন্দ্র, হৃদয়ের পূজ্য হিলোল চিরকাল থাকিবে। ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, এই বাহিরের বসন্ত আমাদের মনের বসন্ত হউক। মনের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের চির বসন্ত, চির সৌন্দর্য্য লভ্য করি। ঈশ্বর ভক্তের তাব বুঝিয়া বলিতেছেন,—'ওরে ভক্ত, আমার প্রেমিত



এই বসন্তের গুচ রহস্য তুমি জানিয়াছিস, প্রাণ তরিয়া তুমি স্বর্গের সুধারস পান কর।' যে দয়াময়, অগাম্য পরমেশ্বর এই বসন্তোৎসব প্রেরণ করিলেন, তিনি চিরকালের জন্য আমাদেরকে তাঁহার অগাম্য বসন্তোৎসবে মত্ত করুন।"

যে অজানা, অজ্ঞাত দেশ থেকে যাত্রা এখানে এসে কিছুদিন থেকে, লীলা সাঙ্গ করে' আবার সেই অজানা লোকে চলে যায়। তাঁর বিষয় কেহই অবগত নহে। কিন্তু সে এখানকার পরিমিত সময়টুকু সুখে, স্বচ্ছন্দে, আরামে কাটাতে চায়। কত সপ্ত, কত সাপ, কত আশা পাশে পোষণ করে; আবার কত অতৃপ্ত বাসনা, অপূর্ণ সাধ, বিলুপ্ত আশা বুকে করে, ভয়ঙ্কর বিষণবাজিত প্রাণে ধ্বংসের ভেঙ্গে দিয়ে অকালে চলে যায়। মায়ার সংসার, মায়ার বেড়ী কেটে, আপন জনকে কাঁদিয়ে, চর্চাৎ অসময়ে স্বর্গলোকে টেড়ে যায়। এই অপূর্ণ, মরীচিকাময় সংসারে তবে কি শান্তিনিকেতন, সুখের আলয়, আরামের বাসগৃহ নাট? শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কি বলেন? "সুখী কে? না যে বিধানবাদী।.....বাড়িটা সুখের বাড়ী, বন্ধুগুলি সুখের বন্ধু, ধর্ম সুখের ধর্ম, সমুদায় সুখের সংযোগে সকলই প্রস্তুত। যৌর অন্ধকারের মধ্যে বাহাদের ছবিরে নিতানন্দের বাগান, শান্তি তাহাদের ভিতরে খেলা করে। বেদ, বেদান্ত, রামায়ণ, মহাভারত প্রকাশ হইল, কিন্তু তোমার (ঈশ্বরের) স্তুতিপানিষদ এখনও প্রচার হইল না। এই পাড়ার কাহারও কানে কষ্ট হইতে পারে না। কাহারও হৃৎখণ্ডে থাকিতে পারে না। মনের কষ্ট, শরীরের কষ্ট, বাবার পরিবার কষ্ট, একথা যে বলে, আমরা খাঁড়া লইয়া সেই কথার প্রতিবাদ করিব। আমাদের কষ্ট নাই, হৃৎখণ্ডে কখনও এ জীবনে পাই নাই। সাধকদল বাহির হউন, এই কথা প্রচার করুন যে, বিষাদে কখন বিষর হই নাই, জীবনে কষ্ট কখনও পাই নাই, শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ, কোন বিষয়ে ক্রোধ আমাদের নাই।" বিশ্বাসীর, ভক্তের এই কথা। তিনি বিশ্বের নিবিড়তম তমসার মধ্যে আনন্দলোকের কব নীপ্তি দেখিতে পান, আনন্দরূপমমৃত্যের জয়ধ্বনি করেন। কবি না হ'লে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখে মোহিত হবার কার অধিকার? ভক্ত না হলে, সংসার নিরবচ্ছিন্ন সুখের আলয়, কে বলতে পারেন? প্রকৃত কবি ভক্ত যে সেই সুখবাদী।

.....যাঁরা আচার্য্যদেবকে দেখেছেন, তাঁরাই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তাঁর অপরূপ স্নিগ্ধ জ্যোতিভরা চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে, "মজলে সুলভের সর্ব চরাচর লীন," 'বহু নিরন্তর অনন্ত আনন্দ-ধারা' এই গভীরতম মন্ত্রবাণী স্পষ্ট ব্যক্ত হতো। কাননের ফুল, পাখীর গান, তটিনীর নৃত্য, শিশুর হাসি, "আবিকৃতচাক্রতারম্, অরংপ্রসন্নম্, আকাশম্," এর শোভা তাঁকে গাগল করতো, সৃষ্টিকর্তার অসন্দ্বিগ্ধ, নিঃসংশয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিত। ঘন মেঘাবৃত আকাশ, নীলমাছের অজ্ঞেয় গিরিশৃঙ্গ, "তমাল-ভালীবনরাজিনীলা," গাঢ়তমাবৃত ধরণী, প্রকৃতির অধ্যাক্ষ,

অক্ষুট আনন্দরাশি প্রকাশ করতো। তাঁর এই স্বভাবগত প্রফুল্ল কবিত্বের তাঁকে কোণায় নিয়ে গেল? সভ্যতার হাতে গড়া সীমার বাঁধ ভেঙ্গে দিয়ে আত্মাকে এক অগাগ, অনাবৃত, বন্ধনমুক্ত অবস্থার উপস্থিত করলো। বিপুল-জন-কোলাহল মধ্যে নীরব, নিতরু, নিবিড় ব্রহ্মানন্দরসে মগ্ন করলো। তিনি শেষে বলেন, "আমরা তোমার হাতে গঠিত। আমাদের গায়ের রং, মুখের আকার সব তোমার হাতের করা। তুমি তুমি দিয়ে যখন আঁকিয়া ছিলে, সেই রংয়ের স্নগন্ধ আমাদের গায়ে।.....আমরা তোমার নিজহস্তে রচিত। অজ্ঞ কেহ স্পর্শ করে নাই। চন্দন কাঠ অনিরা তুমি নিষ্কাশ করেছ।..... আমাদের অন্তর পর্য্যন্ত যেন আতর গোলাপের গন্ধ হয়। যে দেশে যাব, চরিত্রের সৌরভ বাহির হইবে। দয়াময়ী মায় হাতে গড়া জিনিষ যে কেমন হয়, দেখাব।" আরো বলেন, "সাতাল না হলে, পাগল না হলে, ভোলানাথ শিশু না হলে, পরিত্রাণ নেই। গোড়াথেকেই এই তিন ভাব তাঁর চরিত্রে মেশানো ছিল। যথা, "এই জীবনের ভিতরে তিন পুরুষ বর্তমান। তিনি প্রকৃতি এই জীবনে বিরাজ করিতেছে। তিন প্রকার স্বভাবের সমন্বয় হইয়াছে; তিন প্রকার ধাতু একত্র মিলন হইয়াছে। একটা বালক, একটা উদ্ভাদ, আর একটা সাতাল।.....হে নীনবন্ধু, হে করুণার অনন্ত সমুদ্র, বালক করিয়া রেখো, বৃদ্ধ যেন কখনও না হই। মাথার চুল যদি পাকে, ক্ষতি নাই; আবার বার্দ্ধক্য যেন না হয়। দোহাই ঠাকুর, বালক থাকা বড় সুখের।"

বৈদিক যুগের ঔষিকর্ষ-নিঃসৃত, তানলয়বরযুক্ত সামরব, সদাশুষ্টি-যজ্ঞোৎক্লিপ্ত পুত্র, সুরভি হোমানলধূম, বজ্রবেদিকার গঠন-সৌকর্য্য, বোদ্ধযুগের হর্ষা, মঠ, দেবালয়, গুহা, স্তূপ, চৈত্যা, বিহার, দেবমূর্তি, আলোখা প্রভৃতি পাঁচটি বিভিন্ন কলাবিজ্ঞান-সাধনার চরমোৎকর্ষ সন্দেহ নাই। শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের ভাবায় উক্ত পাঁচটিই আছে। সঙ্গীতের স্বরকার, চিত্রকরের তুলির রং, কবিরের ধ্বনি, ভাস্করের কারুকার্য্য, স্থপতির দৌধনির্ম্মাণকৌশল, সবেই মিলন হয়েছে। তাঁর জীবনকুঞ্জে জীবনদেবতার রাগিনী সততই বাজতো, হৃদয়গঞ্জে হৃদয়সখার অসন সদা বিরাজিত ছিল; তাই তাঁর ভাষা শ্রোতার হৃদয়ে স্পন্দনোৎসাহের ইন্দ্রিয় বিস্তার করতো। ছন্দে ছন্দে, তালে তালে হৃদয়ের অপূর্ণ নৃত্য দেখা দিত। সিদানন্দ-সিদ্ধুনীরের প্রেমানন্দলহরী খেলা করত। শ্রোতাকে আনন্দলোকে নিয়ে যেত। কেশবচন্দ্র নিঃসন্দেহ কবি, চিত্রকর ছিলেন এবং তাঁর বাংলা ভাষা এক অপূর্ণ, অতুলনীয় সামগ্রী, অলৌকিক বস্তু। দয় কেশবচন্দ্র, তুমি শ্রু!

....."অত দিন রবে দরা, রবি শশী গ্রহ তারা  
কেশবে না হ'বে হারা তাবৎ সংসারা।"

## রাজা রামমোহন রায়।

( এলাহাবাদে শতবার্ষিকী স্মৃতিসভায়, সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিতাবণ )

যে দেশে মহাপুরুষদিগের আদর ও সম্মাননা আছে, সেই দেশই যথার্থ জীবিত। যে দেশ মৃত ও সেই জন্ত সঙ্গীর্ণনা, সে দেশে প্রকৃত মহাপুরুষ ও মহামানবের আদর ও সম্মান নাই। তৎস্থলে অথবা নির্দা ও নির্গাতন আছে। তাঁহাদের কৃতকার্যের সুফল ভোগ করে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ না হইয়া অকৃতজ্ঞ হয় ও অথবা নিন্দাবাদ করে, ইচ্ছাই দেখা যায়। আমাদের দেশেও এই মৃত অবস্থার দোষগুলি প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সুখের বিষয়, আজকাল এই দূষিত ভাবটা ক্রমে অপমৃত হইয়া, সুস্থ ও জীবিত অবস্থার ভাবের উন্মেষের সূচনা দেখা যাইতেছে; তাই আজ আমরা এখানে একত্রিত হইতে সমর্থ হইয়াছি। বাঁহার মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রজ্ঞালি দিব্যর জন্ত আমরা সমবেত, তাঁহার এবং তজ্জন অন্যান্য মহাত্মা-দিগের মহাব উপলব্ধি করিবার প্রয়াস আরম্ভ হইয়াছে, দৃষ্ট হয়। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত রামমোহন রায় ও সেই শ্রেণীর মহাত্মা-দিগের নামে দেশবাসী নাসিকা সঙ্কুচিত করিতেন। রামমোহনের দোষ তিনি পৌত্তলিকতা, সতীদাহ প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। রামমোহনের সময় দেশের কি ভীষণ অবস্থা ছিল, দেশ যে কিরূপ অন্ধকারে ও কুসংস্কারে আবৃত ছিল, তাহা এখন ধারণা করিতে পারা কঠিন। ইতিহাসপাঠে তাহা কতকটা জানা যায়। দেশের যে সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তখন রামমোহন একাকী দণ্ডায়মান হইয়া-  
ছিলেন, আজকাল ভগবৎরূপার অনেকেই বসিতে পারিতেছেন যে, এই সকল কুসংস্কারে দেশের কত ক্ষতি হইয়াছে এবং রাম-মোহন সেইগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ফলে দেশের কত উপকার ও উন্নতি হইয়াছে। আমরা যদি রামমোহন এবং তৎপরবর্তী প্রকৃত মনীষীদের পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিতে পারিতাম, আজ দেশ কত উচ্চ স্থানে উঠিয়া যাইত—আমাদের এত চর্দ্দশা থাকিত না। এখন আমাদের দৃষ্টি কতক পরিমাণে এইদিকে পড়াতেই, আজ আমরা শুণীর প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে সক্ষম হইতেছি।

মহাজনগণ যখনই কোন মহৎ উদ্দেশ্যে কোন নূতন সংস্কার আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাঁহাদের ভাগ্যে উৎপীড়ন ও লাঞ্ছনা-ভোগ ঘটয়াছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে ক্রমে তাঁহাদের গুণ ও কার্যের ফল গৃহীত হইয়াছে। যিশুখৃষ্ট, রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতির কার্যকলাপ ধর্ম্মে নিব্ধিত হইয়া ক্রমে গৃহীত হইতেছে।

যে দেশ বর্ত্তমান জীব, সে দেশের লোকের অপরের, এমন কি অন্য দেশের লোকের গুণাবলী গ্রহণ করিবার শক্তি ততই প্রবল।

সেখানে তাঁহাদের ক্ষতি, দেশ ইত্যাদি প্রভেদ বিচার থাকে না। এমন কি, মৃত দেশের কোন কোন মহাত্মার গুণ গ্রহণ করিতে ও তাঁহাকে মর্যাদা দান করিতে উক্ত মহাত্মার বদেশবাসী অপেক্ষা ঐ বিদেশবাসীগণকেই বেশী তৎপর দেখা যায়। রামমোহনের মৃত্যুর পর সেই সুদূর বিদেশে তাঁহার গুণগ্রাহী ইংরাজ বঙ্গগণ রাজার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার কেশপাশের কিয়দংশ কয়েকটা লেপেফার মধ্যে সম্বদ্ধে রক্ষা করিয়া, রাজার মৃত্যুর প্রায় আশী বৎসর পরে, অল্পাংশ স্মৃতিচিহ্নের সতিত ব্রাহ্মসমাজের হস্তে প্রদান করেন। ইহা কি তাঁহার প্রতি বিদেশবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় নহে?

একশত বৎসর পূর্বে আমাদের নেতা ও ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম-পিতামহ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন বদেশ, আত্মীয় ও বঙ্গগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূর ব্রিটেল নগরে রোগশয্যায় দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া সেই বিদেশবাসীরাই অতি যত্ন সহকারে ও অকাতরে পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সেবা ওশ্রবা করিয়াছিলেন। আজ আমি ঐ সকল উদারমনা বিদেশী মহোদয়গণকে প্রাণের সহিত কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। তাঁহাদের নিকট হইতে মহতের সম্মাননা আমাদের শিকণীয়।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় বতই আন্দোচনা করা যায়, এবং যে সকল ঐতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া ও বিরুদ্ধ ভাবের সহিত তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল দেখা যায়, ততই তাঁহাকে ভগবচ্ছক্তি দ্বারা অসুপ্রাপিত মহামানব সঞ্চারিত বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেই জন্ত তাঁহাকে Jiant mind বলিয়া গিয়াছেন। রামমোহন ও তাঁহার পশ্চাৎ-বর্ত্তী মনীষিগণ বহু পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং নানা প্রকারে লাঞ্চিত হইয়া, বনাকীর্ণ ভূমি পরিত্যক্ত করিয়া যে মক প্রাপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তত্ক্ষণি দণ্ডায়মান হইয়া কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ স্থলে কেহ কেহ নিন্দাবাদই করিয়া থাকেন। ইহা অতি ক্ষোভের বিষয়। সুখের বিষয়, এ প্রকৃতির লোক ক্রমে কমিয়া আসিতেছে।

সংস্কারক যে সকল সংস্কার প্রণর্জন করিয়া দেশবাসীর নিকট বিদ্রোহভাজন হইলেন, পরে দেশবাসী ঐ সকল সংস্কার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেও, পূর্ব বিদ্রোহভাব অনেক দিন ধরিয়া বহুদূর ভাবে চলিয়া আইসে। অতি দীর্ঘে দীর্ঘে তাহা অপসারিত হয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটয়াছে।

“হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ।”

মহাপুরুষদিগের প্রতি বাঁহারা অত্যন্ত আচরণ করেন, সেই অত্যন্ত আচরণই অজ্ঞায়কারীদের ধ্বংসের পথে অগ্রণর করে। আমাদের দেশও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। তবে সুখের বিষয়, আমাদের এখন চক্ষু খুলিতে আরম্ভ হইয়াছে ইহাতে ভবিষ্যতে আশার চিহ্ন দেখা যায়।

( ক্রমশঃ )

## ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু পরলোকে।

আমরা সম্মুখচিতে প্রকাশ করিতেছি, ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বসু, ৬৬ বৎসর বয়সে, গত ৪ঠা নবেম্বর, শনিবার, রাত্রি প্রায় ৯টার সময়, আত্মিক অরোগে, শান্তিকুটীর হইতে নিত্য শান্তি-ধামে যাত্রা করিয়াছেন। তাবড়া জিলার পাচলা গ্রামে জমীদার বসুবংশে তাঁহার জন্ম হয়, এবং চাটখোণার প্রসিদ্ধ ব্রতবংশে তাঁহার বিবাহ হয়। আলবার্ট স্কুলে ভাই প্রমথলাল, বিনয়েন্দ্রনাথ ও মোহিতচন্দ্রের সহিত এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে করিতে, আচার্যদেবের অমূল্য প্রভুর কৃপাবিহারী সেনের প্রভাবাধীনে আসিয়া, তিনি নববিধানধর্মে আকৃষ্ট হন; এবং আমাদের ব্যাপ্ত অবস্থাপে ও পরে ভাই প্রমথলাল, বিনয়েন্দ্রনাথ, মোহিতচন্দ্র এবং ভাই কালীনাথ ঘোষের সহযোগে যে যুবাঙ্গিরের প্রার্থনাসমাজ গঠিত হয়, তাহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া নববিধানমণ্ডলীভুক্ত হন। অবস্থার চক্রে পড়িয়া পৈত্রিক ধন সম্পত্তি হইতে অনেকটা বঞ্চিত হইয়া যে চাকরী করিতেছিলেন, তাহাও না থাকিতে এবং কয়েকটা পুত্র কন্যা ও স্ত্রী জামাতা ঈমান লোকনাথ মল্লিককে হারাইয়া অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় পতিত হন। সম্প্রতি বি.এ. উপাধিধারী মধ্যমা কন্যা ঈমতী ননীবালায়ও আকস্মিকভাবে মৃত্যু হইলে তাঁহার শরীর মন শোকে তাপে অত্যন্ত ক্রিষ্ট হইয়া পড়ে। আপাততঃ শান্তিকুটীরের পাখস্থ প্রকোষ্ঠে পরিবারে অধিবাস করিতেছিলেন। “স্বনীতিশিক্ষা-লয়ের”ও হিসাবরক্ষকের কার্য্য করিতেন। মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মমন্দিরেও উপাসনার ভার প্রাপ্ত হইতেন। নববিধান ট্রেষ্টের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য এবং খাঁটুরা ব্রহ্মমন্দিরের তত্ত্বাবধানের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। মাত্র দশদিন পূর্বে সামান্য সর্দি অরে আক্রান্ত হন, পরে তাহা মাশেলিয়া বলিয়া মনে হয়; বুধবারে ডবল নিউমোনিয়া বলিয়া ধরা পড়ায় ডাঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসাবিনে অর্পণ করা হয় ও তাঁর পরামর্শ মত ডাক্তার বীবেন্দ্রভূষণ বসু এবং ডাঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বথলাধ্য চিকিৎসা করেন; ডাক্তার অনিলকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুও তাঁহা-দিগের যথেষ্ট সহায়তা বিধান করেন। “কিন্তু নিম্নতি: কেন বাধ্যতে, কোন প্রকার চিকিৎসা ও, সন্তান সন্ততি এবং আত্মীয়গণের প্রাণগত সেবা কিছুই কার্য্যকারী হইল না। শেষ নিঃশ্বাসত্যাগের পূর্বে পর্য্যন্ত তিনি কিছুই সংজ্ঞা হারান নাই। বাইবার পূর্বে একবার বলেন, “আমি কেশবের কাছে যাবো।” “আমাকে এগিয়ে দাও না।” “সেই শান্তিকুটীরে যাবো।” এই ত শান্তি-কুটীর বলাতে বলিলেন, “না, সে শান্তিকুটীর অনেক দূর।” একবার বলিলেন “জৈলোক্যাবাবুর গান শুনবো।” একটি গান হবার পর বলিলেন, “আর একটি গান চোক।” প্রার্থনা করবো কিনা জিজ্ঞাসা করায়, প্রার্থনা কতে বলেন ও যোগ দিলেন। শেষ ভাই প্রিয়নাথ মাতৃস্তোত্র আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে

যোগ দিতে দিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বন্ধু বান্ধবগণ সমবেত হইলে, তাই প্রিয়নাথই উপাসনা করিলে শব লইয়া যাত্রা করা হয়। ব্রহ্ম-মন্দিরের সম্মুখেও শব রক্ষা করিয়া প্রার্থনা হয়। পরে কেশব একাডেমীর সম্মুখে শব রক্ষা করিয়া ভ্রাতা বীবেন্দ্রনাথ সেন প্রার্থনা করেন। শব অশানে নীত হইলে যথাবিহিত নবসংহিতায় প্রার্থনা-সহকারে শবদাহ হয়। মা বিধানজননী পরলোকগত আত্মাকে তাঁর শান্তি-ক্রোড়ে লইয়া নিত্য শান্তিবিধান করুন এবং সন্তান সন্ততি এবং ছাধিনী বিধবাকে তিনিই সাধনা দান করুন।

## স্বর্গীয় অনুকূলচন্দ্র রায়।

(প্রাচ্যবাসরে গঠিত)

আমাদের পূজনীয় পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায় মহাশয় হুগলী জেলার তরিপাল গ্রামে বিখ্যাত রায়বংশে, ৩০শে ভাদ্র, ১২৭৫সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৮ব্রজনাথ রায় এবং মাতার নাম ৮শাকমণি দেবী ছিল।

অতি শৈশবেই পিতৃদেব তাঁহার পিতা ও খুলতাতকে হারাইয়া সম্পূর্ণ অতিভাবকহীন হইয়া পড়েন। তাঁহার চার সহোদর এবং চার সহোদরী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পিতৃদেব ছিলেন চতুর্থ সন্তান এবং ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্বোচ্চ। বাল্যকালেই অতিভাবকহীন হইয়া পিতৃদেব অত্যন্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বৃহৎ পরিবারের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। সেইজন্য অধ্যাপনা-কালেই তাঁহাকে অর্থোপার্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইয়াছিল এবং অধ্যাপনা অসমাপ্ত রাখিয়া সুদূর আসাম অঞ্চলে চাকুরি গ্রহণ করিয়া বাইতে হইয়াছিল।

তৎপূর্বে ১২৯৪সালে ষাণ্ডানিবাসী স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বেণী-মাধব বসু মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা স্বর্গগতা ঈমতী নিকুপক্ষ দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তখন পিতৃদেবের বয়স ১৯ বৎসর। কিছুদিন আসামে চাকুরি করিবার পর পিতামহী ঠাকুরাণীর অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পিতামহীর স্বর্গগতের পরে তিনি আর চাকুরি স্থলে করিয়া যান নাই।

পরে কলিকাতা নগরীতেই অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হন, এবং অন্ন আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের অধ্যাপনার ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইয়া-ছিল। বাল্যকাল অগতি পিতৃদেবের প্রকৃতি ধীর ও শান্ত ছিল, এবং তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও পরোপকারী ছিলেন। সাংসারিক অভাব ও হুঃখ কষ্টের সহিত যৌবনের আরম্ভেই তাঁহাকে যথেষ্ট সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই সময়েই তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁহার সম্পর্কে হুই কাকা স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ রায় ও স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বর্গগত শ্রীযুক্ত বিনোদ

বিহারী রায় মহাশয়দিগের প্রভাবে তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত আরম্ভ করেন; এবং ক্রমে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভাবে অমুপ্রাণিত হন। এই ভাবে তাঁহার ধর্ম-জীবন আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ রায় মহাশয় সুগায়ক ছিলেন; ৮রাধাগোবিন্দ, রামগোবিন্দ ও বিনোদ বাবুকে লইয়া পিতৃদেব নিজ গ্রামে একটা ছোট মণ্ডলী গঠন করেন। তাহাতে আমাদের স্বর্গগতা পিসিমাতা ঠাকুরাণী ও মাতৃদেবীও যোগদান করেন। “শান্তিকানন” নাম দিয়া উপাসনা-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তথায় নিরমিত উপাসনা ও সংকীর্ণনাদি আরম্ভ হয়।

তৎকালে হরিপাল একটা বহিষ্কৃত গ্রাম ছিল। এইরূপ গ্রামে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করা ওখনকার কালে কিরূপ কষ্ট-সাধ্য ব্যাপার ছিল, তাহা সকলেই অস্বপ্নময় কল্পিতে পারেন। বিরোধীদের সহিত পিতৃদেবকে বৈরুপ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার তুলনার সাংসারিক সংগ্রামকে সামান্যই বলা যায়। আত্মীয় স্বজনগণও বিরূপ হইয়াছিলেন। এমন কি, আমাদের মাতামহী পর্য্যন্ত মাতৃদেবীর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু করুণাময় পিতা পরমেশ্বরের করুণায় তাঁহার। সকল বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরে পিতৃদেব স্বর্গগত প্রেরিত ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট নববিধানধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং নববিধানের সাধক ভক্তের হ্রাস জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকেন। তৎকালে তিনি নববিধানের সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্মা কর্তৃক প্রবর্তিত “হানিলুকা ব্যাণ্ড” এর একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং নববিধানের শাস্ত্রালোচনার ও সঙ্গত প্রভৃতিতে যোগ দেওয়া বিষয়ে তাঁহার গভীর আগ্রহ ছিল। সেই সময় হইতেই ক্রমশঃ ভগবানের রূপায় চাকুরিতে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

এই সময়ে তাঁহার জীবনে এবং আমাদের পরিবারে একটা মহা পরিবর্তন ঘটিল। পুজনীয়া মাতৃদেবী কিছুকাল বাবু রোগে ভুগিতে ছিলেন, তাঁহাকে সুস্থ করিবার নানা চেষ্টা করা হইল, কিন্তু কোনট ফল পাওয়া গেল না। তিনি অকালে আমাদের শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন। পিতৃদেবের জীবনের সহিত তাঁহার জীবন যে কি ভাবে জড়িত ছিল এবং তাঁহাদের দাম্পত্য-জীবন যে কিরূপ শান্তিপ্রদ ছিল, তাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলা শক্ত। পিতৃদেবের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট শোক ও পরীক্ষার অংশ মাতৃদেবী গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার স্বর্গগমনে পিতৃদেব শোকে এত কাতর হইয়া পড়িলেন যে, সংসারে আর তাঁহার কোন আকর্ষণ রহিল না। আমাদের কাকাবাবুর হাতে বৃহৎ সংসারের সকল ভার দিয়া, কিছু কাল তিনি নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আবার অর্ধোপার্জনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু

সংসারে তাঁহার আর কোন আসক্তি দেখা যায় নাই।

পিতৃদেব ১৩১৭ সালে স্বর্গগত সাধু প্রমথলাল সেনের নিকট সাধকরূপ গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নববিধানের আদর্শের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অতি গভীর ছিল। কয়েক বৎসর হইল, তিনি বহুমূত্র-রোগে ভুগিতে ছিলেন; গত দুই বৎসর হইল, তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। ইদানীং তিনি কুলুটোতেই বাস করিতে ছিলেন। এখানে কাকাবাবুর তত্ত্বাবধানে ও সেবা শুশ্রূষার গুণে রোগের কষ্ট বহু পরিমাণে লাঘব হইয়াছিল। দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও, তিনি কোন দিন কখনও রোগের যন্ত্রণায় বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই এবং অতি শান্ত ও ধীর চিত্তে সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট বহন করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব আমাদের ছাতিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পারিবারিক জীবনের যে আদর্শ তিনি আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহা পালন করিতে পারি। আমাদের পরিবারে গৌরব করিবার কিছু আছে কিনা, আমরা তাহা বলিতে পারি না; তবে একটা বিষয়ে আমরা মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করি যে, পিতৃদেব যে পারিবারিক বন্ধনে সকলকে বাঁধিয়া ছিলেন, ভগবানের রূপায় তাহা অটুট আছে। পিতৃদেব যে ভার আমাদের কাকাবাবুর হস্তে দিয়াছিলেন—দুর্দল হস্তে দে ভার পড়ে নাই। আত্মীয় স্বজন বহু বাক্যবিশ্রিত জন সকলকেই একত্র করিয়া রাখাই তাঁহার জীবনের কাজ। বিভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করা সত্ত্বেও পিতৃদেব ও কাকাবাবুর মধ্যে প্রেম চিরকাল অচ্ছেদ্য ছিল এবং আমরাও চিরকাল সকলে এক পরিবারে সমভাবে প্রতিপালিত হইয়াছি, এখনও হইতেছি।

পিতৃদেব জগজ্জনীর শান্তিময় ক্রোড়ে চিরশান্তি লাভ করুন এবং আমরা তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ অনুসারে যেন জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারি, করুণাময় পরম পিতার নিকট সেই আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

ভাগ্যহীন

১২শে অক্টোবর, ১৯৩৩।

নির্মল রায়।

## সংবাদ।

জন্মদিন—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২৮নং জুগীপাড়া বেনে, ডাক্তার অমূলচন্দ্র মিত্রের সহধর্মিণীর জন্মদিনে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন।

গত ২৮শে অক্টোবর, কলুটোলার কৃষ্ণভবনে শ্রীযুক্ত কুমুদ বিহারী সেনের জন্মদিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র ওহ উপাসনা করেন।

জাতকর্মা—গত ৫ই নবেম্বর, ১২৮নং হারিশন রোডে, মারোয়াড়ী হাসপাতালে, রায় সাহেব ডাঃ প্রবোধচন্দ্র রায়ের দৌহিত্র, ডাঃ শরচ্চন্দ্র নন্দীর নবম্মাত পিতৃপুত্রের শুভজাতকর্মা-

মুঠানে তাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। শিশুটী গত ৬ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে। এই উপলক্ষে প্রবোধবাবু পাচার-ভাণ্ডারে ৫ টাকা ও অনাথাশ্রমে ৫ টাকা দান করিয়াছেন। ভগবান্ শিশুকে ও তাহার পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

নামকরণ—বিগত ১৮ই অক্টোবর, বুধবার প্রাতে, হাওড়ায় ২৮নং নরসিংচ দত্ত রোডে, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার দাসের দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ নবসংহিতাহুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। তাই অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। দ্বিতীয় পুত্র অরুণকুমার ও কনিষ্ঠ পুত্র সুশান্তকুমার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মা বিধানজননী শিশুদ্বিগকে ও তাহাদের পিতামাতাকে আশীর্বাদ করুন।

পারলৌকিক—বাগনান, চন্দ্রপুর গ্রামে, স্বর্গীয় ভ্রাতা শশিভূষণ চক্রবর্তীর দৌহিত্র এবং শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান্ বাচু সামান্ত্র জরে আকস্মিক ভাবে পরম জননীর কোড়ে আরোহণ করিয়াছে। তাহার আত্মার কল্যাণার্থ এবং শোকসন্তপ্ত পিতামাতা এবং পরিজনগণের সাঙ্ঘন্যের জন্ত, গত ২৯শে অক্টোবর, বাগনানে তাই প্রিয়নাথ মল্লিক বিশেষ উপাসনা করেন এবং স্থানীয় সকল পরিবার যোগদান করেন।

আলবার্ট কলেজের ভূতপূর্ব ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় গত শারদীয় পূর্ণিমা-তিথিতে স্বর্গারোহণ করেন। গত ১লা কার্তিক তাঁর আদ্যশ্রাদ্ধমুঠানে শ্রদ্ধের কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার উভয়ে আচার্য্যের কার্য্য করেন। রায় মহাশয়ের মৃত্যুর দশ দিন পরে তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কুমারীরও আটটা সন্তান ও স্বামীকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ডাঃ প্রসন্নকুমার মজুমদার সতীক রোগে শোকে দুঃখ পরিবারের সর্ব্বতোভাবে অক্লান্ত সেবা করিয়া যত্ন হইয়াছেন। ভগবান্ শোকাক্ত প্রাণে শান্তি ও সাঙ্ঘনা বিধান করুন।

শতবার্ষিকী—গত ২৯শে আশ্বিন (১৫ই অক্টোবর), এলাহাবাদে, মহিলা বিদ্যাপাঠ কলে, বাণীমন্দিরের আহকুলো, জাতীয়তার আদিশুরু যুগমানব রাজা রামমোহন রায়ের স্বর্গারোহণের শতবার্ষিক উৎসব বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ভূতপূর্ব জজ শ্রীযুক্ত জানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। “প্রবাসী”-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অজ্ঞাত ভদ্রমহোদয়গণ বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন। জানবাবুর সুন্দর অভিভাবণী ক্রমে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়।

প্রথম সাংস্ফরিক—এক বৎসর পূর্ণ হইল, আচার্য্যদেব কন্যা মহারাণী সুনীতি দেবী স্বধামে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের প্রথম সাংস্ফরিক সম্পাদনের জন্ত, শ্রীদয়বায়ের সম্পাদক, উপাসক মণ্ডলীর সম্পাদক এবং আচার্য্যপরিবারের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র মেনের নাম স্বাক্ষরে নিমন্ত্রণপত্র

বাতির করিয়া, উপাসকমণ্ডলীকে এবং মহারাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং অনুষ্ঠানটী সুন্দররূপে সম্পাদনের নিমিত্ত ভ্রাতা নির্মলচন্দ্র বিশেষ আয়োজন করেন। নবদেবালয়ের রোয়াকে উপাসনার মণ্ডপ বাঁধিয়া, ১০ই নবেম্বর, প্রাতে ৭টাের সময় এটখানেই উপাসনা হয়। তাই গোপালচন্দ্র গুপ্ত উদ্বোধন ও প্রার্থনা করেন। তাই প্রিয়নাথ আরাধনা ও শান্তিবাচন উচ্চারণ করেন। তাই অক্ষয়কুমার শাস্ত্র পাঠ ও বাখ্যা এবং আচার্য্যদেবের প্রার্থনা আবৃত্তি করেন এবং বিধানমুরলী সত্যোক্তনাথ দত্ত সংগীত করেন। সমস্ত উপাসনাটী অতি সুন্দর ও গস্তীরভাবে সম্পন্ন হয়। উপাসনান্তে সমাগত তাই ভগ্নদ্বিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। সন্ধ্যার পর প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য অতি সুন্দর সংকীর্ত্তন করিয়া শ্রেষ্ঠত্বস্বন্দকে মোহিত করেন। ১২ই ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে, সামাজিক উপাসনার তাই প্রিয়নাথ তাঁহার সুন্দর জীবন বিবৃত করেন।

১০ই নভেম্বর, রাঁচি তৃপ্তিকুটীরেও, সংঘভগিনী স্বর্গীরা মহারাণী সুনীতি দেবীর প্রথম সাংস্ফরিক দিন স্বরণে, শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্র ও শ্রীমতী নিয়লা বসু মণ্ডলীর সহিত যোগ রক্ষা করিয়া, প্রাতে ৭টাের সময় মিলিত ভাবে উপাসনা করিয়াছেন। বৈকালে সুবর্ণরেখা নদীতীরে যাত্রা করা হয়।

অদ্য পাটনার, ৪নং মাদ্রালস্ রোডে, শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদারের গৃহেও, পারিবারিক উপাসনার নবীন্য মীরা মহারাণী সুনীতি দেবীর পবিত্র স্মৃতি স্বরণ করা হয়। গৌরীবাবু উপাসনা করেন, শ্রীমতী সুনীতি মজুমদার প্রার্থনা করেন। কুচবিহারেও সাংস্ফরিক অনুষ্ঠান সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার বিবরণ হস্তগত হইলে, আগামীবারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

সাংস্ফরিক—গত ২৯শে অক্টোবর, কলুটোলার, কৃষ্ণ-ভবনে, স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেনের সধর্ম্মাঙ্গণীর স্বর্গারোহণের সাংস্ফরিক তাই গোপালচন্দ্র গুপ্ত উপাসনা করেন।

গত ২৬শে অক্টোবর, মুন্সেরে স্বর্গীয় শ্রদ্ধেয় শশিভূষণ মল্লিকের সাংস্ফরিক উপলক্ষে, তাঁর মধ্যমা কন্যা লেডি ডাক্তার কুমারী শান্তিপ্রভাও প্রবাসভবনে বিশেষ উপাসনা তাই অখিলচন্দ্র রায় কর্তৃক সম্পন্ন হয়। শান্তিপ্রভা এই উপলক্ষে মুন্সের সমাজে ৪ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ৩০শে অক্টোবর, ৭৬নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে, স্বর্গীয় রামেশ্বর দাসের সাংস্ফরিক, তাই প্রিয়নাথ মল্লিক উপাসনা করেন। পুত্র শ্রীযুক্ত স্বপকাশচন্দ্র দাস প্রার্থনা করেন এবং শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র দাস পাচারভাণ্ডারে ২ টাকা দান করেন।

গত ৫ই নবেম্বর, ৭৮১ হারিশন রোডে, শ্রীযুক্ত নীতলাল ঘোষের গৃহে, তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় অমৃতলাল ঘোষের সাংস্ফরিক তাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন।



চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এলাহাবাদপ্রবাসী আমাদের প্রকৃত উপকারী প্রবীণ বন্ধু শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও অর্থসাহায্যে সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গগত প্রেরিত ভাই ত্রৈলোক্যানাথ সান্নাালের রচিত সঙ্গীতগুলি একত্রে “চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী” নামে মুদ্রিত হইতেছে। আগামী মাঘোৎসবের মধ্যেই ইহা প্রকাশিত হইবে, আশা করা যায়। নববিধান-সাহিত্যে ভক্তিরসপূর্ণ, সাধনপথে সহায় চিরঞ্জীব-সঙ্গীতগুলি অমূল্য সম্পদ। এই অমূল্য সম্পদ সকলের হাতে দিবার জন্য প্রকৃত জ্ঞানবাবু যে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য তিনি আমাদের সকলেরই ধন্যবাদ।

## ব্রহ্মানন্দ-মহোৎসব।

১৯শে নবেম্বর হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত বিশেষ ভাবে সাধন ভজন করিয়া, নববিধান জীবনে এবং চরিত্রে সংক্রামিত হইতে দেওয়া অতি সুন্দর প্রস্তাব। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে সাধনার্থীর বাহা বাহা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে মোটামুটি দুই একটি বিষয়ের আলোচনা করা কর্তব্য মনে হয়। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আশার চন্দ্র। বর্তমান যুগে মনুষ্য-সন্তান চারদিকে জড়বাদ, ইঞ্জিয়পচারগতা, অহংকার ও জ্ঞানভি-মানের মধ্যে স্থিতি করিয়া, ক্লিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মধ্যানের পরিচয় হইয়া ব্রহ্মানন্দরূপ আত্মদান করিতে পারে, কেশবচন্দ্র তাহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্তব্ধতা তাহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের মাঝখানে, তাহার জীবন ও চরিত্রের বাহা বাহা নববিধান-সাধকের সম্পূর্ণ পথপ্রদর্শক স্বয়ং সমুপস্থিত করেন, তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই রূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে। যথা :—ব্রহ্মানন্দজীবনের তিনটি বিশেষ ভাগ—(১ম) স্মরণীয়, (২য়) গ্রহণীয়, (৩য়) সাধনীয়; এই তিনটি পরস্পর আবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্বন্ধ। ব্রহ্মকৃপার বাহা স্মরণ করা যায়, তাহাই তৎকৃপার গ্রহণ করিতে অর্থাৎ জীবনে আয়ত্ত করিতে আগ্রহ হয়। তৎকৃপার সেই আগ্রহ বুদ্ধিশক্তি হইয়া তাহা উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণাদি যোগে সাধন করিতে প্রবৃত্ত জন্মে। এই প্রবৃত্তির মূলে সাধক ব্রহ্মকৃপা দেখিতে পান। একত্র বলিতে বাধ্য হইতেছি, এই যে ১৯শে নবেম্বর হইতে ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত বিশেষ ভাবে সাধন ভজনের প্রস্তাব, এ প্রস্তাব ব্রহ্মকৃপামূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আশার চন্দ্র কেশবচন্দ্রের জীবন ও চরিত্রের কি কি আশাদের স্মরণীয়, গ্রহণীয় ও সাধনীয়, অগ্রে তাহা আলোচনা করা যাইতেছে।

১। স্মরণীয়—“কেশব-চরিত্র, পরম পবিত্র, মুর্তিমান নব-বিধান।”

(ক) জ্ঞানে প্রবীণ, (খ) যোগে শান্ত, (গ) তর্কে উৎসাহী ভীষ্ম, (ঘ) প্রেমে মত্ত মাতঙ্গের প্রায়। অর্থাৎ (ক) ব্রহ্মজ্ঞান, (খ) ব্রহ্মধ্যান (যোগ), (গ) ব্রহ্মানন্দরূপান।

(ক) ব্রহ্মজ্ঞান—হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট, ইসলাম প্রভৃতি সমস্ত

ধর্মশাস্ত্রে সমাদর।

(খ) ব্রহ্মধ্যান—একতরী লইয়া নির্জনে গৃহে, বাগানে, সাধনকাননে, দার্জিলিং, নারিতাল এবং সিমলা পাহাড়ে ধ্যানের সময়।

(গ) ব্রহ্মানন্দরূপান—উপাসনা, নামসাধন, সঙ্গতসভা, উৎসব ও কীর্তন।

২। গ্রহণীয়—(ক) অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা, বৈরাগ্য, শিষ্য-প্রকৃতি। (খ) ব্রহ্মদর্শন, প্রেম, পবিত্রতা ও উদারতা।

(গ) ব্রহ্মবাণী-প্রবণ এবং পবিত্রাখ্যা দ্বারা চালিত হওয়া।

৩। সাধনীয়—সাধন সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। কেন না, উহা ব্যক্তিগত এবং এক এক স্থানের মণ্ডলীগত। পবিত্রাখ্যার আলোকে উহা ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণীয় এবং যেখানে বাহারা একত্র উপাসনা এবং সাধন ভজন করেন, তাহারাও সেই আলোকে সাধন অবলম্বন করিবেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র সেন।

## ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব।

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পঞ্চবতিতম শুভ জন্মোৎসব উপলক্ষে, আগামী ১৯শে নভেম্বর, রবিবার, প্রাতে ১১টিকার সময়, কমলকুটারস্থ নবদেবালয়ে (৭৮বি আপার সাকুলার বোড) বিশেষ উপাসনা হইবে। মাননীয় মহারাণী শ্রীমতী সূচ্য দেবী উপাসনা করিবেন। অপরায় ৪৮টিকার সময় নবদেবালয়-প্রাঙ্গণে কল্লতরুর অশুষ্ঠান হইবে, তৎপর সন্ধ্যা ৬ টিকার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রকৃত ভাই শ্রীনাথ মল্লিক উপাসনা করিবেন। সকলেব মপরিবারে ও সম্বন্ধেব যোগদান বাঞ্ছনীয়।

আগামী ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪১, আচার্য্যদেবের পঞ্চাশতম স্বর্গারোহণ-সাহস্রমরিক দিন। এই জন্মোৎসব হইতে স্বর্গ-রোহণের সাহস্রমরিক পর্য্যন্ত, বিশেষভাবে তাহার জীবন-গ্রহণার্থ, রবিবার বাতীত ২০শে নভেম্বর হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৩৮টিকার সময়, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আলোচনা, পাঠ ও প্রসঙ্গাদি হইবে। সকলে ইহাতেও যোগদান করেন, প্রার্থনা। যিনি যোগদানে অসমর্থ হইলে, য য গৃহে এইভাবে পাঠ প্রসঙ্গাদি করেন, বিনীত অনুরোধ।

বিনীত—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির,  
৮৯, বেহুবাঝার স্ট্রীট,  
কলিকাতা;  
১৪ই নভেম্বর, ১৯৪০।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র ঘোষ  
সম্পাদক।

Edited on behalf of the Apostolic Durbar New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyanath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—৩৯ নং রাসবিহারী মজুমদার স্ট্রীট, “নববিধান-প্রেসে,”  
শ্রীপরিভোজ-বোম্ব কল্লক মন্দির অগ্রহায়ণ রচিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

অবিশালনিবং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।

চেতঃ স্নিগ্ধলভ্যীর্বা সত্যং শাস্ত্রমনবধরম্॥

বিশালো ধর্মবৃক্ষঃ হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।

স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈবেবং প্রকীর্ত্যতে ॥

৬৮ ভাগ।

২২শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

2nd. December, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা :

হে আমাদের পরম পিতা, পরমা জননী! তুমি ক্রমাগত আজ একজন, কাল আর একজন করিয়া আমাদের অতি আদরের, অতি প্রিয় এবং প্রিয়তম ভাই ভগ্নীদিগকে ইহলোক হইতে পরলোকে লইয়া যাইতেছ। পরলোকে ক্রমাগত আমাদের পরিচয়ের ভূমি, সাধনের ভূমি, পিয়ভূমি, আপনার অতি আদরের ভূমি করিয়া, আমাদের মধ্যে পরলোকসাধন যেন একটা বিশেষ সাধন করিয়া তুলিতেছ। কিন্তু পরলোকের কথা বলিতে, পরলোক বিষয়ে কিছু শুনিতে, পরলোক ভাবিতে এখনও কি আমাদের মধ্যে অস্বাভাবিক ভয় ভীতি ও দূরত্বের ভাব মনে হয় না? পরলোক কত উচ্চ, কত অপরিচিত, তাহাতে মনে হয়ই; অপরদিকে পরলোক ভয় ও ভীতির স্থান, এ ভাবও আমাদের প্রকৃতির অস্থি মজ্জার ভিতরে রহিয়াছে। তবে পরলোকে যখন আমাদের এত গুরুজন প্রিয়জন চলিয়া যাইতেছেন, আমাদের গুরুজন তোমার আশ্রয় আসিলেই যাইতে হইবে, নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, সে অবস্থায় আমাদের অন্তর হইতে পরলোক সম্পর্কে সকল প্রকার ভয়ভীতি, দূরত্ব, পরত্ব, এ সমস্ত দূর না হইলে চলিবে কেন? এ সব সহজে দূর

হয় কি করিয়া, বল। তুমি আমাদের পরম পিতা মাতা, সর্ববাপেক্ষা স্নেহদ বন্ধু। আমরা যত দূর তোমাকে চিনিয়াছি, জানিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, তোমার মত আপনার জন, প্রিয়জন আর আমাদের কেহই নাই। আবার তুমি আমাদের পরম স্থান ও অতি প্রিয়স্থান। উপাসনাদি-যোগে যখন তোমাতে সজ্ঞানে সচেতনে স্থিতি করি, সে অবস্থার আয় স্নেহের অবস্থা, সৌভাগ্যের অবস্থা আমাদের আর ত কিছু মনে হয় না। সে অবস্থায় এখনও দীর্ঘ সময় সজ্ঞানে তোমাতে বাস করিতে পারিতেছি না, সে সৌভাগ্যের অবস্থা এখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতেছেন, ইহাই আমাদের সম্বন্ধে অস্বাভাবিকভাবে বিধর। প্রকৃত পক্ষে তোমাকে সাধন, আর পরলোকসাধন একই; তোমাতে সজ্ঞানে সচেতনে স্থিতি, আর পরলোকে বাস একই। তোমাকে গভীররূপে উজ্জলরূপে সাধন এখনও তেমন করিয়া আমাদের হইতেছে না, তোমাতে সজ্ঞানে সচেতনে দীর্ঘকাল স্থিতির সাধনও তেমন করিয়া আমাদের হয় নাই; তাই আমাদের পরলোকের জ্ঞান উজ্জল হইতেছে না, পরলোকসাধন গভীর হইতেছেন, পরলোক-সম্পর্কে ভয়ভীতির ভাব, দূরত্বের ভাব পরিয়া দূর হইতেছে না। যখন তোমাকে সাধন তোমাতে সজ্ঞানে বাস করি, তখন ইহকালের সকল ভুলিতে

হয়, আমাদের শরীর পণ্যস্থ ভুলিয়া যাইতে হয়। যজ্ঞতঃ বাহিরের স্থূল জগতের সকলই তাগ করিয়া, তোমাতে নিরাবিল যোগে স্থিতি, সেই তো পরলোকে বাস ও পরলোকে স্থিতি। এক্ষেতে বাস, ত্র্যক্ষগত জীবনই কি আমাদের স্বর্গবাস এবং স্বর্গীয় জীবন, পরলোকের অমৃত জীবন নয়? এই স্বর্গীয় জীবনে যখন তোমাতে বাসের অবস্থা উজ্জ্বল হয়, এবং তোমাতে অশরীরী রাজ্যে আমাদের গুরুজন প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ও মিলনে স্থিতির অধিকার লাভ হয়, তখন আমাদের আরও কত সৌভাগ্য, কত আনন্দ, কত সন্তোষ হয়। তখন কোথায় ত্রুটি, কোথায় ভীতি, কোথায় দূরত্ব পরলোক বিষয়ে? পরলোকসাধনের সঙ্গে সঙ্গে, যদি তুমি কৃপা করিয়া এবার ত্র্যক্ষানন্দের জন্মোৎসব ও স্বর্গগমনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পাঠ ও শ্রবণাদি যোগে ত্র্যক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন ও ধর্ম সাধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলে, তবে এ সময় তোমার কৃপার অবতরণ আমাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ভিক্ষা করি। আমাদের মধ্যে তোমার কৃপার অবতরণে ত্র্যক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবন ও ধর্মসাধন, পরলোকসাধন, তোমাতে স্থিতি ও তোমাগত জীবন-সাধন, পরলোকে আমাদের সকল গুরুজন প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনসাধন স্বাভাবিক হইবে, আনন্দের ও সন্তোষের ব্যাপার হইবে, এই আশা করিয়া তব পদে বার বার প্রণাম করি।

শান্তিঃ!

শান্তিঃ!

শান্তিঃ!

## জন্মোৎসবের সার্থকতা ।

ত্র্যক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব বৎসরের পর বৎসর হইতেছে, এই জন্মোৎসবের সার্থকতা কান্নাহার জীবনে কতদূর হইয়াছে ও হইতেছে, এই জন্মোৎসবের সার্থকতা আমাদের আত্মিক জীবনে বস্তুতঃ কিরূপে সম্ভবে, এ সময় চিন্তা ও আলোচনা করিবার বিষয়। আমরা ত্র্যক্ষানন্দের জীবন ও জীবনের সাধনা পবিত্রাক্ষর আলোক ও প্রেরণায় আমাদের প্রতি জীবনে বহুদূর গ্রহণ ও আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই পরিমাণেই সত্যতঃ আমরা তাঁহাকে বুঝিয়াছি এবং সেই পরিমাণেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই পরিমাণেই আমাদের জীবনে তাঁহার আদর সম্মান বস্তুতঃ আদর সম্মান, সেই পরিমাণেই তিনি

আমাদের, আমরা তাঁহার, তদতিরিক্ত নহে। গ্রন্থানি-পাঠ ও শ্রবণে তাঁহাকে আমরা বহুই কেন বুঝিতে চাঁ না করি, এবং এরূপ পাঠ শ্রবণের যোগে বহুই কেন তাঁহাকে অর্দর সম্মান না করি, সে আদর সম্মানের মূল্য অতি সামান্য। এরূপ আদর সম্মানে তিনিও আমাদেরকে তেমন অন্তরঙ্গ বোধিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না, আমরাও তাঁহাকে তেমন অন্তরঙ্গ করিয়া ধন্য হইতে পারি না। ত্র্যক্ষানন্দের ধর্মজীবন যে পরিমাণে আমরা আধ্যাত্মিক ভাবে আমাদের নিজ নিজ জীবনে সাধন ও গ্রহণ করিতে পারিয়াছি, সেই পরিমাণেই তাঁহার জীবন লইয়া তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের উৎসবানন্দ; এবং সেই পরিমাণেই তাঁহার জন্মোৎসবের সার্থকতা, সার্থকতা আমাদের জীবনের পক্ষে আমরা গণ্য করিব।

ত্র্যক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্মজীবন বিচিত্র ভাবের বিচিত্র সাধনার বিরাট জীবন। সে জীবনের অতি অল্পই আমাদের মত সামান্য জীবনে এ পর্যন্ত সাধন করিতে, গ্রহণ করিতে ও ধারণ করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। সে জীবনের সঙ্গে আমাদের ধর্মজীবনের তুলনা করিলে বলিতে হয়, সাধনার বেলাভূমিতে আমরা বিচরণ করিতেছি, আমাদের পুরোত্তরে অপার, অনধিগম্য, ত্র্যক্ষানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনরূপ সাধনসমুদ্র। স্থিতি করিতেছে। বাহা হউক, সে জীবনের কোন দিক আমরা কতদূর গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা যদি এ সময় বিশেষ আলোচনার ভিত্তি দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের কল্যাণ হইতে পারে। তাঁহার বিরাট জীবনের কয়টি বিষয় অবলম্বন করিয়া এরূপ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভবে? আমরা এ প্রবন্ধে তাঁহার ধর্মজীবনের ত্রৈলোক্য সম্পদগুলির অল্প কয়েকটি বিষয় লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১। “বিশ্বাসে ধর্মমূলংহি”। বিশ্বাসই ধর্মজীবনের মূল। প্রথমে তাঁহার জীবনের বিশ্বাস, নবযুগের নব বিশ্বাস লইয়া আলোচনা করি। “Man of Faith” বিশ্বাসাত্মা বলিয়া তিনি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত ও পরিচিত। তাঁহার বিশ্বাস জীবন্ত বিশ্বাস। Living faith in living God. তাঁর জীবনের বিশ্বাস নবযুগের নব বিশ্বাস। নব বিশ্বাস কেন বলি? ধর্মরাজ্যে বিশ্বাসের দুইটা ধারা আমরা দেখিতে পাই। আমাদের ভারতের ঋষিজীবনের বিশ্বাস, ভারতীয় সাধুতন্ত্র যোগীদিগের

বিশ্বাস প্রথমতঃ ঈশ্বরের দর্শন ও সাক্ষাৎ অনুভূতি-মূলক। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মানুভূতি তাঁহাদের বিশ্বাসের ভূমি। বিদেশী সাধু মহাজন এত্ৰাহিম, মুসা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির জীবনের বিশ্বাস প্রথমতঃ ঈশ্বরের বাণীশ্রবণ-মূলক। ঈশ্বরের বাণী সেই বিশ্বাসের ভিত্তি-ভূমি। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনে ভারতীয় ঋষি, তত্ত্ব বোগীদিগের ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মানুভূতি এবং মুসা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির জীবনের ব্রহ্মবাণীশ্রবণ, এ উভয়ই সমভাবে গৃহীত ও জীবন্ত ভাবে মুক্তিমান। বিশ্বাসের এই দুইটা ভিত্তিভূমি কেশবচন্দ্রে মিলিত বলিয়া, তাঁহার জীবনের বিশ্বাস মনুষ্যগণের নব বিশ্বাস এবং পূর্ণতম বিশ্বাস। Perception ও hearing দুইটা পক্ষপুটে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বিশ্বাসের উচ্চ-কাশে কতই উড্ডীয়মান হইতেন।

ব্রহ্মানুভূতি এবং ব্রহ্মবাণীশ্রবণ তাঁহার বিশ্বাসের আশ্রয় ভূমি এবং পোষণ সামগ্রী, তাঁহার নিজের বাণী তাহার সাক্ষ্যদান করে। প্রার্থনায় তাঁহার ধর্মজীবনের আরম্ভ, প্রার্থনায় তাঁহার ধর্মজীবনের ক্রমোন্নতি ও উচ্চ পরিণতি, সকলেই জানেন। প্রার্থনার ফল বাণীশ্রবণে তাঁহার বিশ্বাস পরিপুষ্ট হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি পরি-ত্ৰাণপ্রাপ্ত জীবন্ত বিশ্বাসের লক্ষণ বলিতে গিয়া বলিলেন—  
“But very few have faith in God in the true sense of the term, namely, spiritual perception. Do we vividly see His reality? Do we feel His awful presence? Unless we do so, how can we be said to have faith in Him?” আমরা সত্য ঈশ্বরের সত্য দর্শন, অনুভূতি ও বাণীশ্রবণ-যোগে কে কতদূর জীবনের বিশ্বাসকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছি, তাহা এ সময় জীবনের কঠি পাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখি, বুদ্ধি এবং চেতনা লাভ করি, কে কতদূর কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস-ধনে ধনী হইয়াছি।

দ্বিতীয়—কেশবচন্দ্রের জীবনের ‘ভক্তি’। ভারতের প্রাচীন তত্ত্বশাস্ত্র ভক্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিলেন, প্রধানতঃ ভক্তি দুই প্রকার, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও রাগাশুগা ভক্তি। তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া জীবনে যে ভক্তি লাভ হয়, তাহাকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলে; আর সত্য, শিব, সুন্দরের সাক্ষাৎ অনুভূতি

ও দর্শনের মধুরতা-মূলক, তাঁহার রসাল নামগুণাদির কীর্্ত্তনমূলক অনুরাগরঞ্জিত ভক্তিকে রাগাশুগা ভক্তি বলে। আমরা সংক্ষেপে ভক্তির এই দুইটা দিক উল্লেখ করিলাম। কেশব বিজ্ঞানাত্মা কেশব। তাঁহার জীবনের ধর্ম Science of religion। বাহ্য বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, তাহা তাঁহার ধর্ম নহে। তাঁহার জীবনের ব্রহ্ম-দর্শন, ব্রহ্মবাণীশ্রবণ সকলই বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। এরূপ জীবনের ভক্তি তো জ্ঞানমিশ্রা হইবেই। আবার সত্য শিব সুন্দর যিনি, তিনি হইয়াছেন কেশবচন্দ্রের ভক্তির পাত্র। হৃদয়বিহারী প্রেমধন শ্রীহরিরূপে এবং সর্ব-শেষে অনন্ত স্নেহরূপা ভুবনমোহিনী জননীরূপে কেশব-জীবনে সেই সত্য শিব সুন্দরের ঘনীভূত মধুর প্রকাশ। তাই কেশবচন্দ্রের জীবনে রাগাশুগা ভক্তির উচ্চ স্ফূরণ আমরা প্রত্যক্ষ করি। অতএব জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও রাগা-শুগা ভক্তির মিলনে কেশবজীবনের নবভক্তি। এই নব ভক্তি আমাদের কাহার জীবনে কতটুকু স্ফূরণ হইয়াছে, এ সময় নিজ নিজ জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি।

তৃতীয়—তাঁহার জীবনের বিবেক ও বৈরাগ্য। প্রাচীন কালে জনক ঋষি সংসারবাসী হইয়াও সংসার-নির্লিপ্ত ঋষিজীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু সে যুগ আর বর্তমান যুগ তো এক নয়। এ যুগে বাহ্য সভ্যতার ষোল আনা আয়োজনের মধ্যে সংসারীর সাজে সজ্জিত থাকিয়া, অন্তরে তীত্র বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা কত কঠিন ব্যাপার। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেই অগ্নিময় বৈরাগ্যে পরিপুষ্ট হইয়া, নির্মল বিবেকবাণীর অনুসরণে জীবন্ত ঈশ্বর-প্রেরণায় জীবনের বিচিত্র কঠিন কর্তব্য সকল সম্পন্ন করিলেন। পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় জীবনে নৈতিক উচ্চ কর্তব্যের এমন এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গেলেন, যাহা ভবিষ্যতে এ দেশে এক যুগান্তর আনয়ন করিবে। এ সময় জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জীবনের ধর্ম এ বিষয়ে কত-টুকু এ পর্য্যন্ত সাধন ও পালন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

চতুর্থ—কেশবচন্দ্রের জীবনের শিষ্যতাব। অদ্বান্ত বিষয়ে তাঁহার জীবন যদি নূতন হয়, শিষ্যভাবে তাঁহার জীবন হৃদয়ভেদী নূতন। ধর্মক্ষেত্রে শিষ্য সকলেই, কিন্তু কেশবচন্দ্র মহাশিষ্য। শ্রীগোবিন্দ নাকি চৌবটি স্থানে গুরু-করণ করিয়াছিলেন। যে জীবনের আরম্ভে গুরু নাই, গ্রন্থ নাই, সেই কেশবচন্দ্রের জীবনের ক্রমবিকাশ ও ক্রম-

প্রকাশে, শুধু অতীতের বর্তমানের ও স্বদেশের বিদেশের সাধু মহাজনগণ গুরু নন, ছোট বড় যে কোন ব্যক্তিই তাঁহার গুরু হইলেন। তিনি বলিতেন, “আমার হৃদয় স্রুটি কালজের স্থায়, কেহ আমার নিকট আসিয়া কিছু না দিয়ে যাইতে পারেন না, আমি প্রতিজ্ঞেনের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবই লইব।” বিচারপ্রধান আমাদের এই জীবনে আমরা কতটুকু এই মহাশিষ্যতাবসাধনে কৃতকার্য হইয়াছি, এ সময় জীবনের হিসাব মিলাইয়া দেখি।

পঞ্চমতঃ—তাঁহার ধর্ম-জীবনে মহা সন্মিলন। সন্মিলনের ভাব পূর্ব পূর্ব কোন কোন মহাপুরুষের জীবনেও ছিল। কিন্তু স্বর্গ হইতে কেশবচন্দ্র যে সন্মিলন-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, যে সন্মিলন সাধন করিয়া গেলেন, তাঁহার তুলনা কোথায়? মহাসন্মিলন সাধন, মহাসন্মিলনের প্রভাব বিস্তার যদি তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব হয়, তবে সে বিশেষত্বের কতটুকু আমাদের জীবনকে বিশেষত্ব দান করিতেছে, এ সময় ভাবিয়া দেখি।

এই সকল সম্পদের যতটুকু আমরা আমাদের আত্মিক জীবনে গ্রহণ করিয়াছি, আত্মস্থ করিয়াছি, সেই পরিমাণে আমরা ধন্য হইয়াছি। সেই সাধন-সম্পদের ভিতর দিয়া এ সময় শ্রীকেশবচন্দ্রকে আমরা আগে লইয়া ধন্য, এবং আমাদের জীবনলক্ষ্য সেই সাধনসম্পদের পরিমাণেই আমাদের জীবনে শ্রীকেশবচন্দ্রের জন্মোৎসবের সার্থকতা।

## ধর্মতত্ত্ব।

### নববিধানে নবজন্ম।

নববিধান বিজ্ঞানের বিধান। নববিধান নব নব জন্ম, নব নব জীবন দিবার জন্তই অবতীর্ণ। দেহপূরবাসে জন্ম মামুখের প্রথম জন্ম। অধ্যাত্ম জীবনে জন্ম দ্বিতীয় জন্ম। শাস্ত্রে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে, দীক্ষা-লাভে দ্বিতীয় জন্ম প্রাপ্ত হয়। নববিধান এই অধ্যাত্ম জন্ম বা দ্বিতীয় দিবার জন্তই অবতীর্ণ; স্ততএব নববিধানে বিশ্বাসই নব জন্ম বা দ্বিজন্মলাভ।

### অমরত্ব।

দেহী-নাঞেই মৃত্যুপ্রাপ্তে পতিত হইলে, অমরলোকে গমন করে বা অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু নববিধানবিশ্বাসীকে দেহের

মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি দেহে থাকিয়াই অদেহী হইতে পারেন, ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকে বাস করিতে পারেন। উপাসনা-বলে, প্রার্থনা-বলে, যোগ-বলে আমরা অনায়াসেই দেহযুক্ত হইয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হইতে পারি। এই জন্তই ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনা করিলেন, “এই বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে শরীরবিহীন হইয়া যাই। হে আত্মা তোমার জীবন বৃদ্ধি হউক। তুমি অশরীরী হও। এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে তুমি শরীরবিহীন হও। যারা অমর, তারা আর মৃত্যুর দিন গণনা করে না। স্বর্গ তাদের চক্ষে, স্বর্গ তাদের বক্ষে, স্বর্গ তাদের হৃদয়ে। আমার মৃত্যু নাই।” এই ত অমরত্ব।

### শ্রীমহোন্মদের দিন।

“লা ইলাহি এল্লাহ ইরে মোহম্মদ রসুলারা” ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বর নাই, মোহম্মদ কেবল তাঁর প্রেরিত। ঈশ্বর এক অধিতী, পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষ যুগধর্মপ্রবর্তকগণ বলিয়া গিয়াছেন, আর কিছু বলেন নাই, নিজেদের সম্বন্ধে নির্দ্বন্দ্ব ছিলেন। তাঁর ফলে তাঁদের শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে ঈশ্বরবতার বা স্বরং ঈশ্বর বলিয়াই পূজা করিলেন। এমন কি, আমাদের চোখের সামনেই কত সাধুজন ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এসলামবাদিগণ এ জ্ঞাতিতে একেবারে না পড়েন, এই জন্তই মোহম্মদ আপ নাকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া চির প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। বাস্তবিক, বথার্থই তিনি প্রত্যাশিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন। ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বাণী শ্রবণ এবং তাঁহার প্রত্যাশিষ্ট ধর্ম প্রচার দ্বারা, যোর পৌত্তলিক পাশবশ্রদ্ধাতি কোরেশ ও পার্শ্বতা জাতিদিগকে এক ঈশ্বরের উপাসক ও এক জাতি করিতে যে মোহম্মদ প্রেরিত হইয়া-ছিলেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আরব-দেশীয় রাখাল ছেলে জীবন্ত ঈশ্বরারোপে আদিষ্ট না হইলে কি এমন উচ্চধর্ম অস্ত্র লোকদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়? তিনি এমনই ভাবে সাধারণ লোকদিগের মধ্যে অপৌত্তলিক সাধনা সঞ্চার করিলেন যে, পাছে তাঁর অনুবর্তিগণ মামুখের পূজা করিতে প্রলুব্ধ হন, সে জন্তে তাঁর ছবি পণ্যত্ব রাখিতে দেন নাই। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাদানের কোন বিশেষ অনুষ্ঠানও এতদিন ছিল না; এখন এই নবযুগধর্মবিধানের প্রভাবে তাঁর দিন স্মরণের জন্ত এক ইম-লামীর সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে সম-যোগে এই পবিত্র দিন স্মরণ করি এবং মহাপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি অর্পণ করি। তিনি যে একেশ্বরের নামে একজাতীয়তা, আমির ফকিরের সমযোগিতা, পূর্ব অপৌত্তলিকতা প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং বার বার নবজন্ম সাধনে নির্দ্বন্দ্ব রুতি শিক্ষাদান করিলেন, ইহা যেন অনুসরণ করিতে পারি।



## ক্রীড়া ও ক্রীকেশব।

পুরাতন ধর্মপুস্তকে আছে, সর্ব প্রথমে আদি মানব জন্ম লাভ করিলেন। তিনি পাপের প্রলোভনে প্রমুগ্ধ হইয়া পতিত হইলেন। তাই ব্রহ্মনন্দন জৈশা জন্মলাভ করিলেন, তাঁহার জন্মে প্রতি মানবের বিজয় লাভ হইল। মানব বর্গে পুনরুত্থান করিলেন। প্রতি জীবনে এই বিজয়লাভের পথ ক্রীড়া দেখাইলেন। কিন্তু কেশব ভাচাতে ভুট্ট হইলেন না, সপরিবারে সমলে বিজয় ও অমরত্বের সম্ভোগ, ইহাই নববিধানাচার্য্য ক্রীকেশবের জীবনাধর্ম।

## স্বয়ং হরি গুরু।

( গত ২২শে ভাদ্র, যুবকদিগের উৎসবে, আশ্বিনিটোলা নববিধান প্রকল্পনির্দেশ, তাঃ উদ্যোগসমূহ ঘোষণার উপদেশের সারাংশ )

ভগবান্ অম্বা আমাদিগকে যুবকদিগের উৎসবে আহ্বান করেছেন। কাতারা কাহার। এখানে আহ্বান পেয়েছেন? বাঁহারা যুবক, বাঁহাদের হৃদয় মনে উৎসাহের অগ্নি জ্বলিতেছে, বাঁহারা শক্তি ও সাহসের বর্ণে আবৃত হয়েছেন। বাঁহাদের আধ্যাত্মিক চক্ষুর দৃষ্টি এখনও প্রাচুর্যের মধ্যে এবং হৃদয়ের আলোকে ভগবানের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন—এরূপ আধ্যাত্মিক যুবকহৃদয়-সম্পন্নগণের আজ উৎসব। হে যুবক বন্ধুগণ, হে যুবক হৃদয়স্থিত বুদ্ধ সঞ্চকগণ, আপনাদের চরণে আজ গুই এই কথা নিবেদন করিতেছি।

পুরা কাল হইতে, স্মৃতির অতীত সময় হইতে আমাদের নিকট কত যোগ ধানের কথা, কত ভক্তি বিধানের তত্ত্ব ও জ্ঞানের তত্ত্ব শ্রোতের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ও আমাদের মনকে অতুল সম্পত্তিতে পূর্ণ করিতেছে। কত শাস্ত্রের কথা, কত স্মৃতি ও স্মৃতির কথা এবং মহাজন-বাক্য আমাদের আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার পূর্ণ করিয়া আসিতেছে। বর্তমানেও আমরা নববিধানে যোগ, ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ-কারী আচার্য্য হইতে এবং অজ্ঞাত সাধক ও গুরূগণ হইতে প্রাপ্ত অতুল সম্পত্তির ভোগের অধিকারী হইয়াছি। বলিতে গেলে, আমাদের সম্পত্তি বা inheritance প্রায় আকাশবিপুলসম। এসকল সম্পত্তি আমাদের মনোভাজ্য ও জ্ঞানভাজ্যের, ভক্তি ও প্রেমভাজ্যের কোবাগার পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এখন দিচ্চাস্য এই যে, অতুল সম্পত্তি কি আমাদিগকে তৃপ্তিমান করিয়াছে? না, ইহা আমরা বোম্বার দ্বারা বহন করিতেছি? জৈশপুত্র জৈশার সম্বন্ধে একটী গল্প আছে যে, কোনও এক সময় একজন বন্দী যুবা তাঁহার নিকট ধর্মশিক্ষার্থ হইয়া ধর্ম-সম্বন্ধে উপদেশ পাইতে গিয়াছিলেন। তিনি সম্পত্তি দ্বারা অনেক দান, ধ্যান ও ধর্মকর্ম করিয়াছেন; তাঁহার ধর্মকার্যের সম্পত্তিও বিপুল।

ক্রীড়া তাঁহাকে বলিলেন, তোমার সমস্ত ধর্ম সম্পত্তি ও বিপুল আধ্যাত্মিক কার্যের সম্পত্তি সমস্ত বিলাইয়া দিয়া এস—ধর্ম-শিক্ষা দিব।

আমরাও দেখিতেছি যে, inheritance হিসাবে আমরা অনেক আধ্যাত্মিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছি। আজ উৎসবের দিনে, আমাদের গুরু, শিক্ষাদাতা হরির নিকট আমরা আমাদের বিপুল আধ্যাত্মিক সম্পত্তি হাতে করিয়া ধর্মজিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল সহ জীবনবেদ, আচাৰ্য্যের উপদেশ ও সেবকের নিবেদনাদি বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়া আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আমরা সকলেই যুবকহৃদয়, এ সকল শাস্ত্র আমাদিগের কণ্ঠ্য। আমাদের উৎসাহের সীমা নাই, আমাদের চক্ষের জ্যোতি তীব্র, আমরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। তবু কাহাকে বলে, আমরা জানিতেছি না। আমরা মেধা-বলে আকাশবিপুল শাস্ত্র-সমূহ আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু তাই, মনোযোগ দিয়া শুধু, হরি কি বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, এ সব সম্পত্তি সমস্ত বিসর্জন দিয়া আসিতে হইবে। যাহা কিছু inherit করিয়াছি, সমস্ত বিলাইয়া দিতে হইবে। একেবারে রিক্তহস্ত, শূন্যহৃদয় হয়ে হরির দ্বারে তিথারী হতে হবে। নববিধানের এই অমুক্তা।

“সর্বধর্মাস্ত্য পরিভ্রাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং দ্বাং সর্বপাপেষু মোক্ষদ্ব্যামি মা শুচঃ”—গীতা

হরি বলেন, নববিধানে আমি তোদের প্রত্যেককে শিক্ষা দিতেছি, তোরা প্রত্যেকে আমার সম্মান। আমিই তোদের সম্পত্তি, শক্তি, ধর্ম—সমস্তই আমি। আমি নিজে তোমাদিগকে সমস্ত শিক্ষা দিব। নববিধানে যাহা কিছু inheritance তাই পাইয়াছ ও শিখিয়াছ, সমস্ত ভুলিয়া যাও। আমি স্বয়ং গুরু ও শিক্ষাদাতা। আমি অস্ত্র শিক্ষাদাতা সহিতে পারি না। আমি নিতা নতন করিয়া, আমার প্রত্যেক সম্মানের উপযোগী করিয়া, নতন নতন কথা এবং পুরাণে কথাকেও নতন করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকি। সম্মান, আমি তোমাকে যদি কোনও শাস্ত্রের মধ্যে লিয়া যাই, তবে আমি নিজেই সেই সব শাস্ত্রের টিকা ও ব্যাখ্যা তোমার নিকট করিব। অস্ত্র শিক্ষাদাতা আমি মানি না। আমি স্বয়ং শিক্ষাদাতা হইয়া সমস্ত নববিধান—এ, বি, সি, ডি, হইতে আরম্ভ করিয়া—নববিধানের সমস্ত শাস্ত্র, ব্যাখ্যান ও টিকা সহ, আমি তোমাদিগকে, তোমাদের হৃদয়ে যে আনার আলো প্রকাশিত করে রেখেছি, তাহার সাহায্যে শিক্ষা দিব। বৃদ্ধের নিকট তিনি একথা বলিলেন না। কেবল আধ্যাত্মিক যুবক বাঁহারা, তাঁহাদিগকেই তিনি একথা বলিতেছেন। আচার্য্য কেশব কি করিলেন? তাইগণ, স্মরণ কর। তিনি কোনও শাস্ত্রের দোহাই দিলেন না। কোনও অজ্ঞাত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন না। কেবল তাঁহার হৃদয়বিহারী কর্মের নিকট হৃদয় লুটাইয়া কাঁদিলেন, প্রার্থনা করিলেন, শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ

করিলেন। নববিধানের হরি, নববিধানের সকল শাস্ত্র, টীকা ও ব্যাখ্যান সহ, তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত করে দিলেন। যুবক বজ্রগণ, আপনারা কি মাঝের এ আছানো ভীত হইতেন? তাইগণ, ভয়ের কোনও কারণ নাই। ভীতুতা যুবকের লক্ষণ নহে। আপনাদের ও লক্ষণ হতে পারে না। উহা যুবকের লক্ষণ। আজ উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ করুন। হরির চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করুন। হরি উৎসাহ দিবেন, প্রণাম শিখাইবেন, সব করিবেন। এরূপ হলে আপনাদের হৃদয়ে দৈবী শক্তি প্রবাহিত হবে। আপনারা নববিধানের সমস্ত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, স্মৃতি, ঋতি ও বাণী, জীবনবেদ, আচার্যের উপদেশ ও সেবকের নিবেদন, হরির কথামৃত চাইতে লাভ করিবেন। কারণ হরিই বেদ, হরিই বেদান্ত, তিনিই আচাৰ্য্য ও সেবক এবং তিনিই জীবনবেদলেখক। হরি নিজেই আপনাদিগকে দীক্ষা দিলে আপনাদের হৃদয় মন, সমস্ত নববিধানশাস্ত্র দ্বারা পূর্ণ করে দিবেন। আর যদি inheritance-এর বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে চান—দেখিবেন শীঘ্রই উহার তার আর বহন করিতে পারিতেছেন না। আপনি পরিশ্রম করিয়া দৃঢ় ও বলিষ্ঠ হন নাই। অসময়ে অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক পানাহার করিয়া vital শক্তি নিখিল হইয়া গিয়াছে। আপনায় সম্ভ্রমে অতুল সম্পত্তি বিস্তৃত থাকিলেও, তাহাতে আপনার রুচি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহা পাক্তা ভাতের সামিল হইয়া বিবাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। উহা অগস্ত অগ্নিতে সিদ্ধ, আধ্যাত্মিক অগ্নিতে তৈয়ারী গরম ভাত নহে, বাহ্য আত্মা ও মনকে সরস, জীবন্ত ও fresh করিবে। আপনি আর সে সম্পত্তি হইতে কোনও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না।

—o—

## ব্যাকুল প্রার্থনা ও ঈশ্বরের কৃপা ।

জগতে মানবসত্তার প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই, এই দৃশ্যমান সৃষ্টির অন্তরালে যে শক্তি কাজ করছে, তাকে বিম্বিত অন্তরে মানব প্রণয়ন করেছে। অগ্নিময় সূর্য্যগোলক, শীতরশ্মি ও জ্যোৎস্নাময় চন্দ্রমা, প্রবল ঝড়াবৃষ্টি ও মহারবে বজ্রপাত, চক্ষু অন্ধকারী বিদ্যুৎ ও নয়নানন্দকর ইন্দ্রধনুস শোভা, উদ্ভাপাত ও সূর্য্যচন্দ্রের গ্রহণ প্রভৃতি বিশ্বরূপক ঘটনা এবং সর্বোপরি জগৎ ও মৃত্যুর রহস্য মানবচিত্তকে আন্দোলিত করেছে; এবং মানবের সমুদয় শক্তিকে বিফল ও অগ্রাহ্য করে যে শক্তি এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মিত করছে, তার প্রতি মানব ভীতিচিতে সম্মান প্রদর্শন করেছে ও তার করুণা ভিক্ষা করেছে। এই অজ্ঞাত শক্তির পরিচয়ের ফলে মানব-অন্তরে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও সাধনার উত্তব। সেইজন্ত আমাদের দেশের প্রাচীনতম ধর্ম্ম-সাহিত্যে ইন্দ্রধনু প্রভৃতি দেবতার পরিকল্পনা এবং বাগবজ প্রভৃতি দ্বারা উহাদের পরিতৃষ্টির চেষ্টা। সূর্য্যে এই সৃষ্টিররহস্য

ও পরলোকসম্বন্ধে চিন্তা মানবের মধ্যে নানা দর্শন ও শাস্ত্রের সৃষ্টি করল।

এ পর্য্যন্ত জগৎপ্রদায় সম্বন্ধে নানা মতবাদেব উৎপত্তি হয়েছে এবং বহুলোক এ বিষয়ে একেবারেই চিন্তাবিহীন ও উদাসীন। ইহার কারণ এই যে, অধ্যাত্মবিষয়ে জ্ঞানলাভ জড়বস্তুর জ্ঞান-লাভের প্রক্রিয়াতে সম্ভব নয়। আধ্যাত্মিক সত্য বীরা দর্শন ও অনুভব করেছেন, তারা যে সমুদয় প্রশ্নাণী নির্দিষ্ট করেছেন, তা অবলম্বন করা লৌকিক জ্ঞানের সম্যক্ অধিকারীর পক্ষেও অতিশয় কঠিন এবং অনেক সম্ভব অসম্ভব। এই জন্তই অনেক মহাজ্ঞানী জগতে নাস্তিক আখ্যা পেয়েছেন। কিন্তু বীরা বহুদ্রষ্টা খবি বলে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁরাও কি এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করেছেন? তাও ত নয়। তাঁদের নিজেদের উক্তিই এ বিষয়ে প্রমাণ। “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সতং—মনের সহিত বাক্য বীহাকে না পাওয়া নিবৃত্ত হয়। তাহাত দূরের কথা, চিন্তা করনাও তাঁর অস্ত্র পার না। আধ্যাত্মিক সত্য বীরা লাভ করেছেন, তাঁরাও সম্পূর্ণভাবে সফল হন নাই। “নাং মন্ত্রে সুবেদন্তি, নো ন বেদন্তি বেদ চ”—আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিরাছি, এমন মনে করি না; আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নষ্ট, জানি যে এমনও নহে।

আধ্যাত্মিক সত্য কাহারও পক্ষে সম্পূর্ণরূপে লাভ করা সম্ভব নয়। সদীম মানবমন অগ্নিময় সম্যক্ ধারণা করতে পারে না। সত্যদর্শন ও উপলব্ধি বতটাও বা সম্ভব হয়, তাহাতে তার প্রকাশ ও কাথ্যা আরও কঠিন। বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে “ধম্ম”, বিষয়ে অনেক উপদেশ আছে; কিন্তু কি যে সেই “ধম্ম”, তা পরিষ্কার করে দায় না। ঐহিকবেলে “Kingdom of God” সম্বন্ধে অনেক বর্ণনা ও উক্তি আছে, উহার নানা উপমা আছে; কিন্তু উহার প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তা সে সমুদয় পাঠ করে নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা যায় না।

অমর মানবাত্মা অনন্তকাল ধরে তার প্রদায় অনন্তরূপ ধ্যান করবে, এই যদি বিশ্বাসের অতিশয় হয়, তা হলেও তাঁকে এই মর জগতের জীবনকালের মধ্যে জানিবার ও লাভ করবার চেষ্টা করা দরকার। তার কারণ এই যে,—“ভিন্যতে হৃদয়-প্রসিদ্ধিলাভে সর্বসংশয়ঃ। কীরন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাধরে ॥”—ইহাকে দেখিলে হৃদয়গ্রহীত হই, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং সর্বসম্মত কর্ম্ম হয় হয়।

কিন্তু কি উপায়ে এ বিষয়ে কতকটা সফলতা লাভ করা যায়? এ বিষয়ে নামা উপদেশ আমরা দেখিতে পাই। এক স্থলে আছে—“বিজ্ঞানসারধিকৃত মনঃপ্রগ্রহবারহঃ। পোহধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিফোঃ পরমং পদং ॥”—যিনি আপনার মনকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বশীভূত করেন, তিনি সংসারের দুষ্কর বোহ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বব্যাপী পরব্রহ্মকে লাভ করেন। আর এক স্থলে আছে—“অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষঃ

স্রোতের জহাতি"—বীর ব্যক্তি পরমাখ্যাত বীর আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরমদেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হন। আর এক স্থলে আছে, "হৃদা যনৌবা ধনগাতি-কঃশ্রো"—ইনি সংশয়রহিত বুদ্ধিধারা দৃষ্ট হইলে প্রকাশিত হন।

কিন্তু যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আধ্যাত্মিক সত্য সমগ্র-রূপে লাভ করা কঠিন, তেমনি সেই সত্য জীবনে ধরে রাখা ও গাণন করা আরও কঠিন। স্ববীজনাথ তাঁর একটি গানে বলেছেন, "নাথো নাথো তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না?" ধারা সাধু বলে জগতে বিখ্যাত, তাঁরাও কত সময় সত্যের আলোকের অভাবে গভীর ক্রোধ বোধ করেছেন। এই কারণে মানবসমাজে নানা সাধনার প্রণালী প্রবর্তিতও হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই মানব সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। সরল বিশ্বাস, একান্ত নির্ভর ও জীবনের অন্তঃস্বামী এইবিষয়ে একমাত্র এবং সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাই ধর্ম্মিরা বলেছেন—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনী শ্রুতেন। যমেবৈব বৃণতে তেন লভ্যন্তসৌবা আত্মা বৃণতে তস্মৈ নাম্"॥ যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত অন্তঃস্বামী ও বহু না থাকে, তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশবাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের তায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমাখ্যা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। এই প্রার্থনাকে সফল করিয়া জীবনরূপার উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই সাধক বলেছেন, "তং হ দেবমাখ্যবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুকুর্ষু শরণমহং প্রপদ্যে"—আমি মুমুকুর্ষু। সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাগত হই। জীবন ব্রহ্মপ্রকাশ। আমরাও প্রার্থনা করি, "আমিরাবীর্ষ এধি"—হে ব্রহ্মপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার হালদার।

## রাজা রামমোহন রায়।

(এলাহাবাদে শতাব্দিকী স্মৃতিসভায়, সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিভাষণ)

(পূর্বাহ্নস্থিতি)

মহাত্মা রামমোহনের জগদ্বাদী ও কার্যকলাপ এত অধিক যে, বহুকাল ধরিয়া কীর্তন করিয়াও তাহা বিশেষ করা যায় না। অল্পসময়ের মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভবপরও নহে। এখানে তাঁহার কয়েকটি বিশিষ্ট কার্যের ও জগের উল্লেখ মাত্র করিব।

এ বিষয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়ৎংশ আবৃত্তি করিলে রামমোহন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য জানা যায়। আমি ব্রহ্মানন্দের ভাবাই উদ্ধৃত করিয়া আবৃত্তি করিতেছি।

"Great men live for the world, and not for their own account, they rise superior to circumstances, and by force of manly will and in the face of the stoutest resistance, stamp on the age the noble ideas of their soul, leaving an everlasting and priceless heritage to posterity and to all mankind. They 'live, move and have their being' in those ideas. The power and influence they exhibit are not their own; they belong to those ideas entrusted to them by Providence as their sacred errand on earth."

"Among India's great men Ram Mohun Roy holds a high rank. Like all great men he brought into the world his own idea and devoted his life to its realisation. That idea was catholic worship. Whoever has deeply studied his life and carefully looked into his speculations and movements, cannot but admit this to have been his guiding principle. That he was a religious reformer of India is universally admitted, and as such he is universally admired. He is also reputed as an extraordinary theologian. He knew English, Arabic, Sanskrit, Greek, Latin and Hebrew, and his writings bear testimony to his vast and varied learning. He it was who abolished the obnoxious custom of Suttee; he was one of the foremost pioneers of native education, and his name also figures in the valuable suggestions he offered in furtherance of the reforms which took place in the early political administration of this country. But such compliments to his great mind do not mark the real secret of his excellence: they do not point to the ruling principle of his mind which constitutes his greatness. His name shines in undying glory not only in India but in England and America for the valuable theological works which his mastermind indited, and religious and social reforms which his philanthropic heart promoted; but the real mission of his life, his peculiar ideal, so far appears to us on careful analysis, was to give to the world a system of catholic worship. This was prominently exhibited in the establishment of the church or place of worship which was subsequently designated the Brahmo Somaj."

"From his very early days, Ram Mohun Roy's mind manifested a strong and unmistakable religious tendency.....His great mind was not to be long in fetters, born as it was for the noblest type of religious independence.....His obstinate and unflinching aversion to superstition and

superstitious practices soon rekindled the spirit of persecution.

"An unsparing and thorough-going iconoclast, he yet failed not to extract the simple and saving truth of monotheism from every creed with a view to lead every religious sect with the light of his own religion to abjure idolatry and acknowledge the One Supreme.

"The ruling idea of his mind was to promote the universal worship of the One Supreme Creator, the Common Father of mankind. This catholic idea, while it led him to embrace all creeds and all sects in his comprehensive scheme of faith and worship, precluded the possibility of his being classified with any particular religious denomination. His eclectic soul spurned sectarian bondage; it apprehended in the unity of the Godhead the indissoluble fraternity of all mankind. .... His great ambition was to bring together men of all existing religious persuasions, irrespective of distinctions of caste, colour or creed, into a system of universal worship of the One True God. Thus his catholic heart belonged to no sect, and to every sect; he was a member of no church and yet of all churches. He felt it his mission to construct a Universal Church based on the principle of Unitarian worship. His earlier controversies and discussions with the different religious sects exhibit but partial glimpses or dim forebodings of that grand scheme which was subsequently matured and perfected in his mind. Its fullest development and final realization was consummated, in the fulness of time, in the establishment of that institution which bears the name of the Brahma Somaj and which stands as a memorable monument of the founder's real creed—Ram Mohun Roy's grand idea realized. The trust-deed of the Somaj premises contains, we believe, the clearest exposition of his idea. It inter-alia provides :—

".....The premises with their appurtenances should be used, occupied, enjoyed, applied and appropriated as, and for, a place of public meeting of all sorts and descriptions of people without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober religious and devout manner for the worship and adoration of the eternal, unsearchable and immutable Being Who is the Author and Preserver of the universe not under or by any other name, designation or title peculiarly used for, and applied to, any particular

being or beings by any man or set of men whatsoever and that no graven image, statue, or sculpture, carving, painting, picture, portrait or the likeness of anything shall be admitted within the said messuage, building and premises and that no sacrifice offering or oblation of any kind or thing shall ever be permitted therein and that no animal or living creature shall within or on the said building and premises be deprived of life either for religious purpose or for food and that no eating or drinking (except such as shall be necessary by any accident for the preservation of life), feasting or rioting be permitted therein or thereon and in conducting the said worship and adoration no object, animate or inanimate that has been or is, or shall hereafter become, or be recognised as an object of worship by any man or set of men, shall be reviled or slightly or contemptuously spoken of or alluded to either in preaching, praying or in the hymns or other mode of worship that may be delivered, made or used in the said premises, messuage or building and that no sermon or preaching, discourse, prayer or hymn be delivered, made or used in such worship but such as have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the Universe, to the promotion of charity, morality, piety, benevolence, virtue and the strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions and creeds".

(ক্রমশঃ)

## নবীনা মীরার নবীন জীবন।

দেখিতে দেখিতে আমাদের নববিধানের নবীনা মীরার নূতন জীবনের এক বৎসর অত্যন্ত হইয়া গেল। বিগত ১০ই নভেম্বর, মহাসমারিতে সমাহিতা যে মীরামূর্তি আমাদের সম্মুখে নীরব স্নানেন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সে মূর্তি এখনও সম্মুখে জীবন্ত চিত্রের মত বর্তমান। সেই নিষ্পন্দ নীরব মূর্তি, সেই ভিত্তি চক্ষু এবং সেই স্বর্গীয় জ্যোতির্পূর্ণ প্রেক্ষাপট যুগ্ম এখনও আমাদের সম্মুখে তাঁহার সাধনাসিদ্ধ নিগূঢ় নববিধান প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার সে নববিধানে বর্তই অধ্যয়ন করিতে বাই, ততই সে অধ্যয়ন আর শেষ হয় না। এখন বুঝিতেছি, আমরা তাঁহার সে নববিধান হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছি। তাঁহার জীবনের উদ্যোগে যে নববিধান তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদের ভিতরে সে নববিধান এখনও আছে নাই। বিধাতার

আদেশপালনরূপ মহা নববিধানে নবীনা যীরা দীক্ষিত হইরা-  
ছিলেন। এই দীক্ষাই তাঁহাকে কোন স্থানে লইয়া গিয়াছিল,  
আমরা এখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিধাতার বিধানে  
ব্রহ্মানন্দের ভিতরে আদেশ-পালনরূপ যে মহা নববিধান  
আসিয়াছিল, নবীনা যীরা তাঁহার কুচবিহার প্রদেশে সেই মহা  
দীক্ষার দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। “হ্রনীতি, মনে করিও না যে  
তুমি স্বাধীন হইলে, আমি দেখিতেছি তুমি দাসী হইলে।” কুচ-  
বিহার বিবাহে বিধাতা ব্রহ্মানন্দের ভিতর দিয়া যে সত্য প্রকাশ  
করিলেন, সেই সত্য জীবনের মহাসত্যরূপে দেবী হ্রনীতির  
ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল।

নবীনা যীরা তাঁহার প্রিয়ভগ্না সখ্যোগিনী ভগিনী সাবিত্রী  
দেবীকে হারাইয়া, অত্যন্ত তরুণ গাণ ও ভয় ব্যাধা লইয়া, সুদূর  
পার্বত্য ভূমিতে অদূরবর্তী কলখনা সুবর্ণরেখার সমীপপূর্ণ  
প্রান্তের সঙ্গে সুর মিলাইয়া, নির্জন প্রান্তে তাঁহার নববিধানের  
উচ্চ সাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন। একদিকে তাঁহার চিকিৎসকগণ  
নিরাশার সংবাদ দিতেছেন, আর এক দিকে তিনি নববিধানের  
নতুন সংবাদ দিবার ভক্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার  
প্রতিদিনের জীবন নববিধানের সে সাক্ষা দিবার জন্ত নিয়োজিত  
হইয়াছিল। জীর্ণ দেহ ও জীর্ণ শক্তি লইয়া নবীনা যীরা তাঁহার  
সমুদয় সুবর্ণরেখার বেলাভূমিতে নির্জন প্রান্তে উপাসার  
আসনে আসিনা; আর তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে প্রার্থনার  
ক্ষীণ স্বর উথিত হইতেছে এবং তাঁহার প্রতিদিনের উপাসনার  
তাঁহার ভাবের সঙ্গে তাব মিলাইয়া শ্রীমদাচার্য্যের এক  
একটি প্রার্থনা পাঠ করিতেছেন। বৈদ্য তিনি তাঁহার মহা  
প্রস্থানে প্রস্থান করিলেন, সেদিনের জন্ত আচার্য্যধর্মের সমস্তো-  
পযোগী প্রার্থনা পূর্বদিন নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।  
সেই মহা সমাপ্তিতে সমাপ্তি। নীরব তপস্বিনীর সমুখে গেই  
প্রার্থনা পঠিত হইয়াছিল। নববিধানবিশ্বাসী তাই ভগিনীগণ!  
তাঁহার পবিত্র স্মৃতির দিনে একবার অধ্যয়ন কর এবং বুঝিয়া  
লও, আমাদের নববিধান আমাদের কাছে কোথায় লইয়া বাইতে  
পারেন। নববিধানের নবীনা যীরা আমাদের কাছে জীবনের  
মহা বেদ বেদান্ত দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কুচবিহারে  
প্রবেশ আমাদের নববিধানে এক মহা বেদবেদান্তরূপে বিকশিত  
হইয়াছে। আদেশপালন ভিন্ন আমাদের ভিতরে নববিধান  
আসিবে না।

নববিধানের নতুন আদেশে আহুত, সেই যীরা ও সাবিত্রীর  
জীবন এবং সেই রাধারী নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের  
জীবন আদেশের মহা সাক্ষা দিবার জন্ত এবং বিধাতার বিধানে সেই  
পুরাতন ও কুসংস্কারবিষ্ট কুচবিহারে নবধর্মের বীজবপন জন্ত  
তাঁহা কর্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল। নববিধানের এই  
নিগূঢ় বিধান প্রমাণ করিবার জন্ত বিধাতার এই মহা আয়োজন।

বিশ্বাসী তাই ভগিনীগণ, যদি বিধাতার পূর্বায়োজন এবং

বিধাতার গুঢ় সত্য তোমাদের ভিতর আসিয়া থাকে, তাহা হইলে  
তোমরা নববিধানের মহা আদেশবাদ এবং ব্রহ্মানন্দ ও হ্রনীতি  
জীবনের নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে পারিবে। আর এই মহা স্মৃতির  
দিনে, এক বৎসর পরে, আমার অধ্যয়নের মহা সাক্ষা তাই  
ভগিনীগণের নিকট নিবেদন করিলাম।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার।

—০—

## রাজকীয় তিরোভাব।

(বিনি মচোচ্চ পদ সকলের নিরস্তা,  
শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই অরণ্যস্তর)  
কি শুনিমু! চলে গেছে? চলে গেছে ভবনদীকূলে,  
ফেলিয়া নিষ্ঠুর দর শোকাপরাশি,  
প্রদানিবে নাহি আর সে বাপা হৃদমা।  
ধরেছিলে যে পতাকা বিভূর চরণে ওগো মহীরসী!  
উঠেছিল উর্ধ্বমুখে বিশাল ধরনী বুকে;  
গেয়ে গেছে যেই নাম পূর্ণ বক্ষে ভাসি,  
গেয়ে গেছে কুহুহলে, বিতরেছ নারীদলে,  
ফুরাল ফুরাল, তাই হৃৎ-নীরে ভাসি।  
আরি তাই পূর্ব কথা, মনে মনে বাজে বাধা,  
হৃৎখনি রহিল পড়ে ধরা-কারাগারে;  
স্মৃতিতে সে দিন ভর, বিষম পরীক্ষাময়,  
কবে লইবেন প্রভু ধীরে দর করে।  
সকলেই গেল চলে, সবার প্রাচীন বলে,  
রহিলাম ক্ষতিতলে আমি অজাগিনী পাবাণ হৃদয় ধরে,  
পূর্বাপর মনে করে কাঁদি, কতু হাসি।  
অলবুদ্ধদের প্রায় কত উঠে চলে যায়,  
কত স্মৃতি রেখে যায় অনন্ততে পশি।  
যে প্রেমের কণামণি তব ও হৃদয়খনি,  
করেছিল অধিকার যাবত জীবনে,  
কত বৈধ্যক্ষমায়, কি ঔষধী তাবচর, রয় মর্ত্য অধিনানী।  
সততই মনে হয় ও কোমল গুণচয়,  
আর কি এ ধরাধামে কতু জনমিবে আমি?  
আচার্য্যানন্দীগণ সকলেই অতুণম,  
প্রাণে দেব আবির্ভাব, প্রেম-ভক্তি-রাশি—  
পুলকে বহিয়া যায়, বিমল তটিনী প্রায়,  
অক্ষরত মহিমায় ভালবাসা বাসি।  
কে কোথায় আছি ওগো যত ভক্তদল,  
এমনি কুটাও সব প্রাণ-শতদল;  
দাও দাও মহানীরে পবিত্র প্রেমপাণারে,  
অনন্ত গগনতলে অনন্তরি পার।  
কত রত্ন জন্মে হারি, কত রত্ন চলে দার,



রহিব শুধু কৃতি তাক প্রেমের সরসী।  
 বার বোঝা সাক্ষর, কোণাসমো করে তার;  
 অস্তর বিচার কল উচিত্তও নহ;  
 অন্তর-জলদি-জলে সন্তুষ্টিয়া করাবলে,  
 বেধা বিভূষিতলে কোতিহুতা চারি।  
 জানেনা মর্তের লোক, কিবা তার রর ভোগ;  
 কার হৃদিতল কিসে নিমেষে জুড়ায়;  
 চিন্তার পরশে কেবা, তবাতীতে ভাবে সেবা,  
 নিজ নিজ ভাবে বসে নিজ মার্গ পাঠ।  
 কে জানে রহস্য তার, শুধু বুদ্ধির বিচার,  
 সাধনার একপথ নহে সফলকর,  
 বিধির নিয়ম চর কত বে প্রকার।  
 কে জানে রহস্য তার,  
 অজ্ঞাত সবি সবার, করে না বিচার তার;—  
 শুধু ময় চতুর্দশে ক্রি উচ্চ গুণরাশি,  
 বিকাশি উঠিবে তবে সন্নিবল তাসি।  
 বল অর গগপতি, তোমার ইচ্ছার জ্যোতিঃ—  
 তরিতা উঠুক প্রাণে সখা অকিনানী।  
 বাবার সূটায় আভ করি গো প্রণাম;  
 শরঙ্গের রাওবাক্তে ওগো প্রাণাভাক।  
 খালি করে দিবে বুক, কত আশ্র দিকে হুঃ ?  
 তুমি কি বসিবে নাথ শূন্য পূর্ণ করে ?  
 খুলিছে দিবেছি প্রাণ বিধ নরাচরে।  
 বিরাট বিবেচ পরে অকৃত আলোক,  
 ধরিত্রী রাতরাক্ষ দিজে জনালোক,  
 দাও তবে তিনয়ন ছেঁরি সে আলোক।

শ্রীশরৎকুমারী দেব।

## শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

(পুরী ক্লাক্ হলে অক্সোৎসব-সভার তার সাংসদ উপেন্দ্রনাথ  
 দে কর্তৃক পঠিত)

“মুখং করোতি বাচালং পশুং চত্বরতে গিরিঃ।

যংকুপা ভমহং বন্দে পরমামন্দ্যবধরং।”

শ্রীমদ আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন সর্বে কিছু বলিবার ভয়  
 অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে মুকের বাচালতা বা পশুর গিরি-  
 লজ্জার অপেক্ষা অনেক অধিক ভয়ংকর। তথাপি, তাঁহার  
 নিকট অনেক বিষয়ে খণী আছি, অন্তর্গত কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা  
 প্রদর্শন আমার কর্তব্য এই ভাবিয়া, বন্ধুর পুত্রের ভ্রাতা  
 শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, “ব্রহ্ম-  
 কুপাহি দেবলক্” প্রাণিয়া উঠিয়াছি। আশা করি, আপনারা  
 দয়া করিয়া ক্রটি মার্জনা করিবেন।

শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রকে যে ভাবে আমার সামান্য বুদ্ধিতে অধিক  
 কুরিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই একটু নিবেদন করিব।  
 তাঁহাকে বুদ্ধিতে গেলে, প্রথমে কর্তমান যুগের কি, যে বিষয়ে  
 একটু চিন্তা করিতে হয়। কর্তমান যুগ—সমসাময়িক যুগ—ইহা  
 ভাবসম্মত সর্বসম্মত। এ যুগের ভাব্য হইতে “স্বৈচ্ছা”  
 “কাকের” ইত্যাদি কথা উঠিয়া গিয়াছে। এই যুগ-সম্মত  
 সময়ের মত মূর্খ সাধনাবিহীন লোকের বুদ্ধিতে গেলো যে, কিন্তু  
 কি মুগ্ধমান, বোধ কি খুঁটান, কোন্ জল স্রোতঃ কি হিন্দা,  
 সকলেই সেই একমাত্র অবিভীত বিশ্বেরই উপাসনা করে, তা-  
 যেন করেই হোক, যে আকারেই হোক। যেমন মানুষ কৃষ্ণ  
 রূপে নানাবিধ বর্ণ ও নানাবিধ আকারের দেহধারী, কিন্তু স্বরূপে  
 এক সচ্চিদানন্দাংশ আত্মাবৃত্ত, সেইরূপ ধর্ম ও রূপে অর্থাৎ বহিঃরূপ  
 সাধনে (in forms of worship) বহু, কিন্তু স্বরূপে (in  
 essence of spirit) এক। তাহাতে এই বিকাশ অতি প্রাচীন।  
 ধর্মশাস্ত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার বর্ণনেন—

“যে যথা মাং প্রপদ্যতে তাংতদৈব ভজ্যমাংসঃ।

মম বধ্যমুত্তমো মনুষ্যঃ পার্থ সর্বশঃ।”

কাব্যে মহাকবি কলিদাস বর্ণনেন—

“বহুধা প্যামৈর্ভিন্নাঃ পূজানঃ সিদ্ধিতেভবঃ।

স্বযোষি নিপত্যন্তোযাঃ জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে।”

মহিষতোষে পাণ্ডবা যার—

“ত্রয়ো সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতঃ ঐশ্বর্যমিতি

প্রতিয়ে প্রদানে পরমিদম্ অবঃ পথঃ ইতি চ।

কচীনাঃ কৈচিদ্ভাদ্রকুটিলনামা পথকুয়াং

নৃণামেকো গম্যামসি পরসামর্থং ইব।”

কিন্তু কালে এমন অবস্থা ভারতের হয়েছিল যে, এই উদার  
 সর্বধর্মসম্মতের ভাব এক প্রকার লুপ্ত হইয়া হইয়াছিল। ধর্মের  
 রূপ বা বহিঃরূপ সাধনগুলিও যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন  
 অজ্ঞানের পথে উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সময় ভারতের আকাশে ক্রমাগত তিনটি সূর্য উদ্ভিত  
 হইলেন—রাণা রামমোহন তায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও পরম-  
 হংস রামকৃষ্ণ দেব। বাঙ্গালীর পরম নোভাগা যে, তিন জনেই  
 বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরন্তু ইহাও বড় লক্ষ্য  
 কথা যে, বাঙ্গালী জাতি এই ত্রয়োনের উপযুক্ত সন্যাসহার কঠিন  
 পারে নাই। ইহারা তিনজনেই জীবন-প্রেরিত লোকাতীত

\* Prof. Maxmuller—“Introduction to the science of Religion”.

“The intention of Religion, wherever we meet it, it always holy. However imperfect, however childish a religion may be, it always places the human soul in the presence of God; and however imperfect and however childish the conception of God may be, it always represents the highest ideal of perfection which the human soul, for the time being, can reach or grasp.”

মুন্সে, মধ্যমসে, অতিমধ্যম, Super-Man, ও পর্যাক্ত স্বীকার করিতে, বোধ হয়, (বর্তমান সময়ে তাঁহাদের কার্যের ফল দেখিয়া) কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইহার তিনজনকে একই কার্যের জন্য প্রেরিত—এবং সেই কার্যে কেবল তাঁহাদের মধ্যে—সকল অগতঃ সকল ধর্মের স্বরূপের (spirit) পুনরুত্থান—সর্বস্বত্বময় (unity in diversity)—এবং বিশ্বজনীন ধর্ম স্থাপন (establishing the basic principles of Universal religion)।

রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই কার্যে আঁহত করিলেন। সর্বস্বত্বময়ত্বের মূলভিত্তি তাঁহার এই 'মূল বিশ্বাস' যে, "প্রত্যেক দেশের উপলক্ষের সেট সেই দেশকে অন্ধকার ও অগতঃ নির্বাহক এই বিশ্বাসপূর্বক উপাসনা করেন"। বাস্তবিকই "জ্ঞানদায়ক বস্তু" এই বাক্যই সকল জাতির, সকল সম্প্রদায়ের মূল বিশ্বাসবিশিষ্ট। জ্ঞানদায়কের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদান্তদর্শন এই বাক্যই আঁহত হইয়াছে—জ্ঞানদায়কের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র জৈন দর্শনও এই বাক্যই আঁহত হইয়াছে। সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত অবস্থাবোধী ভাব সংস্থাপন করা তাঁহার লক্ষ্য ছিল। খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র তিনি প্রচুর পরিশ্রমে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া তাঁহাদের কুসংস্কার-ভুলির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সভ্যতা ও নিজ নিজ সাধনার প্রেরণ করিতে হইবে, এ সভ্যতাবৃত্তি সত্ত্বেও, সেগুলি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "অধীকৃত সভ্যতা" অধিকাংশ সভ্যতার পুণীত হইত না। তাঁহার পরবর্তী প্রণয়নাদি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়ে, ব্রহ্মসমাজ যত কোন এক বিশেষ সম্প্রদায় বা শাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া প্রকাশ করিতেন, কিন্তু কার্যে তদুপায়ে তাঁহা অল্প শাস্ত্র প্রেরণ করিতেন না। কেশবচন্দ্র কেবল মত মত, বস্তুতঃ কার্যেও যোগ্য করিলেন—"সত্য কাহারও নিজস্ব ধন নহে। অসচ্ছ ইচ্ছাতে সকলেরই অবিকার। সত্য অর্থের লক্ষ্য মতে; সত্যেরই অঙ্গ-পদ মতে। ইহার নিকট রাজপ্রাসাদ ও পর্ণকূট উভয়েই সমান। ধর্মবান্ ও নির্ধন সকলেরই জন্য ইহার প্রেরণ নিঃসন্দেহ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে। ইহা লোকবিশেষে, অথবা সম্প্রদায়বিশেষে, অথবা জাতিবিশেষে বিক্রীত হয় নাই। ইহা দেশে বদ্ধ নহে, কাল ও বদ্ধ নহে; সকল দেশে ও সকল সময়ে ইহার আধিপত্য। সত্য বহু উদার।"

(ক্রমশঃ)

## সংবাদ।

নামকরণ—গত ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ সালের শেষের দিকে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মসংসদ দ্বারা নিম্নলিখিত গুণে নামকরণ উপলক্ষে, তাই প্রিয়নাথ মন্ডিক উপাসনা করেন এবং পিতাকে

"বিবেক" নাম প্রদান করেন। ভগবান্, পিতাকে ও তাঁহার জনকজননীকে শুভাশীষ দান করেন।

সেবা—গত ২৩শে অক্টোবর হইতে ২৬শে নবেম্বর পর্যন্ত মুন্সে তত্ত্বার্থার্থে বাস করিয়া তাই অধিলক্ষ্য রায় নিম্নলিখিতভাবে সেবায়ত পালন করিয়াছেন। ২৬শে অক্টোবর কুমারী শান্তিপ্রভা মন্ডিকের পিতৃদেবের সাংসারিক উপলক্ষে উপাসনা, ১৩ই কার্তিক অমরাগড়ী নববিধানসমাজের স্বর্গীয় উপাচার্য্য তাই ফকিরদাস রায়ের জন্মদিন উপলক্ষে তাঁর মধ্যম ভাতিজা ভ্রাতার শশিত্বরণ দাস গুপ্তের প্রবাসভবনে বিশেষ উপাসনা, ১০ই নবেম্বর প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মসমাজের ও ব্রহ্মসমাজের দ্বারা স্বর্গীয় মহারাজী জীমতী হুণীত দেবীর সাংসারিক উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা, ১১শে নভেম্বর জীমদাচার্য্য ব্রহ্মসমাজের শুভজন্মদিনে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্রহ্মসমাজের বিশেষ উপাসনা, মধ্যাহ্নে দ্বিপ্রহর তাই ভগিনীদেব লইয়া আচার্য্যদেবের সমাধিপ্রস্থানে ভজন ও ব্রহ্মসমাজের হয়। প্রায় ৪০ জন দ্বিপ্রহর বালক বালিকা-দিগকে তৃপ্তিপূর্বক খেচরায় খাওয়ান হয়। এই সঙ্গে ব্রহ্মসমাজের সেবা হয়। এইদিন সাংসারিক জীবনবোধ হইতে জ্ঞানদায়কের বিষয়টি পাঠ ও আলোচনা, তৎপরে উপাসনা হয় এবং মুন্সে ব্রহ্মসমাজের ক্ষুদ্র পুস্তকালয়টিকে "শ্রীব্রহ্মসমাজপুস্তকালয়" প্রার্থনাপূর্বক নাম দিয়া, স্থানীয় সাধারণের পাঠের উপযোগী করার প্রস্তাব হয়। গত ১ই নভেম্বর হইতে মুন্সে ব্রহ্মসমাজের পশ্চিম বারাতার একটি নৈশবিদ্যালয় খোলা হইয়াছে; এই বিদ্যালয়টিকে "সাদু প্রমথলাল নৈশশিক্ষার্থী" নাম দেওয়া হইয়াছে এবং নৈশ বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় বিধিপূর্বক পরিচালনার ভার হইতে কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। মুন্সে ব্রহ্মসমাজের অন্তিম দুইয়ের অধিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ওপ বি.এল, উভয় সভার সম্পাদকের কার্যভার লইয়াছেন। গত জামুয়ারি মাসে "ভক্ত দীননাথ শিক্ষার্থী" নামে যে বালিকাবিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল, কিছুদিন পরে উপযুক্ত শিক্ষকীয় অভাবে বিদ্যালয়ের কার্য বন্ধ ছিল। গত ২০শে নভেম্বর হইতে পুনরায় একটি ব্রাহ্মিকা শিক্ষকীয় দ্বারা উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য চলিতেছে। প্রতি সপ্তাহে সাংসারিক একমাসকাল ব্রহ্মসমাজে চলিয়াছিল। মাঝে মাঝে ব্যক্তিগণ এই তত্ত্বার্থার্থে গমন করিয়া সাধনা ও সেবায়ত অঙ্গীকার করিলে, নব তত্ত্বের প্রাণের মুন্সে সোনার মুন্সে পতিত হইবে। আশা করি, আগামী উৎসবে যোগদান করিতে এখন হইতে সাধনার্থিগণ প্রস্তুত হইবেন।

নব জন্মোৎসব—পূর্বী নবপূর্ণিমায়, গত ১৭ই নবেম্বর, নববিধানাচার্য্য শ্রীব্রহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রের শুভজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে তাই প্রিয়নাথ মন্ডিক উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় স্থানীয় "স্মারক হল" দ্বারা সাংসারিক উদ্যান দাস দেপুটী কালেক্টরের সভাপতিত্বে বৃত্তিসভা হয়। সংগীতান্তে তাই প্রিয়নাথ প্রার্থনা-পূর্বক, শ্রীব্রহ্মসমাজের জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়া সভার উদ্বোধন

করেন। পরে রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ দে ত্রীকেশবচন্দ্রের সর্ব-  
ধর্মসম্বন্ধে স্মৃতিস্তম্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। মৌলবী রচমুজা  
সাহেব বি,এ, ইংরাজীতে এবং সভাপতি মহাশয় উড়িয়া ভাষায়  
মহাপুরুষের উচ্চ জীবনের মাধাওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।  
রায় সাহেব ত্রীশচন্দ্র বোষ মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদান  
করেন।

১৯শে নবেম্বর, কলিকাতায়, কেহ কেহ প্রত্নাবে কলুটোলার  
বাড়ীতে কেশবচন্দ্রের জন্মতীর্থ দর্শনাদি করিয়া আসেন। ১৮টার  
পর নবদেবালয়ে উপাসনা হয়। মাননীয়া মহারাজের মহারানী  
শ্রীমতী সুচাক দেবী উপাসনা করেন। তাই গোপালচন্দ্র গুপ্ত  
ব্যক্তিগত প্রার্থনা করেন, তাই প্রিয়নাথ স্নো পাঠ ও শ্রীমতী  
জগদ্বাহিনী দেবীর প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া বিশেষ প্রার্থনা  
করেন। স্নো নির্মলচন্দ্র সেন শ্রীমৎ আচার্যাদেবের জন্মদিনের  
প্রার্থনা আবৃত্তি করেন। সন্ধ্যার পূর্বে শ্রীমতী মহারানী সুচাক  
দেবীর নেতৃত্বে নবদেবালয়ের রোয়াকে কল্লতর প্রদর্শন হয়;  
তাই প্রিয়নাথ শিশুদের নবশিশুর কথা বলেন। সন্ধ্যার ব্রহ্ম-  
সন্ধিরেও তাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও বিশ্বমানব নবশিশুর  
জন্মদিনে আমাদেরও নব জন্মদিন বিষয়ে আত্মনিবেশন ও প্রার্থনা  
করেন।

বাল্মীকি তারিখ হিসাবে, ৫ই অগ্রহায়ণ শ্রীমৎ আচার্যাদেবের  
জন্মদিনে, ত্রীশ্রদ্ধানন্দাশ্রমে প্রাতে ও সন্ধ্যা দুই বেলাই তাই  
প্রিয়নাথ উপাসনা করেন ও শ্রীমতী স্মৃতি মল্লিক সনাক্ষেব সন্মত  
করেন। মধ্যাহ্নে জ্যোৎস্নাবের পরমায় প্রীতিভোজন হয়।  
অপরাহ্নে শিশুসম্মিলন ও কল্লতর প্রদর্শন হয়, শিশুদিগকে  
ত্রীকেশবচন্দ্রের শিশু জীবনের গল্প বলা হয়। সন্ধ্যার উপাসনার  
পর আচার্যাজীবন সম্বন্ধে প্রসঙ্গ হয়। পরে একদল কীর্তিনীরা  
সুন্দর কীর্তন করেন।

পরলোকগমন—আবার একটা শ্রদ্ধা ও প্রিয়তমাত্মী-  
হানীরা সতী সাধ্বী দেবীপ্রতিমাকে তারাইয়া আমরা বড়ই  
শোকাবৃত্ত হইলাম। স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন সেনের সৎধর্ম্মিনী,  
প্রেনিডেন্সি বিভাগের এডিশন্সাল ইন্সপেক্টর, আমাদের  
পরমপ্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেনের মাতৃদেবী  
শ্রীমতী সরলা সেন, ৬২ বৎসর বয়সে, পুত্র ও পুত্রবধূ হই কল্পা  
ও জামাতাবধূ, নাতি ও নাতিনী এবং বহু আত্মীয় স্বজনদিগকে  
পরিত্যাগ করিয়া, নবভক্তের জন্মোৎসবে দিব্যজন্মলাভে, গত  
২০শে নভেম্বর, প্রত্নাবে ৫-১০মিনিটের সময়, অমরত্ববনে পরম-  
ভজনীর প্রেমবক্ষে পতিদেবতা এবং গুরুজম ও প্রিয়জনদের  
সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। গত ১০ই নভেম্বর, কুচবিচারের  
মাননীয়া মহারানী স্মৃতি দেবীর স্বর্গারোহণের প্রথম সাং-  
সরিক দিনে, রায় গুপ্তিত রাজকমল ভট্টাচার্যের মধুর কীর্তন  
তিনঘণ্টা ধরিয়া শ্রবণ করেন। বাহিরে বসাতে, বোধ করি,  
কোন রকমে ঠাণ্ডা লাগে। তাহাতে পরদিন একটু অসুস্থতা

বোধ করেন। ১২ই রবিবার, প্রবল জ্বর ও সন্দেহে নিউ-  
মোনিয়া প্রকাশ পায়। স্মৃতিকিংসা ও সেবা শুশ্রূষার কিছু মাত্র  
ক্ষতি হয় নাই। কিছুতেই আত্মপাখীকে আর দেহশিঞ্জের বন্ধ রাখা  
গেল না। একবার কঠিন রোগে তাহার শরীর তাজিরা যায়; এই  
ভয় শরীর লইয়াই এতদিন পতিসেবা, সন্তানসেবা, গৃহধর্ম্মসাধন,  
মণ্ডলীর নামা অমৃতানে, উৎসবাদিতে ও মন্দিরে সাধারণিক  
উপাসনার নিয়মিত যোগদান, মণ্ডলীর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়  
স্বজনগণের বাড়ী বাড়ী গিয়া খোঁজখবর নেওয়া ইত্যাদি কর্তব্য  
কর্ম কত ঘেহ, স্মৃতি, অজুরাগ ও ভক্তির সহিত সাধন করিয়া  
আসিতেছিলেন। শোকভাগ তিনি জীবনে অনেক পেয়েছেন।  
বিশেষতঃ ১৯২৮সনে প্রিয়তম দেবরকে, ১৯৩০সনে প্রিয়তম  
নালুদাকে, ১৯৩১সনের ১লা ফেব্রুয়ারী পতিদেবতাকে এবং ২২শে  
ফেব্রুয়ারী ভ্রাতা মোহিতচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যা অতি আদরের  
“বুলাকে” (উমাদেবী) এবং আগে পরে আরো কত প্রিয়জন,  
আপনার জনকে হারাইয়া তিনি যেন পরলোকে বাইবার জন্তই  
প্রস্তুত হইতেছিলেন। সদা হাসি মুখে সরল সুন্দর মিষ্ট মধুর ব্যব-  
হারে সকলের প্রাণে আনন্দ ঢালিয়া, হাসিতে হাসিতে আনন্দ-  
লোকে চিরহাসির রাজ্যে চলিয়া গেলেন। পরমভজননী তাঁর সতী  
কন্যার জীবনকে ওলোকে আরও গৌরবমণ্ডিত করুন এবং  
এখানে সকল শোকার্ত প্রাণে শান্তি ও সাধনা বিধান করুন।

সাংসংসরিক—গত ৩০শে কার্তিক, ১৫ বঙ্গাব্দ ভট্টাচার্য  
স্ট্রীটে, চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চৌধুরীর সৎধর্ম্মিনী স্বর্গারা  
সরোজিনী দেবীর সাংসংসরিক দিনে, পিনোমাতা শ্রীমতী শিশু-  
বাসিনী সেনের গৃহে তাই অক্ষরকুমার লখ উপাসনা করেন।  
পিনোমাতা বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং কন্যা শ্রীমতী সাধনা  
চৌধুরী “মাতৃতর্পন” পাঠ করেন এবং কন্যা শ্রীমতী অমিয়া  
চৌধুরী প্রচারভাণ্ডারে ১ টাকা দান করেন।

গত ১লা অগ্রহায়ণ, ৬৫১১ হারিশন রোডে, বিধানমুরলী  
শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গৃহে, তাহার স্বর্গমাতার সাংসংসরিক  
দিনে তাই অক্ষরকুমার লখ উপাসনা করেন। তদা শ্রীমতী  
কুসুমিনী দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে কন্যা  
শ্রীমতী প্রীতিলতা দত্ত প্রচার ভাণ্ডারে ১ টাকা দান করেন।

গত ২রা অগ্রহায়ণ, ১৫১১বি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে, ডাক্তার  
পৈলেন্দ্রভূষণ দত্তের গৃহে, তাহার মাতৃদেবীর সাংসংসরিক দিনে,  
তাই অক্ষরকুমার লখ উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে প্রচার  
ভাণ্ডারে ২ টাকা দান করা হইয়াছে।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ, ১২১২ বলরাম বোষের স্ট্রীটে, অনাথ-  
আশ্রমে, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গগত তাই প্রাণকৃক দত্তের সাং-  
সরিক দিনে, তাই অক্ষরকুমার লখ উপাসনা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durber  
New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priya-  
nath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha,  
কলিকাতা—৩নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, “নববিধান প্রেসে”,  
প্রিয়ারোহণ বোধ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# ধর্মতত্ত্ব

স্ববিশালবিন্দং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।  
চেতঃ স্তনির্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনবরম্।  
বিশ্বাসো ধর্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।  
বার্ধনাশত বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈশ্বর্যং প্রকীর্ত্যতে।

৬৮ ভাগ।

২৩শ সংখ্যা।

১লা পৌষ, শনিবার, ১৩৪০ সাল, ১৮৫৫ শক, ১০৪ ব্রাহ্মাব্দ।

16th. December, 1933.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩/-

## প্রার্থনা।

মা, ভারতমাতার মা, তোমার এই ভারতে যুগে যুগে কতই যুগধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষ জন্মদান করিয়াছ। সত্য ত্রেতা দ্বাপরের পর কলিযুগ। এই কলিযুগকেও তুমি এ বিষয়ে বঞ্চিত কর নাই। পূর্ব পূর্ব যুগে যাজ্ঞাদিগের দ্বারা তোমার যুগধর্মবিধান প্রবর্তন করিয়াছিলে, তাঁহারাতো তোমার অবতার বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। তাই বর্তমান যুগে, কলিযুগে এমন একজনকে দিয়া তোমার নবযুগধর্মবিধান সর্বসম্মতবিধান নূতন বিধান প্রবর্তন করিলে, যিনি আপনাকে পাপী মানবের সহিত সহানুভূতি-যোগে পাপী মানুষ বলিয়া আত্মপরিচয় দান করিলেন, যেন পাপী আমরাও তাঁহার সহিত সম-যোগে সম নবজীবন লাভ করি। তাই সেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের শুভজন্মদিন সাধন করাওয়া কৃতার্থ করিলে এবং সেই দিন হইতে স্বর্গারোহণদিন পর্য্যন্ত তাঁর নব জীবনের অনুসরণ করিয়া যাহাতে নববিধানের নবজীবন-স্থাপনে আমরা ধন্য হই, তাহারও জন্ম ব্রতধারী করিয়াছ। ব্যক্তিগত জীবনে নবজীবন অনেকেই যুগে যুগে লাভ করিয়াছেন। বর্তমান যুগধর্মসাধনে ব্যক্তিগত নবজীবন লাভ করিলে তোমার নববিধান পূর্ণ হইবে না। তাই তুমি

চাও, আমরা পরিবারগত ভাবে, দলগত ভাবে নববিধান-মুর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দ ত্রীকেশবের অনুসরণব্রত লইয়া, সপরিবারে সদলে মিলিতভাবে জীবনে তোমার নববিধান যেন সপ্রমাণ করি। আশীর্বাদ কর, যেন এবার আমরা এই পবিত্র ব্রত সপরিবারে সদলে গ্রহণ করিয়া, নববিধানের অখণ্ড প্রেমপরিবার ধরায় প্রতিষ্ঠা করিয়া, ব্যক্তিগত জীবনে ও মণ্ডলগত জীবনে ধন্য হই এবং জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আশা বর্জন করি।

শান্তিঃ!

শান্তিঃ!

শান্তিঃ!

— — —

## নববিধানে নবজীবন।

নবেশ্বর মাস আমাদের নবজীবন ও নবজন্ম লাভের মাস। গেল। নববিধান নব জীবনেরই বিধান। আমরা মনুষ্যজন্ম লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছি। দ্বিজজন্ম পাইয়া, নবজীবন পাইয়া স্বর্গে গমন করিব, এই আমাদের জীবনের নিয়তি। সেই নিয়তি যাহাতে সংসিদ্ধ হয়, তাহাই নববিধানের উদ্দেশ্য।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমরা এসময়ে পৃথিবীতে জন্মলাভ করিয়াছি এবং নববিধানে প্রাথমিক স্থান পাইয়াছি। ইহা আমরা নিজ পুরুষকারে বা নিজ

চেষ্টায় পাই নাই। সাধা সাধনার বিধান নববিধান নয়। বিধাতার বিশেষ কৃপার নামই নববিধান। তাই এ ধর্মও সাধা সাধনার ধর্ম নয়। পুরাতন ধর্মবিধানে সাধা সাধনার প্রাধান্য, পুরুষকীরের মহত্ব বর্ণিত হইয়াছে। নববিধান বিধাতার প্রত্যক্ষ কৃপার বিধান, কৃপার দান। এ ধর্মের আগাগোড়া বিধাতার হাতে, মানুষের হাতে কিছুই নয়।

ধর্ম কর্ম করা আগে মানুষের হাতে ছিল; কিন্তু যেমন কথায় বলে, “মানুষ শিব গড়তে বানর গড়ে,” তেমনি ধর্ম কর্ম করিতে গিয়া মানুষ ধর্মের অহংকারে ক্ষীণ হইয়, বা বিদ্যা বুদ্ধির আবর্তে পড়িয়া ধর্মের ভিত্তর মানবীয় কুসংস্কারাদি বা মতের গোলাযোগ আনিয়া ধর্মের গ্লানি উপস্থিত করে। তাহাই দেখিয়া এবার বিধাতা স্বয়ং ধর্মরথের সারথি হইয়া নববিধানের রথ পরিচালন করিতেছেন। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যেমন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সারথি হইয়া পঞ্চ পাণ্ডবকে পরিচালন করিয়াছিলেন, আধ্যাত্মিক আছে, তেমনি নববিধানের পঁচজনকে জীবন্ত বিধাতা বিজয় দান করিবার জন্ত পরিচালক হইয়াছেন; অর্থাৎ সংসারসংগ্রামে পঁচজন একজন হইয়া, বিধাতার অনুজ্ঞা পালন করিয়া বিজয় লাভ করিবেন। তাই নববিধান যে কি নূতন বিধান, ইহা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ প্রয়োজন। বাস্তবিক ইহা মানুষের কারখানা নয়, কিন্তু মানুষকে মহামানুষ করিবার জন্ত ইহা অবতীর্ণ।

আমাদের এ সম্বন্ধে বিশ্বাস তেমন উজ্জ্বল হয় নাই বলিয়া, আমরা নববিধানের পূর্ব মর্ম্ম এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা দিগকে জ্ঞান-বিচার ও পুরুষকারের পথ দিয়া অসিতে হইয়াছে, তাই তাহার সংস্কার আমরা এখনও ত্যাগ করিতে পারি নাই। নিজ চেষ্টায় বা সাধা সাধনায় ভাল হওয়া, আর মার প্রত্যক্ষ কৃপায় গঠিত হওয়া অনেক প্রভেদ। বর্ত্তদিন নিজের বুদ্ধি বিদ্যার অহং মন হইতে না যায়, ততদিন আমরা মার কৃপার ভিত্তারীও হই না, মার কৃপাও পাই না।

এই জন্ত নববিধানের প্রথম সাধন আমিত্ব বা পুরুষ-কারের মৃত্যু। মৃত্যুর পরেই মানুষ স্বর্গে যেমন আরোহণ করে, তেমনি এই ‘আমি’ ‘আমার’ মৃত হইলেই আমরা নববিধানে ~~কর্ম্ম~~ জীবন লাভ করি। সাধা সাধন করিয়া আমাদের ভাল হইতে হইবে, ধর্ম কর্ম করিতে হইবে,

বর্ত্তদিন আমাদের এই ভ্রান্ত বুদ্ধি থাকে, ততদিন আমরা নববিধানের নবজীবন পাবার উপযুক্ত হই না। তাই তাহা পাইও না।

ধন্য মা নববিধান-বিধানিনী! এই বিধান যেমন তাঁর নিজ পবিত্রাঙ্গীকৃত, তেমনই ইহার সাধনব্যবস্থাও তাঁর অনির্বচনীয় লীলায় বিহিত করিয়া আমাদের দিগকে ধন্য করিয়াছেন। এই যে আমাদের মধ্যে মৃত্যুর পর মৃত্যু ঘটতেছে, ইহা হইতেই আমাদের সম্মুখে নবজীবন-লাভের পথ খুলিয়া যাইতেছে। নবজীবনের অর্থ নূতন জন্ম। পৃথিবীতে আমরা দেহধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি। এই দৈহিক জীবন যখন না থাকে, তখনই আমরা নব-জীবন প্রাপ্ত হই। ফাঁহ'রা দৈহিক লোক হইতে আত্মা-লোকে গমন করেন, তাঁহারা ত স্বর্গীয় নবজীবনলাভে ধন্য হনই; কিন্তু দেহ থাকতে থাকতেই আমরা দৈহিক জীবন পরিহার করিয়া আত্মা এবং নবজীবন প্রাপ্ত হইব, ইহাই নববিধান।

ত্রুঙ্গগত জীবনই নবজীবন। আমাদের এই রিপু-পরতন্ত্র দৈহিক জীবন বা আমিত্ব হইতে মুক্ত হইলেই, আমরা নবজীবনে উজ্জীৱিত হই। পৃথিবীতে আজ দৈহিক জীবনে যিনি মৃত হইলেন, তিনি মরিলেন না, তিনি নবজীবনে বাঁচিলেন। তিনি অমর জীবনে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিলেন। মৃত্যু কেবল দেহ হইতে আত্মার মুক্তি। এই যে প্রতিদিন আমরা যখন উপাসনা করি, তখনই কি আমরা দেহমুক্ত হই না বা দেহে মৃত হই না? স্তবরাং মৃত্যু ত আমাদের অভ্যস্ত, মৃত্যু আর ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যু আমাদের নিকট অমৃতের সোপান। এই জন্তই আমরা প্রতিদিন প্রার্থনা করি, মৃত্যু হইতে আমাদের দিগকে অমৃততে লইয়া যাও।

বাস্তবিক দেহের মৃত্যু মৃত্যু নয়, পাপই মৃত্যু। দৈহিক জীবন জড়িতে, কামনায় বাসনায়, পাপে ভাপে যখন জর্জরিত হয়, তখনই মথার মৃত্যু; সেই মৃত্যুই ভয়ঙ্কর। সেই মৃত্যু হইতে বাঁচাইবার জন্তই দেহের মৃত্যু আসে। দেহের মৃত্যু বস্তুতঃ একটা কঠোর। এই দেহে যে জীবন আছে, এক নিঃশ্বাসে সে জীবন বাহির হইয়া গেল, এবং মানবাত্মা পরমাত্মায় গিয়া মিশিল। তিনিই ত জীবনের জীবন, তাহাতে জীবিত থাকাই জীবিত থাকা। মৃত্যু আসিয়া কেমন সহজে তাহা সংযোগ করিয়া দিল। তবু এ মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর কেমন করিয়া বলিব?



যদিহারা আমরা জীবনের জীবনকে সহজে প্রাপ্ত হই, তাহা ভয়ঙ্কর কিসে? আমরা যে নবজীবন পাইতে চাই, উদ্ভাৱা আমরা তাহা পাই। মৃত্যুকে আমাদের উজ্জীবনলাভের সহায় বলিয়া, বন্ধু বলিয়া আমরা কেন না আদর করিব?

বাস্তবিক মৃত্যু আমাদের বন্ধু হইয়া আমাদেরকে যেমন অমর জীবন দান করে, তেমনি বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনদের মৃত্যু হইলেও পরলোকের চিন্তা আনিয়া দিয়া এবং বৈরাগ্য ও সংসারের অসারতা উপলব্ধি করাইয়া, আমাদেরকে কতই কৃতার্থতা দান করে, এবং মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া মা মা বলিয়া মাকে ডাইয়া ধরিবার জন্তও আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন করে। আবার যে বন্ধু বা আত্মীয়, পিতামাতা বা সম্মান সম্ভূতি চলিয়া যান, তাঁদের সঙ্গেও পরলোকে গিয়া মিলিবার জন্ত কতই মনের আকাঙ্ক্ষা হয়। এবং তাগ প্রকৃত হইলে, ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রহ্মসঙ্গ-সাধনা বিনা তাহা পূর্ণও হয় না। তাহা পূর্ণ হইলেই নবজীবনের সম্ভোগ করিয়া আমাদের আত্মা ধন্য হয়। নববিধান আমাদেরকে যে নবজীবন দিবার জন্ত প্রতিশ্রুত, এই মৃত্যুর সহায়তা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া কতই নববিধানকে জীবনে সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হই। এক্ষেত্রে যেমন পরিবারস্থ সকলের মৃত্যু হয়, তেমনি সপরিবারে সমলে এই দৈনন্দিক জীবনের মৃত্যু সংসাধন করিয়া, সপরিবারে সমলে নবজীবনলাভে নববিধান-মুষ্টিমান-জীবন হই, মা এমন বিধান করুন।

—

## ধর্মতত্ত্ব।

“আমি নাই,” “আমি আমি”।

আমি যখন উপাসনা করি, তখন আমার “আমি” আঘাতে থাকে না। “আমি আছি” বিনি, তিনি আমার “আমি”কে উড়াইয়া দিয়া, “আমি নাই” করিয়া, আমাকে অধিকার করিয়া বসেন, তখন আর “আমি আমি” বলিতে দেন না। পবিত্রাত্মা জগৎ তিনি যখন আমাকে অধিকার করেন, তখন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মত আমার অবস্থা হয় বা আমার আশ্রিত তখন মৃত্যুর অবস্থার পতিত হয়। তখন আমি বিশ্বমানবের সঙ্গে এক হইয়া উচ্চ উচ্চ যোগের তত্ত্ব বলি এবং তত্ত্বের অমরগণে অমরজিত হই। আবার যখন আমি সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত হই বা উপাসনার মেরা ছুটিয়া যায়, এবং পবিত্রাত্মা ছুটিয়া যায়, তখন যে আমি সেই আমি হই, নীচ আমিগ্রস্ত হইয়া কাম কোষ রিপূর অধীন হইয়া

আত্মহারা হই। কবে চিরতরে “আমি নাই” হইয়া, এ “আমি আমি” ছাড়িব।

—

ছু’জনে একজন, একজনে ছু’জন।

হুই চক্ষু দেখে এক, হুই কাণ শুনে এক। এমনই যখন হুইটা প্রাণ একপ্রাণ হয়, হুই আত্মা এক আত্মা হয়, হুই দেহ এক দেহ হয়, তখন হুইনেও একজন হয়, এক ইচ্ছা, এক কৃতি, এক মন, এক দর্শন, এক শ্রবণ হয়। আবার এক চক্ষুর দৃষ্টি যখন বিকৃত হয়, তখন একই ব্যক্তিকে হুই ব্যক্তি মনে হয়। তেমনি এক কর্ণ বিকৃত হইলে, এক শব্দ হুই শব্দ মনে হয়। সেইরূপ সংসার-বিকার-গ্রস্ত একই ব্যক্তির ভিতরও হুই হুই ভাব দেখা যায়। ভিতর বাহির হুই রকম। কাজে কথায় মিলন নাই, চিন্তার ইচ্ছার সমতা নাই। বাহিরে সাধু, ভিতরে কপট। এই ব্যক্তিই বিবম সাংঘাতিক।

—

শত্রুকে নমস্কার।

যিনি আমার শত্রুতা করেন তিনি যেমন শত্রু, আবার যিনি আমাকে তাঁর শত্রু মনে করেন বা আমার কার্যে শত্রুতা অনুভব করেন, তিনিও শত্রুপদবাচ্য। এই হুই ব্যক্তিকেই আমরা যেন নমস্কার করিতে পারি। যিনি শত্রুতা করেন, তাঁর বৈর নির্ঘাতন না করিয়া আমার উচিত, তাঁহার শত্রুতা দ্বারা যে শিক্ষালাভ করি এবং তজ্জনিত যে উপকার পাই, সেজন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া যেন তাঁর নিকট শগত হই ও তাঁর কল্যাণ ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি। আবার যিনি আমাকে তাঁর শত্রু মনে করিয়া আমাকে ঘৃণা করেন, সেজন্য আমি উত্তাক্ত না হইয়া, তাঁর ঘাড়েতে শুভবুদ্ধি হয়, না জানিয়া অপরাধী না হন, সেজন্য প্রার্থনা করি। কিন্তু ঈশ্বরের যে শত্রু অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী বা বিধান-বিরোধী, তাহার যেন প্রেতর না দি।

—

নববিধানের শত্রু।

নববিধানাচার্য্য বলেন, যাহারা [ ১ ] ঈশ্বরের বিধাতৃকে অবিশ্বাস করে, [ ২ ] প্রত্যাশকে বিক্রম করে, [ ৩ ] বৈরাগ্যকে ঘৃণা করে, [ ৪ ] প্রার্থনা অপহৃত্ত করে, [ ৫ ] ভ্রমাক ও গোঁয়ার, [ ৬ ] সুরাপারী ও ব্যভিচারী, [ ৭ ] সাম্প্রদায়িক, [ ৮ ] বিজ্ঞান-বিরোধী, [ ৯ ] বিষয়-বুদ্ধি-পরতন্ত্র, [ ১০ ] মৃত পুস্তক ও পুরাতন ভাষার উপাসক ও পক্ষপাতী, ইহরাই নববিধানের শত্রু।

—

সেই দিনের স্মৃতি।

[ ১৬ই নবেম্বর, মাতৃসাম্বৎসরিকে স্মৃতি ]

বিশ্বজগৎ আবহমান কাল ধরিয়া পরিবর্তনের স্রোতে আসিয়া চলিয়াছে। কালের দ্রুতগতি স্রষ্টার সূনিপুণ সৃষ্টিকে তাদিরা

গড়িয়া নবরূপে সজ্জিত করিতেছে। আজ বাহা আছে কাল তাহা নাই, আজ বাহা নিকট কাল তাহা সুদূর, আজ বাহা মধুময় কাল তাহা বিবাদপূর্ণ। ইহাই জগতের নিয়ম। পৃথিবীতে কোনও কিছুই বরূপ লইয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পরিবর্তনের প্রচণ্ড কবলে আত্মসমর্পণ করাই জীবের ধর্ম।

কোন আদিযুগে এই মরুজগতে মানুষের যেলা বলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া মানুষের মৃত্যু লইয়া ভুবনে এক অপকল্প লীলার সৃষ্টি হইয়াছে।

মৃত্যু ইহকাল এবং পরকালের যবনিকাস্বরূপ। আজ বাহাকে দেখিলাম আমাদেরই মাঝে ইহজগতে, কালই হরত তাঁহাকে চরাচরময় খুঁজিয়া পাই না। তিনি সেই যবনিকার অন্তরালে অনন্তলোকে তিরোহিত হইয়াছেন।

মৃত্যু আপনার চতুর্দিকে কি এক মোহময় সুরঙ্গ বেঁধেন করিয়া রাখিয়াছে, জানি না। অবলার, অসময়ের, সম্পদে, বিপদে যখনই মৃত্যুর আহ্বান ধারে আসিয়া পৌঁছয়, জীবনাই তাহাতে সাড়া দিয়া ওঠে। সংসারের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সেই গুঢ় যবনিকা তেজ করিয়া, অনীমের সন্ধ্যাে ছুটিয়া চলে। পশ্চাতে কিরিয়া চাহিবার অবসর থাকে না। \* \* \*

আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিবারে একটা বিশেষ দিন। এবং সেই বিশিষ্ট স্মৃতি স্মরণ করিয়াই আমাদের মন চঞ্চল হইতেছে। হৃদয়ে মৃত্যুর ছায়া নানা ভাবে উদ্ভিত হইতেছে। মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোনও তর্ক বা অভিযোগ করা চলে না—ভ্রমের আগত মরণকে বরণ করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ; কিন্তু মৃত্যুর করাল মূর্তির অন্তরালে প্রিয়জন যখন অন্তহিত হন, তখন এ সকল তত্ত্ব মন প্রবোধ মানে না।

আজ হইতে তিন বৎসর পূর্বে, ১৬ই নবেম্বর, ৩০শে কার্তিক, রবিবার, রাতি দশটার সময়, আমাদের ক্ষুদ্রবাসভবনে ক্রতের পিনাক বাহাকে আহ্বান করিয়া নিজের সঙ্গে লইয়া চলিল, তিনি আমাদের মাতৃদেবী। সে নিনাদে যে সুর বাজিয়াছিল—মাতৃদেবী তাহাতে সজ্জা না দিয়া পারেন নাই।

সেই রাত্রি হইতে আমরা তাঁহার সন্তান সন্ততি শোকে মুগ্ধমান হইয়া পড়িলাম। শ্মশানের ভগ্নমুষ্টি ভিন্ন তাঁহার অস্তিত্ব আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না। শোকের কাতর হইয়া তাঁহারই ভিতর সাশ্বনা অনুসন্ধান করিলাম, বার্থ হইলাম। তখন মৃত্যু এবং মৃত্যুপ্রেরকের সহজে নানা প্রকার প্রশ্ন হৃদয়ে জাগিল—প্রেরকের উপর ক্ষোভ ও অভিমান সুরু হইল। আজ তিনবৎসর পর আবার সেই ভয়াবহ দিন আমাদের মৃত্যুর প্রতাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

মৃত্যুর গভীর আশ্রানে যে দিন মাতৃদেবী সাড়া দিলেন, সে দিন কোথায় ~~কি~~ তাঁহার সংসারবন্ধন, কোথায় বা রহিল তাঁহার স্নেহ, মায়ী, প্রেম? সংসারের কোটি কোটি বন্ধন তাঁহার পথ রোধ করিতে পারিল না—তিনি সকল প্রকার ঐহিক

চিন্তা দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রশান্ত চিত্তে বাত্মা শ্রব করিলেন। সে দিন আমাদের চারিদিকে হাহাকার, বেদনা, তীব্র দীর্ঘবাস সমবেত হইয়া যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল—কোনও দিন ভাবি নাই, সেই কালোমেঘ আবার কাটিয়া যাইবে। সেই হৃদ্দিনে অবলম্বনহীন হইয়া, অসহায় হইয়া কেবলমাত্র অদৃষ্টকে ভৎসনা করা ভিন্ন কোনও প্রশস্ত উপায় দেখি নাই। বেদিকে চাহিলাম, দেখিলাম মাতা নাই—তুলিলাম তিনি নাই—বলিলাম তিনি নাই। গৃহে নাই, বাহিরে নাই, উর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, দূরে নাই, নিকটে নাই, কোনও স্থানে নাই।

প্রভাতী গানে পাখী জানাইল, তিনি নাই—প্রভাতে ফুলের রাশি স্নান হাসিয়া জানাইল, তিনি নাই—হেমন্তের বিগতপ্রায় কুহেলিকা জানাইল, তিনি তাঁহারই মতন অস্পষ্ট হইয়াছেন, অদৃশ্য হইয়াছেন। দিগন্তব্যাপী এই শূন্যতা দেখিয়া হাহাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমশে আকাশ বাতাস মথিত হইয়া চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল, নাই নাই নাই।

সেইদিন ভাবিয়া ছিলাম, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমাদের সংসার চলিবে না। তিনিই যে সংসারের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী—আমাদের জননী। তিনি আর আমাদের হাসিতে, অশ্রুতে, সম্পদ বিপদে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসিবেন না ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। কিন্তু আজ দেখিতেছি, তাঁহাকে বাদ দিয়া আমরা সকলেই আবার হাসিতেছি, চলিতেছি। হৃদয়ের এই ক্ষত কে যে নিঃশব্দে আসিয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া দিল, তাহা নিজেরাই জানি না। সকলের অজ্ঞাতে কাহার কমণ্ডলু হইতে আমাদের ব্যথাহত হৃদয়ে সাশ্বনাবারি সিক্ত হইল? সাশ্বনা বাহিরে যেদিন খুঁজিয়া ছিলাম—পাই নাই, আজ সে সাশ্বনার অবাচিত পরশ হৃদয়ে অমুভব করিতেছি। এই সাশ্বনা তিনিই দিয়াছেন, যিনি মাতৃদেবীকে মরুজগতে পাঠাইয়াছিলেন এবং তুলিয়া লইয়াছেন।

এই লীলাময়ের সংস্পর্শে আসিলে শোক, তাপ, অভাব, অভিযোগ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়—তাঁহার সত্তা হৃদয়ে অমুভব করিলে তাঁহার চরণতলে মাথা নত হইয়া আসে। মৃত্যুর গুঢ় যবনিকা যেন ধীরে ধীরে পরিষ্কার রূপ ধারণ করিয়া, অতি স্পষ্ট রূপে প্রকটিত হইয়া উঠে।

মনে হয়, মরণসংঘাতের ভিতর দিয়া বিধাতা মানুষকে বাচাই করিয়া লইতেছেন। মনে হয়, আঘাতের পর আঘাত করিয়া, হৃদয়ে দহনানল জ্বালাইয়া, বিশ্বনিরস্ত্র আমাদের পরীক্ষা করিয়া লন। আজ আর কিছু বলিবার নাই। শুধু সেই পরমকল্যাণময় পরমেশ্বরের কাছে এই কাতর প্রার্থনা, যেন তিনি আঘাতাত্মকারী সঙ্কট করিবার কমতাও দান করেন। তবেই তাঁহাকে বলিতে পারিব—“আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো; আরো কঠিন সুরে জীবন-তায়ে বঁধারো। \* \* \* অলে

উঠুক সকল হতাশ, গর্জি উঠুক সকল বাতাস, আগিয়ে দিয়ে  
সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো।”

সাধনা চৌধুরী।

—০—

## পরলোকগতা শ্রীমতী সরলা সেন।

( জ্যেষ্ঠা কস্তা শ্রীমতী ইন্দিরা রায় কর্তৃক, ৩রা ডিসেম্বর,  
শ্রদ্ধাবাসরে বিবৃত প্রজ্ঞাপ্তি )

আজ এই পবিত্র শ্রদ্ধাবাসরে বাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা  
অর্পণ করে প্রাণে একটু শান্তিলভ করব বলে আমরা এখানে  
উপস্থিত হয়েছি—তাকে আমরা এ সংসারে মাতৃরূপে পেরে  
ধন্য হয়েছিলাম। এই একপক্ষ কাল আমরা এ গৃহে  
তার সেই তাসিমাখা উজ্জল মুখখানি আর দেখতে পাচ্ছি না;  
কিন্তু তার স্নেহমাখা স্পর্শ, তার কর্তৃত্বর এখানকার প্রতি দবে,  
প্রতি তারগার অনুভব করছি। আজ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব  
সকলে এখানে উপস্থিত হয়েছি—ইহলোক ও পরলোক উভয়ের  
মিলন পাণে অনুভব করছি; আজ তিনিও বিদেহী হয়ে পর-  
লোকগত পিতা ও সকল প্রিয়জনের সঙ্গে এখানে উপস্থিত।  
পরম পিতার নিকট তাঁর আত্মার কলাপ কাননা করে কৃতার্থ  
হব, এই আশা।

প্রায় ৬২ বৎসর পূর্বে কলুটোলার বিখ্যাত সেনবংশে  
আমাদের মাতৃদেবীর জন্ম হয়। মাতামহ স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ সেন  
ও মাতামহী স্বর্গীয় নিত্যারিণী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান ও একমাত্র  
কস্তা আমাদের মা বড়ই আদরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন।  
তার বাল্যজীবনের কথা আমরা বিশেষ কিছু জানি না। শুধু  
জানি, মাতৃদেবী ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁর পিতামহ স্বর্গীয়  
হেওরান মাধবচন্দ্র সেনের গৃহে বহু পরিবার ও সুখ ঐশ্বর্যের  
মধ্যে বাস করতেন। মাতৃদেবীর বাল্যকালেই মাতামহ জয়কৃষ্ণ  
সেন আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে আসেন। পিতা  
মাতার পুণ্য চরিত্রের প্রভাবে আমাদের মার জীবনে অনেকখানি  
পড়েছিল। মা আমাদের দিদিমার মত সরল হাসিতে, যে কেহ  
তার সংস্পর্শে আসত, তাকেই মুগ্ধ করতেন। অপরকে ভালবাসা  
শৈশব হতেই তাঁর জীবনে বিশেষ গুণ ছিল। শুধু আপনার  
পরিবারকে নয়—আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলকেই তিনি  
প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন। তাই আজ তাকে হারিয়ে তাঁরা  
কত ব্যথিত ও দুঃখিত।

বাল্যকালে বিশেষ কোনও বিদ্যালয়ে তাঁর যাওয়া হয় নি।  
Miss Pigot নামীয় ইংরাজ মহিলা—যিনি সেন পরিবারের  
অধিকাংশ বালিকার শিক্ষকতা করেছিলেন—তাঁর নিকটই মার  
শিক্ষালাভ হয়। প্রায় ১৪ বৎসর বয়সে আমাদের পূজনীয়  
পিতৃদেব স্বর্গগত জানেন্দ্রিয়োহর সেনের সহিত বিবাহ হয়।

আমাদের মাতামহ প্রকাশ্য ভাবে এই প্রথম ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান  
করেন।

পিতামহ স্বর্গগত গোপীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের ঢাকার বাসগৃহে  
মার বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েক বৎসর কেটেছিল; সেখানেও  
সকলকে ভালবেসে সকলের ভালবাসা পেয়েছিলেন। তারপর  
পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কস্তার জন্মের পর, পিতৃদেবের কন্যাপলক্ষে  
কলিকাতায় এসে তাঁরা সংসার আরম্ভ করেন। এই সময়  
আমাদের মাতামহের বিরোগে মা প্রথম শোক পেলেন। কলি-  
কাতায় সংসারের আরম্ভে নানা অভাব ও পরীক্ষার মধ্যে পড়েও,  
ভগবানে শ্রদ্ধা রাখা থাকায়, সে সকলই বাবা ও মা হাসিমুখে  
বচন করতে পেরেছিলেন।

নববিধান ধর্ম্মে তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস ও ভালবাসা ছিল—এই  
সময় থেকেই সমাজের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগ আরম্ভ হয়।  
সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি কাজ সম্পন্ন করেও, যখন যেখানে  
উপাসনা, কীর্ত্তন, বক্তৃতা হত, আমাদের মা সকলের আগেই  
সেখানে উপস্থিত হতেন। বাইল বৎসর পূর্বে সফটপল্ল রোগে  
তাঁর শরীর ভগ্ন হয়ে যায়—অকালে জরা ও বার্দ্ধক্য আসে—তবু  
শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ঐ সবে যোগ দেবার উৎসাহ একদিনও কমে  
নি। ব্রহ্মসঙ্গীতে মার বড় অঙ্গুরাগ ছিল। গান শুনতে যেমন  
ভালবাসতেন—গাইতেও তেমনি ভালবাসতেন। ব্রহ্মসঙ্গীতের  
সমস্ত গানই প্রায় তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। যেখানে উপাসনা হ’ত,  
মা গানে সর্বদা যোগ দিতেন। তাঁর অযোগ্য কস্তা আমরা,—  
যেটুকু ব্রহ্মসঙ্গীত জানি—তা মার কাছেই শেখা।

২৮ বৎসর বয়সে মা আমাদের দিদিমাকে হারিয়ে নিজেকে  
বড় অসহায় মনে করেছিলেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই জ্যেষ্ঠ  
সহোদর স্বর্গগত মোহিতচন্দ্র সেনের অকস্মাত পরলোকগমনে  
মা বড় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের বড় মামা ৩৭বৎসর  
এই পৃথিবীতে থেকে, চারিদিকে তাঁর সদ্গুণের কত সৌরভ  
ছড়িয়ে গিয়েছেন, তা সেই সময়ের সকলেই জানেন। শ্রদ্ধের  
মোহিতচন্দ্র, বিনয়েন্দ্রনাথ ও প্রমথলাল তাঁরা তিনজনেই মার  
অতি প্রিয় ছিলেন, অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রাণভরে তাঁদের  
ভালবাসতেন। শ্রদ্ধের বিনয়েন্দ্রনাথ ও প্রমথলালের সঙ্গে শুধু  
আত্মীয়তা ছাড়া ধর্ম্মের দিক দিয়েও তাঁর গভীর যোগ ছিল।  
একে একে তাঁরা তিনজনেই পরলোকে—আমাদের মাও আজ  
সেখানে তাঁদের সঙ্গে মিলে আনন্দ করছেন।

মার একটি পুত্র ও তিনটি কস্তার মধ্যে কনিষ্ঠা কস্তাকে  
অসময়ে তার পাঁচ বৎসর বয়সে হারিয়েছিলেন। অগ্র তিনটী  
সন্তানকে উপযুক্ত সময়ে বিয়ে দিয়েছিলেন। গৃহের ছোট বড়  
প্রত্যেক অনুষ্ঠানগুলিতে সমাজের প্রচারক ও কন্যাদের  
সকলকেই ডাকতেন। সংসারের সকল কাজেই তাঁর গুরুত্বপূর্ণতা  
ও সুবন্দোবস্ত থাকত। পরিবার পচ্ছন্নতা তাঁর জীবনের আর  
একটি গুণ ছিল। ক্রম ভগ্ন শরীর নিয়েও গৃহের প্রত্যেকটি

জিনিস পরিষ্কার ও শৃঙ্খলার আছে কি না, সে দিকে তাঁর সর্বদা দৃষ্টি ছিল। অলসতা কাকে বলে, তিনি কোনও দিন তা জানতেন না। ভয় শরীর নিয়েও সব সময়ই সংসারের কিছু না কিছু কাজ বা সেলাই করতেন। প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় বন্ধু সকল পরিবারের ছোট ছোট শিশুদের নিজের হাতে টুপী মোজা জামা বুন দিয়ে বড় আনন্দ পেতেন। আর সকলকে খাওয়াইতে বড় ভালবাসতেন। যে কেউ বাড়ীতে আসতেন, তাঁকেই খাওয়া-বার জন্তে বাস্তবতেন। এমন কি, রোগশয্যায়ও যে কেউ তাঁকে দেখতে এসেছেন, সন্দেশ খাওয়াবার জন্ত বাস্তবতেন। সংসারের যি চাকরদের পুষ্ক কছার মত মের ও যত্ন করতেন। আজ তাঁকে চারিদিকে বিশ্রী বহরের পুরাণো খিও চোবের জলেক্তাসছে।

ব্রহ্মানন্দদেবের উপর তাঁর অসীম ভক্তি ও আকর্ষণ ছিল। তা ভাবায় বলবার নয়। দেউ আকর্ষণেই তাঁর পরিবারের পোতাকের উপরেই মার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। তাঁদের সকলের রোগে, শোকে, সুখে, চঃখে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত যোগ রেখেছিলেন। মহারাণী শ্রীমতী সত্যক দেবী তাঁর সহ-কালীন ছিলেন বলে, ছোটবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ও ভালবাসা ছিল।

ক্রমে ক্রমে পরিবারে আরও করে কটী শোক পাবার পর, প্রায় তিন বছর চল, আমাদের পিতার স্বর্গারোহণ হয়। সেই সময়ে স্বামীর রোগশয্যার পাশে বসে—কি অসীম বৈরাগ্য ও সত্যিকৃত্য তাঁর সঙ্গে করদিন দিবাত্রি তাঁকে মধুর গান গুনিতে পরলোক-যাত্রার জন্ত প্রস্তুত করিয়েছিলেন—এমন তো কাহাকেও প্রায় করতে দেখা যায় না। এই দৃষ্টান্ত থেকে মার ভগবানে বিশ্বাস ও নির্ভরতার পরিচয় আরও পাওয়া যায়। কিন্তু পিতৃদেবের তিরোধানের পর থেকে তিনি নিজের সেইলোকে যাবার জন্ত ক্রমে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। শেষে স্বামীর বিরোগের মজ বাইশ দিন পরেই, কতাসমা প্রতিপালিতা আমদের ব্রাতৃপুত্রী উমাকে অকস্মাৎ হারিয়ে, তাঁর মনে যে কি গভীর আঘাত লেগেছিল—আমরা তা বেশ বুঝতে পারিতাম।

কাবা আমাদের ছেড়ে যাবার দু'বছর ও মশমাস পরেই মা যে চলে যাবেন; তা আমরা একবারও ভাবি নি। মার শারীরিক অসুস্থতার বাহ্যিক প্রকাশ ছিল মা বলে আমাদের মনে হিত বিশ্বাস ছিল যে, মা তাঁর স্নেহের আঁচলে আরও কিছুদিন আমাদের ঘিরে থাকবেন। মা যে সংসারের মারা এত শীঘ্র কাটবেন, তা স্বপ্নের অতীত। আত্মীয়দের প্রতি তাঁর কত নার্যা, কত মমতা। তাঁদের ও সমাজের বন্ধু পরিচিতদের সুখে দুঃখে, বিপদে পোজা নিতে সর্বদা ব্যস্ত হতেন, আর রুগ ভয় শরীর নিয়েও সকলের কাছে যেতেন। শেষ রোগশয্যার শোবার আগের দিন পর্যন্ত সকলের সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন। বিবাহিত জীবনের প্রথমার্ধে ঢাকা সহরে বাসকালে যে সব আত্মীয় তিনি লাভ করেছিলেন—তাঁদের চিত্তে অনেকেরই এখন পরলোকে।

তবুও ফাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই মা এবার পুজোর সময় ঢাকার গেলেন। আমাদের পিতৃমাতৃ-দ্বীন খুড়তুতো তাইবোনদের দুঃখে মার প্রাণ বড়ই ব্যথিত হ'ত। পুজোর ১২দিন তাদের কাছে কাটিয়ে মা পরম তৃপ্তিলাভ করলেন এবং সেই সঙ্গে ঢাকা সহরের বৃদ্ধ প্রচারকবৃন্দের সঙ্গে নিজের শারীরিক অসুস্থতা সর্বে গিয়ে দেখা করে নিজেকে খত বনে করলেন। এখন মনে হয়, যেন সকলের কাছে শেষ বিদায় নিতেই গিয়েছিলেন।

কলিকাতার ফেরবার সময় আমাদের খুড়তুতো বোন লাংপ্যাকে নিয়ে এলেন এবং শেষ পর্যন্ত তার হাতের সেবা পেরে কত তৃপ্ত হলেন। ঢাকা থেকে ফিরে মা ঠিক দেড়মাস আমাদের মাঝে রইলেন। গত ১০ই নভেম্বর, শ্রদ্ধা মহারাণী-স্মৃতি-দেবীর প্রথম সাধুস্মরিক দিনে কমলকুটারে-হবেলা উপাসনা ও কীর্তনে কত উৎসাহ করে গেলেন। ১২ই রবিবার, মার জন্ম-প্রকাশ পেল, সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। প্রথম-দিনও সকালে মা অরুকে অগ্রাহ্য করে সংসারের দৈনন্দিন-কর্মা সমাপন করলেন। মা বরাবর বলতেন যে, “আমার হাত পা থাকতে থাকতে আমি যেন চলে যাই।” বিশ্বাসীর কথা ভগবান শুনলেন। তাই মা মাত্র ৮দিন রোগ-শয্যায় রোগযাতনা ভোগ করলেন। তাও মা কোন দিন রোগের কথা ভাবেন না এবং আমরা যাতে না ভাবি, তার দিকেই মার লক্ষ্য ছিল। স্নেহের সন্তানদের প্রতি, দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের প্রতি মার কি অসীম স্নেহ ছিল; কিন্তু রোগশয্যায় তবুও মার মন কোন অশুভলোকের সন্ধান পেয়েছিল জানিনা; মা সংসারের আগন্তিক থেকে নিজেকে মুক্ত করে সেই উচ্চলোকের প্রতীক্ষা করছিলেন। সুদূর বিদেশে স্নেহের কছার কথাও মা ভাবলেন না; মার জীবনে মা এই বুঝিয়ে গেলেন যে, সেই পরম মাতার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হলে, সংসারের আগন্তিক, মারাত্মক বন্ধন কত সহজে কাটিয়ে মুক্ত হওয়া যায়।

মাগো, হোমাকে হারিয়ে আজ আমরা কত অসহায়। চিহ্ন-লোক থাকতে তুমি যে স্নেহের আঁচলে আমাদের ঢেকে রেখেছিলে—আজও আমরা সেই স্নেহের জায়গায় রয়েছি—

“মার হাতখানি—সদা আছে জানি

সন্তানের শিরোপরে;

মায়ের সে-প্রাণ—আছে বর্তমান

সন্তানের কাছে কাছে।”

এই গানের সার্থকতা যেন সব সময় আমরা উপলব্ধি করতে পারি। মা তুমি কোথায় জানিনা—কিন্তু রোগশয্যায় যে আনন্দ-উৎসবের কথা বার বার বলে গিয়েছিলে, আজ তা আমাদের বিশ্বাস-নয়ন খুলে দেখতে দাও; আর বুঝিয়ে দাও যে, অনন্ত অনন্দময়ীর কোলে পিতৃদেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি আনন্দ-উৎসব সন্তোষ করছ।

## স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

(৪ঠা ডিসেম্বর, প্রাক্কবাসরে, কল্যাণীমতী মাধ্যমবালা মল্লিক  
কর্তৃক পঠিত)

আমাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু  
মহাশয় চাওড়া জেলার অন্তর্গত পাঁচলা গ্রামে প্রসিদ্ধ বসুবংশে  
১৮৬৭ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অতি বালাকালে তিনি তাঁহার পিতার সহিত কলিকাতায়  
আসেন ও পরে আলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। সেইখান হতেই  
তাঁহার ধর্মজীবনের প্রথম সূত্রপাত হয়। বিনয়েন্দ্রনাথ, মোহিত  
চন্দ্র ও প্রমথলাল সেনের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক  
ধর্মপ্রবণ প্রাণ যেন এক নতুন আলোকের সন্ধান পাইল। সেই  
ভরুণ বয়সে স্বয়ং আচার্য্যদেবের অল্পপ্রেরণার পিতৃদেব নব-  
বিধানের পথে যাত্রা শুরু করিলেন।

ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থার্থ তাঁহাকে অশেষ লাহুনা ভোগ করিতে  
হইয়াছিল; কিন্তু আর্থিক এবং অল্প কোন প্রকার ক্ষতি তাঁহাকে  
কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই। “তোমারাই করিয়াছি  
জীবনের প্রবর্তার” একথা তিনি জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-  
পালন করিয়াছিলেন।

তারপর “স্বকর্মিণের প্রার্থনা-সমাজের” কার্যাবলীর মধ্য  
দিয়া তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য পরিণতি লাভ করিতে থাকে।  
ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন পিতৃদেবের মনের উপর বিশেষ প্রভাব  
বিস্তার করিয়াছিল। যদিও তিনি সংগীতচর্চা করিতেন না,  
তবুও ব্রহ্মসংগীতের আর সকল গানই তাঁহার কর্ণধ্বনি ছিল। সংঘমে,  
বিবাহে, জ্ঞানে ও কর্মে তাঁর এই ধর্মজীবন গঠিত হইল, উভা  
আমাদের আদর্শ হউক, ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি।

তারপর একে একে তাঁর প্রাণের বহুগুণ পরলোকগমন  
করিলেন, অপরদিকে পারিবারিক শোকের ত’ তাঁর অবধি ছিল  
না; কিন্তু নীরবে তিনি সকল ব্যথা সহ্য করে’ জীবনের শেষদিন  
পর্যন্ত এক অখণ্ড ভগবদ্বিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়া-  
ছেন। দারিদ্র্য, মনঃকষ্ট তাঁহাকে কখনও কর্ণভ্রষ্ট করিতে  
পারে নাই। তাই যেদিন তিনি প্রিয়তম কল্যাণী আকস্মিক  
মৃত্যুতে শোকাবল হইয়া বলিয়াছিলেন, “ভগবান! তুমি এ  
বজ্র দিয়েছ, তাইত সহ্য হয়”—সেদিনও কর্ণবিমুখতা তাঁহাকে  
স্পর্শ করিতে পারে নাই। ঋতু রুটিতেও তিনি জীবনের শেষ  
সেবাস্থল “সুশ্রীতি-শিকাগরে” অতি প্রভাবে শোকজীর্ণ শরীরটিকে  
টানিয়া লইয়া বাইতেন—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও বলিয়াছেন,  
“ওরে আমার সমাজের কাজ যে সব বাকী রইল,” নিজেকে কর্ত-  
ব্যের বোধীমূলে উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁর এতই ব্যাকুলতা ছিল।

তাঁর ধর্মজীবনের বহিঃপ্রকাশ আড়ম্বরশূন্য ছিল, কিন্তু  
অন্তরের অন্তঃস্থলে যে নিত্য মতোৎসব চলিত, তাঁর স্পর্শ পাইয়া  
নিজেনের কত দত্ত মনে করিয়াছি।

অস্বিম রোগের আবির্ভাবের সহিত পিতৃদেবের জীবনের  
সর্বশ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলির সূচনা হইল। নববিধানে বিখ্যাত মানবের  
প্রাণে যে কত বল সঞ্চার করে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা  
পেলান তাঁর মৃত্যুশয্যায়। অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও পরলোকের  
স্বর্ণস্থিতির তাঁর অন্তরালোকে উদ্ভাসিত চক্ষুর সম্মুখে এতটুকুও স্নান  
হয় নাই। যে মৃত্যু আমাদের নিকট বজ্রসমান, তাহা তাঁহার  
নিকট প্রেমের বার্তা, মিলনের বার্তা বহন করিয়া আনিল।

দেহের যন্ত্রণা বতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরমেশ্বরের সহিত  
মিলিত হইবার জন্য তিনি ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ক্রমে  
সেই পরমরূপ উপস্থিত হইল; জীবনে বিশ্বের পরিচয় প্রদান  
করিয়া, স্বপ্নে তাঁহারই জয় ঘোষণা করিতে করিতে, তিনি সেই  
বাহিত লোকে চলিয়া গেলেন।

প্রভু! তুমি ভবেদনা দাও না, তবে কেন আমরা শোক  
করিব। তোমার দিকে চাহিলেই ত দেখিতে পাই, স্বর্গীয় আত্মা  
তোমার শান্তি-ক্রোড়ে পরম আনন্দে, পরম তৃপ্তিতে মগ্ন—আমরা  
তাঁহাকে শান্তি দিতে পারি নাই, তাই বুঝি তাঁকে অনন্ত শান্তিতে,  
অনন্ত আনন্দে রাখিয়াছি।

হে করুণাময় প্রভু! পরলোকগত আত্মার তৃপ্তির জন্য  
আমরা যেন আমাদের জীবন, মন তোমার চরণে উৎসর্গ করিতে  
পাতি, আজ তুমি সেই আশীর্বাদ কর। পিতৃদেব যে মরণ-জরী  
বিদ্বেষের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই করুণামাত্র লাভ  
করিয়া আমরা যেন দত্ত হই—তোমার চরণে এই ভিক্ষা করি।

শান্তিঃ।

শান্তিঃ।

শান্তিঃ।

—০—

## শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

(পুরী ক্লাব হলে জন্মোৎসব-সভার আর সাহেব উপেন্দ্রনাথ  
দে কর্তৃক পঠিত)

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

এই উদার মতের দ্বারা কেশবচন্দ্র কেবল ভারতের নহে,  
সমগ্র জগতের সাম্প্রদায়িক গভীর বাঁধ ভাঙিয়া দিলেন। এই  
মত কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ,  
খ্রীষ্টান, শিখ, পারসীক, যিহুদী সকল ধর্মশাস্ত্র হইতে সার সত্য  
সংগ্রহ করিয়া, সাধনের সুবিধার জন্য একখানি গ্রন্থাকারে উহা  
প্রকাশ করিলেন। সর্বধর্মসম্বন্ধে এই বর্তমান যুগে ইহাই  
কেশবের স্থান অর্থাৎ সংকীর্ণতার গভীর অতিক্রম করিয়া, হৃদয়ের  
কবীট খুলিয়া দিয়া, দেশ কাল জাতি সম্প্রদায় ইত্যাদি দ্বারা  
অনাবদ্ধ সত্যকে সাধন দ্বারা জীবনে আধ্যাত্মিক ভাবে (Spiritual-  
ly) আত্মসাৎ করা। ১৮৬৯খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র “The Future  
Church” লব্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ধর্মসাধনে স্বাধীনতা



সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যৎ বিশ্বজনীন ধর্মসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া-  
ছিলেন—[Lectures in India—p. 100, 122—25 উইবা]

ওখানি ভারতের প্রতীকোপাসনাকে তিনি পৌত্তলিকতা-  
জ্ঞানে বর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ভবিষ্যৎ  
বিশ্বজনীন ধর্মে প্রতীকোপাসনার স্থান থাকিবে না। [See  
Lectures in India—p. 112—13.]

এই স্থানে বিশ্বজনীন ধর্মগঠনের যে একটু অপূর্ণতা রহিল,  
উহাই পূর্ণ করিবার জন্য পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব।  
স্বামী বিবেকানন্দ, Roman Rolland প্রভৃতি বর্তমান যুগের  
অনেক মনীষী ব্যক্তিবর্গের মত এই যে, বর্তমান পর্যন্ত জগতে  
কৃষ্টি বিচিত্রতা থাকিবে, ততদিন ধর্মসাধনের অর্থাৎ বহিঃক-  
সাধনের [Forms of worship] বৈচিত্র্যও থাকিবে—কোন  
প্রকার গভীর মধ্যে এই Future Church কে বন্ধ করা যায়  
না। কারণ জগতের অধিকাংশ লোক প্রতীকোপাসক এখনও  
আছে এবং আমাদের বিশ্বাস, বর্তমান কৃষ্টি থাকিবে, ততদিন  
থাকিবে। উদাহরণস্বরূপ বাহিরে কেলিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম গঠিত  
হইতে পারে না। অতএব শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখে  
এই মত প্রচার করিলেন যে, “ঈশ্বর সাকারও বটে, নিরাকারও  
বটে, আবার সাকারও নহেন, নিরাকারও নহেন অর্থাৎ উভয়ের  
অতীত।” গীতার মতে তিনি “অচিন্ত্যরূপ” অথচ “অনন্তরূপ”—  
সমগ্র বিশ্ব তাঁহার একটা রূপ—আবার তাঁহার মাধুর্যরূপও  
আছে। পরমহংসদেব বলেছেন—“নিরাকারে বিশ্বাস সে ত  
ভালই; কিন্তু একথা বলিও না যে, সাকার উপাসনা কিছুই  
নহে, উহা ভ্রম।”

এইরূপে ভগবান্ ঈশ্বর সকল গভীর, সকল সাম্প্রদায়িকতা  
ভাঙ্গিয়া দিয়া, এই তিনজন মহাজননের দ্বারা এই উদার—“উদার-  
চরিতানন্ত বসুধৈব কুটুম্বকম্”—বিশ্বগ্রামী বিশ্বধর্ম প্রচার  
করিলেন। অতএব রামমোহন, কেশব ও রামকৃষ্ণ সেই অনন্ত-  
শক্তি ঈশ্বরের বিশ্বধর্মপ্রকাশরূপ শক্তি-শৃঙ্খলে এক একটা  
link। ইংল্যান্ডের এক করিয়া যিনি দেখেন, তিনিই দেখেন;  
যিনি ভিন্ন করিয়া কে ছোট, কে বড় নির্ণয় করিতে চান, তিনি  
অন্ধ।

বর্তমান যুগের হিন্দুধর্মাবলম্বিগণ আচার্য কেশবচন্দ্রের নিকট  
বিশেষ ভাবে ঋণী। সে কত আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা  
জানাইরা এই সামান্য বক্তব্য শেষ করিব। হিন্দুর প্রতীকো-  
পাসনা (symbolism) যে পৌত্তলিকতা (Idolatry) নহে,  
তাহা তিনি বুঝিতেন না, এমন নহে। তবে যে তিনি উঃ  
স্বরূপতঃ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার কারণ মনে হয় যে, তিনি  
বুঝিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ একদল লোক উহার প্রতিশ্রুতি  
করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, উহা প্রকৃতই পৌত্তলিকতার দাঁড়াইয়া  
যাইবে। হিন্দুধর্মের দুর্গোৎসবাদি তিনি ভাবে [in spirit] নব  
দুর্গোৎসবাদি নাম দ্বারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এরূপ

করিয়া দুর্গোৎসবাদির প্রকৃত মর্ম কি, তাহা তিনি হিন্দুসমাজের  
সম্মুখে উন্মুল করিয়া ধরিয়াছিলেন। তদ্বারা আমাদের যে  
বিশেষ উপকার হইয়াছে, একথা কোন মতে অস্বীকার করা  
যায় না।

দ্বিতীয়তঃ আচার্য কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া এবং  
তাঁহারই জীবনের আলোকে, অবিপ্রবর শ্রীমদ্ উপাধ্যায় গৌর-  
গোবিন্দ রায় মহাশয় যে কয়েকখানি হিন্দুধর্মশাস্ত্রের ভাষা প্রকা-  
শিত করিয়াছেন—যথা বেদান্তসম্বন্ধভাষ্য, গীতাসম্বন্ধভাষ্য এবং  
গীতাপ্রবৃষ্টি বা শ্রীমদ্ভাগবত—সেগুলি বর্তমান বিজ্ঞান-প্রধান  
যুগে এই সকল শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে লোকের কি পর্যন্ত সহায়তা  
করিতেছে ও করিবে, তাহা কথার বলা যায় না। এই সকল  
ভাষ্যের মধ্যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সকলের গভীর  
গবেষণামূলক এবং নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ সাধনামূলক যে  
সকল তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, উহা জগতে অতুলনীয়। তাঁহার  
প্রণীত “শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম” নামক গ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের  
মানবলীলা রূপ জীবন যে মত উচ্চ আদর্শে গঠিত, তাহা অত্রি-  
নিপুণভাবে বর্তমানের সভ্য সমাজের নিকট দেখাইয়াছেন। (এ  
গ্রন্থখানি শ্রীমদ্ বক্রিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হইবার  
পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল।) এই সকলের জন্য আজ বিশেষ  
ভাবে শ্রীমদ্ আচার্য কেশবচন্দ্রের চরণে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ  
প্রণাম জানাইতেছি।

মন্তব্য—রাজর্ষি রামমোহন সম্বন্ধধর্মের হৃদযাত্রা জানে  
করিয়াছিলেন, কার্যতঃ তিনি একমাত্র বৈদিক ধর্মই সাধনের বিষয়  
করিলেন। শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ দেবও যদিও সম্বন্ধধর্ম স্বীকার  
করিলেন, কিন্তু কার্যতঃ তিনি একমাত্র হিন্দুতাকেই প্রাধান্য  
দিলেন কিংবা হিন্দু সম্বন্ধভাবই তাঁর অমুগামী শিষ্যগণ গ্রহণ  
করিলেন। জীবনের সাধন দ্বারা পূর্ণ সম্বন্ধবিধান শ্রীকেশবচন্দ্রই  
প্রতিষ্ঠা করিলেন। দুঃখ এবং আলতাকে মিলাইলে, দুঃখের রংও  
থাকে না, আলতার রংও থাকে না, আর এক নূতন রং হয়।  
অমর্ত্যের উপাসনার সহিত মর্ত্যের উপাসনার সম্বন্ধ কেমনে হয়,  
চিন্তার পূজা মৃত্যুর আধারে কেমন করিয়া হয়, কেশবের পূজার  
ভিতর দিয়া দেবদেবী-পূজার আধ্যাত্মিকতা কিরূপে উপলব্ধি  
করা যায়, যুগধর্মবিধানে তাহাই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অন্বেষণ  
করিয়াছেন।—[ ধঃ সঃ ]

## ভক্ত প্রকাশচন্দ্র ও মধুসূদন।

[ বাৎসরিক স্মৃতির দিনে ]

নববিধানমণ্ডলীর ইতিহাসে ভক্ত প্রকাশচন্দ্র ও মধুসূদন  
মধুসূদনের জীবন-কাহিনী বর্তমান ত্রাণ পরিবারের নিকট  
শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। ভক্তজীবন অধ্যয়ন করিলে শিষ্টা

নূতন শিক্ষা লাভ হয়। তত্ক্ষণাতঃই জীবনে দেখাযায়, বিত্তীয় কার্যক্ষেত্রে মজা ও কাজের ভগবানের ভিতরে বসে কঠোর পাবে। তত্ক্ষণাতঃই বিত্তীয় প্রদেশে তিনটি মাসিকের মাসিক কার্যবাস্তবতার মধ্যে উপাসনার মহাভাব গভীর অবিচলিত অবস্থায় মজা চলিয়াছে। সে প্রত্যেক কদিন মনোভূত হয় নাই। প্রতিদিন চাইবার পারিবারিক উপাসনা মনোভূত আরও তিনবার নির্জনে ভগবানের নিকটে হইতেন। উপাসনা তাঁহার জীবনে সঙ্গের লক্ষী ছিল। বাকিপুর অবস্থান কালে এক সময়ে তাঁহার কার্যস্থান গয়া নগর হইতে বহুদূরে বিদ্যাগিরিতে “কোকনদ” নামক এক জলপ্রপাত দেখিতে কয়েকটা যুবকবৃন্দসহ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। পালাড়ের প্রান্তরথও উপাসনার আসনে সকলে বসিলেন। এক দিকে সেই প্রান্তরের পার্শ্বাংশি সহস্র ধারার মত ঝরঝর শব্দ করিয়া সমীপে তুলিয়াছে, আর অপর দিকে প্রকাশচন্দ্রের প্রাণ-শালী উপাসনার ধারা আশ্বাদের প্রাণের ভিতরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি উপাসনার ভিতর দিয়া সকলকে আকর্ষণ করিতেন। তিনি যখন বাকিপুরে, তখন নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এক অংশে সমাজে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি এখানে স্রীর ভবনে তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্মিণী দেবী আশোর কামিনীর নামে যে “আশোরপরিবার” প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে উত্তর সমাজেরই কল্যাণ ও মহিলাগণ নানাতান হইতে আদিয়া বাস করিতেন এবং দেবী আশোর কামিনীর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। এই পরিবারের ভিতর প্রাতে ও সন্ধ্যায় পারিবারিক উপাসনার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। নববিধানে প্রকাশচন্দ্রের বিশ্বাস ও নববিধানাচার্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অলোভা ত্রি বর্তমান যুগে শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মনীষা-সম্পন্ন শ্রেষ্ঠতম নেতা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার বাহ্য ও যুবক জীবনের সমপাঠী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের এ মধুর সম্বন্ধ অক্ষুর ছিল। উভয়েই উভয়কে নাম ধরিয়া ও “তুমি” “তুমি” বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কুচ-বিহার বিবাহের পর শাস্ত্রী মহাশয় বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু বিমালী প্রকাশচন্দ্র টলিলেন না। তিনি বলিতেন, “এমন দিন আসিবে, যখন বিরোধী মিত্র হইবে এবং অব্যাহতকারী বন্ধন করিবে।” বর্তমান শতাব্দীর উষাকালে যখন প্রকাশচন্দ্র ও শাস্ত্রী মহাশয় দার্জিলিংয়ে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস যন্ত্র হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় তখন তাঁহার হস্তাক্ষরে লিখিত ইতিহাস খানি এক প্রকাশচন্দ্রকে দেখিতে দিয়াছিলেন। তত্ক্ষণাতঃই সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যখন বহুকে ফিরাইয়া দেন, তখন বলিলেন, “শিবনাথ! তুমি যদি পক্ষপাতশূন্য না হইয়া এই ইতিহাস প্রকাশ কর, অবশ্যই তোমাকে গ্রহণ করিবেন।”

পণ্ডিত জৈনচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনীলেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার তেজস্বী লেখনী ধারণ করিয়া “নবাত্মক” পত্রে প্রকাশিত ইতিহাসের তীব্র সমালোচনা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিলেন। তাহার পর অধ্যাপক দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় তাঁহার “Behold The Man” গ্রন্থ সাধারণের চক্ষে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাঃ ভি. বার মহাশয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের “জীবন-বেদ” ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া তাহার সুখব্দে লিখিলেন, “Keshub Chunder Sen, up to now, is the highest water-mark in the universal religion of the Brahmo Somaj;” এবং আচাৰ্যদেবের ইংরেজি “True Faith” গ্রন্থেরও কল্যাণবাদ প্রকাশ করিলেন। তাহার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন শতবার্ষিক উৎসব করিলেন, তখন উক্ত সমাজের মনীষী ও অগ্রতর নেতা ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আমেরিকা হইতে সমাগত খ্রীষ্টানী ভক্ত South Worth এর পার্শ্ব দাঁড়াইয়া তাঁহার তেজস্বিনী ভাষার ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্রের বিত্তীয় কার্যক্ষেত্রে কথা বলিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার তত্ক্ষণাতঃই অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি যে গুরুর সামনে বসিয়া ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গুরুর জন্মদিনের উৎসবে, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর নগরে প্রকাশ্য সভায়, ১৯১০ সালে, তাঁহার ওজস্বিনী ভাষার গুরু জীবনী সম্বন্ধে তুরসী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তত্ক্ষণাতঃই তাহার ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হইতেছে।

তাঁহার পর তত্ক্ষণাতঃই মধুসূদনের জীবন একটি বিশেষ আশোচা বিষয়। নবীন শিশু নববিধানের আত্মদর কালে যখন তত্ক্ষণাতঃই নববিধানের নবীন মন্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই উষাকালে তত্ক্ষণাতঃই পারিবারিকরূপে মধুসূদন দাঁড়াইয়া ছিলেন। প্রভাত সূর্য্যের নবীন রশ্মিতে যেমন নবশিশু ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, শিশুপ্রকৃতি মধুসূদন সেই নবধর্মের নবীন রশ্মিতে সেইরূপ বাড়িতে লাগিলেন। যুবক মধুসূদন কলিকাতায় ছেলার স্কুলে পাবলিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া বেঙ্গল ব্যাঙ্ক কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং সামাজিক ও পারিবারিক অধ্যয়ন অতিক্রম করিয়া তত্ক্ষণাতঃই সহিত ধর্ম-বিশ্বাসের অনুরাগ যোগে যুক্ত হইয়াছিলেন। অত্যা সে সময়ে তাঁহার আত্মীয় ও স্বজনবর্গের ভিতর হইতে অনেক বাধা বিঘ্ন ও নিন্দাবাদ তাঁহার উপর আদিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সে সমুদয় তাঁহার নিকট হইতে বায়ু-বিতাড়িত গুহ্মজের মত চলিয়া গিয়াছিল। বিশ্বাসবীর যুবক মধুসূদন আপনায় বিশ্বাস-কেদ্র হইতে কোনদিন বিচলিত হন নাই। বিশ্বাসের কার্যে বিধাতার কার্য্য অশৌকিক। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্মিণী মঙ্গলা দেবী এক নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবার হইতে উদ্ভূত ছিলেন। তিনিও ক্রমশঃ নবধর্মবিশ্বাসে আমোদ এই নবজীবনের প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। কোমল লজ্জিকা যেমন লবমান যুবকে

আশ্রয় করিলে সেই বৃক্ষের সঙ্গে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে এবং অভেদা বোঝে যুক্ত হয়, দেবী মঙ্গলাও সেইরূপ প্রেমভক্তিরসে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী মঙ্গলা দেবী তৎকালীন কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রাসায়নিক বিভাগের প্রধানতম রাসায়নিক পরীক্ষক রায় বাহাদুর তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের একমাত্র ভগিনী ছিলেন। রায় বাহাদুর তারাপ্রসন্ন রায় মহাশয় শ্রেষ্ঠ বৈদ্যবংশজাত নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। দেবী মঙ্গলা তাঁহার প্রেমভক্তি ও বিশ্বাসের প্রভাবে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃবর্গের সদর আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। ভগিনী ধর্মাস্তর গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের ভিতরে ভগিনীর প্রতি অচলা ভক্তি ও ভালবাসা ছিল।

নববিধানে গঠিত এই নবীন পরিবারের আর এক ঐতিহাসিকতার ইতিহাস বিবৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সেই পুরাতন সংস্কারের যুগে কতক্ষে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা সঙ্ক সাহসের কাজ ছিল না। ব্রাহ্ম পরিবারও এই সাহসিক কার্যে সহজে অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তত্ত্ব মধুসূদন ও ভক্তিমতী দেবী মঙ্গলা ভগবানের আশ্রয় পাঠিয়া সেই যুগে তাঁহাদের প্রথম কন্যা দেবী সুমতিতে ব্রাহ্মানন্দ-প্রতিষ্ঠিত নেটিভ লেডিস নর্সাল বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। এই সময়ে নিষ্ঠাবান হিন্দু নারীবিদ্যালয়কে ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। বিবাহের পরও দেবী সুমতিতে নারীবিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ছিলেন। সেই সময়ে এই বিদ্যালয় ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

যাচা হটক, তত্ত্ব মধুসূদন নানারূপ অসুস্থ ও শ্রান্তিকুল স্রোতের মধ্যে পড়িয়াও একটা আদর্শ পরিবার গঠন করিতে পারিয়াছিলেন। এই পরিবার হইতেই পরিবারের গৌরব-স্থানীয় অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ উদ্ভিত হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার ।

## সংবাদ ।

**শুভবিবাহ**—বিগত ১২ই অগ্রহায়ণ, বৈশাখীপুর কাঁধি-সহরে, মালদহ নিবাসী স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কন্যা কল্যাণীয়া কুমারী আশালতার সহিত, ডাক্তার শশীভূষণ দাস গুপ্তের তৃতীয় পুত্র কল্যাণীর শ্রীমান সত্যভূষণের শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কস্তার মাতা সম্প্রদান করেন। তাই অখিলচন্দ্র রায় আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর, ঢাকা নগরীতে, বিধানপল্লীস্থ দেবালয়-প্রাঙ্গণে, শ্রদ্ধেয় তাই মহিমচন্দ্র সেনের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী ক্ষীরোদমণির সহিত, তত্ত্ব ডাক্তার উমাশ্রয় ঘোষের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় তাই দুর্গানাথ রায় উপাসনা এবং তাই গোপালচন্দ্র গুহ পুরোহিত্য করেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর, গিরিদিতে, কলিকাতা-নিবাসী স্বর্গীয় বিনোদবিহারী বসুর তৃতীয় পুত্র কল্যাণীর শ্রীমান মনোমোহনের

সহিত, গিরিদি-প্রবাসী শ্রীযুক্ত দ্বিতেন্দ্রনাথ দেব কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী উমার শুভবিবাহ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। তাই শ্রিয়নাথ মল্লিক এই অমুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কাজ করেন।

গত ১৫ই ডিসেম্বর, ৬২বি একডালিয়া রোডে, সাধু অঘোরনাথের পৌত্রী, শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ গুপ্ত রায়ের প্রথম কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রতিভা সহিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক স্বর্গীয় গুরুদাস চক্রবর্তীর কনিষ্ঠ পুত্র কল্যাণীর শ্রীমান প্রেমকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বেনীমাধব দাস শুভমুষ্ঠানে আচার্য্য ও পুরোহিতের কার্য্য করেন।

ভগবান্ সম্পতি-চক্রবর্তীকে স্বর্গের শুভাশীষ দান করিয়া, নিত্য কল্যাণের পথে রক্ষা করুন।

**গৃহ-প্রবেশ**—গত ৯ই ডিসেম্বর, পুরীধামে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোপাল স্বামী নাইডুর "গোপাল ভিলি" নামক গৃহ নবসংহিতার প্রার্থনা সহ উৎসর্গীকৃত হয়। গৃহস্বামী ও একজন ইংরাজ বন্ধু ও দুইজন ইংরাজ মহিলা প্রার্থনার যোগদান করেন।

**সেবা**—গত নবেম্বর মাসের, চারিটা রবিবার ও ডিসেম্বর মাসের প্রথম রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মসন্ধির তাই শ্রিয়নাথ উপাসনা করেন। ২৮শে নবেম্বর আমসেদপুরে গিয়া ভ্রাতা মিঃ অমলাচরণ বসুর বাড়ী দুইদিন অবস্থান করিয়া উপাসনাদি করেন, কয়েকটা বাড়ী বাড়ী গিয়াও প্রার্থনা ও প্রসঙ্গাদি করেন। ৩০শে গির্জাঘাতে গিয়া শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, সন্ধ্যার স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া উপাসনা ও প্রসঙ্গাদি করেন। ১লা ডিসেম্বর, সেখানেই উপাসনা করিয়া বাগদান শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রমে আগমন করেন। ৭ই ডিসেম্বর, পুরী গিয়া দুইদিন সেবা করেন ও ১০ই ডিসেম্বর, কটক ব্রহ্মসন্ধির সামাজিক উপাসনা করেন। ১১ই ডিসেম্বর, শ্রীমান্ অধ্যাপক নিরঞ্জন নিরোগীর বাড়ীতে পারিবারিক উপাসনা করেন ও স্থানীয় কয়েক বাড়ীতে প্রার্থনা প্রসঙ্গাদি করিয়া আশীর্বাদ করেন।

বিগত ১৭ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, শ্রান্তে কাঁধি ব্রহ্মসন্ধির তাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন, "অখণ্ড মানবত্বের সাধনার ধরার স্বর্গহাপন" বিষয়ে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন।

**পারলৌকিক**—গত ১২ই ডিসেম্বর, ২৮নং রামকমল সেন গেলে, আমাদের শ্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেনের প্রথম শিশু দৌহিত্রের অকস্মাৎ মৃত্যুর একমাস পূর্ণ দিনে, স্নাতা ও পরিজনবর্গের সান্ত্বনার্থ বিশেষ উপাসনা হয়। তাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত মধুর সংগীতে সকলের প্রাণে তৃপ্তি দান করেন। ভগবান্ বাগগোপালরূপে সন্তানহারী মাত্র কোলের শূন্য স্থান পূর্ণ করে থাকুন, এবং সকল শোকার্ভ প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করুন।

**আত্মশ্রাদ্ধ**—গত ৩রা ডিসেম্বর, ১নং গির্জাঘাটের সেনে, স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনের সহধর্মিণী স্বর্গীয় দেবী সুরলা

সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ পূর কত্যা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীমতী ইন্দিরা রায় ও শ্রীমতী মণিকা গুপ্ত কর্তৃক, নবসংহিতাসূত্রে অনুসরণে ও গভীরভাবে স্মরণ হইয়াছে। মাননীয়া মহারানী শ্রীমতী সুরেন্দ্র দেবী গভীর ও প্রাণস্পর্শী উদ্বেগ ও আরাধনা দ্বারা সকলের প্রাণে তৃপ্তি দান করেন। তাই অক্ষয়কুমার লখ পাঠ, প্রার্থনা ও অমৃত্যুনের অস্ত্রাঙ্গ অংশ সম্পন্ন করেন। বজ্রবাক্য অনেকই প্রকাশিতভাবে অমৃত্যুনে যোগদান করিয়া পরলোকগতা দেবীর পূত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কত্যা শ্রীমতী ইন্দিরা রায় মাতৃদেবীর উদ্দেশে ছন্দের “প্রজ্ঞালি” পাঠ করিলে, পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন নব-সংহিতার প্রথম শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। অমৃত্যুনের প্রথমেই “জয় জয় সতিদানন্দ হরে!” সঙ্গীত করিতে করিতে, পবিত্র তন্ত্রাধার সহ সমাধিসন্ধিরে বাইরা, তদায় নবসংহিতার প্রার্থনাস্তে তাহার রক্ষিত হয়। এই পবিত্র অমৃত্যুনে পুত্র ও কত্যাগণ মিলিত হইয়া প্রচারক ও অস্ত্রাঙ্গ বজ্রদের অস্ত্র বজ্র ও স্থিতিচিহ্ন দ্বাভীত নিয়মিত দান উৎসর্গ করিয়াছেন :—

নববিধান প্রচারভাণ্ডার ২০, কাস্তিচন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার ২০, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১৫, লক্ষ্মী ব্রহ্মমন্দির ১০, ঢাকা ব্রহ্মমন্দির ১০, পুরী ব্রহ্মমন্দির ১০, করাচী ব্রহ্মমন্দির ৫, মরমনসিং ব্রহ্মমন্দির ৫, ব্রাহ্ম রিগ্বেদ ৫, বালকদিগের নীতি-বিদ্যালয় ৫, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ৫, ভগ্নীসমিতি ৫, পুণ্যাশ্রম ৫, অক্ষয়দ্যালয় ৫, কালা বোবাদের স্কুল ৫, বালিকা হীরানন্দ আশ্রম ৫, অনাথাশ্রম ৫, গোবিন্দকুমার আশ্রম ৫, হিরণ্যদী বিদ্যা শিলাশ্রম ৫, মোট ১৫০ টাকা।

গত ৪ঠা ডিসেম্বর, শান্তিকুটীরে, স্বর্গীয় জ্ঞাত দেবেন্দ্রনাথ বসুর শ্রাদ্ধাযুষ্ঠান পুত্রকত্যা কর্তৃক গভীরভাবে সম্পন্ন হয়। তাই প্রিয়নাথ মল্লিক, তাই গোপালচন্দ্র গুহ এবং তাই অক্ষয়কুমার লখ লম্বাযোগে অমৃত্যুনে সম্পাদন করেন। পুত্র প্রভাতকুমার প্রধান শোককারীর প্রার্থনা করেন এবং কত্যা শ্রীমতী মাধববালা মল্লিক পিতৃ-তর্পণ পাঠ করেন। এই অমৃত্যুনে নিম্নলিখিত দান উৎসর্গ হইল :—ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ৪, প্রচারভাণ্ডার ৪, নববিধান ট্রেড ২, অনাথ আশ্রম ২, ব্রাহ্মরিগ্বেদ ২, Little sisters of the poor ২, শ্রীব্রহ্মানন্দাশ্রম ২, পুরী সর্বদর্শনমন্দির নববিধান প্রতিষ্ঠান ২, খাঁটুরা ব্রাহ্মসভা ২, স্থানীয় শিক্ষালয় ৪, এবং ৩টা ভোজ্য, বস্ত্র, শয্যা, পাছকা, ছাতা ও তৈলসাদি।

ভগবান পরলোকগত আত্মা সকলের কল্যাণ করুন এবং পৃথিবীতে শোকাক্তদের প্রাণে স্বর্গের শান্তি ও সাধনা বিধান করুন।

উৎসব—গত ১৮ই নভেম্বর, রবিবার হইতে নির্মলা বসু ও শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্র শ্রীমতী চপলা মজুমদারের আহ্বানে হাজারী-বাগে সন্মানিত করেন। ১৯শে ব্রহ্মানন্দের জন্মদিনে, রবিবার উৎসব-কালে, “চকলাকুটীরে” উৎসব হইল, প্রাতে ৮টার সাধারণ

ব্রাহ্মসভায় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাট্টাঙ্গির উপাসনার যোগ দেওয়া হয়, মধ্যাহ্নে “চকলাকুটীরে” ব্রহ্মানন্দ-ভোজ হয়, বৈকালে রাম-মোহনের শতবার্ষিক উপলক্ষে কেশবহলে, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাট্টাঙ্গির সভা-নেতৃত্বে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান বক্তৃতা করেন; সন্ধ্যাকালে নববিধান মন্দিরে শ্রীযুক্ত ব্রজকুমার নিরোগী উপাসনা করেন, শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মজুমদারের গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের উপদেশ “কেশবচন্দ্র কোথায়” পাঠ করেন। ২০শে প্রাতে স্বর্গীয় শ্রদ্ধের নালদার সমাধিস্থান দর্শন করিয়া মাতৃস্তোত্র পাঠ হয়; বৈকালে কেশবহলে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাট্টাঙ্গির বক্তৃতা করেন। ২১শে হইতে ২৪শে পর্যন্ত প্রাতে “চকলাকুটীরে” উপাসনাগৃহে কেশবচন্দ্রের জন্মদিন-স্মরণে বিশেষ ভাবে উপাসনাদি হয়। ২৫শে প্রাতে হাজারীবাগের স্বর্গাকুণ দর্শন করিয়া, রানাদির পর প্রাতে “চকলাকুটীরে” বিশেষ উপাসনা হয়; শ্রীমতী হেমলতা চন্দ্র উপাসনার কার্য্য করেন। ২৬শে, রবিবার, বৈকালে “চকলাকুটীরে” শ্রীমতী নির্মলা বসুর আগ্রহে ও শ্রীমতী চপলা মজুমদারের প্রস্তাবে একটি মহিলা-সম্মিলনে স্থানীয় সন্ন্যাসী ২৫৩ জন মহিলা উপস্থিত হন। সংগীত, শ্রাধা ও পাঠাদির পর স্বর্গীয়া চকলা নিরোগীর জীবন-চরিত্র আলোচনা হয়। কয়েকটি মহিলা তাঁর স্থাপিত মহিলা-সমিতি, বাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়। সন্ধ্যাকালে নববিধান ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু উপাসনার কার্য্য করেন।

আগামী ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুন্সের ভক্তিতীর্থে উৎসবের অমৃত্যুনে হইবে। নবভক্তিসাধনার্থী ভাইভগ্নীগণের উপস্থিতি ও যোগদান প্রার্থনীয়।

প্রত্যাবর্তন—স্বর্গীয় মদনমোহন সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ বিবেকমোহন সেন (এম, বি,) ছই বৎসর জাম্বানীতে চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, কলিকাতার প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে, গত ৩০শে নভেম্বর, সন্ধ্যায়, ১১৫ মন্থর ভট্টাচার্য্য স্ট্রীটে, তাই অক্ষয়কুমার লখ বিশেষ উপাসনা করেন। মাতৃদেবী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী সেন ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া সন্তানের কল্যাণার্থ প্রার্থনা করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী দাসও কল্যাণ ভিক্ষা করিয়া প্রার্থনা করেন। ভগবান তাঁর পুত্রকে শুভাশীষ দান করুন। এই উপলক্ষে মাতৃদেবী প্রচারভাণ্ডারে ১ ও ব্রহ্মমন্দির ১ টাকা দান করিয়াছেন।

সমাধি-প্রতিষ্ঠা—গত ১০ই ডিসেম্বর, পূর্বাহ্নে, ৭টাবি অপার সার্কুলার রোডে, কমলকুটীরস্থ নবদেবালয়ের সম্মুখে, আচার্য্যদেব ও আচার্য্যপত্নীর সমাধিসমুপে, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠা কত্যা কুচবিহারের মাননোয়া মহারানী স্বর্গীয়া শ্রীমতী স্থনীতি দেবীর পবিত্র ভগ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্থানীয় ব্রহ্মসভার প্রস্তাব-নির্মিত সমাধি-স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ময়ূরভদ্রের মাননোয়া

মহারানী শ্রীমতী সূচাক দেবী সমাধিপার্শ্বে উপাসনা করিয়া সমাধি-প্রতিষ্ঠার পবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র সেন আচার্য্যদেবের প্রার্থনা এবং শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র সেন মাতৃ-দেবীর প্রার্থনা পাঠ করেন।

**পাটনার সংবাদ**—বিগত ১৯শে নবেম্বর, বাকিপুর মনবিধান ব্রহ্মবলিরে শ্রীমদাচার্য্যদেবের জ্যোৎস্ন উপলক্ষে, বি, এন, কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ডি, এন, সেন উপাসনা করেন। ২১শে ও ২২শে নবেম্বর, রাজা রামমোহন রায়ের বর্গারোহণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে বি, এন, কলেজের প্রস্তুতহলে, ব্রহ্মী সভায়, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও ব্রাহ্মবঙ্গগণ এবং ২১১ জন ইংরাজও উপস্থিত ছিলেন। রাজা রামমোহনের ওপাবলি কীর্তন ভক্ত সকল সম্মুখের হটহেট বক্তা দণ্ডারমান হইয়াছিলেন।

পাটনায়, ৪নং ম্যাকলস্-রোডে, গত ১লা ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত গৌরীশাসন মজুমদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ মজুমদারের জন্মদিনে, ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর, কলিকাতার সতিত বোগ রক্ষা করিয়া, বর্গীয়া সরলা সেন এবং বর্গীয়া দেবেন্দ্রনাথ বহুর প্রতি প্রজ্ঞাপ্রকাশার্থ এবং ৭ই ও ১০ই ডিসেম্বর ভক্ত বর্গীয়া প্রকাশিত্র ও মধুসূদনের বর্গারোহণদিন-স্মরণার্থ উপাসনা করিয়া ছিল। সংদিনই শ্রীযুক্ত গৌরীশাসন মজুমদার উপাসনা করেন।

**কোচবিহারের সংবাদ**—গত ৭ই নভেম্বর, বর্গীর মহা-রাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের সাধ্বসঙ্গিক দিনে, সমাধিপার্শ্বে শ্রীযুক্ত কেশবনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ১০ই নবেম্বর, শ্রীশ্রীমতী মহারানী সুনীতি দেবীর প্রথম সাধ্বসঙ্গিক দিন উপলক্ষে কেশবপ্রসন্ন সমাধিপার্শ্বে বিশেষ উপাসনা হয়। কলিকাতা হইতে আগত পাটনার এডভোকেট শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার উপাসনা করেন এবং রাজমাত্যবর্গ ও কর্মচারিবৃন্দ সকলেই প্রায় বোগদান করেন। সন্ধ্যায় লালডাউন হলে স্তুতিসভা হয়। টেট জজ মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ গুহ সভাপতির কার্য্য করেন। উজ্জ্বল সুরেন্দ্রকান্ত বহু মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার মহারানীর জীবনী সম্বন্ধে প্রজ্ঞাপ্তী অর্পণ করেন। সন্ধ্যায় সমাধিপার্শ্বে কীর্তনাদি হয়। ১২শে নবেম্বর, এবং মনবিধানাচার্য্যদেবের জন্মদিন উপলক্ষেও আশ্রমকূটরে ভ্রাতা কেশবনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনা করেন। ৩রা ডিসেম্বর, রাজর্ষি রামমোহনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে লাল-ডাউন হলে শ্রীযুক্ত বতীপ্রমোহন সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে স্তুতি-সভা হয়।

**দাম্ভসঙ্গিক**—গত ১২ই অগ্রহায়ণ, অমরাগড়ীর শ্রীযুক্ত কেশবনাথ রায়ের সহধর্মিণী বর্গীয়া যাক্রমণি দেবীর সাধ্বসঙ্গিক দিনে, অমরাগড়ীতে “কৃপাকূটরে” সমাধিপার্শ্বে ভাই অখিলচন্দ্র রায় উপাসনা করেন এবং কেশবনাথ বিশেষ প্রার্থনা করেন। কলিকাতায় ৩০/১১/৪০ বৈষ্ণবাবতার হীটে, জামায়া শ্রীযুক্ত হরি-সুন্দর দাসের পুত্রস্বর্গেই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন এবং জামায়া বিশেষ প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে জামায়া প্রচার-

ভাণ্ডারে ২ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ, (২৯শে নবেম্বর) দিনাপুরে, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বহুর মাতৃদেবীর সাধ্বসঙ্গিক, শ্রীযুক্ত মধুসূদন সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে বিধুনাথ প্রচারভাণ্ডারে ৪-৩ অনাধ আশ্রমে ২ টাকা দান করিয়াছেন।

১লা ডিসেম্বর, শ্রীযুক্ত প্রেরিত ভাই উমানাথের সাধ্বসঙ্গিক দিনে শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রসাদ, এই ডিসেম্বর, বিধান-বিধানী গৃহস্থ বৈরাগী জেছের মাতৃদেবীর বহুর সাধ্বসঙ্গিক দিনে মনবিধানের ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন। এই শ্রীকৃষ্ণদাসপ্রসাদে ভ্রাতা বতীপ্রমোহন বহু ও কটকে শ্রীযুক্ত বিধুনাথ কর উপাসনা করেন। ৮ই ডিসেম্বর, বর্গীর ভাই কালীনাথের, ৯ই বর্গীর সাধু অশোক-নাথের সাধ্বসঙ্গিক দিন স্মরণে পুরী লবণপুত্রে ভাই প্রিয়নাথ উপাসনা করেন এবং বর্গীর ভ্রাতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী ভাই কালীনাথের বিনে বিশেষ প্রার্থনা করেন ও দুই দিনই সংগীত করেন।

এই ডিসেম্বর, ৭/১১ হারিধন রোডে, শ্রীযুক্ত নীতিলাল ঘোষের মাতৃদেবীর সাধ্বসঙ্গিক দিনে, ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন।

গত ৮ই ডিসেম্বর, বর্গগত ভাই কালীনাথ ঘোষের বর্গারোহণের সাধ্বসঙ্গিক, ২৪নং তারক চাট্টার্মি লেনে, গাংত ভাই অক্ষয়কুমার লখ, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বেবীনাথ দাস উপাসনা করেন। ভাবে ভোলা, প্রেমে মাতোয়ারা, দিলদরদী, ভগবানের চরণে আত্মাৎ-সর্গকারী, বৈরাগ্যের স্তম্ভর জীবনখানি উপাসনার ভিত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

গত ৯ই ডিসেম্বর, ৩২বি একডালিয়া রোডে, সাধু অশোক-নাথের বর্গারোহণের সাধ্বসঙ্গিক দিনে, তাঁর পুত্রদের গৃহে, তাঁর বিমলচন্দ্র ঘোষ উপাসনা করেন। তিনি লক্ষ্যোদগরীতে মহা-প্রসন্নকণের স্তম্ভর ও পবিত্র চিত্র বর্ণনা করিয়া কপেন, মন-বিধানের যোগী তত্ত্ব শ্রীযুক্ত নির্মল লাত্ত করিয়াছিলেন। গুলিয়াই, এমন স্তম্ভর “শাক্যানুচিহ্নিত” লিখিতে পারিয়াছিলেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর, ২৮নং নিউরোডে, আলোপুরে, ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেনের গৃহে, তাঁরদের পিতৃদেব গৃহস্থসাবক বর্গীর মধুসূদন সেনের সাধ্বসঙ্গিক বক্তোজ্ঞাব্য উপাসনা করেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর, ২৯/১১ বগদিয়া পাড়া টেনে, বর্গগত শান্তসাবক ভাই কেশবনাথের পুত্র বর্গীর মনোপঙ্কজ দেব সাধ্বসঙ্গিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লখ উপাসনা করেন। তদীয় শ্রীমতী অশোকলতা দাস বিশেষ প্রার্থনা করেন।

Edited on behalf of the Apostolic Durbur New Dispensation Church, by Rev. Bhai Priyannath Mallik and Rev. Bhai Gopal Chandra Guha.

কলিকাতা—১৩নং রাসাখ মজুমদার হীটে, “সমাধিপার্শ্বে”

শ্রীপরিহার ঘোষ কর্তৃক এই পৌষ সুজিত ও প্রকাশিত।











